দৃশ্যকাব্য-পরিচয়

শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায়

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

দৃশ্যকাব্য-পরিচয়

গ্রন্থ-পরিচয়

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নাট্য-সমালোচকের তুলাদণ্ডে
বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যের বিচার।

বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের মনস্তাত্ত্বিক জন্মবৃত্তান্ত, বিভিন্নমুখী সাহিত্যের মধ্যগত নাট্যবীজ ও নাটকের ভ্রূণদেহের বিবরণ, ভিন্ন ভিন্ন দেশে নাট্যকলার জন্ম-কাহিনী—বাংলায় প্রাক্-মধুসূদন যুগের পঙ্গু নাট্য-সাহিত্য—বাঙ্গালী নাট্যকার রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, মনোমোহন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, রাজকৃষ্ণ, অতুলকৃষ্ণ, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমরেন্দ্রনাথ, অপরেশচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র প্রভৃতি মৃত লেখকের নাট্য-সাহিত্যের এবং প্রাচীন লেখকের জীবন-সাধনার ফলস্বরূপ বহু বিক্ষিপ্ত নাটকের সংশ্লেষাত্মক ও বিশ্লেষাত্মক আলোচনা।

নিবেদন

'দৃশ্যকাব্য-পরিচয়' বঙ্গসাহিত্যসৌধের এক নূতন কক্ষ-দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিল। 'A nation is known by its Theatre', রঙ্গালয় হইতেই জাতিকে চেনা যায়; সুতরাং জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে সাহিত্যের ভিতর দিয়া রঙ্গমঞ্চের পাদপীঠে প্রদর্শিত হয়, এরূপ একটা অত্যাবশ্যকীয় বিভাগের সংশ্লেষাত্মক ও বিশ্লেষাত্মক প্রণালীক্রমে দৃশ্যকাব্যের ইতিহাস সংকলন বিষয়ে বড় বড় সাহিত্যসেবীদের দৃষ্টি না থাকা বাঙ্গালী জাতির গৌরবের পরিচয় নহে। বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মতো নাট্যসাহিত্যের প্রাথমিক যুগও কুজ্ঝটিকার অন্ধকারে আবৃত । এমন কোন প্রতিভাদীপ্ত তপন সাহিত্যাকাশে আজও উদিত হন নাই, যাঁহার তেজো-প্রভাবে কুহেলিকা ভেদ করিয়া নাট্যসাহিত্যের অতীত ইতিহাসে আলোক-রশ্মিপাতের সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিশ্বরাজ্যের প্রত্যেক কার্যে চিরকালই প্রতিভার পূর্বে উহার প্রারম্ভিক ব্যাপার (spade-work) সম্পাদনার জন্য অপ্রতিভার হস্ত প্রথমেই দেখা দেয়, বিশেষতঃ যখন শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধার অভাব সাহিত্যের এই বিশিষ্ট বিভাগের মূলে বিদ্যমান ছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা উপক্রমণিকায় দ্রষ্টব্য। আমার ন্যায় অকৃতবিদ্যের আগমন প্রাকৃতিক নিয়মে অস্বাভাবিক হয় নাই। গত সাঁইত্রিশ বৎসরের ধারাবাহিক চেষ্টা আজ জগদীশ্বরীর ইচ্ছায় গ্রন্থাকার প্রাপ্ত হইল, ইহা তাঁহার কৃপা ভিন্ন আর কি বলিতে পারি?

বক্তব্য শেষ করিবার পূর্বে দুইচারিটি কথার উল্লেখ আবশ্যক বোধ করি। এই পুস্তকের অন্তর্গত কতকগুলি বিষয় অধুনালুপ্ত 'নাট্যমন্দির' মাসিক পত্রিকার ১৩১৯ সনের শ্রাবণ মাস হইতে ধারাবাহিক কয়েক সংখ্যায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার একটি প্রবন্ধ গ্রে স্ট্রীটস্থ তদানীন্তন 'সাহিত্য-সভার' ১৩২৩ সনের ভাদ্রমাসের অধিবেশনে পঠিত হইয়া পরে তাহা উক্ত সভার মুখ-পত্র সাহিত্য-সংহিতা পত্রিকার ঐ সনের ভাদ্র সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার আর একটি প্রবন্ধ প্রসিদ্ধ মাসিক 'ভারতবর্ষে'র ১৩২৫ সনের চৈত্রমাসে ও অপর একটি ১৩২৬ সনের ভাদ্র মাসে, এবং অন্য কতকগুলি প্রবন্ধ তৎকাল প্রচলিত অধুনালুপ্ত 'সারথি' পত্রিকার ১৩২৭ সনের আশ্বিন মাস হইতে ধারাবাহিক ছয়-সাত মাস কাল যথাক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩২৬ সনের ভাদ্র মাসে যে প্রবন্ধটি 'ভারতবর্ষে' বাহির হইয়াছিল, তাহা উক্ত 'সাহিত্য-সভার' ১৩২৫ সনের কার্তিক মাসের এক অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত হয়। 'সারথি' পত্রিকার প্রবন্ধগুলিও গ্রে স্ট্রীটস্থ তদানীন্তন সাহিত্য-সভার ১৩২৭ সনের ভাদ্র মাসের অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল। ঐ-ঐ অধিবেশনে যে-যে মনীষিগণ সভাপতির আসন অলংকৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইল! জ্যাস্টিস্ স্যর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় সাহিত্যের ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রসরাজ নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু। পূর্ব প্রকাশিত প্রবন্ধ নিচয়ের মধ্য হইতে গ্রন্থোপযোগী কতকগুলি বাছিয়া লইয়া ঐগুলির যথেচ্ছ পরিবর্তন, পরিহার ও পরিবর্ধন করিয়া এই গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছি।

বিষয়টি যেরূপ গুরু ও বিস্তৃত, গ্রন্থখানি তদনুরূপ বিরাট হইয়া পড়িয়াছে, পাঠক-পাঠিকারা এ ত্রুটি মার্জনা করিবেন। ইহাতে প্রাথমিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া, বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের যে সুরম্য হর্ম্য অধুনা নির্মিত হইয়াছে, তাহারই কতকগুলি প্রকোষ্ঠের পরিচয় মাত্র আছে। যে

সকল নাট্যকার ঐ নাট্যহর্ম্য গড়িবার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহাদের গঠনভঙ্গী এবং তাঁহাদের নাট্যসাহিত্যে বর্ণিত পর্ণকুটীর হইতে রাজপ্রাসাদ, উদ্যান হইতে তপোবন, শৌণ্ডিকালয় হইতে দেবালয় প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা ইহার মধ্যে আছে। যে সময়ে নাট্যসাহিত্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবের মিলন-সেতু নির্মিত হইয়াছিল, এবং যাহার উভয়প্রান্তে নাট্যরথিগণ বিচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিষয়ই সম্যকরূপে আলোচিত হইয়াছে।

জীবিত লেখকের রচনা স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত তাহার সম্বন্ধে আলোচনা রূপ লই' পারে না, কারণ কালস্রোতে তাহার কোন্‌টা ভাসিয়া থাকিবে, কোন্‌টা ডুবিয়া যাইবে. ত' দেখিবার জন্য কালের অপেক্ষা করিতে হয়, এ গ্রন্থে তাই মৃত লেখকের দৃশ্যকাব্যের আলোচনা ক' হইয়াছে, কোন জীবিত নাট্যকার আলোচনার মধ্যে আসেন নাই।

গ্রন্থমধ্যস্থ সাল-তারিখগুলিকে ভারতের সর্বপ্রদেশের গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য খৃষ্টাব্দ ও ইংরাজী মাস-তারিখে পরিণত করা হইয়াছে, কারণ সংবৎ, শকাব্দ, বঙ্গাব্দ, চৈতন্যাব্দ প্রভৃতি বি' সালের প্রচার ভারতে প্রচলিত আছে।

প্রত্যেক দৃশ্যকাব্য-প্রণেতার পরিচ্ছেদের শীর্ষদেশে যে খৃষ্টাব্দের উল্লেখ আছে, তাহা তাঁহাদের জীবিতকাল নির্দেশক না হইয়া, গ্রন্থগুলির প্রথম অভিনয়-তারিখ বা প্রথম প্রকাশকা জ্ঞাপক হইয়াছে।

তর্পণ

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জলতম রত্ন—ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আরম্ভিক
যুগের নিষ্কামকর্মী ও সাধারণ সম্পাদক—আলিপুর ও কলিকাতা
হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যবহারাজীব—'নববিভাকর' পত্রিকার
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধের
সম্পাদক—পরলোকগত পূজ্যপাদ পিতৃদেব—

৺গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়,

এম্-এ, বি-এল, পি-আর-এস্

মহাশয়ের চরণোদ্দেশে

পিতঃ!

দ্বিষষ্টিতম বর্ষ অতীত হইয়াছে আপনি ধরাধাম ছাড়িয়া অভিলষিত লোকে গমন করিয়াছেন। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে নিতান্ত শৈশবেই আপনাকে হারাইয়াছি। এই দীর্ঘকালের মধ্যে বাৎসরিক শ্রাদ্ধবাসর ব্যতীত আপনাকে স্মরণ করিবার সাহস কুলায় নাই, কারণ লোকমুখে শুনিতাম যে, আপনি বিদ্যার্থীর প্রিয় বন্ধু ছিলেন। আমি আপনার অকৃতবিদ্য সন্তান; পাছে আপনার পরলোকগত আত্মা পুত্রের অকৃতিত্বে ক্ষুব্ধ হয়, তজ্জন্য পুত্রের শেষ কর্তব্য পিণ্ডদান ব্যতীত অন্য সময়ে আপনাকে স্মরণ করিবার যোগ্যতা রাখি নাই। আজ যে অকাল-তর্পণের আয়োজন হইয়াছে, ইহার একটু অভিনবত্ব আছে, বিদ্যাদ্বারা না হোক, বয়সের অভিজ্ঞতা-দ্বারা যাহা লাভ করিয়াছি, তাহা লইয়া সতিলের পরিবর্তে সপুত্র-তর্পণের ব্যবস্থা করিয়াছি।

আপনার এ পৌত্র রক্ত-মাংস-অস্থি-বিজড়িত দেহী নহে, যে পুনরায় আপনার আশাভঙ্গ করিবে—ইহা মানসীকল্পনা-প্রসূত অজৈব-দেহী। এ পৌত্র আপনার প্রীতিবর্ধন করিতে পারে, পুত্রের অন্ততঃ আর একটা কর্তব্যপালন করিতে পারিয়াছি মানিয়া লইব; আর যদি বিরক্তির কারণ হইয়া উঠে, আপনার দুঃখ করিবার কিছুই থাকিবে না; কারণ ইহাদ্বারা বংশের গৌরববৃদ্ধি না হউক, কালিমা বিস্তৃত হইবে না। রেখাপাত জৈব দেহ-দ্বারা সম্ভব, অজৈবের তাহাতে অধিকার নাই। ইতি—

১৯৫০, খৃষ্টাব্দ

আপনার ভাগ্যহীন অকৃতি সন্তান

সত্যজীবন

সূচী।

বিষয় | পত্রাঙ্ক

বিষয় পত্রাঙ্ক

বিষয় | পত্রাঙ্ক

বিষয় | পত্রাঙ্ক

বিষয় | পত্রাঙ্ক

বিষয়			পত্রাঙ্ক
প্রায়শ্চিত্ত, পরিত্রাণ	--	--	৪০৭
শারদোৎসব	--	--	৪০৮
ঋণশোধ, মুকুট	--	--	৪০৯
রাজা, অরূপরতন, ডাকঘর	--	--	৪১০
মালিনী, বিদায় অভিশাপ	--	--	৪১১
অচলায়তন, গুরু	--	--	৪১২
ফাল্গুনী, মুক্তধারা	--	--	৪১৩
বসন্ত (গীতিনাট্য), গৃহপ্রবেশ	--	--	৪১৪
শোধবোধ	--	--	৪১৫
নটীর পূজা, ঋতু উৎসব, সুন্দর	--	--	৪১৬
রক্তকরবী, নবীন	--	--	৪১৭
নটরাজ (ঋতুরঙ্গশালা), শাপমোচন, কালের যাত্রা (নাট্য), রথের রশি		--	৪১৮
কবির দীক্ষা, রথযাত্রা, চণ্ডালিকা	--	--	৪১৯
নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা, তাসের দেশ	--	--	৪২০
বাঁশরি, শ্রাবণগাথা, পরিশোধ	--	--	৪২১
শ্যামা, মুক্তির উপায়	--	--	৪২২
নাট্যসাহিত্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের কাল (১৮৯৪—১৯২৬ খৃঃ)—			৪২২
ফুলশয্যা, প্রেমাঞ্জলি	--	--	৪২৩
আলিবাবা	--	--	৪২৪
প্রমোদরঞ্জন, কুমারী	--	--	৪২৫
জুলিয়া, বভ্রুবাহন	--	--	৪২৬
সপ্তমপ্রতিমা	--	--	৪২৭
সাবিত্রী, বেদৌরা (অপেরা)	--	--	৪২৮
প্রতাপ আদিত্য, রঘুবীর	--	--	৪২৯
বৃন্দাবন বিলাস, রঞ্জাবতী	--	--	৪৩০
পদ্মিনী, উলূপী	--	--	৪৩১
পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, রক্ষঃরমণী	--	--	৪৩২
চাঁদবিবি, দাদা ও দিদি	--	--	৪৩৩
নন্দকুমার	--	--	৪৩৪
অশোক, বরুণা, দৌলতে দুনিয়া	--	--	৪৩৫
ভূতের বেগার, বাসন্তী	--	--	৪৩৬
বাঙ্গালার মসনদ, পলিন, খাঁজাহান	--	--	৪৩৭
মিডিয়া	--	--	৪৩৮
ভীষ্ম, রূপের ডালি	--	--	৪৩৯
নিয়তি, আহেরিয়া	--	--	৪৪০
বাদশাজাদী	-	--	৪৪১

উপক্রমণিকা

সাইত্রিশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্যের এমন অবস্থা গিয়াছে, যে সময়ে বঙ্গের নীতিবিদ্ শিক্ষিত-সমাজ ইহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন না। তাঁহারা ইহাকে রঙ্গমঞ্চের কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র-বিশিষ্ট যুবকের ব্যসনী-জীবন চরিতার্থ করিবার উপায়স্বরূপ জ্ঞান করিয়া, ঐ সকল কুক্রিয়াসক্ত লোকের সহিত দৃশ্যকাব্যকেও অশ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

নাট্যসাহিত্য ব্যষ্টির সামগ্রী নহে, সমষ্টির সামগ্রী। কোন জাতির সম্প্রদায়বিশেষ যদি জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডার হইতে নিজেদের লাভবান্ করিবার জন্য অভিনয়োপযোগী নাটক রচনার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কি সেই জাতির অপর সম্প্রদায় ঐ জাতীয় সাহিত্যের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া সেই সম্প্রদায়বিশেষকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন, না নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন? সঙ্কীর্ণতাই জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী. বঙ্গভাষার প্রকৃত উন্নতিকামী সাহিত্যিকের পক্ষপাতশূন্য হওয়া উচিত ছিল।

ভাবসম্পদ-ই যখন সাহিত্য-ভাণ্ডারের ধনরত্ন, তখন সে সামগ্রী সমাজচক্ষের নিন্দনীয় স্থান হইতে সংগৃহীত হইলেও তাহা গ্রহণযোগ্য—প্রশংসার্হ স্থান হইতে আসিলে তো কথাই নাই। ভাব-সম্পদ সাহিত্যরূপ রাজহংসের অঙ্গীভূত হইলেই বুঝিতে হইবে, যে তাহার নীরত্ব ক্ষীরত্বে রূপান্তরিত হইয়াছে। সমাজদৃষ্টির সুস্থান-কুস্থান ভেদ ভাবগ্রাহী জনার্দন-সাহিত্যের মাপকাঠি নহে; সাহিত্যের মাপকাঠি তাহার লাভালাভে—স্থানভেদে নহে। বারাঙ্গনা-কলুষিত রঙ্গালয় শিক্ষিত ভদ্রসমাজের আদরণীয় নহে সত্য, কিন্তু বর্তমান সমাজবিধানের অনন্যোপায় অবস্থায় উপায় কি? বিশেষতঃ রঙ্গমঞ্চের সহিত দৃশ্যকাব্যের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সেটি পরস্পরাপেক্ষ অবস্থায় গঠিত হওয়ায় অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। একটি অপরটির দ্যোতক। রঙ্গমঞ্চের সহায়তায় দৃশ্যকাব্যের সৌন্দর্য-বৃদ্ধি হয়, এমন কি দৃশ্যকাব্যের অনেক অপরিস্ফুট অংশ পরিস্ফুট হইয়া যায়। অপরপক্ষে রঙ্গমঞ্চও দৃশ্যকাব্যের সাহচর্যে সুকৌশলী অভিনেতা, সুকণ্ঠ গায়ক, নৃত্যপটীয়সী অভিনেত্রী, মনোরম দৃশ্যপট ও অভিনয়োপযোগী সাজসজ্জা পাইয়া শিল্পকলার পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এইরূপ বলিয়াছেন :—

"অভিনয়-কলার সহিত নাট্যকলার পরস্পরাপেক্ষ সম্বন্ধ অত্যাবশ্যক। নাট্যকার পাঠকের কল্পনা দ্বারা তাঁহার অভিনেতার কার্য সম্পাদন করাইবার যতই কেন যুক্তি দেখান না, এবং যে সকল নাটক রঙ্গমঞ্চের তোয়াক্কা রাখে না, এমন নাটককে "সাহিত্যবিষয়ক নাটক" বলিয়া যতই কেন অভিহিত করুন না, সেগুলির ঐ নামকরণ যে অযথা হইয়াছে, এবং ঐগুলি যে আত্ম-মর্যাদাহীন, তাহার পরিচয় অনাবশ্যক। অভিনেতা নাট্যকারের নাটকীয় সৌন্দর্যের অস্থায়ী প্রকাশক, কখন বা নাট্যকারের ভ্রান্ত টীকাকার—কিন্তু সময়ে সময়ে নাটকীয় চরিত্রের বা পরিস্থিতির এমন কতকগুলি গূঢ়তথ্যের আবিষ্কার তিনি এমন ভাবে করিয়া দেন, যেগুলি ধ্যানমগ্ন নাট্যকারের বাহ্য চক্ষুর অন্তরালেই থাকিয়া যাইত। এ মন্তব্যে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, নাট্যকলা ও অভিনয়কলার গতি ঠিক পাশা-পাশি চলে না; কিন্তু তা'বলিয়া ইহাদের সংযোগ যে অনাবশ্যক, তাহার প্রতিধ্বনিও উক্ত মন্তব্য

হইতে পাওয়া যায় না, বরং উহা মিলনের পক্ষপাতী বলিয়াই মনে হয়। দৃশ্যকাব্য যতক্ষণ পর্যন্ত না অভিনীত হইতেছে, ততক্ষণ দৃশ্যকাব্য নামের অযোগ্য।" *

বিধাতৃবিধানে বাঙ্গালীর মঙ্গলের সূচনা হইয়াছে। শিক্ষিত সমাজের বহুকালের বদ্ধসংস্কার কালক্রমে তিরোহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। শিক্ষিত সমাজ এখন রঙ্গাধ্যক্ষের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিতেছেন, এবং তাহার ফলে নট ব্যতীত অন্য কৃতবিদ্য লোকের দৃশ্যকাব্যও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে। দৃশ্যকাব্যের এই অভাবনীয় ভাগ্য পরিবর্তন দেখিয়া ইহার বিশ্লেষাত্মক পরিচয়পূর্ণ ইতিহাস সংকলনে সাহসী হইয়াছি।

নাট্যসাহিত্যের প্রাথমিক কাল অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও, বঙ্গসাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় দুর্জ্ঞেয় নহে। বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে জন্মলাভ করিয়াছে। তাবার প্রাচীনত্বের তুলনায় দৃশ্যকাব্যের আধুনিকত্ব নিন্দনীয় নহে, কারণ প্রত্যেক ভাষারই যৌবনকালে নাটক উদ্ভূত হইয়াছে। কিরূপে এবং কোন্ অবস্থায় দৃশ্যকাব্যের গর্ভবাস হইতে তাহার জন্ম ও পরিণতিলাভ ঘটিল, এ বিষয়ের একটি ধারাবাহিক অনুসন্ধান গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তবে ইহার ঐতিহাসিক গবেষণা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। গ্রন্থারম্ভের পূর্বে তাহার আভাস দেওয়া কর্তব্য। ইতিহাসের খোসা বাদ দিয়া তাহার ভিতরকার রসাল অংশই এ গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। সন, তারিখ ও পরম্পরার দিকে নজর রাখিলেও সকল স্থলে যথানিয়মে উহা রক্ষিত হয় নাই। কোন্ কালে বাঙ্গালীর চিন্তাস্রোত কোন্ পথে ধাবিত হইয়া নাট্যসাহিত্যের কোন্ কোন্ অঙ্গ কিরূপভাবে পুষ্ট করিয়াছে, বক্ষ্যমান গ্রন্থে তাহারই আলোচনা আছে। অনেক স্থলে এরূপ হইয়াছে, যে কোন আলোচ্য গ্রন্থ অপর কোন সমকালীন অথবা কিছু প্রাচীন অথচ একপ্রকৃতিক অনালোচ্য গ্রন্থের পরে রচিত হইয়াছে। সেখানে কিন্তু সেই প্রাচীনকে উপেক্ষা করিয়া আধুনিকের উল্লেখ করা হইয়াছে, কারণ, ঐ আধুনিকে তৎকালোচিত চিন্তা, রুচি ও ভাবের প্রভাব অধিক পরিমাণে দেখা গিয়াছে। মনে হয় ঐরূপ চিন্তাগত, রুচিগত ও ভাবগত পরিবর্তনের সূত্র ধরিয়া থাকাই ঐতিহাসিকের কার্য, বিশেষতঃ সাহিত্যের ইতিহাসে উহা একান্ত প্রয়োজনীয়।

এ গ্রন্থের আরও এক বিশেষত্ব এই যে, বিশ্লেষণপূর্বক অনুশীলন ক্রমে (analytical study) প্রতি দৃশ্যকাব্যের ইতিহাসের অবতারণা ইহাতে আছে। এ প্রণালী বঙ্গ-সাহিত্যে একেবারেই নূতন

---

* "The Co-operation of the art of Acting is indispensable to that of drama. The dramatic writer may have reasons for preferring to leave the imagination of his reader to supply the absence of this Co-operation ; but though the term 'Literary Drama' is freely used of works kept away from the stage, it is in truth, either a misnomer or a self-condemnation. It is true that the actor only temporarily interprets and sometimes misinterprets the dramatist, while occasionally he reveals dramatic possibilities in a character or situation which remain hidden from their literary inventor. But this only shows that the courses of the dramatic and the histrionic art do not run parallel, it does not contradict the fact that the conjunction is on the one side as well as on the other, indispensable. No drama is more than potentially such till it is acted."

Encyclopaedia Britannica, 11th Edition.

বলিতে হইবে। ইহাতে একাধারে আলোচ্য গ্রন্থের সমালোচনা ও ঐতিহাসিক লাভালাভের উল্লেখ থাকে ; এই বিশেষত্বই ইহার নবীনত্ব।

এ গ্রন্থমধ্যে যে সকল দৃশ্যকাব্য আলোচিত হইয়াছে, তাহার প্রায় অধিকাংশই কোন-না-কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। যেগুলি অভিনীত হয় নাই, কেবল ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণের জন্য সেগুলির নামোল্লেখ করা হইয়াছে। অভিনীত দৃশ্যকাব্যগুলির প্রথম-অভিনয়-তারিখ সর্বত্র দেওয়া হইয়াছে। ৩৭ বৎসর পূর্বে এই কার্যে যখন প্রথম হস্তক্ষেপ করা হয়, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যে এ জাতীয় পুস্তক ছিল না বলিলেও চলে। যেগুলি ছিল এবং কাজ আরম্ভ করিবার পর যেগুলির সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছে, গ্রন্থ-পঞ্জীর মধ্যে তাহাদের নাম দেওয়া হইল। ঐ তালিকার মধ্যগত আধুনিক গ্রন্থগুলির গবেষণার ফল সর্বত্র গ্রহণ করিবার সুযোগ হয় নাই, কারণ তৎপূর্বেই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি শেষ হইয়া গিয়াছিল। নানা বিপর্যয়ের মধ্যে জীবন কাটাইতে হইয়াছিল, তাই এতকাল ইহা মুদ্রিত হয় নাই।

যাহা হউক, এ জাতীয় ইতিহাস-সংকলন একার কার্য নহে। বিরাট বাঙ্গালা দেশে কোথায় কি দৃশ্যকাব্য রচিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল, তাহার সংবাদ রাখা একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। মুদ্রিত ও অভিনীত দৃশ্যকাব্যের সকলগুলিকেই যে গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ কথাও নহে, তজ্জন্য কৈফিয়ৎ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। নাটককারদের কালালোচনার শিরোভাগে যে তারিখ দেওয়া আছে, তাহা নাট্যসাহিত্যের প্রকাশকাল বা প্রথম অভিনয়কাল ধরিয়া করা হইয়াছে।

সাহিত্যের মধ্যে দৃশ্যকাব্য দুইরূপে জনসাধারণে প্রকাশিত হয়। ইহার ন্যায্য রূপ অভিনয়-কালে দর্শকসাধারণের চক্ষে প্রথম পড়ে, এবং তাহাতেই ইহার সার্থকতা বিদ্যমান থাকে, কারণ ঐ বৈশিষ্ট্যের জন্য তাহার আকারগত পার্থক্য গ্রন্থকর্তা পূর্ব থেকেই করিয়া দেন। যে দৃশ্যকাব্য অভিনয়ে দাঁড়াইয়া যায়, তাহার রস বুঝিবার জন্য ইহার দ্বিতীয় মুদ্রিত রূপের অনুসন্ধান চলে। এই গ্রন্থে তজ্জন্য দৃশ্যকাব্যগুলির প্রথম অভিনয়-তারিখ দেওয়া হইয়াছে। শতকরা ৯৫ ভাগ নাটকই অভিনীত হইয়াছে। অনভিনীত নাটক নাম-গোত্রহীন (misnomer)।

দৃশ্যকাব্য-পরিচয়

—:০:—

দৃশ্যকাব্যের মনোবিজ্ঞান-সম্মত ও অলংকারশাস্ত্র-সম্মত উৎপত্তির কথা

দৃশ্যকাব্য বলিলে কি বুঝায় এবং কিরূপেই বা তাহা উৎপন্ন হইল ?—এ কথা জানিবার জন্য স্বতঃই মনের মধ্যে একটা কৌতূহল জাগে। সেই কৌতূহলের বশে আলংকারিকের ভাষায় যাহাকে ব্যঙ্গ্যার্থ ও বাচ্যার্থ বলা হয়, মানুষ তাহারই অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠে। দৃশ্যকাব্যের মনোবিজ্ঞান-সম্মত উৎপত্তি দেখাইবার কালে প্রথমেই ইহার ব্যঙ্গ্যার্থ ব্যক্ত হইবে। এ আলোচনার পরে কিরূপে বঙ্গসাহিত্যে দৃশ্যকাব্যের রূপ বিকাশ পাইয়াছে, তাহার আলোচনা-প্রসঙ্গে ইহার বাচ্যার্থও প্রতিপন্ন হইবে।

মানুষের মানসিক বৃত্তিনিচয়ের (faculties of mind) মধ্যে নাট্যবৃত্তি ও অনুকরণ-বৃত্তি নামে দুইটি বৃত্তি আছে। বৃত্তিগুলির ধর্ম এই, যে ইহারা অজ্ঞাতসারে মানুষের উপর আধিপত্য স্থাপন করে, এবং মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো ইহাদের দাস হইয়া যায়। নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমবায়কে নাট্য কহে। নৃত্য দেখিবার, গীত ও বাদ্য শুনিবার যে স্বাভাবিক স্পৃহা, তাহাই নাট্যবৃত্তি, এবং ঐ নাট্যবৃত্তির প্রেরণায় নৃত্য, গীত ও বাদ্য—যাহা দেখা বা শুনা হইল, মানস-পটে তাহাদের চিত্রাঙ্কন করিয়া পুনরভিনয়ের চেষ্টাই অনুকরণ-বৃত্তি। এই দুই বৃত্তি কার্যকারণ-সম্পর্কে এত ঘন-সংস্পৃক্ত যে, স্থূলদৃষ্টিতে ইহাদিগকে অভিন্ন মনে হয়, কিন্তু বিচার করিলেই পার্থক্য বাহির হইবে। কিরূপে এই বৃত্তি-দ্বয় দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তিমূলক হইয়াছে, ক্রমশঃ তাহাই প্রদর্শিত হইবে।

জীবপ্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শৈশব হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত সকল অবস্থাতেই জীবকুল নাট্যবৃত্তির সেবায় তৎপর। এই বৃত্তির মোহিনী শক্তি কেবল যে মনুষ্যসমাজে পরিব্যাপ্ত তাহা নহে, মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও ইহার অভিব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয়। দেখা গিয়াছে, গীত ও বাদ্যের শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া সর্প বা মৃগ সর্প-বৈদ্য বা কিরাতের ক্রীড়নক হইয়াছে। সুতরাং নাট্যবৃত্তি যে ওতপ্রোত ভাবে জীবজগতে ছড়াইয়া আছে, তাহার আর অন্য প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। পৌর্বাপর্য সম্বন্ধ নিবন্ধন অনুকরণবৃত্তি নাট্যবৃত্তির অনুসারিণী। অনুকরণবৃত্তির ধর্ম এই যে, জীবের চক্ষে যাহা কিছু সুন্দর ও আনন্দপ্রদ, তাহার অনুকরণে জীব স্বতঃ প্রণোদিত হয়, অপরের প্ররোচনার অপেক্ষা রাখে না। এরিস্টটল্ (Aristotle) এই বৃত্তির সর্বজনীনতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—'মানব-মনে অনুকরণ-বৃত্তি স্বভাবজ ও শৈশব হইতে স্ফুরিত। অনুকরণলব্ধ আমোদ সর্বজাতি সর্বকালে সমভাবে উপভোগ

করে। * শিশু মাতৃক্রোড় হইতেই মাতার হর্ষোৎফুল্ল অন্তর্ভক্তিযুক্ত স্নেহ-সম্ভাষণ, ভ্রাতাভগিনীর আদর-আপ্যায়ন, এবং কোন উদ্দিষ্টবস্তু নিকটবর্তী করিবার আঙ্গিক কৌশলাদি নিয়ত লক্ষ্য করিয়া, শিশু শয্যা হইতেই সেই সকল প্রদর্শিত বাচনিক ও আঙ্গিক অনুকরণে আপনার ক্ষুদ্র শক্তিকে নিযুক্ত করে. এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া নিজ নয়ন ও মনের প্রীতিপ্রদ যাহা কিছু দেখে বা শুনে, তাহারই অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। নাট্যবৃত্তির মতো অনুকরণ বৃত্তিরও প্রভাব মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। পক্ষিশাবকের উড্ডয়ন-চেষ্টা ও তাহার অস্ফুট মধুর কাকলি যে, তাহার মাতাপিতার উড্ডয়ন-অভ্যাস ও শব্দশীলতার অনুকরণে সংসাধিত হয়, এ কথা নিঃসংকোচে বলা যায়।

এই অনুকরণ-বৃত্তি সময়ে সময়ে এরূপ প্রবলভাবে দেখা দেয় যে, যখন কোন মানুষ অপর কোন মানুষের ভাব বা অবস্থার সংস্পর্শে আসিয়া তন্ময়চিত্তে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে থাকে, তখন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই লক্ষিত ব্যক্তির ভাব বা অবস্থার অনুযায়ী ভাব-ভঙ্গী নিজের অজ্ঞাতেই নিজ দেহমনের ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে দেয়। কখনও বা এমন হয় যে, ভাবপ্রবণ মানুষ আপনার পার্শ্বস্থ সমাজের কোন এক উন্নত ভাবাদর্শে আকৃষ্ট হইয়া, সেই ভাবের অনুকরণ করিয়া আপনার মনোরাজ্যে তাহার একটা চিত্র চিত্রিত করে, এবং সেই অনুকরণ-সৃষ্ট মানসী প্রতিমাই ক্রিয়াযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ প্রাণময়ী হইয়া উঠিতে থাকে। পরে সেই প্রাণময়ী মানসী প্রতিমা বহুবিধ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রবহুল উপাখ্যান-বস্তু সৃষ্টি করে। কালে ইহাই বহিরবয়ব পাইয়া দৃশ্যকাব্য আখ্যা লইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাকেই দৃশ্যকাব্যের মনোবিজ্ঞানসম্মত উৎপত্তি (Psychological origin) বলা হয়। দৃশ্যকাব্যের জন্ম-সম্বন্ধীয় এই চিরন্তন প্রথার বৈলক্ষণ্য কোথাও নাই। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত দৃশ্য-কাব্যের জন্ম সর্বত্র এই নিয়মে নিয়মিত আছে। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে অবয়বের বিচিত্রতা থাকিতে পারে, কিন্তু জন্ম-রহস্যের পার্থক্য নাই। নাট্য-অবয়বের বিচিত্রতা আলোচনার তারতম্যানুসারে হইয়া থাকে। যে জাতির মধ্যে দৃশ্যকাব্য যত বেশী উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, সেখানে ইহা যত্ন-সেবিত বনস্পতির মতো নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃতিলাভ করিয়া আপনার সুশীতল ছায়াতলে ও সুগন্ধি কুসুম-বিলাসে আশ্রিত পান্থের পথশ্রম লাঘব করিয়াছে। এবং যেখানে ইহা সম্যক্‌রূপে আলোচিত হয় নাই, সেখানে উষর ক্ষেত্রোৎপন্ন অযত্নবর্ধিত তৃণগুল্মের মতো কঙ্কালসার হইয়া কাব্যকুসুমসুরভি-পরিম্লাত সাহিত্যকাননের শোভার অন্তরায় হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ জার্মান্ নটসূত্রকার শ্লিগেল (Schlegel) সাহেব দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তির অনুসন্ধান বিষয়ে অনুকরণ-প্রবৃত্তি হইতে আরও একপদ অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্যের তাৎপর্য এইরূপ :—"মানুষের পৃথক পৃথক সামাজিক জীবন হইতে অনুকরণীয় অংশগুলি পৃথক করিয়া লইয়া সেইগুলিকে চুম্বক-ভাবে একটি ঘটনার অঙ্গীভূত করিয়া সমাজচক্ষে উহাদের এককালীন পুনঃ প্রদর্শনই দৃশ্যকাব্যোৎপত্তির প্রাথমিক অবস্থা।" † ঐ শ্লিগেল সাহেব (Schlegel) আর এক স্থানে

* "Imitation is instinctive in man from his infancy; and no pleasure is more universal than what is given by imitation."

† "One step more was requisite for the invention of the Drama, namely, to separate and extract the imitative elements from the separate parts of social life and to present them to itself again collectively in one mass."

বলিয়াছেন—"কলাবিদ্যায় মাত্র অনুকরণ ফলপ্রদ হয় না। অপরের কাছ থেকে আমরা যাহা অনুকরণ দ্বারা লাভ করি, তাহাকে প্রকৃত নাট্যভাবাপন্ন করিতে হইলে, আমাদের মনের মধ্যে ইহার পুনর্জন্মের প্রয়োজন হইয়া থাকে। বিজাতীয় অনুকরণ যাহা আমাদের প্রকৃতিগত নহে, তাহার কি প্রয়োজন আছে? প্রকৃতিগত না হইলে কলাবিদ্যা তিষ্ঠিতে পারে না। মানুষ তাহার নিজের প্রতিবিম্ব-ছাড়া সহচরদের আর কিছু দিতে পারে না।" *

পূর্ববর্ণিত আলোচনার মধ্যে আমরা দৃশ্যকাব্যের ব্যঙ্গ্যার্থ পরিস্ফুট দেখিলাম। একণে আভিধানিক ও আলংকারিক ব্যুৎপত্তি দ্বারা ইহার বাচ্যার্থ প্রতিপন্ন করিয়া বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্যের রূপবিকাশ ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিব।

অলংকারশাস্ত্র কাব্যকলাপ্রসূত সেই গ্রন্থ-বিশেষকে দৃশ্যকাব্য বলে, যে গ্রন্থাবলম্বিত ক্রিয়ার পাত্র-পাত্রিগণ ক্রিয়ানুমোদিত হইয়া সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। প্রাচীন আলংকারিকেরা কাব্যকে শ্রব্য ও দৃশ্য ভেদে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যাহা গুরুমুখে শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তাহাই শ্রব্য-কাব্য, যথা—মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য ইত্যাদি। পুরাকালে যখন লিখনপ্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন প্রাচীন রীত্যনুসারে উল্লিখিত কাব্যাদির অধ্যয়নাদি প্রধানতঃ শ্রুতিসাহায্যে নিষ্পন্ন হইত। যদিও মুদ্রাযন্ত্র প্রচলনের পর পূর্বোক্ত কাব্যাদির পঠনক্রিয়াও সম্পাদিত হইতেছে, তথাপি ইহারা আজও সেই প্রাচীন শ্রব্যনামে অভিহিত আছে। যে কাব্যের শ্রবণ বা পঠন ব্যতীত দর্শনেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহাই বাচ্যার্থগত দৃশ্যকাব্য।

বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্যই এ গ্রন্থের অবলম্বিত বিষয়, তজ্জন্য তাহার উৎপত্তির ও রূপের অনুসন্ধানে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া যাক্।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশে নাট্যকলার জন্ম-সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনার পূর্বে, পৃথিবীর দুই মহাজাতির মধ্যে কিরূপে দৃশ্যকাব্য উদ্ভূত হইয়াছিল,তাহার কিঞ্চিৎ ইতিহাসালোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ আপনার কোন একটি বিষয়কে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ঐরূপ সমধর্মী বিষয় প্রাচীন প্রতিবেশীর ঘরে কিংবা দূর বিদেশীর গৃহে কিরূপে উৎপন্ন হইয়া সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহার আলোচনায় প্রতিপাদ্য বিষয়ের জ্ঞান অধিকতর পরিস্ফুট হইবে। সুতরাং প্রথমেই আমরা প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীক, এই দুই মহাজাতির নাট্যকলার জন্ম-সম্বন্ধীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াই বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্যের জন্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

---

* "But in the fine arts, mere imitation is always fruitless, even what we borrow from others, to assume a true poetical shape, must, as it were, be born again within us. Of what avail is all foreign imitation? Art cannot exist without nature, and man can give nothing to his fellow-men but himself." —Schlegel's "Dramatic Literature"

প্রাচীন হিন্দু-দৃশ্যকাব্য

সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রে দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তির কারণ নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত আছে:—"কথিত আছে যে, পুরাকালে ব্রহ্মা ইন্দ্রকর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তাঁহার চিত্ত-প্রসাদনের নিমিত্ত চতুর্বেদ হইতে সংকলন করিয়া নাট্যনামে পঞ্চম বেদ প্রণয়ন করেন। বেদের ন্যায় উপবেদও চারিটি এবং তন্মধ্যে গান্ধর্ব বেদ * স্বয়ম্ভু শিবের নিকট শিক্ষালাভ করেন, এবং স্বয়ম্ভুর নিকট হইতে ভরতমুনিই তাহা মর্ত্ত্যে প্রচার করিয়াছিলেন। সেজন্য শিব, ব্রহ্মা ও ভরত—এই তিন জনকেই নাটকের প্রবর্তক বলা হয়।"†

ইন্দ্রের ব্রহ্মার নিকট যাওয়া সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা এইরূপ:—অতি প্রাচীনকালে বৈদিকযুগে যখন অনুন্নত জন-সাধারণ বেদের নীরস আত্মিক তত্ত্বের রসবোধ করিতে পারিল না, তখন ধীরে ধীরে সমাজদেহে পাপাচরণ প্রবেশলাভ করিল। তদানীন্তন সমাজরক্ষক ঋষিগণ ইন্দ্রের নিকট যাইয়া জন সাধারণের শিক্ষার অনুরূপ সহজবোধ্য ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। ইন্দ্র স্বয়ং তাহা করিতে অক্ষম হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা তখন সবেমাত্র সমাপ্ত দেবাসুর সংগ্রাম বিষয়ক নাট্যাভিনয়ের আদেশ দিলেন। দেব, নর, অসুরবৃন্দ দর্শক বা শ্রোতৃর আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। অসুরেরা ইহাতে আপনাদিগকে অপমানিত মনে করিয়া উপদ্রব শুরু করিয়া দিল। তদবধি অভিনয়ক্ষেত্রের পুরোভাগে বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত ইন্দ্রধ্বজ বা জর্জর প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইল।

ঋক্‌ হইতে কথোপকথন, সাম হইতে সংগীত, যজুঃ হইতে ভাবরাজি, অথর্ব হইতে সাজ-সজ্জা প্রভৃতি বিবিধ উপকরণ গ্রহণ করিয়া নাট্যবেদ প্রণীত হইয়াছিল। ভরতই ইহার প্রচারক হইলেন।

ভরত কর্তৃক নাট্যকলা মর্ত্ত্যভূমিতে আনীত, তজ্জন্য মহর্ষি ভরতকেই নাট্যশাস্ত্রের প্রণেতা বলা হয়। নট, নাটক, নৃত্য, নাট্যশালা, অভিনয়-শাস্ত্র প্রভৃতি দৃশ্যকাব্য-সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ের সহিত ইঁহার নাম এরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, ভরত ব্যতীত ভারতে নাট্যকলার অস্তিত্ব নাই বলিয়াই মনে হয়। কাহারও-কাহারও মতে ভরত তাঁহার প্রকৃত নাম নহে। ভ (ভাব) + র (রাগ) + ত (তাল)—এই তিনের সমন্বয়ে ত্র্যক্ষরবিশিষ্ট নামরূপকের সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং পূর্বকথিত মুনি ইহার প্রবর্তক বলিয়াই এই নাম তাঁহাতেই অর্পিত হইল। পূর্বোক্ত ভাবাদি

---

* গান+ধর্ম (নিপাতনে সিদ্ধ)+ষ্ণ=গান্ধর্ব। গান ধর্ম যার এমন বেদ, অর্থাৎ নাট্যবেদ, কারণ নাটকের গান একটি ধর্ম বিশেষ।

† "ইহানুশ্রূয়তে ব্রহ্মা শক্রেনাভ্যর্থিতঃ পুরা।
চকারাকৃষ্য বেদেভ্যো নাট্য বেদন্ত পঞ্চমং।
উপবেদোহথ বেদাশ্চ চত্বারঃ কথিতাঃ স্মৃতৌ।
তত্রোপবেদো গান্ধর্বঃ শিবেনোক্তঃ স্বয়ম্ভুবে।
তেনাপি ভরতায়োক্ত স্তেন মর্ত্ত্যে প্রচারিতঃ।
শিবাজযোনিভরতা স্তস্মাদস্য প্রযোজকাঃ।"

"সঙ্গীত দামোদর"

বিভাগে অগ্র-সন্নিবেশ নিবন্ধন ভাবের প্রাধান্ত লক্ষিত হয়, এবং এই প্রাধান্ত ন্যায়সঙ্গত, কারণ ভাবই দৃশ্যকাব্যের প্রাণ। *

ভরতের পর শিলালিন্ ও কৃশাশ্ব এই দুই নটসূত্রকারের নাম পাণিনীতে পাওয়া যায়, এবং তাঁহাদিগের নামানুসারে শৈলালী ও কৃশাশ্বী, এই দুইটি পদ নটার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণিনী-ভাষ্যকার পতঞ্জলি দুইখানি নাটকাভিনয়ের নামোল্লেখ করিয়াছেন—কংসবধ ও বালিবন্ধন। ওয়েবার (Weber) সাহেব তাঁহার ভারতবর্ষীয় কাব্যের প্রাচীন ইতিহাস-গ্রন্থে বলিয়াছেন পাণিনীর শিলালিন্ শব্দ শতপথ ব্রাহ্মণে শৈলালী নামে ব্যবহৃত আছে। এই মন্তব্য প্রামাণিক হইলে হিন্দু নাটকের উৎপত্তি বৈদিকযুগে সম্ভাবিত ছিল। পতঞ্জলিকথিত নাট্যাভিনয়ের পোষকতা করিয়া এগেলিং (Eggelling) সাহেব বলিয়াছেন:—"পতঞ্জলিবর্ণিত নাট্যাভিনয় হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাঁহার প্রাদুর্ভাবকালে যে সকল নাটকের অভিনয় হইত, সেগুলি ইওরোপীয় প্রথার ধর্মসম্বন্ধীয় নাটকের সহিত অনেকটা তুলনীয়, এবং ঐ সকল নাট্যাভিনয়ের পূর্বে তৎকালপ্রচলিত প্রথানুযায়ী কতকগুলি সরল প্রকৃতিক নাট্যাভিনয় হইয়াছিল, কিন্তু পতঞ্জলি সেগুলির নামোল্লেখ করিবার অবসর পান নাই। †

বেদের পর পুরাণেও নাট্যাভিনয়ের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। বিরাটপর্বে উত্তর-গৃহে বৃহন্নলা অভিনয় শিখাইবার জন্য বৃত হইয়াছিলেন। বজ্রনাভপুরে প্রভাবতী-হরণকালে প্রদ্যুম্ন নটবেশে নাট্যাভিনয় করিয়াছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণে উক্ত আছে—ভরত যখন মাতুলালয়ে পিতার মৃত্যু-সম্বন্ধীয় অশুভ স্বপ্ন দেখিয়া বিষণ্ণ ও চিন্তিত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার মনের শান্তি-বিধানের জন্য বাদ্য, নৃত্য ও নাটকাদি দ্বারা তাঁহার চিত্তের প্রসাদন করা হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণের বিংশ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে, সত্রাজিৎ রাজার পুত্র গীতশ্রবণে ও নাটকদর্শনে অনুরাগী ছিলেন। তিনি কখনও কাব্যকলার আলোচনা করিতেন, কখন বা গীত ও নাটকে ব্যাপৃত থাকিতেন। নাট্যাভিনয়-প্রথার প্রাচীনত্বের আর এক নিদর্শন মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে "নটশ্চ করণশ্চ" ইত্যাদি শ্লোকে পাওয়া যায়।‡ বৌদ্ধগ্রন্থে বুদ্ধশিষ্য মৌদ্গল্যায়ণ ও উপতিষ্যের জীবনবৃত্তে এই দুই মহাত্মার সম্মুখে নাটকাভিনয়ের উল্লেখ

---

* " 'Bharata' some say is not the name of the man. What his real ame is, is not known for certain. Bharata consists of three syllables. *Bha* tands for Bhava, which is gesticulation, *Ra* stands for Raga, which is vocal ıusic, *Ta* for Tala, which is keeping time by means of cymbals. These are nown as Bharata. This classification gives prominence to gesticulation or ction, and I think the classification is just for without action amusement is dull r parrot-like."

—Kumarswami's "The dramatic history of the world" P. 187.

† "Judging from these allusions, theatrical entertainment in those days eem to have been very much on a level with our old religious spectacles or ıysteries, though there may already have been some simpler kind of ecular plays which Patanjali had no occasion to mention."

‡ দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'পৃথিবীর ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ড।

দেখা যায়। 'ললিতবিস্তরে' কথিত আছে, বুদ্ধদেব যে সকল বিদ্যার অনুশীলন করিতেন, তন্মধ্যে নাট্যকলা একটি।*

পুরাণে নাটকাভিনয়ের নামোল্লেখ থাকিলেও, প্রকৃত অবয়বে সে নাটকগুলি প্রকাশিত হয় নাই। ক্রমে যখন হিন্দুদিগের মহাকাব্যগুলি কথোপকথনের আতিশয্যে নাট্যভাবাপন্ন হইতেছিল, সে সময়ে হিন্দুনাটক মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ প্রকৃত অবয়বে স্বাধীনভাবে উদ্ভূত হইতে লাগিল।† সুতরাং প্রকৃত নাটক মহাভারত ও রামায়ণের পর উৎপন্ন হইয়াছিল। এ অংশে হিন্দুনাটক গ্রীকনাটকের সহিত তুলনীয়, কারণ প্রাচীন স্তোত্রাদির পর গ্রীকদিগের যেরূপ হোমার-লিখিত কাব্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল এবং সেই কাব্যাদি হইতে পরে যেমন গ্রীকনাটকের উদ্ভব হয়, সেইরূপ হিন্দুনাটকও বেদ হইতে পুরাণ এবং পুরাণ হইতে নাটক, এই ক্রমপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই উৎপন্ন হইয়াছিল।

হিন্দুনাটকের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা হিন্দুদিগের সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব সম্পত্তি, কোনরূপ বৈদেশিক প্রভাব ইহার জন্য কলুষিত করে নাই। এখানে ওয়ার্ড (Ward) সাহেবের মত প্রামাণ্যস্বরূপ উদ্ধৃত হইতেছে। তিনি ভারতবর্ষীয় নাটকাবলির উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ইহা হিন্দুদের নিজস্ব সম্পত্তি, এ কথা নিঃসংকোচে বলা যায়। মুসলমানগণ ভারত আক্রমণকালে কোন নাটক সঙ্গে লইয়া আসে নাই। পারসীক, আরব এবং মিশরবাসীর জাতীয় রঙ্গমঞ্চ ছিল না। হিন্দুনাটক চীনদেশীয় নাটকের কাছে ঋণী, একথা একরূপ অসঙ্গত এবং গ্রীকদিগের প্রভাব হিন্দুনাটকে কোনকালে সংক্রামিত হইবার প্রমাণও নাই। অধিকন্তু হিন্দুনাটক যখন উন্নতির শিখর হইতে অবনতির পিচ্ছিল পথে পদার্পণ করিল, তাহার পর হইতে বর্তমান সময়ের ইওরোপীয় নাটকের সূত্রপাত হইয়াছে।‡ সংস্কৃত নাটকের

---

* "Buddhist Legend seems, indeed, in one instance—in the story of the life of Maudgalayana and Upatishya, two disciples of Buddha—to refer to the representation of dramas in the presence of these individuals."

"In the Lalit-Vistara, apropos of the testing of Buddha in the various Sciences Natya, must undoubtedly, be taken in the sense of mimetic art and so Foulaux translates it." Weber's "Dramatic History of the World."

† "But while the Epic poetry of the Hindus gradually approached the dramatic in the way of dialogue, their drama developed itself independently out of the union of the lyric and the Epic forms."

"Encyclopaedia Britannica," 11th. Edition.

‡ "The origin of the Indian drama may unhesitatingly be described as purely native. The Mohamedans when they over-ran India, brought no drama with them; the Persians, the Arabs and the Egyptians were without a national theatre. It would be absurd to suppose the Indian drama to have owed anything to the Chinese or its offshoots. On the other hand, there is no real evidence for assuming any influence of Greek examples upon the Indian drama at any stage of its progress. Finally, it had passed into its decline before the dramatic literature of Modern Europe had sprung into being."

—Wards' "Dramatic literature"

প্রাচীনতা ও বৈদেশিক প্রভাবহীনতা সম্বন্ধে জার্মান নটসূত্রকার শ্লিগেল (Schlegel) সাহেবের মতও এখানে উদ্ধৃত হইল। তিনি বলিয়াছেন :—"হিন্দুরা যেরূপ তাহাদের সমাজবন্ধন ও মনঃকর্ষণ বহু শতাব্দী পূর্ব হইতে নিজেদের হস্তগত করিয়াছিল, সেরূপ তাহারা তাহাদের নাটকাবলিও বিদেশীয় প্রভাবস্পৃষ্ট হইবার পূর্বে পাইয়াছিল। হিন্দুদের নাট্যৈশ্বর্য অতি অল্পদিন ইওরোপীয়ের দৃষ্টিপথে আসিয়াছে।" *

পূর্বোক্ত বিবরণে প্রতিপন্ন হইল যে, অতি প্রাচীনকালেই হিন্দুদের নাট্যভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মৃচ্ছকটিক, শকুন্তলা, উত্তর-রামচরিত প্রভৃতি সুরম্য নাট্যহর্ম্যের অপূর্ব দৃশ্যে সমস্ত জগৎ আজ বিস্মিত হইয়াছে। ইহাদের কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে বিচরণ করিয়া তন্মধ্যস্থিত অমূল্য সম্পদরাজি দেখিয়া জগৎবাসী পুলকবিস্ময়ে চাহিয়া আছে। ঐগুলি প্রাচীন নাট্যভিত্তিকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাচ্য আলংকারিকগণ দৃশ্যকাব্যের বিবিধ রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইদানীং ইহাদের অধিকাংশ অপ্রচলিত, এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রয়োজন-রহিত বলিয়া ঐগুলির মাত্র নামোল্লেখ করিয়াই বিষয়ান্তরে প্রবেশ করা যাইবে। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে দৃশ্যকাব্যের এই কয়টি রূপ কল্পিত হইয়াছিল :—নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, প্রহসন, বীথী, নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, প্রেঙ্খণ, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্মল্লিকা, হল্লিস। বাহুল্যভয়ে এইখানেই প্রাচীন হিন্দুকাব্যের উৎপত্তির ইতিহাস শেষ করিতে হইল।

গ্রীক দৃশ্যকাব্য

প্রতীচ্যখণ্ডের নাট্যোৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে যাইলে, কেবলমাত্র প্রাচীন ইওরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি গ্রীসের নাট্যেতিহাস পাঠ করিলেই তাহা নির্ণীত হইবে। গ্রীসাকাশে যে সভ্যতাসূর্য উঠিয়াছিল, উত্তরকালে তাহারই কিরণজাল পাশ্চাত্ত্য গগনের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহকে শশধরের মতো দিপ্তিশালী করিয়া তাহাদেরই উৎকীর্ণালোকে প্রতীচ্যদেশের নাট্যকক্ষের অন্ধকার দূর করিয়াছিল। সুতরাং গ্রীসের নাট্যোৎপত্তির ইতিহাস জানিলেই অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য দেশের নাট্যেতিহাস স্থূলতঃ জানা হইবে।

প্রাচীন হিন্দুদের মতো গ্রীকদের নাট্যহর্ম্য ধর্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আনুমানিক খৃষ্ট জন্মিবার ৬।৭ শত বৎসর পূর্বে ধর্ম-সম্বন্ধীয় গুহ্য উৎসবাদি (Mystic ceremonials) হইতে ইলিউসিনিয়ান্ মিস্টেরির (Eleusinian Mystery) জন্ম হয় এবং যে সকল দেবতার কার্যকলাপ অবলম্বনে ঐ মিস্টেরি গঠিত হইয়াছিল, তাহাই আবার উক্ত দেবোদ্দিষ্ট উৎসবাদিতে স্বসম্প্রদায়ের পুরোহিতগণ দ্বারা অভিনীত হইত। এই ধর্ম-সম্পর্কিত অভিনয়াদি মিস্টিক ড্রামা (Mystic drama) নামে পরিচিত ছিল। উত্তরকালে ঐগুলি উৎকর্ষলাভ করিয়া মিস্টেরি বা মিরাকেল্ (Mystery or

* "Among the Indians, whose social institution and mental cultivation descend unquestionably from a remote antiquity, plays were known long before they could have experienced any foreign influence. It has lately been made known to Europe that they possess a rich dramatic literature etc, etc."

—Schlegel's "Dramatic literature"

Miracle) নাটকের সৃষ্টি করিয়াছিল। আমাদের মহাভারতের ন্যায় হোমার (Homer) লিখিত ইলিয়াড্ (Illiad) ও ওডিসিরূপ (Odyssy) মহাকাব্যেও নাটকের বীজ দেখা যায়। সেই হেতু এরিস্টটল্ (Aristotle) হোমারকে নাটকের স্রষ্টা নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে থেস্পিস্ই (Thespis) নাটকের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া প্রতীচ্যখণ্ডে নাটক সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারই থেস্পিসিয়ান্ আর্ট (Thespisian art) নামে অভিহিত হইয়াছে। ডোরিয়ান্‌দের (Dorians) সংগীত আইয়োনিয়ান্‌দের (Ionians) ডিথাইরাম্বের (Dithyrambs) সহিত সম্মিলিত হইয়া সমবেত সংগীতের (Choral Songs) সৃষ্টি করিয়াছিল; ঐ গীতগুলি বেকাসের (Bacchus) জন্মোৎসবে বা বিজয়োৎসবে গীত হইত এবং সেই সংগীতের সহিত উক্ত দেবের প্রীত্যর্থে ছাগ বলি দেওয়া হইত। তজ্জন্য ঐ গান ট্রাগাডিও (Tragadio) ছাগগীতি নামে অভিহিত ছিল। বর্তমানে ট্রাজেডি (Tragedy) বলিলে যে নাটকবিশেষ বুঝায়, এই ট্রাগাডিও শব্দ তাহার জনক। সমবেত সংগীতের সহিত বাক্য সংযোজিত হইয়া ক্রমশঃ কথোপকথন চলিতে লাগিল। এই জাতীয় গ্রীসীয় কোরাস্ অনেকটা সংস্কৃত নাটকের 'প্রবেশক' ও 'বিষ্কম্ভকের' মতো কার্য সম্পন্ন করিতে লাগিল। পূর্বোক্ত কথোপকথন একজন অভিনেতা দ্বারা সম্পন্ন হইত, তাহাতে প্রশ্নোত্তরের ব্যাঘাত ঘটিত, থেস্পিস্ তজ্জন্য দ্বিতীয় অভিনেতার প্রচলন করিলেন। পরে এস্‌কাইলাস্ (Aeschylus) নাটকে সংগীতের ভাগ কমাইয়া বক্তৃতার ভাগ বাড়াইয়া দিলেন এবং থেস্পিস্ প্রবর্তিত দ্বিতীয় অভিনেতার চলনও বজায় রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সফোক্লিস্ (Sophocles) অভিনেতার সংখ্যা বাড়াইয়া তিন করিয়াছিলেন। ইউরিপিডিস্ই (Euripides) প্রথমে গ্রীকনাটকে দার্শনিকতার অবতারণা করিলেন। আলেকজাণ্ডারের (Alexander) সময়ে গ্রীসীয় নাট্যপ্রভাব ইওরোপের সর্বত্র বিস্তৃতিলাভ করে এবং তাঁহার রাজত্বকালেই গ্রীক নাট্যকলা চরমোন্নতি প্রাপ্ত হয়।

অধুনাতন ইওরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে পূর্বোক্ত উৎসবাদিতে এবং সমবেত-সংগীতে নাটকের উপাদান থাকিলেও মহাকাব্য (Epic poems) ও খণ্ডকাব্য (Lyric poems) জন্মিবার পর হইতেই প্রকৃত নাটক প্রসূত হইয়াছিল। এমন কি, যে সময়ে পূর্বোক্ত দুই প্রকার কাব্য পৃথিবীর সাহিত্য-সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিল, ঠিক তাহার অব্যবহিত পরেই নাটক সাহিত্যের আকারে জনসমাজে পরিচিত হইয়াছিল। *

গ্রীকরাই পাশ্চাত্যের নাট্যগুরু। তাহাদের পথানুসরণ করিয়া প্রতীচ্যের অন্যান্য জাতিরা স্ব-স্ব নাট্যসম্পদ আরও সমৃদ্ধ করিয়াছিল।

ইংলণ্ডের নাট্যসাহিত্য

এখানে একটি কথা প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার। অনেকের ধারণা, ইংলণ্ড তাহার দৃশ্যকাব্যের জন্য অন্যের নিকট ঋণী নহে, এবং ঐ মত সমর্থনের জন্য তাঁহারা শেক্সপীয়রের নাটকাবলির উল্লেখ করিয়া বলেন যে,

* "As a matter of fact, the beginnings of dramatic composition are in the history of such literatures as are well-known to us, preceded by the earlier stages in the growth of the lyric and epic forms of poetry, or by one of these at all events, and it is in the continuation of both that the drama in its literary form takes its origin in those instances which lie open to our study."

—"Encyclopaedia Britannica," 11th. Edition.

শেক্সপীয়র প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করেন নাই, এমন কি বহু স্থানে প্রাচীন নাট্যরীতি উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এ কথা সত্য যে, শেক্সপীয়র গ্রীকদের নাটক লিখিবার রীতি গ্রহণ করেন নাই এবং ইহাও মানিতে হইবে যে, তাঁহার প্রদর্শিত পথই নাটক লিখিবার উৎকৃষ্ট পথ, কিন্তু তা' বলিয়া কি বলিতে হইবে যে, তিনি ইংলণ্ডদেশীয় নাটকের স্রষ্টা? শেক্সপীয়রের পূর্বে ইংলণ্ডে নাটকের চর্চা হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড যেমন তাহার ধর্মের জন্য গ্রীকদের শিষ্য রোমকদের নিকট ঋণী, সেইরূপ তাহার নাট্যকলা বিষয়ে তাহারা ঐ এক গুরুরই শিষ্য। শুধু তাহা নহে, শেক্সপীয়রের পূর্বে ইংলণ্ডে নাট্যকলা নিতান্ত অনুন্নত ছিল না। তাহার নিদর্শনস্বরূপ আমরা ইংলণ্ডের নাট্যেতিহাস পাঠ করিলে, লাইলি, কিড, গ্রীণ, মার্‌লো, পীল, এবং জন হে-উড প্রভৃতি কতকগুলি নাট্যকারের নাম পাইয়া থাকি। উপরি উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মার্‌লো বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন, তাহা হ্যাজ্‌লিট (Hazlette) লিখিত তাঁহার প্রশংসাবাদে দেখা যায়। হ্যাজ্‌লিট বলিয়াছেন:—"নাট্যকারদের তালিকার মধ্যে মার্লো উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া প্রায় শীর্ষদেশে বসিয়া আছেন। ইনি শেক্সপীয়রের কিছু পূর্বে প্রাদুর্ভূত ছিলেন এবং শেক্সপীয়র ও অপর নাট্যকার অপেক্ষা তাঁহার নাটকীয় চরিত্রে বৈশিষ্ট্য ছিল।" * সুতরাং ইংলণ্ড যতই কেন নাট্যগৌরবে গৌরবান্বিত হ'ক না, এবং যত বিভিন্ন পথে তাহার নাট্যগতি পবিচালিত থাকুক না, ঐ দেশীয় নাটকের উৎপত্তির মূলে যে সেই প্রাচীন সংগীতাদি ও গ্রীকদের অনুষ্ঠিত মিরাকেল বা মিস্‌টেরি প্লের প্রভাব বিদ্যমান ছিল, ইহা একরূপ নিঃসন্দেহ। কারণ, ইংরাজি দৃশ্যকাব্যের বিবিধ নামকরণের মধ্যে পূর্বোক্ত মন্তব্যের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে, পাদটীকায় নামগুলি দেওয়া হইল। † বাহুল্যভয়ে এইখানেই প্রতীচ্যদেশের নাট্যোৎপত্তির ইতিহাস শেষ করা গেল।

নাটকোৎপত্তির পূর্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা

অতীতে যতদূর দৃষ্টিনিক্ষেপ সম্ভবপর ততদূর পর্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের কিছু পূর্বে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা সাধারণের বোধগম্য হইবে বলিয়া সংস্কৃত পরিত্যাগপূর্বক দেশজ ভাষায় নিজেদের ধর্মমত—দোহা, ছড়া ও গীতিকার আকারে লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে চর্যাপদের সৃষ্টি হইল। তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষা। ‡ এ মন্তব্য প্রামাণিক ধরিলে বাঙ্গালা

* "Marlowe," says Hazlette, "is a man that stands high and almost first in the list of dramatic worthies. He was a little before Shakespear's time and has a marked character both from him and from the rest etc. etc."

—Hazlettes' "Characters of Shakespear's plays"

† "Mystery, Miracle, Morality, Interlude, Tragedy, Comedy, History, Pastoral, Melodrama, Farce, Barlesque, Pantomime, Opera, Burletta etc.

‡ "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বর্ধমান অধিবেশনে সাহিত্যশাখার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ।"

ভাষা যে, তখন বাঙ্গালীর কথিত ভাষা ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কালপ্রবাহে ভারতবর্ষ হইতে মাগধী, আবন্তিকী, প্রাচ্যা, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, বাহ্লীকা, দাক্ষিণাত্যা—এই সপ্তমূর্তিময়ী প্রাকৃত-ভাষা বিস্মৃতির অতল সাগরে অল্পে অল্পে ডুবিতেছিল, এবং পরিবর্তনশীল সংসারের অমোঘ নিয়মের বশে তাহাদের স্থান নানা গৌড়ীয় ভাষা দ্বারা * অধিকৃত হইতেছিল। সংস্কৃতের চর্চা তখন ক্রমশঃ কতিপয় পণ্ডিতমণ্ডলীর গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে লাগিল।

এই সময়ে "কর্পূর মঞ্জরী" নামে একখানি প্রাকৃতভাষায় লিখিত নাটকের নাম পাওয়া যায়। ইহা বৌদ্ধসংঘের দ্বারা গ্রাম্যলোকের মধ্যে অভিনীত হইত। এটি কবিতা ও সংগীতবহুল ছিল। বাঙ্গালা-দৃশ্যকাব্য এই গ্রন্থের উপজীব্য বলিয়া অন্য নাটক সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে যে সময়ে ভাষাগত পরিবর্তন এইরূপে আরম্ভ হইল, তাহার অত্যল্পকাল পরে অর্থাৎ ১২০২ খৃষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার প্রমুখ মুসলমানগণ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিল। নিরুপদ্রব বাঙ্গালী ধনপ্রাণ লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল, ভাষাচর্চার অবকাশ তাহার রহিল না। কয়েক শতাব্দীর পর আক্রমণকারীরা যখন এইদেশে বসবাস আরম্ভ করিয়া দিল, তখন অত্যাচারিতেরাও অত্যাচারীর অপরাধ ক্রমশঃ বিস্মৃত হইতে লাগিল। বঙ্গবাসীরা ধীরে ধীরে শান্তির সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া পুনরায় সাহিত্যসেবায় মনোযোগ করিল। বঙ্গভাষা যেন এই শুভমুহূর্তেরই অবসর খুঁজিতেছিল। আজ যে ভাষার কলনাদে সমগ্র বাঙ্গালাদেশ মুখরিত, যাহার অমৃতনিস্যন্দিনী বাণীর মোহিনীশক্তি বিদেশীয়দিগকেও মুগ্ধ করিয়াছে, সেই বঙ্গভাষার পুষ্টির ইতিহাসে হিন্দু ও মুসলমানে সম্মিলিত শক্তি যে কাজ করিয়াছিল, ভাষাতত্ত্ববিদের কাছে এ কথা অনবগত নাই। বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না, পৃথিবীর কোন ভাষার ইতিহাসে এরূপ অপূর্ব সমন্বয় ঘটে নাই। কোন্ বিজেতা বিজিতের ভাষা গ্রহণ করিয়াছে, এবং তাহার উন্নতির জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়াছে? বিজিতেরা সর্বতোভাবে বিজেতার অনুসরণ করে, বঙ্গদেশে কিন্তু তাহার বিপর্যয় ঘটিল। বিজেতা মুসলমানগণ যে, কেবল বঙ্গভূমিকে মাতৃ সম্বোধন করিল তাহা নহে, তাহারা তাহাদের পৈতৃকভাষা পরিত্যাগপূর্বক বঙ্গভাষাকেই মাতৃভাষায় বরণ করিয়া লইল, এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপ প্রাচীন সাহিত্যে আমরা কতিপয় মুসলমান কবির আনুকূল্য লাভ করিতে পারিয়াছিলাম। বিদ্যাপতির সময়ে নাসীর শাহ, সুলতান গিয়াসুদ্দীন, পরাগল খান্ এবং ছুটি খান্ প্রভৃতি মুসলমান উৎসাহদাতাদের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের পূর্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রাচীনতম মুসলমান কবিদের অন্যতম দৌলত কাজী ও আলাওল কবিও বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে আজ দীক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইলেও, তৎকালে বিজেতা মুসলমান সংখ্যায় নিতান্ত নগণ্য ছিল না। প্রতিহত স্রোতোবেগ যেমন বাধা অতিক্রম করিয়া অধিকতর বেগশালী হয়, আমাদের বঙ্গভাষাও সেইরূপ মুসলমান আক্রমণে প্রতিহত হইয়া পরে হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ-শক্তি দ্বারা অধিকতর বেগে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে লাগিল।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময়ে অর্থাৎ ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই অঘটন সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বিশ্বপ্রেমের পশরাটিকে হৃদিকন্দরোৎসাবিত ভক্তিমন্দাকিনীতে

* "হরন্‌লি সাহেবের মতে গৌড়ীয় ভাষা এই কয়েকটি—বাঙ্গালা, মারাঠা, হিন্দি, গুজ্‌রাতি, কাশ্মিরী, তামিল, তেলেগু, কেনারিস্—" দীনেশবাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"

অভিষিক্ত করিয়া জাতিধর্মনির্বিশেষে বঙ্গবাসীর দ্বারে-দ্বারে অযাচিতভাবে প্রেমভক্তি বিলাইয়াছিলেন। তাঁহার সে আকুল আহ্বানে হিন্দুর কথা দূরে থাক্, বিধর্মী মুসলমানেরাও আত্মবিস্মৃত হইয়া ভক্তি গদ্‌গদ্‌চিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে শুধু যে বাঙ্গালীর ধর্মজগতে বিপ্লব আসিয়াছিল তাহা নহে, তাহাদের সাহিত্যও সমধিক অলংকৃত ও সরস হইয়া উঠিয়াছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি দ্বারা পুষ্ট বঙ্গসাহিত্য-নদ প্রেমের বন্যায় টল্-টল্ চল্-চল্ করিত। পূর্বরাগ হইতে বিরহ পর্যন্ত প্রেমের বিভিন্ন অবস্থার প্রতিচ্ছবি তরঙ্গ-ভঙ্গে সে নদ-বক্ষে ক্রীড়া করিত। রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমমাধুরী বক্ষে ধারণ করিয়া কালিন্দীর মতো যখন আমাদের ভাষা-জননী বঙ্গের শ্যামল বক্ষে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন ভগীরথের ন্যায় চৈতন্যদেবই ভক্তিরূপা জহ্নুতনয়াকে আনিয়া তাঁহার সহিত মিলাইয়া দিলেন; নবদ্বীপেই সাহিত্য-প্রয়াগের সৃষ্টি হইল। চৈতন্যদেবের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা সেই যুক্তবেণীতে অবগাহন করিয়া প্রেমভক্তির নির্মাল্য শিরে ধারণপূর্বক নিজেরাও ধন্য হইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব-সাহিত্যকেও ধন্য করিলেন। নাটক উৎপত্তির পূর্বে বাঙ্গালা-সাহিত্য এবংবিধ প্রেম-ভক্তির বন্যায় প্লাবিত ছিল।

বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তির ইতিহাস

চৈতন্যদেবের সময়ে দৃশ্যকাব্যের অবস্থা

বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের পূর্বে দৃশ্যকাব্যের নাম বিরলপ্রচার ছিল। তিনি পার্ষদ সমভিব্যাহারে যখন "কৃষ্ণলীলা"র অভিনয় আরম্ভ করিলেন, তখন ভাবাভিব্যঞ্জক নাটকের অভাব পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ "কৃষ্ণলীলা" কোন নাটক—কি ভাবাভিনয়, তাহা আজও অজ্ঞাত রহিয়াছে। কাহারও মতে উহা জন-সাধারণের বোধগম্য ভাষায় কৃষ্ণলীলার অংশবিশেষের ভাবব্যঞ্জক অভিনয়। নাটকের অভাব পূরণার্থ গোবিন্দদাস কৃত 'সঙ্গীতমাধব', রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত' এ সময়ে রচিত হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ দীনেশবাবু তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে এই সময়কার এক নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ নিম্নলিখিতরূপে করিয়াছেন:—"রায় রামানন্দ উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মচারী ছিলেন, ইতি বিখ্যাত 'জগন্নাথবল্লভ' নাটক রচনা করেন। চৈতন্যদেব ইঁহার দর্শনেচ্ছায় নিজে বিদ্যানগরে গিয়াছিলেন।" পূর্ব বর্ণিত নাটকগুলি সংস্কৃতভাষার রচিত হইয়াছিল। পরে যদিও প্রেমদাসের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়', রূপগোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' প্রভৃতি নাটকগুলির বঙ্গানুবাদিত অবস্থায় অভিনীত হইবার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা পয়ারাদি-ছন্দে মূলের ব্যাখ্যানমাত্রে পর্যবসিত ছিল। ঐ গুলি 'শকুন্তলা'প্রমুখ প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের ন্যায় মনুষ্যচরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত-জনিত ঘটনা-পরম্পরায় বিভূষিত হয় নাই। এগুলি পূর্ববর্ণিত প্রেম-ভক্তি-প্রবাহে স্নাত, এবং চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ভক্তিমার্গেরই প্রাধান্য ঐগুলিতে অধিক লক্ষিত হইয়াছে।

এই সকল নাট্যাভিনয়ের রস সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞ ব্যক্তিরা উপভোগ করিতে পারিতেন না, তজ্জন্য বাঙ্গালা মৌলিক দৃশ্যকাব্যের অভাব বিশেষভাবে দেশবাসীর মধ্যে অনুভূত হইতে লাগিল।

মঙ্গলগান ও তাহার মধ্যে নাটকের বীজ

চৈতন্যদেবের কিছু পরবর্তীকালে মঙ্গলনামধেয় একপ্রকার গীতাবলি বাঙ্গালা-সাহিত্যে দেখা দিল। বাঙ্গালার অসংস্কৃতজ্ঞ জনসাধরণ সংস্কৃতজ্ঞ প্রতিবেশিবর্গের নাট্যাভিনয়ের অনুকরণে অনুপ্রাণিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের তদানীন্তন স্বল্প ক্ষেত্রের মধ্যে নাট্যশক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদিগকে অধিক বেগ পাইতে হইল না। কারণ ধর্মমঙ্গল হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে কৃষ্ণমঙ্গল, রামমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, মনসামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, প্রভৃতি যাবতীয় মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে তাহারা নাট্যবীজ দেখিতে পাইয়া সুর-তাল ও বাদ্য সংযোগে ঐ গুলির কোন-কোনটি পালাকারে গঠিত করিয়া গান করিতে লাগিল। তৎকাল-প্রচলিত গল্প ও পুরাণাদি অবলম্বন করিয়া কবিপ্রসূত পরিকল্পনা ও প্রতিভাবলে নূতনমূর্তিতে এই মঙ্গলপালাগুলি রচিত হইতেছিল। পৌরাণিকী আখ্যায়িকা ব্যতীত অন্যবিষয়ক মঙ্গলগানগুলির মধ্যে যদিও ভাষাগত আবর্জনা এবং ইতরজনোচিত ভাববাহুল্য অধিক থাকিত, তথাপি ইহাতে দেশের জন-সাধারণের সহানুভূতি ও তাহাদের নাট্যবৃত্তি চরিতার্থতার চেষ্টা চলিতে লাগিল।

এই পালাগুলি গাহিবার পদ্ধতি, কতকটা প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে গীত রামায়ণ ও চণ্ডীর গানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রধান গায়েন মাথায় তাজ, অঙ্গে লালবর্ণের চেলী পরিয়া, গলদেশে পুষ্পমালা দোলাইয়া, চামর ও ঘুমুর সহযোগে গানের ধুয়া ধরাইয়া দেয়, অবশিষ্ট গায়েনেরা মৃদঙ্গ ও মন্দিরার সহিত সেই গীতের প্রতিধ্বনি করে। এই গীত-পদ্ধতি গ্রীকদের র‍্যাপ্সোডিস্ট্ (Rhapsodists) সম্প্রদায়ের গীত-পদ্ধতির সহিত অনেকটা তুলনীয়। তাহারাও মঙ্গল-গায়েনদের মতো হোমার অথবা অন্য কোন গ্রীককবি-রচিত মহাকাব্য সাধারণের মনোজ্ঞ করিয়া বাদিত্র সংযোগে গান করিত।

বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তির মূলে সংগীতের প্রভাব

বঙ্গীয় দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তির মূলে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পৃথিবীর যাবতীয় জাতির মধ্যে সংগীতই নাটকোৎপত্তির আদিম কারণ। বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্য তাহারই পথানুসরণ করিয়াছে।

কথকতা ও তাহার ভিতর দৃশ্যকাব্যের স্তর

মঙ্গল পালাগুলির সমসাময়িক বা কিছু পূর্বে বঙ্গদেশে আর এক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়, ইহাও অল্প-বিস্তর দৃশ্যকাব্য রচনার সহায়তা করিয়াছে। এই অনুষ্ঠানের নাম কথকতা। কথকতার সৃষ্টি কবে এবং কোথায় হইয়াছিল, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে ইহা যে অতি প্রাচীনকালে বর্তমান ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, কৃত্তিবাস ও কাশীরাম তাঁহাদের রচিত রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক উপাদান কথকদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তবে প্রাচীনকালের কথকতা বর্তমানের প্রণালীর মতো নাট্যরসাত্মক ছিল না, নিম্নলিখিত ঘটনাতে তাহার উপলব্ধি হইয়াছে—"একদিন বৈকালে গঙ্গাধর শিরোমণি মহাশয় কোন একস্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। অন্য অন্য স্থানে তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য অধিক লোক

সমাগম হইত, কিন্তু ঐ স্থানে অধিক শ্রোতা আসিতেছে না দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন, নিকটে একস্থানে রামায়ণ-গান হইতেছে, সেইখানেই সকল লোক যাইতেছে। শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, আচ্ছা সকলকে বলিবে, কল্য হইতে আমার নিকট ভাগবত-গান শুনিতে পাইবে। তিনি যেমন সুপণ্ডিত, তেমনি সুগায়ক ও কবি ছিলেন। রাত্রিতে পরদিনের ব্যাখ্যার অংশকে তাঁহার স্বকপোল-উদ্ভাবিত কথকতার রীতিতে পরিণত করিয়া রাখিলেন। পরদিন বৈকালে নূতন রীতির কথকতা আরম্ভ করিলেন। চারিদিক হইতে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার স্বর-সংযোগ, বাক্যবিন্যাস, ব্যাখ্যা ও সংগীত পদাবলী শুনিয়া লোকে বিস্মিত ও মোহিত হইল। এইরূপে শিরোমণি মহাশয় প্রতিদিন ধ্রুবচরিত, প্রহ্লাদচরিত, দক্ষযজ্ঞ, বামনভিক্ষা, প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের অংশ সকল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ইহাই আধুনিক রীতির কথকতার প্রথম সৃষ্টি। ক্রমে রামায়ণ, মহাভারতের কথাগ্রন্থ বিরচিত হইল। গঙ্গাধর শিরোমণি কথকতাকে অনেক পল্লবিত ও উন্নত করিয়া গিয়াছেন। গোবরডাঙ্গার রামধন শিরোমণিও তাহাতে অনেক অঙ্গরাগ দিয়াছেন।" *

উপরিউক্ত ঘটনাতে প্রতিপন্ন হইল যে, গঙ্গাধর শিরোমণি প্রবর্তিত কথকতার প্রণালী অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। যদিও অতি প্রাচীনকালের কথকতার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নাই, তবে তাহা যে অনেকটা পুরাণাদির নীরস ব্যাখ্যায় পর্যবসিত হইত, অনুমানে তাহা ধরা গিয়াছে। মঙ্গলগান অপেক্ষা শিরোমণি মহাশয়ের কথকতা অধিক নাট্যভাবাপন্ন হইয়া দাঁড়াইল।

মঙ্গলগান ও কথকতার পার্থক্য

কথকতার রসাভিনয়ের সুযোগ অনেক থাকে। কথককে একই প্রসঙ্গে কখন বা পঞ্চমবর্ষীয় প্রহ্লাদ সাজিয়া হরিভক্তের অভিনয় করিতে হয়, কখনও বা বিষ্ণুদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর বৈরী-সাধনা দেখাইতে হয়, কখন বা কয়াধুর পুত্র-স্নেহের পবিত্র উৎস উৎসারিত করিতে হয়, কখন বা ষণ্ড-মার্কণ্ডের বৈতনিক অধ্যাপনার প্রতিচ্ছবি দেখাইতে হয়। এইরূপ পরস্পর-বিরোধী নানা রসাভিনয়ের অবসর ইহাতে থাকে। এই অভিনয়ে যিনি যত অধিক দক্ষ, তিনি ততোধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। মঙ্গল পালাগুলির মতো মাত্র ছড়া ও সংগীতে ইহার সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি সাধিত হয় না বলিয়া, কথককে রসাভিব্যঞ্জক কথোপকথনের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। কথক বেদীতে বসিয়া সরস বর্ণনা দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর কল্পনাকে নিজ বর্ণিত বিষয়ের অনুসারিণী করিয়া লয়েন; সেই জন্য শ্রোতারা নিজ নিজ আসনে বসিয়া থাকিয়াই দৃশ্যপট ব্যতিরেকে কথকের কল্পনার সঙ্গে কখন ভীষণ শ্বাপদসংকুল অরণ্যানী, কখনও বা ঐশ্বর্য পরিপূর্ণ রাজপ্রাসাদে পরিভ্রমণ করিতে পারেন।

কথকতার অনুকরণে মঙ্গল পালার সংস্কার

আধুনিক রীতির কথকতা প্রবর্তিত হইবার পর তাহার অনুকরণে পরবর্তী সাহিত্য সংস্কারকেরা সপ্তদশ শতাব্দীর মঙ্গল গানগুলিকে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করিবার নিমিত্ত পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনের মধ্যে সংগীত ও পদাবলির বাহুল্য কমাইয়া গদ্য প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত করিলেন। কিন্তু কি মঙ্গলগানে, কি কথকতায় 'ভাণ' প্রকৃতিক সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের মতো মঙ্গল গায়ক বা কথককে আকাশভাষণ

* রাজনারায়ণ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা।"

হইতে উক্তি-প্রত্যুক্তি পর্যন্ত সমুদয় ব্যাপারই একক সম্পাদন করিতে হইত, তাহাতে অনেক সময়ে পুরাণানভিজ্ঞ শ্রোতৃবর্গের কল্পনার ব্যত্যয়জনিত রসবোধের ব্যাঘাত ঘটিত।

যাত্রাভিনয়ের সৃষ্টি ও তাহাতে দৃশ্যকাব্যের কঙ্কালরূপ

ঐ অভাব দূরীকরণার্থ সামাজিকগণের চেষ্টা চলিয়াছিল, এবং সেই চেষ্টার ফল পরবর্তীকালের যাত্রাভিনয়ের জন্য রচিত পালার মধ্যে দেখা গিয়াছে। ঐ পালার নূতনত্ব এই—প্রধান গায়েন ব্যতীত পালার নায়ক-নায়িকারা আসরে নামিতে আরম্ভ করিল, এবং আপনাদের বক্তব্য গায়নরূপী সূত্রধারের মুখে না বলাইয়া নিজেরাই বলিতে আরম্ভ করিল। শ্রোতৃবৃন্দের কল্পনা তখন শৃঙ্খলার ভিতর ভ্রমণ করিতে পাইয়া রসবোধের ব্যাঘাত দেখিতে পাইল না। এই পালাগুলি পূর্ববর্ণিত মঙ্গলগান বা কথকতা অপেক্ষা অধিক নাট্যভাবাপন্ন হইয়া দৃশ্যকাব্য লিখিবার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর-লাভ করিতে লাগিল। মঙ্গলগান ও কথকতার মধ্যগত নাট্যবীজ যাত্রাভিনয়ের জন্য রচিত পালায় কিরূপে দৃশ্যকাব্যের কঙ্কালরূপ ধারণ করিল, এবং কিরূপেই বা এই কঙ্কালরূপ রক্তমাংস-মেদ বিজড়িত হইয়া পূর্ণাবয়ব পাইল, আমরা ক্রমশঃ তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

যাত্রাভিনয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

যাত্রাগানগুলির প্রারম্ভে 'গৌরচন্দ্রী' পাঠ হইত, তজ্জন্য অনেকের ধারণা মহাপ্রভু চৈতন্যের পরে যাত্রাগুলি বর্তমান আকারে দেখা দিয়াছিল, কিন্তু আমরা ঠিক সেকালের মঙ্গল গীতাভিনয় ভিন্ন অপর কোন যাত্রাভিনয়ের নামোল্লেখ পাই না। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে কতকগুলি যাত্রাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণযাত্রা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। "শ্রীকৃষ্ণযাত্রার সাধারণ নাম ছিল 'কালীয়দমন', কিন্তু এই যাত্রা নামের অর্থমাত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীলাই এই 'কালীয়দমন' যাত্রার অভিনীত হইত।" * আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে কেঁদেলী গ্রাম নিবাসী শিশুরাম অধিকারী প্রাচীন যাত্রার সংস্কার করিয়া নূতন যাত্রার প্রচলন করেন। † তাহার পর "বীরভূমনিবাসী পরমানন্দ অধিকারী শ্রীদাম-সুবল অধিকারীর 'অক্রূর সংবাদ' ও 'নিমাই সন্ন্যাস' গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে ইনি কুমারটুলির বিখ্যাত বনমালী সরকার ও মহারাজ নবকৃষ্ণের বাড়ীতে পালা গাহিয়া তাঁহাদের এরূপ মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন, এবং পরে কবিকে তাঁহারা অপরিমিত সংখ্যক মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। লোচন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী ও কাটোয়া নিবাসী পীতাম্বর অধিকারী ইহাদের পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণযাত্রার পর পাতাইহাটের প্রেমচাঁদ অধিকারী, আনন্দ অধিকারী, জয়চন্দ্র অধিকারী 'রামযাত্রায়' লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ফরাশডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভ 'চণ্ডীযাত্রা' ও বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশনিবাসী লাউসেন বড়াল 'মনসার ভাসান' পালা গাহিতেন" ‡ ইহার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে "কৃষ্ণকমল গোস্বামী 'নিমাই সন্ন্যাস' যাত্রা রচনা করেন ও তাহা অভিনয় করিয়া নবদ্বীপবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার 'স্বপ্নবিলাস' ঢাকায় রচিত

---

* দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"

† ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোর "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস"

‡ ভারতী, মাঘ, ১২৮৮ সাল।

হয়। এই স্বপ্নবিলাস-যাত্রাগানের একটি সংস্করণ যাহা পরবর্তী কালে গঙ্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং রাধানাথ চক্রবর্তী প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার একখানি বই কলিকাতা সাহিত্য-পরিষদ-পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে, তাহার আভাস এইরূপ:—প্রথমে মঙ্গলাচরণ গীত, রাগ বেহাগ—তাল ধ্রুপদ "বন্দে শ্রীগৌরচন্দ্র-চরণারবিন্দ-দ্বন্দ্ব। মকরন্দ গন্ধ-লুব্ধ-বৃন্দারক-বৃন্দবন্দ্য॥" ইত্যাদি। পালাটির সংক্ষিপ্তসার দেওয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া মথুরায় ধনুর্যজ্ঞে যাইলে, ব্রজধামে যশোদা ও শ্রীমতী রাধিকার যে স্বপ্নবিলাস ঘটিয়াছিল, তাহার কথা অনুপ্রাসবহুল পাঁচালী-ছন্দে গীত হইয়াছে। বিরহ-বেদনায় রাধিকার ও চন্দ্রাবলীর মূর্চ্ছা, কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে সংজ্ঞালাভ, শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপ দেখিয়া রাধাকৃষ্ণের মিলন কেন হইল, এ সকল বিষয় এই পালার বৈশিষ্ট্য। রাগ-রাগিনী-তাল-মানাদি যুক্ত গান, কথা ও পয়ারাদি শ্লোক ইহার বাহন। 'রাই উন্মাদিনী', 'বিচিত্র বিলাস', 'ভরত-মিলন', 'নন্দহরণ', 'সুবল সংবাদ' প্রভৃতি পালাও ইনি রচনা করিয়াছিলেন। * 'রাই উন্মাদিনী'তে রাধিকার দিব্যোন্মাদ-ভাব চিত্রিত হইয়াছিল, ইহার রচনামাধুর্য ও কবিত্ব গোস্বামী মহাশয়কে অমর করিয়া রাখিবে। "তখনকার শ্রেষ্ঠ যাত্রাওয়ালা নিমাই দাস ও নিতাই দাসের যাত্রা এ বাটীতে হইত। এই যাত্রায় 'কেলুয়া-ভুলুয়া' সং ছেলেদের বিশেষ চিত্তাকর্ষক ছিল।" "৺গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বাবুবিলাস' নামক যাত্রা আমাদের বাড়ীতে একবার অভিনীত হইয়াছিল। আমরা তখন খুব ছোট, উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া দেখিয়াছিলাম মনে আছে।" †

যাত্রাভিনয়ের পারিপার্শ্বিক আমোদ-প্রমোদ ও তাহাদের অশ্লীলতা

যাত্রাভিনয় যখন বঙ্গবাসীকে আমোদ দিতেছিল, সেই সময়ে তাহার পারিপার্শ্বিক আমোদ-প্রমোদও যথেষ্ট ছিল। কবি ‡, পাঁচালী §, ফুল বা হাফ আখড়াই ¶, তর্জা ||, চড়কের সং প্রভৃতি নানাবিধ

* রামগতি ন্যায়রত্নের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব"

† বসন্ত চট্টোর "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি" পৃঃ ৩৪. ৩৬

‡ "কলিকাতায় কবির লড়াই সম্বন্ধে একটা প্রচলিত কথা আছে—'নিতে ভবানীর' লড়াই। নিতাই দাস বৈরাগী ও ভবানী বেণে এই দুই জনের কবির দল ছিল, উহাদের লড়াই কলিকাতায় হইলে, উহা শুনিবার জন্য দুই দিন দূরের পথের লোক আসিত, ইত্যাদি।" প্রমথ মল্লিকের 'কলিকাতার কথা' (২য় খণ্ড)। "হরু ঠাকুর, রাসু নৃসিংহ, রামবসু ও নীলু ঠাকুর কবিওয়ালা ছিলেন।" শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।" "হরুঠাকুর, রাসু নৃসিং, রামবসুর কবির গানে বিখ্যাত ছিল। নিতাই দাসের খুব খাতির ছিল। ভদ্রপাড়ার পাণ্ডিতেরা তাহাকে 'নিত্যানন্দ প্রভু' বলিয়া ডাকিতেন। [illegible] একজন কবিওয়ালা। আণ্টনি ফিরিঙ্গী নামক ফরাশডাঙ্গার একজন ফরাশী গরীটির বাগানে থাকিয়া কবির গান বাঁধিত, তাহার বিপক্ষদলের সাঙ্কেতিক নাম—'হ—মো—স,' (সম্ভবতঃ হরমোহন সেন)"। রাজনারায়ণ বসুর "সেকাল আর একাল"।

§ "মূল গায়েন পত্তে পৌরাণিক আখ্যায়িকা সুর-তান সহ বর্ণন করিত ও মধ্যে মধ্যে [illegible] ভাব সূচক এক একটি গান করিত। লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ণ নস্কর প্রসিদ্ধ পাঁচালীওয়ালা ছিলেন। দাশরথি রায় তাঁহাদের পরবর্তীকালের পাঁচালীগায়ক।"

শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত—"রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ"

"গুরু-দুঃখ আর এক পাঁচালীকার ছিলেন—"বঙ্গভাষার লেখক ১ম ভাগ" হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।

¶ "বাগবাজার নিবাসী স্বর্গীয় মোহন চাঁদ বসু হাফ-আখড়াইএর আবিষ্কারক"

অবিনাশ গাঙ্গুলীর 'গিরিশচন্দ্র' পৃঃ ৪২৬

আমোদ তখন বঙ্গের গ্রামে বা নগরে অনুষ্ঠিত হইত। ইহারা আকারে-প্রকারে পৃথক হইলেও মূলে সকলগুলি এক ছিল, কারণ তৎকাল প্রচলিত গীতিপ্রবণতা ও অশ্লীল ব্যঙ্গোক্তি-পরায়ণতা ইহাদের কোনটাই অতিক্রম করিতে পারে নাই। সময়ে-সময়ে অশ্লীলতার মাত্রা এতদূর বাড়িয়া যাইত যে, অবলম্বিত বিষয় ছাড়িয়া ব্যক্তিগতভাবে দলপতিদের উপর ঐ অশ্লীল আক্রমণগুলি আসিয়া পড়িত। এইরূপ ব্যঙ্গোক্তির মাত্রা যে দলে যত অধিক হইত, সেই দল তত বেশি পরিমাণে লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিত। এইভাবে আনন্দ-দানের ব্যপদেশে বঙ্গসাহিত্যে অশ্লীলতার প্রচার চলিতে লাগিল।

বঙ্গসাহিত্যের উপর অমর কবি ভারতচন্দ্রের প্রভাব কুরুচির সহায় হইয়াছিল

অমানুষী প্রতিভাসম্পন্ন ভারতচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যের যুগপ্রবর্তক হইয়াও কালধর্মকে জয় করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালীর অমূল্য সম্পদ তাঁহার গ্রন্থরাজির মধ্যে, তাঁহার কুহকিনী লেখনী প্রসূত "অন্নদামঙ্গলের" অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দর এই কুরুচি-প্রবণতার জন্য দায়ী। ভাষার প্রাঞ্জলতা, বিচিত্র ছন্দোবন্ধের ঝংকার ও রসের প্রগাঢ়তা থাকিলেও স্থানে-স্থানে এরূপ কুরুচি প্রসঙ্গ আছে যে, সেগুলি তাঁহার চতুর লিখনভঙ্গীপ্রভাবে বিচার-বুদ্ধিহীন তরলমতি পাঠকের চিত্ত অতি সহজেই প্রলুব্ধ করে। তাঁহার লেখনীর এমনি কুহক যে, যখন যে প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গই প্রস্ফুটিত কুসুম-স্তবকের মতো ফুটিয়া উঠিয়া পাঠকের মনোহরণ করিয়াছে। এই মোহে পড়িয়াই বোধ হয় কোন-কোন পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, প্রাকৃত জনের কাছে বিদ্যাসুন্দরের অনেক দ্ব্যর্থবোধক বিষয়ের পঞ্চবর্গ সংস্কৃত হইয়াছে।

কালধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে যাইলে প্রভূত নৈতিক বলের প্রয়োজন। ভারতচন্দ্রের সময়ে বাঙ্গালীর নৈতিকজীবন অবসাদগ্রস্ত ছিল, তাহা না হইলে ভারতচন্দ্র স্নানার্থিনী কুল-কামিনীর মুখে সুন্দরকে দেখিয়া :—

"দেখিয়া সুন্দর রূপ মনোহর
স্মরে জর জর যত রমণী।
কবরী ভূষণ কাঁচলী কষণ
কটির বসন খসে অমনি॥
* * *
আহা মরে যাই লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে।

*১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণনদীর তীরবর্তী ভাটকলাগাছি গ্রামে প্রথম রথযাত্রার দিনে দুই দল মিলিয়া সংগীত সংগ্রাম আরম্ভ করেন। প্রথম দলে হরিদাস ঠাকুর মূলগায়ক, স্বরূপদাস ও সনাতনদাস গায়ক হন। দ্বিতীয় দলে নিত্যানন্দ কর্তা মূল গায়ক, গোবিন্দকর্তা ও মাধবকর্তা ধারক থাকেন। এই ছয়জনই পণ্ডিত-চক্রবর্তী ভট্ট বিষ্ণুরাম বাগ্‌চীর ছাত্র ও শিষ্য। এই সংগীত-সংগ্রামের নাম আখড়াই সংগীত, পরে কবির লড়াই, মুসলমান কবিরা এর্তজার লড়াই শুরু করে। পরে সংস্কৃত হইয়া পেশাদারী কবিরা 'দাঁড়া কবি' নামে খ্যাত হইল। ফুল-আখড়াই সংগীতসংগ্রামের মাঝে খেঁউড় গান ঢুকাইয়া হাফ-আখড়াই সৃষ্টি হইল।"

"হাফ আখড়াই সংগীত-সংগ্রামের ইতিহাস"—গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য বিরচিত। ১৩২৬ সালের ৩০শে ভাদ্র ও ১৩৩২ সালের ভাদ্রমাসে প্রকাশিত।

যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া সাগর পারে ॥

* * *

ঘরে গিয়া আর দেখিব কি ছার
মিছার সংসার ভাতার জরা।
সতিনী বাঘিনী শাশুড়ী রাগিনী
ননদী নাগিনী বিষের ভরা ॥

* * *

রতি মহোৎসবে এ কর পল্লবে
কুচঘটে যবে শোভিত হবে।
কেমন করিয়া ধৈরয ধরিয়া
গুমানে মরিয়া গুমান রবে ॥"

প্রভৃতি ক[illegible] [illegible]র এমন করিয়া প্রকাশ্যভাবে বলাইতে পারিতেন না। তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী লেখক এ[illegible] [illegible]র প্রশ্রয় দিয়াছেন বলিয়াই তো তাঁহার পরবর্তী অষ্টাদশ শতক ও ঊনবিংশ শতকে[illegible] [illegible]দের আদিরসাশ্রিত সাহিত্যে অনেক অনর্থপাত ঘটিয়াছিল। এমন কি, অতি অশ্লীল[illegible] ভা[illegible] যে বিষয় তিনি প্রচ্ছন্ন রাখিবার প্রয়াস করিয়াছেন, সেই প্রচ্ছন্নাংশও তাঁহার পরবর্তী অনুকরণকারীরা সাহসের সহিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সে সবের সাহিত্যে এবং [illegible] [illegible], পাঁচালী প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদে অনেক আবর্জ্জনা জমিয়াছিল, যাহা পরবর্ত্তি-কালে সা[illegible]-সংস্কারকদিগকে দূর করিতে বহু বেগ পাইতে হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার কৈফিয়ৎ

যা[illegible] এক কারণে এই অশ্লীলতার প্রশ্রয় সাহিত্যে আসিয়াছিল, যাহার সুযোগ ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বকা[illegible] সাহিত্যে বড় একটা দেখা যাইত না। ভারতচন্দ্রই প্রথমে সামাজিক ব্যাপার লইয়া [illegible] সৃষ্টি করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যে সকল কাব্যকার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, পুরাণ [illegible] [illegible] প্রচলিত কিংবদন্তী তাঁহাদের উপজীব্য ছিল। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে মুকুন্দরাম এবং [illegible] তাঁহাদের কাব্যে সামাজিক প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা খাঁটি সামাজিক নহে। পৌরাণিক ও সামাজিকের অদ্ভুত-সংমিশ্রণে ঐ সকল কবির গল্পাংশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের বর্ণিত পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়াকলাপের পরিণতি ঐ আশ্রিত বিষয়ের প্রদর্শি[illegible] পর্য্যবসিত হইবে বলিয়া ঐ চরিত্রগুলি বিধি-নিষেধের অতীত ছিল। বিদ্যাসুন্দরের পাত্র-পাত্রী বা অন্যান্য চরিত্র প্রাকৃত জন, তাহারা আমাদের মতই সামাজিক, সে জন্য সমাজ-সম্মত বিধি-নিষেধের মধ্যে না রাখিলে চলিবে কেন? যদিই বা চরিত্রহীনা সমাজবিদ্রোহী কোন নারীচরিত্র দেখাইবার জন্য ঐরূপ কোন কুলমহিলার আমদানী কবি করিয়া থাকেন, তবে তাহার সহিত বাকি কাব্যাংশের আর কোন সম্পর্ক রাখেন নাই কেন? ইহাতে মনে হয় ভারতচন্দ্র কালধর্ম্মের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। তিনি যদি বিবাহিতা ভদ্র কুলকামিনীর মুখে না বলাইয়া মালিনীর মুখে ঐ

কথাগুলি বলাইতেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিত না,—কারণ সে নষ্টচরিত্রা। সমাজের নৈতিক বলের ক্ষতিকর কার্যে কবিরও হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই, যদি তিনি ঐ কার্যের অনুরূপ পরিণতি তাঁহার কাব্যে না দেখাইতে পারেন।

সামাজিক রীতি-নীতি কালের সঙ্গে বদ্‌লাইয়া যায় সত্য, তবু সমাজের এমন কতকগুলি চিরন্তন নীতি থাকে, যাহা অপরিবর্তনীয়। পতি-পত্নীর একনিষ্ঠা তাহাদের মধ্যে একটি। পৃথিবীর সবজাতি এ নিষ্ঠা স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

যাত্রাভিনয়ে বিষয়-বৈচিত্র্যের চেষ্টা ও ভারতচন্দ্রের সে সম্বন্ধে উদ্যম

জয়দেব হইতে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত প্রায় চারিশত বর্ষকাল সমুদয় প্রাচীন পদ-কর্তাই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকেই আপনাদের উপজীব্য করিয়াছিলেন। সুতরাং জন-সাধারণ বিষয়-বৈচিত্র্যের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি-সম্পন্ন ভারতচন্দ্রের নিকট এ চাঞ্চল্য অলক্ষিত রহিল না। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী শুনিতে অভ্যস্ত কর্ণে হঠাৎ অন্য গান ভাল শুনাইবে না বলিয়া, বিদ্যাসুন্দরের প্রেম-গাথা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে প্রভেদ এই—বৃন্দাবনের প্রেম কামগন্ধবর্জিত, আর বর্ধমানের প্রেম কাম দ্বারা পুষ্ট ছিল, সুতরাং প্রাকৃত জন যে সহজেই আকৃষ্ট হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি! কেহ-কেহ বিদ্যাসুন্দরকে উদ্দেশ্যাত্মক কাব্য বলেন, এবং বর্তমানের মাপকাঠি দিয়া তাহার অশ্লীলতার বিচার করিলে কবির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হইবে—এরূপ মন্তব্য করেন। কিন্তু ইহা উদ্দেশ্যাত্মক হইলেও কাব্য-সৌন্দর্যের প্রাচুর্য হেতু ইহাকে ঠিক সাময়িক সাহিত্য-হিসাবে ধরিলে চলিবে না। সাময়িক সাহিত্যের লক্ষ্য উদ্দেশ্য-সিদ্ধি এবং তাহাতেই তাহার পরিসমাপ্তি। বিদ্যাসুন্দরে উদ্দেশ্যের পূরণ হইয়া থাকিলেও, ইহার কাব্যমাধুর্য ও ছন্দোবৈচিত্র্য ইহাকে বিশ্ব-সাহিত্যের আসনে বসাইয়াছে। উত্তর পুরুষ যাহার বিচার করিবে, তাহা সংযত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তৎকালীন যাত্রাভিনয়ের জন্য রচিত পালাগুলি প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের মতো বস্তু-তন্ত্রে পূর্ণ নহে দেখিয়া, সংস্কৃতজ্ঞ ভারতচন্দ্র মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত মহিষাসুর-বধ বিষয় লইয়া 'চণ্ডীনাটক' নামে একখানি নাটক লিখিবার প্রয়াস করেন, কিন্তু আরম্ভ করিয়া তিনি নিজেই ভবনাট্যলীলা শেষ করিলেন। নাটকের প্রারম্ভে সংস্কৃত, হিন্দি, মৈথিলী, বাঙ্গালা প্রভৃতি নানা ভাষার এক জগা-খিচুড়ি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যাহা হোক, অসম্পূর্ণ বস্তুর উপর মত-প্রকাশ সমীচীন নহে।*

বিদ্যাসুন্দর-গীতাভিনয়ের পালাগ্রন্থ ও তাহার অভিনয়, কিন্তু তৎপূর্বে কতিপয় বিক্ষিপ্ত যাত্রাভিনয়

অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতচন্দ্রের দেহাবসানের কিছুকাল পরে তাঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দর-কাব্য গীতাভিনয়ের উপযোগী করিয়া বঙ্গদেশের বহুস্থানে অভিনীত হইয়াছিল। সেই প্রাচীন পালা-রচয়িতার নাম আজও অজ্ঞাত রহিয়াছে। পরবর্তী কালের যে সকল বিদ্যাসুন্দর-পালার নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রায় সকলগুলি উনবিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে অভিনীত হইয়াছিল। এই সকল বিদ্যাসুন্দর-গীতাভিনয়ের পূর্বে কলিকাতা বা তন্নিকটবর্তী স্থানে যে সকল

* গঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত "বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা"

অভিনয় হইত, তাহা পূর্ববর্ণিত ও পরে লিখিত যাত্রাভিনয়। রামমোহন সম্পাদিত 'সংবাদ-কৌমুদী' পত্রিকায় ১৮২১ খৃষ্টাব্দে 'কলিরাজার যাত্রা' নামক একখানি নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ আছে। * পরে ব্রজেন্দ্র বাবু প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহার পাত্র-পাত্রীগণ এইরূপ :—"কলিরাজ, মন্ত্রী, গুরু, চট্টগ্রাম হইতে আগত কোন ইংরাজ (নিজস্ত্রী ও ভৃত্যসহ) রঙ্গাসরে অবতীর্ণ হইয়া নাচ, গান ও সরস কথাবার্তা দ্বারা দর্শকের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন।" ইহা না যাত্রা,—না কোনরূপ দৃশ্যকাব্য। 'বিল্বমঙ্গল' নামে আর একখানি যাত্রাগানের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার অভিনয় বা সত্তার কোন পরিচয় নাই। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুরে 'নলদময়ন্তী যাত্রা' ও 'কামরূপ যাত্রা' অভিনীত হইবার সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু পালা-গ্রন্থ না থাকায় ইহাদের নাট্যমূল্য নির্ণীত হইল না। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ভূ-কৈলাসে 'রাজা বিক্রমাদিত্য' পালা অভিনীত হইয়াছিল, কিন্তু গ্রন্থ না থাকায় তাহারও নাট্যমূল্য নির্ণীত হইবার উপায় রহিল না। †

উপরিলিখিত নাট্যাভিনয়ের সংবাদে বুঝা যায় যে, যাত্রাভিনয়গুলি ক্রমশঃ উন্নততর হইতেছিল এবং প্রয়োজনমতো অভিনেতার সংখ্যাও তাহাতে বাড়িতেছিল। সম-সাময়িক পত্রিকায় আরও কতকগুলি যাত্রাভিনয়ের নামোল্লেখ আছে। 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী' নামে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'হাস্যার্ণব' নামে একটি প্রহসনও ঐ সময়ে ছিল। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে দুই অঙ্কে সমাপ্ত 'কৌতুক সর্বস্ব' নামে একটি নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা গোপীনাথ চক্রবর্তিকৃত সংস্কৃত 'কৌতুক সর্বস্ব' অবলম্বনে হরিনাভিনিবাসী রামচন্দ্র তর্কালংকার কর্তৃক রচিত। নাটকটির আখ্যানভাগ কলিবৎসল রাজার উপাখ্যান। ‡ গ্রন্থ না পাওয়ায় এগুলিরও নাট্যধর্মগত মূল্য নির্ধারিত হইল না।

এইবার বিদ্যাসুন্দর-গীতাভিনয়ের কথা বলা হইতেছে। "১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা শ্যামবাজারস্থ বাবু নবীনচন্দ্র বসু প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার বাড়ীতে কয়েকবার বিদ্যাসুন্দর নাটক অভিনয় করাইয়াছিলেন। আধুনিক রীতি-অনুসারে বিচার করিলে নবীনবাবুর বাটীর অভিনয় অবশ্যই সম্পূর্ণ নাটকোচিত হয় নাই। তাহাতে প্রত্যেক দৃশ্য-পরিবর্তনের সময়ে একজন অভিনেতা সেই দৃশ্যের সংশ্লিষ্ট বিষয় ভারতচন্দ্র হইতে আবৃত্তি করিয়া দর্শকদিগকে শুনাইতেন। প্রত্যেক দৃশ্য-পরিবর্তনের সঙ্গে দর্শকদিগকেও রঙ্গভূমিতে স্থান পরিবর্তন করিতে হইত। বকুলমূলে উপবিষ্ট সুন্দর বা মালিনীর গৃহ দেখিবার জন্য দর্শকদিগকে স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্থানে যাইতে হইত। তথায় তাঁহাদিগের জন্য আসন প্রস্তুত থাকিত। ইহাতে দর্শক ও অভিনেতা উভয়েরই অসুবিধা হইত। কিন্তু এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও, দৃশ্যপটের সমাবেশ §, অভিনেতৃগণের সঙ্গে অভিনেত্রীর প্রবর্তন এবং নাটকোচিত বাক্যবিন্যাস ও ভাব-ভঙ্গী প্রভৃতির জন্য বিদ্যাসুন্দর অভিনয়কেই বঙ্গদেশের প্রথম নাটকাভিনয় বলা যাইতে পারে।

---

* Calcutta Review Vol XIII, 1850

† শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

‡ • • • •

§ দৃশ্যপটের অভাব ছিল বলিয়াই স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্থানে যাইয়া অভিনয় দর্শন করিতে হইত, এ কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তবে দৃশ্যপটের সমাবেশ কোথা হইতে আসিল? সম্ভবতঃ দুই এক বর্ষ অভিনয়ের পর শেষ অভিনয়-গুলির সময়ে দৃশ্যপট আসিয়া থাকিবে। ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় তারিখ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর বলিয়াছেন, তাহার ২ বৎসর পূর্বে এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইতি—গ্রন্থকার।

নবীনবাবুর বাটীর অভিনয়কার্য দুই তিন বৎসর চলিয়াছিল এবং নবীনবাবু তজ্জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম ও অপর্যাপ্ত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, এ দেশে সে সময়ে যাহা কিছু সম্ভবপর, নবীনবাবু তাঁহার কোন বিষয়েই ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার বাটীর বিদ্যাসুন্দর-অভিনয় হইতেই বঙ্গীয় দর্শকগণ প্রথমে নাটকাভিনয়ের আস্বাদ পাইয়াছিলেন।" *

কলিকাতার বহুবাজার নিবাসী রাধামোহন সরকার নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ীতে নবীনবাবুর বাড়ীর অভিনয়ের প্রায় সমসাময়িক আর একটি বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার দল স্থাপিত হয় এবং রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীতে ইহার প্রথম আসর হইয়াছিল। এই দলই পরে গোপাল উড়ের দলে পরিণত হইয়াছিল। ফরাশডাঙ্গায় ভৈরব হালদারের নেতৃত্বে বিদ্যাসুন্দর নাটকের আরও একটি দল গঠিত হয়। এ সম্বন্ধে একটু মতভেদ আছে, এখানে তাহাও উদ্ধৃত হইল:—"রাধামোহন সরকারের বহুবাজারে শখের যাত্রা ছিল। গোপাল উড়ে সেইখানে বিদ্যাসুন্দরের মালিনী সাজিয়া সকলের এরূপ মনস্তুষ্টি করে যে, উহার মাসিক মাহিনা দশ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা করা হয়। রাধামোহনের মৃত্যুর পরে ভৈরব হালদার নামক জনৈক ব্রাহ্মণের দ্বারা বাঙ্গালায় গান ও স্বরযোজনা করিয়া গোপাল উড়ে তাহার দল করে। লোকনাথ দাসের (লোকা ধোপার) যাত্রার দলও বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ ছিল। প্রবাদ আছে, লোকনাথের কণ্ঠস্বর এতই মধুর ছিল যে, স্বয়ং ভগবতী ছল করিয়া বৃদ্ধার বেশে তাহার গান শুনিতে আসেন; কিন্তু সে দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া গান না শুনাইলে, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়। শেষে স্বপ্নে ঐ ব্যাপার জানিতে পারিয়া দেবীর স্তব-স্তুতি ও দেবীর মন্দিরে গান গাহিয়া পুনরায় লোকনাথের পূর্ববৎ কণ্ঠস্বর স্ফূর্ত হয়।" †

"মতান্তরে প্রসিদ্ধ আছে, কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী ধনাঢ্য বীর নৃসিংহ মল্লিক মহাশয় বিদ্যাসুন্দরের পালা সৃষ্টি করেন। ইহাতে তাঁহার দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। নানা দেশের ওস্তাদ আসিয়া এই গানে সুর দিয়াছিলেন, নানা স্থানের কবি আসিয়া গান বাঁধিয়াছিলেন। গোপাল উড়ে বীর নৃসিংহবাবুর ভৃত্য ছিল। বীর নৃসিংহবাবু গোপাল উড়েকে এই পালা দান করিয়া যান।"‡ এই সকল কিংবদন্তীর কোন্‌টা সত্য, তাহা আজ বলা কঠিন। যাহা হোক ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেত্তার জন্য তথ্য সংগৃহীত রহিল।"

"১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রেল তারিখে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাড়ীতে 'নন্দবিদায়' যাত্রার তৃতীয় অভিনয় হইয়াছিল, ইহা নূতন ধরণের যাত্রা, কিন্তু নামমাত্র রহিয়া গেল, পালাগ্রন্থ পাওয়া যায় নাই।" ¶

বাঙ্গালীর রুচি পরিবর্ত্তন

বিদ্যাসুন্দরপ্রমুখ যাত্রাভিনয়গুলি বাঙ্গালীকে অধিক দিন আনন্দ দিতে পারে নাই, তাহার কারণ রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের পর বাঙ্গালীর রুচি-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল এবং সেই পরিবর্ত্তিত রুচির অনুকূলে ইওরোপীয়দের নাটকাভিনয় দেখা গিয়াছিল।

---

* শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত'।
† প্রমথ মল্লিকের 'কলিকাতার কথা' (২য় খণ্ড)
‡ বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'গোপাল উড়ের টপ্পাগানের ভূমিকা'।
¶ ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' হইতে সংগৃহীত।

ইংরাজী নাটকের অভিনয় এবং তত্তুলনায় বাঙ্গালা নাটকের অভাববোধ

"১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর তারিখে হেরাসিম্ লেবেডেফ নামীয় জনৈক রাশিয়াবাসী 'ডিস্‌গাইস্' (ছদ্মবেশ) নামক এক ইংরাজী নাটক বাঙ্গালায় অনুবাদ করাইয়া বাঙ্গালী নট-নটীদ্বারা অভিনয় করাইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে ইওরোপীয় চেষ্টায় ইহাই প্রথম বাঙ্গালা অভিনয়।" £ উক্ত অভিনয়ের সমর্থনে এই কথাগুলি পাওয়া যায়,—"লেবেডেফের নিউ থিয়েটারে বিলাতী বাদ্যযন্ত্রের সহিত যে সকল বাদ্যযন্ত্র বাঙ্গালীদের প্রিয়, তাহাও ব্যবহৃত হইবে। বাঙ্গালীর সর্বজনপ্রিয় কবি ভারতচন্দ্র রায়ের একটি শব্দ-ঝংকারপূর্ণ কবিতার সংগীতাবৃত্তি হইবে।" ℣ "১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে নারিকেলডাঙ্গায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগানে হিন্দুথিয়েটার কর্তৃক 'জুলিয়াস্ শিজর' প্রথম অভিনীত হয়।" ৭ "কলিকাতায় ইংরাজদিগের দ্বারা প্রথমাবস্থায় যতগুলি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে সাঁ-সুছি (Sans-Soci) নাট্যশালার নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস্ হিমান উইলসন্, ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক ষ্টকুলার (Stocquler), বোর্ডের জুনিয়ার সেক্রেটারী এইচ্-এম্-পার্কার (H. M. Parker), বোর্ডের মেম্বর টরেন্স (Torrens) এবং ব্যারিস্টার হিউম্ (Hume) প্রভৃতি সে সময়কার অনেক সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ইংরাজ এই নাট্যশালায় অভিনয় করিতেন।" ∫ "সাঁ-সুছি-ইংরাজী-নাট্যশালার অভিনয়ে একজন বাঙ্গালী অভিনেতা বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্য ওথেলোর ভূমিকায় অভিনয় করেন, উহার তারিখ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট। শেক্সপীয়রের নাটকাবলি ডেভিড্ হেয়ার একাডমি, ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার, মেট্রোপলিটন একাডমি এবং প্যারীমোহন বাবুর জোড়াসাঁকো নাট্যশালার একমাত্র উপজীব্য ছিল।":: ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ কৃতবিদ্য ব্যক্তির উদ্‌যোগে উইল্‌সন সাহেব কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত সংস্কৃত 'উত্তররাম চরিতের' অভিনয় § হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দুকলেজের রিচার্ডসন্ ও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর হার্মান্ জেফ্রয়েরের প্ররোচনায় (এক বিদ্যাসুন্দর ও কতিপয় যাত্রাভিনয় ছাড়া) ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অন্যান্য সমুদয় অভিনয় ছাত্রবৃন্দের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে, হয় ইংরাজীতে, না হয় ইংরাজী হইতে অনূদিত বাঙ্গালা ভাষায় সম্পন্ন হইয়াছিল। ঐ সকল অভিনয় দেখিয়া তখনকার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্রকৃত নাটকের অভাববোধ জন্মিয়াছিল, কিন্তু বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে তাঁহাদের রুচির সমর্থক একখানি নাটকও পাওয়া যাইল না।

'রমণী নাটক' নামক একখানি গ্রন্থ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৭।৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন। এখানির নাটক আখ্যা থাকিলেও এখানি দৃশ্যকাব্য নহে। সন্তোষ নগরাধিপ সুরেন্দ্রের কন্যা রমণীর বিবাহ ও ব্যভিচার ইহার গল্পাংশ। পয়ার-লাচাড়ী প্রভৃতি বিবিধ ছন্দে ও গদ্যে এই কাব্যখানি বিরচিত হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষের বিহারঘটিত অশ্লীলতায় ইহা পূর্ণ। দৃশ্যকাব্যের পর্যায়ভুক্ত

£ ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোর "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" হইতে সংগৃহীত।

℣ হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কলিকাতা সেকালের ও একালের ইতিহাস' পৃঃ ৭১০।

৭ ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস'।

∫ যোগীন্দ্র বসু প্রণীত 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত'।

:: ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস'।

§ "Calcutta Monthly Journal."

না থাকায় আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তারাচাঁদ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটক পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে এবং মধ্যে-মধ্যে গদ্যে রচিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু ইহার লিখন-প্রণালী ও ভাষা শ্রব্য কাব্যেরই উপযুক্ত। কোন দৃশ্য পরিবর্তন করিয়া নূতন দৃশ্য সংযোজনার পূর্বে কতকগুলি কার্য পাত্র-পাত্রীর দ্বারা না করাইয়া নাট্যকার স্বয়ং সেগুলি করিয়াছেন। ইহাতে পাঠকালীন অসুবিধা না হইলেও অভিনয়কালে ঘটনা-পরম্পরার সামঞ্জস্য থাকে না, এবং তাহাতে দর্শকবৃন্দের বুঝিবার ব্যাঘাত ঘটে। ভাগ্যক্রমে ভদ্রার্জুন অভিনীত হয় নাই। অভিনীত হইলে এ অভাব বিশেষ ভাবেই অনুভূত হইত। মহাভারতের আদিপর্ব হইতে অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণের ব্যাপার ইহার গল্পাংশ। দেশের প্রাচীন প্রথার সহিত পাশ্চাত্যের মিলন ঘটাইতে যাইয়া নাট্যকার ইহার মধ্যে নান্দী, সূত্রধার, প্রস্তাবনা রাখেন নাই বটে, তবে 'আভাস' নাম দিয়া প্রথমেই পয়ার ছন্দে পূর্বরঙ্গের (prologue) কার্য করিয়া লইয়াছেন। ঘটনার যথাযথ বর্ণনা (narration) ইহাতে দেওয়া আছে, সংঘাতরূপ নাটকীয় কৌশল নাই। বহু অবান্তর প্রসংগে এই দৃশ্যকাব্যটির মূল ক্রিয়া ব্যাহত হইয়াছে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে 'কীর্তিবিলাস নাটক' নামে একখানি নাট্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার আখ্যাপত্রে নাটককারের নাম ছিল না, তবে ইহা যে যোগেন্দ্র নাথ গুপ্তের রচনা তাহা একরূপ স্বীকৃত হইয়াছে, এখানি অভিনীত হইবার সংবাদ নাই। ইহার নাটকীয় সংজ্ঞাগুলি আধুনিক নাট্যসাহিত্যে অপ্রচলিত, যথা :—"অভিনাট্য ব্যক্তিগণ, কামিনীগণ, প্রথমাঙ্ক প্রথমাভিনয়, দ্বিতীয়াঙ্ক দ্বিতীয়াভিনয় ইত্যাদি।" সংস্কৃতের অনুকরণে প্রথমে নান্দী, নান্দ্যন্তে সূত্রধার ইত্যাদির সমাবেশ নাট্যকার রাখিয়াছেন। নাটকের ভাষা গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত কিন্তু প্রাচীনত্বের গন্ধে ও আড়ষ্টতায় উহা গতিশীল হয় নাই। এখানিকে বিষাদান্ত করিবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থের ভূমিকায় নাট্যকার বহু কৈফিয়ৎ দিয়াছেন এবং বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে নূতনত্ব আনিবার জন্য প্রথমে হেমপুরাধিপ চন্দ্রকান্তের, তৎপরে যুবরাজ-বনিতা সৌদামিনীর ও পরিশেষে কীর্তিবিলাসের মৃত্যু সংঘটিত করাইয়া বিষাদান্ত ঘটনার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় নাটকখানি নাটকীয় সংঘাতবিহীন হওয়ায় অপাংক্তেয় হইয়া রহিয়াছে। নাটককার নাটকের মধ্যে মন্ত্রগুপ্তি দিয়াছেন, কিন্তু সংঘাত তুলিতে পারেন নাই। এ দোষটি তিনি যে যুগের নাট্যকার সে যুগধর্মানুসারে দোষাবহ নহে, কারণ মৌলিক বাঙ্গালা নাটক তখন সবেমাত্র প্রসূত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার অন্তর্গত একখানি গান এইরূপঃ—"সই, রাখিব প্রাণ কেমনে। দেশান্তরে থাকে কান্ত সদা ভাবি মনে মনে। নিষ্ঠুর নির্দয় কান্ত আসিবেন না একান্ত, হইল মোর প্রাণান্ত, যাতনা সহে না প্রাণে॥" এ গান খানির মধ্যে তৎকালোচিত কবি-পাঁচালীর গন্ধ পাওয়া যায়।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' এবং আরও কয়েক বৎসর পরে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'চারুমুখ চিত্তহরা' নামে তাঁহার আর একখানি নাটক শেক্সপীয়রের যথাক্রমে 'মার্চেন্ট অফ্ ভিনিস্' ও 'রোমিও জুলিয়েটের' ছায়া লইয়া রচিত হইয়াছিল। এগুলি কবিতাবহুল, কাব্যাংশই তাহাতে স্ফূর্ত, নাটকাংশ প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছে। হরচন্দ্র ঘোষের সর্বশেষ নাটক 'রজতগিরি-নন্দিনী' ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। নাট্যকার বৈদেশিক নাটকের প্রভাবে এই নাটকের মধ্যে মন্ত্রশক্তি, দ্রব্যশক্তি ও অমানুষিক ক্রিয়ার আশ্রয় লইয়াছেন। অতিমাত্র সুন্দরী করিবার লোভে গ্রন্থের নায়িকা 'কণপ্রভাকে' পরীরাজ্যের কন্যা হইতে হইয়াছে। এখানি নামে নাটক, গ্রন্থমধ্যে কোন খানেই

সংঘাত স্পষ্ট হয় নাই। ঘাত উঠিলেই প্রতিঘাত করিবার শক্তি কোন নাট্যচরিত্রেরই নাই এরূপভাবে তাহারা গঠিত হইয়াছে। এ দৃশ্যকাব্যখানি পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। ইহার ভাষা কেতাবী গদ্য এবং উচ্ছ্বাসের স্থানে পদ্যের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। গানের সংখ্যা নিতান্ত কম এবং একটি ছাড়া সবগুলি নেপথ্যে গীত হইয়াছিল। এ তিনখানি নাটকের কোন খানিই অভিনীত হয় নাই।

"নন্দকুমার রায় রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত হইতে অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি তারিখে কলিকাতার তৎকালীন প্রসিদ্ধ ধনী খ্যাতনামা আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবু) বাড়ীতে অভিনীত হইয়াছিল। এ পালায় গান বাঁধিয়াছিলেন তদানীন্তন বিখ্যাত কবি কবিচন্দ্র।" * "গরিফার বৈদ্য নন্দকুমার রায় যেখানে সংস্কৃত শ্লোক আছে, বঙ্গানুবাদে সেই সেই স্থানে পয়ার বা ত্রিপদী দিয়াছেন। ** আমি তখন নাটকের কায়দা, কারচুপি কিছুই জানিতাম না। ** নন্দকুমারের শকুন্তলার অনুবাদ খুব সহজ না হইলেও সরস রচনা।" † "ঐ বৎসরের ১১ই এপ্রেল তারিখে মহাভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ীতে রামনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। এই ঘটনার আট মাস পরে উক্ত সিংহ-ভবনে সমধিক সমারোহের সহিত কালীপ্রসন্ন সিংহের নূতন অনুবাদিত 'বিক্রমোর্বশী' নাটক অভিনীত হইয়াছিল। নাট্যকার স্বয়ং তাহার একজন অভিনেতা ছিলেন। অভিনয় কার্য এরূপ নৈপুণ্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল যে, কলিকাতার নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, এমন কি ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী বীডন্ সাহেব (পরে স্যর সিসিল বীডন্) পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে অভিনয়-ক্রিয়ার প্রশংসা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonerjee) মহাশয় ইহাতে একজন অভিনেতা ছিলেন।" ‡ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে যথাক্রমে মণিমোহন সরকারের অনূদিত নাটক 'মহাশ্বেতা' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্বশী' নাটক অভিনীত হইয়াছিল। তারিখ ধরিয়া হিসাব করিলে ইহার পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য অভিনয় পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের অনূদিত শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী নাটিকা।' এই নাটিকাখানি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। দেশের জন-সাধারণ তৎকাল প্রচলিত যাত্রাভিনয়, হাফ, আখড়াই, পাঁচালি, তর্জা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের প্রতি এককালীন শ্রদ্ধা হারাইয়াছিল। তাহাদের সেই অশ্রদ্ধা উক্ত পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার 'রত্নাবলী' নাটিকার ভূমিকায় নিম্নলিখিত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন :—"সরস সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার নাটকসমূহের অতুল্য রসমাধুরী অবগত হইয়া প্রচলিত ঘৃণিত যাত্রাদিতে সকলেরই সমুচিত অশ্রদ্ধা হইয়া পড়িয়াছে। নির্মল সুধাকর বিনিঃসৃত সুধাধারার আস্বাদ পাইলে, কাঞ্জিকাতে কাহারও অভিরুচি হয় না।' মাইকেল মধুসূদন ইংরাজ-দর্শকের জন্য অনবদ্য ইংরাজীতে ইহার চারি অঙ্কই তর্জমা করিয়াছিলেন।

* বিপিন বিহারী গুপ্তের "পুরাতন প্রসঙ্গ"।

† হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থের পিতাপুত্র পরিচ্ছেদ" হইতে সংগৃহীত পৃঃ ৪১৪।

‡ যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত" (মধ্যে মধ্যে গ্রন্থকারের কথাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে)।

মৌলিক নাটক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের সাময়িক প্রতিষ্ঠা

এ যাবৎ সমুদয় অভিনয় ধনী ব্যক্তিদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে সম্পন্ন হইত। কোন স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অভিনয় উপযোগী দৃশ্য-পট ও সাজ-সজ্জা সেই-সেই দিবস ব্যাপী আমোদের জন্য সংগৃহীত হইত। ছাতুবাবুর বাড়ীতে শকুন্তলা অভিনয়ের পর মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পাইক পাড়ার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী নাট্যামোদী প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ভ্রাতৃদ্বয়কে এক স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক যত্নে ও অর্থব্যয়ে তাঁহাদেরই বেলগাছিয়া উদ্যানে এক অভিনব নাট্যশালা নির্মিত হইল। অভিজাত-সম্প্রদায়ের জন্য ঐ রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হইল, কিন্তু উক্ত নাট্যপিপাসুগণ অনূদিত নাটকসমূহকে জাতীয় নাটকের সম্মানজনক আসনে বসাইতে সংকুচিত হইলেন। অনুবাদ দ্বারা ভাষা লাভবতী হয় বটে, কিন্তু মৌলিক নাটকের অভাবে বাঙ্গালীর উদ্ভাবনী শক্তির দৈন্য প্রকাশ পাইয়া সাধারণের নিকট বাঙ্গালীকে লজ্জিত করিয়া তুলিল। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' এই রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হইয়া বাঙ্গালীর সেই লজ্জা দূর করিয়াছিল। মধুসূদনের কাল বিচার-সময়ে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে বলা হইবে।

নাট্যসাহিত্যে প্রাচীন প্রথার উচ্ছেদ

বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চকে প্রাচীন ও আধুনিক নাট্যরীতির সেতু-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। ইহারই এক প্রান্তে বহু শতাব্দীসঞ্চিত প্রাচীন রীত্যনুমোদিত সংস্কৃত নাটকের সমাধি-মন্দির। তর্করত্ন অনূদিত রত্নাবলী নাটিকার অভিনয় ঐ মন্দির হইতে নিঃসৃত নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ ক্ষীণালোক মাত্র। ঐ অভিনয়-রজনীর পর, যে অন্ধকার ঐ নাট্যপীঠে বিরাজ করিতেছিল তাহা দূর করিবার জন্য মাইকেলের বালার্ককিরণমণ্ডিতা উষাসিমন্তিনী 'শর্মিষ্ঠা' আধুনিক রীতির পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া সেতুর অন্য প্রান্ত দিয়া ঐ শূন্য-পীঠ অধিকার করিয়া লইল। প্রাচ্যভাবের সহিত প্রতীচ্যভাবের বিনিময় এই স্থানেই সংঘটিত হইল। এইরূপে বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্য জন্মলাভ করিলে পর উহার ব্যঙ্গ্যার্থ ও বাচ্যার্থগত উৎপত্তির ইতিহাস-কথা অনাবশ্যক বোধে এইখানেই শেষ করা গেল। অতঃপর প্রসিদ্ধ নাট্যকারদের কালবিভাগ করিয়া নাট্যসাহিত্যের ক্রমোন্নতি দেখান হইবে।

নাট্যসাহিত্যে রামনারায়ণ তর্করত্নের কাল (১৮৫৪-১৮৭৫ খৃঃ)

রামনারায়ণের কাল হইতে পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ নাট্যকারগণ, যাঁহারা কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া নাট্যসাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, যথাক্রমে তাঁহাদের কাল এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইবে; এবং সেই-সেই কালে কি-কি নূতন নাট্য-সম্পদ নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডারে আহৃত হইয়াছে, তাহার প্রদর্শনও ঐ কালবিচারের অন্যতম উদ্দেশ্য থাকিবে। কোন সমসাময়িক নিঃসঙ্গ দৃশ্যকাব্য ঐ আলোচ্যকালের মধ্যে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়া থাকিলে তাহার আলোচনাও সেই-সেই অধ্যায়ের শেষভাগে প্রদত্ত হইবে।

রামনারায়ণের প্রথমার্ধকালের 'কুলীন কুল সর্বস্ব'

নাট্যসাহিত্যে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের কাল-বিচার করিতে হইলে তাঁহার কালকে প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ ক্রমে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। ইহার প্রথমার্ধ কাল বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্যের জন্মকাল, এবং দ্বিতীয়ার্ধ কাল তাহারই পুষ্টিকাল। প্রথমার্ধ কালে দৃশ্যকাব্য সবেমাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এমন কি তাহার সূতিকা গৃহত্যাগ পর্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই।

রংপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুরস্কারলব্ধ 'কুলীনকুলসর্বস্ব' রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রথম মৌলিক দৃশ্যকাব্য। ইহা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের দুইজন অভিনেতার উদ্‌যোগে চড়কডাঙ্গাস্থ (বর্তমান টেগর্ ক্যাসল্ রোড্) রামজয় বসাক মহাশয়ের বাড়ীতে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

যাত্রা, পাঁচালী, হাফ্-আখড়াই প্লাবিত দেশের প্রথম বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্য যে, ঐগুলির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিবে, এরূপ আশা করা যায় না; কাজেই ইহার মধ্যে যাত্রাভিনয়ের গীতবাহুল্য না থাকিলেও পাঁচালী বা তৎকাল প্রচলিত রসিকতার প্রভাব এখানি এড়াইতে পারে নাই। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া এই দৃশ্যকাব্যখানি রচিত হইয়াছিল। কৌলিন্য-প্রথা প্রচলিত থাকায় বঙ্গদেশের কুলকামিনীদের কিরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল তাহারই চিত্র এই দৃশ্যকাব্যে চিত্রিত হইয়াছে। দৃশ্যকাব্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছু নাই। তদানীন্তন সমাজের কুৎসিত-চিত্রের প্রদর্শন যখন ইহার উদ্দেশ্য, তখন ইহা যে অশ্লীলভাবাপন্ন হইবে তাহা আর বিচিত্র কি! তবে নাট্যকার তাঁহার লেখনীকে আরও সংযত করিলেও করিতে পারিতেন। পূর্ববর্তী বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয়ের পালাগুলি তাঁহাকে কতকটা অসংযত করিয়া তুলিয়াছিল। বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর অনুকরণে 'কুলীনকুল সর্বস্বে'র রসিকাও নিম্নলিখিতরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছে :—

"বাড়ী মোর বংশীপুরে দেখা যায় কিছু দূরে
ঘেরা-ঘোরা ঘর দুইখানি।
নবীনা যুবতী আমি মরেছে আমার স্বামী,
তবু কভু দুঃখ নাহি জানি ॥ * *
তৃষিত পথিকগণ এসে করে আকিঞ্চন,
যদি পায় মোর ঘরে বাসা।
নাহি যার অন্তস্থান করে সবে অবস্থান
এমন আমার ভালবাসা ॥" ইত্যাদি

এগুলি অবান্তর প্রসঙ্গ। মূল ঘটনার বিষয়ীভূত কুলীনকামিনীগণের নিঃসঙ্গজীবনজনিত খেদ দেখাইতে যাইয়া নাট্যকার নাপিতবউ রসিকারও বিরহ দেখাইয়া লইলেন। এই দৃশ্যকাব্যে সংস্কৃত নাটকের অনেক অন্ধ অনুকরণ আছে। নান্দী, প্রস্তাবনাদি প্রাচীন রীতির প্রকরণবন্ধানুক্রমে এটি রচিত হইয়াছে। নান্দীটি সুন্দর, গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত বেশ খাপ খাইয়াছে। প্রস্তাবনাটি সুন্দর হইলেও সূত্রধার যখন আপনার বক্তব্য শেষ করিয়া নটীর উদ্দেশে বলিতেছে :—"প্রিয়ে, যদি তোমার বেশ-বিন্যাস হইয়া থাকে ত্বরায় আইস।" নটী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশানন্তর বলিল : - "আর্যপুত্র এই আমি আসিলাম, আজ্ঞা করুন কি করিব?" 'এই আমি আসিলাম' কথাটি সংস্কৃতের অন্ধ অনুকরণ।

রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া আর্যপুত্রের কাছে পৌঁছিয়া তাঁহারই সমক্ষে 'এই আমি আসিলাম' বলা অত্যুক্তি-মাত্র। ইহা ব্যতীত সংস্কৃত নাটকের প্রধান পাত্রের অনুকরণে এই দৃশ্যকাব্যের কুলপালক প্রভৃতি প্রধান পাত্ররা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা শ্লোকের মায়া ছাড়িতে পারেন নাই। দৃশ্যকাব্যের ভিতর যেখানে-সেখানে ঐগুলির প্রাবল্য দেখা গিয়াছে। 'জল-সওয়া' উপলক্ষে প্রতিবাসিনী কামিনীদের আক্ষেপের ব্যপদেশে তৎকালপ্রচলিত অনুপ্রাসবহুল পাঁচালীছন্দের অনুকরণও ইহাতে আছে, যথা—প্রতিবাসিনীদের কথোপকথন :—

হেমলতা— "* * বিয়ার নাচি প্রসঙ্গ অনঙ্গেতে ভরে অঙ্গ
রঙ্গ দেখে লোকে ব্যঙ্গ করে।
মনেতে ভেবেছি সার শুধিব বাঙ্গালি-ধার
কুলে জলাঞ্জলি দিয়া পরে॥"

যশোদা— "ওলো তোদের দুখ, শুনে, মোর বুক ফাটে।
তোরা খাস ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে॥"

শুক-সারীর রাধাকৃষ্ণের রূপগুণ বর্ণনার ভঙ্গীতে এই দৃশ্যকাব্যের ধর্মশীল ও অনৃতাচার্য বরের রূপ-গুণ নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিতেছে :— ধর্ম—"দেখিতে সুন্দর বর দাদ্ সব গায়।" অনৃ—"বিনা চক্রে শালগ্রাম শোভা নাই পায়," ইত্যাদি। তৎকালপ্রচলিত ব্যঙ্গের আস্বাদন এইরূপ ছিল। অনৃতাচার্য ও গ্রহাচার্যের নিম্নলিখিত কথোপকথনের মধ্যে ব্যঙ্গের পরিবর্তে ন্যাকামির ইঙ্গিত বেশী প্রকট হইয়াছে। কোন কোন সম্প্রদায় ইহাতে বেশ আমোদ উপভোগ করিয়াছেন, নমুনা দেখুন :—

"অনৃ—কাল রাত্রিতে বিবাহ হইতে পাবে কি না, তুই তাহাই বলে যা।

গ্রহাচার্য- (সমীচীনরূপে পঞ্জিকা দেখিয়া) না মহাশয়! কল্য দিন হইবে না।

অনৃ—(ফিরিয়া) কল্য কি সূর্যোদয় হইবে না? দিন হইবে না কেন? এ বেটা বাতুল না কি!

গ্রহা—(ঈষৎ ক্রোধে) আমি বিবাহের দিন হইবে না বলিয়াছি।

অনৃ—আঃ কি বিপদ, ওরে মূর্খ! বিবাহ কি দিনে হয়?

গ্রহা—না-না—তা নয়, কল্য বিবাহের নক্ষত্র নাই, তাহাতেই বলিয়াছি, কল্য নিশাতে বিবাহ হইতে পারে না।

অনৃ—এ বেটা রাইতকানা না কি? এ কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, কল্য তুই আমার নিকট আসিস্, তোকে আকাশে কত নক্ষত্র দেখাইয়া দিব, খুঁজিয়া দেখিস্! একটাও কি বিবাহের হইবে না" ইত্যাদি।

কুলাচার্যের কুশল-জিজ্ঞাসা কুলপালক কিরূপ পদ্ধতিতে করিতেছেন তাহার নমুনা :—"মহাত্ম ব্যক্তির শরীর সর্বদা স্বোপার্জিত পুণ্যে পবিত্র; তাহাতে আধি-ব্যাধির বাধা কদাচ সম্ভবে না বটে, তথাপি অনিন্দিত শিষ্টাচারানুসারে আপনকার শরীরের কুশল প্রশ্নে আত্মাকে পুনরুক্ত নিযুক্ত করিতেছি,—মহাশয়ের শরীরের কুশল?"

গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাব সাহিত্যে তখন এত অধিক ছিল যে, নাটকেও তাহা পরিলক্ষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণী অর্থাৎ কুলপালকের স্ত্রী কন্যার বিবাহে আনন্দে বিহ্বল হইয়া এইরূপ বলিতেছেন :—

"আজি কি আনন্দ দিন মেয়েদের বিয়ে।
শরীর জুড়াবে মোর জামাই দেখিয়ে॥"

তৎকালপ্রচলিত রুচির আর একটা প্রমাণ এইবার দেখুন। মেয়ে মায়ের কাছে বিবাহপ্রসঙ্গ লইয়া এইরূপ বলিয়াছে :—"কান্ত বিনে কেমনে বসন্তে প্রাণ বাঁচে" ইত্যাদি।

তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার এই দৃশ্যকাব্যের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর কথোপকথনে সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত ভাষা প্রয়োগের মতো গ্রাম্যভাষা প্রয়োগের লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ভৃত্য ভোলাকে কোন কাজের ফরমাশ করিলে সে গ্রাম্যভাষায় নিম্নলিখিতরূপে দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিল :—

"(স্বগতঃ) মোগার কোপালে দুক্ নেকেচে গোঁসাই।
খাট্টি খাট্টি মনু, এট্টু বস্তি পাই নাই ॥
বসি ঘরে প্যাটভরে খাত্তি নাই পাই।
চাকুরি ঝকমারি কাম করি মুই তাই ॥"

"ঐ ওত্তরের বাড়ির মুই খ্যানা কাট্টি গেছ্‌লাম, এস্‌তে এস্‌তেই বড় মোশাই বল্যে "ওরে ভোলা তুই যা, পুরুৎঠাকুরেরে ডাকি আন্"। "তা এই মুই অদ্দুরে থাকি আলাম্, তামুক খাত্তিও পালাম না, এট্টু জিরুত্তিও পালাম না," ইত্যাদি। গ্রাম্য লোকের গণ্ডচিত্র হিসাবে এটি মন্দ নহে, ভৃত্যের অন্তর-ব্যথাই প্রকাশিত হইয়াছে।

ধর্মশীল পুরোহিত কুলপালকের যজনকার্য করিলেও কন্যা-বিক্রয়-প্রথার উপর বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই। কন্যা-বিক্রয় সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলিতেছেন :—"রেখে দাও তুমি সংসার যাত্রা। বৃক্ষে কি পত্র নাই, নদীতে কি জল নাই, আরণ্য ভূমিতে কি স্থান নাই, পল্লবে কি শয্যা রচনা হয় না? বাম বাহু কি উপাধান হইতে পারে না? বল্কল কি পরিধেয় নহে? এই পৃথিবীতলে জগদীশ্বরদত্ত অযত্ন সুলভ কি না আছে, কি না পাওয়া যায়? তবে কি নিমিত্ত এই মহাপাতক?" এই অংশটি ভাষা-হিসাবে দৃশ্যকাব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

এইরূপ উৎকৃষ্টাপকৃষ্টের সংমিশ্রণ থাকিলেও 'কুলীন কুল সর্বস্বে'র গঠনপ্রণালী নাটকোচিত হয় নাই। ইহার গ্রন্থন প্রণালী এইরূপ :—

প্রথমে—কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান, দ্বিতীয়ে—ঘটকের কপট ব্যবহারসূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব, তৃতীয়ে—কুলকামিনীগণের আচার-ব্যবহার, চতুর্থে—শুক্রবিক্রয়ীর দোষোদ্‌ঘোষণ, পঞ্চমে—নানা রহস্য ও বিরহী পঞ্চাননের বিয়োগ-পরিদেবন, ষষ্ঠে—বিবাহ নির্বাহ। যদিও এই ছয়টি চিত্র অল্পাধিক মূল বিষয়েরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ, তথাপি এইগুলি এরূপভাবে মূল ঘটনার সহিত গ্রথিত হইয়াছে যে, ঐগুলিকে পৃথক করিয়া লইলেও মূল ঘটনার বিশেষ অঙ্গহানি হয় না। ফলার লোভী ব্রাহ্মণের চিত্র, ধর্মশীল ও তর্কবাগীশের বহু প্রসঙ্গ কেবলমাত্র এক একটি ভিন্ন-প্রকৃতিক জাতিরূপ (type) দেখাইবার উদ্দেশ্যে দৃশ্যকাব্যের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এগুলি যদি উঠাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে গ্রন্থাবয়ব কমিয়া যাওয়া ছাড়া, দৃশ্যকাব্যের মূল বিষয়ের কোন রসভঙ্গ হয় না। নিপুণ নাট্যকার এরূপভাবে কার্য করেন না। তাঁহার রচনায় মূল ঘটনা প্রধান স্রোতঃস্বতীর মতো তরঙ্গ-ভঙ্গে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে ধাবিত হয় এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ঘটনা উপনদীর মতো সেই প্রধান নদীতে আসিয়া মিশিয়া যায় এবং পরে সেই সম্মিলিত ঘটনাবলী প্রবল জলস্রোতের মতো নূতন বেগ লইয়া নদীর সাগরসঙ্গম-রূপ দৃশ্যকাব্যের উদ্দেশ্যসিদ্ধি লাভ করে।

কুলীনকুলসর্বস্বে এ নিয়মের ব্যত্যয় হইয়াছে। নাট্যসাহিত্যের সূতিকাগারের শিশু দৃশ্যকাব্যের এ সকল ব্যতিক্রম শোভনীয় না হইলেও অসহনীয় নহে।

রামনারায়ণের দ্বিতীয়ার্ধ কালের দৃশ্যকাব্য

'কুলীনকুলসর্বস্বে'র পর তর্করত্ন মহাশয় যতগুলি দৃশ্যকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলিকে অনায়াসে তাঁহার দ্বিতীয়ার্ধ কালের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা যায়। ঐগুলি যখন রচিত হইয়াছিল, তাহার পূর্বে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' রঙ্গাসরে অবতীর্ণা হইয়া যশস্বিনী হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তর্করত্নের বাকী দৃশ্যকাব্যগুলির মূল্য কুলীনকুলসর্বস্বের তুলনায় কম দাঁড়াইয়া গেল। 'নবনাটক', 'স্বপ্নধন' ও 'কংসবধ' ব্যতীত তর্করত্নের ঐ কালের অপর দৃশ্যকাব্যগুলি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ মাত্র। যদিও ঐ সকল অনুবাদের মধ্যে মূল সংস্কৃত নাটকের অবলম্বিত বিষয় ছাড়াইয়া অনুবাদকের স্বকপোলকল্পিত ইঙ্গিতও যথেষ্ট ছিল, তথাপি সেগুলি মূলতঃ মূলকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহার অনূদিত নাটক সমূহের বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমরা কেবল সেগুলির নাম ও প্রথম অভিনয় তারিখ উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব, কারণ সৌন্দর্যের মূল্য যদি কিছু থাকে, তাহা মূলেরই প্রাপ্তব্য।

(১) 'বেণীসংহার'—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রেল তারিখে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের বাটীতে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

(২) 'রত্নাবলী'—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই, শনিবার বেলগাছিয়া নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়।

(৩) 'মালবিকাগ্নিমিত্র' পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পুরাতন বাড়ীর দ্বিতলে নাচঘরের বাঁধা-রঙ্গমঞ্চে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত হয়।

(৪) 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে শাঁখারি টোলার বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষের বাড়ীতে প্রথম অভিনীত হয়।

(৫) 'মালতীমাধব' ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি তারিখে পাথুরিয়াঘাটার রাজ বাড়ীতে প্রথম অভিনীত হয়।

(৬) 'রুক্মিণী হরণ' ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারি তারিখে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের নিজ বাড়ীতে পাথুরিয়া ঘাটা বঙ্গ নাট্যশালা-সম্প্রদায় কর্তৃক প্রথম অভিনীত হয়। নাটকটির গল্লাংশ ভাগবত হইতে গৃহীত। ইহা ঠিক অনুবাদ নহে, মৌলিকতা যথেষ্টই আছে।

তর্করত্ন মহাশয়ের উত্তরকালীয় নাটকগুলি প্রাচীন প্রথায় লিখিত হয় নাই। ইংরাজি নাটকের লিখন-পদ্ধতি যেন তাহাদের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিয়াছে। দেশ-কাল-পাত্র জ্ঞান (sense of propriety) তর্করত্ন মহাশয়ের তাদৃশ প্রখর ছিল না। 'রুক্মিণীহরণ' নাটকে কৃষ্ণ ও নারদের কথোপকথনের মধ্যে ইহার একটা নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে :—

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নারদ—'কালো বলে মেয়ে দেয় না? তা' এক কর্ম কর না।'

কৃষ্ণ—'কি কর্ম?'

নারদ—'এখন কেউ-কেউ শুভ্রকেশ দ্রব্যগুণে কালো করে থাকে, এমনও দেখা যাচ্যে—তা' তুমি কালো গায়ে কোন দ্রব্য দিয়ে কি সুন্দর হ'তে পারো না?'

এরূপ প্রসঙ্গ আধুনিক কালের সামাজিক নাটকে শোভনীয় হইলেও পৌরাণিক নাটকে সম্পূর্ণ অশোভনীয়। যাহা হোক এ নাটকখানি আটবার অভিনীত হইয়া গিয়াছে।

রামনারায়ণের 'নব-নাটক' জোড়াসাঁকো-নাট্যশালা কমিটি কর্তৃক বহু বিবাহবিষয়ক প্রস্তাব লইয়া রচিত ও পুরস্কৃত হইয়াছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি তারিখে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতেই ইহার প্রথম অভিনয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল। তর্করত্ন মহাশয়কে কিরূপভাবে পুরস্কৃত করা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা জ্যোতিরিন্দ্রের জীবন স্মৃতিতে * এইরূপ আছে :—"নাটক রচিত হইল। নাটকের নাম নবনাটক। যে দিন এই উপলক্ষ্যে তর্করত্ন মহাশয়কে পুরস্কার প্রদান করা হয়, সে একটি স্মরণীয় দিন * *। একটা রূপার থালায় নগদ ৫০০৲ টাকা † সাজাইয়া রাখা হইল। তখন ঐ ৫০০৲ শত টাকা তর্করত্ন মহাশয়কে প্রদান করা হইল। নবনাটকে তিনি ইংরাজিশিক্ষিত লোক-দিগের রুচিকে প্রশ্রয় দিয়াই খাঁটি বাঙ্গলায় এই সর্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটক রচনা করিলেন।" "যখন গবেশবাবুর ছোটগিন্নি ও বড়গিন্নি গবেশবাবুর এক একটা পা দখল করিয়া তৈলমর্দন করিবার জন্য টানাটানি করিত আর বলিত, 'এটা আমার পা, তুই আমার পাটায় কেন তেল মাখাচ্ছিস ইত্যাদি' তখন গবেশবাবুর অবস্থা ও মুখভঙ্গী দেখিয়া দর্শকেরা কেবল হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেই বাকী রাখিত। বড় স্ত্রী গবেশবাবুকে বশ করিবার জন্য ঔষধ করায় গবেশবাবুর উদরটা ফুলিয়া ঢাক হইয়া উঠিয়াছিল। গবেশবাবু যখন তাঁহার লম্বোদরটি আরও ফুলাইয়া দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে বসিতেন, তখন এই সামান্য দৃশ্যেই সকলে হাসির লহর তুলিত। গবেশবাবুর মৃত্যু হইলে অমলা, কমলা, চন্দ্রকলা প্রভৃতি গবেশবাবুর পুরস্ত্রীগণ এরূপ মড়-কান্না জুড়িয়া দিত যে, সেই রোদন-রোল শুনিয়া পাড়ার লোকের পর্যন্ত আতঙ্ক উপস্থিত হইত। প্রথম দিনের অভিনয়ে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় শেষ হইলে, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন : -'যারা পলাট (plot) নাই, পলাট নাই বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক্'—সমালোচকদিগের উপর এইরূপ মধুবর্ষণ করিতে করিতে তিনি আপনার আনন্দ-সাফল্যে গর্বিত হইয়া খুব আস্ফালন করিয়াছিলেন।" ‡ নবনাটকে তর্করত্ন মহাশয় 'কুলীনকুলসর্বস্ব' অপেক্ষা অধিকতর শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ইহার সংলাপ অপেক্ষাকৃত উন্নত ও যুক্তিপূর্ণ। কৌতুক ও রসগোষালিনীর রসিকতা, শ্লেষ, হাস্যরস স্থানে স্থানে বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। এ নাটকের মধ্যে নাটককার বহু বিবাহ, দলাদলি, পণ্ডিতাভিমানী ও মূর্খপণ্ডিতের তর্ক প্রভৃতি বহু প্রসঙ্গ আনিয়াও যথাস্থানে নাটকোচিত পরাকাষ্ঠা (climax) আনিবার কৌশল করিতে পারেন নাই। মৃত্যু, অপমৃত্যু আনিয়া বিষাদান্ত পরিণতি দেখাইয়াছেন, কিন্তু তজ্জনিত মনোমধ্যে বিশেষ কোন সাড়া তুলিতে পারেন নাই; এমনই একটা কৌতুককর আব্‌-হাওয়া নাটকখানির মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। প্রথম নাট্যকার হিসাবে ইনি যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

তর্করত্ন মহাশয়ের 'স্বপ্নধন' নাটকখানি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। বিদর্ভদেশের রাজপুত্র মতিমানের সহিত কেরল দেশীয় রাজকন্যা কুসুমলতার

* শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বিরচিত "জ্যোতিরিন্দ্র নাথের জীবনস্মৃতি" পৃষ্ঠা ১০৩

† "পাঁচশত টাকা ভ্রমক্রমে লিখিত হইয়াছে, ২০০৲ টাকা হইবে, কারণ উহাই বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

‡ বসন্তকুমারের "জ্যোতিরিন্দ্র নাথের জীবনস্মৃতি"

পরিণয় ব্যাপারই ইহার গল্পাংশ। ইহার নায়ক-নায়িকা এক মহাপুরুষের কৌশলে উভয়ে উভয়কে স্বপ্নে দেখিয়াই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, এবং কি করিয়া তাহাদের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল, নাটকের মধ্যে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। নানা অলৌকিক কাণ্ড উহার মধ্যে আছে।

কংসবধ

রামনারায়ণের এই পৌরাণিক অথচ মৌলিক নাটকখানি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, এখানির প্রথম অভিনয়-তারিখ পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থকার কংসবধকে নাটক আখ্যা দিলেও নাটকের আসল বস্তু রস ও সংঘাত ইহার মধ্যে নাই। বিবৃতিজ্ঞাপক কথোপকথনগুলি যেন পর-পর সাজানো রহিয়াছে। সুর সত্ত্বেও গান কয়খানি যেন প্রাণহীন কথার গাঁথা-মালা। এ খানি তিন অঙ্কে সমাপ্ত। কৃষ্ণ-বলরামের বহু স্মৃতিমণ্ডিত বৃন্দাবন ত্যাগ রূপ এত বড় একটা ট্র্যাজেডি নাট্যকার স্তিমিতপ্রায় দীপের মতো নির্জনেই নির্বাপিত করিলেন !

রামনারায়ণের এই সকল নাটকের কোনটাই যুগ-প্রবর্তক ছিল না, সুতরাং ঐগুলির বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক।

রামনারায়ণের 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এখানি দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়। ইহার গল্পাংশ এইরূপ :—সুধীর নামীয় কোন লোকের অনুপস্থিত কালে তাহার স্ত্রী সুমতির প্রতি কামাসক্ত হইয়া এক মুন্সেফ ও তাঁহার এক সেরেস্তাদার ঐ দম্পতির কৌশলে কিরূপ দুর্গতিলাভ করিয়াছিলেন তাহার চিত্র ইহাতে আছে। এখানি দুই অঙ্কে সমাপ্ত প্রহসন, নাট্যকৌশল বিশেষ কিছু নাই।

রামনারায়ণের 'চক্ষুদান' ও 'উভয় সংকট' প্রহসনদ্বয় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ীতে প্রথম অভিনীত হইয়া গিয়াছে। সামাজিক কলঙ্কের চিত্র কি 'চক্ষুদানে', কি 'উভয় সংকটে' পৃথক ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। নিকুঞ্জবিহারী নামক লম্পটকে তাহার স্ত্রী এক পুরুষের ছদ্মবেশধারিণী স্ত্রীলোক দ্বারা যে শিক্ষা দিয়াছিল তাহার চিত্র চক্ষুদানে আছে; ইহার উপসংহার গীতটি এইরূপ :—"এরেই বলে চক্ষুদান। এরেই বলে চক্ষুদান! ধোঁকা তো মিট্‌লো এবার সাহস ক'রে চক্ষু চান!!" 'উভয় সংকটে' দুই পত্নীযুক্ত ব্যক্তির লাঞ্ছনা দেখানো হইয়াছে। এই প্রহসনদ্বয় মধুসূদন রচিত প্রহসনদ্বয়ের পরে রচিত ও অভিনীত হইয়াছে, সুতরাং মধুসূদনের প্রভাব যে ঐগুলিতে পৌঁছায় নাই এ কথা বলা কঠিন। উপরিউক্ত গ্রন্থত্রয়ের জন্য রামনারায়ণ মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন।

রামনারায়ণের কালে তাঁহার মৌলিক দৃশ্যকাব্য 'কুলীনকুলসর্বস্বে' আমরা প্রথমে ব্যঙ্গ চিত্রের আস্বাদ পাইয়াছি। ইহা নাটক নামে অভিহিত থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে নাটক অপেক্ষা প্রহসনের লক্ষণ অধিক পরিস্ফুট রহিয়াছে। পরবর্তীকালে যে প্রণালীতে প্রহসন লিখিত হইয়াছিল সে পদ্ধতি ইহাতে ছিল না, এবং নাটকীয় রীতির অভাবও সম্পূর্ণ রহিয়াছে, তজ্জন্য ইহা—না নাটক, না প্রহসন এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্য সম্বন্ধে ইহার অধিক মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।

রামনারায়ণের কালে অপর প্রসিদ্ধ দৃশ্যকাব্যের কথা

রামনারায়ণের সমকালীন অপর যে কয়জন নাট্যকারের নাট্যগ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহাদের বিবরণ যথাক্রমে প্রদত্ত হইল :—

বিধবাবিবাহ নাটক

হাইকোর্টের বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্রের ভ্রাতা উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের মতে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রথম বিয়োগান্ত নাটক ; কিন্তু বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি" গ্রন্থে রামনারায়ণের 'নব-নাটক' সম্বন্ধে ঐ কথাই বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত 'বিধবাবিবাহ' নাটকের অস্তিত্বের কথা বা তৎপূর্বে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কীর্তিবিলাস' নাটকের কথা জীবনস্মৃতিকারের মনে আসে নাই। যাহা হোক 'বিধবাবিবাহ' নাটকখানি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে অর্থাৎ ২৩শে এপ্রেল তারিখে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক কেশবচন্দ্র সেনের উদ্‌যোগে কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটীর রামগোপাল মল্লিকের বাসভবনে মেট্রোপলিটন থিয়েটার কর্তৃক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। উমেশচন্দ্র মিত্র ইহার প্রণেতা ও কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক। প্রথম-মুদ্রনের তারিখ ২৫শে ভাদ্র ১২৬৪ সাল (ইংরাজি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ)। ৯০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা দেশে বিশেষতঃ কলিকাতা শহরে ও তাহারই আশ-পাশের সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে যে আলোড়ন আসিয়াছিল ইহাতে তাহারই একটি চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। নাটক তখনও পয়ার-লাচাড়ীর প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই, তাই পাত্র-পাত্রীর মধ্যে ভাবাতিশয্য ঘটিলেই তাহা প্রকাশের জন্ম উহার আশ্রয় লওয়া হইত। ইহার অন্তর্গত কি কথোপকথন, কি স্বগতোক্তি এত দীর্ঘ হইয়াছে যে উহাতে ঘটনা বর্ণনার ভঙ্গী (narration) ভিন্ন নাটকীয় কৌশল (technique) মোটেই রূপ গ্রহণ করে নাই। বিধবা বিবাহ সমাজে প্রচলিত করিবার উদ্দেশ্যে নাট্যকার অদ্বৈত দত্তের বিধবা কন্যা প্রসন্নের বিবাহ দিয়া সমাজ রক্ষার পথ দেখাইলেন এবং কীর্তিরাম ঘোষের বিধবা কন্যা সুলোচনার বিবাহ না দিয়া কন্যা ও ভ্রূণহত্যা একসঙ্গে কিরূপে সংঘটিত হইল তাহাও দেখাইলেন। নাটকখানি চার অঙ্কে সমাপ্ত। দৃশ্য শব্দের উল্লেখ করিয়া দৃশ্যযোজনা করা হয় নাই বটে, তবে সংযোগ স্থলের উল্লেখ প্রয়োজন মতো আছে। বাসরঘরের গান ছাড়া নাটকের মধ্যে আর গান ছিল না। অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে এখানি বাঙ্গালা ভাষার প্রথম বিষাদান্ত নাটক। তৎকালোচিত অশ্লীল কথার প্রয়োগ না থাকিলেও অশ্লীলভঙ্গীর হাত হইতে নাটকখানি রক্ষা পায় নাই, বিষয়বস্তুর প্রয়োগনৈপুণ্যের (delineation) অভাবই তাহার হেতু। পরবর্তীকালের বেঙ্গল থিয়েটারের অধ্যক্ষ বিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহাতে নায়িকার ভূমিকা লইয়াছিলেন। *

চপলাচিত্তচাপল্য নাটক

উপরিউক্ত 'বিধবাবিবাহ' নাটক অভিনীত হইবার প্রায় দুই বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ভাদ্রমাসে 'চপলাচিত্তচাপল্য' নাটকখানি মুদ্রিত হইয়াছিল। 'পদ্যপাঠের' প্রসিদ্ধ কবি যদুগোপাল

* বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রণীত "পুরাতন প্রসঙ্গ"

চট্টোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা। নাটকখানি মুদ্রিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্বে কবির বন্ধুমহলে ইহার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছিল। নাট্যকার উক্তগ্রন্থের ভূমিকায় এইরূপ বলিয়াছেন :—"বিধবা-বিবাহ নির্বাহ হইবার পূর্বেই ইহার লেখা শেষ হইয়াছিল, কিন্তু কোন অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধকতাবশতঃ একাল পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। যদিও এখন ইহার সমুদয় ভাগ অসংলগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি কিছু পরিবর্তন না করিয়া প্রথমে যেরূপ লেখা ছিল সেইরূপ প্রকাশিত হইল।" এটি উদ্দেশ্যাত্মক নাটক। বয়োকনিষ্ঠ বিধবার পুনর্বিবাহ না দিয়া সমাজে যেরূপ অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছিল তাহার চিত্র ইহার মধ্যে আছে। বহু বিবাহের অনিষ্টফল রামনারায়ণের 'নবনাটকে' প্রদর্শিত হইয়াছে। বিধবার পুনরায় বিবাহ না দেওয়ায় সামাজিক কুফল কিরূপ ভীষণ হইতেছিল উপরিউক্ত দুইখানি নাটকে তাহার চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। 'চপলাচিত্তচাপল্য' নামেমাত্র নাটক, পল্লবচরিতার হাতে পড়িয়া ইহার নাট্যশক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। নাট্যকার ভূমিকায় স্বয়ং বলিয়াছেন যে, 'ইহার সমুদয় ভাগ অসংলগ্ন'। নাটকের দৃশ্যগুলি পরস্পরাপেক্ষ না হইয়া পৃথক পৃথক চিত্রের ন্যায় দেখাইয়াছিল। ইহা নাটক লিখিবার রীতি নহে, এবং স্থানে অস্থানে পয়ার ও ত্রিপদীছন্দের কবিতার প্রয়োগে নাটকটি ভারাক্রান্ত হইয়া চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার অভিনয়ের কোন খবর আসে নাই। সংক্ষেপে উপাখ্যানভাগটি এইরূপ :—"ধনী বাসব রায়ের কন্যা চপলা ১৪।১৫ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল। তৎকালীন সামাজিক প্রথানুযায়ী কন্যাকে বিধবার বেশ বা আহার প্রদান করিতে কন্যার প্রতি অত্যধিক স্নেহশীল মাতাপিতা পারিলেন না। পাড়ায় রায়-বাড়ী সম্বন্ধে নানা ঘোঁট চলিতে লাগিল। এদিকে বাসববাবু কন্যার চিত্তকে ধর্মপ্রবণ করিবার জন্য বাড়ীতে 'পুরাণ-কথা' দিলেন। শ্রোতৃবৃন্দের আসন হইতে চিকের ফাঁক দিয়া চপলা ও পাড়ার ছেলে চারুচন্দ্রের নয়ন-বিনিময় ক্রমশঃ প্রাণ-বিনিময়ে পর্যবসিত হইল। অপর দিকে বাসববাবু নানা শাস্ত্র পড়িয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বুঝিয়া তর্কালংকার পুরোহিতের সাহায্যে উহাদের মিলন সাধিত করিলেন।"

কলিকৌতুক নাটক

রামনারায়ণ-কালের উপসংহার করিবার পূর্বে তাঁহার সম সাময়িক শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ-গুণনিধি বিরচিত 'কলিকৌতুক' নাটক সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। এখানি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। এখানি নামে নাটক হইলেও নাটক লিখিবার প্রণালী ইহাতে নাই। অঙ্কের ব্যবধান থাকিলেও দৃশ্য নাই। একই অঙ্কে বহু দৃশ্য অবতারিত হইয়াছিল, মাত্র পাত্র-পাত্রীর মুখে তাহাদের উল্লেখ দেখা যায়। কলির পাপাচারের নগ্নরূপ দেখানোই ইহার উদ্দেশ্য। মহাভারতের রাজা পরীক্ষিৎ হইতে যথাক্রমে বুদ্ধ, চৈতন্য, আগমবাগীশ, কৌলাচার, ভৈরবীসাধন, আদিশূর, বল্লালসেন, কৌলীন্যপ্রথা, নেড়া-নেড়ী, বাউল, সাঁই, না-গোসাই, বাবাজী, মুসলমানের ভারত আক্রমণ, মোড্ভেস দলের ভারতবিজয়, ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধাচার প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের এককালীন চিত্র দেখাইতে যাওয়ায় ইহার নাট্যশক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণিত হইয়াছে। লিখন-ভঙ্গী মোটেই নাটকোচিত হয় নাই। পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী প্রভৃতি বিবিধ ছন্দের প্লাবনে এবং অশ্লীল-আলোচনায় নাটকটি ভরপুর। সৌভাগ্যক্রমে নাটকখানি অভিনীত হয় নাই, এরূপ অনুমান করা চলে; কারণ সভ্য-সমাজের স্ত্রী-পুরুষে একত্রে বসিয়া ইহার অভিনয় দেখিতে পাবেন না, এমনই অশ্লীল ইঙ্গিত ইহার মধ্যে আছে।

স্বর্ণ-শৃঙ্খল নাটক

ডাঃ দুর্গাদাস কর ইহার প্রণেতা। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি কর্মোপলক্ষে ঢাকায় বদলী হইয়া যান, সেখানে ইহা মুদ্রিত করেন, কিন্তু তৎপূর্বে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বরিশালে বসিয়া এখানি রচনা করিয়াছিলেন এবং ১৮৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বরিশালেই ইহা পাণ্ডুলিপির আকারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। গ্রন্থের ভূমিকায় উক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবুর মতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে উক্ত অভিনয় ঘটিয়াছিল। বিদ্যাসাগরী ভাষার মাধ্যমে মহাভারতীয় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ইহার উপজীব্য। নাট্যকারের দেশ কাল-পাত্র জ্ঞানের অভাব রহিয়াছে, কারণ দ্বাপরের পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়া আধুনিক বাঙ্গালী সংসারের অভাব-অভিযোগের কথা প্রকাশিত করিয়াছেন। ইংরাজ রাজত্বের কতকগুলি একচেটিয়া দ্রব্যের ব্যবসায় দুর্যোধন-রাজ্যে অনুষ্ঠিত হইতেছে এরূপ ইঙ্গিতও দিয়াছেন। তাঁহার সম-সাময়িক নাট্যকার মনোমোহন বসুর নাটকেও এ দোষ দেখা গিয়াছিল। রসবৈচিত্র্য হিসাবে রাজ-মজুর, বুড়ি ও ভদ্রলোকের অবান্তর প্রসংগে কেন্দ্রগত চিত্রের গৌরবহানি হইয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে সংগীতশাস্ত্রের সামান্য গবেষণা নাটকের মধ্যে আছে। পাণ্ডবেরা ধর্মরূপ স্বর্ণ-শৃঙ্খলে কিরূপ আবদ্ধ ছিলেন তাহা দেখাইবার জন্য নাটকের এইরূপ নামকরণ নাট্যকার করিয়াছেন।

চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা (নাটক)

মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। বিজ্ঞাপনের তারিখ ১৫ই আষাঢ়, সন ১২৬৫ সাল। প্রথমে সূত্রধার, নট-নটী আবির্ভূত হইয়া কবিতা ও গদ্যে মামুলী বক্তব্য বলিয়াছে। মদ, আফিম, গুলি ও গাঁজাখোরদের দুর্দশার কথা পয়ার ও গদ্যে বর্ণনাভঙ্গী-ক্রমে কথোপকথনের আকারে এই গ্রন্থে রূপায়িত হইয়াছে। নেশায় সর্বস্ব খোয়াইয়া জীবনযাত্রার পথে অন্ধ বন্ধুসহ চার ইয়ার অবশেষে বৃন্দাবনধামে তীর্থযাত্রা করিয়া নেশার অভ্যাস ছাড়িয়া সেখানে সামান্য মাহিনায় সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল। অশ্লীল কথা ও ভঙ্গী ইহার স্থানে স্থানে আছে। চারি অঙ্কে এখানি সমাপ্ত। স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে কামিনী ও সারদা নিজ নিজ দুঃখের কাহিনী পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিয়াছে। নাটকত্ব ইহাকে স্পর্শ করে নাই।

বিদ্যাসুন্দর নাটক

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর অশ্লীল অংশ বাদ দিয়া 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক রচনা করিয়াছিলেন এবং ইহা তাঁহাদের পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। বিদ্যাসুন্দর সম্বন্ধে পূর্বে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে, এখানে মাত্র ইহার বৈশিষ্ট্যটুকু উল্লিখিত হইল।

সংযুক্তা-স্বয়ংবর নাটক

প্রাণনাথ দত্ত কর্তৃক ইহা রচিত হইয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। টডের 'অ্যানল্স অফ্ রাজস্থান' নামক গ্রন্থ হইতে ইহার গল্পাংশ গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু মনোহারিত্ব সম্পাদনার্থ নাট্যকার সামান্য পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন। প্রথমে নান্দী, নান্দ্যন্তে সূত্রধারের চলন রাখা হইয়াছে এবং তাহাতেও কোন নূতনত্ব নাই। পূর্ণ ক্রিয়াপদযুক্ত ভাষা ব্যবহৃত

হইয়াছে, উচ্ছ্বাসের বেগ কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। জয়চাঁদ কন্যা সংযুক্তা ও পৃথীরাজ ঘটিত ব্যাপার ইহার আখ্যায়িকা। সংলাপগুলি ফেনাইয়া এত বড় করা হইয়াছে যে, পাঠকের কৌতূহলে আঘাত লাগিয়াছে। ইহা অভিনীত হয় নাই, তাই দর্শকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই। অনিপুণ হস্তে নাটকীয় কৌশল নষ্ট হইয়াছে। নাটকখানি সাত অঙ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত, গানগুলি নীরস ও ভাবহীন। এই কয়খানি দৃশ্যকাব্যের সহিত রামনারায়ণ-কালের আলোচনাও শেষ করা গেল।

যাত্রাগান, গীতাভিনয় (অপেরা) ও নাটক

যাত্রাগানের স্বরূপ ও সৃষ্টির ইতিহাস পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব সম্পত্তি। নদীবহুল শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির অঙ্কে তাহার ভাবপ্রবণ অধিবাসী-দ্বারা ইহা সৃষ্ট ও অভিনীত হইয়াছিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ঠিক এ জাতীয় দৃশ্যকাব্য দেখা যায় না। ইওরোপীয় দৃশ্যকাব্যের সংস্পর্শে আসিয়া পুরাতন যাত্রাগান 'গীতাভিনয়ে' রূপান্তরিত হইতে লাগিল। কয়েকটির নমুনা দেওয়া হইল।

শকুন্তলা (গীতাভিনয়)

অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার রচয়িতা। গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৩ই এপ্রেল ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ। এই পালাদ্বারা প্রাচীন যাত্রার সংস্কার করা হইতেছে, পালাকার গ্রন্থের ভূমিকায় এরূপ বলিয়াছেন। নট, নটী, পারিপার্শ্বিক পূর্বের মতোই ছিল। পালাগ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্বে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এখানি বাগবাজার নাট্যসমাজ কর্তৃক একাধিকবার অভিনীত হইয়া গিয়াছে। পয়ার, ত্রিপদী ও গদ্যদ্বারা এখানি গ্রথিত, নূতন কিছু সমাবেশের পূর্বে 'ধুয়া'র প্রচলন পূর্বের মতোই রহিয়া গিয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা ইহার উপজীব্য বলিয়া কয়েকটি স্থানে নাটকীয় সংঘাত দেখা দিয়াছে। যথা :—দুর্বাসার অভিশাপ, অভিজ্ঞান দেখাইতেই পূর্বকথার স্মরণ, অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরীয়কের অজ্ঞাতসারে পতন, অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া দুষ্মন্ত রাজের জেলেকে হার বক্‌শিশ, দুষ্মন্ত পুত্রের সিংহশাবক লইয়া খেলা, পিতৃনাম জিজ্ঞাসায় পুরুবংশীয়ের পরিচয় প্রদান, মাতার নাম জিজ্ঞাসায় শকুন্তলা নামের প্রকাশ। উভয়ের মিলন তখন সম্পাদিত হইয়া গেল। রাজা ঐ কাল-অঙ্গুরীয়ক ফেরৎ দিতে চাহিলে শকুন্তলা পতির স্নেহই নারীর ভূষণ বলিয়া অঙ্গুরীয়ক আর গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে মোট ৬২ খানি গান আছে, গানের দিক দিয়া কোন সংস্কার দেখা গেল না।

নলদময়ন্তী (গীতাভিনয়)

কালিদাস সান্যাল ইহার রচয়িতা। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মদনমোহন তলায় বাগবাজার নাট্যসম্প্রদায় কর্তৃক এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল এবং তৎপরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। গদ্যের মাধ্যমে লেখা, মহাভারতীয় বিখ্যাত উপাখ্যান ইহার গল্পাংশ। ঘটনাবলির মধ্যে সংঘাত নাই। মহাকবি গিরিশচন্দ্র পরবর্তীকালে এই আখ্যান ভাগ লইয়া সুন্দর

নাটক রচনা করিয়াছিলেন। গীতাভিনয়টি সপ্তম অঙ্কে সমাপ্ত। ইহাতে ২২ খানি গান আছে, তদানীন্তন কালের সংগীতের প্রভাব এখানি অতিক্রম করিতে পারে নাই।

জানকী-বিলাপ (গীতাভিনয়)

হরিমোহন কর্মকার (রায়) ইহার প্রণেতা, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট তারিখে এখানি প্রকাশিত। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে এখানি অভিনীত হইয়াছিল। দুর্মুখের লোকাপবাদ শুনিয়া রামের সীতানির্বাসন ও সীতার পাতাল-প্রবেশ ইহার আখ্যায়িকা। নাটক হিসাবে এখানি দাঁড়ায় নাই। বনবাস-সংবাদে সীতা নিজে কাতরা না হইয়া মূর্ছাপ্রাপ্ত লক্ষ্মণকে নিজ অঙ্কে লইয়া সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। ৪১ খানি গান ইহাতে আছে। নাটকীয় সংঘাতের এমন অপমৃত্যু বড়ই দুঃখপ্রদ হইয়াছে। তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত এখানি বিকৃত।

শ্রীবৎস-চিন্তা (গীতাভিনয়)

হরিমোহন কর্মকার (রায়) ইহারও রচয়িতা। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইলে পর সিমুলিয়া শখের যাত্রা কোম্পানি দ্বারা এখানি অভিনীত হইয়াছিল। নাটকখানি সংগীতবহুল, পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ ইহার বাহন। গানগুলি সুরতাল সংযোগে শ্রোতার চিত্তরঞ্জন করিয়াছিল, কিন্তু নাটকের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত নাই। নিম্নশ্রেণীর রসিকতা স্থান-লাভ করিয়াছে। পৌরাণিক বর্ণনার ভিতর দিয়া নাটকীয় রূপ প্রবিষ্ট হয় নাই। ২৫ খানি গান লইয়া ছয় অঙ্কে এখানি সম্পূর্ণ। ইহার পরবর্তীকালে মহাকবি গিরিশচন্দ্র এই একই বিষয় লইয়া সংঘাতপূর্ণ এক অপূর্ব নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। গীতাভিনয়টি অঙ্কে ও দৃশ্যে বিভক্ত হইয়া অপেরার নূতন রূপ লইয়াছে।

উষাহরণ (গীতাভিনয়)

অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগস্ট তারিখে এই পালা২খানি প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তৎপূর্বে পাণ্ডুলিপির আকারে ইহা কয়েকবার অভিনীত হইয়াছিল। নাটক-নাটিকার সহিত গীতাভিনয়ের পার্থক্য দেখাইবার জন্য ইহার কথঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। ইহাতে ৫৭ খানি গান আছে। দৃশ্যের বালাই নাই; পাত্র-পাত্রীরা প্রয়োজন মতো যাওয়া-আসা করে। কবি পাঁচালীর ঢং কি কথোপকথনে, কি সংগীতে সর্বত্র দেখা দিয়াছে। নট-নটী-সূত্রধার-পারিপার্শ্বিক প্রাচীন যাত্রার সমস্তই ইহাতে আছে। ভাবের তরঙ্গ কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে, অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি প্রত্যেক গানে রহিয়া গিয়াছে।

প্রাচীন যাত্রাগানের সহিত তুলনা করিলে পশ্চিমদেশীয় নাটকের আদর্শে সে সকল গীতাভিনয় উদ্ভূত হইতেছিল সেগুলির নাড়ীর যোগ ইহাদের সহিত আছে বলিয়া মনে হয় না, বরং গীতাভিনয়গুলি এইরূপ নূতন নাটকের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে লাগিল। তবে যাত্রার গানের প্রভাব ঐ নূতন প্রসূত নাটকগুলি অতিক্রম করিতে পারে নাই। বাঙ্গালী সংগীতপ্রিয়, তাই বাঙ্গালা নাটকে সংগীতের প্রাবল্য দেখা যায়। মধুসূদনের কালালোচনার সময়ে নাটকের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহাই নাটকের প্রকৃতরূপ। সুধীজন নাটক সমালোচনার সময়ে ঐ কথাগুলি ভুলিবেন না।

নাট্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাল এবং দৃশ্যকাব্যের ইতিহাসে তাঁহার স্থান

(১৮৫৮—১৮৭৪ খৃঃ)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে সময়ে দৃশ্যকাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করিলেন, সে সময় বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের নিতান্ত শৈশবকাল, এমন কি জন্মকাল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার পূর্বে যে সকল দৃশ্যকাব্য বঙ্গের সাহিত্য-আসরে আসিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা বাঙ্গালীর নাট্যপিপাসা মিটে নাই। কেন মিটে নাই, তাহার কারণ সেই সেই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

মধুসূদন এক শুভ মুহূর্তে বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্যের ভাগ্যনিয়ন্তৃরূপে নাট্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ইহার গঠনরীতি নির্ণীত করিলেন। শর্মিষ্ঠাই তাঁহার অবলম্বিত রীতির প্রথম ফল। যদিও এই রীতি পরবর্তীকালের ভূয়োজ্ঞানের পরিমাপে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই এবং তজ্জন্য উত্তরকালের দৃশ্যকাব্যের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন দেখা গিয়াছিল, তথাপি তাহা এত সামান্য যে, আজ পর্যন্ত বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্যসমূহ তাঁহারই গঠনাদর্শে রচিত হইতেছে। ইহা মধুসূদনের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে! এই জন্য নাট্য-সাহিত্যে মধুসূদনের স্থান খুব উচ্চে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার গ্রন্থ-সমালোচকেরা তাঁহার এ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন না। শ্রব্যকাব্যের ইতিহাসে অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তক বলিয়া তাঁহার নাম যেরূপ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে, দৃশ্যকাব্যের ইতিহাসেও তাঁহার নাম, বাঙ্গালা নাটকের ঠিক জনকরূপে না হইলেও পাশ্চাত্যরীতির নাট্য-সাহিত্যের প্রবর্তকরূপে লিখিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য।

শর্মিষ্ঠা

মধুসূদনের প্রথম দৃশ্যকাব্য শর্মিষ্ঠা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রচিত হইয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে পাইক্‌-পাড়ার রাজাদের প্রতিষ্ঠিত বেলগাছিয়া নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল থিয়েটার এই নাটক লইয়া খোলা হইয়াছিল। মধুসূদনের প্রথম মৌলিক দৃশ্যকাব্য বলিয়া ইহার একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। ইহার গঠন-প্রণালী আধুনিক রীতির মতো দেখাইলেও ইহার ভাব ও রুচি প্রাচীন প্রথার অনুবর্তী ছিল। প্রাচীন প্রথানুমোদিত নান্দী, নান্দ্যন্তে সূত্রধার ইত্যাদির সমাবেশ ইহাতে ছিল না বটে, তবে মধুসূদন তাঁহার প্রথম দৃশ্যকাব্যটিকে প্রস্তাবনাহীন করিতে সাহসী হন নাই। একটা নূতন কিছু করিতেছেন তাহার বিজ্ঞাপন দিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবনাটি লিখিত হইয়াছিল :—

"মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়।
যে সময়, দেশময়, নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।
শুন গো ভারতভূমি! কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুম-ঘোর হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।

কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয় ।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে, বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয় ।
সুধারস অনাদরে বিষবারি পান করে
তাহে হয় তনু-মনঃক্ষয় ।
মধু কহে, জাগো মাগো, বিভু স্থানে এই মাগো,
সুরসে প্রবৃত্ত হ'ক্ তব তনয়-নিচয় ।”

এই ধরণের প্রস্তাবনা পরবর্তী-কালের দুই-একজন দৃশ্যকাব্য-প্রণেতা তাঁহাদের কোন কোন দৃশ্যকাব্যে ব্যবহার করিয়াছিলেন। একটা নূতন কিছু বিজ্ঞাপিত করিবার উদ্দেশ্যে ইহার ব্যবহার চলিত।

শর্মিষ্ঠার আরম্ভটি অতিশয় চিত্তাকর্ষক। বিদ্যাসুন্দর, কুলীনকুল-সর্বস্ব এবং রত্নাবলীর অভিনয়-দর্শকেরা সে অভিনব-চিত্র দেখিতে পান নাই। প্রথম দৃশ্যটি হিমালয় পর্বত, দূরে ইন্দ্রপুরী—অমরাবতী। শর্মিষ্ঠার ভাষায় দৃশ্যটির পরিচয় এইরূপ :—“স্থানে স্থানে তরুশাখায় নানা বিহঙ্গমগণ মধুস্বরে গান কচ্চে, চতুর্দিকে বিবিধ বনকুসুম বিকশিত, ঐ দূরস্থিত নগর হ'তে পারিজাত পুষ্পের সুগন্ধ সহকারে মৃদুমন্দ পবন সঞ্চার হচ্চে, আর কখন কখন মধুরকণ্ঠী অপ্সরীগণের তাল-লয়-বিশুদ্ধ সংগীতও কর্ণকুহর শীতল কচ্চে, কোথাও সিংহের নাদ, কোথাও ব্যাঘ্র-মহিষাদির ভয়ঙ্কর শব্দ, আবার কোথাও বা পর্বতনিঃসৃতা বেগবতী নদীর কুল-কুল ধ্বনি হচ্চে ইত্যাদি।” এই সমুদয় দৃশ্যটি দৃশ্যপট, অভিনেতা ও তদুপযুক্ত সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে এক অভিনব চিত্রে চিত্রিত হইয়া বাঙ্গালী দর্শকের চক্ষে অদৃষ্টপূর্ব মনোহর সামগ্রীরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।

শর্মিষ্ঠায় রত্নাবলীর সাদৃশ্য অনেক আছে। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে বারংবার রত্নাবলীর অভিনয় দেখিয়া এবং ঐ নাটিকার ইংরাজী অনুবাদ স্বয়ং সম্পাদন করিয়া মধুসূদনের মানসপটে উক্ত নাটিকার ভাব এরূপ দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, কিছুতেই তিনি তাহা মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই। উভয় গ্রন্থে সাদৃশ্য আসিবার কারণ ইহাই। যোগীন্দ্র বাবু মধুসূদনের জীবন-চরিত গ্রন্থে এই সাদৃশ্য অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

“উভয় গ্রন্থেই দুইজন নায়িকা, জ্যেষ্ঠা অভিমানিনী ও কোপনা, কনিষ্ঠা অভিমানশূন্যা ও মুগ্ধ-স্বভাবা, রূপগুণে জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার নিকট পরাভূতা। উভয় গ্রন্থেই কনিষ্ঠা কিছুদিনের জন্য জ্যেষ্ঠার দাসী; কিন্তু পরিণামে কনিষ্ঠারই জয়। উভয় গ্রন্থেই জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে স্বামীর দৃষ্টিপথ হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। রাজার রূপে উভয় গ্রন্থের নায়িকাই সমান মুগ্ধা। যতদিন কনিষ্ঠাকে না দেখিয়াছিলেন, ততদিন উভয় গ্রন্থের নায়কই জ্যেষ্ঠার প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্ত, কিন্তু কনিষ্ঠাকে দেখিবামাত্র উভয়েরই প্রেম শরতের মেঘের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে।”

এই সাদৃশ্যরক্ষার আরও এক কারণ আছে। মধুসূদন প্রতীচ্যরীতির পক্ষপাতী হইলেও, সংস্কৃতরীতির নাট্যাভিনয় দর্শনে অভ্যস্ত প্রাচীন সম্প্রদায়ের সম্মুখে, তাঁহাদের বিরাগভাজন হইবার

আশঙ্কায়, তাঁহার প্রথম দৃশ্যকাব্য 'শর্মিষ্ঠা'কে আমূল বিলাতী পরিচ্ছদে বাহির করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য রত্নাবলীর সহিত তুলনা করিলে নিম্নলিখিত প্রভেদগুলি নজরে পড়ে। শর্মিষ্ঠার নায়ক রত্নাবলীর নায়কের ন্যায় কেবলমাত্র আদিরসের একান্ত সাধক ছিলেন না, দস্যু হস্তে নিপীড়িত দরিদ্র ব্রাহ্মণের উদ্ধারার্থ বীররসের অভিনয়েও পশ্চাৎপদ হন নাই। ইহার নায়িকা রত্নাবলীর সাগরিকার ন্যায় প্রণয়াস্পদের বিরহবিধুর হইয়াও সেরূপ কাঠিন্যের পরিচয় দেন নাই; প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পরিচারিকা দেবিকার সহিত কথোপকথনকালে শর্মিষ্ঠার সহৃদয়তার বহু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রত্নাবলীর বিদূষক বসন্ত-উৎসবের আমোদে উন্মত্ত হইয়া মদনিকার হস্তধারণপূর্বক নৃত্য করিয়াছিল। শর্মিষ্ঠার বিদূষক তাহার উপর মাত্রা চড়াইয়া রাজার চিত্তবিনোদনার্থ আনীত নটীর চুম্বন-প্রয়াসী পর্যন্ত হইয়াছিল। শ্রীহর্ষদেব বসন্ত উৎসবের আড়ালে এই কার্য করাইয়াছিলেন, সে জন্য তাঁহার 'সাত খুন মাফ', মধুসূদনের কিন্তু সেরূপ কোন কৈফিয়ৎ ছিল না। এইরূপ স্থানে স্থানে ভাব ও রুচির ইতরবিশেষ থাকিলেও শর্মিষ্ঠা প্রাচীন রুচিরই অনুগামিনী ছিল।

শর্মিষ্ঠা প্রকাশিত হইবার পর তৎকালীন সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিতমণ্ডলী 'ইহা কিছুই হয় নাই' একবাক্যে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। যোগীন্দ্রবাবু তাঁহার মধুসূদনের জীবন চরিত গ্রন্থে পূর্বোক্ত পণ্ডিতদের নির্দেশিত 'দুঃশ্রবত্ব', 'চ্যুতসংস্কারত্ব', 'নিহতার্থত্ব', 'অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ' প্রভৃতি অলংকার-শাস্ত্রোক্ত দোষ-নিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। মনে হয় 'শর্মিষ্ঠা' পড়িয়া তাঁহারা এই মত প্রকাশ করেন নাই। বাঙ্গালা ভাষার বর্ণজ্ঞানহীন মধুসূদন নাটক লিখিতে অক্ষম এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই তাঁহারা ঐরূপ বলিয়া থাকিবেন। কারণ আমরা অলংকারশাস্ত্রের সাহায্যেই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষার বর্ণজ্ঞানশূন্য হইয়াও কিরূপ দক্ষতার সহিত শর্মিষ্ঠা রচনা করিয়াছিলেন। মধুসূদন কোন কালেই 'সাহিত্যদর্পণ' প্রণেতা বিশ্বনাথের পক্ষপাতী ছিলেন না; কিন্তু অলংকার শাস্ত্রানুমোদিত দৃশ্যকাব্যের লক্ষণচয় তাঁহার অজ্ঞাতসারেই শর্মিষ্ঠায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। রত্নাবলীর পুনঃ পুনঃ অভিনয় দেখিয়া তাঁহাকে উক্ত রীতি গ্রহণ করিতে শিখাইয়াছিল।

মধুসূদন তাঁহার শর্মিষ্ঠাকে নাটক নামে অভিহিত করিলেও ইহা নাটিকা-লক্ষণাক্রান্ত। সাহিত্যদর্পণকার নাটিকার লক্ষণ বলিয়াছেন:—

"নাটিকা কৢপ্তবৃত্তা স্যাৎ স্ত্রীপ্রায়া চতুরঙ্কিকা।
প্রখ্যাতো ধীরললিতস্তত্র স্যান্নায়কো নৃপঃ॥
স্যাদন্তঃপুর সম্বন্ধা সংগীতব্যাপৃতোঽথবা।
নবানুরাগা কন্যাত্র নায়িকা নৃপবংশজা॥
সম্প্রবর্তেত নেতাঽস্যাং দেব্যাস্ত্রাসেন শঙ্কিতঃ।
দেবী পুনর্ভবেজ্জ্যেষ্ঠা প্রগল্ভা নৃপবংশজা॥
পদে পদে মানবতী তদ্বশঃ সঙ্গমোদ্বয়োঃ।
বৃত্তিঃ স্যাৎ কৌশিকী স্বল্প বিমর্ষাঃ সন্ধয়ঃ পুনঃ॥"

শর্মিষ্ঠা যদিও মহাভারতের ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছে, তথাপি মধুসূদন তাহা আমূল গ্রহণ করেন নাই; ইচ্ছামত গ্রহণ করায় ইহা কবিকল্পিত হইয়াছে। শর্মিষ্ঠা যে, স্ত্রীচরিত্র-প্রধানা সে

বিষয়ের পরিচয় অনাবশ্যক। মধুসূদন ইহা পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত করিয়াছেন, সুতরাং সাহিত্যদর্পণকারের হিসাব হইতে এক অঙ্ক ইহাতে বেশি আছে, কিন্তু এ ত্রুটি নগণ্য। ইহার নায়ক যযাতি প্রখ্যাতচরিত্র ও ধীরললিত লক্ষণাক্রান্ত (অর্থাৎ নিশ্চিন্ত মৃদু এবং গীতবাদ্যপরায়ণ)। যদিও দস্যুদমন কালে ধীরোদ্ধতের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা মাত্র একটি স্থানে। সুতরাং তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইহার নবানুরাগিণী কুমারী নায়িকা শর্মিষ্ঠা নৃপবংশজা, অন্তঃপুরচারিণী ও সংগীতব্যাপৃতা। জ্যেষ্ঠা পত্নী দেবযানীও উচ্চবংশসম্ভূতা, প্রগল্‌ভা এবং পদে পদে মানবতী। সেই পত্নীর ত্রাসে যযাতি সর্বদা সশঙ্ক থাকিতেন। শর্মিষ্ঠা ও যযাতির মিলন জ্যেষ্ঠা পত্নীর কর্তৃত্বে সম্পাদিত হইয়াছিল। কৌশিকীবৃত্তি নাটিকাতে থাকা আবশ্যক এবং পঞ্চসন্ধির মধ্যে বিমর্ষসন্ধি নাটিকায় কম থাকে।

সামান্য ইতরবিশেষ থাকিলেও শর্মিষ্ঠা প্রধানতঃ উল্লিখিত লক্ষণাক্রান্তা হওয়ায় ইহার স্থান নাটিকা পর্যায়ের ভিতরে অবিসংবাদিতরূপে দেওয়া যায়। এই মত দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য অলংকার শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের আর একটু ভিতরে প্রবেশ করা যাক্। কৌশিকী বৃত্তি এবং সন্ধি শর্মিষ্ঠায় কিরূপভাবে আছে প্রথমে তাহারই আলোচনা করিতেছি। সাহিত্য-দর্পণকার কৌশিকী বৃত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন:—

"যা শ্লক্ষ্নেপথ্য বিশেষচিত্রা
স্ত্রীসঙ্কুলা পুষ্কল নৃত্যগীতা।
কামোপভোগ প্রভবোপচারা
সা কৌশিকী চারুবিলাসযুক্তা॥"

মনোরম সাজসজ্জা শোভা, স্ত্রীসংকুলতা, নৃত্যগীতবাহুল্য, কামভোগোপচার এবং চারুবিলাস যে সব ব্যাপারে অর্থাৎ নায়কাদির চেষ্টাবিশেষে বর্তমান থাকে তাহাই কৌশিকীবৃত্তি। নর্ম, নর্মস্ফুর্জ, নর্মস্ফোট এবং নর্মগর্ভ নামে কৌশিকীবৃত্তির চারিটি অঙ্গ আছে।

(১) নর্ম—বৈদগ্ধ্যক্রীড়াই নর্ম। যযাতি দেবযানীকে দর্শন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলে পর কোন নির্জন গৃহে চিত্তবিকারজনিত চিন্তামগ্ন ছিলেন। সেখানে বিদূষকের সহিত নানাবিধ প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দেবযানীর প্রতি মহারাজের অনুরাগ বুঝিতে পারিয়া সহাস্যবদনে বিদূষক এইরূপ বলিতেছে:—"এমন কিছু নয়, তবে তা'হলে রাজলক্ষ্মীর নিকট বিদায় হোন্। রাজদণ্ড পরিত্যাগ ক'রে বীণাগ্রহণ করুন, আর রাজবৃত্তির পরিবর্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করুন।"

রাজা—"কেন? কেন?"

বিদূ—"বয়স্য! আপনি কি জানেন না লক্ষ্মী সরস্বতীর সপত্নী! অতএব ভূমণ্ডলে সপত্নীপ্রণয় কি সম্ভব?" ইত্যাদি।

বিদূষকের বাক্‌চাতুর্যই এখানে শুদ্ধহাস্য নর্ম হইয়াছে।

(২) নর্মস্ফুর্জ—আরম্ভে সুখ কিন্তু ভয়ে সমাপ্ত নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলন নর্মস্ফুর্জ। শর্মিষ্ঠার সহিত মিলনে যযাতির যে সুখ হইয়াছিল, দেবযানী সেই সুখের বিষয় জানিতে পারায় চতুর্থাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে বিদূষকের সহিত রাজার ভীতিসংকুল কথাবার্তাই এখানে নর্মস্ফুর্জ।

(৩) নর্মস্ফোট—লেশমাত্রভাবে অনুরাগের অল্পসূচনাকে নর্মস্ফোট বলে। গোদাবরীতীরস্থ পর্বতমুনির আশ্রমে অশোক বৃক্ষতলে চিন্তামগ্ন শর্মিষ্ঠাকে দেখিয়া যযাতির মনে যে প্রথম অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহাই নর্মস্ফোট।

(৪) নর্মগর্ভ—ছদ্মবেশী নায়কের রসানুকূল ব্যবহার নর্মগর্ভ নামে অভিহিত। শর্মিষ্ঠার নর্মগর্ভ অঙ্গের অস্তিত্ব নাই। শর্মিষ্ঠার প্রতি যযাতির প্রণয় ঘটিত কথা অবগত হইয়া দেবযানী ছদ্মবেশে রাজপুরী ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নায়ক ছদ্মবেশে কোনরূপ রসানুকূল ব্যবহার না করায় ইহাকে ঠিক নর্মগর্ভ বলা যায় না।

উল্লিখিত চারি অঙ্গ ব্যতীত কৌশিকীবৃত্তির অন্তবিধ লক্ষণ আছে যথা—মনোরম সাজসজ্জাশোভা স্ত্রীসংকুলতা, নৃত্যগীতবাহুল্য, কামভোগোপচার ও চারুবিলাস প্রভৃতি অবশিষ্ট অঙ্গবিশেষ ওতপ্রোতভাবে শর্মিষ্ঠার বিজড়িত রহিয়াছে। এগুলি স্বতঃসিদ্ধ, ইহাদের উদাহরণ-প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। নাটিকার অন্যান্য লক্ষণও শর্মিষ্ঠার পূর্ণমাত্রায় আছে। পরে পরে সেগুলি প্রদর্শিত হইতেছে। শর্মিষ্ঠা পঞ্চসন্ধি সমন্বিত। সমগ্র গ্রন্থটি এক প্রয়োজনসিদ্ধির অভিমুখে ধাবিত হইবে এবং সেই মুখ্য প্রয়োজনের যে সকল অবান্তর প্রয়োজন আছে, তাহার সহিত মধ্যে মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকিবে তাহাই সন্ধি। এই সন্ধিগুলি মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি ভেদে পাঁচ প্রকার।

(১) মুখ—যে ঘটনায় মুখ্যফলের বীজ উৎপন্ন হয় তাহাই মুখসন্ধি। পর্বতমুনির আশ্রমে যযাতি ও শর্মিষ্ঠার প্রথম দর্শনজনিত পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বীজোৎপত্তিমূলক মুখসন্ধি।

(২) প্রতিমুখ—স্পষ্টাস্পষ্টভাবে বীজোদ্ভেদই প্রতিমুখ সন্ধি। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে যযাতি ও শর্মিষ্ঠার প্রণয় দেবিকার নিকট স্পষ্টভাবে উদ্ভিন্ন, কিন্তু বিদূষক ও দেবযানীর কাছে তখন ইহা অস্পষ্টভাবে উদ্ভিন্ন রহিল। এইরূপ স্পষ্টাস্পষ্ট বীজোদ্ভেদই শর্মিষ্ঠার প্রতিমুখ সন্ধি।

(৩) গর্ভ—একাধিকবার হ্রাস ও অন্বেষণমিশ্রিত অনুরাগ-সমুদ্ভেদ ইহার গর্ভসন্ধি। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রাজান্তঃপুরস্থ উদ্যানমধ্যে যযাতির সহিত শর্মিষ্ঠার প্রথম প্রেমালাপ রাজমহিষীর ভয়ে কথঞ্চিৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং চতুর্থাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে শর্মিষ্ঠার গুপ্ত-প্রণয়-ব্যাপার দেবযানীর কর্ণগোচর হওয়ায় রাজা ও বিদূষকের শঙ্কাসূচক কথাবার্তা দ্বারা উহা পুনরায় হ্রাস পাইয়াছিল। গোদাবরী-তীরে শর্মিষ্ঠাকে দেখিবার পর রাজার পুনরায় তাঁহাকে দেখিবার সাধ হয় এবং সেই সাধ মিটাইবার আশায় তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে শর্মিষ্ঠার জন্য যযাতির অন্বেষণের কথাও আছে। এইরূপ একাধিকবার হ্রাসান্বেষণ-মিশ্রিত অনুরাগ-সমুদ্ভেদই শর্মিষ্ঠার গর্ভসন্ধি।

(৪) বিমর্ষ—গর্ভসন্ধি অপেক্ষা অধিক উদ্ভিন্ন অনুরাগাদি মুখ্যফলোপায় অভিশাপাদি বিঘ্নে অভিভূত হইলে বিমর্ষসন্ধি উৎপন্ন হয়। চতুর্থাঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে শর্মিষ্ঠার অনুরাগ রাজার ক্ষণবিরহ-জনিত বিলাপ দ্বারা পূর্ববর্ণিত গর্ভসন্ধি অপেক্ষা যখন অধিক স্ফুরিত হইয়াছিল, ঠিক তখন দেবযানীর গৃহত্যাগের সংবাদে উভয়ের মন মহাতেজস্বী শুক্রাচার্যের অভিশাপাদি ত্রাসে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং পরে যযাতি অভিশাপ প্রভাবে জরাগ্রস্তরূপ বিঘ্নেও অভিভূত হইয়াছিলেন। এই ক্রিয়াসমষ্টিদ্বারা বিমর্ষসন্ধি উৎপন্ন হইয়াছিল। সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন—'নাটিকা স্বল্পবিমর্ষা:' অর্থাৎ নাটিকায় বিমর্ষসন্ধি অল্প থাকিবে। মধুসূদন কিন্তু বিশ্বনাথের এ আদেশ সম্যক পালন করেন নাই। যযাতির জরাপ্রাপ্তি এবং তাঁহার সন্তানদের উপর অভিশাপ প্রভৃতি ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা বিমর্ষসন্ধি স্বল্প না হইয়া

প্রভূত হইয়াছিল। মধুসূদন উত্তরকালে কৃষ্ণকুমারীর স্তায় বিষাদান্ত নাটক রচনা করিবার আশা রাখিতেন, তাই বিমর্ষসন্ধির প্রতি তাঁহার এতাদৃশ অনুরাগ দেখা গিয়াছিল।

(৫) উপসংহৃতি—বীজবান্ মুখাদি সন্ধ্যর্থ যথাযথভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া একার্থরূপ প্রয়োজনে আসিলে উপসংহার সন্ধি হয়। শর্মিষ্ঠা নাটিকার মুখাদি সন্ধ্যর্থ যথাযথভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে শর্মিষ্ঠার সহিত যযাতির মিলনরূপ একার্থে আসিয়া উপসংহার সন্ধি সৃষ্টি করিয়াছে।

অলংকার শাস্ত্রের আরও কতকগুলি নিয়ম আছে। দেখা যাক্, সেগুলি শর্মিষ্ঠায় কিরূপভাবে রক্ষিত হইয়াছে। সেগুলি এই :—

বিষ্কম্ভক—অতীত বা ভবিষ্যৎ ঘটনার সূচনা ইহাতে থাকে। অঙ্কের প্রথমেই ইহার সন্নিবেশ হয়। মধ্যম পাত্র বা মধ্যম পাত্রদ্বয়, অথবা একজন মধ্যম ও একজন অধম পাত্র বিষ্কম্ভকে প্রবেশ্য। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে বকাসুর ও দৈত্যের কথোপকথনে শর্মিষ্ঠার অতীত এবং দেবযানীর দাসিত্বরূপ তাঁহার ভবিষ্যৎ ঘটনারও সূচনা ইহাতে আছে। বকাসুর ও দৈত্য মধ্যম পাত্রদ্বয় দ্বারা ইহা সূচিত হইয়া শুদ্ধ বিষ্কম্ভক হইয়াছে।

প্রবেশক—ঠিক বিষ্কম্ভকের মতো, কেবল প্রথম অঙ্কে প্রবেশক হয় না এবং প্রবেশকের পাত্র অধম। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমেই নাগরিকেরা দেবযানীর জন্য অধীরচিত্ত যযাতিকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল বাক্যালাপ করিয়াছিল, তাহাতে যযাতির দেবযানী-প্রণয় সূচিত হইয়াছে। এখানে নাগরিকেরা সাধারণ লোক, সুতরাং পাত্রও অধম।

পতাকাস্থান— "সহসৈবার্থ সম্পত্তির্গুণবত্যুপচারতঃ।
পতাকাস্থানকমিদং প্রথমং পরিকীর্তিতম্॥" ইত্যাদি।

কোন এক বিষয়ের চিন্তামূলক ব্যবহারের বা বাক্যপ্রয়োগের সহিত চিন্তিত বিষয়ের স্বাধর্মসম্পন্ন অতর্কিত বিষয়ান্তরের সম্বন্ধ ঘটিলে প্রথম পতাকাস্থান বুঝিবে। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বিদূষক ও মহারাজের সংলাপের মধ্যে দেবযানীকে লক্ষ্য করিয়া—'ক্ষত্রিয় দুষ্প্রাপ্য। মহর্ষি কন্যা প্রাপ্তি' ইত্যাদি চিন্তামূলক ব্যবহারের বা বাক্যপ্রয়োগের সহিত এই চিন্তিত বিষয়ের স্বাধর্মসম্পন্ন—'আহা সখে। তাঁর সহচরীদের মধ্যে একটি যে স্ত্রীলোক আছে, তার রূপ-লাবণ্যের কথা কি বলিব' ইত্যাদি অতর্কিত বিষয়ান্তরের সম্বন্ধ হওয়ায় সুন্দর পতাকাস্থান হইয়াছে।

পূর্বোক্ত বিশ্লেষণে দেখা গেল যে, ঈষৎ পরিবর্তন ছাড়া শর্মিষ্ঠা সর্বতোভাবে সংস্কৃত নাটিকারই লক্ষণোপেত। পূর্ববর্ণিত সংস্কৃতাভিমানী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা কেবলমাত্র অলংকারশাস্ত্রের সপ্তম পরিচ্ছেদান্তর্গত দোষবিভাগের কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিয়া শর্মিষ্ঠার দোষ নির্দেশ করিয়াছিলেন। অষ্টম পরিচ্ছেদ-বর্ণিত গুণবিভাগ তাঁহারা স্পর্শ করেন নাই। আনুবীক্ষণিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া খুঁজিলে 'নিহতার্থত্ব', 'অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ', 'চ্যুতসংস্কারত্ব' দোষের দুই-চারিটির সন্ধান হয়তো মিলিতে পারে। বিশেষভাবে অনুধাবন করিলে অতি অল্পস্থানেই 'দুঃশ্রবত্ব' দোষের সন্ধান পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত সমুদয় রচনাই প্রসাদগুণসম্পন্ন, এবং স্থানে স্থানে মাধুর্যগুণ বেশ ফুটিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থল :—তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দেবযানী ও যযাতির সংলাপ এবং চতুর্থাঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে শর্মিষ্ঠা ও যযাতির বাক্যালাপ। উক্ত পণ্ডিতগণ নাটক সমালোচনা করিতে বসিয়া অলংকার শাস্ত্রের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ কেন পরিত্যাগ

করিলেন, বুঝা কঠিন। বোধ হয় শর্মিষ্ঠার ন্যায় নগণ্য নাটিকার সমালোচনায় অলংকার শাস্ত্র কলঙ্কিত হইতে পারে এইরূপ কোন ধারণা উঁহার মূলে বিদ্যমান ছিল।

দৃশ্যকাব্যের ইতিহাসালোচনার খাতিরে উপরিউক্ত তীব্র মন্তব্য করা হইল, সুধীজন ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন।

পদ্মাবতী

পূর্বে বলা হইয়াছে যে সাধারণের সহানুভূতি হারাইবার ভয়ে মধুসূদন তাঁহার নাটকে আমূল বিলাতী-পদ্ধতি আনিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু যখন দেখিলেন শর্মিষ্ঠা সাধারণের উপেক্ষার বস্তু হয় নাই, বরং প্রীতিকরই হইয়াছে, তখন তাঁহার দ্বিতীয় নাটক পদ্মাবতী আসরে নামিল। ইহার রচনা-কাল আনুমানিক ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে পাথুরিয়াঘাটার কোন বড় মানুষের বাড়ীতে পদ্মাবতী-নাটকখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। শর্মিষ্ঠার সাফল্যে সাহসী হইয়া পদ্মাবতীর উপাখ্যান-ভাগের জন্য মধুসূদন হিন্দু পুরাণ ছাড়িয়া গ্রীক পুরাণের ছায়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনীষা সেই উপাখ্যানটিকে এরূপ হিন্দু আকার দিয়াছিল যে গ্রীক পুরাণানভিজ্ঞের সাধ্য নাই যে ইহার হিন্দুত্বে সন্দিহান হন্। বিলাতী নাটকের আদর্শে মধুসূদন পদ্মাবতীকে শর্মিষ্ঠা অপেক্ষা বৈচিত্র্যময়ী করিয়াছিলেন। প্রাচীন নাটকসমূহের মধ্যে সংস্কৃতভাষায় রচিত 'মৃচ্ছকটিক', 'মুদ্রারাক্ষস' এবং 'হরিশ্চন্দ্র' ব্যতীত কি সংস্কৃত, কি বাঙ্গালা কোন ভাষারই দৃশ্যকাব্যে এত বৈচিত্র্য ইতঃপূর্বে ছিল না।

শর্মিষ্ঠার ন্যায় পদ্মাবতীও স্ত্রীচরিত্র প্রধান। তবে শর্মিষ্ঠা মাত্র দুইজন নায়িকার লীলানিকেতন, আর পদ্মাবতী স্বয়ং নায়িকাপদবাচ্যা হইলেও তিনজন দেববালার ক্রীড়াপুত্তলিকা ছিলেন। ঐ দেববালাদের মধ্যে শচীদেবীর চরিত্রটি মধুসূদন বিলাতী ছাঁচে ঢালিয়াছেন। ইতঃপূর্বে বাঙ্গালা বা সংস্কৃত নাটকে এরূপ প্রকৃতির চরিত্র দৃষ্টিগোচর হয় নাই। স্ত্রীসুলভ কোমলতাই প্রাচীন নাট্যকবি-বর্ণিত স্ত্রীচরিত্রের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় ছিল; কিন্তু মধুসূদন ঐ কোমলতার অন্তরালে কঠোরতা এবং সরলতার স্থানে কুটিলতা আনিয়া তাহারই একটি মূর্তিমতী চিত্র ঐ শচীদেবীর চরিত্রে অঙ্কিত করিলেন। শর্মিষ্ঠার মতো পদ্মাবতীর স্ত্রীচরিত্রগুলিও মধুসূদনের হাতে বেশ ফুটিয়াছিল। নিজের মনীষাবলে এবং রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত স্ত্রীপ্রধান শকুন্তলা, রত্নাবলী প্রভৃতি নাটক-নাটিকার অভিনয় দেখিয়া মধুসূদন স্ত্রীচরিত্র-চিত্রণে সমধিক দক্ষতা দেখাইয়াছেন।

পদ্মাবতীর দৃশ্য বা অঙ্ক-যোজনার দোষ-গুণ

শর্মিষ্ঠা বা পদ্মাবতীতে মধুসূদন নিপুণতার সহিত দৃশ্যবিভাগ দেখাইতে পারেন নাই। দুই বা ততোধিক দৃশ্যের বর্ণনীয় বিষয় একই দৃশ্যে দেখাইয়াছেন, ইহাতে একজন পাত্র বা পাত্রী যখন সংলাপে নিযুক্ত থাকে, তখন ঐ দৃশ্যের অপর দলের কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মতো দাঁড়াইয়া থাকা-ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। নাটকের সজীবতা ইহাতে নষ্ট হয় এবং পাঠক বা দর্শকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত না হইয়া হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। মনে হয়, সংস্কৃত-দৃশ্যকাব্যের অনুকরণে মধুসূদন তাঁহার নাট্যগ্রন্থে দৃশ্য-যোজনা করিয়া থাকিবেন। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে অঙ্কের মধ্যে পৃথক দৃশ্যযোজনা নাই, এবং অঙ্কের প্রারম্ভেও কোন স্থান বিশেষভাবে নির্দিষ্ট

থাকে না। পাত্র-পাত্রীরা অঙ্কের মধ্যে প্রয়োজন মতো প্রবিষ্ট ও নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়। তাহাদের বর্ণনার মধ্য হইতেই ক্রিয়ার স্থান বা সময় নির্ণয় করিয়া লইতে হয়। এই কারণেই বোধ হয় সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের বিবিধ গুণসত্ত্বেও কৃত্রিমতাকে সে স্থানে-স্থানে অতিক্রম করিতে পারে নাই। বহুস্থলে এটি দোষের কারণ হইলেও সকল স্থলে সেরূপ হয় না। রত্নাবলী নাটিকায় দেখা গিয়াছে যে, ইহার ক্রিয়া প্রথমদিনের সন্ধ্যার প্রাক্কালে আরম্ভ হইয়া তৃতীয় দিনের কিয়দংশ কাল-মধ্যে নির্বাহিত হইয়াছিল; সুতরাং ইহার সংযোগস্থল রাজার প্রাসাদমধ্যস্থ কদলীগৃহ, উদ্যান, রাজান্তঃপুর প্রভৃতি কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান-মাত্র, এবং ঐগুলি পৃথকভাবে উল্লিখিত না হইলেও সাধারণের বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হয় না।

অঙ্ক-বিভাগে মধুসূদন সংস্কৃত নাট্যকবির অন্ধ অনুকরণ করেন নাই। তিনি তাঁহার নাটকান্তর্গত বিষয়গুলিকে গর্ভাঙ্করূপ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক খণ্ডের উপরিভাগে সেই গর্ভাঙ্কের সংযোগ-স্থলের নামকরণও করিয়াছিলেন। এ সকল অনুষ্ঠান-সত্ত্বেও তিনি দৃশ্য-যোজনায় পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই, কারণ ইহার একটি দৃশ্যে এমন অনেক বিষয় আছে যাহা দৃশ্যান্তরে দেখাইলেই শোভন হইত; 'দৃশ্য' এই পদের পরিবর্তে 'গর্ভাঙ্ক' পদ মধুসূদন তাঁহার অগ্রগামী নাট্যকার রামনারায়ণের কাছে পাইয়াছেন, সুতরাং এজন্য তিনি দায়ী নহেন, অনুকারীমাত্র।

শর্মিষ্ঠা নাটিকায় যযাতির শাপোৎসর্গ ব্যতীত অপর সকল বিষয়ে মধুসূদন সংস্কৃত আলংকারিকদের অনুমোদিত পথে বিচরণ করিয়াছিলেন। পদ্মাবতীতে কিন্তু সেরূপ করেন নাই। স্থায়ীরসের বিরোধীরসেরও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-দর্পণকার বলিয়াছেন—"আদ্যঃ করুণবীভৎস রৌদ্র বীরভয়ানকৈঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ করুণ, বীভৎস, রৌদ্র, বীর এবং ভয়ানক রস আদিরসের বিরোধী রস। সুতরাং আদিরসের বর্ণনায় ঐগুলি স্থান পাইবে না। পদ্মাবতী আদিরসপ্রধান নাটক। ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতী দেববালার ক্রোধে পড়িয়া যেরূপ লাঞ্ছনা-ভোগ করিয়াছিলেন তাহাতে করুণরসের উদ্দীপনা যথেষ্টই হইয়াছে। শচীদেবী ও কলিদেব তাহাদের উপর যেরূপ রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে রৌদ্ররসের অভিনয়ও কম হয় নাই। মধুসূদনের এই সকল প্রাচীন নাট্যরীতি সম্বন্ধীয় ব্যভিচার দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি ধীরে ধীরে আলংকারিক শৃঙ্খল খুলিয়া ফেলিতেছিলেন।

পদ্মাবতী নাটকের স্থানে-স্থানে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করিয়া মধুসূদন সংলাপের ভাব-গাম্ভীর্য দেখাইয়াছেন; এবং ভবিষ্যতে দৃশ্যকাব্য পুরাপুরি ঐ ছন্দে লেখা যায় কিনা তাহা বুঝিবারও চেষ্টা ইহাদ্বারা করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মধুসূদন বহু উপায়ে নাট্যসাহিত্যের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পদ্মাবতীতে যেটুকু বাঁধাবাঁধি ছিল কৃষ্ণকুমারীতে তাহাও রহিল না। ইহাতে নাট্যকবির অবাধ-কল্পনা বিস্তৃতপক্ষ বিহঙ্গমের মতো উন্মুক্ত আকাশে পরিভ্রমণ করিয়াছে, এবং ইহার নাটকীয় চরিত্রগত ভাবরাজিও রাজান্তঃপুর রূপ গণ্ডি ছাড়াইয়া বাহিরের আবহাওয়ায় মিশিয়াছে। ইহার নায়ক নারীসেবা পরিত্যাগ করিয়া দেশমাতৃকা ও কুলগৌরবের সেবা করিয়াছেন। ইহার নায়িকা প্রণয়বিধুর হইয়াও পিতৃলাঞ্ছনাকারী প্রণয়াস্পদের অঙ্কশায়িনী হওয়ার চেয়ে পিতৃকুলের সম্মানরক্ষার্থ

জীবন বলি দিয়াছেন। ইহার প্রতিনায়কদ্বয়ের মধ্যে একজন যোদ্ধবেশে নেপথ্যেই ছিলেন, রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইবার সুযোগ পান নাই। অপরজন নায়িকালাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া আযৌবন-সেবিত লাম্পট্য ত্যাগ করিয়া রাজোচিত বীর্যে বিভূষিত হইয়াছিলেন। ইহার মন্ত্রিদ্বয় স্বধর্মনিরত এবং রাজা ও রাজত্বের মঙ্গলকামী। ইহার বিলাসবতী ও মদনিকা চরিত্রদ্বয় মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনা ও মদনিকার ছায়াপাতে সৃষ্ট হইলেও কার্যস্রোতে ভিন্ন পথে গিয়াছে। বসন্তসেনার চারিত্রিক কোমলতা ছাড়া অপর কোন গুণই বিলাসবতীতে প্রতিফলিত হয় নাই। বসন্তসেনার লালসা গুণজ, বিলাসবতীর উহা কামজ, বসন্তসেনা গ্রন্থ-শেষে হত্যাপরাধ হইতে চারুদত্তকে উদ্ধার করিয়া নিজের অভীষ্টবস্তু লাভ করিয়াছিল। বিলাসবতী নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ হইতেই জগৎসিংহের উপভুক্ত। তবে স্ত্রীসুলভ কোমলতার অভাব তাহার ছিল না। ধনদাস যখন জগৎসিংহের ক্রোধে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিল, সে সময়ে বিলাসবতীর আন্তরিক যত্নে তাহার জীবন রক্ষা পাইয়াছে।

মদনিকার চরিত্রটি এক অপরূপ কৌশলে সৃষ্ট হইয়াছে। ইহারই কুহকে পড়িয়া উদয়পুররাজ ভীমসিংহ স্নেহের প্রতিমা কৃষ্ণাকে অকালে বিসর্জন দিয়াছেন, মহামহিমময়ী সাধ্বী রাজ্ঞীকে কন্যাশোকে মোহ্যমানা অবস্থায় হারাইয়াছেন, অবশেষে নিজেও রাজনৈতিক ও পারিবারিক দুশ্চিন্তায় বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া জীবন্মৃত হইয়াছিলেন। ক্ষুদ্র ধনদাসকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে মদনিকা যে কৌশলের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে পড়িয়া ধনদাস তো সর্বস্বান্ত হইয়াছিলই, অধিকন্তু উদয়পুর রাজপরিবারও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। নাট্যকার মদনিকা চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এরূপ নিপুণতার সহিত এই শোকপরম্পরা দেখাইয়াছেন যে, কোন স্থানে নাটকীয় সৌন্দর্য অপহৃত হয় নাই। নাটকটি বিষাদান্ত হইবে বলিয়া আরম্ভ হইতে বিষাদের রেখা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো উদয়পুর-রাজগৃহে বিদ্যমান রাখিয়াছেন। ইহার তপস্বিনী চরিত্রটি মালতীমাধবের সংসারত্যাগিনী কামন্দকীর মতো সংসারাশ্রমের বাহিরে থাকিয়াও সংসার লইয়া বিব্রত ছিলেন। এই চরিত্রের অনুপাতে ভাবী নাটকে অনেক চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে। ধনদাস ওথেলোর ইয়াগো চরিত্রের ছায়াপাতে সৃষ্ট, তবে ইহার নৃশংসতার ক্ষেত্র তত বিশাল ছিল না।

কৃষ্ণকুমারীর আত্মহত্যা ব্যাপারটি পাপ দ্বারা কলুষিত হয় নাই। বংশের মর্যাদারক্ষা যে আত্মত্যাগের মূলে বিদ্যমান থাকে সে আত্মঘাতিনীর কাছে সর্ববিধ বিসর্জনই মূল্যবান্—প্রাণ তো তাহারই চরম দান। নাট্যকার এক অভিনব কৌশলে নায়িকার প্রাণনাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সে কৌশলটি মন্ত্রীমহাশয় আনীত একখানি পত্র। পত্রমধ্যে কৃষ্ণার প্রাণনাশের কথা ছিল। এই পত্রখানি পাইয়া ভীমসিংহ ও বলেন্দ্র সিংহ যেরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিছুদিন পূর্বে কৃষ্ণাও স্বপ্নযোগে তাঁহাদের বংশের নারী পরলোকগতা পদ্মিনীর আহ্বানে সেরূপ বা ততোধিক চমৎকৃতা হইয়াছিলেন। মধুসূদন কিন্তু এই দুই ঘটনা এরূপ কৌশলের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণকুমারীর দেহ-বিসর্জন-সম্বন্ধে বা ভীমসিংহের তাহাতে সম্মতিদানের বিরুদ্ধে কেহ কোনরূপ ইঙ্গিত করিতে সাহসী হয় নাই।

ইহার রচনাকাল ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট তারিখে আরম্ভ হইয়া ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে শেষ হইয়াছিল। ইহার গানগুলি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত এরূপ কিংবদন্তী আছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি সোমবার এই নাটকখানি শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটির রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

মধুসূদনের দৃশ্যকাব্যের দোষ

পূর্ব আলোচনায় মধুসূদনের নাটকসমূহের গুণাবলি প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে দোষাবলির অনুসন্ধান করা যাক্। মধুসূদনের নাট্যশিক্ষার হাতেখড়ি শর্মিষ্ঠায় হইয়াছিল, কৃষ্ণকুমারীতে তাহারই পরিণতি। তাঁহার নাট্যকলাকৌশল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া কৃষ্ণকুমারীতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু কি শর্মিষ্ঠায়, কি পদ্মাবতীতে, কি কৃষ্ণকুমারীতে নাটকের রসমূর্ত চরিত্রাবলি মধুসূদন দক্ষতার সহিত সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণকুমারীতে ইহার চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র, কৃতকার্যতা লাভ হয় নাই। অপরিণত কুসুমকলি যেমন আলো-অন্ধকারের সাহায্যে ক্রমে-ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া লোক-লোচনের আনন্দপ্রদ হয়, নাটকীয় চরিত্রও সেইরূপ নানারূপ বৈধ ও অবৈধ ঘটনার ঘাত ও প্রতিঘাতে বিকশিত হইয়া পাঠক বা দর্শকের প্রীতিবর্ধন করে। মধুসূদনের কোন নাটকীয় চরিত্রই এইরূপভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই, সেগুলি যেন ফুটিতে-ফুটিতে ফুটিল না, এরূপ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রবাবুর ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায়,—"অতি কমনীয় মূর্তি ক্ষীণাঙ্গ দেখিলে যেমন ক্লেশ বোধ হয়, মধুসূদনের নাটকীয় চরিত্রগুলি আলোচনা করিলে, সেইরূপ ক্ষোভ জন্মে। মনে হয় যেন পরিবর্ধিত হইতে হইতে হইল না,—যেন আরও দুই একটি কথা বলিলে, আরও দুই একটি ঘটনার সমাবেশ করিলে তাহাদিগের পূর্ণতা হইত।"

শর্মিষ্ঠা পৌরাণিক নাটিকা। পৌরাণিক ভিত্তির উপর ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; দেবযানীর দাসীত্বলাভ হইতে আরম্ভ করিয়া যযাতির জরাপ্রাপ্তি পর্যন্ত ঘটনাবলির উল্লেখ মধুসূদন শর্মিষ্ঠায় করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহার ক্ষেত্র অপরিসর। মধুসূদন তাঁহার সাহিত্যসেবার প্রথম উদ্যমে ঐ অল্প পরিসরের মধ্যে নাটকীয় চরিত্র-গঠনের নিপুণতা দেখাইতে পারেন নাই। ইহার পরবর্তী নাটক পদ্মাবতীতে আখ্যায়িকা বিষয়ে পৌরাণিক বন্ধন না থাকিলেও বিষয়-বৈচিত্র্যের দিকে নজর রাখায় চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারীতে কিন্তু চরিত্রসৃষ্টির দিকে লক্ষ্য থাকিলেও পূর্ণাবয়বসম্পন্ন চরিত্র একটিও সৃষ্ট হয় নাই। ভীমসিংহের সুর বিষাদান্ত নাটকের সুরের সহিত খাপ খাইলেও তাহার চরিত্রের একদেশমাত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। যে ঘটনার উপপ্লবে ভীমসিংহ সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, এবং যাহাতে তাঁহার সুখ-শান্তি চিরলুপ্ত হইয়াছিল তাহার কোন চিত্র নাটকের মধ্যে স্থান পায় নাই। ঐরূপ কোন চিত্রের সমাবেশ থাকিলে তাঁহার অপর মানসিক বৃত্তির সহিত পাঠক বা দর্শকের পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিত, এবং তাহা তাঁহার চরিত্রোন্মেষের সহায়ক হইত। কৃষ্ণা-চরিত্রটি বেশ ফুটিয়াছে; কিন্তু—"যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা থাকে না"—স্বর্গতা পদ্মিনীর এইরূপ তত্ত্বপূর্ণ শিক্ষার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে সেরূপ শিক্ষার কোন নিদর্শন কৃষ্ণাচরিত্রে ইতঃপূর্বে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। একস্থানে কেবল তাঁহার সংগীতবিদ্যা শিখিবার ইঙ্গিত আছে। কিন্তু তাহাই একমাত্র হৃদিবল-সাধক হইতে পারে না। যে হৃদয়বল থাকিলে পদ্মিনীর এবংবিধ ইঙ্গিত কার্যে পরিণত করিবার সাহস জন্মে, সেরূপ কোন শিক্ষা বা সাধনার উল্লেখ নাটকের মধ্যে দেখা যায় নাই। এরূপ কোন কৌশল রাখিলে মধুসূদন কৃষ্ণা চরিত্রে আরও পারদর্শিতা দেখাইতে পারিতেন।

দৃশ্যবিভাগের দোষ সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আর একটি দোষ মধুসূদনের প্রথম দুইখানি নাটকে দেখা গিয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণকুমারীতে তাহা আর ছিল না। পাত্র-পাত্রীর স্বগত চিন্তার মধ্য দিয়া দর্শক বা পাঠককে পরিচয় দিবার জন্য কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করানো। এরূপ কার্য নাট্যকলা বিকাশের সহায়ক হয় না। পাত্র বা পাত্রীর মনে স্বভাবতঃ যে চিন্তার উদয় হয় তাহাই স্বগত উক্তির মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য।

মধুসূদনের প্রহসনদ্বয়

নাটক-বিভাগ অপেক্ষা প্রহসনবিভাগে মধুসূদন অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। প্রহসন সমাজ-দেহের দূষিতাঙ্গের প্রদর্শক। যখন কোন বিরুদ্ধাচার সমাজদেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার কোন অঙ্গবিশেষকে বিকৃত বা দূষিত করে, তখন প্রহসনরূপ দৃশ্যকাব্য সেই বিকৃতাঙ্গ বা দূষিতাঙ্গকে লোকলোচনের বিষয়ীভূত করিয়া সেই বিরুদ্ধাচারের প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দেয়। মধুসূদন এই জাতীয় দৃশ্যকাব্যের জনক বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মধুসূদনের পূর্বে কুলপালকদের হৃদয়হীনতার এবং কুলীন কামিনীদের দুর্দশায় তৎকালীন সমাজদেহে যে ব্রণ উদ্‌গত হইয়াছিল তাহার অস্ত্র-চিকিৎসার জন্য রামনারায়ণ তর্করত্নমহাশয়ের কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক অবতারিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার চিত্রগুলি সজীব হয় নাই, অভিনয়ের পর সেগুলির কথা কাহারও আর মনে থাকে নাই। মধুসূদনের প্রহসনদ্বয়ের চরিত্রগুলি সজীব ও ক্রিয়াশীল বলিয়া অধিক কার্যকরী হইয়াছিল। পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যপ্রণেতৃগণ মধুসূদনের প্রহসনদ্বয়কে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের সমকালীন 'ইয়ংবেঙ্গল' দল এবং ভণ্ডকপটাচারী হিন্দুর দল তৎকালীন সমাজের কলঙ্কস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। মধুসূদন তাহাদের ক্রিয়াকলাপ এই দুই গ্রন্থে দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"হিন্দু জমিদারের মুসলমান রমণীর প্রতি আসক্তি স্বাভাবিক নয়।" যে হিন্দু কপটাচারী, যাহার ভিতর-বাহিরে মিল নাই, সে বিধিনিষেধের অতীত; সঙ্গোপনে যবনীগমন অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করিতে সে সমর্থ। সুতরাং মনস্তত্ত্বের দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রতিবাদ টিকে না। মাইকেলের জীবনচরিত প্রণেতা যোগীন্দ্রবাবু একস্থানে বলিয়াছেন—"বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়ার শেষ অঙ্কে ভক্তপ্রসাদের সহিত ফতিমার ও হানিফের ধীরতার সহিত ব্যঙ্গ • • অস্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়।" কিন্তু অভিনিবেশ-সহকারে দৃষ্টি করিলে ইহা স্বাভাবিকই বলিতে হইবে, কারণ পূর্বমীমাংসিত বিষয় ধীরতার সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে। হানিফ ও ফতিমা ভাল করিয়াই জানে ভক্তপ্রসাদবাবুর এই কার্যের প্রতিফল তাহারা কিরূপে দিবে। সুতরাং তাহাদের ব্যঙ্গ ধীরতার সহিত সম্পাদিত হওয়ায় আরও তীব্র হইয়াছিল। অধিকন্তু বাচস্পতি মহাশয়ের শিক্ষার ফলে হানিফ উগ্রতা ত্যাগ করিয়া ধীরতা অবলম্বন করিবে এরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিল, গ্রন্থমধ্যে এ কথারও উল্লেখ আছে। যোগীন্দ্রবাবু এ মন্তব্য না করিলেই ভাল করিতেন।

'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া' নামক প্রহসনদ্বয় মধুসূদন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ের মধ্যে রচনা করিয়া থাকিবেন। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চের জন্য এ দুখানি রচিত হইয়াছিল। নব্য ও প্রাচীনদলের অপ্রীতিকর হইবে বিবেচনা করিয়া ঐ নাট্যশালায়

ঐগুলি তখন অভিনীত হয় নাই। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটি শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটীর রঙ্গমঞ্চে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই তারিখে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া' খানি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে আরপুলি নাট্যসমাজ কর্তৃক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

মায়া-কানন

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মৃত্যুর পূর্বে মায়াকানন নাটকখানি বীডন্ স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য লিখিয়া গিয়াছিলেন এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রেল তারিখে ঐ রঙ্গমঞ্চে ইহার প্রথম অভিনয় হইয়াছিল।

ইহার আখ্যানবস্তু পদ্মাবতীর ন্যায় পৌরাণিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে ইহা গ্রীক পুরাণের ছায়া লইয়া নহে, হিন্দু-পুরাণের ছায়া, প্রচলিত কিংবদন্তী, ঋষি ও মর্ত্য মানব প্রভৃতির অদ্ভুত সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছিল। মায়াকাননের ভিতরেই নাটকের মূল রহস্য নিহিত আছে। পাষাণময়ী দেবী প্রতিমা ও তাঁহার দৈববাণীরূপে বজ্রধ্বনি—মূল রহস্যেরই প্রতীক। পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে এই রহস্য কিরূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল তাহা নাটকের পাঠক ও দর্শকমাত্রেই জানেন।

নাটকটির উদ্দেশ্য এইরূপ :—কোন ব্যক্তিগত প্রণয় তাহা কি নারীর, কি পুরুষের যদি রাজ্যের বিঘ্ন বা ধ্বংসের নিদান হইয়া উঠে, তাহা হইলে ঐ অবাঞ্ছিত প্রেম হইতে উৎপন্ন সন্তানের খাতিরেই উহাকে হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিতে হইবে। নাট্যকার তাঁহার এই উদ্দেশ্য নাটকীয় অরুন্ধতী চরিত্রের মুখ দিয়া এইরূপে বলাইয়াছেন :—"কিছুকালের সুখভোগের নিমিত্তে কাল-নদীতীরে যুবকাষ্ঠের স্বরূপ কলঙ্ক-স্তম্ভ স্থাপন করা, জ্ঞানীজনের কর্তব্য নয়।" এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া নাট্যকার নাটকের অভ্যন্তরে যে সব চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়াছেন, তাহার কোনটাই সিদ্ধিলাভ করে নাই। আকাঙ্ক্ষিতের প্রণয়লাভ বা তজ্জনিত বংশরক্ষা, কোনটাই ফলপ্রসূ হইল না। মাত্র নাট্যকারের বহু ঈপ্সিত বিষাদান্ত চিত্র (tragedy) সৃষ্ট হইয়া গেল। শেষ দৃশ্যে সিন্ধুদেশাধিপতি অজয়, গান্ধাররাজ তনয়া ইন্দুমতী ও তাঁহার সহচরী সুনন্দা আত্মহত্যা করিয়া নাটকের বিষাদপূর্ণ পরিণতি (tragic end) আনিয়া দিল।

নাটকটিতে পুরুষকার যখনি বিপর্যস্ত হইবার উপক্রম করিয়াছে, তখনি দৈববাণীর আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। অধ্যাত্ম-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তেও নাট্যকার স্থিরনিশ্চয় ছিলেন না, তাহার প্রমাণ :—তপস্বিনী অরুন্ধতী, যিনি নাটকের কেন্দ্রস্থানে থাকিয়া সকলকে পরিচালিত করিয়াছেন, তিনি মায়াকাননের বজ্রধ্বনির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া একস্থানে এইরূপ বলিতেছেন :—"ঐ বজ্রধ্বনির অর্থ এই যে, বিধাতা প্রথমে অজয়কে ইন্দুমতীর পতি ক'রে সৃষ্টি ক'রেছিলেন, কিন্তু গ্রহদোষে তাঁর সে অভিলাষ নিষ্ফল হ'লো।" বিধাতাও মানবের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে অক্ষম, নাট্যকারের এরূপ প্রতীচ্য ভাবের ইঙ্গিত প্রাচ্য-ভাবের যুক্তির বিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়।

মধুসূদনের ভাষা এই নাটকে নূতন ভঙ্গিমা ও নূতন গতি লাভ করিয়াছিল; চিন্তার ধারাও গতানুগতিকভাবে চলে নাই। তাঁহার অন্যান্য নাটক অপেক্ষা ইহার ভাষাকে মার্জিত ও উন্নত করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু এ সব সত্বেও সর্বজন-বোধ্য নাটুকে ভাষার সৃষ্টি হইল না। স্থানে স্থানে প্রকাশভঙ্গী চমৎকার হইয়াছে; যথা—ইন্দুমতীর রূপ-প্রশংসার ব্যপদেশে তাঁহার গুণ-বর্ণনা অরুন্ধতী

এইরূপে করিতেছেন :—"আর কেবল যে রূপসী, তাও নয়, সুশীলতা, ধর্মপরতা ইত্যাদি গুণ প্রফুল্ল-কমলের ন্যায় এর মানস সরোবরের শোভা বিস্তার করেচে।" আর এক স্থানে রাজা ও শশিকলার সংলাপের মধ্যে রাজ্যের মন্ত্রীকে লক্ষ্য ক'রে উপহাসচ্ছলে বলা হ'য়েছে :—"দেখ দিদি, বৃদ্ধ হ'লে লোকের বুদ্ধির হ্রাস হয় ; জ্ঞান-নদে এক প্রকার জল-শেষ হয়। বোধ করি মন্ত্রিবরেরও সেই দশা ঘটছে।" অপর স্থানে উপমান উপমেয়ের সাহায্যে মন্ত্রীর কথা বলার ভঙ্গীটি সুন্দর ভাব-প্রকাশক হইয়াছে :—"সূর্যকিরণে গভীর নদের জলমুখ উজ্জ্বল দেখা যায়, কিন্তু নিম্নদেশ যে কিরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তা কে জানে? মুখে হাস্‌লেম, কিন্তু হৃদয়ে যে সর্বক্ষণ বেদনা, তা যিনি অন্তর্যামী তিনিই জানেন।" অন্য এক স্থানে অজয় ইন্দুমতীকে দ্বিতীয়বার দর্শন করিয়া সংজ্ঞা হারাইয়াছিলেন, কিন্তু অরুন্ধতীর দৈবক্রিয়ায় আরোগ্যলাভ করিয়া বলিতেছেন :—"আমিও অপবিত্র। কেন না, আমি এখন প্রাণশূন্য। আপনারাও এখন] আর পবিত্র নন্। কেন না, আপনারা শ্মশানভূমি পদস্পৃষ্ট করেছেন।" আর এক স্থানে ইন্দুমতী শশিকলাকে বলিতেছেন :—"সখি! সুকণ্ঠই বলো, আর কুকণ্ঠই বলো, তা সে সকল এখন আর নাই। এখন দুঃখের হলাহলে এক প্রকার নীলকণ্ঠ! জর্জরীভূতা হয়ে রয়েছি।" দু-এক স্থানে প্রচলন-বিরুদ্ধ পদের প্রয়োগ আছে। ইন্দুমতী যখন শশি-কলার কাছ থেকে বিদায় লইতেছেন, তখন এইরূপ বলিয়াছিলেন :—"তোমাকে এত ভালবাসি যে, তুমি আমার সপত্নী হও এ বাসনাকে মনে স্থান দিতে ইচ্ছা হয় না।" সপত্নী সতীন অর্থে যত ব্যবহৃত হয় 'শত্রু' অর্থে তত হয় না, যদিও উভয় অর্থই ব্যাকরণ সঙ্গত।

নাট্যকার মায়াকাননের গীতগুলি নেপথ্যে গাওয়াইয়াছিলেন। গ্রন্থমধ্যে গান না থাকায়, কি গান গীত হইয়াছিল জানিবার উপায় নাই। কৃষ্ণকুমারীর বহুকাল পরে রচিত 'মায়াকানন' নাটক-খানিতে মধুসূদন আরও কৃতিত্ব দেখাইবেন দর্শকেরা এরূপ আশা করিয়াছিলেন,, কিন্তু মধুসূদন ইহাতে শক্তি-ক্ষয়েরই পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভার ছায়া ইহা স্পর্শ করিতে পারে নাই।

অদৃষ্টপূর্ব মেঘনাদবধ কাব্যখানিকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একাধিকবার নাট্যরূপ দান করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ তারিখে বেঙ্গল রঙ্গমঞ্চে গ্রেট ন্যাশানল্ অপেরা কোম্পানী দ্বারা মেঘনাদবধ সর্বপ্রথমে অভিনীত হইয়াছিল। এটি গিরিশচন্দ্রের নাট্টীকরণ নহে।

মধুসূদনের কালে নাট্যসাহিত্যের লাভালাভ

মধুসূদনের কালে মৌলিক নাটক রচিত হইয়াছে। শর্মিষ্ঠায় ইহা এক মেটে হইয়া কৃষ্ণকুমারীতে সজ্জিতা প্রতিমারূপে ইহাকে পাওয়া গিয়াছে। ভাব ও রুচির পরিবর্তনও এই কালের বিশেষত্ব। মধুসূদন প্রাচীন ভাবের সহিত আধুনিক ভাবের সমন্বয়-সাধন করিয়া গিয়াছেন। রামনারায়ণের কালে নাটকে স্ত্রীচরিত্রের যে প্রাধান্য দেখা দিয়াছিল, মধুসূদনের কালে তাহার শোভাকে আরও একটু সৌন্দর্যশালিনী ও বৈচিত্র্যময়ী করিয়াছে। মৌলিক নাটককার হিসাবে মধুসূদনই পৌরাণিক ও কল্পনামিশ্রিত-ঐতিহাসিক নাটকের প্রথম প্রবর্তক।

বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের ত্রিবিধ রূপ

বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের যাবতীয় উচ্চাঙ্গের দৃশ্যকাব্য যাহার রসপ্রবাহ মানবমনের গভীরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া মানুষকে তাহার বর্তমান অবস্থা ভুলাইয়া দেয়, তাহাই নাটক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

যেগুলি অপেক্ষাকৃত লঘুভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু স্ত্রীপ্রধান ও নৃত্যগীতবহুল তাহাই নাটিকা পদবাচ্য। যে গুলির মধ্যে হাস্য, পরিহাস ও ব্যঙ্গ আছে, সেগুলি অথবা যে গুলির মধ্যে কোন সমাজ ও ব্যক্তি বিশেষের অনুকৃতি (parody) আছে সেগুলি প্রহসন পর্যায়ের দলভুক্ত।

মধুসূদন উপরিউক্ত মূর্তিত্রয়ের কোনটির জনক, কোনটির প্রবর্তক, কোনটির সংস্কারক ছিলেন। নাটক, নাটিকা ও প্রহসন—এই মূর্তিত্রয় বঙ্গ দৃশ্যকাব্য-মন্দিরের বিগ্রহরূপে মধুসূদনের কাল হইতে নাট্যসাহিত্যের সর্বত্র বিরাজ করিতেছে। অবয়বের পার্থক্য থাকিলেও নাট্যধর্মগত পার্থক্য ইহার কোনটিতেই নাই। ক্রিয়ানুমোদিত কার্যকলাপের সংসিদ্ধি—দৃশ্যকাব্যের এই মূলসূত্র সকলগুলিতেই বর্তমান থাকে। পরবর্তীকালের কোন কোন নাট্যকার এইগুলির বিন্যাস ও সমবায় (permutation and combination) দ্বারা কিছু পরিবর্তন ঘটাইলেও মূলতঃ ঐ তিনটি প্রধান।

মধুসূদনের কালে অন্যান্য প্রসিদ্ধ দৃশ্যকাব্য

মধুসূদনের কাল মধ্যে অপর নাট্যকারের যে সকল নাট্যগ্রন্থ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, সেগুলির নাম ও বিবরণ যথাক্রমে প্রদত্ত হইল :—

বুঝ্‌লে কি না ? (প্রহসন)

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। প্রিয় মাধব বসু ইহার রচয়িতা। এই জাতীয় প্রহসনে নাট্যকলার অপমৃত্যু ঘটে, কিন্তু তৎকালীন সমাজের অত্যাচার দেখাইবার প্রয়োজনে ইহা রচিত হইয়াছিল। বকধার্মিক বিদ্যালংকার পুরোহিতের ও ধনবান্ দলপতি অটলের যথাক্রমে ভণ্ডামি ও কুক্রিয়া ইহার প্রতিষ্ঠানভূমি। মদ ও বেশ্যা তদানীন্তন সমাজের কিরূপ অনিষ্টসাধন করিতেছিল তাহার চিত্র দেখানো ইহার মুখ্য এবং নাট্যকলার গৌরবসাধন গৌণ উদ্দেশ্য ছিল, তজ্জন্য ভদ্র স্ত্রীপুরুষ একাসনে বসিয়া ইহার অভিনয় দেখিতে পারেন না, এমনই ইতর জনোচিত ব্যবহারে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। দলবিশেষের প্রতি আক্রোশ-প্রদর্শন এখানির অন্যতম উদ্দেশ্য। কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার 'আমার জীবন' গ্রন্থে মহারাজ যতীন্দ্রমোহনকে ইহার রচয়িতা বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বিপিনগুপ্তের "পুরাতন প্রসঙ্গেও" ঐ একই ভুল করা হইয়াছে।

কিছু কিছু বুঝি (প্রহসন)

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর তারিখে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল কিন্তু তৎপূর্বে ৩১শে অক্টোবর তারিখে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। পানদোষ, অপব্যয়, ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা ও অল্পবয়স্ক বালকগণের নাটকাভিনয়ে যোগদান করিলে অধ্যয়নে বঞ্চিত হইবার কথা প্রভৃতি লইয়া ইহা পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। ইহা 'বুঝলে কি না'র উত্তর হিসাবে লিখিত হইয়াছিল। কুৎসিত ইঙ্গিতে বর্ণনাত্মক

ভাবে লিখিত হওয়ায় নাট্যরস ফুটিয়া উঠে নাই। ইহার খদ্যোতেশ্বর চরিত্রটি ঠাকুর গোষ্ঠীর কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুকৃতি (parody)। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থের রচয়িতা।

নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধুর কাল এবং দৃশ্যকাব্যের ইতিহাসে তাঁহার প্রভাব

(১৮৬০—১৮৭৩ খৃঃ)

নাট্যসাহিত্যের ক্রমোন্নতিসাধন বিষয়ে মধুসূদনের কার্য যেখানে শেষ হইয়াছিল, তাহার পারম্পর্য রক্ষার জন্য দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের কার্য ঠিক সেইখানে আরম্ভ হইয়াছে। দীনবন্ধু প্রথম হইতে নির্ভীকভাবে তাঁহার দৃশ্যকাব্যগুলিকে আধুনিক রীতির গঠন দিয়াছিলেন, মধুসূদনের ন্যায় ভীতিভাব তাঁহার ছিল না।

দীনবন্ধুই সামাজিক নাটকের স্রষ্টা

দীনবন্ধু তাঁহার নাটকগুলির উপাদান সামাজিক ব্যাপার হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্বে কোন নাট্যকার নাটকের মধ্যে সামাজিক ব্যাপারের অবতারণা করেন নাই। বিদ্যাসুন্দরে সামাজিক প্রসঙ্গ ছিল, কিন্তু তাহা মৌলিক নাটক নহে—অভিনয়ার্থ নাটকে নীত হইয়াছিল মাত্র। কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক লিখিবার আধুনিক রীত্যনুসারে গঠিত না হওয়ায় ইহাকে বর্তমান কালের সামাজিক নাটক পর্যায়ের মধ্যে গণ্য করা যায় না। অধিকন্তু ইহাতে প্রহসনের ভাব নাটক অপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট ছিল। মধুসূদনের প্রহসনদ্বয় সামাজিক ব্যাপারাশ্রিত ছিল, কিন্তু ইহাও আমাদের লক্ষ্যের বহির্ভূত বিষয়, কারণ প্রহসনের উপাদান সামাজিক ঘটনার উপরই নির্ভর করে, সামাজিক ঘটনা ব্যতিরেকে প্রহসন সৃষ্ট হয় না। সুতরাং দীনবন্ধুই সামাজিক নাটকের স্রষ্টা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মাত্র উমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের 'বিধবা বিবাহ' নামধেয় সামাজিক নাটকখানি ইহার এক বৎসর পূর্বে অভিনীত হইয়াছিল, এবং তৎপূর্বে প্রকাশিতও হইয়াছে, কিন্তু নাটকীয় কৌশলের অভাব তাহাতে ছিল।

নীলদর্পণ

দীনবন্ধুর প্রথম নাটক নীলদর্পণ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। এখানি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর শনিবার জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে ন্যাশানাল থিয়েটার কর্তৃক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল, এই নাটক লইয়া উক্ত থিয়েটার প্রথম খোলা হইল। দীনবন্ধু নীলকর-প্রপীড়িত বঙ্গসমাজের চিত্র নীল দর্পণে প্রতিবিম্বিত করেন। নীলকরদের অত্যাচার-প্রদর্শন এই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং সে উদ্দেশ্য সফলতালাভ করিয়াছিল। গ্রামের সামান্য জমিদার হইতে রায়তগণের আর্তনাদ দৃশ্যে-দৃশ্যে বেশ ফুটিয়াছিল। যখনই এই আর্তনাদ নীলকরদের শ্রুতিপথে আসিয়াছিল, তখনি তাহারা আরও অধিক উদ্ধত হইয়া নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই সংঘর্ষ-কৌশলে অত্যাচারই ফুটিয়াছিল। নাট্যকার সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিকের মতো এ বিষয়সম্পাদনে

[সকল মনোরথ হইয়াছিলেন। অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের চিত্রগুলি কিরূপ হইয়াছে, তাহার আলোচনার পূর্বে, যে নাট্যগৃহমধ্যে ঐ চিত্রগুলি স্থান পাইয়াছিল, সে সম্বন্ধে আলোচনা বাঞ্ছনীয়। আধার উপযুক্ত না হইলে আধেয় তাহাতে স্থান পায় না।

নাটকে ত্রিবিধ ঐক্য

যদিও ইওরোপীয় ভাব ও কল্পনা-প্রধান (romantic) নাটকের আদর্শে নীলদর্পণ রচিত হইয়াছিল, তথাপি গ্রীক ও রোমকদের আভিজাত্য-গৌরবান্বিত গভীর ভাবপূর্ণ (classical) নাটকের প্রকৃতি অনুযায়ী ক্রিয়ার, সময়ের ও স্থানের ঐক্য (unity of action, time and place) ইহাতে বেশ সুরক্ষিত ছিল। ঠিক জ্ঞাতসারে না করিলেও এই সকল বিষয়ে দীনবন্ধু ক্লাসিক্যাল নাট্যকারদের পথানুবর্তী হইয়াছিলেন। আধুনিক বাঙ্গালা নাটকসমূহ ইংরাজদের রোমান্টিক্ নাটকের আদর্শে রচিত হইতেছে, তজ্জন্য গ্রীক নাট্যকারদের মতো বাঙ্গালী নাট্যকারেরা সময় বা স্থানের ঐক্যের দিকে আর তাদৃশ প্রখর দৃষ্টি রাখেন না। দৃষ্টির প্রাখর্য না থাকিলেও ঐগুলিকে একেবারে উপেক্ষা করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদের নাই। কারণ, আলোচনায় দেখা যাইবে যে, পূর্বোক্ত ত্রিবিধ ঐক্য-সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীক আলংকারিকদের ধারণায় তুলনায় বর্তমান-কালের ধারণায় তারতম্য দাঁড়াইলেও, ঐগুলি উপেক্ষিত হয় নাই। ঐ তারতম্য ন্যায্য কি অন্যায্য বিচার করিবার পূর্বে, একটা বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, কতকগুলি নাট্যালংকার দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গে-সঙ্গে বদলাইয়া যায়; কিন্তু এমন কতকগুলি অলংকার আছে, যেগুলি সর্বকালীন ও সর্বজনীন। পূর্বোক্ত ত্রিবিধ ঐক্য ঐ জাতীয় অলংকার। নাটকে এই জাতীয় অলংকার অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়া ঐগুলির কথঞ্চিৎ আলোচনা সমীচীন বোধ হইতেছে। নীলদর্পণে ইহাদের সমতা কিরূপ কৌশলে রক্ষিত হইয়াছে তাহার আভাবও ঐ আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইবে।

ক্রিয়ার ঐক্য (unity of action)

নাটকে এটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। ইহার উপরই নাট্যসৌধ নির্মিত হয়। এই ভিত্তি ঐক্যশূন্য হইলে তাসের ঘরের মতো নাট্যসৌধ আপনা হইতেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। নাটকের একটি প্রধান ক্রিয়ার সহিত নাট্যমধ্যস্থিত অপর ক্রিয়াগুলির, এমন কি, বিপরীত ক্রিয়ারও, পরস্পরাপেক্ষ সম্বন্ধ-স্থাপনাকেই নাট্যক্রিয়ার ঐক্য-সম্পাদনা বলে। গ্রীক আলংকারিকদের সময়ে নাট্যক্রিয়া জটিল ছিল না, কোন একটি ক্রিয়া লইয়া নাটক রচিত হইত। এখন কিন্তু সেরূপ হয় না—ক্রিয়া বহুমুখীন হইয়া উঠিয়াছে, তজ্জন্য গ্রীক আদর্শ লইলে আধুনিক নাটকের প্রয়োজন-সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। আধুনিক নাট্যকার কিরূপ কৌশলে এই ঐক্য সম্পাদন করেন জার্মান নাট্যসূত্রকার শ্লিগেল (Schlegel) সাহেব তাঁহার নাট্যসাহিত্য-গ্রন্থে (Dramatic literature) উপমা দ্বারা এইরূপ বুঝাইয়াছেন :— "প্রকৃতিরাজ্যে যেমন কতকগুলি ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী পৃথক স্থানে ও পৃথক অবস্থায় জন্মলাভ করিয়া স্ব-স্ব গন্তব্য পথে বিচরণ করিতে-করিতে উপযুক্ত অবসরে পরস্পরে মিলিত হইয়া যায়, এবং পরে সেই সম্মিলিত বারি-প্রবাহ বেগবতী স্রোতস্বতীর আকারে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জলধির ক্রোড়ে যাইয়া বিশ্রামসুখ লাভ করে,—নাট্যকারও সেইরূপ মানুষের কতকগুলি চেষ্টা ও ভাব-প্রণোদিত

ক্রিয়াকলাপ, উপনদীর মতো কিছুক্ষণ পৃথক গতিশীল রাখিয়া অবশেষে মূল ক্রিয়ারূপ প্রবল নদীর সহিত তাহাদের অদ্ভুত মিলন ঘটাইয়া দেন। নাট্যকবি ঐ সকল কার্য অতি কৌশলের সহিত সম্পন্ন করিয়া তাঁহার দৃশ্যকাব্যের দর্শককে এমন একটি অবস্থায় উন্নীত করেন, যেখানে ঐ ক্রিয়াকলাপরূপ উপনদীগুলির গতি আর পৃথকভাবে পরিলক্ষিত হয় না,—কেবল মূলক্রিয়ারূপ একটি প্রবল নদীপ্রবাহমাত্র দর্শকের মানস-নেত্রে ভাসিতে থাকে। পুনরায় যদি এরূপ হয় যে, ঐ বেগবান্ নদীপ্রবাহরূপ মূল-ক্রিয়াটি ঘটনার আতিশয্যে নানা শাখা-প্রশাখায় বহুমুখী হইয়া, সাগরসঙ্গমরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধি লাভ করে, তাহা হইলে কি ঐগুলিকে সেই এক ক্রিয়া বলিব না? নিশ্চয় বলিতে হইবে।" †

নীলদর্পণে ক্রিয়ার ঐক্য পূর্বোক্তভাবেই সম্পাদিত হইয়াছে। স্বরপুর গ্রামের এক অবস্থাপন্ন বসু-পরিবার নীলকরদের অত্যাচারে কিরূপে সর্বস্বান্ত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল—এই মূল ক্রিয়ার সহিত, রাইয়তগণের হাহাকার-রূপ দ্বিতীয় ক্রিয়ার, এবং বেগুনবেড়ের ইংরাজ নীলকর ও তাহাদের দেশীয় কর্মচারিবর্গের প্রতিকূল ব্যবহার-রূপ তৃতীয় ক্রিয়ার এরূপ অপূর্ব সমন্বয় স্থাপিত হইয়াছিল যে, ঐগুলির সংমিশ্রণে বৈষম্য উৎপন্ন না হইয়া, মূলক্রিয়ার পরিপোষকরূপে ঐগুলি ব্যবহৃত হওয়ায় মূল ক্রিয়ার ঐক্য সুগ্রথিত করিয়াছিল।

সময়ের ঐক্য (unity of time)

বাস্তব জগতে ২৪ ঘণ্টায় দিন হয়। কোন এক দিবসব্যাপী নাটকীয় ক্রিয়া পূর্বোক্ত বাস্তব সময়ের হিসাবে সম্পন্ন করিতে হইলে, ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে নিষ্পাদ্য নাটকের ক্ষুদ্র অবয়বে তাহার স্থান সংকুলান হয় না। তজ্জন্য বাস্তব সময় ছাড়িয়া নাট্যকারকে একটা কাল্পনিক সময়ের আশ্রয় লইতে হয়; এবং ঐ কাল্পনিক সময় অনুপাত অঙ্কে বাস্তব সময়ের যতটা নিকটবর্তী হইবে, সময়ের ঐক্যও ততটা সুন্দরভাবে রক্ষিত হইবে। এই নিয়মে তথাকথিত কাল্পনিক ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সম্পাদ্য ক্রিয়ার সহিত নাট্যাভিনয়ের ৩।৪ ঘণ্টাকালের প্রকৃত সময়ের যতটা নিকট সম্বন্ধ আছে, তথাকথিত কাল্পনিক ২৪ বৎসরের সহিত তদনুপাত লব্ধ নাট্যাভিনয়ের প্রকৃত সময়ের ততটা দূর সম্বন্ধ থাকিয়া যায়। ২৪ শের সহিত ৪০০০এর অপেক্ষা, ২৪শের সহিত তিনের অনুপাত সর্ব সময়েই নিকটতর। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নাট্যক্রিয়ার তথাকথিত কাল্পনিক সময় বাস্তব ঘটনাযুক্ত প্রকৃত সময়ের অনুপাতে যত অধিক নিকটবর্তী হয়, নাটকও তত স্বভাবসঙ্গত হইয়া থাকে, এবং সময়ের ঐক্য তদনুসারেই রক্ষিত হয়।

---

† "It is a mighty stream, which on its impetuous course overcomes many obstructions, and loses itself at last in the repose of the ocean. It springs perhaps from different sources and certainly receives into itself other rivers, which hasten towards it from opposite regions. Why should not the poet be allowed to carry on several, and, for a while, independent streams of human passions, and endeavours, down to the moment of their raging junction, if only he can place the spectator on an eminence from whence he may overlook the whole of their courses? And if this great and swollen body of waters again divide into several branches, and pour itself into the sea by several mouths, is it not still one and the same stream?"

গ্রীক আলংকারিক এরিস্‌টটল্‌ এর (Aristotle) ধারণা কিন্তু অন্যরূপ ছিল। তাঁহার মতে নাটকের ক্রিয়া ২৪ ঘণ্টা পরিমিত সময়ের মধ্যে সম্পাদিত হওয়া চাই। তৎকাল-প্রচলিত নাটকগুলির প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে এই নিয়ম অযৌক্তিক বোধ হইত না; কারণ সেগুলি বহুক্রিয়ান্বিত ছিল না, এবং ঐ অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের সমাধান অনায়াসে হইতে পারিত। এখন কিন্তু ঐ নিয়ম খাটে না। আধুনিক নাটকগুলি বহুক্রিয়ান্বিত হইয়াছে। এখন ক্রিয়াবাহুল্যের অনুপাতে সময়-বহুত্বও দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু এই অনুপাতগুলি পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইলেই সময়ের ঐক্য বজায় থাকে। নাটকান্তর্গত সময়ের যে সকল ব্যবধান বা উল্লঙ্ঘন থাকে সেগুলিকে দৃশ্যের মধ্যে না দেখাইয়া অঙ্কের আড়ালে দেখাইতে হয়।

সময়ের ঐক্যের দিক দিয়া বিচার করিলে নীলদর্পণের যাবতীয় ক্রিয়া বিংশ দিবসে সম্পাদিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম অঙ্ক তিন দিনে (দ্বিতীয় দিন বিশ্রামের দিন বলিয়া মনে হয়, কারণ ঐ দিনে কোন ক্রিয়ার উল্লেখ নাই), দ্বিতীয় অঙ্ক এক দিনে, তৃতীয় অঙ্ক দুই দিনে, চতুর্থ অঙ্ক ৬ দিনে (এই ৬ দিনের মধ্যে অষ্টম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ দিন নিষ্ক্রিয় ছিল), এবং চারি দিন বিশ্রামের পর অবশিষ্ট চারি দিনে পঞ্চমাঙ্কের বিষয় নিষ্পন্ন হইয়াছিল। সুতরাং সময়ের ঐক্য সুরক্ষিত রহিয়াছে। ইংরাজি দৃশ্যকাব্যকে আদর্শ করিলেও দীনবন্ধু সময়ের ঐক্য সম্বন্ধে ততটা স্বাধীন হইতে পারেন নাই। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অঙ্ক মধ্যে সময়ের দুরন্ত ব্যবচ্ছেদ হইলেও দৃশ্যমধ্যে তাহা শোভনীয় হয় না। দীনবন্ধু চতুর্থ অঙ্কে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু শ্লিগেল (Schlegel) সাহেবের মত প্রামাণ্য ধরিলে, এ ব্যতিক্রমও দোষাবহ হয় না। তাঁহার মতের তাৎপর্য এইরূপ:—"জ্যোতিষ দ্বারা নিরূপিত সময় মানব-দেহের উপর কার্য করিয়া থাকে, কারণ মানুষের আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি তদ্দ্বারা পরিচালিত হয়। মানুষের মনের কিন্তু নিজের একটা স্বতন্ত্র সময়-জ্ঞানের আদর্শ আছে। ক্রমোন্নতি-সাধন বিষয়ক জ্ঞানে সতত সচেতন থাকাই মানুষের সেই আদর্শ। সময়ের এইরূপ পরিমাপের দিক দিয়া বিচার করিলে দুইটি প্রয়োজনীয় মুহূর্ত বহুবৎসরের ব্যবধানে থাকিলেও তাহাদের মিলন কেমন আপনা হইতেই হইয়া যায়, এবং ঐ দুইটি প্রয়োজনীয় মুহূর্তের মধ্যে সম্পর্কশূন্য অপ্রয়োজনীয় যে নিষ্ক্রিয়তা বিরাজ করিতেছিল, তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। যেমন, আমরা নিদ্রা যাইবার পূর্বে কোন এক বিষয়ে যদি গভীরভাবে চিন্তামগ্ন থাকি, তাহা হইলে নিদ্রান্তেও সেই চিন্তাসূত্র আমাদের মন ধরিতে পারে। নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নগুলি যে ক্রিয়া দেখাইয়াছিল তাহার কথা তখন আর মনে থাকে না। নাটকীয় ব্যাপারও ঠিক এইরূপভাবে সম্পাদিত হয়। নাটকের মধ্যে আমাদের কল্পনা অতি সহজেই অনেক অল্প-সম্পর্কিত বিষয়ের সময় লঙ্ঘন করিয়া দূর-দূরবর্তী সময়ের মধ্যে সম্পাদিত ক্রিয়াকে বরণ করিয়া লয়, কারণ ঐ গুলির মধ্যেই তাহার সম্পর্ক রহিয়াছে। অপ্রয়োজনীয় বোধে মধ্যের ঐ লঙ্ঘন-দ্বারা নাটকের অঙ্গহানি হয় না। নাটক কেবলমাত্র সিদ্ধান্তপ্রদ মুহূর্তের উপর আপনার ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া যায়, এবং সেই ক্রিয়ার গাঢ়তায় এতই মুগ্ধ থাকে যে অনেক অলস মুহূর্ত বা দিন তাহার চক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া থাকে।" * পূর্বোক্ত প্রমাণের দ্বারা বিচার

* "Our body is subjected to external astronomical time, because the organical operations are regulated by it, but our mind has its own ideal time, which is no other but the consciousness of the progressive development of our

কারণে নীলদর্পণের চতুর্থ অঙ্কের দৃশ্যান্তর্গত চারিদিনের সামান্য উল্লঙ্ঘন গণনার মধ্যেই আসে না। সুতরাং দীনবন্ধু সময়ের সমতা সুন্দররূপে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

স্থানের ঐক্য (unity of place)

সময়ের ন্যায় স্থানেরও একটা আসল-নকল ভেদ আছে। আসল স্থান হইল সেই স্থান যেখানে নাটক অভিনীত হইতেছে, এবং নকল স্থান হইল সেই দেশ, সহর, গ্রাম বা বাড়ী যে সব স্থানে নাটকের ক্রিয়াগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন সেই আসল স্থানের উপর দুই বা ততোধিক নকল স্থানের প্রদর্শন অসংগত বলিয়া বোধ হয় না, যদি সেই প্রদর্শিত স্থানগুলি ঠিক পরে পরে দেখানো হয়; কারণ তৎসঙ্গে দর্শকের কল্পনা, নাটকের ভাষা ও দৃশ্যপটের সাহচর্য সর্বদা বিদ্যমান থাকে। মানুষের কল্পনা বিচারবুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হইলে, একটি বাড়ীর দুইটি কক্ষ বা সেই গ্রামের দুইটি বাড়ী দেখা অনায়াসসাধ্য বলিয়া উহা দেখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবে না। কিন্তু, একটি দেশের মধ্যে দুইটি দূরবর্তী নগর, বা একটি মহাদেশের মধ্যে দুইটি দূরতর প্রদেশ দেখা আয়াস-সাধ্য বলিয়াই তাহাতে অনিচ্ছুক হইবে। বাস্তব জগতে মানুষ ঘর, বাড়ী, গ্রাম, নগর এবং দেশের মধ্যগত নৈকট্য বিদ্যমান থাকিতে দেখিয়াছে, এবং তজ্জন্য নাট্যাভিনয়ের অল্প সময়ের মধ্যে একটি স্থান হইতে অপর একটি স্থানে যাইতে, অথবা নাট্যক্রিয়া উহার একস্থান হইতে অপর স্থানে সম্পাদিত করিতে হইলে পরস্পরের সান্নিধ্য হেতু স্থানের ঐক্য নষ্ট হইয়া যায় না। আধুনিক বাঙ্গালা নাটকে একই অঙ্কে কখন বা পার্শ্ববর্তী স্থানের, কখন বা বহু দূরবর্তী স্থানের পাশাপাশি সংযোগ দেখা যায়। এটি কিন্তু সময়ের অনুপাতে না হইলে দূষণীয় হইয়া উঠে। গল্পাংশের প্রকৃতি, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের গুণস্বভাব এবং ঘটনার বৈচিত্র্য অনুসারে নাট্যক্রিয়ার সময় নির্দ্ধারিত হয়, এবং স্থানও সেই সময়ের অনুপাতে পাওয়া চাই। প্রাচীন সংস্কৃত-আলংকারিকদের স্থানের ঐক্য সম্বন্ধীয় ধারণা এইরূপ ছিল যে, যে স্থানে বা দৃশ্যে নাটক আরব্ধ হইয়াছিল সেই স্থানে বা দৃশ্যে নাটকের বাকী অংশটুকুও শেষ হওয়া চাই, কারণ যে স্থানে ইহা অভিনীত হইতেছে তাহা সেই একই স্থান, সুতরাং তাহাকে বহু বা পৃথক বিবেচনা করা অন্যায়। তজ্জন্য রত্নাবলী নাটিকা-বর্ণিত বিষয়গুলি নায়কের পুষ্পবাটিকা, উদ্যান এবং রাজান্তঃপুর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। এখন কিন্তু তাহা আর হয় না, নাটকের ক্রিয়া বহু বিস্তৃত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে দৃশ্যপটের সাহায্যে যদিও একই প্রকৃত স্থানে

---

beings. In this measure of time the intervals of an indifferent inactivity pass for nothing, and two important moments, though they lie years apart link themselves immediately to each other. Thus, when we have been intensely engaged with any matter before we fell asleep, we often resume the very same train of thought the instant we awake, and the intervening dreams vanish into their unsubstantial obscurity. It is the same with dramatic exhibition. Our imagination overleaps with ease the times which are presupposed and intimated but which are omitted because nothing important takes place in them, it dwells solely on the decisive moments placed before it, by the compression of which the poet gives wings to the lazy course of days and ours." Schlegel's 'Dramatic Literature."

বিভিন্ন সকল স্থানের কল্পনা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না, তথাপি সেগুলি পরস্পরে যত নিকটবর্তী থাকে, তত সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মায়, এবং তাহাতেই স্থানের ঐক্য সুন্দররূপে বজায় থাকে। ড্রাইডেন (Dryden) সাহেব সময় ও স্থানের ঐক্য উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া বলিতেছেন :—"একখানি আধ গজ পরিমিত দর্পণের উপর যেরূপ একটি গৃহের, তন্মধ্যস্থিত দ্রব্যের এবং গৃহান্তর্গত মানুষের প্রতিকৃতি একসঙ্গে প্রতিবিম্বিত হয়, অথচ দর্পণের অভ্যন্তরে ঐগুলি প্রকৃত অবস্থায় থাকে না, নাটকেও সেরূপ বাস্তব জীবনের বহু বিস্তৃত স্থান ও ক্রিয়ার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, অথচ ঐগুলি সেই অল্প আয়তনের মধ্যে থাকে না, দেখায় মাত্র।" †

দীনবন্ধু এইভাবেই স্থানের সমতা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাটকের মধ্যে এক চতুর্থাঙ্ক ছাড়া অপর সকল অঙ্কের সংযোগস্থল স্বরপুর গ্রামের গোলক বসুর গোলাঘরের রোয়াক, দরদালান, শয়নঘর, প্রতিবাসী সাধুচরণের বাড়ী এবং বেগুণবেড়ের সাহেবদের কুঠি ও কামরায় মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। সুতরাং পরিপ্রেক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিলে এক স্বরপুর গ্রামের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ তিনটি স্থান প্রদর্শিত হইয়াছিল মাত্র। চতুর্থাঙ্কে যদিও ইন্দ্রাবাদের কাছারী এবং জেলখানা দেখানো হইয়াছিল, তাহা কিন্তু একটি পৃথক অঙ্করূপ বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, সুতরাং দীনবন্ধু স্থানের ঐক্য সুন্দররূপেই বজায় রাখিয়াছেন।

নীলদর্পণের রসবিচার

নায়ক-নায়িকা, পীঠমর্দ এবং প্রতিনায়কাদির চেষ্টা ও ব্যবহার দ্বারা নাটকের মধ্যে যে ধ্বনি উঠে তাহাই নাটকের রস। রসের অনুভূতি থাকিলেও পৃথক রূপ নাই। প্রথমে নাট্যবর্ণিত রসের বিচার করিয়া, তৎপরে সেই রসাশ্রিত চরিত্রাবলির আলোচনা করা যাইবে।

নায়ক, প্রতিনায়কাদির চেষ্টা ও ব্যবহার হইতে জানা গিয়াছে যে, নীলদর্পণ করুণ রসাত্মক নাটক। সাহিত্য-দর্পণকার করুণরসের লক্ষণ এইরূপ দিয়াছেন :—

"ইষ্টনাশাদনিষ্টাপ্তেঃ করুণাখ্যো রসো ভবেৎ।
ধীরৈ কপোতবর্ণোঽয়ং কথিতো যমদৈবতঃ॥
শোকোঽত্র স্থায়িভাবঃ স্যাচ্ছোক্যমালম্বনং মতম্।
তস্য দাহাদিকাবস্থা ভবেদুদ্দীপনং পুনঃ॥
অনুভাবা দৈবনিন্দা ভূপাত ক্রন্দিতাদয়ঃ।
বৈবর্ণোচ্ছ্বাস নিশ্বাস স্তম্ভ প্রলপনানি চ॥
নির্বেদ মোহাপস্মার ব্যাধি গ্লানি স্মৃতিশ্রমাঃ।
বিষাদ জড়তোন্মাদ চিন্তাদ্যো ব্যভিচারিণঃ॥"

নীলকরদের অত্যাচারে বসু পরিবার মধ্যে ইষ্টনাশ হেতু যে অনিষ্টপাত হইয়াছিল, তাহাই এখানে করুণাখ্য রস হইয়াছে। ইহার বর্ণভঙ্গী কপোতের মতোই বিচিত্র, মৃত্যু আছে বলিয়া ইহার দেবতা যম।

† "As in a glass or mirror of half a yard diameter, a whole room and many persons in it may be seen at once; not that it can comprehend that room or those persons, but that it represents them to the sight." Dryden's "Essay on the defence of Dramatic Poesy."

পারিবারিক মৃত্যুজনিত শোক এই রসের স্থায়িভাব। নায়ক পক্ষে—গোলক বসু, নবীনমাধব, ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি এবং প্রতিনায়ক পক্ষে—উড, রোগ, আমীন ও দেওয়ান ইহার আলম্বনবিভাব। নায়ক পক্ষে—গোলক বসুর অপমান ও জেল, নবীনমাধবের অপমান ও সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্তি, ক্ষেত্রমণির লজ্জাশীলতার হানি প্রভৃতি, এবং প্রতিনায়ক পক্ষে—তাহাদের ঐ সকলের উদ্দীপক কার্যপ্রণালী ইহার উদ্দীপন-বিভাব। শোকরূপ স্থায়িভাবের কার্যপরম্পরা এখানে অনুভাব হইয়াছে, যথা—গোলক বসুর অপমৃত্যু শ্রবণে এবং নবীনমাধবের সাংঘাতিক আঘাত দর্শনে বসু পরিবার মধ্যে যে অদৃষ্ট-ধিক্কার, ভূপতন, ক্রন্দন, দীর্ঘনিশ্বাস, বিবর্ণতা প্রভৃতি জন্মিয়াছিল তাহাই এখানে অনুভাব, এবং অবশেষে তাহাদের বিয়োগজনিত নির্বেদ, মোহ, অপস্মার, ব্যাধি, গ্লানি, স্মৃতিভ্রম, বিষাদ, জড়তা, উন্মত্ততা প্রভৃতি লক্ষণ যাহা উক্ত বসু পরিবার মধ্যে দেখা গিয়াছিল, তাহাই ইহার ব্যভিচারিভাব। সুতরাং নীলদর্পণ সর্বতোভাবেই করুণরসাত্মক নাটক।

এক্ষণে উক্ত রসের পরিপাক কিরূপে হইয়াছে তাহাই দেখা যাক্। পরিপাকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে হইলে এরিস্টটল্ এর (Aristotle) মতানুযায়ী নীলদর্পণকে Protasis, Epitasis, Catastasis ও Catastrophe নামক চারি অংশে বিভক্ত করিতে হইবে। মানুষের দেহে ভুক্তদ্রব্য যেমন পৃথক পৃথক যন্ত্রের ভিতর দিয়া অবস্থান্তরক্রমে পরিপাক হইয়া যায়, নাটকের রসও সেইরূপ পৃথক অবস্থার ভিতর দিয়া অবস্থান্তরিত হইয়া পরিপক্কতা লাভ করে। দেখা যাক্ নীলদর্পণে তাহার কি হইয়াছে।

প্রথম,—Protasis (or Entrance) অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রবেশ :—সমস্ত নাটকের মধ্যে যে ক্রিয়া প্রদর্শিত হইবে তাহার অঙ্কুর এই অবস্থায় থাকে। নীলকরদের অত্যাচার আরম্ভ হওয়ায়, যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া করুণ রস ফুটিবে, সেই নায়ক ও পীঠমর্দদের মনস্তাপ প্রভৃতি প্রথম অঙ্কে অঙ্কুরের মতো প্রকাশ পাইয়া রসের সূচনা করিয়াছে।

দ্বিতীয়,—Epitasis অর্থাৎ ক্রিয়ার আরম্ভ :—এই অংশে মামুলি অত্যাচার তো আছেই, তাহার উপর নায়কের পিতার বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগের ষড়যন্ত্র আসিয়া নূতন বিপদের আশঙ্কায় সকলকেই শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। নাটকের দ্বিতীয় অবস্থায় এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাওয়ায় রসকে আরও একটু ঘনাইয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে এই ব্যাপার ছিল।

তৃতীয়,—Catastasis অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাকাষ্ঠা :—নাটকের এই তৃতীয় অবস্থায় ক্ষেত্রমণির উপর প্রাণঘাতী অত্যাচার, গোলকবসুর জেলখানায় অপমৃত্যু প্রভৃতি ঘটনায় রস বেশ পাকিয়া উঠিয়াছিল। নায়কের কর্তব্যাকর্তব্য তখনও নির্ধারিত না হওয়ায়, নাট্যক্রিয়া চতুর্থ অবস্থার প্রতীক্ষায় সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই, নতুবা রসের প্রগাঢ়তা এই অবস্থাতেই চূড়ান্ত হইয়াছিল। তৃতীয় এবং চতুর্থ অঙ্ক এই তৃতীয় অবস্থার ক্রীড়াভূমি।

চতুর্থ,—Catastrophe অর্থাৎ ক্রিয়ার আবিষ্কার বা অর্থানুভূতি :—নাটকের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ ক্রিয়ার সূচনার সময়ে ক্রিয়ার অর্থানুভূতি বা আবিষ্কার বিষয়ে যে কৌতূহল জন্মে, ক্রমে অবস্থার ক্রমিক পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে নাট্যক্রিয়া যখন আরও জটিল হয়, তখন সেই কৌতূহলের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া নাটকের চতুর্থ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিলে নাট্যক্রিয়ার অর্থানুভূতি বা আবিষ্ক্রিয়ার সহিত দর্শকের কৌতূহলও নিবৃত্ত হইয়া যায়। নীলদর্পণের প্রথম অবস্থায় রসের গতি সম্বন্ধে দর্শকের মনে

যে আকাঙ্ক্ষা ও কৌতূহল ছিল, নায়কের মৃত্যুর পর তাহা নিবৃত্ত হইয়াছে এবং ক্রিয়াও অনন্যাপেক্ষী হওয়ায় নাটকও শেষ হইয়া গিয়াছে। গ্রীক্ দার্শনিক এরিস্‌টটল্ এর (Aristotle) মতানুযায়ী অবস্থা চতুষ্টয়ের মধ্য দিয়া নীলদর্পণের নাট্যরস সুন্দররূপে পরিপক্বতা লাভ করিয়াছে।

নীলদর্পণের গঠনপ্রণালীর আলোচনা হইয়াছে, এবং তাহার প্রাণস্বরূপ রসের ভিতর দিয়া নাটকের অভ্যন্তরেও প্রবিষ্ট হওয়া গেল; অতঃপর সেই প্রাণভূত রস সমূর্ত হইয়া কি কি চরিত্রে বিকাশ পাইয়াছে তাহা দেখা যাক্।

নীলদর্পণের চরিত্রাবলীর বিশ্লেষণ

নায়ক :—নবীনমাধব নায়করূপে চিত্রিত হইয়াছেন। নাট্যকার তাঁহাকে পারিবারিক ও সামাজিক বহুগুণে বিভূষিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বীর্যবত্তা, পরোপকারিতা ও পিতৃভক্তির পরিচয় যত অধিকস্থানে পাওয়া গিয়াছে, তাহার তুলনায় তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা, বদান্যতা ও দেশ-হিতৈষণার পরিচয় অতি অল্প স্থানেই আছে। নাট্যকার নায়ককে আদর্শ চরিত্রবান্ করিলেও, নায়কের চেষ্টা ও ব্যবহারের দিক দিয়া ঐ আদর্শানুরূপ গুণনিচয় সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি পায় নাই। কোন বিশিষ্ট গুণের সহিত নাটকের দর্শক বা পাঠককে পরিচিত করাইতে হইলে হঠাৎ সেই গুণের কথা বলিলে চলিবে না, নায়কের প্রতি চেষ্টা বা ব্যবহার, ঐ গুণের দ্যোতক হওয়া চাই। নাট্যকার এততেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার নায়ককে আরও পারিবারিক গুণে ভূষিত করিতে ছাড়েন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ভ্রাতৃস্নেহ, তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে পত্নীপ্রেম ও ভ্রাতৃজায়াপ্রীতির নাম ক.া যাইতে পারে।

নায়ককে এইরূপে বহু গুণান্বিত করিতে যাইয়া প্রথমোক্ত তিন গুণ ছাড়া অপর কোনগুণই নাট্যকার তাঁহার চরিত্রে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিবার অবসর দেন নাই। ক্রিয়াক্ষেত্র স্বল্প হইলে বহুগুণান্বিত নায়ক তাঁহার সর্ববিধ গুণের ক্রিয়া দেখাইবার স্থান ও সময় পান না। এই কারণে নবীনমাধবের চরিত্র সংক্ষিপ্ত মনে হয়। নায়কের ক্রিয়া সম্পাদিত হইবার পরও মনে হয়, একটা কিছু যেন বাকী থাকিয়া গিয়াছে, সব কথা বলা হয় নাই। এই ত্রুটি ব্যতীত নায়কের ব্যবহার গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমীচীন হইয়াছে।

নায়িকা :—সৈরিন্ধ্রীও নায়কের ন্যায় আদর্শ রমণীরূপে চিত্রিতা হইয়াছেন। কোন্ চরিত্র কিরূপ হইয়াছে তাহার বিচার করিতে হইলে নাটকের উদ্দেশ্যের সহিত সেই চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে কিনা দেখিতে হইবে। সৈরিন্ধ্রী চরিত্রে কখনো দেবর ও দেবরজায়ার উপর অগাধ স্নেহ-ভালবাসার প্রয়োগ,—কখনো তাঁহার অকৃত্রিম পতিপ্রেম,—কখনো বা শ্বশ্রূর প্রতি অবিচলিত ভক্তি-শ্রদ্ধার জ্ঞাপন প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের ছবি যুগপৎ ক্রিয়া করিতে দেখিয়া নায়িকার আসল উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝা কঠিন হইয়াছে, এবং তজ্জন্য গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত নায়িকা চরিত্রের সামঞ্জস্য থাকে নাই। নিম্নে ঐ ত্রুটিগুলি দেখানো হইতেছে।

আখ্যায়িকা আরম্ভ হইবার পূর্বে নায়িকার মাতার মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাঁহার পিতা নীলকরদের হস্তেই গতাসু হন, এবং মাতাপিতৃহীন অবস্থায় নবীনমাধবের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। স্বামীগৃহে আসিয়া ঐ নীলকরদের অত্যাচারের পুনরভিনয় তিনি দেখিলেন। এরূপ অবস্থায় সতত

সশঙ্ক থাকা তাঁহার উচিত ছিল; কিন্তু নাট্যকার তাঁহাকে কতকটা নিশ্চিন্ত করিয়া চিত্রিতা করিয়াছেন। আরও এক অন্তরায় এই যে, দেবরজায়ার প্রতি নায়িকার স্নেহের উল্লেখ নাটকের মধ্যে এত অধিক স্থানে আছে যে, উহা গৌণভাবে রাখিলে তাঁহার চরিত্র যেরূপ মধুর হইত মুখ্যভাবে প্রকাশিত হওয়ায় সেরূপ হইতে পারে নাই। প্রত্যেক ভাবের চিত্রগুলি পরস্পর অসংলগ্ন থাকিয়া নায়িকাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়াছিল। যে রমণী পতিবিয়োগে সহমরণে যাইতে কৃতসংকল্পা হইয়া ধৈর্যের সহিত স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পুত্রের হাত দিয়া স্বয়ং সম্পাদিত করিতেছিলেন, এমন কি, দীনপালক স্বামীর সদ্গতি প্রার্থনা করিয়া অনাথনাথ বিশ্বনাথের চরণে অনুপ্রাস ও যমক অলংকার বহুল ছন্দে তাঁহার আশীর্বাদ কামনা করিতেছিলেন, সে রমণী সাধারণ নারীর মতো "মধ্যাহ্ন সময় আমার সুখসূর্য অস্তগত হইল, আমার বিপিনের উপায় কি হইবে?"—বলিয়া বিলাপ করেন না।

এইরূপে কখন মনোভাব ও ইঙ্গিতের সহিত কথার, কখন বা কথার সহিত মনোভাব ও ইঙ্গিতের মিল না থাকায় নায়িকা চরিত্রটি অসমঞ্জস হইয়াছে। যতই আদর্শরূপে তাঁহাকে চিত্রিতা করিবার চেষ্টা থাকুক না কেন, পূর্বোক্ত নানা কারণে উহা নিষ্প্রভ হইয়াছে। অধিকন্তু ভাষার ভারে নায়িকা এতই ভারাক্রান্তা ছিলেন যে, নাট্যক্ষেত্র-মধ্যে সচ্ছন্দ বিচরণের ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। ভাবের ভাষা সরল না হইলে চরিত্র জীবন্ত হইতে পারে না।

গোলক বসু:—মাত্র প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে তাঁহার পরিচয় আমাদের সহিত ঘটিয়াছিল, এবং সেই এক পরিচয়েই তাঁহাকে ধর্মপ্রাণ, নির্বিরোধ গ্রাম্য গৃহস্থ জমিদাররূপে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

সাবিত্রী:—নাটকের মধ্যে মাত্র পাঁচটি স্থানে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে এবং প্রতিবারেই তাঁহার চরিত্রে রমণীয়তা লক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রের একদিকে যেমন পরিজনবর্গের উপর স্নেহের নিদর্শন আছে, অপর দিকে তেমনি প্রতিবেশীদের সুখ-দুঃখে তাঁহার সহানুভূতিও দেখা গিয়াছে। তাঁহার চরিত্রের পরদুঃখকাতরতা ও সাহসিকতা গুণ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নবীনমাধবে বর্তিয়াছিল। পুত্রের প্রতি স্নেহশীলা বাঙ্গালীঘরের কয়জন মাতা পুত্রকে বিপদের সম্মুখীন করিয়া—'যদি নীলবানরের হস্ত হইতে পবিত্র মাণিক্য অপবিত্র না হইতে হইতেই আনিতে পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম'—বলিতে পারেন? পতিপুত্রশোকে উন্মাদ অবস্থার মধ্যেও সাবিত্রীর স্বাভাবিকী স্নেহবৃত্তি কতকটা বিশৃঙ্খল হইলেও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। নাট্যকার বেশ কৌশলের সহিত সাবিত্রীর উন্মাদচিত্রটি আঁকিয়াছেন। এক পুত্রের বিয়োগে উন্মত্ততার আরম্ভ দেখাইয়া, বহুদিন পরে বিদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাগত দ্বিতীয় পুত্রের আগমনে ও আহ্বানে তাঁহার জ্ঞানদীপ চির-নির্বাপিত হইবার পূর্বে একবার উজ্জ্বল রাখিয়া পরক্ষণেই নিজ দোষে কন্যাসদৃশা কনিষ্ঠা পুত্রবধূর মৃত্যু-জনিত আক্ষেপের মধ্যেই নাট্যকার তাঁহাকে মৃত্যুবরণ করাইলেন। সাবিত্রী চরিত্র নাট্যসাহিত্যে এক অপূর্ব সামগ্রী, দীনবন্ধুর পূর্বগামী কোন নাট্যকারই এরূপ সুন্দর সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করেন নাই।

বিন্দুমাধব:—এই চরিত্রের সহিত জনসাধারণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ তিনটি স্থানে হইয়াছে। ইহা ছাড়া পত্র বা পরের মুখে তাঁহার সম্বন্ধে একটা ধারণা আগে থাকতেই সকলের জন্মিয়া গিয়াছিল। নাট্যকার উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত এক যুবকের চিত্র বিন্দুমাধবে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিন্দুমাধব যখন অপরের সহিত সংলাপে নিযুক্ত থাকে, তখন তাহার চরিত্রটি স্বভাবসঙ্গত মনে হয়, কিন্তু যখন স্বগতোক্তি দ্বারা নিজ চিন্তা বা মনোভাব ব্যক্ত করে, তখন ঐগুলি কৃত্রিম বোধ হয়। তাহার

চিন্তা বা ভাবের দোষে এরূপ মনে হয় না, যে ভাষায় ঐগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহারই দোষ। বিন্দুমাধবের ভাষায় রূপক অলংকার ও দীর্ঘসমাসের এত বাহুল্য যে, ঐগুলির আবরণ ভেদ করিয়া তাহার চিন্তা বা ভাবের তরঙ্গ বাহির করিতে বেগ পাইতে হয়।

ইন্দ্রাবাদের জেলখানায় উড়ানি-পাকানো দড়িতে পিতার মৃতদেহ ঝুলিতে দেখিয়া উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত কোন যুবকই—"হাঃ আহারান্বেষণে ভ্রমণকারী বকদম্পতির মধ্যে বক ব্যাধ কর্তৃক হত হইলে শাবক-বেষ্টিত বক-পত্নী যেমন সঙ্কটে পড়ে, জননী আমার, আপনার উদ্‌বন্ধন সংবাদে সেইরূপ হইবেন"—এরূপ ভাষায় খেদ করে না। আকস্মিক বিপদে লোকের বাঙ্‌নিষ্পত্তিই থাকে না, যদি বা বাক্যস্ফূর্তি হয়, তাহা হইলে ঐরূপ উপমান-উপমেয় দ্বারা শোক-প্রকাশের ভঙ্গী অস্বাভাবিক ঠেকে। পণ্ডিত বা মূর্খের ভাষাগত পার্থক্য শোকের সময় প্রায় থাকে না—যাহা কিছু প্রভেদ থাকে তাহা ভাব বা রুচির। বিন্দুমাধবের শোকে ঐরূপ কোন নূতনত্ব ছিল না। পিতার মৃতদেহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার কলেজ ছাড়ার বিবরণ, নীলকরদের অত্যাচার-বিষয়ক আলোচনা এবং পাদরী সাহেবের বদান্যতার পরিচয়-প্রদান প্রভৃতি বহু অবান্তর প্রসঙ্গের যুগপৎ উত্থাপন বিন্দুমাধবের মুখে ঐ সময়ে বড়ই বিসদৃশ দেখাইয়াছে। ঐ প্রসঙ্গগুলি অন্য কোন দৃশ্যে ভিন্ন কৌশলে প্রদর্শিত হইলে এই দৃশ্যটির গাম্ভীর্য বজায় থাকিত এবং বিন্দুমাধবের শোকে কৃত্রিমতার ছায়া আসিত না।

সরলতা :—স্বামী চরিত্রের দোষ পত্নী চরিত্রেও বর্তিয়াছে। অপরের সহিত কথাবার্তায় বা ব্যবহারে সরলতা বাস্তবিকই সরলতার প্রতিমূর্তি, কিন্তু যখন তিনি পৃথকভাবে চিন্তা করেন, তখন তাঁহার চিন্তার মধ্যে বহু অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ হুড়্‌মুড়্‌ করিয়া আসিয়া তাঁহার চরিত্রের প্রাঞ্জলতা নষ্ট করিয়া দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ :—পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে সরলতার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীলা শ্বশ্রূঠাকুরাণী যখন উন্মত্ত অবস্থায় নবীনমাধবের মৃতদেহকে বেষ্টন করিয়া গণ্ডির বীভৎস মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মৃতদেহের চারিদিকে ঘুরিতেছিলেন, সরলতা তখন সেই ভয়াবহ স্থানে উপস্থিত হইয়া নিজ স্বামী বিন্দুমাধবকেই নিদ্রিত মনে করিয়া নিদ্রা-সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্বসম্বলিত বক্তৃতা দেওয়া বা তৎসহ মেঘাচ্ছন্ন রজনীর তুলনা করা উক্ত স্থান বা ঘটনার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়াছিল। সরলতা লেখা-পড়া জানিতেন, বিন্দুমাধবের মতো তাঁহারও তৎকালোচিত মনোভাব ভাষার আড়ম্বরে চাপা পড়িয়াছিল। সরলতা চরিত্রটি মধুর হইয়াও স্থানে-স্থানে উপরিউক্ত দোষদুষ্ট হইয়াছে।

আদুরী :—এই চরিত্রটি নাট্যকারের নূতন সৃষ্টি। এরূপ প্রকৃতির দাসী অধুনা দুর্লভ হইলেও প্রাচীনকালে সুলভ ছিল। এই চরিত্রটি এত স্বভাবসঙ্গত হইয়াছে যে, সে কথা কহিলেই তাহার সমুদয় চিত্রটি একেবারে হাজির হয়। তাহার সরলতা, আন্তরিকতা এবং যে ভাষায় সে কথা বলে তাহা, বাস্তবিকই তাহার মতো হইয়াছে। উত্তরকালে এই চরিত্রকে আদর্শ করিয়া বহু নাট্যকার বহু চিত্র আঁকিয়াছেন।

সাধুচরণ ও তাহার পরিবারবর্গ :—নাট্যকার গোলকবসুর সংসারকে যেমন একটি আদর্শ হিন্দু-গৃহস্থ পরিবাররূপে দেখাইয়াছেন, সাধুচরণের সংসারকেও সেরূপ একটি আদর্শ হিন্দু কৃষক পরিবাররূপে বর্ণিত করিয়াছেন। বসুপরিবারকে উচ্চ আদর্শের অনুরূপ করিতে যাইয়া স্থানে-স্থানে তাঁহার অভিজ্ঞতা বাধা পাইয়াছিল, কিন্তু এই কৃষক-পরিবার চিত্রণ-বিষয়ে সে বাধার নাম-গন্ধ ছিল না,—এখানে তাঁহার সহানুভূতি ও অভিজ্ঞতা সাবলীল ছিল। সাধুচরণ লেখা-পড়া জানিত, এবং বসুপরিবারের

সংস্পর্শে আসিয়া তাহার চরিত্রে চাষা-সুলভ চপলতা প্রকাশ পায় নাই, বিজ্ঞতা ও ধীরতা তাহার আচরণে দেখা গিয়াছিল। এমন কি—কন্যার মৃত্যু সময়েও তাহার চিত্তের স্থৈর্য নষ্ট হয় নাই। তাহার বিজ্ঞতাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার শত্রু-পক্ষীয়েরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিলেও, তাহাদের দ্বারাই সে আবার মাতব্বর রাইয়ত আখ্যা পাইযাছিল। নবীনমাধব কর্তৃক উপকৃত বলিয়া সাধুচরণ আজীবন বসু-পরিবারের বন্ধু ছিল।

রাইচরণে :—চাষার তেজ ও সাহস থাকিলেও সাধুচরণ দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় সেগুলি প্রকাশিত হইবার অবসর পায় নাই।

রেবতী :—চাষাঘরের গৃহিণীর মতই সরল ও স্নেহশালিনী।

ক্ষেত্রমণি :—বালিকা, কিন্তু বালিকা হইলেও স্ত্রীজাতিসুলভ তেজ তাহার বিলক্ষণ ছিল। নীলকর কতৃক যখন তাহার লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত ঘটিতেছিল, এবং বহু অনুনয়-বিনয়ের পরও যখন ঐ নীলকর তাহার হস্তধারণ করিয়া তাহাকে বেইজ্জত করিতে উদ্যত হইল, তখন তাহাকে উদ্দেশ করিয়া ক্ষেত্রমণি :—"ও আঁটকুড়ীপুৎ, তোর বাড়ী জোড়া মরা মরে, মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি, তোর হাত মুই এঁচড়ে-কেমড়ে টুক্‌রো-টুক্‌রো করবো ; তোর মা বুন্ নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে যা, দেঁড়িয়ে রলি কেন? ও ভাই-ভাতারীর ভাই—মার্ না, মোর প্রাণ বার ক'রে ফ্যাল্ না, আর যে মুই সইতে পারি নে"—এরূপে প্রাণের ভাষায় কথা কহিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই সকল চরিত্রের ভাব, ভাষা ও চিন্তা বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তজ্জন্য জীবন্ত হইয়াছে।

তোরাপ :—নাট্যকারের আর একটি অপূব সৃষ্টি। এরূপ প্রভুভক্ত বীব মুসলমান প্রজার চিত্র দীনবন্ধুর পূবে আর কোন নাট্যকার দেখান নাই। তোরাপের ভাষা তাহার ভাব ও চিন্তার সহিত যেন নাচিতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্র-চিত্রণ-ব্যাপারে নাট্যকার তাঁহার কলমের এক এক আঁচড়ে এক একটি জীবন্ত প্রতিমূর্তি চিত্রিত করিয়াছেন।

গোপীনাথ :—চরিত্রেও নাট্যকার যথেষ্ট গুণপনা দেখাইয়াছেন। অধুনা অনেক কর্মচারী ঠিক গোপীনাথ না হইলেও তাহার নিকটবর্তী হইবার যোগ্য। প্রতি কার্যে প্রভু কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া অবশেষে গোপীনাথের মনে তাহার কৃতকর্মের জন্য একটা অনুতাপ আসিযাছিল, কিন্তু শরতের মেঘের মতো উহা দেখা দিয়াই উড়িয়া গেল, কারণ সাহেবের ডাকের উত্তরে—"বন্দা হাজির। এবার কার পালা—প্রেমসিন্ধু নীরে বহে নানা তরঙ্গ"—কথাগুলির মধ্যগত কর্মবাত্যায় ঐ মেঘ আর তিষ্ঠিতে পারিল না। উদ্দেশ্যহীন জীবন এইরূপই হয়।

নীলকরদ্বয় সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই। ইহাদের অত্যাচারের সহিত নাট্যক্রিয়ার সম্বন্ধ ছিল, এবং সেই অত্যাচার দৃশ্যে-দৃশ্যে ফুটিয়া ঐ অত্যাচারী মূর্তিদ্বয়কে বেশ প্রকট করিয়াছিল।

এই কয়টি প্রধান চরিত্র লইয়া নীলদর্পণ নাটক রচিত হইয়াছে। বিশ্লেষণ দ্বারা ঐ গুলির দোসগুণ প্রদর্শিত হইল। অন্যান্য বলিবার বিষয় দীনবন্ধু-কালের উপসংহারে বলা হইবে।

নবীন-তপস্বিনী

দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাটক নবীন-তপস্বিনী ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জনাইয়ের পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আহিরীটোলাস্থিত বাস-ভবনে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি

মিলনান্ত নাটক। নাট্যকার তাঁহার প্রথম নাটকে যেরূপ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, এ নাটকে সে শক্তির ন্যূনতা পরিদৃষ্ট হইয়াছে। নাটকে ক্রিয়ার ঐক্য সুরক্ষিত হয় নাই। নাটকান্তর্গত দুইটি ক্রিয়াকে প্রাধান্য দেওয়ায় মূল ক্রিয়ার চমৎকারিত্ব নষ্ট হইয়াছে। নায়ক-বিজয় ও নায়িক-কামিনী ঘটিত ব্যাপার মূল ক্রিয়া। জলধর-মালতী বিষয়ক ঘটনা আপেক্ষিক ক্রিয়ারূপে সৃষ্ট হইলেও, নাট্যকারের স্বাভাবিক সহানুভূতির ছায়ায় পুষ্ট হইয়া ঐ ক্রিয়াটি মূল ক্রিয়ার সৌন্দর্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। আরও এক কারণে নবীন-তপস্বিনী শক্তিশালিনী হইতে পারে নাই—সেটি নাটকের মধ্যে যেখানে সেখানে নাট্যকারের সামাজিক অভিজ্ঞতা-প্রসূত বিচিত্র চরিত্রের অযথা সমাবেশ। ঘটক, পণ্ডিত, গুরু প্রভৃতি কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক চরিত্র আসিয়া নাটকটিকে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়াছে। নীলদর্পণে যে দোষগুলি অল্পমাত্রায় ছিল, এ নাটকে সেগুলি পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়াছে। নাট্যকার নায়ক-নায়িকাকে অতিমাত্রায় আদর্শ নর-নারী করিতে যাওয়ায় তাহাদের ঘাত-প্রতিঘাতহীন জীবনস্রোতে চরিত্র আদৌ দাঁড়াইতে পারে নাই।

রমণীমোহন ও তপস্বিনীর শোক-পরম্পরা লোকলোচনের অন্তরালেই ছিল। ঐ শোক কাহিনী তাহাদের প্রমুখাৎ মাঝে মাঝে দর্শক বা পাঠকের শ্রুতিপথে আসিয়াছে মাত্র। রমণীমোহন-তপস্বিনী বা বিজয়-কামিনীর সংলাপে কিংবা তাহাদের সুখ-দুঃখে দর্শক সাধারণের সহানুভূতি আপনা-হইতে উদ্রিক্ত হয় না—কারণ সেগুলি সাজানো ও কৃত্রিম। মল্লিকা চরিত্রটি যেন ফুটন্ত মল্লিকা, তাহার পরিহাস-পরিমলে নাটকের আদ্যন্ত ভরপুর। মালতী মল্লিকার মতো বাগ্-বৈদগ্ধ্য-সম্পন্না না হইলেও, অরসিকা ছিল না। নাট্যকবি তাহার চরিত্রে স্ত্রীজাতিসুলভ ব্রীড়া ও গাম্ভীর্যের রসান দিয়া তাহাকে আরও মনোহারিণী করিয়াছেন। দীনবন্ধুর পূর্ববর্তী বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যে এ ধরণের স্ত্রী-চরিত্র দেখা যায় নাই, এটিও তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি।

জলধর-জগদম্বা চরিত্র নাট্যকারের অপূর্ব সৃষ্টি। কেহ কেহ অনুমান করেন শেক্সপীয়রের 'Merry wives of Windsor' নাটকের চরিত্র বিশেষের ছায়া লইয়া নাট্যকার জলধর চরিত্রটি আঁকিয়াছেন। তাঁহাদের অনুমানের সত্যাসত্য এখানে বিচার্য নহে, তবে এটি গৃহীত চরিত্র হইলেও ইহার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয় নাই, নাট্যকবির এমনই অসাধারণ কৃতিত্ব! মাধব চরিত্রও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—এতাবৎকাল বিদূষক-চরিত্র তরলমতি ব্যবহারিক জ্ঞানহীন ঔদরিকরূপে চিত্রিত হইয়াছে, দীনবন্ধুই ঐ চরিত্রকে তাদৃশ উচ্ছৃঙ্খল না করিয়া একটু সংযত ও প্রেমিক করিয়াছেন—এই নূতনত্বে মাধব মধুর হইয়াছে। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই।

নবীন-তপস্বিনীর পর দীনবন্ধু 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়া' ও 'সধবার একাদশী' রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐগুলি ভিন্ন জাতীয় দৃশ্যকাব্য বলিয়া নাটক পর্যায়ের মধ্যে ইহারা আলোচিত হইল না, পরে যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

'সধবার একাদশীর' অব্যবহিত পরে লীলাবতী রচিত হইয়াছিল। ইহার রচনাকাল ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ, এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে তারিখে শ্যামবাজারস্থিত বৃন্দাবন পাল গলির রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়ীতে ভাবী ন্যাশনাল থিয়েটার-সম্প্রদায় কর্তৃক এই নাটকখানি প্রথমে কলিকাতার

অভিনীত হইয়াছিল। তৎপূর্বে ঐ বৎসরের ৩০শে মার্চ তারিখে চুঁচুড়ায় শ্যামবাবুর ঘাটের নিকটে মল্লিক বাড়ীতে ইহার আর এক অভিনয় হইয়াছিল। নবীন তপস্বিনীর মতো এই নাটকেও কতক-গুলি ঘটনা কথারম্ভ আরম্ভের পূর্বে গুপ্তভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল। ঐগুলির প্রকৃত বিবরণ নাটকান্তর্গত বহু পাত্র-পাত্রীর কাছ অপ্রকাশিত ছিল, তজ্জন্য নাটকের কতকগুলি ক্রিয়া ঐ সকল চরিত্রের কাছে প্রথমে প্রহেলিকার মতো থাকিয়া পরিশেষে উপসংহার-সন্ধিকালে অদ্ভুত রসের সমাবেশ দ্বারা তাহাদের প্রকৃত তাৎপর্য বাহির হইয়াছে।

সংস্কৃত আলংকারিক পণ্ডিত বিশ্বনাথ এই কৌশলকে নাটকের একটি গুণ বলিয়াছেন। নাটকের লক্ষণ নির্দ্ধারণকালে তিনি উপসংহারাখ্য সন্ধি সম্বন্ধে একস্থানে বলিয়াছেন- "অন্তেরসাঃ সর্বে কার্য নির্বহণেঽদ্ভুতং" অর্থাৎ নাটকের উপসংহারাখ্য সন্ধিকালে নায়কাদির কার্যাদিপ্রসূত রস সকল অদ্ভুত কার্য নির্বাহের সহায়-স্বরূপ হইবে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হোক্ নাট্যকারের নবীন-তপস্বিনী ও লীলাবতী নাটকদ্বয়ে এই রীতি অবলম্বিত হইয়াছিল।

বঙ্কিম বাবুর মতে লীলাবতী নাট্যকারের নাট্য-প্রতিভার মধ্যাহ্নকালে রচিত হইয়াছিল; বাস্তবিক লীলাবতীর চরিত্রাবলি যেরূপ পূর্ণতা পাইয়াছিল, ইহার পূর্ববর্তী নাটক দুখানির কোন চরিত্রই সেরূপ সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তিলাভ করে নাই। ঐগুলিতে নায়ক-নায়িকা অপেক্ষা তাহাদের পীঠমর্দের চরিত্রগুলি স্ফুটতর ছিল, কিন্তু লীলাবতীতে নায়ক-নায়িকা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের পীঠমর্দ, এমন কি, প্রতিনায়ক ও তাহার পীঠমর্দ প্রভৃতি যাবতীয় চরিত্রই বেশ সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছিল।

লীলাবতীর আর একটি গুণ এই যে, ইহার কবিতার অতিরিক্ত অংশ বাদ দিলে সংলাপগুলি যেন ওজন করিয়া লেখা এরূপ মনে হয়। এমন কি ইহার নায়ক-নায়িকাও তাঁহার অন্যান্য নাটকের ন্যায় বেশী বাজে বকে নাই। নাট্যকার লীলাবতীতে যে সমাজচিত্র আঁকিয়াছিলেন তাহা নূতন ধরণের—হিন্দু ও ব্রাহ্ম সামাজিকের উদ্ভট সম্মিলনে উহা উদ্ভূত হইয়াছিল। হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় কুলধর্ম্ম পালনের জন্য আপনার শিক্ষিতা কন্যাকে এক চরিত্রহীন মূর্খের সহিত বিবাহ দিতে বদ্ধ-পরিকর ছিলেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্ম ললিতকে শাস্ত্রসম্মত যাগাদি করিয়া কিরূপে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ইহা সমস্যার কথা বটে। তবে নাট্যকার ব্রাহ্ম অর্থে নব্য-সভ্যতাপ্রিয় কুসংস্কার বর্জিত এরূপ অর্থ যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্য কথা। কিন্তু তাহাই বা অবিসংবাদিত-রূপে কিরূপে গ্রহণ করা যাইবে, কারণ ললিতের গৃহত্যাগের পর হরবিলাস বাবু ঐ ললিতের অনুরোধেই অনেক ধর্ম ও আচার বিরুদ্ধ ক্রিয়াও করিয়াছিলেন, যথা—গ্রামের ভিতর দীক্ষাপ্রথা উঠাইয়া দেওয়া, এঁটোর বাছ-বিচার তাদৃশ না করা, ব্রাহ্মণ-শূদ্রে এক হুকায় তামাক খাওয়া প্রভৃতি, সুতরাং ললিত যে কেবল সামাজিক আচার-ব্যবহারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিল তাহা নহে, তৎকালীন হিন্দুসমাজে অবশ্য প্রতিপাল্য দীক্ষাগ্রহণ প্রথারূপ আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার উপরেও ফতোয়া-জারি করিয়া-ছিল, এই সকল কারণে তাহাকে নবালোক-প্রাপ্ত ব্রাহ্ম মতাবলম্বী বলিলে চলিবে না, কুলধর্মত্যাগী ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী বলিতে হইবে। কুলত্যাগী ললিতকে কুলাচারী হরবিলাস পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া কিরূপে কুলধর্ম রক্ষা করিবেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। শুধু যে পোষ্যপুত্র লইবার অজুহাতে ললিতকে জামাতা করিতে চাহেন নাই, তাহাও নহে, ললিতের অকুলীনত্ব তাহাকে সে পদগ্রহণে অনুপযুক্ত করিয়াছিল। দীনবন্ধু বাবুর কালে ইয়ং-বেঙ্গল দল মাথা তুলিলেও সমাজবন্ধন এখনকার

মতো সে দিনে প্রথ ছিল না। ইহাকে সমাজবিদ্রোহীর চিত্রই বা কি করিয়া বলা যায়, কারণ তাহাতেও তো পূর্বাপর সামঞ্জস্য ও যুক্তি থাকে। লীলাবতী যত্নসহকারে লিখিত হওয়া সত্বেও নাট্যকারের দেশ-কাল-পাত্রের জ্ঞান সকল স্থলে কার্যকরী হয় নাই, নিম্নের দুই-তিনটি উদাহরণে তাহা স্পষ্টীকৃত হইবে।

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে হেমচাঁদ যখন শারদাসুন্দরীকে অনেক শিখাইয়া-পড়াইয়া নদেরচাঁদের সম্মুখে কথা কহিবার জন্য হাজির করিল, তখন নদেরচাঁদের ইতরজনোচিত উপহাসে শারদাসুন্দরী পলাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগত ছেলেদের খাবার প্রস্তুত করিবার অছিলা তাঁহার ঐ পলায়নের কৈফিয়ৎ হইয়াছিল। কিন্তু ভোলানাথের পরিবার-মধ্যে ইতঃপূর্বে কোন বালকের অস্তিত্বের কথা বলা হয় নাই, সুতরাং অন্য কোন আপত্তি তুলিলে এরূপ অসঙ্গত কারণের উল্লেখ করিতে হইত না। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে পাত্রী দেখাইবার সময়ে হরবিলাসের নমস্য মেজ খুড়া প্রভৃতি বর্ষীয়ান্ প্রতিবেশীদের সম্মুখে এবং শিক্ষিতা ও বয়স্থা পাত্রী লীলাবতীর উপস্থিতিতে নব্য-সভ্যতাপ্রিয় ললিত ও সিদ্ধেশ্বরের পোষকতায় নদেরচাঁদ ও হেমচাঁদকে লইয়া অতটা বেয়াদপি যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। ললিতের ধৈর্যচ্যুতির লক্ষণ যদিও তাহার বক্তৃতার মধ্যে ছিল, কিন্তু পরক্ষণে সেই বক্তৃতার ধুয়া ধরিয়া বেয়াদপির মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছিল—এমন কি বাড়ীর চাকর রঘুয়া পর্যন্ত ঐ ফেলেল্লামিতে যোগ দিল। ইহা পূর্ব বর্ণিত ত্রুটির আর একটি নিদর্শন। চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে মামা ও ভাগিনেয়ের চার ইয়ার লইয়া মদ্যপান ও ইয়ারকি তৎকালীন ইয়ং বেঙ্গলপূর্ণ সমাজের কোন নিভৃত অঙ্গে সম্ভবপর হইলেও বাঙ্গালীর শুদ্ধান্তঃপুর মধ্যে বড়ই বিসদৃশ দেখাইয়াছিল। বিশেষতঃ মাতৃস্থানীয়া মাতুলানীকে লইয়া ইতরজনোচিত ঠাট্টা বিদ্রূপ মাতাল মুখে কদাচিৎ বাহির হইলেও ভদ্রসমাজে উহা চাপা দিবার সামগ্রী। নাট্যকার এ সকল বিষয়ে একটু সংযত হইতে পারিতেন।

নীলদর্পণের নবীন-সৌরিন্ধ্রী বা বিন্দু-সরলতার দীর্ঘসমাসবহুল কথোপকথন জন-সাধারণের তৃপ্তিকর হয় নাই দীনবন্ধু তাহা জানিতেন, তজ্জন্য ইহার পরবর্তী নাটক নবীন-তপস্বিনীতে মাঝে মাঝে কবিতার আশ্রয়ে উচ্চভাবাদি প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে নূতনত্ব আসিলেও অনুপ্রাস-অলঙ্কার বাহুল্যে কবিতাগুলি দুর্বোধ হইয়াছিল। এ ত্রুটিও নাট্যকারের অলক্ষিত রহিল না। লীলাবতীর কবিতাবলি অপেক্ষাকৃত সরল হইয়াছিল বটে, কিন্তু নাট্যকারের কবিতার বেগ এতই প্রবল হইয়া আসিল যে চলিত কথার মধ্যেও তাহার ঢেউ চলিয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ :—'এখন নয়নতারা বাহিরেতে যাই। যা তুমি বলিবে আমি করিব তাহাই।' ইত্যাদি। এই কবিতা প্রসঙ্গে আর এক কথা মনে পড়িয়া গেল। অরবিন্দ-রূপী যোগজীবন লীলাবতীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সে 'মেঘনাদবধ কাব্য পড়িতে পারে কি না, এবং তাহার অর্থ-ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে কি না?' তদুত্তরে লীলাবতী বলিয়াছিলেন 'শক্ত-শক্ত কথার মানে লেখা আছে ইত্যাদি।' লীলাবতী তখনও শিক্ষা-নবিশী করিতেছেন, সুতরাং কিরূপে তিনি যেখানে সেখানে পয়ার ও অমিত্রছন্দে অনর্গল উক্তি-প্রত্যুক্তি করিতে পারিলেন বুঝা গেল না।

হরবিলাসের পরিবারবর্গের মিলন চাঁপার অপূর্ব কৌশলে অদ্ভুতভাবে সংঘটিত হইয়াছিল। খণ্ডগিরি গুহায় বা পুরুষোত্তমের মন্দির প্রাঙ্গণে অথবা নাগপুরের জঙ্গলে চাঁপা-ঘটিত অপবাদ দূরীকরণার্থ বনচারী অরবিন্দের জীবন রক্ষার নিমিত্ত কৃতসংকল্পা চাঁপার সহিত নাট্যকার যদি তাঁহার নাটকের দর্শক বা পাঠকের পরিচয় অরবিন্দের অসাক্ষাতে আরও একটু ঘনিষ্ঠভাবে করাইতে পারিতেন, তাহা

হইলে নাটকটি মনোরম হইত। এ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও লীলাবতী নাটকখানি দীনবন্ধুর প্রতিভামণ্ডিত হইয়াছিল, এবং এককালে ইহা রঙ্গভূমির দর্শক-সাধারণের আদরের সামগ্রী হইয়াছিল।

কমলে-কামিনী

কমলেকামিনী লীলাবতীর অব্যবহিত পরবর্তী নাটক নহে, এক জাতীয় দৃশ্যকাব্য বলিয়া এ খানির আলোচনা ইহার পরে করা হইল। কমলেকামিনী রচনার তারিখ জানা যায় নাই। তবে ইহা যে নাট্যকারের শেষ রচনা তাহা অনুমানে বুঝা যায়, কারণ কমলে কামিনী প্রকাশিত হইবার অত্যল্পকাল মধ্যে দীনবন্ধু ভবলীলা সাঙ্গ করেন। এখানি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে চিৎপুর রোডস্থিত মধুসূদন স্যান্নালের ভবনে ন্যাশানাল থিয়েটার কর্তৃক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাট্যকারের প্রতিভার উৎস ক্রমশঃ যে মন্দীভূত হইতেছিল তাহার নিদর্শন এই নাটকের অভ্যন্তরে পাওয়া গিয়াছে। ইহা ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই দৃশ্যকাব্যের নূতনত্ব এই যে, ইহার বর্ণনীয় প্রেম-প্রবাহটিকে নাট্যকার প্রথম হইতে এক যোদ্ধৃহৃদয়ের লৌহবর্মের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রাখিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন; কার্যক্ষেত্রে কিন্তু সেই অমূর্ত প্রেম সমূর্ত হইয়া বর্মভেদপূর্বক প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল; অবশ্য এটি নাট্যকারের স্বেচ্ছাক্রমেই ঘটিয়াছিল। নাট্যকার প্রথম অঙ্কে বীররসের পাক চড়াইয়া তাঁহার দর্শক বা পাঠককে যে রসবৈচিত্র্য দেখাইতে গিয়াছিলেন, সে রস পরিপক্বতা লাভ করিবার পূর্বেই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আদিরসের প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছিল।

এই নাটকখানির কথাবস্তু 'প্রথম দর্শনে প্রাণ বিনিময়' (love of first sight) নামক ইংরাজি তত্ত্বভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই প্রতীচ্য প্রবচনের সার্থকতা প্রাচ্যদের কাছে নূতন নহে। হিন্দুদের পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক অনেক উপাখ্যান ঐ তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দীনবন্ধু ঐ তত্ত্বের সমাধান তদানীন্তন সামাজিক অনুশাসনে শাসিত বঙ্গান্তঃপুরচারিণীদের সাহায্যে না করিয়া রাজান্তঃপুরের সাহায্য লইয়াছিলেন। নাটকখানির আদ্যোপান্ত নাট্যকারের স্বভাবসুলভ পরিহাস-রসিকতায় মুখরিত। নীলদর্পণ বা লীলাবতীতে যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গিয়াছিল, এ নাটকে সে শক্তি মন্দীভূত হইয়াছে। ইহার চারিত্রিক লাভ—সুরবালা ও রণকল্যাণী। নাটকের মধ্যে যে-যে স্থানে এই দুইজনকে একসঙ্গে দেখা গিয়াছে, সেই সেই স্থানে ইহা সরস, বাকী অংশগুলি নীরস।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, নাট্যকার নাটকগুলিকে তাঁহার সর্ববিধ অভিজ্ঞতা-প্রকাশের ক্ষেত্রস্বরূপ জ্ঞান করিতেন এবং সেই প্রেরণার বশে বক্ষ্যমাণ নাটকেও তিনি অনেক অসমীচীন কথা প্রয়োগ করিয়াছেন। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজা ও পারিষদবেষ্টিত রাসমণ্ডপের সম্মুখে রাসলীলা অভিনয় ব্যপদেশে কৃষ্ণবিরহকাতরা রাইকিশোরীবেশী রণকল্যাণীকে উদ্দেশ করিয়া দূতীবেশী সুরবালা এইরূপ বলিয়াছে :—"বিরহিনী মুখে বলেন আহার নাই, কিন্তু ভোজন পাত্রের পার্শ্বে দেশের ডাঁটা চিবায়ে বিন্ধ্যাচল নির্মাণ করেন। মুখে বলেন নিদ্রা নাই, কিন্তু নাসিকা ধ্বনিতে গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়।" এই জাতীয় পরিহাস, এবং ঐ দৃশ্যেই কৃষ্ণরূপী শিখণ্ডীবাহন যখন রাইকিশোরীর নিকট যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল, তখন দূতী সুরবালা শিখণ্ডীবাহনের আগ্রহ দেখিয়া এইরূপ বলিয়াছিল :—'অনুমতি লবে না?' শিখণ্ডী—'আমি অনুমতির অপেক্ষা করিতে পারি না।' সুরবালা—

'শনিবারের জামাইয়ের মতো ব্যস্ত হ'লে যে', এই সব রঙ্গরস সমীচীন হয় নাই। কারণ প্রথমটিতে বঙ্গনারীর স্বভাবের পরিচয় আছে এবং দ্বিতীয়টিতে কেরাণী নামধেয় বাঙালী পুরুষের অভ্যাসের ব্যাখ্যান-মাত্র দেওয়া হইয়াছে। রাইকিশোরীকে বঙ্গনারী এবং শিখণ্ডীবাহনকে বঙ্গপুরুষের কোন একটা বিশিষ্ট দোষের অজুহাতে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা দেশ-কাল-পাত্রোচিত হয় নাই। বিশেষতঃ শিখণ্ডীবাহন, রণকল্যাণী ও সুরবালা যখন ছদ্মবেশে ঐ রাসমণ্ডপে সাধারণের প্রীতিবর্ধনের নিমিত্ত অভিনয় করিতেছিল, তখন তাহাদের কথাবার্তা-দ্বারা অভিনয়ের ত্রুটি হইলে সাধারণের কাছে তাহাদের ধরা পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ভ্রাতৃবধূবেশী দিদিমাকে লইয়া রণকল্যাণীর অতটা বেলেল্লামি স্বভাবসঙ্গত হইলেও নাটকের রাজোচিত গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহার বিদূষক সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্রের নূতন সংস্করণ মাত্র। নবীন-তপস্বিনীর বিদূষকে যে নূতনত্ব দেখা গিয়াছিল, কমলেকামিনীতে তাহার উন্নতির পরিবর্তে অবনতি দেখিয়া ক্ষোভ জন্মে। গান্ধারী চরিত্রটি দৃশ্যকাব্যজগতে এক নূতন বার্তা ঘোষিত করিয়াছে, কবি এখানে বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন।

বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো

দীনবন্ধুর নাটক বিভাগের আলোচনা শেষ হইল, এখন তাঁহার প্রহসন-বিভাগের দ্বার উদ্‌ঘাটন করা যাক্। 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' নাট্যকারের প্রথম প্রহসন। ইহার রচনাকাল ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ, কিন্তু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বাগবাজার অবৈতনিক থিয়েটার কর্তৃক চোরবাগানের লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়ীতে এখানির প্রথম অভিনয় হইয়াছিল।

অধুনা বঙ্গসমাজে বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ার সংখ্যা কমিলেও দীনবন্ধুর সময়ে ইহার সংখ্যা এত কম ছিল না। তখন এই কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য জীবেরা আপনাদের খোশ-খেয়ালের বশবর্তী হইয়া অনেক পরিবারকে উৎসন্নের পথে লইয়া গিয়াছিল। পাশ্চাত্যশিক্ষার জ্ঞানালোকে নাট্যকার এই প্রথাকে কদাচার বলিয়া লক্ষ্য করিলেন এবং সেই কদাচারের বিরুদ্ধে ইহাই তাঁহার সশস্ত্র অভিযান।

মধুসূদনের প্রহসন সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে যখন কোন পাপাচার সমাজদেহে প্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে কলঙ্কিত করিয়া তুলে, তখনই কোন সমাজনীতিজ্ঞ সাহিত্যিক কাব্যরূপ অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে সেই পাপাচার কিরূপে সমাজদেহকে অন্তঃসারশূন্য করিতেছে তাহা লোক-লোচনের সম্মুখে আনিয়া ঐ পাপের প্রতি জন-সাধারণের ঘৃণা জন্মাইয়া দেন।

বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো এই পাপাচারের প্রতি কতটা ঘৃণা উৎপাদনে সহায়তা করিয়াছিল তাহা দেখা যাক্। তৎকালীন সমাজে এই প্রহসনের প্রভাব এত গভীর ছিল যে, প্রহসনান্তর্গত 'বুড়া বাম্‌না বোকা বর', 'এলো চুলে বেনে বউ' প্রভৃতি ছড়াগুলি এবং বাসর ঘরের অনেক রসিকতা দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীর পরেও বহু বাঙ্গালীর মুখে শুনা গিয়া থাকে। এই নাট্যগ্রন্থখানি শক্তিশালী হইয়াও অশ্লীলতা-দোষ দুষ্ট হইয়াছে। বাসি বিয়ের নাম করিয়া ব্রাহ্মণ রাজীবলোচনকে লইয়া শালারূপী নসীরামের উক্তকার্য-সম্পাদনার্থ পলায়ন সামাজিক প্রথাসম্মত হয় নাই। শূদ্রের মতো ব্রাহ্মণের বাসি বিয়ে হয় না, কুশণ্ডিকা হইয়া থাকে এবং তাহা প্রায়শ বিবাহের দিন রাত্রিকালে বা পর দিবস দিবাভাগে সম্পাদিত হয়। সুশীলের চরিত্রটি অপ্রাসঙ্গিক। বাগ্‌দী পেঁচোর মার মুখ দিয়া ব্রাহ্মণ-

জাতিকে এতটা গাল দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। এই সকল সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্বেও প্রহসনটি প্রশংসার যোগ্য হইয়াছিল।

সধবার একাদশী

দীনবন্ধুর দ্বিতীয় প্রহসন 'সধবার একাদশী' 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ার' পূর্বে রচিত হইয়াছিল; কিন্তু ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হয়। এখনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের দুর্গা-সপ্তমী পূজার রাত্রিতে বাগ্‌বাজার মুখুজ্জে পাড়াস্থ প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে বাগ্‌বাজার এমেচার থিয়েটার কর্তৃক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহার পরবর্তীকালের কোন অভিনয় রজনীতে নাট্যকার স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই নাটকে নিমচাঁদের ভূমিকা লইয়া সর্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

দীনবন্ধুর সম-সাময়িক সমাজে মদ ও বেশ্যার প্রভাব কিরূপ দ্রুতপদে সামাজিকগণকে অভিভূত করিতেছিল তাহারই চিত্র এই প্রহসনে চিত্রিত হইয়াছে। জনৈক ধনাঢ্য পরিবারের একটিমাত্র আদুরে সন্তান অবনতির পিচ্ছিল সোপানে পদস্খলিত হইতে-হইতে কিরূপে তাহার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিল, সেই অবতরণিকার সোপান-পরম্পরা দৃশ্যে-দৃশ্যে এই প্রহসন মধ্যে দেখানো হইয়াছে। অটল গ্রহকে কেন্দ্রে রাখিয়া অপর যে সকল পাপগ্রহ আপনাদের উচ্ছৃঙ্খলতার কক্ষপথে ঘুরিতেছিল, তাহারা সকলেই একে একে কক্ষচ্যুত হইয়া সরিয়া পড়িয়াছিল, নিমচাঁদ কিন্তু অটলকে ছাড়ে নাই। পরিশেষে এমনি অবস্থান্তর ঘটিল যে, পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া চন্দ্রের ন্যায় নিমচাঁদের চতুঃপার্শ্বে অটলই ঘুরিতে লাগিল।

মাতাল হইল এই প্রহসনের আলোক (light) এবং গণিকা তাহারই ছায়া (shade)। তজ্জন্য শিক্ষিত-অশিক্ষিত, দেশীয়-ভিন্নদেশীয় বিবিধ মাতালমূর্তি কাঞ্চনরূপ ছায়া-নির্মিত পট-ভূমিকার উপর চিত্রিত হইয়াছিল। এই চিত্রগুলি এতই স্বাভাবিক যে, নাট্যকার যেন একহস্তে ফটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা এবং অপর হস্তে গ্রামোফোন্ যন্ত্র লইয়া তাহাদের প্রকৃত অধিষ্ঠান-ভূমি হইতেই ঐগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আসব ও গণিকা যে গ্রন্থের উপজীব্য তাহার চরিত্র কুসুমগুলি প্রস্ফুটিত হইলে সুগন্ধ বিকীর্ণ করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের পূতিগন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত করিলে চলিবে কেন?

নিমচাঁদ এই প্রহসনের একটি নূতন সৃষ্টি। মদের উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিলে শিক্ষা-দীক্ষা যে অতল জলে ভাসিয়া যায় তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ নিমচাঁদ। প্রকৃতিদেবী নিমচাঁদের প্রতি অকরুণ ছিলেন না, ঘোর মাতাল অবস্থাতেও নিমচাঁদের মনে চৈতন্য সঞ্চার করিয়াছিলেন, কিন্তু মদ যাহাকে খাইয়াছে তাহার চৈতন্য স্থায়ী হইতে পারিল না। নিমচাঁদের সমুদয় উচ্চশিক্ষা মাতালের প্রলাপোক্তিতে পর্যবসিত হইয়াছিল। ইংরাজি কাব্য-সাগর মন্থন করিয়া সে তাহার যুক্তির অনুকূলে যে সকল রত্ন উদ্ধার করিত, তাহা 'বেনাবনে মুক্তা ছড়ানোর' মতো তাহার বন্ধুমহলকে বিস্মিত করিত বটে, কিন্তু বিমুগ্ধ করিতে পারিত না।

নকুলেশ্বর ও কেনারাম এই প্রহসনের অপ্রাসঙ্গিক চরিত্র। উকিল মাতাল দেখাইবার জন্য নকুলেশ্বরের সৃষ্টি, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে তাহার ক্রিয়া এত বিরল যে পাত্রান্তরে সে চিত্র প্রদর্শিত হইলেও

গ্রন্থের অঙ্গহানি হইত না। কেনারাম চরিত্রটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, নাট্যকারের লোক-চরিত্র জ্ঞানের ফলস্বরূপ গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে।

অটল গ্রন্থের নায়ক, দুর্বলতাই তাহার অবনতির কারণ। দৈহিক বলশালী নিমচাঁদের ব্যক্তিত্বের (personal magnatism) কাছে সে পরাজিত—তাহার বিদ্যাবত্তায় সে অভিভূত—কাঞ্চনের মান-অভিমানে সে বিমূঢ় এবং পরিশেষে মদের নিকট যখন সে আত্মবিক্রয় করিল, তখনি তাহার পাপের পরাকাষ্ঠা জন্মিল। অগম্যাগমনের অভিলাষ জন্মিয়া সেই অভিলাষ চরিতার্থ করিবার প্রয়াস ঘটিলে এক আশ্চর্য কৌশলে ঐ কার্যে বাধা উপস্থিত হইল, এবং সেই বাধাজনিত বেদনায় অটলের জ্ঞানদীপ নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো ক্ষণকালের জন্য উজ্জ্বল হইয়া পুনরায় অন্ধতমসায় ডুবিয়া গিয়াছিল। অটল তখন বলিল :—"নিমচাঁদ। ওঠ বাবা না আস্তে-আস্তে আমরা বাগানে যাই। যে মার খেয়েছি—অনেক ব্রাণ্ডি না খেলে বেদ্‌নো যাবে না।"

নিমচাঁদ নিরাশ সাগরে যেন কূল পাইল, এবং অটলের মুখে মদের নাম শুনিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল :—

"কি বোল্ বলিলে বাবা বল আর বার।
মৃত দেহে হলো মম জীবন সঞ্চার॥
মাতালের মান তুমি, গণিকার গতি।
সধবার একাদশী, তুমি যার পতি॥"

এই কথার পর তাহারা পুনরায় উৎসন্নের পথে ধাবিত হইল, এবং প্রহসনের মূল রহস্যটি (key-note) প্রকাশিত করিয়া গেল।

জামাই-বারিক

এখানি দীনবন্ধু-রচিত সর্বশেষ প্রহসন। ইহার রচনাকাল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ এবং ঐ বৎসরের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে চিৎপুর রোডস্থ মধুসূদন স্যাণ্ডালের ভবনে ন্যাশানল থিয়েটার কর্তৃক এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। বহু বিবাহের ও ঘর-জামাইদের লাঞ্ছনা-প্রদর্শন এই প্রহসনের উদ্দেশ্য। দীনবন্ধুর অন্যান্য দৃশ্যকাব্যের মতো এই দৃশ্যকাব্যের ব্যঙ্গচিত্রগুলি স্বাভাবিক হইয়াও স্থানে-স্থানে অত্যুক্তি-দোষে দূষিত হইয়াছে। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন :—"রাত্রিকালে স্বামীভ্রমে চোরকে ধরিয়া দুই সতীনের ওরূপ কাড়াকাড়ি ও প্রহার করা প্রভৃতি কার্যগুলি নিতান্ত অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইয়াছে।"

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বিজয়-বল্লভের কন্যার বিবাহ-প্রসঙ্গে পদ্মলোচনকে আনাইয়া ডেপুটি বাবুর ও মূর্খ জমিদারের চরিত্র লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। নাট্যকার গ্রন্থশেষে কামিনী চরিত্রের অদ্ভুত পরিবর্তন দেখাইয়াছেন। এই পরিবর্তন এত শীঘ্র সম্পাদিত হইয়াছিল যে হঠাৎ দেখিলে ঐ ঘটনাটি অস্বাভাবিক ঠেকে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে তাহা মনে হয় না। নাট্যকার কামিনীকে যদি তাহার প্রথম বারের স্বামীবিরহ স্বামী প্রতি কথঞ্চিৎ অনুরাগিনী দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে এই চরিত্রটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হইত।

দীনবন্ধুর কালে বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের লাভালাভ

পৃথকভাবে এবং যথাক্রমে দীনবন্ধুর দৃশ্যকাব্যের আলোচনা শেষ হইল, এক্ষণে তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্য কি-কি বিষয়ে লাভবান্ হইয়াছিল সাধারণভাবে তাহার বিশ্লেষণ করিয়া দীনবন্ধু-কালের উপসংহার করা হইবে। পূর্ব-পূর্ব অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া রামনারায়ণের অব্যবহিত পূর্বকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দৃশ্যকাব্যের সত্তা ভ্রূণদেহে (Foctus) অবস্থিত ছিল, সুতরাং ইহার আকার কিরূপ এবং ইহা কোন্ জাতীয় তখনও নির্ণীত হয় নাই। গর্ভস্থ জীব নড়িলে চড়িলে যেমন তাহার জীবনের প্রমাণ পাওয়া যায়, সেইরূপ নাট্যভ্রূণের প্রাণ-সত্তার প্রমাণ, তাহার তৎকালীন সাহিত্য মধ্যস্থ চাঞ্চল্যে দৃষ্ট হইত। মঙ্গলগানে, কথকতায়, যাত্রাগানে, গম্ভীরায়, কবি বা পাঁচালী গানে এবং ধর্মোদ্দিষ্ট উৎসবে ঐ চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইত। কি অবস্থায় এবং কোন্ খানে ইহা দেখা যাইত, তাহার বিচার তত্তৎকালের আলোচনা-প্রসঙ্গে করা হইয়াছে, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

রামনারায়ণের কালে নাট্যভ্রূণ দৃশ্যকাব্যরূপ দেহীর আকার ধারণ করিলে পর আকৃতিগত সমস্যা মিটিল বটে, কিন্তু জাতির সমস্যা তখনও রহিয়া গেল। প্রাকৃতিক নিয়মে সদ্যজাত জীবেরা পুরুষ, স্ত্রী কি নপুংসক, তাহাদের মুখের আকারে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। রামনারায়ণের 'কুলীন কুল সর্বস্বে' ঠিক অনুরূপ গোলে পড়িতে হয়, কারণ ইহা নাটক, নাটিকা বা প্রহসন ঐ দৃশ্যকাব্যের মুখের আকার দেখিয়া তাহা বুঝা যায় নাই। কৌলীন্যের অপচার ব্যঙ্গাত্মকভাবে প্রদর্শিত হওয়ায় কখন কখন মনে হইয়াছে যে, এটি প্রহসন জাতীয়। ঘাত প্রতিঘাত নাটকের প্রাণ, এবং প্লটের (plot) ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশিত হয়। 'কুলীন-কুল-সর্বস্বে' প্লট না থাকায় ঘাত-প্রতিঘাত একেবারেই ছিল না, সুতরাং গ্রন্থখানি প্রাণবস্তুহীন হওয়ায় ইহার রচয়িতা নির্দেশিত নাটক-আখ্যা থাকিলেও ইহাকে নাটক বলিতে স্বভাবতঃ কুণ্ঠা জন্মে। ইহার নাটিকা আখ্যাও যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ নাটিকারও একটা প্লট থাকে, তবে ওতপ্রোতভাবে স্ত্রীপ্রাধান্য ও পরিহাস-রসিকতা দেখিলে নাটিকার বিভ্রম আনিয়া দেয় মাত্র। উক্ত ত্রিবিধ সংশয়ের নিরসন না হওয়ায় রামনারায়ণ-কালের প্রথমার্ধে দৃশ্যকাব্যের জাতিগতসমস্যা সর্বতোভাবে মিটে নাই। মধুসূদনের কালে বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্য অপেক্ষাকৃত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর, ইহার জাতিগত সমস্যা সর্বপ্রকারে মিটিয়া গিয়াছিল, এবং ইহা কি-কি মূর্তিতে বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যে বিরাজ করিতেছে তাহার রূপভেদও তৎকালের আলোচনায় বলা হইয়াছে।

দীনবন্ধু-কালের বিশেষত্ব চরিত্র বিকাশে (Characterisation)। এ বিভাগে তিনি সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কোন্ চরিত্রকে কিরূপ ক্রিয়ার মধ্যদিয়া লইয়া যাইলে সে চরিত্রের বিকাশ-সাধন হইবে, এ সন্ধান তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। সে জন্য প্রত্যেক ক্রিয়ার দুই চারিটি কথার মধ্যেই এক একটি চরিত্র মূর্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে। সরকারী কর্মোপলক্ষ্যে দীনবন্ধু বাঙ্গালা দেশের বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং বহুলোকসংঘাত লাভ করিয়া তাঁহার দৃশ্যকাব্যগুলিকে সেই সকল লোক-চরিত্রের দর্পণস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তজ্জন্য এক হিসাবে ঐগুলিকে উনবিংশ-শতকের প্রথমার্ধের সামাজিক ইতিহাস বলা যায়।

দীনবন্ধু সামাজিক নাটকের স্রষ্টা—একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তিনি সব্যসাচীর ন্যায় এক হস্তে নাশমূলক আয়ুধ (destructive weapon) এবং অপর হস্তে সৃষ্টিমূলক বীজ (constructive seeds) লইয়া সামাজিক দৃশ্যকাব্যগুলি রচনা করিয়াছিলেন। নীলদর্পণ, বিয়ে পাগ্‌লা বুড়া, সধবার একাদশী ও জামাইবারিক তাঁহার নাশকারী আয়ুধের ব্যবহার-স্থান,এবং নবীন-তপস্বিনী, লীলাবতী ও কমলেকামিনী তাঁহার আদর্শ-প্রজননকারী বীজের ক্ষেত্র।

দীনবন্ধু তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকার রামনারায়ণ বা মধুসূদনের মতো সামাজিক ক্ষতগুলি লোকলোচনের গোচরীভূত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সেগুলির চিকিৎসারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ চরিত্রগুলিকে নিন্দনীয় চরিত্রের পাশা-পাশি রাখিয়া সেই চিকিৎসার কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার আদর্শাত্মক উদ্দেশ্য গ্রন্থমধ্যে কিরূপে কার্য করিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করা যাক্।

নীলকরগণ এবং তাহাদের কর্মচারিরা যে সকল সদ্‌গুণের অভাবে পরপীড়ক হইয়াছিল, গোলকবসুর পরিবারবর্গের মধ্যে সেই সকল গুণ প্রবেশ করাইয়া একটি আদর্শ পরিবার গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা নাট্যকার করিয়াছিলেন। সুশিক্ষার অভাবে লোকে বিপথগামী হয়, এবং সুশিক্ষিত হইলে সদ্‌গুণরাশি আপনা-হইতেই বিকশিত হইয়া উঠে—এই সিদ্ধান্ত-ভিত্তির উপর নাট্যকার তাঁহার আদর্শ চরিত্রগুলি গঠিত করিয়াছিলেন। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে তিনি শিক্ষাপ্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন, তাই তাঁহার গ্রন্থমধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার ইঙ্গিত একটু বেশী পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। এই শিক্ষার মোহ নাট্যকারের মধ্যে এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, সাধুচরণের কৃষক-পরিবারকেও তিনি শিক্ষিত কৃষক-পরিবাররূপে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সাধুচরণ, ললিত, সিদ্ধেশ্বর, বিজয়-কুমার, শিখণ্ডীবাহন প্রভৃতি তাঁহার শিক্ষিত পুরুষ চরিত্রের আদর্শ, এবং বিদ্যোৎসাহিতা, বদান্যতা, পরহিতৈষণা, বীরত্ব, প্রেম প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি ইহাদের আচরিত ব্রত ছিল। সরলতা, সৈরিন্ধ্রী, সুরমা, কামিনী, শারদাসুন্দরী, লীলাবতী, রাজলক্ষ্মী, রণকল্যাণী, সুরবালা, চাঁপা প্রভৃতি তাঁহার শিক্ষিতা স্ত্রী-চরিত্রের আদর্শ, এবং বিদ্যানুরাগ, প্রেম, ভক্তি, দয়া, হাস্য-পরিহাস প্রভৃতি কমনীয় বৃত্তিগুলির সেবিকারূপে ইহারা চিত্রিত হইয়াছিল। কিন্তু এত আয়াস-সত্ত্বেও নাট্যকারের আদর্শাত্মক স্ত্রী বা পুরুষ চরিত্র আদৌ শক্তিশালী হয় নাই।

দীনবন্ধু আদর্শবাদে (Idealism) অপেক্ষা বস্তুতন্ত্রবাদে (Realism) কেন পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন তাহার কৈফিয়ৎ তাঁহার ক্ষণভিন্ন সুহৃদ্ বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে দিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর আর কাহারও কিছু বলিবার রাখেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :—"* * দীনবন্ধুর এই দুইটি গুণ—(১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্বব্যাপী সহানুভূতি তাহার কাব্যের গুণ-দোষের কারণ,—এই তত্ত্বটি বুঝান এই সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি ইহাও বুঝাইতে চাই যে, যেখানে এই দুইটার মধ্যে একটার অভাব হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার কবিত্ব নিষ্ফল হইয়াছে। যাহারা তাঁহার প্রধান নায়ক-নায়িকা তাহাদের চরিত্র যে তেমন মনোহর হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ। আদুরী বা তোরাপ জীবন্ত চিত্র, কামিনী বা লীলাবতী, বিজয় বা ললিতমোহন সেরূপ নয়। সহানুভূতি আদুরী বা তোরাপের বেলা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ভাষা পর্যন্ত আনিয়া কবির কলমের আগায় বসাইয়া দিয়াছিল। কামিনী বা বিজয়ের বেলা, লীলাবতী বা ললিতের বেলা চরিত্র

ও ভাষা উভয় বিকৃত কেন? যদি তাঁহার সহানুভূতি স্বাভাবিক এবং সর্বব্যাপী, তবে এখানে সহানুভূতি নিষ্ফল কেন? * * এখানে অভিজ্ঞতার অভাব। প্রথমে নায়িকাদের কথা ধর। লীলাবতী বা কামিনী শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্রী হইয়া যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাঁহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে তখনকার বাঙ্গালিসমাজে ছিল না, * * যাহার আদর্শ সমাজে নাই তিনি তাই গড়িতে বসিয়াছিলেন। * * তাঁহার চরিত্র-প্রণয়ন-প্রথা এই ছিল যে জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিতেন। এখানে জীবন্ত আদর্শ নাই, কাজেই ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যগত মৃৎপুত্তলগুলি দেখিয়া সে চরিত্র গঠন করিতে হইত। * * কাজেই সে সর্বব্যাপিনী সহানুভূতিও সেখানে নাই। কেন না, সর্বব্যাপিনী সহানুভূতিও জীবন্ত ভিন্ন জীবনহীনকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না। * * এই দুইটি লইয়াই দীনবন্ধুর কবিত্ব।" বঙ্কিমবাবুর বিশ্লেষণে বেশ বুঝা গেল যে, আদর্শবাদে দীনবন্ধুর শক্তি বস্তুতন্ত্রবাদের তুলনায় ক্ষীণতর ছিল।

এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন তাঁহারা দীনবন্ধুর দৃশ্যকাব্যগুলিকে অশ্লীল বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের এ উক্তি যে একেবারে যুক্তিহীন এরূপ বলা চলে না, কারণ গ্রন্থমধ্যে বহুস্থানে অশ্লীলতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। প্রহসনের মধ্যে যখন ঐগুলি থাকে, তখন নাট্যকারকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তাঁহার প্রহসনের প্রায় সকলগুলিই অশ্লীলতার অপনয়নকারীরূপে সৃষ্ট হইয়াছিল। অন্যবিধ দৃশ্যকাব্যে এগুলি দোষাবহ। এ দোষ তাঁহার ইচ্ছাকৃত নহে, কারণ তাঁহার সুহৃদ্ বঙ্কিমচন্দ্র আর এক স্থানে বলিয়াছেন :—"দীনবন্ধুর সহানুভূতি তাঁহার অধীন বা আয়ত্ত নহে, তিনি নিজেই সহানুভূতির অধীন। তাঁহার সর্বব্যাপী সহানুভূতি যদি তাঁহাকে * * রুচির মুখরক্ষা করিতে দিত তাহা হইলে ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।" আরও এক কারণে দীনবন্ধু অশ্লীলতার হাত এড়াইতে পারেন নাই, সেটি তাঁর সম-সাময়িক দেশ-কাল পাত্রের প্রভাব। নীতির মাপকাঠি কালভেদে বদলাইয়া যায়, সেকালে যাহা রসিকতা ছিল, একালে তাহাই অশ্লীলতা দাড়াইয়াছে। অধ্যাত্মশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন এ শক্তিকে উপেক্ষা করা সহজসাধ্য নহে।

দৃশ্যকাব্যের লাভালাভ বিচার করিয়া দেখিলে দীনবন্ধুর কালে নাট্যসাহিত্য যে পরিমাণে লাভবান্ হইয়াছিল, তাহার তুলনায় এ সকল সামান্য ত্রুটি ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। মূর্তিমান্ সজীব চরিত্রই দৃশ্যকাব্যের প্রাণবস্তু। ধরিতে গেলে নাট্যসাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা দীনবন্ধুই করিয়াছিলেন। এতাবৎ কালের পুতুলই দৃশ্যকাব্যের চরিত্রের স্থান দখল করিয়াছিল—প্রয়োজনে তাহারা সাড়া দিত। তাহাদের বলা-চলা-ফেরা সমুদয় ব্যাপারই অপরের চেষ্টা বা ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। দীনবন্ধুর নাট্যচরিত্রগুলি স্বেচ্ছায় চলা-ফেরা ও কথা বলিয়াছে। দীনবন্ধু নাট্যসাহিত্যে যত বড় কাজ করিয়া গিয়াছেন, এত বড় কাজ তাঁহার পূর্বগামী কোন নাট্যকার করেন নাই। যতদিন বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন দীনবন্ধুর নাম ইহার ইতিহাস পৃষ্ঠায় চির স্মরণীয় থাকিবে।

বঙ্কিম বাবু দীনবন্ধুর কবিত্ব সমালোচনা-প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন :—"ঈশ্বরচন্দ্র খাটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরাজ, দীনবন্ধু ইঁহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায় যে ১৮৫৯।৬০ খৃষ্টাব্দের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গালা কাব্যের নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল।" শ্রব্যকাব্যের দিক্ দিয়া এ সিদ্ধান্ত যুক্তিপূর্ণ হইলেও দৃশ্যকাব্যের সম্বন্ধে ইহা সমীচীন নহে, কারণ মধুসূদন তাঁহার কৃষ্ণকুমারী নাটকে 'ডাহা'

ইংরাজ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রথম দৃশ্যকাব্যে ইংরাজ হইতে পারেন নাই, বরং টোলো-পণ্ডিত হইয়াছিলেন, দীনবন্ধু কিন্তু প্রথম হইতেই ইংরাজ। তাঁহার দৃশ্যকাব্যের লিখন-ভঙ্গী, ভাব ও রুচি সমস্তই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল, কেবল তাঁহার সাহিত্যগুরু ঈশ্বরগুপ্তের ব্যঙ্গ-পরিহাস যাহা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন, মাত্র তাহাতেই তাঁহার বাঙ্গালিত্বের পরিচয় ছিল, অপর সকলগুলি প্রতীচ্যের অনুকরণ-ফলে উৎপন্ন হইয়াছিল। এই কথা কয়টি বলিয়াই দীনবন্ধু-কালের উপসংহার করা গেল।

দীনবন্ধুর কালে উদ্ভূত অন্যান্য দৃশ্যকাব্যের কথা

দীনবন্ধুর কালমধ্যে অন্য নাট্যকার বিশেষ প্রাধান্য-লাভ করিতে পারেন নাই। যে অল্প-সংখ্যক নাটকের নাম পাওয়া যায়, তাহাদের কোনটাই যুগ-প্রবর্তক (epoch-making) ছিল না। ইহাদের বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকখানির নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

বোধেন্দু বিকাশ নাটক

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহার রচয়িতা; এখানি 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের অনুরূপ অর্থাৎ স্বভাবানুযায়ী বর্ণনা। আখ্যাপত্রে কোন তারিখ নাই, তবে অনুমান হয় ইহার প্রকাশ-কাল ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ। প্রথমে সংগীতে ও কবিতায় মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে, পরে পদ্যে ও গানে প্রস্তাবনা, সূত্রধার, নট,নটী প্রভৃতির ক্রম প্রাচীন নাট্যরীতি অনুসারে দেওয়া হইয়াছে। চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের সময় হইতে ভারতচন্দ্রের তথা ঈশ্বর গুপ্তের কাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মানব সমাজে প্রবৃত্তির সহিত নিবৃত্তির সংগ্রাম এই জাতীয় রূপকের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। জীব প্রবৃত্তির দায়ে মহামোহের প্রভাবে পড়িয়া তাহার অনুচর দশ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয় ভোগ করিয়া অতৃপ্ত বাসনা লইয়া নিবৃত্তিমার্গে আসিয়া নানা পথে বিচরণ করিয়া কিরূপে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা ও নিষ্কাম ধর্মরূপ বিষ্ণুভক্তি লাভ করিয়া বোধেন্দুর বিকাশসাধনে কৃতকার্য হয় রূপক খানিতে তাহাই দেখানো হইয়াছে। ছন্দোবৈচিত্র্য ইহার কাব্যাংশ অপেক্ষা নাটকাংশকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। এই তথাকথিত নাটকখানি সাত অঙ্কে গ্রথিত, তন্মধ্যে প্রথম কয়েকটি অঙ্কে প্রবৃত্তিমার্গের কথা আছে, বাকি অঙ্কে নিবৃত্তির সন্ধান মিলিয়াছে।

বোধেন্দু বিকাশ নাটকের শেষ প্রশ্নোত্তরগুলি এইরূপ :—

বিষ্ণুভক্তি দেবীর প্রশ্ন— 'আমি জীব আমি শিব, এই যদি হবে।
জীবে শিবে প্রভেদ, হয়েছে কেন তবে॥'

" " " 'কারে কহে পাশমুক্ত, কারে কহে পাশ।
বল বল, এই পাশ কিসে হয় নাশ॥'

" " " 'ঘুচিল অজ্ঞান-ধন্ধ সদানন্দ স্মরি।
বল বল, তবে কারে প্রণিপাত করি॥'

আত্মার উত্তর— 'পাশযুক্ত যখন তখন জীব জীব।
পাশমুক্ত হ'লে পর জীব হয় শিব॥'

আত্মার উত্তর — 'বন্ধের কারণ মায়া, তারে বলি পাশ।
জ্ঞানী করে জ্ঞান অস্ত্রে মায়া পাশ নাশ॥'
" " — 'নমোনমঃ পরমাত্মা, চিদানন্দ ধাম।
আমায় আমার আমি, প্রণাম প্রণাম॥'
সোহং তত্ত্বে জীব মুক্ত হইল।

শকুন্তলা নাটক

ঈশ্বরগুপ্ত এখানির রচয়িতা। কবিতায় লেখা ও এক অঙ্ক পর্যন্ত 'প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি এখানি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তারিখ সংগৃহীত হয় নাই।

দুর্ভিক্ষ দমন নাটক

যদুনাথ তর্করত্ন ইহার প্রণেতা। আখ্যা পত্র না থাকায় গ্রন্থের প্রকাশ-কাল জানা যায় নাই এবং অভিনীত হইবার সংবাদও আসে নাই, তবে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এই নাটকখানি 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকায় আলোচিত হইয়াছিল। প্রাচীন রীতি অনুসারে নান্দী, নটী-সূত্রধার, প্রস্তাবনা সবই আছে। এখানি রূপকজাতীয় দৃশ্যকাব্য। 'দুর্ভিক্ষ' ইহার মূর্তিমান রাজা, 'হাহাকার' প্রধান মন্ত্রী, 'দুর্গতি' হাহাকারের স্ত্রী। অনটন-অনশন-রোগ-শোক উক্ত রাজার চারিজন প্রধান সেনাপতি। দুর্ভিক্ষের অবশ্যম্ভাবী সহচর 'মাগ্‌গীরাম' সর্বত্র বিরাজিত থাকিয়া শান্তিকালের 'শস্তারামকে' কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া দুর্ভিক্ষের শাসন দেশময় চালাইতে লাগিল। কাঠামোটি নাটকের আঙ্গিকে থাকিলেও বর্ণনাভঙ্গীতে ইহা লিখিত। ১১৭৩ সনের মন্বন্তরের পর উড়িষ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা ও বিহার অঞ্চলে যে দ্বিতীয় মন্বন্তর ইংরাজ-শাসনের সময়ে দেখা দিয়াছিল তাহার কাহিনী ইহার বর্ণিতব্য বিষয়। দুর্ভিক্ষদমনের উপায়স্বরূপ রপ্তানিবন্ধ, দেশের সর্বত্র লঙ্গরখানা খুলিয়া ক্ষুধাতুরকে অন্নদানের ব্যবস্থা, দাতাদের মুক্তহস্তে দান প্রভৃতি কার্য দেখানো হইয়াছে। দেশবাসীর কাতর প্রার্থনায় লক্ষ্মীদেবী যথাক্রমে বৃষ্টি ও শস্যসম্ভার লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। শান্তি ও তজ্জনিত আনন্দ দেশে ফিরিয়া আসিল। নাটকখানি চারি অঙ্কে সমাপ্ত এবং গদ্য-পদ্য মিশ্রিত তাৎকালিক ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

হিন্দু-মহিলা নাটক

বিপিনমোহন সেনগুপ্ত ইহার প্রণেতা। জোড়াসাঁকো নাট্যশালার জন্য এখানি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখে রচিত ও পুরস্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ঐ নাট্যশালাটি উঠিয়া যাওয়ায় এখানি আর অভিনীত হয় নাই। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনের তারিখ ১৩ই নভেম্বর, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ। হিন্দু মহিলাদের দুরবস্থার কথা এখানির মধ্যে আছে। বিনা সংগীতে সাত অঙ্ক পর্যন্ত এখানি বিস্তৃত। নাটকের আকারে থাকিলেও নাট্যকৌশল নাই। কৌলিন্যের অপচার, নারীনিগ্রহ, পুষ্পোৎসব, বাসরঘরের রসিকতা, নারীমহলের কথোপকথন, স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা প্রভৃতি যাবতীয় দুরবস্থার কথা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। স্বেচ্ছাকৃত মনোনয়ন দ্বারা পাত্র-পাত্রী নির্বাচিত না হওয়ায় অবশেষে এক পরিবার মধ্যে উন্মত্ততা ও অপঘাত মৃত্যু পর্যন্ত আসিয়াছিল।

উষানিরুদ্ধ নাটক

মণিমোহন সরকার ইহার রচয়িতা। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইলেও ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি তারিখে চোরবাগান শখের নাট্যশালায় এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছে। প্রস্তাবনা আছে। উষা, অনিরুদ্ধ ও সখীদের মধ্যে বাক্ চাতুরীজনিত হাস্যরস বেশ ফুটিয়াছে। রসিকতা সর্বত্রই রূপ লইয়াছে। আট অঙ্কে নাটকখানি সমাপ্ত। ১৮ খানি গান ইহার সম্পদ। নাটকের আসলরূপ সংঘাত যথাস্থানে প্রযুক্ত হয় নাই।

ইন্দুপ্রভা নাটক

গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা, সংগীতগুলি গ্রন্থকর্তার আত্মীয় গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত। গ্রন্থের প্রকাশকাল ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ এবং ঐ খৃষ্টাব্দেই বাগবাজার নাট্যসমাজ কর্তৃক ইহা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ভাষায় কবিত্ব ও রচনাশুদ্ধি বিরাজ করিতেছে। স্থানে অস্থানে এত উপমান-উপমেয় প্রভৃতি কাব্যালংকারের প্রাচুর্য, যে কি আনন্দজনক দৃশ্যে, কি শোকপূর্ণ দৃশ্যে আসল কথার মর্মভেদ করিতে বিলম্ব ঘটে। দীর্ঘ স্বগতোক্তি বা সংলাপ ফেনাইয়া এতবড় করা হইয়াছে যে পুনরুক্ত হইয়া ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইয়াছে। আর একটি দোষ, বিশেষ ঘাত প্রতিঘাতপূর্ণ অংশগুলিকে নেপথ্যে রাখা হইয়াছে ১৭।১৮ খানি গান লইয়া ৬য় অঙ্কে ইহা সমাপ্ত।

এঁরাই আবার বড়লোক !

সন ১২৭৪ সাল, কার্তিক মাস ইংরাজী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে স্টানহোপ যন্ত্রে ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার নাম-লিপিকায় গ্রন্থকারের নাম ছিল না, কিন্তু ইহা চুঁচুড়ার নিমাইচাঁদ শীলের রচনা। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে তারিখের 'সোমপ্রকাশে' ইহার প্রথম অভিনীত হইবার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, অভিনয় তারিখ ৯ই মে। গ্রন্থকার ইহাকে প্রহসন বলিয়াছেন, কিন্তু ইহার প্রকাশভঙ্গী বা ঘটনা পরম্পরা প্রহসনোচিত বা নাটকোচিত হয় নাই, অথচ ঐ দুইয়েরই ছায়াপাত ইহার মধ্যে আছে। রাজাবাবু নামক এক গ্রাম্য জমিদার কৃষ্ণকুমার নামীয় কোন শিক্ষক ও রামরাম নামক কোন ডাক্তাররূপী মো-সাহেবদ্বয়ের সহায়তায় ভণ্ড কপটাচারীর বেশে সমাজ সংস্কারক সাজিয়া দেশসেবার অছিলায় মদ ও লাম্পট্যের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিয়াছিল। তাহার কুহকে পড়িয়া কুল-কামিনীর সর্বনাশ, স্ত্রীর অপমৃত্যু, বিধবার কুলটাবৃত্তি গ্রহণ প্রভৃতি ঘটিয়াছিল। দীর্ঘ বক্তৃতা ও স্বগতোক্তির তোড়ে দৃশ্যকাব্যখানি রূপায়িত হইতে পারে নাই।

চন্দ্রাবতী নাটক

উপরিউক্ত নিমাইচাঁদ চন্দ্রাবতী নাটকেরও প্রণেতা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারি তারিখে ইহা মুদ্রিত হইয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর, শনিবার তারিখে হুগলীর ঘুঁটিয়া বাজারের নব নির্মিত রঙ্গভূমিতে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। পাঠান রাজত্বের পতন-কালে ও ইওরোপীয় সওদাগরদের অভ্যুদয়-সময়ে বাঙ্গালা মানভূম অঞ্চলের ভূম্যধিকারীদের ইতিবৃত্তমূলক কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া নাট্যকার যে ঘটনাবহুল আখ্যানবস্তু সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা চমকপ্রদ সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্রিয়া-বিন্যাসের দোষে ও প্রকাশভঙ্গীর আড়ষ্টতায় রূপায়িত হয় নাই।

একটা গুপ্ত রহস্য নাটকের আরম্ভ থেকে প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন রাখিয়া নাট্যকার জনসাধারণের কল্পনা ও কৌতূহলের উপর যে অত্যাচার করিয়াছেন তাহাতে নাটকীয় রস বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা হইয়াছে। চরিত্রগুলি পূর্ণ না হইয়া খণ্ডিত হইয়াছে। চন্দ্রাবতী ও ইন্দুমালার সংলাপে কবিত্ব আছে, প্রাণ নাই। চন্দ্রাবতী ও মন্মথ নাটকের নায়ক নায়িকা হইয়াও ঘটনার চাপে মুকুলিত রহিয়া গেল, ফুটিবার অবসর পাইল না। নাটকখানি মিলনাত্মক। ডাঃ সুকুমার সেনের মতে এখানির আখ্যানভাগ রেণল্ডসের "Loves of the Harem" নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

ভ্যালারে মোর বাপ! (অর্থাৎ স্ত্রীবাধ্য প্রহসন)

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ইহার রচয়িতা। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহা প্রকাশিত করেন, কিন্তু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দোলপূর্ণিমার দিন আহিরীটোলাস্থিত জনাইয়ের মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের বাড়ীতে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। কলিবকাপ নামধারী কোন স্ত্রৈণ স্ত্রীর কথায় নিজ গর্ভধারিণীর উপর যে সব অত্যাচার করিয়াছিল তাহার কাহিনী ইহার বিষয়। নূতনত্বের মধ্যে ইহার সমুদয় গান বিষয়ের অনুগত করিয়া রচিত হইয়াছিল। ঘটনাগুলি অত্যুক্তি দোষে পূর্ণ। সর্বশেষে স্ত্রীর কথায় যখন নিজে গর্দভ-বেশ ধারণ করিয়া লোকরঞ্জন করিতেছিল, তখন মা সেখানে আসিয়া পুত্রের ঐরূপ কার্য দেখিয়া "ভ্যালারে মোর বাপ" কথাটি বলিয়াছিলেন, ইহাই ঐ প্রহসনের নামকরণের ইতিহাস।

প্রভাবতী নাটক

কালীপদ ভট্টাচার্য প্রণীত প্রভাবতী নাটকখানি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের রাসপূর্ণিমায় হাওড়া-ব্যাটরার বঙ্গনাট্যবিধায়িনী সভার সভ্যগণ কর্তৃক বেনেটোলার কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়ীতে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি 'লেডি অফ্ দি লেকে'র অনুসরণে লিখিত, 'মার্চেণ্ট অফ্ ভিনিশে'র ভাবও ইহার মধ্যে আছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট তারিখে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। অনূদিত নাটক বলিয়া ইহার গুণাগুণ আলোচিত হইল না।

ভারতমাতা

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার রচয়িতা। আখ্যা-পত্র না থাকায় প্রকাশ-কালের তারিখ নির্ণীত হয় নাই, তবে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ঐ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে জোড়াসাঁকোর ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। সূত্রধারের ব্যবহার আছে, এখানি রূপক জাতীয় দৃশ্যকাব্য। ভারতমাতা, ভারতলক্ষ্মী, দুর্বৃত্ত সাহেব, দয়াবান্ সাহেব, ধৈর্য, সাহস প্রভৃতি মূর্তিমান হইয়া ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। তাঁহাদের আক্ষেপোক্তি, প্রাচীন ভারতের সহিত ইংরাজ অধিকৃত ভারতের তুলনা এবং লর্ড নর্থব্রুকের জয়-গানে এখানি পূর্ণ। সংগীত ও গদ্যের মধ্যে একাঙ্কে ইহা সমাপ্ত হইয়াছে।

মনোরমা নাটক

মদনমোহন মিত্র ১৮ই মার্চ, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইহা রচনা করেন, কিন্তু ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ২২২নং কর্ণওয়ালিস্

স্ট্রীটস্থ কৃষ্ণচন্দ্র দেবের বাড়ী ঐ নাটকের অভিনয়স্থল। এই সামাজিক বিষাদান্ত নাটকখানি ছয় অঙ্কে সমাপ্ত, কিন্তু নাটকত্ব অপেক্ষা প্রাচীন পদ্ধতিক্রমে ছড়া, কবিতা, প্রবচন ও রস-রসিকতায় এখানি পূর্ণ রাখা হইয়াছে। মদ ও লাম্পট্য তদানীন্তন সমাজের কিরূপ অনিষ্টসাধন করিতেছিল তাহার চিত্র ইহার উপজীব্য। মন্মথ ও মনোরমা যথাক্রমে ইহার নায়ক ও নায়িকা। ইহার বিন্যাসপ্রণালী ঐক্য সমন্বিত নহে। প্রত্যেক সংলাপ গোলকধাঁধার ঘোরাপথে ঘুরপাক খাইয়া বক্তব্যকে জটিল হইতে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। সংগীতের সংখ্যা কম। প্রথম যুগের নাটক বলিয়া ইহার সাতখুন মাফ। অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগও দোষযুক্ত।

বসন্তকুমারী নাটক

মীর মশাররাফ হোসেন এখানির রচয়িতা। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি তারিখে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রাচীন নাটকের ন্যায় প্রস্তাবনা আছে, তবে মুসলমান নাটককর্তা বলিয়া তাহার মধ্যে একটু রঙ্গরস করা হইয়াছে। ইহার দৃশ্যবিভাগ সম্বন্ধীয় আঙ্গিক এইরূপ :—প্রথম রঙ্গভূমি, দ্বিতীয় রঙ্গভূমি ইত্যাদি। গ্রন্থখানি তিন অঙ্কে সমাপ্ত, এবং ঐ অঙ্কের শেষ দৃশ্যটি নাটকটির পরাকাষ্ঠা বহন করিতেছে। এক বিপত্নী ক বৃদ্ধ রাজা পুত্রের বিবাহ ও রাজ্যাভিষেক সঙ্কল্প লইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে পর ঘটনাচক্রে নিজেই এক তরুণীকে বিবাহ করিলেন। সেই নব পরিণীতা পত্নী বয়োধর্মে ও কামবশে সপত্নীতনয় রাজকুমারকে নিজ মনোভিলাষ ব্যক্ত করিয়া বিফল মনোরথ হওয়ায় প্রতিহিংসা সাধনার্থ ধর্ষণের অপবাদ লইয়া রাজসমীপে বিচারপ্রার্থিনী হইল এবং যুবরাজকে তাহার নববিবাহিতা পত্নীসহ অগ্নিদগ্ধ করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিল। নাটকটিকে বিষাদান্ত করিবার জন্য নরেন্দ্র সিংহ (যুবরাজ), বসন্তকুমারী (যুবরাজের নববিবাহিতা বধূ), বীরেন্দ্র সিংহ (ইন্দ্রপুরের রাজা স্বয়ং) ও রেবতী (ঐ রাজার দ্বিতীয়পক্ষের ব্যভিচারিণী স্ত্রী একই দৃশ্যে পর পর মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। ছয়খানি সংগীত আছে। বিশুদ্ধ গদ্য এবং অল্পস্থানে পদ্যের বাহনে নাটকখানি রচিত। নাটককারের ইহাই নাটক লেখার প্রথম উদ্যম। বর্ণনার ভঙ্গীতে ঘটনাবলি লিখিত হওয়ায় শেষের ঐ একটি দৃশ্য ব্যতীত আর কোথাও সংঘাত স্পষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষার সাধারণ সাহিত্যে মুসলমানের অবদানের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, নাট্যসাহিত্যেও এই নাটকখানি সেই কার্য সমাধা করিয়াছে।

নয়শো-রূপেয়া

অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় শিশিরকুমার ঘোষের এই দৃশ্যকাব্যখানি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে চিৎপুর রোডস্থিত মধুসূদন সান্যালের ভবনে ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহার আখ্যাপত্রে নাট্যকারের নাম ছিল না। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে অর্থলোভী বাঙ্গালী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ সমাজে কন্যা বিক্রয় প্রথাদ্বারা কি নির্মম অত্যাচার বর-কনের উপর চলিত, তাহার একখানি নিষ্ঠুর চিত্র নাটকখানির আখ্যান বস্তু। নাটকের তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে রঞ্জন-সরলার যে গুপ্ত প্রণয়-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল তাহাতে নাটকীয় সংঘাত দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু উহার প্রকাশভঙ্গীতে একটু আতিশয্য (overdoing) ঘটিয়াছে। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে রঞ্জন-সরলার নৈশ সংলাপের মধ্যে পরস্পরের চরিত্র-মাধুর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সংলাপের মান তদানীন্তন নাট্যসাহিত্য অপেক্ষা উন্নত, নাট্যকার এ যশের অধিকারী হইলেন।

মাতামহের বংশে বিবাহ অসিদ্ধ এই সংস্কার বশেই সরলা, রঞ্জন ও তাহার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ স্থাপনে অনিচ্ছুক হইয়াছিল, তাই এই দৃশ্যে তাহার স্বার্থত্যাগদ্বারা নাটকীয় পরাকাষ্ঠা আসিয়াছে। পরবর্তী বিবাহ-সভায় রঞ্জনের জন্মরহস্য জাদুকরের ইন্দ্রজালের মতো প্রকাশিত হইয়া নাটকের মন্ত্রগুপ্তি সভাস্থ জনসাধারণকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিয়া তুলিল, এবং ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ লইয়া পাড়ার গণ্ডগোল দূরীভূত হইয়া গেল। সংগীতজ্ঞ শিশিরকুমার নাটকখানিকে কেন সংগীতবিহীন করিলেন, আজ তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন। ইহার মাতুলাল চরিত্রটি অপূর্ব, সমসাময়িক নাট্যসাহিত্যে এ জাতীয় চরিত্র অধিক দেখা যায় না, গঞ্জিকাসেবন দ্বারা তাঁহার হৃদ্বৃত্তি কলুষিত হয় নাই। ন্যাশানল থিয়েটারে এখানি বহুবার অভিনীত হইয়াছে।

হেমলতা নাটক

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে হরলাল রায় প্রণীত বীর রসাত্মক এই নাটকখানি চিৎপুর রোডস্থিত মধুসূদন সান্যালের ভবনে ন্যাশানল থিয়েটার কর্তৃক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। সত্যসখা নামীয় এক নায়ক গুপ্তঘাতকের হস্ত হইতে চিতোররাজ বিক্রমসিংহের প্রাণরক্ষা করিয়া উদয়পুর রাজার চর মনোহরের চক্রান্তে পড়িয়া প্রথমে প্রাণদণ্ড পরে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। চিতোররাজ-কন্যা নায়িকা হেমলতা সত্যসখার বীরত্বে পূর্ব থেকেই মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। মনোহর নানা কৌশলে বিক্রমসিংহকে বশ করিয়াছিলেন, এবং নানা ষড়যন্ত্রের মধ্যে সত্যসখাকে ফেলিয়া নাস্তানাবুদ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে অশান্তিকর আবহাওয়ার মধ্যেই নায়ক-নায়িকার মিলন সংসাধিত হইল। এই নাটকের মধ্যে চক্রান্ত মুখ্যরূপ লইয়াছে, নাট্যরূপ গৌণ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

নাট্যসাহিত্যে মনোমোহন বসুর কাল (১৮৬৮-১৮৯০ খৃঃ)

দীনবন্ধুর পর বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্য বিভাগে মনোমোহন বসু হস্তক্ষেপ করিলেন। ইনি স্বভাব-কবি ছিলেন, কিন্তু এ বিভাগে তাঁহার কৃতিত্ব কতটা আলোচনা দ্বারা তাহা নিরূপিত হইতেছে।

রামাভিষেক নাটক

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বহুবাজারস্থিত গোবিন্দ সরকার মহাশয়ের ভবনে যে নাট্য-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল তাহাদের দ্বারা 'রামাভিষেক' নাটকখানি সর্বপ্রথম অভিনীত হইয়াছিল। প্রাচীনকালের মতো ইহার প্রস্তাবনায় নট-নটী সমানই ছিল, তবে ইহার নট একস্থানে অতৃপ্তির পরিচয় এইরূপে দিয়াছে :—"এদেশের জঘন্য যাত্রার পরিবর্তে পুনর্বার নাট্যাভিনয় উদয় হচ্ছে—তাঁরা চান অভিনয়ের নায়ক-নায়িকা নির্মল চরিত্র হবে ইত্যাদি।" যাত্রাভিনয়ে স্থানে-স্থানে নাট্যকলার অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে নাট্যকার মনোমোহন তাহা উপলব্ধি করিয়াই নটের মুখ দিয়া ঐরূপ বলাইয়াছিলেন।

এই নাটকের সংলাপ সম-সাময়িক নাটকের সংলাপ অপেক্ষা উন্নততর ছিল, নিম্নোদ্ধৃত অংশে তাহার পরিচয় আছে :—

"রাম—(সহাস্তে) প্রিয়ে, কার কথা হচ্ছিল ?
সীতা—(সলজ্জভাবে) যার কথায় মন ভাল থাকে।
রাম—তার কোন্ কথাটি ?
সীতা—যে কথাটি মনে রাত-দিন্ জাগ্‌ছে।
রাম—যা মনে জাগে, তা কি মুখে আসে না ?
সীতা—সকলের কাছে আসে না।
রাম—তবে আমি কি সকলের মধ্যে গণ্য ?
সীতা—(সহাস্তে) না আর্যপুত্র, এ বিষয়ে তুমি মধ্য নও—অগ্রগণ্য।"

উভয়ের অন্তর্নিহিত প্রেম কিরূপ সংযত ভাষায় উপরিউক্ত সংলাপের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে! ইহাতে ন্যাকামি নাই—রস আছে। মধুর-রসের পরিবেশনের মধ্যে করুণ-রস আনিয়া মনোমোহন দক্ষতা দেখাইয়াছেন সন্দেহ নাই। কৌশল্যাপ্রমুখ সপত্নীত্রয়কে ত্রিবিধ গুণের অধিকারিণী করিয়া নাট্যকার পুরাণকার-বর্ণিত চরিত্রে গুণপনা দেখাইয়াছেন। লক্ষ্মণের বনগমন-বাধা সুমিত্রা কেমন এক কথায় মিটাইয়া দিলেন দেখুন :—"* * এই চাঁদমুখ দেখ্‌তে না পেয়ে প্রাণে মরি, সেও ভাল; তবু তুই রামের সঙ্গে গেলে আমার যে সুখ হয়, দিগ্বিজয় ক'রে কুবেরের ধন এনে দিলেও আমার তত আহ্লাদ হবে না—আমি অনুমতি কচ্ছি, তুমি সচ্ছন্দে এসো গে।"

নাট্যকার চরিত্র-সৃষ্টি-কৌশলে বেশ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। নাটকের স্বল্প ক্ষেত্রের মধ্যে দুই-চারিটি কথায় প্রাণের গভীরতম প্রদেশের বেদনা প্রকাশিত করা অন্যতম নাট্য-কৌশল। পরিচয় দেখুন :—রাম কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সুমন্ত্র দশরথের মনের অবস্থা এইরূপে ব্যক্ত করিতেছেন—"কখনো বল্‌ছেন, আমার সমস্ত সম্পত্তি, সমস্ত রাজ-পরিচ্ছদ, সমস্ত সৈন্য-সামন্ত শ্রীরামের সঙ্গে দাও—রাম যেন বনেই রাজত্ব কর্তে পারে"। আশাহতের অনুরূপ বেদনা এই কথা কয়টির মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

বনগমনের পূর্বে রামকে দেখিবার ইচ্ছা দশরথ প্রকাশ করায় সুমন্ত্র রামকে লইবার জন্য আসিলে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও জানকী সমভিব্যাহারে অবিলম্বে বিদায় লইতে আসিতেছেন—এই কথা কয়টি মাত্র বলিলেন। নাট্যকার ঐ বিদায়-দৃশ্যটি নেপথ্যে রাখিয়া শোকের গভীরতা দেখাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরবর্তী দৃশ্যে রামকে বিদায় দিয়া সুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও দশরথের মৃত্যুজনিত কথোপকথনের মধ্যে পিতাপুত্রের অদর্শন-জনিত বেদনাটি তীব্রতর না হইয়া ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে লাগিল। এটি দৃশ্য-যোজনার দোষে ঘটিয়াছে। আরব্ধ রসের পাক শেষ পর্যন্ত সমানভাবে বজায় রাখা প্রভূত নাট্যশক্তির পরিচায়ক, মনোমোহনের এ নাটকে সে শক্তি দেখা যায় নাই।

সতী নাটক

এখানি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে বহুবাজার নাট্য-সম্প্রদায় কর্তৃক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। মনোমোহনের অন্যান্য নাটকের মতো ইহাতেও প্রস্তাবনা ও নট-নটীর প্রবেশ আছে। এই নাটকের শান্তিরাম চরিত্রটি নাট্যকারের মৌলিক সৃষ্টি। এই ধরণের পাগলকে আদর্শ করিয়া পরবর্তী নাট্যকাররা বহু চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ছন্দোবন্ধে কথোপকথন এই চরিত্রের বিশেষত্ব। দীর্ঘ উক্তি-প্রত্যুক্তির চাপে ইহার নাট্যক্রিয়া (action) গতিশীল না হইয়া রসের সঞ্চরণ-শীলতার

ব্যাঘাত আনিয়াছে। দেব-নাটককে অতিরিক্ত গার্হস্থ্য-ধর্মাবলম্বী করিয়া এইরূপ করা হইয়াছিল। চরিত্রগুলি ফুটে নাই। সংলাপ বহুস্থানে দীর্ঘ হইয়াছে। কোন-কোন সংলাপের মধ্যে স্থায় যুক্তির অবতারণা বেশ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ :—সতী যখন যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ স্থির করিলেন, তখন এইরূপ বলিতেছেন :—"জন্মদাতা মহাগুরু অবধ্য, ওঁরে তো কিছু বল্‌তে পার্বো না, কিন্তু এমন জনকের জনিত যে জন্ম—এমন মোহান্ধ পিতার দত্ত যে দেহ, তা' আর রাখ্‌বো না। এখনি আমার যোগীশ্বরের দীক্ষিত মহাযোগ-বলে এ জীবনকে জীবিতেশ্বরের পাদ-পদ্মে অর্পণ কর্বো—যাঁর নিকট এ দেহ পেয়েছিলাম, তাঁর কাছেই এ পাপদেহখানি রেখে যাব" ইত্যাদি।

প্রণয়-পরীক্ষা

এখানি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ গ্রেট-ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এই থিয়েটারটি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর শনিবার তারিখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নাটকখানি সামাজিক; বহুবিবাহের কুফল ইহাতে দেখানো হইয়াছে। সংলাপগুলি বাগ্‌-বৈদগ্ধ্যবিশিষ্ট হইয়া স্থানে স্থানে এত আড়ম্বরপূর্ণ ও দীর্ঘ হইয়াছে যে, দর্শক বা পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল। তবে সংলাপের মান (standard) সম-সাময়িক নাটক অপেক্ষা উচ্চতর (higher) ছিল। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী চরিত্র ফুটিয়াছে বেশি। নায়িকা সরলার চরিত্রে নাট্যকার আদর্শ নারী চরিত্র দেখাইয়াছেন, চরিত্রটি সব দিক দিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গিয়াছে। এখানে দীনবন্ধু অপেক্ষা মনোমোহন কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। একে মনোমোহন স্বভাব-কবি, তাহার উপর কবিতার যুগে তিনি নাট্যকার হইয়াছেন, তজ্জন্য নাটকখানি কবিতার প্রাবল্যে পূর্ণ। সুশীলার চরিত্রটি মন্দ হয় নাই, পুরুষ চরিত্রের মধ্যে নটবরটি ফুটিয়াছে ভাল। অন্যান্য চরিত্রগুলি প্রয়োজনে সাড়া দিয়াছে, নাট্য-ক্রিয়ার চরিতার্থতা-সাধনে তাহাদের যে একটা কাজ আছে, এ কথা তাহারা যেন ভুলিয়া যায়—এরূপভাবে তাহাদের গ্রন্থন-প্রণালী সাধিত হইয়াছিল, এ দোষটি মার্জনীয় নহে।

নাগাশ্রমের অভিনয়

এখানি প্রহসন-জাতীয় দৃশ্যকাব্য। 'কেঁড়েল চন্দ্র ঢাকেন্দ্র' ছদ্মনাম লইয়া মনোমোহন ইহা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের এক কুৎসিত চিত্র প্রদর্শন-করানোই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। এই জাতীয় প্রহসন ইহার পূর্বেও রচিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পরিচয় পাঠক যথাস্থানেই পাইয়াছেন। এখানির রচনা-কৌশল মন্দ হয় নাই। প্রথমে প্রস্তাবনা আছে। নাগ-নাগিনীর নামকরণ ও তাহাদের ব্যবহারে সম্প্রদায়-বিশেষের উপর কটাক্ষ-পাত থাকিলেও, ঐ সমষ্টির মধ্য হইতেই ব্যষ্টিগত চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। দর্শকের কৌতূহল কোথাও ব্যাহত হয় নাই। নাট্যকারের পাকা-হাতের ছাপ বেশ আছে। তৎকাল-প্রচলিত কবি-পাঁচালীর গন্ধমুক্ত হইতে এখানি পারে নাই, নমুনা দেখুন :—

"(আরে) হিঁদু সমাজের ওঁছা পাপ।
গোটাকতক ফচ্‌কে কাপ্‌॥
পেয়ে বাসুকির ধর্মের তাপ।
ডিম ফুটে হয় জাওলা সাপ॥" ইত্যাদি

সম্প্রদায়কে ছাড়াইয়া ব্যক্তিবিশেষের উপর আক্রমণ এ প্রহসনে আসিয়া পৌছিয়াছে। ইহার অভিনয়ের স্থান বা তারিখ সংগৃহীত নাই। সম্ভবতঃ অভিনয় হয় নাই।

হরিশ্চন্দ্র নাটক

এই নাটকখানি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি বহুবাজার নাট্যসমাজ কর্তৃক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি পৌরাণিক নাটক; মিলনান্ত হইলেও ইহার বিষাদপূর্ণ ঘটনাবলি কথোপকথনের আতিশয্যে ও দীর্ঘ বর্ণনা-ভঙ্গীর মধ্যে নাটকীয় রসের চরমোৎকর্ষতা দেখাইতে পারে নাই। পাতঞ্জল চরিত্রটি অবান্তর। রাজা-রাজড়ার বিদূষকের প্রয়োজন হইলেও মুনি-ঋষির সে প্রয়োজন থাকে না। বরং পাতঞ্জলের ছায়াতলে বিশ্বামিত্র চরিত্রটি ফুটিবার পথে বাধা পাইয়াছে।

দেশ-হিতৈষণার খাতিরে উনবিংশ শতকের পণ্যসামগ্রী ও রাজকরের ফিরিস্তি যাহা ছন্দোবন্ধে নাটকের মধ্যে সুরতান-লয়ে গীত হইয়াছিল, তাহার ব্যবহার পৌরাণিক যুগের হরিশ্চন্দ্র নাটকে থাক অশোভনীয় হইয়াছে। ঐ সুন্দর গানগুলি আধুনিক কালের কোন ভারতগৌরব ঐতিহাসিক নাটকে স্থান পাইলে ভাল হইত। এ নাটকের সমুদয় গীতগুলি নেপথ্যে গীত হইয়া নাট্যরস জমিতে দেয় নাই। স্বদেশীয় সঙ্গীত-রচনার বাহাদুরি নাট্যকার পাইতে পারেন, কিন্তু অক্ষেত্রে পড়িয়া ঐগুলি অপ্রাসঙ্গিক হইয়া গিয়াছে। পাঠকের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য নিম্নে ঐ বহুপ্রশংসিত গীতের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল :—

"নরবর নাগেশ্বর শাসন কি ভয়ঙ্কর!
দে কর দে কর রব নিরন্তর, করের দায় অঙ্গ জর জর।
* * * *
আয়-কর শুনে গায় আসে জ্বর।
অস্থি-ভেদী রথ্যা-কর কি দুষ্কর।
লবণ টুকু খাব, তাতেও লাগে কর।
কত আর কব মুনিবর।
মাদকতা-কর ছলে দেশময়,
মদ্যের বিপণি নিত্য বৃদ্ধি হয়,
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয়,
হাহাকার রব নিরন্তর।
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা, কিসে রবে লাজ?
ধর্বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ—
বাকল, টেনা, ডোর কপীন।
ছুঁই, সুতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দীয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে—
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে'
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন॥" ইত্যাদি

বিশ্বামিত্র নাগেশ্বরকে হরিশ্চন্দ্রের রাজত্বের শাসন-ভার প্রদান করিয়াছিলেন। নাগেশ্বর কিরূপভাবে ঐ রাজত্ব শাসন করিলেন তাহারই চিত্র ঐ গানটির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বসন্ত ও মল্লিকা চরিত্র দুইটি নাটকের মূল ক্রিয়ার সৌন্দর্যবৃদ্ধি না করায় অবান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পার্থ-পরাজয় নাটক (অর্থাৎ বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জুনের পরাভব)

মনোমোহন বসুর এই নাটকখানি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহার দ্বিতীয় মুদ্রণের তারিখ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস। বারাসতের সন্নিকটবর্তী বাদু ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামের কোন অবৈতনিক গীতাভিনয় সম্প্রদায়ের জন্য এই পঞ্চাঙ্ক নাটকখানি লিখিত হইয়াছিল। এ নাটকোক্ত পাত্র-পাত্রীর কথোপকথন এত দীর্ঘ হইয়াছিল, যে পাঠক বা অভিনয় দর্শনকারীর ধৈর্যচ্যুতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। কথার প্যাঁচে নাটকের রস রস-সৃষ্টি করিতে পারে নাই। রাক্ষসীয় ভাষায় আনুনাসিক শব্দ দ্বারা নূতনত্ব আনিলেও বস্তুর অভাবে তাহা জমে নাই। নাটকীয় অবয়বের গান সত্বেও গীতাভিনয়ের জন্য পৃথকভাবে গান যোজিত হইয়াছিল। ইহা কোন থিয়েটারে অভিনীত হয় নাই।

রাসলীলা নাটিকা

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এখানি প্রকাশিত হইয়া ঐ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে এমারেল্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী গোপাললাল শীল বীডন স্ট্রীটস্থ এমারেল্ড থিয়েটারটি কেদার চৌধুরীর নিকট হইতে খরিদ করিয়া সুসংস্কৃত অবস্থায় চালাইয়াছিলেন। মহাভাবময়ী রাসেশ্বরী রাধিকার রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত মহারাসোৎসব ইহার উপজীব্য। ছন্দোময়ী কবিতা ও গানে-গানে এখানি পূর্ণ। আয়ান ও রাধিকা সম্বন্ধীয় জন্মান্তরীণ রহস্য ইহাতে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, কিন্তু নাট্যরস তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। গিরিশচন্দ্র ঐ তথ্যটিকে তাঁহার 'প্রভাস যজ্ঞ' নাটকে মহাভাবময়ীর ভাবলীলার মধ্যে নাটকোচিতভাবে প্রকটিত করিয়াছিলেন। মনোমোহন খুঁটিনাটির (details) দিকে নজর রাখায় এই নাটিকার অন্তর্নিহিত ভাবরাজির প্রতি দর্শক বা পাঠকের ঔৎসুক্য অন্তর্হিত হইয়াছে, এটি নাটক রচনার দোষ। রাসলীলার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় বাল্যলীলা প্রকটিত করিতে যাইয়া ইহার কেন্দ্রগত রসোৎসব প্রভাবহীন হইয়া গিয়াছে। খণ্ডচিত্র হিসাবে মূর্তিমতী কালিন্দী-বৈষ্ণবী চরিত্রটি নূতন আলোক দিয়াছে। একখানি চারি অঙ্কে পূর্ণ ক্ষুদ্র নাটিকার মধ্যে ৩০ খানি গীত থাকা বাহুল্য বলিয়াই ধরা যাইতে পারে, তাহার উপর খণ্ড-গীত ও কবিতা-ছন্দোময়ী ভাষা উহার পোষকতা করিয়াছে, তাই নাটকাকার ইহাকে melodrama বলিয়াছেন।

আনন্দময় নাটক

এই নাটকের অভিনয় তারিখ পাওয়া যায় নাই। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। নাটকখানি সমস্যামূলক সামাজিক। গৃহে পুত্রসন্তানের অভাব কন্যাসন্তান দ্বারা কেন পূর্ণ হইবে না? এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া কান্ত বাবু আনন্দময়ের সংসারকে কিরূপে নিরানন্দময় করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহার আলেখ্য এই নাটকের মধ্যে আছে। ঘটনাগুলিকে সাংসিদ্ধিক-ভাবে না দেখাইয়া আকস্মিক-ভাবে দেখাইতে যাওয়ায় নাট্যকার দর্শক বা পাঠকের কৌতূহল বৃদ্ধি করিয়াছেন।

সন্দেহ নাই, কিন্তু তজ্জন্য রস-সৃষ্টিতে ব্যাঘাত আনিয়াছেন। নাটকের মধ্যে একটি বা দুইটি আকস্মিক ঘটনার সন্নিবেশ শোভনীয় হইলেও ঐগুলির পরম্পরা (sequence) বিরক্তিকর হইয়া মনস্তত্ত্ব ফুটিবার ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়াছে। ডিটেক্‌টিভের রোমাঞ্চকর ঘটনা সমস্যামূলক (problematic) সামাজিক নাটকে অশোভনীয়। মনোমোহন বসু এই নাটকের গীতগুলি আর নেপথ্যে গাহিতে দেন নাই। ইহা উন্নতির আর এক সোপান বলিতে হইবে।

মনোমোহনের কালে দৃশ্যকাব্যের লাভালাভ

এইকালে নাটকের মধ্যে সংলাপের উন্নতি, অশ্লীল প্রকাশভঙ্গীর অভাব ও নাটকীয় চরিত্র-বিকাশের ক্রমোন্নতি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। পৌরাণিক চরিত্রগুলির দেবভাব গৃহস্থের মায়িক আদর্শকে অতিক্রম করিয়া ফুটিবার অবসর পায় নাই। দীনবন্ধুর শিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষের আদর্শ মনোমোহন তাঁহার সামাজিক নাটকের স্ত্রী-পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত কৃতিত্বের সহিত অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এই কয়টি বৈশিষ্ট্য লইয়া মনোমোহনের কাল সম্পূর্ণতা লাভ করিল।

মনোমোহনের কালে অপর কতকগুলি প্রসিদ্ধ দৃশ্যকাব্যের কথা

মনোমোহনের সম-সাময়িক কোন-কোন দৃশ্যকাব্য ঠিক যুগ-প্রবর্তক ভাবে না আসিলেও তাহাদের প্রাসাদ জন্মিয়াছিল। তদানীন্তন দর্শকসমাজ ঐগুলির অভিনয় বেশ তৃপ্তি-সহকারে উপভোগ কারয়াছিলেন। নিম্নে সেগুলির নাম সংক্ষিপ্ত আলোচনা সহ লিখিত হইল :—

আমি তো উন্মাদিনী (নাটক)

শ্রীনাথ চৌধুরী ইহার রচয়িতা, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বহু পূর্বে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে পাণ্ডুলিপির আকারে পুরাতন সান্নাল ভবনে ইহার প্রথম অভিনয় হইয়া গিয়াছিল। মদ ও বেশ্যার মোহে শ্বশুর বিধুভূষণ বিদেশিনী নাম্নী পত্নীকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়া অবশেষে কিরূপে গৃহবাসী হইল, এবং হেমাঙ্গসুন্দর নামক তাহার বড় জামাতা গাঁজিকার প্রভাবে বালিকা পত্নী সৌদামিনীকে জ্বালা দিয়া কিরূপে তাহাকে উন্মাদিনী করিয়া দিল, নাটকখানিতে তাহারই কাহিনী আছে। রচনার দোষে ঘাত-প্রতিঘাত উঠিতে পারে নাই। চারি অঙ্কে এখানি বিস্তৃত, একখানি মাত্র গান তাহাতে আছে। কামিনীর একটি রহস্যপূর্ণ কথায় পাগল হইয়া যাওয়াটা একটু যেন অস্বাভাবিক বোধ হয়। সে কথাগুলি এইরূপ :—সৌদা—"সে যে কাষ্ঠহাসি, যা হ'ক্ বল্, কার কি সর্বনাশ হয়েছে।" কামিনী—"আর কার তোমারই, হেমাঙ্গসুন্দর—"সৌদা—"আমারই? ওমা, কি হলো? (মূর্ছা)"—এই কথা কয়টি সৌদামিনীর তথাকথিত মানসিক আঘাত! গদ্য ও কবিতায় নাটকখানি রচিত।

কুসুমকুমারী নাটক

চন্দ্রকালী ঘোষ ইহার প্রণেতা। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন তারিখে এখানি প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তৎপূর্বে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তারিখের মাসিক প্রভাকরে এইগ্রন্থের প্রথম অঙ্ক

প্রকাশিত হইয়াছিল। শেক্সপীয়রের অপূর্ব কমেডী 'সিম্বেলীন' নাটকের মর্মানুবাদ ইহার ভিত্তি-ভূমি, তাহার সহিত কাল্পনিক ঘটনার সাহায্য লইয়া নাট্যকার এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। ইহার বহুদিন পরে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে পুরাতন সান্যাল বাড়ীতে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এই নাট্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে নান্দী, সূত্রধার প্রভৃতি পাঠ ছিল না, দ্বিতীয় সংস্করণে এগুলি সংযোজিত হইয়াছে। প্রথম যুগের দৃশ্যকাব্যের নাটকীয় সংঘাতের দিকে গৌণভাবে দৃষ্টি দিবার যে অভ্যাস ছিল তাহা ইহাতেও রহিয়া গিয়াছে। সংলাপগুলিকে মাত্রাপেক্ষা ফেনাইয়া তুলিবার ঝোঁক ইহাতেও পরিত্যক্ত হয় নাই। নাটকখানি পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। নান্দী-প্রস্তাবনার সংগীত লইয়া ৭ খানি গান বিষয়ানুগ হইয়া ইহার মধ্যে আছে, তন্মধ্যে ৫ খানি নেপথ্যে গীত হইয়াছিল। ভাষা স্থানে স্থানে অলংকারপূর্ণ হইলেও সরল গদ্যে এখানি লিখিত।

বাজারের লড়াই

আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই, কিন্তু শিশিরকুমার ঘোষ ইহার রচয়িতা। হগ্ সাহেবের বাজার প্রতিষ্ঠাকালে মতিলাল শীলের পুত্র হীরালাল শীলের ধর্মতলা-বাজার লইয়া যে লড়াই চলিয়াছিল ইহার মধ্যে তাহারই বিদ্রূপ আছে। দৃশ্যগুলিকে অভিনয় বলা হইয়াছে, এইরূপ তিনটি অভিনয়ে প্রহসনটি সম্পূর্ণ, ঘটনাবলীর উল্লেখ ছাড়া নাট্যরস কিছু নাই। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ২৪শে তারিখে ন্যাশানল থিয়েটারে ইহা অভিনীত হইয়া গিয়াছে।

একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব?

এই প্রহসনখানি কস্যচিৎ বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য দ্বারা রচিত; ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি তারিখে বেঙ্গল থিয়েটারে এখানির প্রথম সংস্করণ অভিনীত হইয়াছিল। বাঙ্গালী সিভিলিয়ানদের কেহ কেহ কিরূপ অদ্ভুত জীব হইয়া বিলাত হইতে দেশে প্রত্যাবর্তন করিতেন তাহার একটি প্রকৃত হাস্যকর চিত্র ইহার মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। প্রহসনখানির মধ্যে দৃশ্য নাই, ছয় অঙ্কে এখানি সমাপ্ত। প্রায়শ্চিত্ত বিধির শাস্ত্রীয় অনুশাসনে নহে, পিতৃবন্ধুর সহানুভূতিসূচক মনস্তাত্ত্বিক আলোচনার কৌশলে কিরূপে ঐ বিপথগামী সিভিলিয়ানটি অবশেষে মাতাপিতার গৌরব ও আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল তাহার বিবরণে এখানি পূর্ণ। এখানির মধ্যে শ্লেষ নাই, ইহাই অন্য প্রহসনের তুলনায় ইহার বৈশিষ্ট্য। অশ্লীলভঙ্গী একেবারেই নাই। সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য এই জাতীয় প্রহসন এখন প্রয়োজনহীন। ইহার মধ্যগত দুইখানি গান ভাবে ও শিক্ষায় সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, দীর্ঘ বলিয়া উদ্ধৃত হইল না।

নন্দ-বংশোচ্ছেদ

• এখানি লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীর করুণরসাশ্রিত নাটক, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি তারিখে গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়া গিয়াছে। কি-কি ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া নন্দ-বংশোচ্ছেদ ঘটিল, নাটকের দর্শক বা পাঠক তাহা দেখিয়াছেন। নাট্যকার গদ্য, সরল অমিত্রাক্ষর ও পয়ার ছন্দে নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের অন্তর্গত মন্ত্রগুপ্তি শেষ

পর্যন্ত টানিয়া আনিয়া যথাকালে তাহা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। এ গুণপনা তদানীন্তন অতি অল্প নাট্যকারের দেখা গিয়াছে। ষষ্ঠ অঙ্ক পর্যন্ত নাটকখানি বিস্তৃত এবং ৯ খানি গান তাহাতে আছে। শশিপ্রভা ও নন্দ চরিত্র দুইটি বেশ ফুটিয়াছে। মহারাণী চরিত্রটি দুর্বলতা ও পুত্রস্নেহের মূর্তিমতী প্রতীক। এই করুণরসাত্মক দৃশ্যকাব্যের বিষাদান্ত পরিণতি নন্দ ও শশিপ্রভা।

মা এয়েচেন! (প্রহসন)

খৃষ্টীয় ১৮৭৩ সালে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। আখ্যাপত্রে প্রহসনকারের নাম নাই। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মাচ তারিখে বেঙ্গল থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। রক্ষিতা বেশ্যা তাহার প্রতিপালককে ঠকাইয়া কিরূপে অন্য জার ঘরে লইয়া আসে, তাহার কাহিনী ইহার উপজীব্য। ঐ বেশ্যাসক্ত পুরুষটি নিজের সতী সাধ্বী পত্নীকে আজীবন দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া অবশেষে এইরূপে প্রতারিত হইয়া ঘরে ফিরিলেন। প্রহসনের শিক্ষণীয় নীতি ঐটুকু। ইহাতে ৪ খানি গান আছে, তাহার প্রথম তিনটি সুন্দর, চতুর্থটি রঙ্গপূর্ণ। একাঙ্ক ইহার জীবন।

স্বর্ণলতা নাটক

দেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার রচয়িতা। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রেল তারিখে এখানি প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু অভিনীত হইবার সৌভাগ্যলাভ করে নাই। ইহার উপদেশপূর্ণ সংলাপগুলি কেতাবী ভাষায় লিখিত এবং তৎকালীন কবিতার স্রোত তখনও নাটকের নানাস্থানে উঁকি-ঝুঁকি দিয়াছে, তাই কথোপকথনের মধ্যে প্রাণশক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। কৌলীন্য বিষে দেশ কিরূপ জর্জরিত হইয়াছিল তাহার একটি বিষাদপূর্ণ চিত্র ইহাতে আছে। দলাদলি ও পাত্র-পাত্রীর মনের খোঁজ না লইয়া বিবাহ দিলে কি বিষাদান্ত পরিণতি ঘটে তাহাই ইহার দর্শনীয় বিষয়। যদিও সমাজ আজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে তথাপি পুরাতন নাটক হিসাবে ইহার কদর অল্প। নাটকে কোন গান নাই। স্বর্ণলতা ও চারুর প্রাণের মিল থাকিলেও দেহের মিলন ঘটিল না, নাটকখানি পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত।

কুলীন কন্যা অথবা কমলিনী

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী ইহার প্রণেতা। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৩০মে তারিখে গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটারে এখানি অভিনীত হইয়াছিল। এই সামাজিক নাটকের সংলাপ ও রস-রসিকতা সমসাময়িক নাটক অপেক্ষা উন্নততর হইলেও যথাস্থানে নাটকীয় সংঘাত ঘটিতে বাধা পাইয়াছে। চরিত্রের দিক দিয়া বেচারাম, তারানাথ ও কুমুদিনী অপূর্ব। দৃশ্যকাব্যের প্রাথমিক যুগে নাট্যকারের চরিত্র সৃষ্টিগত খ্যাতি শ্লাঘার বস্তু। কৌলীন্যের নেশায় পড়িয়া কমলিনীর পিতা যে অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিলেন কৃতিত্বের সহিত নাট্যকার তাহার শেষ রক্ষা করিয়া গেলেন। ১১ খানি গান সুপ্রযুক্তভাবে পাঁচ অঙ্কে বিস্তৃত হইয়া এই নাটকখানির মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। গদ্যই নাটকটির বাহন, অল্প স্থানে পদ্য আছে।

সতী-কি-কলঙ্কিনী (কলঙ্কভঞ্জন)

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা, তিনি ইহাকে নাট্যরাসক বলিয়াছেন। এ নাটিকাখানি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১১শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

হইয়াছিল। তৎপরে বহুবার ভিন্ন-ভিন্ন রঙ্গমঞ্চে এখানি অভিনীত হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এখানির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ-কাল ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ। প্রস্তাবনা-সংগীত ইহার মধ্যে আছে। এখানি চারি অঙ্কে সমাপ্ত। বৃন্দার প্ররোচনায় রাধিকার কলঙ্কিনী নাম দূর করিবার জন্য গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া এই নাটিকাখানি রচিত হইয়াছিল। আয়ান, কুটিলা, জটিলা, কৃষ্ণকালীমূর্তি, শতসহস্র ছিদ্র কলস প্রভৃতি বিচিত্র ঘটনাবলির সমাবেশে ও মধুর সংগীত-লহরীর মধ্যে নাটিকাখানি দর্শক-সাধারণের চিত্তরঞ্জন করিয়াছিল। নাটিকার চরিত্র ও পরিবেশকে পৌরাণিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে, নাট্যকলা কৌশল বিশেষ কিছু নাই।

ভারতে যবন

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত এই রূপকখানি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ও ১০ই অক্টোবর তারিখে গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ববর্তী যবনাধিকারের জন্য হিন্দুদিগের খেদ এবং ভারতসন্তানকে স্বাধীনতা লাভের জন্য উৎসাহিত করা ইহার বিষয় বস্তু, কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করিবার কোন পথ ইহাতে প্রদর্শিত হয় নাই। এখানির ভিতর দৃশ্যকাব্যোচিত কৌশল ছিল না; একাঙ্কে এটি সমাপ্ত।

রুদ্রপাল নাটক

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর তারিখে হেয়ার স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক হরলাল রায় প্রণীত 'রুদ্রপাল' নাটকখানি বীডন্‌স্ট্রীটস্থ গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল এবং ঐ সালে ইহা প্রকাশিতও হইয়াছে। এখানি শেক্সপীয়রের 'ম্যাক্‌বেথ' নাটকের মর্মানুবাদ। বিলাতী নৃশংসতাকে হিন্দু ছাঁচে ঢালিতে যাইয়া নাট্যকার তাহার রৌদ্ররসকে যথাযথভাবে পরিবেশন করিতে পারেন নাই, কেমন একটা খাপছাড়াভাব ইহার মধ্যে রহিয়াছে। নাটকখানি পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। ভাষা ভাল, কিন্তু স্থানে-স্থানে ভাবের দ্যোতক হয় নাই।

আনন্দকানন (নাট্যরূপক)

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী ইহার প্রণেতা। এখানি রূপক জাতীয় নাট্যগীতি। কবিতা ও সংগীত ইহার বাহন। গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ আমরা দেখিতে পাইয়াছি। শিব তাঁহার তপস্যা-সৌকর্যার্থ হিমালয়ের 'আনন্দ-কানন' নামক এক শান্তিপূর্ণ স্থানে তপস্যায় মগ্ন থাকিতেন। মদন তাঁহার স্বাভাবিক জিগীষা-বলে শিবের উপর মোহন শর-ক্ষেপ করিলে পর হর-কোপানলে তিনি ভস্মীভূত হন, কিন্তু অমর বলিয়া কমলা কর্তৃক অমৃতসিঞ্চন-গুণে মদনের চেতনালাভ ঘটিয়াছিল। মদন, রতি, অবিবেক, আলস্য, চপলতা, ঈর্ষা, প্রীতি, শান্তি, ভক্তি প্রভৃতি রূপক চরিত্রে নাটিকাখানি পূর্ণ ও তিন অঙ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দুইখানি গান বহু প্রচারিত হইয়াছিল:—(১) 'যুবক যুবতী জাগ, যামিনী যে যায় রে। মদন শাসনে কেবা নিশিতে ঘুমায় রে॥ (২) 'শারদ লতিকা সম ললিত ললনা কায়। বিধি কি সুখের নিধি নারী নিরমিল হায়। যদিরে কামিনীকুল, হ'ত কাননের ফুল, তুলে আনি অনুরাগে তোড়া বাঁধিতাম, অথবা গাঁথিয়া মালা দিতাম গলায়॥' ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তারিখে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

শত্রুসংহার নাটক

হরলাল রায়ের 'শত্রুসংহার' নাটকখানি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানিও পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত, ইহার আখ্যা-পত্রে প্রকাশ তারিখ নাই। কবি ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকের মর্ম লইয়া 'শত্রুসংহার' লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যগত কুরু ও পাণ্ডব চরিত্র হীনভাবে চিত্রিত হইয়াছে। রাক্ষসের ভাষায় ও সংগীতে নূতনত্ব আনিলেও নাটকখানি নাটকীয় গুণসম্পন্ন হয় নাই।

বঙ্গের সুখাবসান নাটক

হরলাল রায় ইহার প্রণেতা, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটারে এখানি অভিনীত হইয়াছে, কিন্তু তৎপূর্বে ১৪ই নভেম্বর তারিখে এখানি বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। কতকগুলি নূতন প্রকাশভঙ্গী এই নাটকের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে, যথা, (১) "বৃক্ষের বৃদ্ধি উর্দ্ধ দিকে, তোমার স্নেহের বৃদ্ধি আমার দিকে," (২) "সাবধান এ কথা জিবের আগায় এন না—যেন স্মরণ গহ্বরে লুকান থাকে," (৩) "বুদ্ধি আছে বল নাই, এরূপ অবস্থার মানুষ ভীরু ও শঠ হয়," (৪) "যদি বাতাস কথা কইতে জান্‌ত, তা হলে বাতাসকে জিজ্ঞাসা করতেম্," (৫) "যখন সান্ত্বনা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন আক্ষেপই আক্ষেপের উত্তর," (৬) "এখন দুজনে একত্রে কি ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে? তোমাদের সূক্ষ্মবুদ্ধির পক্ষে এই কারাগারের গরাদিয়া অত্যন্ত স্থূল, ভাঙ্গতে পারবে না।" (৭) "দুষ্ক'র্বের সময়ের মিত্রতা বিপদকালে বিসংবাদের কারণ হয়, পরমেশ্বরের এই নিয়ম।" বঙ্গাধিপ লক্ষ্মণসেন যে ষড়যন্ত্রজালের ভিতর দিয়া সিংহাসনচ্যুত হইয়া উড়িষ্যার পথে আপনার বঙ্গদেশ ও জীবন হারাইয়াছিলেন তাহার চিত্র ইহাতে আছে। জাল, ষড়যন্ত্র, কাপুরুষতা, মহান্ চরিত্র, ভাষা, লিখনভঙ্গী সব সত্বেও নাটকীয় কৌশলের অভাবে ও ঘাত-প্রতিঘাতের মাত্রাজ্ঞান অভাবের জন্য নাটকখানি ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। মাত্র একটি গান ইহার সম্বল। নাট্যসাহিত্যের শৈশবে ইহার জন্ম, তাই দোষগুলি মার্জনীয়।

মণিমালিনী (নাটক)

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ইহার রচয়িতা। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত এবং ঐ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে বেঙ্গল থিয়েটারে এই নাটকখানি অভিনীত হইয়াছিল। নায়ক বীরভূষণ ও নায়িকা মণিমালিনীর বহু ঘটনাপূর্ণ করুণরসাশ্রিত মিলন-কাহিনী ইহার আখ্যায়িকা। মণিমালিনীর পিতা এ মিলনের পরিপন্থী ছিল, কিন্তু ষড়যন্ত্রের এমনি প্রভাব যে বীরভূষণকে হত্যা করিবার পরিবর্তে মণিমালিনীর পিতাই মৃত্যুবরণ করিল। ভাষা ও ঘটনা-সমাবেশের দিক দিয়া নাটকখানি মন্দ নহে, তবে লোমহর্ষ ঘটনার আতিশয্যে নাট্যচরিত্র বিকশিত হইতে পারে নাই। পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত নাটকখানি একেবারেই সংগীতবিহীন।

বিধবার দাঁতে মিশি

গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এই দৃশ্যকাব্যখানি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার অভিনয়-সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তদানীন্তন বঙ্গসমাজে মদ্য-পান প্রবেশলাভ করিয়া ভদ্র গৃহস্থ-পরিবারবর্গকে কিরূপে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছিল তাহার একখানি চিত্র এই দৃশ্যকাব্যের মধ্যে

প্রদর্শিত হইয়াছে। দৃশ্যকাব্য-কার প্রারম্ভে প্রহসনের পাক চড়াইয়া তৃতীয় অঙ্কের শেষা-শেষি ঐ পাককে সহসা নাটকের পাকে পরিণত করিতে অভিলাষী হইয়া নাট্যকলার অপমৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন। যতক্ষণ প্রহসনের পাক ছিল, ততক্ষণ মধ্যে-মধ্যে অশ্লীলভঙ্গী ছাড়া ইহার গতি অন্য দিক দিয়া বেশ স্বচ্ছন্দ ছিল, কিন্তু পরিশেষে রূপান্তরিত অবস্থার মধ্যে ইহার বিবাদপূর্ণ ঘটনাবলিকে মিলনান্ত করিতে যাইয়া নাট্যকার পাক ধরাইয়া ফেলিয়াছিলেন; নাটকের চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্ক তজ্জন্য চোঁয়া-গন্ধে পূর্ণ। গ্রন্থমধ্যে কোন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিককে অবনমিত করা হইয়াছে; তাঁহাকে যেরূপভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে তাহাতে ভদ্রতার সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে। নাটকীয় পরিকল্পনাটি এমনই দোষযুক্ত যে গোরাচাঁদ প্রতিনায়ক হইয়া ঘটনার প্রাবল্যে নাটকের আসল নায়ক বরদাকান্তের চরিত্রটিকে ফুটিবার অবসর দেয় নাই। সৌদামিনী চরিত্রটি ফুটিবার অবকাশ পাইয়াও নাট্যকারের বুনানি (weaving) দোষে ক্রমশঃ নিমীলিত হইয়া গেল। হেমাঙ্গিনী বা যামিনী চরিত্র দুইটি নাট্যক্রিয়ার মধ্যে আসিয়াও নেপথ্যে থাকিবার মতো ক্রিয়াহীন হইয়া গিয়াছে। অশ্লীল প্রকাশভঙ্গী ছাড়া অশ্লীল কথার সমাবেশ নাটকের স্থানে-স্থানে আসিয়া ইহাকে শিক্ষিত ভদ্রসমাজের অপাঙ্‌ক্তেয় রাখিয়াছে।

বাল্যবিবাহ নাটক

রামচন্দ্র দত্তের এই নাটকখানি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। নাট্যকার অপরিপুষ্ট নাট্যকলাজ্ঞান লইয়া নাটকখানি লিখিয়াছেন। বাল্যবিবাহের দোষ, মদ্যপান, বউকাঁটকী শাশুড়ী-চরিত্র প্রভৃতির বিরুদ্ধে এককালীন অভিযান চালাইতে যাইয়া নাটকটি উদ্দেশ্যহীন হইয়াছে। আড়ম্বরপূর্ণ আরম্ভটি শেষ রক্ষা করিতে পারে নাই। নাট্যক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধহীন কতকগুলি অবান্তর বিষয় নাটকের মধ্যে আসিয়া রসসৃষ্টি করিতে দেয় নাই। যে সকল চরিত্রের ভিতর দিয়া রস ফুটিয়া উঠিবে সেগুলি মৃৎপুত্তলী। মাত্র বউকাঁটকি-শাশুড়ী সৌদামিনীর চরিত্রটি ফুটিয়াছে। মহেন্দ্র, সরলা, ভূষণ প্রভৃতি প্রধান চরিত্রগুলির কোনটাই সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। দর্শক বা পাঠকের কৌতূহল অপূর্ণ রাখিয়া সেই অসম্পূর্ণতার মধ্যেই নাটকখানি শেষ হইয়াছে। সম্ভবতঃ এখানি অভিনীত হয় নাই, তাহা হইলে দোষগুলি স্পষ্টীকৃত হইত। নাট্যকার মোটেই কল্পনা-কুশলী ছিলেন না। নাটকীয় চরিত্রের স্বগতোক্তিগুলি নীরস ও কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। সংগীত সুপ্রযুক্ত হয় নাই।

শরৎ-সরোজিনী

বহুবাজারের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাস 'দুর্গাদাস' ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন। এখানি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এটি সামাজিক নাটক, এবং ইহার নায়ক-নায়িকারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত। সদ্য কলেজ-নিষ্ক্রান্ত শরতের মস্তিষ্কের মধ্যে কেতাবী উপদেশে পুষ্ট দেশ-প্রেম, জনসেবা, দয়া-পরোপকার প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলি একযোগে ক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার মনে ধারণা হইতে বিলম্ব হইল না যে, মানুষ অকৃতদার না হইলে কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন করিতে পারে না। নারীপ্রেম মানুষকে স্বার্থপর করিয়া তুলে, সুতরাং তিনি আজীবন কুমার থাকিয়া স্বদেশকে উন্নত করিবেন। ক্রমে বিধি-বিড়ম্বনায় তাঁহার ভাগ্য-বিপর্যয়

আরম্ভ হইল, এবং নিজ গৃহে প্রতিপালিতা সরোজিনীর প্রতি তাঁহার যে আশৈশব ভগিনীসুলভ ভালবাসা ছিল, তাহা ঐ বিড়ম্বনার কিরূপে দাম্পত্য প্রেমে পরিণত হইল, তাহারই চিত্র এই নাটকটির মধ্যে চিত্রিত আছে।

ঘটনার প্রাবল্যে নাটকটি চমকপ্রদ হইয়াছে সন্দেহ নাই; প্রতি দৃশ্য রোমাঞ্চকর ঘটনায় পূর্ণ—চলচ্চিত্রপ্রদর্শনের মতো প্রতি দৃশ্যেরই বিস্ময়কর পরিণতি ঘটিয়াছে। শৃঙ্গার, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও হাস্যরসের এককালীন হুড়াহুড়িতে নাটকের স্থায়ী রসকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব ঘটে। নাট্যকার তাঁহার লেখনীকে একটু সংযত রাখিলে, আরও দক্ষতার পরিচয় দিতে পারিতেন। নাটকটি জনপ্রিয় হওয়ায় একাধিকবার অভিনীত হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

নগ নলিনী

প্রমথনাথ মিত্রের নগনলিনী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বীডন্‌সট্রীটস্থ গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি কল্পনামিশ্রিত ঐতিহাসিক নাটক, ভীল ও রাজপুত কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। এই নাটকের বুনানি (weaving) নাটকোচিত (dramatic) হয় নাই। প্রতি দৃশ্য বর্ণনার বাহুল্যে দর্শক বা পাঠক সমাজের মনে ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইয়া দিয়াছে। কৌতূহলের মাত্রা কতদূর উঠাইয়া কোথায় তাহার নিবৃত্তি করিতে হইবে নাট্যকারের সে জ্ঞানের অভাব ইহাতে দেখা গেল। নায়ক-নায়িকারা যখন কবিতায় কথা বলে তাহার রস দর্শক-সাধারণ উপভোগ করিতে পারে না—এমনি দীর্ঘ ও দুর্বোধ ভাষায় সেগুলি রচিত।

ভীমসিংহ

তারিণী চরণ পাল ইহার প্রণেতা। শেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকের এখানি মর্মানুবাদ। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বেঙ্গল রঙ্গমঞ্চে গ্রেট ন্যাশানল অপেরা কোম্পানী দ্বারা এখানির মিলিত অভিনয় সংঘটিত হইয়াছিল। নাট্যকার লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী ও কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, গ্রন্থের ভূমিকায় একথার স্বীকৃতি আছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশে অদ্বিতীয় শেক্সপীয়রের অমর নাটকের ভাবমর্ম হিন্দু পোষাক পরিহিত ভীমসিংহ ও স্বর্ণলতা যথাক্রমে ওথেলো ও ডেস্‌ডিমোনার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। ইয়াগোর নৃশংসতা ভৈরবের ক্রিয়াকলাপে প্রকটিত হইয়াছে। শেক্সপীয়রের নগ্ন রৌদ্ররস বাঙ্গালী পাঠক বা দর্শকসমাজ তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতে পারেন নাই, তাহার প্রমাণ তারিণীচরণের 'ভীমসিংহ' ও পরবর্তীকালে রচিত গিরিশচন্দ্রের 'ম্যাকবেথ' নামক নাটকও রঙ্গমঞ্চে আশানুরূপ দর্শক আনিতে পারে নাই।

পারিজাত হরণ বা দেব-দুর্গতি

এই নাট্যরাসকখানি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা। প্রস্তাবনা-সংগীত আছে। নারদ কর্তৃক আনীত পারিজাত পুষ্প লইয়া, রুক্মিণী ও সত্যভামা দেবীর সহিত যে কোন্দল বাঁধিয়াছিল, তাহার ফলে ইন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপক্রম হয়, কিন্তু মহাদেব, কশ্যপ ও নারদের হস্তক্ষেপে যথা সময়ে তাহা নিবারিত হইয়াছিল। ইহার নাট্যগত মূল্য কিছু নাই, গানে-গানে দর্শক বা পাঠককে আনন্দ দেওয়াই উদ্দেশ্য। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর তারিখে গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটারে ইহা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

সাক্ষাৎ দর্পণ (নাটক)

আখ্যাপত্রে নাটককারের নাম নাই। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর তারিখে এখানি প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রেল তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়া গিয়াছে। ঐ অজ্ঞাত নাটককার ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, কোন প্রচলিত উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এখানি রচিত হয় নাই। যে সকল ভয়ানক দোষ ও বিগর্হিত আচরণ তৎকালে বঙ্গ-সমাজে প্রচলিত ছিল ইহাতে তাহারই সাধ্যানুসারে বর্ণনা আছে। পরবর্তী নাটুকে ভাষার প্রচলন নাটকের প্রাথমিক যুগে হয় নাই, তাই নাট্যকার ইংরাজি বা বাঙ্গালা মিশ্রিত কথিতভাষা ইহাতে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন ইহা নাটক নামে অভিহিত হইলেও নাটকত্ব ইহার মধ্যে নাই, কোন সমস্যা সমাধানপ্রাপ্ত হয় নাই। সামাজিক দোষগুলির নগ্নরূপ দর্পণের প্রতিবিম্বের মতো ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাই নাট্যকার ইহার নাম 'সাক্ষাৎ-দর্পণ' রাখিয়াছেন। ব্যঙ্গাত্মকভাবে ঐগুলি প্রদর্শিত হইলে প্রহসন বলা চলিত, কিন্তু তাহাও হয় নাই। কৌলীন্যের খাতিরে 'বর' অপেক্ষা 'ঘর' দেখিয়া বিবাহ ও তাহার কুফল, ব্রাহ্মধর্ম, কেশবসেন, রেভারেণ্ড কালীবন্দ্যো প্রভৃতির উপর কটাক্ষপাত আছে। মদ খাওয়া, বেশ্যাগমন ও অন্যবিধ লাম্পট্যের নগ্নরূপ ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। ১০ খানি গান আছে।

গুইকোয়ার নাটক

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেশচন্দ্র মিত্র কর্তৃক এখানি যথাক্রমে প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে তারিখে বেঙ্গল থিয়েটারে গ্রেট ন্যাশনল অপেরা কর্তৃক ইহা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। বরোদার রেসিডেণ্ট সাহেবকে বিষ খাওয়ানো ব্যাপার লইয়া বরোদার মহারাজের বিচার ও নির্বাসন দণ্ড ইহার উপজীব্য। দামোদর নামে তাঁহার কর্মচারী এই ষড়যন্ত্রের অন্যতম ছিল। চারি অঙ্কে এখানি সম্পূর্ণ। মহারাজ-কুমারী কুমাবাঈ ও মহারাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের সংলাপ মধ্যে ও বিচার দৃশ্যে নাটকত্ব আছে। এখানি সংগীতবিহীন নাটক।

পদ্মিনী (চিতোর রাজসতী)

অভিনেতাশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রলাল বসু কর্তৃক রচিত এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাটকে গানের উল্লেখ আছে কিন্তু কোন গীত নাই, বোধ হয় নাট্যকার নিজে গীত রচনা করেন নাই, অপরের রচিত গান গীত হইয়াছিল। এখানি আগাগোড়া গদ্যে বিরচিত। 'মিলে সবে ভারত সন্তান, এক তান মনোপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান' ইত্যাদি চারণ-গীতি কপালকুণ্ডলা ও তাঁহার সৈন্যগণ কর্তৃক ছন্দোবদ্ধে গীত হইয়াছিল। ভীমসিংহ স্বয়ং—'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়। দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়'—নামক প্রসিদ্ধ কবিতাটি সৈন্যমধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য আবৃত্তি করিয়াছিলেন, নাটকখানি পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত, ঘটনাবিবৃতির মধ্যে মাত্র একটি স্থানে নাটকীয় সংঘাত রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, সেটি চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে। পদ্মিনী উপাখ্যান সর্বজনবিদিত, তাই গল্পাংশের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বীরবালা নাটক

উমেশচন্দ্র গুপ্ত এখানির প্রণেতা। ১৫ই জুলাই, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। এখানি সিল্যিউকস্ ও মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্ত বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থকার গ্রামস্থ অভিনেতৃবর্গের জন্য এখানি

লিখিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সহিত সিলিউকস্-তনয়া বীরবালার প্রণয় ও বিবাহ ইহার আভ্যন্তরীণ ভাব। পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। নাট্যকলা-কৌশল কোন কোন স্থানে বিকশিত হইয়াছে, সর্বত্র নহে। গদ্যে লেখা, উচ্ছ্বাসের স্থানে কবিতা লেখা দিয়াছে, কিন্তু সেগুলি সাবলীল নহে। সংগীতের ভাগ কম এবং শ্রুতিকটু।

সুরেন্দ্র-বিনোদিনী

উপেন্দ্রনাথ দাস নামক নাট্যকারের দ্বিতীয় নাটক 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল রঙ্গমঞ্চে দি-নিউ-এরিয়ন থিয়েটার কর্তৃক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানিও নাট্যকারের 'দুর্গাদাস' নামক ছদ্মনামে লিখিত হইয়াছিল। নাট্যকার আখ্যায়িকাকে কৌশলময় করিতে যাইয়া নাট্যক্রিয়ার গতি সমান চালে রাখিতে পারেন নাই, স্থানে-স্থানে মন্থর গতি বিশিষ্ট হইয়াছিল। সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রণয় হরিপ্রিয়ের মনের খেয়াল চরিতার্থ করিবার ফন্দির মধ্যে পড়িয়া নাট্যরসের মাধুর্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এত বড় দুইটি চরিত্রের গতি বিনা প্রশ্নে, বিনা প্রমাণে —মাত্র অভিমানের বশে ভিন্ন পথে প্রধাবিত হইল, এবং রাধাচন্দ্র ও বিরাজমোহিনীও সেই এক ভুল করিয়া বসিল—এটা অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। যাহা হ'ক্ সে যুগের নাটকের মধ্যে এখানি বেশ সাড়া তুলিয়াছিল। দেশের দুর্ভাগ্য, যে এই নাট্যকার অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার নাটকদ্বয়ের যশঃ গৌরব যাহা তিনি মৃত্যুর পর (Posthumous glory) প্রকৃতপক্ষে পাইয়াছিলেন তাহাও নিতান্ত কম ছিল না।

অপূর্ব সতী বা জলন্ধর বধ দৃশ্যকাব্য

নৃত্যলাল সাহা ইহার প্রণেতা। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বহু পূর্বে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৩ আগস্ট তারিখে ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়া গিয়াছিল। নাট্যকার এই কাব্যখানিকে দ্বাদশ অঙ্কে বিভক্ত করিয়া নাট্যমঞ্চে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর দর্শনীয় করিয়াছেন বলিয়া ইহা দৃশ্যতঃ দৃশ্যকাব্য হইয়াছে, কিন্তু পরবর্তীকালের যোগরূঢ় শব্দবিচারে ইহা নাটক-সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে নাই, যেহেতু নাটকীয় সংঘাত-কৌশল ইহার মধ্যে ছিল না। পার্বতীর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জলন্ধর-পত্নী বৃন্দাবতী সতীর অভিশাপে রাধিকার কালা কলঙ্কিনী নামগ্রহণের ইতিহাস ও পার্বতীর ইচ্ছায় বৃন্দাবতীর ভস্মীকৃত দেহ হইতে তুলসীবৃক্ষের উৎপত্তি-বিষয়ক পৌরাণিকী কাহিনীর বর্ণনা ইহাতে আছে। ইহার মধ্যে ২৫ খানি গান আছে, সরল অমিত্রাক্ষর ছন্দ ইহার বাহন।

বীরনারী

এই ঐতিহাসিক নাটকখানি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, আখ্যাপত্রে নাটককারের নাম নাই। ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর কল্পনার সাহায্যে নাটকখানি রূপায়িত হইয়াছে এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্‌টেম্বর শনিবার তারিখে বেঙ্গল থিয়েটারে দি নিউ এরিয়ান থিয়েটার কর্তৃক এখানি প্রথম অভিনীত হইয়া গিয়াছে। সিন্ধু প্রদেশান্তর্গত ত্রোহীরাজ ডাহির-পত্নী ও তাঁহার পুত্রবধূ জয়সিংহের স্ত্রীর বীরত্ব-কাহিনী ইহার আখ্যায়িকা। নাটকখানির মধ্যে গড্ডালিকা-স্রোত প্রবিষ্ট হয় নাই। মন্ত্রী ও মন্ত্রীপুত্রীর কথোপকথনে কয়েকটি নূতন কথার ইঙ্গিত আছে, যথা—(১) "পিতা বিশেষ ভালবাসার

পাত্র, কিন্তু একমাত্র নহেন। ভালবাসা জলস্রোতের ন্যায় একদিগ্‌গামী নহে, জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় ইহার মধুর কণা চারিদিগে বিস্তৃত—স্নেহ, ভক্তি, বন্ধুত্ব ও প্রেম।" (২) "যদি বিবাহে আপনার এতই আপত্তি থাকে, সুনীতি তার অন্যথা করবে না। আপনার কন্যা কেবল ভালবাসার অধিকার চায়—হৃদয়ের সন্তৃপ্তি চায়—আর কিছু চায় না।" (৩) "মানুষ গুণেই আকৃষ্ট হয়, কেবল কুলে নয়।" নাটকটির মধ্যে ব্রাহ্মণের উপর কিছু কটাক্ষপাত আছে। মহম্মদ কাশিমের প্রথম ভারতবিজয় লইয়া এখানি রচিত। রাজপুতললনার চিতারোহণ, ক্ষত্রবীর ও ক্ষত্রশিশুর যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মদান—এ সকল সত্ত্বেও নাটকীয় কৌশলের অভাবে নাটকখানি জনপ্রিয় হয় নাই। নাট্যকার নাটকের আদিম যুগে নূতন পথের সন্ধান দিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ইংরাজি নাটকের আদর্শে গঠন করিতে যাইয়া শেষ দৃশ্যে পরীস্থানের একটিমাত্র গীতে নাটকখানি শেষ করিয়াছেন। বাঙ্গলা নাটকের সংগীতের প্রভাব এখানি পায় নাই।

ডাক্তারবাবু নাটক

নাট্যকার অজ্ঞাতনামা থাকিতে চান, গ্রন্থের ভূমিকায় এরূপ অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন, কিন্তু নাম অপ্রকাশিত থাকিলেও তিনি যে চোরবাগান অঞ্চলের একজন বিখ্যাত বংশোদ্ভব ব্যক্তি ছিলেন, তাহা জনরব বলিয়া দিয়াছে। এখানি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন প্রকাশিত হইয়া ঐ অব্দের ৪ঠা সেপ্‌টেম্বর তারিখে ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাটকখানি পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত, সংগীত নাই। মন্মথ, কৃষ্ণ, বিনোদ প্রভৃতি ডাক্তার-ত্রয়ের চরিত্রগত ও ব্যবসায় গত আলোচনা ইহার উপজীব্য। মদ, লাম্পট্য ও ব্যবসায়িক জুয়াচুরি যাহা চিকিৎসকের অশোভনীয় তাহা কিরূপে তৎকালীন চিকিৎসক-সমাজকে লোকচক্ষে হেয় করিতেছিল তাহার বিশিষ্ট বর্ণনা ইহার মধ্যে আছে। নাটক নামে অভিহিত হইলেও নাটকীয় কৌশল কিছুমাত্র নাই।

আচাভুয়ার বোম্বাচাক (নাটক)

নাদাপেটা হাঁদারাম ইহার রচয়িতা। আখ্যাপত্রে রচনার কোন তারিখ নাই, তবে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক এরূপ নির্দেশ আখ্যাপত্রে আছে, তজ্জন্য তিনি যে ইহার আসল প্রণেতা তাহা একরূপ জানা গেল। অনুমানে বোধ হয় ১৮৭৪।৭৫ খৃষ্টাব্দের কাছা-কাছি সময়ে ইহা প্রণীত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার কুহকে মুগ্ধ হইয়া এক পল্লীবাসী ধনী সন্তান অত্যদ্ভুত খেয়ালের বশবর্তী হইয়া নিজ পত্নীর সতীত্ব পরীক্ষার জন্য এক বন্ধুর তত্ত্বাবধানে তাহাকে রাখিয়া পরে সেই বন্ধুদ্বারা কিরূপে প্রতারিত হইল তাহার কাহিনী ইহার উপজীব্য। কবিতা ও কথোপকথনের সাহায্যে লিখিত হইলেও নাট্যরূপ তাহাতে ছিল না। উপসংহারকালীন ছড়ার কিয়দংশ এইরূপ :—

"মুলুক জুড়ে কলির চেলা
বেড়ায় লাকে লাক্।
সাজে কুলাঙ্গনা বারাঙ্গনা
তাই দেখে অবাক্॥

ধর্মের ঢোলে রগড় বাজে
তাক্ তাক্‌সিন্ তাক্।
ঠেকে দেখে 'আচাভুয়ার'
হ'ল 'বোম্বাচাক্'॥"

প্রকৃত বন্ধু (নাটক)

ব্রজেন্দ্রকুমার রায় এখানির রচয়িতা। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি তারিখে গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাটকের প্রাথমিক যুগে যে কয়খানি নাটক আসরে দেখা গিয়াছিল, এখানি তাহারই অন্যতম বলিয়া তদানীন্তন গড্ডালিকা স্রোতোধারায় মিলিত হয় নাই। গল্পাংশের নূতনত্বে ও বিন্যাসের নবীনতায় এখানি নূতন গতিলাভ করিয়াছিল, কিন্তু সংলাপের অতিশয়োক্তিতে ও প্রবন্ধজাতীয় সাহিত্যের অনুরূপ ভাষার আড়ম্বরে লিখিত হওয়ায় ইহা স্বচ্ছন্দ গতিশীল হয় নাই, তাই নাট্যসাহিত্যের পরবর্তী উন্নত আসরে ইহার অভিনয়-কথা আর শুনা যায় নাই। নাটকখানিতে সংগীতের আড়ম্বর নাই, মাত্র দুইখানি গান যথাস্থানে গীত হইয়াছিল। তদানীন্তন অশ্লীলতার আব-হাওয়া হইতে নাটকখানি মুক্ত। নাটকটি অঙ্গনা, অপর্ণা ও কলিঙ্গ দেশের কথায় পূর্ণ। ইহার প্রথম দুইটির নাম কাল্পনিক এবং শেষোক্তটি ঐতিহাসিক। তজ্জন্য বাঙ্গালা-সমাজের অনেক কথা নাটকের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

কর্ণাটকুমার

সত্যকৃষ্ণ বসু সর্বাধিকারী ইহার প্রণেতা। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ও ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। কর্ণাটরাজ ও উজ্জয়িনীরাজের চির বিবাদের ফলস্বরূপ কর্ণাটরাজকুমার রঞ্জনের সহিত উজ্জয়িনীরাজকুমারী প্রমদার অভূতপূর্ব মিলনে যে মিলন গ্রন্থি গ্রথিত হইল, তাহা দ্বারা কেবল নায়ক নায়িকাই নহে উপনায়ক বীরবল্লভ ও উপনায়িকা মুরলা পর্যন্ত প্রণয়সূত্রে বন্ধনপ্রাপ্ত হইল। ৮ খানি গানের সহিত নাটকখানি পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। নাট্যক্রিয়াগুলি যথাস্থানে সংঘাত আনিতে পারে নাই, তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। প্রাবন্ধিক ভাষার মাধ্যমে নাটকখানি রচিত, তাই কৃত্রিমতাকে সে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

নাট্যসাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাল (১৮৭২—১৯০৪ খৃঃ)

মনোমোহন বসুর পর নাট্যসাহিত্য-ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পদার্পণ করিলেন। দৃশ্যকাব্য বিভাগে তাঁহার কৃতিত্ব আলোচনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে। জ্যোতিরিন্দ্রের নাট্যসাহিত্যের হাতে-খড়ি সম্বন্ধে তাঁহার জীবনস্মৃতিকার এইরূপ বলিতেছেন :—"এক দিন কথা হইল, আমাদের ভিতর Extravaganza নাট্য নাই। আমি তখনই Extravaganza প্রস্তুত করিবার ভার লইলাম। পুরাতন 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে কতকগুলি মজার-মজার কবিতা জোড়া-তাড়া দিয়া একটা অদ্ভুত নাট্য খাড়া করিয়া তাহাতে সুর বসাইয়া ও-বাড়ীর বৈঠকখানায় মহা উৎসাহের সহিত তাহার মহলা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে একটা গান ছিল—

"ও কথা আর ব'লো না, আর ব'লো না,
বল্‌ছো বঁধু কিসের ঝোঁকে—
ও বড় হাসির কথা, হাসির কথা,
হাস্‌বে লোকে, হাস্‌বে লোকে,—
হাঃ হাঃ হাঃ হাস্‌বে লোকে।" *

এ ঘটনাটি সম্ভবতঃ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল।

উৎকট নাট্যরঙ্গের (Extravaganza) সৃষ্টি ও অভিনয়

উৎকট নাট্যরঙ্গে কোন কৈন্দ্রিক গল্পাংশ নাই। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্য হইতে কতকগুলি ঘটনাকে বাছিয়া লইয়া কথা ও গানের সাহায্যে সং-রং-তামাশার মতো করিয়া জন-সাধারণের সম্মুখে অভিনয় করাই ইহার কাজ। ইতঃপূর্বে পূর্বোক্ত আখ্যানবস্তুহীন রং-তামাশাপূর্ণ নাট্যের (Extravaganza) অস্তিত্বের কথা ১৮২১ খৃষ্টাব্দে অভিনীত 'কলিরাজার যাত্রা' ভিন্ন আর শুনা যায় নাই, তজ্জন্য জ্যোতিরিন্দ্র নাথকেই এই জাতীয় নাট্যের জনক বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। অন্ততঃ তিনি যে ইহার প্রবর্ত্তক তাহা একরূপ নিঃসন্দেহ, কারণ তাঁহার ঐ জাতীয় নাট্যরঙ্গ প্রবর্তিত হইবার পর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যথাক্রমে 'কুজার কুঘটন', 'নববিত্তালয়', 'মুস্তফি সাহেবকা পাকা তামাশা', 'পরীস্থান', 'The goose-quill fight', 'বিলাতিবাবু', 'সাবস্‌ক্রিপ্‌শন্ বুক', 'প্রাইভেট্ থিয়েটারের গ্রীনরুম', 'মডেল স্কুল' প্রভৃতি উৎকট নাট্যরঙ্গগুলির অভিনয়-সংবাদ সম-সাময়িক সংবাদপত্রে পাওয়া গিয়াছে। এগুলির সাহিত্যিক মূল্য কিছুই ছিল না। অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফি, অমৃতলাল বসু, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, প্রিয়মাধব বসু, ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি তদানীন্তন কালের নট-নটী ও নাট্যকারগণ রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা ও নাচ-গান-রং-তামাশার মধ্য দিয়া ইহাদের এক-একটির রূপ দিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষও এই সময়ে মাউসি, চ্যারিটেবল ডিস্‌পেন্‌সারি, হগ্ এবং বুল্ নামীয় কতকগুলি উৎকট নাট্যরঙ্গ গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটারের জন্য রচনা করিয়াছিলেন। এইগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত নাট্যরঙ্গের অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।

কিঞ্চিৎ জলযোগ

এই প্রহসনখানিতে একাধারে দর্শক ও অভিনেতার জলযোগের ব্যবস্থা প্রহসনকার এক কৌতুককর আব্-হাওয়ার মধ্যে করিয়াছেন। ইহাতে কোন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম নেতা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার উপর কটাক্ষপাত আছে। পূর্ণচন্দ্র নামধেয় কোন সুরা ও অবিদ্যাসেবী পুরুষের এবং বিধুমুখী নাম্নী কোন স্বাধীনতা ও সমাজপ্রিয় নারীর বহির্গমনাভিলাষ জনিত প্রণয়-কলহ পেরুরাম নামা এক বেকার যুবকের অকস্মাৎ আবির্ভাবে কিরূপে দূরীভূত হইয়াছিল তাহার চিত্রও ইহাতে আছে। পেরুরামই ঐ সন্দেহ আনিবার ও তাহা দূর করিবার হেতু হইয়াছিল। দুইটি দৃশ্যের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হাস্যরসের অদ্ভুত কৌশল দেখাইয়াছেন। এটি তাঁহার নাট্যবিষয়ক প্রথম গ্রন্থ, কিন্তু বাহাদুরি যথেষ্টই আছে। ১৮৭২

* বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "জ্যোতিরিন্দ্র নাথের জীবনস্মৃতি" পৃঃ ৭১ এবং রবীন্দ্রনাথের "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থেও এই গানটির কথা বলা হইয়াছে। গানটির ভাষা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উহাকে সুর-তান-লয়ে গঠিত করিয়াছিলেন। ইতি—গ্রন্থকার।

খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে ইহা প্রকাশিত হইয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রেল তারিখে রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে ন্যাশানল থিয়েটার কর্তৃক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

পুরুবিক্রম নাটক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটক ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে অগস্ট তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি নাট্যকার-রচিত প্রথম নাটক। এটি কল্পনা-মিশ্রিত ঐতিহাসিক এবং দেশাত্মবোধে পূর্ণ।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত চৈত্রমেলা চৈত্র সংক্রান্তির দিন প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং ইহাই পরবর্তীকালে হিন্দুমেলা নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইংরাজ-শাসন-কালে বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধের ইহাই হইল প্রথম জাগরণ। ঐ মেলায় যে সকল শিক্ষিত যুবক যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই নাট্যসাহিত্যের ভিতর দিয়া দেশাত্মবোধকে তাঁহার ঐতিহাসিক্ নাটকে প্রথম দেখাইলেন।

নারীর প্রেম ও ক্ষুদ্রতম স্বার্থের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা ভারতের ভাগ্যচক্রকে কিরূপে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল তাহার চিত্র নাটকের মধ্যে চিত্রিত হইয়াছে। ইহাব ভাবা ও রুচি বেশ মার্জিত, প্রসঙ্গ সুষ্ঠু ও উদ্দীপনাময়। সম সাময়িক নাটকের অশ্লীল আবিলতা হইতে নাটকখানি মুক্ত হইয়া ঠাকুর-বাড়ীর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে। উদাসিনী গায়িকার চারণ-গীতি নাট্যসাহিত্যে এই প্রথম রচিত হইল:—

"মিলে সব ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান" ইত্যাদি

পরবর্তীকালে বহু নাট্যকারের কল্পনার উৎস এই জাতীয় গীতদ্বারা খুলিয়া গিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার-পতন' তাহার একটি দৃষ্টান্ত-স্থল। সেকেন্দর-সার বিরুদ্ধে সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিবার ভঙ্গীটি এইরূপ :—

পুরুরাজ বলিতেছেন— "ওঠ! জাগ! বীরগণ! দুর্দান্ত যবনগণ
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।
হও সবে এক প্রাণ, মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ॥" ইত্যাদি

ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে পুরুরাজের একতা বন্ধনের চেষ্টা তক্ষশীলের স্বার্থ-তাড়নায় কিরূপে বিপর্যস্ত হইয়াছিল নাটকের ক্ষেত্র তাহাই। মোটের উপর নাটকখানি দর্শক সাধারণের উপভোগের সামগ্রী হইয়াছিল।

সরোজিনী নাটক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নাটক সরোজিনী ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে বীডন্ স্ট্রীটস্থ গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি কল্পনামূলক ঐতিহাসিক দৃশ্য-কাব্য। ইহার আখ্যানভাগ এক প্রহেলিকাপূর্ণ দৈববাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধর্মান্ধ (fanatic) চিতোরবাসিগণ দৈববাণীর অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া যেরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারই

চিত্র ইহাতে আছে। সংলাপগুলি এত দীর্ঘ যে, তাহাতে নাটক-মধ্যগত স্থায়ীরসের আস্বাদনে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া দেয়। চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী চতুর্ভুজাদেবীর দৈববাণীর ব্যাখ্যা লইয়া নাটকের প্রায় তিন অঙ্ক পূর্ণ রহিয়াছে, ইহাতে দর্শক বা পাঠক সমাজের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল। এটি সংক্ষিপ্ত হইলেই ভাল হইত। ইহার বিষাদময়ী কবিতাগুলি উনবিংশ শতকের শেষ-পাদে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দর্শনার্থ আগত দর্শকসমূহের মুখে-মুখে ফিরিত। কবিতাবলির দুই-চারি ছত্র এইরূপ :—

"জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
শোন্‌রে যবন! শোন্‌রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী রলেন দেবতা তার,
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥" *

ইংরাজীতে একটা কথা আছে "great men think alike," অর্থাৎ মনীষীরা একরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন। মনোমোহন বসুর 'সতীনাটকে' দক্ষ-যজ্ঞ স্থলে সতী তাঁহার দেহত্যাগের পূর্বে যে সব কথা বলিয়াছিলেন, জ্যোতিবাবুর সরোজিনীও বলিদানের জন্য নীত হইবার সময়ে তাঁহার পিতাকে সম্বোধন করিয়া সেই এক কথার পুনরুক্তি করিয়াছিলেন। কথাগুলি এইরূপ :—"পিতঃ! * * আপনা হ'তেই আমি এ জীবন পেয়েছি, আদেশ করুন; এখনি তা আপনার চরণে উৎসর্গ করি, আপনার ধন, আপনি যখন ইচ্ছা ফিরে নিতে পারেন,—আমার তাতে কিছুমাত্র অধিকার নেই। পিতঃ! আপনি একটুও চিন্তা করবেন না, আপনার আদেশ পালনে আমি তিলার্ধ বিলম্ব করবো না—আমার শরীরের যে রক্ত, তা আপনারই—এখনি তা ফিরে নিন্।" এই জাতীয় উক্তিগুলি বাস্তবিকই মানুষের মনকে উন্নত করিয়া তুলে। দোষে-গুণে নাটকখানি মন্দ হয় নাই।

অলীকবাবু

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই প্রহসনটির পূর্ব-নাম 'এমন কর্ম আর করব না' ছিল, পরে তিনি ইহার 'অলীকবাবু' নামকরণ করিয়াছিলেন। এখানি ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল। সরোজিনী নাটকের পর ইহা রচিত হয়। এ প্রহসনটি গতানুগতিকভাবে লিখিত হয় নাই—একটু নূতনত্ব ইহাতে আছে! প্রহসনটি একাঙ্কে সমাপ্ত। দৃশ্যপরিবর্তন যাহাতে না করিতে হয়, সেজন্য একই বাড়ীর বহির্বাটির একটি ঘরে প্রহসনের যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল। ঐটি ইহার নূতনত্ব এবং লিখন ভঙ্গীর মধ্যে ঠাকুর-বাড়ীর বৈশিষ্ট্য বেশ উঁকি-ঝুঁকি দিয়াছে, এখানি হাস্যরসের অফুরন্ত ভাণ্ডার। বাহ্যিক সত্যের আবরণে ঢাকা মিথ্যাচারে লোকে কিরূপ প্রলুব্ধ হইয়া থাকে, তাহার চিত্র ইহার মধ্যে আছে। ইহার গানগুলির নূতনত্ব এই, যে কলিকাতার তৎকালীন প্রভাত ও সন্ধ্যা

* ইহা রবীন্দ্রনাথের রচনা—ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোঃ 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়'

বিষয়ক বর্ণনা ঐগুলির মধ্যে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অলীক বাবু ও হেমাঙ্গিনীর মতো লোকের অভাব বঙ্গসমাজে কোন দিন ছিল না বা থাকিবে না। মিথ্যাড়ম্বরপ্রিয় লোকের ও 'নভেল-পড়া' কাল্পনিক জীবন-প্রিয় ললনার কিরূপ দুর্গতি হয়, অলীকবাবুতে তাহাই প্রহসনকার দেখাইয়াছেন। ইহার প্রথম অভিনয় ঠাকুর বাড়ীতেই সম্পন্ন হইয়াছিল, তারিখ জানা যায় নাই। অলীকবাবু নাম লইয়া ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেল তারিখে প্রকাশিত হয়।

অশ্রুমতী নাটক

জ্যোতিরিন্দ্রের তৃতীয় নাটক 'অশ্রুমতী' ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে প্রথম মুদ্রিত হয়, এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল থিয়েটারে ইহা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর গঠিত প্রেমের এক অদ্ভুত পরিণতি ইহার আখ্যানবস্তু। মুসলমান কর্তৃক চিতোর-বিজয়ের দিন জন্ম হইয়াছিল বলিয়া রাণা প্রতাপসিংহ কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন অশ্রুমতী। একদিকে—চিতোরের স্বাধীনতা-সূর্যের পুনরুদয়ের প্রতীক্ষায় রাণা প্রতাপের কঠোর ত্যাগ ও সেই চেষ্টাজনিত বিপদ-পরম্পরার অশ্রুপ্রবাহ, অপরদিকে—সেলিম-অশ্রুমতীর স্বতঃস্ফুরিত প্রণয়-ব্যাপার হইতে উদ্ভূত অশ্রুপাতে নাটকটির প্রতি অঙ্ক ও দৃশ্যকে অশ্রু-প্লাবিত করিয়াছে। নাট্যকার কতকগুলি জটিল চক্রান্তের মধ্য দিয়া নাটকখানিকে চালিত করায় ইহার সাবলীল গতি মন্থর হইয়া গিয়াছিল। অশ্রুমতী চরিত্রটি ঐতিহাসিক নহে, সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ইহার সংগীত-বিভাগে নাট্যকার বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, তাহার তিনটি গীত এখানে উদ্ধৃত হইল :—

(১)

"গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে,
মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাস লোক লাজে
সজনি! আও আও লো।" ইত্যাদি

(২)

"এখনো এখনো প্রাণ, সে নামে
শিহরে কেন?
এখনো হেরিলে তারে
কেন রে উথলে মন।" ইত্যাদি

(৩)

"ক্যায়সে কাহারোয়া
জাল বিছু রে,
দিনকো মারে মছলি
রাত্‌কো বিছু জাল,
আব্‌ অ্যায়সা দেকৃদারি
কিয়া জিয়া কি জজাল।" ইত্যাদি

এই গানগুলি প্রায় অর্ধ শতাব্দী-কাল ধরিয়া বাঙ্গালার ঘরে-ঘরে গীত হইতে শুনা গিয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী নাট্যকারগণের কোন নাটকেই এরূপ মাধুর্যপূর্ণ সংগীতের রচনা দেখা যায় নাই। কবিতাসিদ্ধ ঠাকুর-বাড়ীর হাতে-গড়া পৃথ্বিরাজের মুখ দিয়া অশ্রুমতীর রূপ-বর্ণনার কবিতাটিও তদানীন্তন দর্শক ও পাঠক সমাজের মনে আনন্দদান করিয়াছিল। কবিতার কয়েকছত্র এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"হেথায় হোথায়, মলয়ার বায়ে
কোথায় অলকা যেতেছে ছুটি,
ভাবেতে গলিয়ে পড়িছে ঢলিয়ে
টানা টানা বাঁকা নয়ন দুটি॥
সরলতা সনে মাধুরী মিশায়ে,
চারুতার তুলি ধরিয়ে করে,
সরু সরু মরি ভুরু দুটি যেন,
এঁকে কে দিয়েছে নয়ন পরে॥" ইত্যাদি

স্বপ্নময়ী নাটক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রণেতা ; ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথম মুদ্রিত। দ্বিতীয় মুদ্রণের কাল ১৯০২ খৃষ্টাব্দ। আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালে শোভাসিংহের বিদ্রোহ-ব্যাপার লইয়া এই ঐতিহাসিক নাটকখানি রচিত। দেশাত্মবোধের অনেক নূতন মর্ম-কথা স্বপ্নময়ী ও শোভাসিংহের কথোপকথনের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। প্রাণের আবেগে সেগুলি কবিতাময়ী হইয়া দেখা দিয়াছে। ছদ্মবেশী শোভাসিংহ কর্তৃক স্বপ্নময়ীর দেশাত্মবোধে দীক্ষা কার্যটি বেশ নাটকীয় ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। শোভাসিংহের দেবরূপ এক মনস্তাত্বিক মুহূর্তে স্বপ্নময়ীর হৃদয়ফলকে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গেল। নাটকের অন্তর্গত প্রণয়-কাহিনী ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া ধ্বংসলীলায় রূপগ্রহণ করিল। বর্ধমান রাজবংশের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী জগৎ রায় ও তাঁহার পত্নী সুমতি নিরাশ সাগরে তাঁহাদের জীবন-ভেলা ভাসাইয়া দিলেন। এ ঐতিহাসিক নাটকে কল্পনাই জয়যুক্ত হইল। ভাষা ও লিখনভঙ্গীতে ঠাকুরবাড়ীর ছাপ স্পষ্টীকৃত আছে। ইহার অভিনয় তারিখ ও স্থান সংগৃহীত নাই।

হঠাৎ নবাব

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই প্রহসনখানি ফরাসী প্রহসন-কার মলিয়রের 'ল-বুর্জোয়া জাঁতিয়মের' ছায়াবলম্বনে লিখিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল ; ঠাকুর-বাড়ী বা ভারত সঙ্গীত সমাজ ভিন্ন অন্যত্র ইহার অভিনয়-সংবাদ পাওয়া যায় নাই। প্রহসনের গতানুগতিকতা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এখানি রচিত হইয়াছিল। কোন খেয়ালি মধ্যবিত্ত বণিকপুত্রের নবাব-বাদশাহ হইবার সাধ ও তজ্জন্য তাহার হাস্যকর প্রচেষ্টা ইহার আখ্যানভাগ বিষয়ের নূতনত্ব আনিলেও বুননের (weaving) দোষে কেমন একটা 'একঘেয়ে' ভাব মধ্যে-মধ্যে উঁকি দিয়াছে। প্রহসনের মধ্যে বহু দৃশ্যে জনান্তিকে কথোপকথনের চেষ্টা করানো কেমন যেন অস্বাভাবিক বোধ হইয়াছে। যাহা হোক্ প্রহসনখানি জনপ্রিয় হয় নাই, অন্যত্র অভিনীত না হইবার কারণ তাহাই। গান ও কবিতার মধ্যে ঠাকুর-বাড়ীর বিশেষত্ব পাওয়া গিয়াছে।

পুনর্বসন্ত

জ্যোতিরিন্দ্রের অদ্ভুত-রসমিশ্র গীতিনাট্য। নাটিকাখানি ভারত-সঙ্গীত-সমাজে অভিনীত হইয়াছিল; প্রথম অভিনয় তারিখ সংগৃহীত হয় নাই। স্বর্গরাজ্যে ইন্দ্রসভায় নৃত্যকালীন উর্বশীর চরণ হইতে নূপুর স্খলিত হইয়া গিয়াছিল, ইন্দ্রদেব উহা কুড়াইতে যাইয়া নারদ কর্তৃক আনীত শচীদেবীকে ঐ স্থানে দেখিতে পাইলেন। পরে নারদের কৌশলে ঐ ব্যাপার লইয়া শচীদেবী ও ইন্দ্রের মধ্যে দারুণ অভিমানের পালা শুরু হইয়াছিল। ঐ বিচ্ছেদ কিরূপে পুনর্মিলনে পরিণত হইল নাটিকার ক্রিয়া তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে। গান ও ছড়া লইয়া চারি অঙ্কে নাটিকাখানি বিস্তৃত। প্রকাশকাল ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ।

বসন্ত-লীলা (গীতিনাটিকা)

দোলোৎসব দিবসে ভারত-সঙ্গীত-সমাজ কর্তৃক অভিনীত হইবার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই নাটিকাখানি রচনা করিয়াছিলেন। গানে-গানে চারিটি দৃশ্যে এখানি সম্পূর্ণ, নূতনত্ব বিশেষ কিছু নাই। প্রথম অভিনয় তারিখ সংগৃহীত নাই। প্রকাশকাল ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ।

দায়ে পড়ে দার-গ্রহ (প্রহসন)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইহার রচয়িতা। প্রকাশকাল ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্‌টেম্বর। মোলিয়ার কৃত 'মারিয়জ ফোসে' অবলম্বনে রচিত। ৬০।৬৫ বৎসর বয়সের এক বৃদ্ধের হঠাৎ বিবাহ করিবার বাতিক হওয়ায় তাহার যে হাস্যকর লাঞ্ছনা ঘটিয়াছিল তাহার বিবরণী লইয়া এখানি রচিত। ইহা তিন অঙ্কে সমাপ্ত হইয়াছে। ঠাকুর বাড়ীর কৃতিত্বপূর্ণ তিনখানি সংগীত ইহার মধ্যে আছে। ন্যায়রত্ন ও বেদান্তবাগীশের কাছে পরামর্শ লইবার দৃশ্যটি বড়ই কৌতুকপ্রদ। এখানি ঠাকুর বাড়ীতেই প্রথম অভিনীত হইয়াছিল, তারিখ পাওয়া যায় নাই।

হিতে বিপরীত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইহাকে কৌতুক নাটিকা বলিয়াছেন। এখানি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। চারিটি দৃশ্যে নাটিকাখানি সমাপ্ত। গল্পাংশ এইরূপ :—৭০ বৎসর বয়স্ক ভজহরি নামক এক ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণ ধনী চতুর্থবার দার-পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পর তাঁহার ভৃত্য ও নাতি দ্বারা কিরূপে লাঞ্ছিত ও প্রতারিত হইয়াছিলেন তাহার কৌতুকপূর্ণ কাহিনী ইহার মধ্যে আছে। ভাবা ও পরিকল্পনার শুচিতায় ঠাকুর বাড়ীর ছাপ আছে। "টুকটুকে তোর পা-দুখানি, আল্‌তা পরাই আয়" ইত্যাদি গানখানি খুব চলিত হইয়াছিল। ইহার আর একখানি হাসির গান নামতার সুরে হাসির লহর তুলিয়াছিল, যথা—"গামছাকে গামছা, গামছা দুগুণে কাছা, দুই কাছায় পণে ধুতি, চার কাছায় ধুতি।" বাসর ঘরে নূতন গিন্নি টাকার বাক্স লইয়া প্রস্থান করিলে ঐ বৃদ্ধটি বলিয়াছিলেন এ যে দেখ্‌ছি 'হিতে বিপরীত'। ভারত-সংগীত-সমাজে ইহার অভিনয় সম্পাদিত হইয়াছিল, তারিখ সংগৃহীত নাই।

ধ্যানভঙ্গ (কাব্যচিত্র ও গীতিনাটিকা)

এখানি ভারত-সঙ্গীত-সমাজে অভিনয়ার্থ রচিত হইয়াছিল। ১৩০৬ সালে, ইংরাজি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তারকাসুর নিধনের জন্য কুমার কার্তিকেয়ের জন্ম প্রয়োজন হইয়াছিল, তাই মদন-রতির সাহায্যে ইন্দ্রদেব মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিলেন, এবং তাহার ফলস্বরূপ মদন ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। এখানি কবিতা ও গানে পরিপূর্ণ। গানের বিচিত্র সুর ইহার মধ্যে আছে। অভিনয় তারিখ সংগৃহীত নাই। সুরবৈচিত্র্য ভিন্ন অন্য কোন নাট্যবৈশিষ্ট্য নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অপর দৃশ্যকাব্যের কথা

মৌলিক দৃশ্যকাব্য ব্যতীত জ্যোতি বাবু ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ১৯ খানি সংস্কৃত, পালি, ইংরাজি ও ব্রহ্মদেশীয় দৃশ্যকাব্যের বঙ্গানুবাদ করিয়া গিয়াছেন। অনুবাদের কৃতিত্ব ভিন্ন এগুলির নাটকীয় সৌন্দর্যের মূল্য অনুবাদকের প্রাপ্য নহে, মৌলিক নাট্যকারদেরই তাহা পাইবার কথা, তজ্জন্য অবান্তর বোধে ঐগুলির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন হইল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কালে নাট্যসাহিত্যের লাভালাভ

আখ্যান-বস্তুহীন রং-তামাশাপূর্ণ উৎকট নাট্যরঙ্গ (extravaganxa) এই কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। একালে নাটকের ভাষা ও রুচি বেশ মার্জিত ও উন্নত হইয়াছিল। অশ্লীল প্রকাশভঙ্গী বা ভাষার আড়ষ্টতা একালে ছিল না। ভাবের গাম্ভীর্য ও তাহার সুষ্ঠু প্রয়োগ একালের আর একটি বৈশিষ্ট্য। উদ্দীপনাময়ী চারণ-গীতি এই কালেই উদ্ভূত হইয়াছে। প্রহসনের গতানুগতিকতা বন্ধ করিয়া নূতন পথের সন্ধান এই কালই দিয়াছে। সংগীতগুলি একালে মধুর ভাবপূর্ণ ও কবিত্বময় হইয়া উঠিয়াছে, কবিতার গতি সাবলীল ও রসপূর্ণ হইয়াছে। সংলাপের দীর্ঘতা একালেও রহিয়া গিয়াছে। নাট্যসাহিত্যের ভিতর দিয়া দেশাত্মবোধের প্রথম জাগরণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথই আনিলেন। এই সকল নূতনত্বের জন্য নাট্যসাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই কালের আলোচনায় দেখা গেল যে, নাট্যসাহিত্য উত্তরোত্তর কেমন পুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রের কালমধ্যে অপর প্রসিদ্ধ দৃশ্যকাব্যের কথা

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি এই কালেই নাট্যরূপ পাইয়া অভিনীত হইতে শুরু করিয়াছিল, নিম্নে যথাক্রমে তাহাদের অভিনয়-তারিখ ও নাট্যরূপ দাতার নাম প্রদত্ত হইল :—

কপালকুণ্ডলা—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে ন্যাশানল থিয়েটার কর্তৃক প্রথম অভিনীত।

দুর্গেশনন্দিনী—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এটি গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যরূপের নকল, প্রসিদ্ধ নট কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক এই থিয়েটারের জন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র প্রদত্ত এই প্রথম নাট্যরূপের অভিনয়

ন্যাশানল থিয়েটার কর্তৃক (১৮৭৪ খৃঃ ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে চুঁচুড়ায়) হইয়াছিল, কিন্তু পাণ্ডুলিপিখানি খোয়া যাওয়ায় তিনি দ্বিতীয়বার নূতন করিয়া ইহাকে নাট্যাকারে পরিবর্তিত করেন, এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি রবিবার তারিখে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে তাহা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

মৃণালিনী—১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে চিৎপুর রোডস্থ পুরাতন সান্যালের বাড়ীতে গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটার কর্তৃক প্রথম অভিনীত।

বিষবৃক্ষ—১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। অমৃতলাল বসু ইহার দ্বিতীয় নাট্যরূপ দিয়াছিলেন এবং তাহা হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে, তারিখ সংগৃহীত নাই।

চন্দ্রশেখর—১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ তারিখে বীডনস্ট্রীটস্থ বেঙ্গল রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত। ইহার নাট্যরূপ দাতা সম্ভবতঃ বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে অমৃতলাল বসু ইহার দ্বিতীয় নাট্যরূপ দিয়াছিলেন এবং হাতিবাগানস্থ স্টার রঙ্গমঞ্চে তাহা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

আনন্দমঠ—১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বীডনস্ট্রীটস্থ ন্যাশানলে ইহা প্রথম অভিনীত। কেদারনাথ চৌধুরী ইহার নাট্যরূপ দিয়াছিলেন।

দেবী চৌধুরাণী—১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে বীণা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। কেহ কেহ বলেন নীলমাধব চক্রবর্তী ইহার নাট্যরূপ দিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে অতুলকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের দেওয়া নাট্যরূপই সিটি থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

কৃষ্ণকান্তের উইল—১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ এমারেল্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। তৎপরে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে 'ভ্রমর' নাম দিয়া অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার দ্বিতীয় নাট্যরূপ দিয়াছিলেন এবং বীডনস্ট্রীটস্থ ক্লাসিক থিয়েটারে তাহা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

রজনী—১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত নাট্যরূপ লইয়া বীডন্‌স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল থিয়েটারে ইহা প্রথম অভিনীত। বিহারীলাল ইহার বিজ্ঞাপন স্তম্ভে এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন :—

"চোখে চোখে ভালবাসা পদ্মপাতা জল। ক্ষণে চায় ক্ষণে ধায় নিরাশ কেবল ॥
মনে মনে ভালবাসা প্রেম বলি গণি। প্রেমের প্রতিমা অন্ধ দুঃখিনী রজনী ॥"

রাজসিংহ—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারি তারিখে অমৃতলাল বসু কর্তৃক নাট্যরূপে পরিবর্তিত হইয়া হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

ইন্দিরা—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ইহা নাটকাকারে পরিবর্তিত করিয়া বীডন্‌স্ট্রীটস্থ ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনয় করাইয়াছিলেন।

সীতারাম—১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে সীতারামের নাট্যরূপ বীডন্‌স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম দেওয়া হয়। গিরিশচন্দ্র ইহাতে সীতারাম চরিত্রের মনস্তত্ত্ব ফুটাইয়াছিলেন।

উপরিউক্ত প্রখ্যাত উপন্যাসগুলির কাব্যসৌন্দর্য বজায় রাখিয়া তাহাদের নাট্যরূপ-দান সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। যাহা হোক্ তদানীন্তন কালের নট ও নাট্যকারগণ ঐ বিষয়ে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

যেখানে নাট্যরূপদাতার নামোল্লেখ নাই, সেখানে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঐ কার্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। উপন্যাস হইতে রূপান্তরিত নাটকগুলি মৌলিক নহে বলিয়া ঐগুলির বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

মোহন্তের এই কি কাজ!

লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ইহার রচয়িতা। এখানি দুইখণ্ডে বিভক্ত। ইহার প্রথম খণ্ডটি বীডন্‌স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ-কাল ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ। মাধবগিরি নামা তারকেশ্বরের তদানীন্তন এক মোহন্ত লাম্পট্য ও পরনারী ধর্ষণের জন্য আদালতের বিচারে তিন বৎসর সশ্রম কারাবাস-দণ্ড ভোগ করিয়াছিল। তারকেশ্বরের নিকটবর্তী কোন গ্রামবাসী নীলকমলের কন্যা ও নবীনচন্দ্রের স্ত্রী এলোকেশী ঘটিত কাহিনী ইহার বর্ণিতব্য বিষয়। যে কুৎসিত ব্যাপারের জন্য এলোকেশী তাঁহার স্বামী কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন তাহার রহস্যদ্বার পুনরুদ্ঘাটন করার আর প্রয়োজন নাই। এককালে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এ ব্যাপার লইয়া খেপিয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে নাট্য কৌশল কিছুমাত্র নাই; বর্ণনাত্মকভাবে ঘটনা সাজান হইয়াছে। ইহার মধ্যগত দুইখানি গান (১) "মোহন্ত রাজা রাখলে ধ্বজা এই কলিকালে। মঠের গদি ত্যাজ্য ক'রে বাসর করে হুগ্‌লী জেলে।" (২) "আয় গো আয় মোহন্তের তেল নিবি কে। হুগ্‌লী জেলখানায় তেল হতেছে"—দেশের সবত্র গীত হইয়াছিল।

✓রসাবিষ্কার বৃন্দক

রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইহার রচয়িতা। নয়টি রসের রূপ দেখাইবার জন্য নয়টি দৃশ্যের সংযোজনা ইহাতে ছিল, এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীর নাট্যশালায় ইহা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। পুরাণ হইতে নবরসের উপাখ্যান লইয়া সংগীত দ্বারা ঐ রসগুলি পৃথক পৃথক দৃশ্যে গীত হইয়াছিল মাত্র। ইহার অন্য নাট্যগুণ কিছু ছিল না।

নব বৃন্দাবন অর্থাৎ ধর্মসমন্বয় নাটক

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল 'চিরঞ্জীব শর্মা' ছদ্মনাম লইয়া এই নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে বিখ্যাত বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেনের তত্ত্বাবধানে এখানি পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে প্রথম বার অভিনীত হইয়াছিল; পরে আরও কয়েকটি স্থানে ইহার অভিনয়-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইহার ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাতে অনেক পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছিল। নাটকের লিখন-পদ্ধতি এইরূপ:—প্রথমে মঙ্গলাচরণ—সংগীত, স্তব ও প্রার্থনায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। নরহরি বসু পরিবার পাশ্চাত্ত্যের কুশিক্ষা প্রভাবে মদ ও নানাবিধ দুশ্চরিত্রতার আশ্রয়ে কিরূপ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া নরহরিপুত্র অবিনাশের সাধ্বীস্ত্রী চারুশীলার সুচরিত্রবলে এক মহাপুরুষ দ্বারা কিরূপে রক্ষা পাইয়াছিল তাহাই ইহার আখ্যায়িকা। ধর্মপ্রচারক কেশবচন্দ্র সেন পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার নববিধান নামক ব্রাহ্ম সমাজকে মাতৃভাবের উপাসনা দ্বারা সংস্কৃত করিলেন এবং সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের পথ দেখিতে পাইলেন, ইহাও ঐ নাটকের একটি অবান্তর প্রসঙ্গ। বিখ্যাত সন্ন্যাসী পাহাড়ী বাবার প্রসঙ্গও ইহাতে আছে, ঐ ভূমিকাটি কেশব বাবু স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। চলিত কথা ও কবিতায় নাটকখানি সাত অঙ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। "আমরা পাঁচটি ইয়ার" প্রভৃতি লইয়া ২।৩টি গান আছে।

আশামুকুর ভঙ্গ নাটক

রাইচরণ ঘোষ ইহার নাট্যকার। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল। এখানি পৌরাণিক নাটক; মহাভারতীয় দুর্যোধনের উরুভঙ্গ ও অশ্বত্থামা কর্তৃক পাণ্ডবদের পঞ্চপুত্রের নিধন ব্যাপার লইয়া এই নাটকখানি রচিত। নাটকটি এত সংক্ষিপ্ত ও পৌর্বাপর্য-সম্বন্ধহীন যে নাট্যক্রিয়ার মধ্যে কোন স্থায়ী রসের সৃষ্টি হয় নাই। দুর্যোধন চরিত্রটি ঠিক পৌরাণিক ছায়াপাতে সৃষ্ট হয় নাই, মহামানী বীর দুর্যোধনকে অপেক্ষাকৃত ভীরু ও মধ্যে মধ্যে মূর্ছমান করা হইয়াছে। এরূপ করায় পৌরাণিক চরিত্রের অবমাননাই হইয়াছে। নাটকীয় চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তি বা স্বগতোক্তি এত দীর্ঘ যে, তাহার মধ্য হইতে সর্বদা একটা একঘেয়ে সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। নাটকটির নাম 'আশামুকুর ভঙ্গ'। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রত্যেক পরাজয়ের পর দুর্যোধন নূতন-নূতন রথী নিযুক্ত করিয়া প্রতিবারই জয়াশা করিয়াছিলেন, কিন্তু অশ্বত্থামা যখন ভ্রমবশে পাণ্ডবদের পঞ্চশিরের পরিবর্তে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের পঞ্চশির লইয়া আসিলেন, তখনই দুর্যোধনের শেষ আশামুকুর ভঙ্গ হইয়া গেল। নাটকখানি এই স্থানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু নাট্যকার অনর্থক আরও এক অঙ্ক বাড়াইয়া দেওয়াতে নাটকের মধ্যগত রস যাহা কিছু সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা উদ্দীপ্ত না হইয়া মন্দীভূত হইয়া গেল। বৈচিত্র্য দেখাইবার লোভে নাট্যকার বিনা প্রয়োজনে কবিতায় কথোপকথন করাইয়াছেন, এ বৈচিত্র্য অসহনীয় হইয়াছে।

অজ্ঞাতবাস নাটক

যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার রচয়িতা। এখানি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মুদ্রিত হইয়াছিল, ইহার অভিনয়-সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মহাভারতীয় উপাখ্যান-ভাগ হইতে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস ও বিরাটরাজের গো-গৃহ রক্ষার বিষয় লইয়া ইহা রচিত হইয়াছিল। নাটকের ভূমিকার মধ্যে নাট্যকার নিজেকে নূতন শিল্পকার বলিয়াছেন। আভ্যন্তরীণ আলোচনায় নাটকটিকে নাট্যকলাহীন বোধ হইল। ঘটনাকে কি করিয়া নাটকীয় করা যায় তাহার কৌশল নাট্যকার তখনও অধিগত করিতে পারেন নাই। প্রস্তাবনায় নাট্যকার নটীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে, করুণ, আদি ও বীররসের এককালীন সমাবেশ নাটকের মধ্যে দেখাইতে না পারিলে দর্শক বা পাঠকের তৃপ্তিকর হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে নাট্যকার উক্ত ত্রিবিধ রসের পরিপাকে মাত্র বীভৎস-রসই উৎপন্ন করিয়াছিলেন। দীর্ঘ সংলাপের অলংকার-বহুল ভাষা উপমান-উপমেয়ের আবরণ ভেদ করিয়া রস-সৃষ্টি করিতে পারে নাই। অঙ্কমধ্যস্থ দৃশ্যগুলিতে অবতীর্ণ পাত্র-পাত্রীরা স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করিয়া গিয়াছে। নাটকের মূলক্রিয়ার (action) সহিত তাহাদের যে একটা পরস্পরাপেক্ষ সম্বন্ধ আছে তাহা পাঠককে জোর করিয়া বুঝিয়া লইতে হইয়াছে। স্থানে-স্থানে দেশকালপাত্র-জ্ঞানের অভাব পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

দাদা ও আমি (নাটিকা)

আখ্যাপত্রে নাট্যকারের নাম নাই। প্রকাশকের নিবেদনের তারিখ ২রা ডিসেম্বর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ এবং তাহাতে গ্রন্থকার উপেন্দ্রনাথ দাস স্বয়ংই প্রকাশকরূপে স্বাক্ষরিত রহিয়াছেন। নাটিকাখানি চারি অঙ্কে সমাপ্ত। পল্লীর এক ঘটকী দ্বারা উৎকেন্দ্রিক দুইভ্রাতা বিবাহার্থ নির্ণীত পাত্রীদ্বয়ের

কৌশলে কিরূপে বিবাহিত হইল, গ্রন্থশেষে উক্ত 'দাদা ও আমি' কথা দ্বারা তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। নাটিকাখানি সামঞ্জস্যহীন। অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

শৈলজা

আখ্যাপত্রে নাট্যকারের নাম নাই। রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে এখানি অভিনীত হইবার সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু তারিখ নাই। গ্রন্থান্তর্গত বিজ্ঞাপনের মধ্যে দেখা যায় যে বাঙ্গালা ও ইংরাজি সংবাদপত্রে এখানি সমালোচিত হইয়াছিল। গ্রন্থখানি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানি সামাজিক নাটক। অর্থপিশাচ শ্বশুরের হাতে পুত্রবধূর লাঞ্ছনা, বিবাহ কেবল অর্থ উপার্জনের পথ এই ধারণার বশবর্তী পিতার হাতে পুত্রের বিবাহিত জীবনের অশান্তি, নৌকাডুবি, আত্মহত্যা, উন্মত্ততা প্রভৃতি সব সত্ত্বেও উক্তি-প্রত্যুক্তিপূর্ণ বর্ণনাত্মক কথোপকথনের মধ্য দিয়া নাট্যকলা-কৌশল ফুটিয়া উঠে নাই, উঠিয়াছে মাত্র তথাকথিত কথা-সাহিত্যের রূপ। যাহা হোক্ এখানি অভিনীত হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিল। গ্রন্থখানি পাঁচ অঙ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত এবং গদ্যে লেখা। গানের সংখ্যা কম।

নাট্যবিকার

জানকীনাথ বসু কর্তৃক এখানি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার আখ্যাপত্রে লিখিত আছে যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্ম দিনে ২৪শে মে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে এখানি প্রথমে অভিনীত হইয়াছিল। সুপণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ বসু রায় বাহাদুর এই প্রহসনখানির প্রণেতা। নাটক ও তাহার অভিনয় তিনি এত ভালবাসিতেন যে বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত নূতন নাটকের অভিনয়কালে তাঁহাকে প্রতি রঙ্গমঞ্চেই দেখা যাইত। অতিরিক্ত নাট্যচর্চায় কি কুফল ঘটে তাহা এই শিক্ষাপ্রদ প্রহসনের মধ্যে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা দিবস হইতে যে সকল নাটক সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে তাহাদের মধ্যগত চমকপ্রদ কথাগুলি এমনি কৌশলে প্রহসনকার রামমণি, দিগম্বর, ভূতি, কমলমণি, রমেন্দ্রমোহন প্রভৃতি চরিত্রের মুখে প্রয়োজন মতো বসাইয়া দিয়াছেন যে হরিশের সংসার গোল্লায় যাইবার পথ হইতে এক অদ্ভুত উপায়ে রক্ষা পাইল, তাই হরিশ বলিতে পারিয়াছে :—

> "বাপ রে বাপ, কি গয়ার পাপ, নাটুকে বাতিক।
> কপাল গুণে গোপাল মেলে, ফলে আমার বেগতিক॥
> ভাগ্যি ভাল, জুটেছিল, মোশান-ম্যাস্টার।
> তাই সর্বরক্ষে, পেলেম শিক্ষে, ঘোর নাট্যবিকার॥"

এই প্রহসনটি পরবর্তীকালে 'ঘোরবিকার' নাম গ্রহণ করিয়া কোন-কোন রঙ্গমঞ্চে একাধিকবার অভিনীত হইয়া গিয়াছে। এ জাতীয় প্রহসন আর হয় নাই। প্রহসনকার একাই এ যশের অধিকারী।

নাট্যসাহিত্যে মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের গৌরবময় কাল

(১৮৭৭—১৯১২ খৃষ্টাব্দ)

কালবিভাগ-ক্রমে বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্যের ক্রমবিকাশ পদ্ধতি অনুশীলন করিয়া যাইলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাল অতিক্রম করিয়া আমরা গিরিশচন্দ্রের কালে উপনীত হই। দীনবন্ধুর নাট্য-চরিত্রের একজন সামান্য অভিনেতা যে, উত্তরকালে শ্রেষ্ঠ নাটককার হইবেন, তাহার আভাস গিরিশচন্দ্রের অভিনেতৃ-জীবনে নিতান্ত অস্পষ্ট ছিল না। অভিনেতার পদ হইতে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পদ-প্রাপ্তি বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্যের ইতিহাসে এই প্রথম দেখা গেল। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের মহাকবি শেক্সপীয়রের সহিত গিরিশচন্দ্রের তুলনা নির্ভয়ে করা যাইতে পারে। প্রভেদ এই-মাত্র যে, শেক্সপীয়রের মতো গিরিশচন্দ্র নিম্নশ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন না।

নাট্য-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের সর্বতোমুখী প্রতিভা কি আদর্শ চরিত্র চিত্রণ ব্যাপারে, কি বস্তুতান্ত্রিক চরিত্র অঙ্কনে সর্বত্র সমভাবে ক্রীড়া করিয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার পূর্বগামী নাট্যকারদের প্রচলিত পথে না চলিয়া নিজের একটা স্বতন্ত্র গতিপথ নির্ধারিত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। পরবর্তী আলোচনা দ্বারা ইহা স্পষ্টীকৃত হইবে যে, গিরিশচন্দ্রের কালই দৃশ্যকাব্যেতিহাসের গৌরবময় কাল।

জাতীয় নাটকের সৃষ্টি

গিরিশচন্দ্রের পূর্বগামী নাট্যকাররা মৌলিক নাটকের রচয়িতা হইলেও কেহই জাতীয় নাটকের স্রষ্টা ছিলেন না। হিন্দুর জাতীয় জীবনের ভাব বা সংস্কৃতি তাঁহাদের রচিত কোন চরিত্রেই ফুটিয়া উঠে নাই। গিরিশচন্দ্রই জাতীয় নাটক সৃষ্টি করিলেন। হিন্দুর জাতীয় জীবনের মূলসূত্র তিনি ধরিতে পারিয়াছিলেন। হিন্দুর প্রত্যেক বিষয়ই ধর্মোদ্দিষ্ট ছিল, এমন কি শিল্প-সাহিত্য পর্যন্ত সে লক্ষ্য হইতে বহির্ভূত ছিল না, এ কথা গিরিশচন্দ্রই প্রথমে বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যে প্রচার করিলেন।

অতি প্রাচীন কালের কৃষ্ণবিষয়ক পালাগুলি দৃশ্যকাব্যের পঙ্‌ক্তিভুক্ত নহে, কারণ ঐগুলির মধ্যে নাট্যবীজ প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে এবং নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস সংকলনকারীরা ঐগুলিকে দৃশ্যকাব্যের প্রথম অবস্থা সাব্যস্ত করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ঐগুলি আধুনিক দৃশ্যকাব্যের পর্যায়ের মধ্যে আসে না। বীজের ভিতর বৃক্ষ চিরদিনই লুক্কায়িত থাকে, কিন্তু বীজাবস্থায় উহা চিরকালই বীজ, বৃক্ষ নহে। কি মহাকাব্য, কি খণ্ডকাব্য, কি গীতিকাব্য প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ ছিল না, যাহাতে ভগবৎ-তত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই। একমাত্র নাট্য-সাহিত্য ভগবান বা ভাগবতের ভাবৈশ্বর্যের সন্ধান তখনও পর্যন্ত রাখে নাই। গিরিশচন্দ্রের হস্তপ্রেরণা পাইবামাত্র নাট্যসাহিত্যের এ অভাব—এ দুর্গতি দূর হইয়া জাতীয় নাটক প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহার পূর্বগামী পৌরাণিক নাট্যকাররা তাঁহাদের লিখিত নাটকে কাহিনীর গৌরব দেখাইয়াছেন, উহার অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করেন নাই।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নাট্য-সাহিত্যের দর্শক, পাঠক ও অভিনেতাগণ যথাক্রমে রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, মনোমোহন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক দৃশ্যকাব্যগুলির মধ্যে মামুলি যৌনতত্ত্ব ব্যতীত যখন অধ্যাত্মতত্ত্বের কোন সন্ধান পাইলেন না, ঠিক সেই শুভ মুহূর্তে গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রথম রচনা 'আগমনী' ও 'অকালবোধন'—নাট্যরাসকদ্বয় লইয়া নাট্য-

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ করিলেন এবং বৈচিত্র্য-গ্রহণাভিলাষী অনুসন্ধিৎসু জনসাধারণের কর্ণে ঐগুলির মধ্যস্থিত 'মাতৃগীতি' শুনাইয়া দিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভুবনমোহন নিয়োগীর লিজ লওয়া ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত 'আগমনী' এইরূপ গাহিল : "ও মা কেমন করে পরের ঘরে, ছিলে উমা বল্ মা তাই। কত লোকে কত বলে, শুনে ভেবে মরে যাই।"—এই বিশ্ববিশ্রুত সংগীতটি বাঙ্গালী ভিক্ষুকের কণ্ঠে দুর্গার শরৎকালীন আগমনীর সময়ে আজও শুনা গিয়া থাকে, এমনি অমর সংগীত তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ঐ খৃষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর তারিখে 'মুকুটাচরণ' ছদ্মনামে লিখিত ও ঐ রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত গিরিশচন্দ্রের 'অকাল বোধন'ও এইরূপে মাতৃস্তুতি করিল :—

"উগ্রচণ্ডা উমা, ভয়ঙ্করী ধূমা,
নমো নমঃ হৈমবতী।
নমস্তে ভবানি, ভবেশ-ভামিনী
শবারূঢ়া শিবসতী॥
নমস্তে অভয়া গিরীশ তনয়া,
আদ্যাশক্তি কপালিনী।
ত্রাহি মে সুশ্যামা বারিদ-বরণা
মৃত্যুঞ্জয়-প্রসবিনী॥" ইত্যাদি

এই স্তব দ্বারা গিরিশচন্দ্র দেখাইলেন যে, মানুষ সংসার-সংগ্রামে বিধ্বস্ত হইয়া যখন শক্তিহীন হইয়া পড়ে, শত চেষ্টা করিয়াও যখন তাহার মানুষী-শক্তি অদৃষ্টশক্তির কাছে পরাভূত হয়, কেবলমাত্র দৈবীশক্তির আশ্রয়লাভ ভিন্ন যখন তাহার আর গত্যন্তর থাকে না, তখন আত্মশক্তি-বিশ্বাসী মানুষ, হয় এই ত্রিতাপতপ্ত সংসার-সাগরোর্মির প্রচণ্ডাঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ সংসার-জলধির ক্রোড়েই আত্মবিসর্জন করে, নতুবা ঐ ভৈরবী প্রকৃতির মধ্যে রণচামুণ্ডার মূর্তি দেখিয়া তাঁহারই আশীর্বাদে বিজয়ী হইয়া উঠে। এই প্রকার জয়-পরাজয় লইয়া মানুষের জীবন অহরহঃ কাটিতেছে। গিরিশচন্দ্রের নাট্যচরিত্রগুলি যখনি এইরূপ কোন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, তখনি তিনি তাহাদের জীবনের গতি, হয় এক অভাবনীয় উপায়ে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া দিয়াছেন, না হয় ঘটনায় সাংসিদ্ধিক পরিণতির মধ্যে তাহাদের ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। পূর্ব-বর্ণিত নাট্যরাসকদ্বয়ের মাতৃগীতি ও মাতৃ-আবাহন ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ নাট্য মূল্য ছিল না।

গিরিশচন্দ্র ছোট-বড় মোট ৮০ খানি দৃশ্যকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং বহুল নাট্যগ্রন্থ-রচয়িতা হিসাবে তিনি বাঙ্গালায় আজও অদ্বিতীয় আছেন। এই সংখ্যার মধ্যে অসম্পূর্ণ দৃশ্যকাব্য বা উৎকট নাট্যরঙ্গগুলিকে ধরা হয় নাই। তাঁহার দৃশ্যকাব্যের প্রত্যেকটির পৃথক আলোচনা কষ্টসাধ্য হইলেও এ গ্রন্থে বিশদভাবে তাহা করা হইয়াছে। ঐগুলির মধ্যগত নাটকগুলিকে পৌরাণিক, উচ্চভাবমূলক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক-এক বিভাগে কি-কি নূতন সম্পদ দৃশ্যকাব্য-ভাণ্ডারে তিনি দিয়া গিয়াছেন, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। সর্বশেষে তাঁহার নাটিকা ও প্রহসন বিভাগও তারিখ ধরিয়া যথাক্রমে আলোচিত হইবে। যে নাটকগুলি কোন শ্রেণীর অন্তর্গত নহে সেগুলিকে এক পৃথক পরিচ্ছেদের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

পৌরাণিক-বিভাগ

পৌরাণিক-বিভাগ আমাদের প্রথম আলোচ্যের বিষয়, কারণ এই বিভাগেই গিরিশচন্দ্রের নাটক-রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। পুরাণের মধ্যে রামায়ণকে তিনি সর্ব প্রথম উপজীব্য করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী আনোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে রাম চরিতের সহিত প্রথম পরিচিত হইতে থাকে। গ্রাম্য বালিকারা—"দশরথের মতো শ্বশুর হবে, কৌশল্যার মতো শাশুড়ী রবে, রামের মতো পতি পাব, লক্ষ্মণের মতো দেবর লব, সীতার মতো সতী হব"—বলিয়া ব্রত-নিয়মাদি, নিতান্ত পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন সংসারে না থাকিলে আজও পালন করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্লাবন অতিক্রম করিয়া আজও বঙ্গের বহু গণ্ডগ্রাম ও নিভৃতপল্লী রামায়ণ-গানে, কথকতায় ও পুরাণ পাঠে বিমুগ্ধ রহিয়াছে, তাই রঙ্গমঞ্চের দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে পুরাণবর্ণিত কাহিনী দৃশ্যকাব্যরূপ ঐন্দ্রজালিক কুহকের মধ্যে ফেলিয়া নাট্যকার বাস্তবের মোহ আনিয়া দিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের তিরোধানের পর ইংরাজ-রাজত্বের সূচনার সময়ে গীতিকাব্য ব্যতীত বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্য বিভাগে ধীরে-ধীরে জড়বাদ (materialism) মাথা তুলিতেছিল। পরে বাঙ্গালা সাহিত্যের পুনর্জন্মের (renaissance) সময় যখন উক্ত জড়বাদ ক্রমে-ক্রমে নাস্তিক্যবাদে (atheism) উপনীত হইতে লাগিল, তখন সাহিত্য ও সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া বঙ্কিম-প্রমুখ নীতিবাদীরা ও বুদ্ধিজীবীরা তাঁহাদের প্রণীত উপন্যাসে, নিবন্ধে ও প্রবন্ধে নীতি শিক্ষার প্রবর্তন করিলেন বটে, কিন্তু নাট্যসাহিত্য-বিভাগ পূর্ববৎ অপরিবর্তিত রহিয়া গেল। নাট্যাভিনয়ে বাস্তবের বিভ্রম উৎপাদিত হয় বলিয়া গিরিশচন্দ্র প্রথমে পৌরাণিক দৃশ্যকাব্যের ভিতর দিয়া হিন্দুর মর্মস্থলে আঘাত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার ফল ক্রমশঃ এইরূপ দাঁড়াইল যে, যখন গিরিশচন্দ্র তাঁহার কোন নূতন মতবাদ সাধারণে প্রচার করিতে অভিলাষী হইতেন, তখন নাট্যসাহিত্যের ভিতর দিয়া এমনই সুকৌশলে তাহা প্রকাশ করিতেন যে, সাধারণে ঐ নূতনত্ব ধরিতে পারিত না।

রামায়ণাবলম্বিত দৃশ্যকাব্যের গল্পাংশ গিরিশচন্দ্র কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই বিরাট গ্রন্থের কোন কাণ্ডই তিনি ত্যাগ করেন নাই। 'সীতার বিবাহে' আদিকাণ্ড, 'রামের বনবাসে' অযোধ্যাকাণ্ড, 'সীতাহরণে' অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা ও সুন্দরকাণ্ড, 'রাবণ বধে' লঙ্কাকাণ্ড, 'সীতার বনবাসে' ও 'লক্ষ্মণবর্জ্জনে' উত্তরকাণ্ড যথারীতি তিনি অনুসরণ করিয়াছিলেন। প্রভেদ এই—কৃত্তিবাস শ্রব্যকাব্যের সাহায্যে ইতিবৃত্তলেখক এবং গিরিশচন্দ্র দৃশ্যকাব্যের সাহায্যে চরিত্রলেখক। একজন ঘটনাকেই সার করিয়াছেন, আর একজন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কিরূপে চরিত্র বিকশিত হইয়া উঠে, তাহাই দেখাইয়াছেন। একজন সূত্রকার, অপরজন তাঁহার ভাষ্যকার। বাস্তবিক কৃত্তিবাস মোটা তুলিকার টানে যে সকল চিত্রের রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন, গিরিশচন্দ্র সূক্ষ্ম তুলিকার আঁচড়ে তাহাদিগকে মূর্তিমান্ করিয়া তাহাদের হৃদয়-রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র এ বিষয়ে কতটা কৃতকার্য হইয়াছেন, আমরা কেবলমাত্র তাঁহার নায়ক-নায়িকা চরিত্রের বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব। আলোচনা দীর্ঘ হইলেও পাঠকগণ ধৈর্য হারাইবেন না।

রামায়ণ হইতে গৃহীত পৌরাণিক দৃশ্যকাব্যের নায়ক

ত্রেতাবতার এবং সমগ্র ভারতবর্ষের ত্রি-চতুর্থাংশ হিন্দু অধিবাসীর ইষ্টদেবতা রামচন্দ্র রামায়ণের নায়ক।

সীতার বিবাহ নাটকের রাম

সীতার বিবাহ নাটকখানি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ প্রতাপ জহুরীর ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নরদেহধারী রামের কার্যাবলির মধ্যস্থিত অলৌকিক বিষয়গুলিতে পাছে প্রাকৃতজনের মনে অস্বাভাবিকতার ছায়াপাত করে, তজ্জন্য গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'সীতার বিবাহ' নাটকের রামকে সাধারণের সহিত পরিচিত করিবার পূর্বে তিনি ও নায়িকা-সীতা যে আসলে পৃথিবীর লোক নহেন, প্রাকৃত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—এ কথা মহাদেবের মুখ দিয়া এইরূপে জানাইয়া দিলেন :—

"জানি জানি, ওহে পদ্মযোনি,
ব্রহ্ম সনাতন—
জন্মিলা আপনি অযোধ্যায়,
মিথিলায় গোলক-বাসিনী রমা।"

এই তত্ত্বটুকু জানাইবার আরও এক তাৎপর্য ছিল। যদিও গোলোক-পতি বিষ্ণু স্বয়ং নরদেহে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া প্রাকৃতজনের মতো দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, তথাপি সাধারণ মানুষের মতো সেই দুঃখ-তাপের পীড়নে তাঁহার দেবত্ব নষ্ট হয় নাই, বরং দগ্ধ-সুবর্ণের মতো তাঁহাকে পরিশুদ্ধ করিয়া আরও মনোহারী করিয়া তুলিয়াছিল. ইহাই রামের অপ্রাকৃতের আর একটি লক্ষণ।

'সীতার বিবাহ' নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে রামের সহিত দর্শক বা পাঠকমণ্ডলীর প্রথম পরিচয় ঘটে এবং সেই পরিচয়-চিত্রটি বড়ই মধুর। ভরতকে রামরূপে চালাইবার চেষ্টায় দশরথের প্রতারণা বুঝিতে পারিয়া বিশ্বামিত্র যখন ক্রুদ্ধ হইয়া অযোধ্যাপুরী ধ্বংস করিতে আসিয়াছেন, রাম তখন কিরূপে সেই মুনিবরের ক্রোধবহ্নি নির্বাপিত করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা কৃত্তিবাস এইরূপে দিয়াছেন :—

"মুনি হৈয়া যেই জন রাগে দেয় মন।
পূর্ব ধর্ম নষ্ট তার হয় ততক্ষণ॥
পুত্রে পাঠাইতে পিতা হ'লেন কাতর।
যজ্ঞ রক্ষা করি গিয়া মিথিলা নগর॥"

'পূর্ব ধর্ম নষ্ট তার হয় ততক্ষণ' বাক্যে বিশ্বামিত্রের ন্যায় ক্রোধী তাপসের ক্রোধ প্রশমিত না হইয়া উদ্দীপ্ত হইবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু ভাব্যকার গিরিশচন্দ্রের রাম ঐ 'ক্রোধ' শব্দ বজায় রাখিয়া কিরূপ কৌশলে উভয় দিক রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা দেখুন :—

"দয়া কর ঋষিরাজ অবোধ বালকে,
রাম নাম্ মম, ব্রাহ্মণের দাস আমি।
কহ দেব কি কর্ম সাধিব তব,—
ক্রোধ করি বঁধো না আপন দাসে।
দেবকার্যে দানিব এ দেহ, সতত মানস মম;

অনয় সকল বাসিব হে তপোধন—
যদি দেব প্রয়োজন
কোন মতে পারি সাধিবারে।"

রাম এখানে উপদেষ্টা না হইয়া উপদিষ্টের বাক্য প্রয়োগ করায় বিশ্বামিত্রের ক্রোধ আপনিই শান্ত হইয়া গিয়াছিল। চরিত্র লেখকের ইহাই অব্যর্থ সন্ধান। পূর্ববর্ণিত বাক্যগুলির মধ্যে নাটককার আরও এক উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইলেন,—সেটি 'দেবকার্যে দানিব এ দেহ, সতত মানস মম' কথাগুলির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। অবনীতে অবতীর্ণ হইবার প্রকৃত উদ্দেশ্য শাপগ্রস্ত আত্মবিস্মৃত নররূপী রামের বিস্মৃতির মধ্যে থাকিলেও অন্য ঘটনার অনুরোধে তাহা রামের মুখেই ঐ কথাগুলির ভিতর দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। অন্য ঘটনার আড়ালে নাট্যকারের রামাবতারের উদ্দেশ্য-বিবৃতির এ কৌশল উল্লেখযোগ্য।

যে রাম-চরিত ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শ-চিত্র বলিয়া সর্বত্র পূজিত, সেই রাম যে নিরাপত্তে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে তাড়কা-নিধনে সাথী করিয়াছিলেন, এ চিত্র গিরিশচন্দ্র দেখাইতে সাহস করেন নাই, তাই তিনি সে সময়ে রামের মুখে 'থাকুক আযোধ্যাপুরে বালক লক্ষ্মণ'—এই কথা বলাইয়াছিলেন। কৃত্তিবাস কিন্তু এ অংশে নীরব ছিলেন।

তাড়কা-নিধনকালে কৃত্তিবাস রামকে—"এক বাণ বিনা যে দ্বিতীয় বাণ ধরি। তোমার দোহাই যদি তিন বাণ মারি॥"—বলাইয়া আস্ফালনের সহিত যে প্রতিজ্ঞা করাইলেন গিরিশচন্দ্রের রাম সেরূপ কিছু করেন নাই; কারণ রামকে ভবিষ্যতে বড় বড় শত্রু নিপাত করিতে হইবে, তাই তাহাদের তুলনায় নিকৃষ্ট শত্রুকে বিনাশ করিতে তাঁহার সমস্ত বীর্যের প্রয়োগ তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই। কেবলমাত্র এই কয়টি কথা যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াছিলেন:—

"এত দম্ভ ধরে সে রাক্ষসী
অযোধ্যার পাশে আসি
করেছে আশ্রয়।
ভীরু বলি ঘোষিবে সংসারে
রাক্ষসী যদ্যপি জিয়ে মম বিদ্যমানে।"

এ কথাগুলি বীর ও প্রশান্ত রামেরই উপযুক্ত হইয়াছিল।

হরধনুর্ভঙ্গকালে কৃত্তিবাসের রাম বলিয়াছেন:—

"ধনুক তুলিয়া রাম বলেন লক্ষণে।
ভাঙ্গিব শিবের ধনু ভয় হয় মনে॥
ধনুকে অর্পিয়া গুণ বলেন মুনিরে।
তাহা করি যাহা আজ্ঞা করিবা আমারে॥"—

এই কথা কয়টি বলিয়াই ধনুর্ভঙ্গ করিলেন। 'ভয় হয় মনে' কথা দ্বারা কৃত্তিবাস রামকে ধর্মভীরু করিয়াছেন, কিন্তু কোনরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা ঐ ভীতি নিবারণের চেষ্টা করেন নাই। গিরিশচন্দ্রের ধর্মভীরু রাম বিশ্বামিত্র কর্তৃক ধনুর্ভঙ্গ করিতে আদিষ্ট হইলে জগৎগুরু শিবের শরাসন ভাঙ্গিতে বলিলেন:—

"ক্ষুদ্র নর আমি মুনিবর,
হরদত্ত শরাসন ভাঙ্গিব কেমনে?

শিব দাতা মহাদেবে করিব লঙ্ঘন,
কি নিয়মে দেহ উপদেশ ?
কন্যাহেতু ত্রিপুরারি কে করিবে অরি ?"

বলিয়া ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুনঃপুনঃ অনুরুদ্ধ হওয়ায় এবং তাঁহার তৎকালীন আত্মবিস্মৃতি বিশ্বামিত্র কর্তৃক অপসারিত হইলে তিনি সভাস্থলে দাঁড়াইয়া :—

"রুদ্রেশ্বর করি নমস্কার,
রুদ্রতেজ দেহ ভুজে ;
বাড়াও ভক্তের মান,
নিজ ধনু কর দুই খান।
ভাইরে লক্ষ্মণ !
যবে ফেলিব ধনুক ভাঙি,
মেদিনী না রবে স্থির—
দেখো ধরা ধসকের ছলে।—"

এইরূপ বাক্যে মহাদেবকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া প্রকৃত ভক্তের মতো ঐ কার্য করিয়াছিলেন।

'সীতার বিবাহ' নাটকের সূচনায় নাট্যকার রামকে গোলোকপতি বিষ্ণু ও সীতাকে রমা বলিয়াছেন এবং সতীর শাপে রামাবতারে বিষ্ণু আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। যেখানে যেখানে সমধর্মী ঘটনা বা অপর কর্তৃক প্রবুদ্ধতা আসিয়াছিল, সেই সেই স্থানে রামের পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র তাঁহার দৃশ্যকাব্যের ভিতর আত্মবিস্মৃত রামের এইরূপ ক্ষণস্মৃতি ও ক্ষণবিস্মৃতি মনস্তাত্ত্বিকের কৌশলে দেখাইয়া গিয়াছেন। রামের বিবাহের লগ্নভ্রষ্ট করিবার জন্য চন্দ্র গীতাভিনয় শুরু করিয়া দিলে গিরিশচন্দ্র তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত 'সমুদ্রমন্থন' পালার অন্তর্গত লক্ষ্মীর উত্থানের সঙ্গেসঙ্গেই রামের পূর্বস্মৃতি অতি সুন্দর কৌশলে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস সেরূপ কিছু করেন নাই।

পরশুরাম 'রাম কই ?' বলিয়া দশরথকে প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তরে—"দাস তব সম্মুখে ব্রাহ্মণ, আশীর্বাদ প্রার্থী তব পায়" বলিয়া গিরিশচন্দ্রের রাম স্বয়ং যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বিনয়ী রামেরই উপযুক্ত হইয়াছিল। পুনরায় প্রশ্ন হইল—"তুমি রাম ? ভাঙিয়াছ শিবদত্ত ধনু মম ?" উত্তর—"পদ্মুতে লঙ্ঘায় গিরি ব্রাহ্মণ প্রসাদে।" পরে অন্য কথার পর বশিষ্ঠদেব ক্রুদ্ধ পরশুরামকে বলিলেন—"ঋষি তুমি ক্ষান্ত হও, বালক বুঝিয়ে।" তদুত্তরে পরশুরাম বলিতেছেন—

"বৃদ্ধ-শিশু নাহি ক্ষত্রিয়ের,
সবে সম অনাচার।
নহি আমি যাজক ব্রাহ্মণ
প্রত্যাশা না করি কার।"

শিষ্যের সম্মুখে গুরুনিন্দা হওয়ায় শিষ্য আর নির্বাক থাকিতে পারিলেন না, কিন্তু অস্থির হইলেও বিনয়ের সীমা অতিক্রম করেন নাই। গিরিশচন্দ্রের রাম বলিতেছেন—

"মার্জনা-ভিখারী আমি যদি অপরাধী, কিন্তু
রুষ্ট ভাব কিবা হেতু কন্ পুরোহিতে ?

যাজন বিপ্রের ক্রিয়া, ক্ষত্রিয়ের ধনুক ধারণ—
ব্রাহ্মণের ক্রিয়াভ্রষ্ট নন্ মুনিবর।"

যাহার দর্পচূর্ণ করিতে হইবে, সে যতদূর দর্পী, তাহার সম্মুখে ততদূর বিনয়ী হইতে না পারিলে দর্পের পরাজয় মধুরভাবে সম্পাদিত হয় না। গিরিশচন্দ্র এখানে সেই মাধুর্য আনিয়াছিলেন। তিনি কৃত্তিবাসের রামের মতো—"তোমার ধনুকে যদি গুণ দিতে পারি। তোমার ধনুক-বাণে তোমারে সংহারি।"—ভাবা প্রয়োগ করেন নাই।

এ সকল ত্রুটি কৃত্তিবাসের দোষ নহে, তাহার কৈফিয়ৎ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে পাঠোদ্ধার করিয়া সেই-সেই অংশ গিরিশচন্দ্রের নাটকান্তর্গত পাঠের সহিত তুলনা করিয়া কৃত্তিবাসকে খাটো করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নহে। কৃত্তিবাস ছিলেন, তাই আমরা গিরিশচন্দ্রকে পাইয়াছি। সূত্র আছে বলিয়া টীকার গৌরব। পুরাণকার ও নাটককার একই বিষয়ে কিরূপ ভিন্নভাবে কার্য করেন, পাশা-পাশি রাখিয়া তাহার প্রভেদ দেখানোই এখানে উদ্দেশ্য।

রাম-বনবাস নাটকের রাম

'রাম-বনবাস' নাটকখানি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রেল তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ প্রতাপ জহরীর ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। 'রাম বনবাস' নাটকের রামকে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এখন তিনি বিবাহিত ও সংসারী এবং দেশের আপামর-সাধারণের আনন্দ বর্ধনের নিমিত্ত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতে যাইতেছেন, সুতরাং প্রজারঞ্জনার ভাব তাঁহার মনে জাগিয়াছিল; তাই এ সময়ে রাজার কতকগুলি কর্তব্য তাঁহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল, এবং তিনি সেগুলিকে এরূপ ভাবে বরণ করিয়া লইলেন, যে, আজ কত যুগ-যুগান্তের পরও লোকে রামকেই সেই-সেই কর্তব্যনিষ্ঠার আদর্শ-পুরুষ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এত সমাদর আর কোন পৌরাণিক চরিত্রের ভাগ্যে ঘটে নাই। রাম-চরিত পর্যালোচনা করিলে তাঁহার সমুদয় কার্যগুলিকে দুইটি প্রধান শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায়। একটি সত্যপালন—অপরটি প্রজাপালন। এই দুইটি কর্তব্যের বিরুদ্ধে যখন যে বাধা উপস্থিত হইয়াছিল, রাম তাহা অকুতোভয়ে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র রামের এই বৈশিষ্ট্য কিরূপ কৌশলে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, ক্রমে-ক্রমে তাহাই প্রদর্শিত হইবে।

বিশিষ্টতাই তো জীবন। দেহধারী জীবমাত্রেই আহার-বিহার-মৈথুন তত্ত্ব অবগত আছে। এ দৈনন্দিন ব্যাপারের মধ্যে সৌন্দর্য নাই। আমাদের চক্ষু যদি প্রতিদিন একই দৃশ্য দেখিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার নবীনত্ব অল্প দিনেই নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই বুঝি প্রকৃতি-রাণী নিত্য নব-নব সৌন্দর্যে জীবের মনোহরণ করিয়া থাকেন। তাই বৈচিত্র্য আস্বাদপ্রিয় ঔদরিকের কাছে অনাহারী বনবাসী রামের মহিমা—নিদ্রাতুরের কাছে বিনিদ্র লক্ষ্মণের কঠোর সাধনা—এবং ভোগ-সর্বস্বের কাছে জিতেন্দ্রিয় ব্রতচারী রাম বা লক্ষ্মণের চিত্র এত মধুর লাগিয়াছে!

'রাম-বনবাসের' রামকে প্রথম হইতে পিতৃ-ভক্তরূপে পাওয়া গিয়াছে, ইহাও নাটককারের একটা কৌশল। এ কৌশল না থাকিলে রামের পিতৃ ভক্তি যে অপ্রমাণিত হইবে, তাহা নহে। তবে রামের পিতৃ ভক্তির সহিত দৃশ্যকাব্যের দর্শক বা পাঠককে সহসা অপ্রস্তুত-ভাবে একেবারে পরিচিত করাইলে সেই গুণের মোহিনী শক্তি হ্রাস পাইবে, এবং তজ্জন্য চরিত্র-বিকাশের ব্যাঘাত ঘটিবে।

নাট্য শিল্পী গিরিশচন্দ্র এ তথ্য জানিতেন, তাই, যে রাম অপরের পিতৃ-সত্য-পালনের জন্ত রাজৈশ্বর্য পরিত্যাগ-পূর্বক বনচারী হইবেন, সেই রামের এত বড় একটা গুণের সহিত দর্শক বা পাঠককে তাঁহার পূর্বগামী নাট্যকারদের মতো আকস্মিক-ভাবে পরিচিত না করাইয়া অল্পে অল্পে করাইতেছিলেন। এ সত্য কথা নাটকের দর্শক বা পাঠক মাত্রেই অবগত হইয়াছেন, পাঠোদ্ধার নিষ্প্রয়োজন।

নাট্য-শিল্পী গিরিশচন্দ্র রামের পিতৃ-ভক্তির অন্তরালে নাট্য-কাব্যের আর একটি মহৎ উদ্দেশ্ত সাধন করিয়া লইয়াছিলেন। রাম-বনবাসের সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে রামের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথম অধ্যায়ের রাম বালক, পিতৃ-নির্দেশের সম্পূর্ণ বশবর্তী ছিলেন। রাজ্যাভিষিক্ত হইবার কালে রাজ্য-পালন সম্বন্ধে তিনি যে সম্পূর্ণ স্বাধীন—এরূপ একটা ধারণার বশে রাম তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপ ভাবে যাপন করিবেন তাহার একটা ছবি পূর্ব হইতেই মনে মনে খাড়া করিতেছিলেন। তাই অপেক্ষাকৃত বয়স্ক রাম-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনায় গিরিশচন্দ্র সেই ছবিটি সাধারণ্যে প্রকাশিত করিয়া প্রকৃত নাটককারের উদ্দেশ্তসাধন করিয়াছিলেন। রামের তখনকার মনের অবস্থা নাটককার নিম্নলিখিত কথাগুলির মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছেন :—

"হে ভূপ-মণ্ডল।
লব রাজ্য পিতার আদেশে,
কিন্তু অজ্ঞ আমি, যোগ্য কভু নই।
রাজ কার্যে দেখ যদি বাল্য চপলতা
মার্জনা করিহ দোষ বালক ভাবিয়ে;
স্নেহে মোরে দিও উপদেশ।
রাজনীতি-বিশারদ ভূপালমণ্ডল,
ব্রাহ্মণ-সজ্জন সুধীর সচিবগণে,
গুরুজনে নমস্কার মম; প্রসাদে
সবার পারি যেন করিবারে পিতৃ-মুখোজ্জ্বল—
বহিবারে পৃথিবীর ভার,
ক্ষুদ্র হ'তে রহে যেন রঘুবংশ-মান।"

জ্যামিতির কোন এক প্রতিজ্ঞা পূরণের পূর্বে যেমন প্রতিপাদ্য বিষয়টির উল্লেখ করিয়া লইয়া পরে সেই সম্পাদ্য-বিষয় প্রমাণ সহকারে পূরণ করিতে হয়, গিরিশচন্দ্রও সেইরূপ রামের স্বাধীন জীবন আরম্ভের পূর্বে রামের মুখেই উপরিউক্ত প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়া, পরে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের কার্য-পরম্পরা দ্বারা ঐ প্রতিজ্ঞা পূরণ করাইয়া লইয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ নাটককার এইরূপেই কার্য করেন।

কৈকেয়ী নিজমুখে রামকে বনবাস-বার্তা শুনাইলে কৃত্তিবাসের রাম এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

"শুনিয়া কহেন রাম সহাস্ত বদনে।
তোমার আজ্ঞায় মাতা এই যাই বনে॥
করিয়াছ কোন্ কাজে পিতারে মূর্ছিত।
লঙ্ঘিতে তোমার আজ্ঞা নহেত উচিত॥
তব প্রীতি হবে রবে পিতার বচন।

চতুর্দ্দশ বৎসর থাকিব গিয়া বন ॥
ভরতেরে ত্বরিতে আনাও মাতা দেশ।
ভরত হইলে রাজা আনন্দ অশেষ ॥
কোন দোষ নাহি মাতা তাহার শরীরে।
ধন জন রাজ্য ভোগ দেহ ভরতেরে ॥"

কৈকেয়ী তখন বলিলেন—

"কৈকেয়ী বলেন রাম আগে যাহ বন।
ভরত আসিবে তবে এই নিকেতন ॥
আমার কথাতে কোপ না করিহ মনে।
শিরে জটা ধরি তুমি আজি যাহ বনে ॥

ভূলুণ্ঠিত দশরথ রাম-কৈকেয়ীর পূর্বোক্ত কথোপকথন এতক্ষণ স্বপ্নাবিষ্টের মতো নীরবে শুনিতেছিলেন, এমন সময়ে—

"রামচন্দ্র পিতার চরণদ্বয় বন্দে।
দশরথ ক্রন্দন করেন নিরানন্দে ॥
পিতারে প্রণমি রাম চলেন ত্বরিত।
'হা রাম' বলিয়া রাজা হ'লেন মূর্চ্ছিত ॥"

বন-গমনের পূর্বে রাম-দশরথ-সম্মিলন কৃত্তিবাস এইভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। উভয়কেই এখানে নীরব রাখিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তখন কি দশরথের মনে কোন চিন্তার উদয় হয় নাই, বা দশরথকে ভূলুণ্ঠিত দেখিয়া রামের মনেও কোন ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই? নিশ্চয় হইয়াছিল। শ্রব্যকাব্য-প্রণেতা কৃত্তিবাস উভয়কে নীরব রাখিয়া সেই শোক ও সান্ত্বনার গভীরতা দেখাইয়াছেন। গিরিশচন্দ্র কিন্তু তাঁহার ভাষ্যকার, সুতরাং সেই নীরবতার মধ্যে শোক ও সান্ত্বনার যে সিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, নিম্নলিখিত বাক্যগুলিদ্বারা তাহার ভাষ্য করিয়া গেলেন। গিরিশচন্দ্রের রাম প্রথমে কৈকেয়ীর প্রতি বলিলেন:—

"হেন দুঃখ
কি হেতু মা দিয়াছ পিতারে।
তুমি আজ্ঞা করিলে জননি,
যাইতাম বনবাসে।
আনন্দ আমার—
রাজা যদি হয় গো ভরত।

পরে দশরথের প্রতি—

উঠ পিতা, ত্যজ ধরাসন,
সফল জনম মম, বহু পুণ্যফলে
পিতৃ-সত্য করিব পালন।
ধরি দেহ তোমার কৃপায় দেব,

বধূমাতা কাঁদিবে বিহনে তোর,
কুবচন কবে সবে মোরে,
কেমনে রে লব তোরে সাথে
আঁধার করিয়ে পুরী?"

দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লক্ষ্মণ দেখিলেন যে তাঁহার ইচ্ছাকে রাম স্নেহের আড়াল দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে চাহিতেছেন, তখন অভিমানী লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলেন :—

"বুঝিলাম
অপরাধী হয়েছি চরণে,
গুরুজনে কহি কটু।
দেহে আর কি কাজ আমার?
রাম-সেবা করিতে নারিব।"

লক্ষ্মণের এই অভিমান-সূচক দুঃখ ভ্রাতৃ-বৎসল রামকে বিহ্বল করিয়া সকল বাধা দূর করিয়া দিল। রাম তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন :—

"ভাই, ভাই, ভাইরে আমার,
চল সাথে সঙ্কটের সাথী!
চল, বিদায় মাগিব জনে-জনে,
জানকীরে সঁপিব মাতায়;
আজি যাব বন-বাসে।"

রাম জননীর কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছেন। কৌশল্যা রাম-বিরহে পাগলিনী-প্রায় হইয়া দশরথকে কুবচন বলিতেছেন। পিতৃভক্ত রাম আর থাকিতে পারিলেন না, মাতাকে বলিলেন—

"মাগো! মন্দ নাহি বল গো পিতারে,
অতি দুঃখী পিতা মম।
ভুবনে আখ্যান,
সত্যের সম্মান সূর্য্যবংশে চিরদিন,
সূর্য্যবংশে সত্যাধীন সবে।
বনে যাই বিধি বিড়ম্বনে,
পিতারে না বল কুবচন।
মা গো!
দেখিলে রাজার, প্রাণ ফেটে যায়,
ভূমেতে মুকুট লোটে;
অবিরল চক্ষে বহে জল,
'হা রাম', 'হা রাম' মুখে;
না জানি জননী।
নৃপমণি কি করেন মোর শোকে!

মাগো! পিতা গুরু তব
আমার গুরুর গুরু—
কেমনে মা লঙ্ঘিব বচন তাঁর?
এস গো জননী
যাব পিতার নিকট বিদায় লইতে,
শোক-সিন্ধু উথলিবে তাঁর।
আমা বিনা পিতা নাহি জানে,
শান্ত কর গৃহিণী-মা তুমি।
দিও অন্ন জল, জনক বিকল,
অন্ন-জল ত্যজিবেন মন-দুঃখে।
মাগো, কি কব তোমায়,
শঙ্করী-পূজায় ভুল শোক—
জননী আমার।
লিপি বিধাতার খণ্ডন না হয় কভু,
বনে যাব অন্যথা না হবে।”

পূর্বোক্ত কথাগুলির মধ্যে রামের পিতৃভক্তি ও মাতার প্রতি সান্ত্বনা এমন সহৃদয়তার সহিত বাহির হইয়াছে যে, ঐ কথার পর কৌশল্যার শোক কতকটা মন্দীভূত হইয়া গেল। রাম তখন মাতা-সমভিব্যাহারে পিতার সম্মুখে বিদায়ের জন্য দাঁড়াইলেন। দশরথের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। রাম পিতাকে বলিতেছেন—

“পিতা পিতা! ত্যজ অনুতাপ,
সত্যবান্ তুমি মহারাজ!
সত্যের সম্মানে
প্রিয় পুত্রে পাঠাইলে বনে,
মহত্ত্ব প্রচার করিলে হে ধরাতলে।
রবিকুল রবিসম সত্যময়;
পুত্র তব সত্য হেতু যায় বনে।
পুত্র রাখে বংশের গরিমা
পিতার মহিমা তাহে।
রাজ্য ছার! মাহাত্ম্য পদার্থ গণি,
পুত্রের গৌরবে কি হেতু কাতর রাজা?
(পরে মাতৃ উদ্দেশে)
মাতা! পতি সেবা ধর্ম তব,
রঘু কুল-বধূ
মোহ বশে কর্তব্য ভুল না।

মাগো! জেনে কি জান না,
কার ভাগ্যে ঘটে, সত্যে জনকে করিতে পার!
মা আমার,
দেহ গো মেলানি—
(পুনরায় পিতার প্রতি)
পিতা!
তোমার প্রসাদে সুখে রব বনাশ্রমে
হাসি মুখে করো গো বিদায়।"

এরূপ আন্তরিক সমবেদনা জগতে দুর্লভ। প্রতি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে গিরিশচন্দ্র রামচরিত্রের মহত্ত্ব নাটকীয় কৌশলের ভিতর দিয়া এমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে তাহার ইয়ত্তা নাই।

ভরতের রাজ্যলাভ ব্যাপারটিকে রাম প্রাকৃতের চক্ষে দেখেন নাই। তিনি নিজে যেমন পিতৃ-সত্য পালনের জন্য বনে যাইতেছেন, ভরতও সেইরূপ পিতৃ-সত্য পালনের নিমিত্ত অযোধ্যার রাজা হইবেন, এরূপ ভাবেই দেখিয়াছিলেন। ভরতের রাজ্যলাভ কৈকেয়ীর বর-প্রার্থনার অন্যতম বিষয় ছিল, সুতরাং উহা পিতৃ-সত্য পালনের অপর দিক। বড় ভাইকে বঞ্চিত করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করিলে রামের মতো ভ্রাতার চিন্তা নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশিত হইত না:—

"পিতৃসত্য করিতে পালন—রাজা হবে ভরত আমার।" পরে গুহককে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—"ভার তোমা সবাকার—রাখিতে অযোধ্যাপুরী, বালক ভরত ভাই।"

রাম-বনবাস নাটকের শেষ দৃশ্যে শত্রুঘ্ন—'বাপ কেন হও চিন্তামণি' বলিয়া 'চিন্তামণি' শব্দ দ্বারা আত্মবিস্মৃত রামকে যখন তাঁহার পূর্ব-স্মৃতিতে পৌঁছাইয়া দিলেন, রাম তখন প্রবুদ্ধ হইয়া ভরত ও শত্রুঘ্নকে উদ্দেশ করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন:—

"ভাইরে ভরত, ভাই শত্রুঘ্ন!
বিধির লিখনে দেব-মর্ম বুঝ ভাই,
বিমাতার কি সাধ্য প্রেরিতে বনে?
সত্যের রক্ষণে পিতৃদেব পরলোকে—
দেব কার্য জেন স্থির।
দেব কার্যে এসেছি গহনে।
রাজ্য রাখ এই আজ্ঞা মম,
ধর্ম-মর্ম বুঝি আজ্ঞা নাহি ঠেল ভাই।
জেন স্থির—
চারি ভাই চারি কার্য হেতু।"

গিরিশচন্দ্র আত্মবিস্মৃত রামের ক্ষণস্মৃতি ক্ষণবিস্মৃতি উদ্বোধক শব্দ বা ঘটনার সাহায্যে সর্বত্র এইরূপ সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন, ইহাও তাঁহার নাট্য কৌশলের অপর একটি দৃষ্টান্ত-স্থল।

সীতাহরণ নাটকের রাম

'সীতাহরণ' নাটকটি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ প্রতাপ জহুরীর ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এই রাম রামাবতারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন। যদিও তাড়কা-নিধন বা মিথিলায় যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষস সমূহের বিনাশ সাধন-ব্যাপার দ্বারা বালক রামচন্দ্র রামাবতারের প্রধান কার্য গৌণভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য তখন কিন্তু অন্যরূপ ছিল। স্থানীয় অত্যাচার-নিবারণ উঁহার লক্ষ্য ছিল, এবং সেই অত্যাচারের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে রামের রক্ষঃবধ স্পৃহাও অন্তর্হিত হইয়াছিল। সীতাহরণের রাম কিন্তু যে রক্ষঃ-বধ আরম্ভ করিলেন তাহা তাঁহার রামাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্যের সহিত বিজড়িত ছিল।

চিত্রকূট ও দণ্ডকারণ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে রাম ও সীতা মুগ্ধ হইলেন। পাছে এই সুন্দর দৃশ্যের সহবাসে রামের কোমল বৃত্তিগুলি জাগিয়া উঠিয়া দেবকার্য-সাধনে বিলম্ব উৎপন্ন করে, তজ্জন্য স্থাবর-জঙ্গমের ভাগ্য-নিয়ন্তা ব্রহ্মা পুরন্দর-সমভিব্যাহারে বিমান পথে আবির্ভূত হইয়া নিম্নলিখিত সংলাপের মধ্যে রামের ও দণ্ডকারণ্যের ভাগ্য কিরূপে নিয়ন্ত্রিত করিলেন, দেখুন। ব্রহ্মা পুরন্দরকে বলিতেছেন :—

"রণস্থল নেহার অদূরে—
নবদল শোভিত ভূতল
খচিত শিশির-হারে,
ক্ষণপরে ভাসিবে রুধিরে !
এবে বিহঙ্গিনী তোলে তান সুমধুর,
ক্ষণপরে বাণের গর্জ্জনে অধীর হইবে গিরি।
কুসুম-সৌরভে রসায় ঋষির মন,
পূতিগন্ধে মাতিবে মেদিনী।
ঘোর রোলে ডাকিছে শৃগাল,
রাক্ষস-সংহার ব্রতী হইবেন রাম।
পুরন্দর। তব ভয় ঘুচিবে সত্বর।

ইন্দ্র— বিধি তব বুঝিতে না পারি,
কোথা শনি-অংশে নারী,
কে মজাবে স্বর্ণলঙ্কা ?

ব্রহ্মা— হের,
আসিতেছে রাক্ষস-নাশিনী।"

এই সংলাপের গূঢ় রহস্যটি এইরূপ :—পৃথিবীর যাবতীয় কার্য-কারণ সম্বন্ধে সংবদ্ধ থাকে। সীতাহরণ-রূপ কার্যেরও একটা কারণ থাকা আবশ্যক, রামায়ণে তজ্জন্য শূর্পণখার সৃষ্টি হইয়াছে। নারীর অবমাননার জন্য রামের নারীও অবমানিতা হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র সীতাহরণের প্রারম্ভে সংস্কৃত নাটকের 'বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক' নামক পারিভাষিক কৌশলের ভিতর দিয়া এ রহস্যটুকু প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

শূর্পণখার নাসা-কর্ণ-ছেদন বিষয়ে কৃত্তিবাসের রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিতেছেন :—"শ্রীরাম বলেন ভাই ছাড় উপহাস। ইঙ্গিতে বলেন কর ইহারে বিনাশ।" লক্ষ্মণও ঐ ইঙ্গিতের বশবর্ত্তী হইয়া :—"ক্রোধেতে লক্ষ্মণ বীর মারিলেন বাণ। একবাণে তাহার কাটিল নাক-কাণ।" স্ত্রীলোক দুশ্চরিত্রা হইলে বধার্হা নহে, এ কথা গিরিশচন্দ্রের রাম জানিতেন, তাই 'দূর হ কুলটা' বলিয়া শূর্পণখাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ভ্রষ্টা নারী বধার্হা না হইলেও দণ্ডের উপযুক্ত ভাবিয়া লক্ষ্মণ—"যা বলেন বলুন শ্রীরাম, কাটিব ইহার নাক-কাণ" বলিয়া তদনুরূপ কার্য করিয়াছিলেন।

খর-দূষণ এখন সমরে নিপতিত হইয়াছে; শূর্পণখা সহায়হীনা অবস্থায় লঙ্কাপতি রাবণকে তাহার অবমাননার সংবাদ দিবার জন্য লঙ্কায় নিজেই চলিয়াছে। অন্তরীক্ষচারী যে সকল দেবতা খর-দূষণের সমর দেখিতেছিলেন, গিরিশচন্দ্র তাঁহাদেরও এ সময়ে নিশ্চিন্ত রাখেন নাই। তাঁহারা জানিতেন যে, লঙ্কাপতি রাবণ এ অপমানের প্রতিশোধ লইবেন, এবং যত সত্বর সেই প্রতিশোধ গৃহীত হয় রাবণবধও তত শীঘ্র সম্পাদিত হইবে। এই আশায় ব্রহ্মা-প্রমুখ দেবতাগণ যাহাতে শূর্পণখার গমন-পথ শঙ্কাশূন্য হয় তাহারই ব্যবস্থা অন্তরীক্ষে থাকিয়া করিতেছিলেন। কৃত্তিবাস কেবল দেবতাদিগকে অন্তরীক্ষে রাখিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাঁহার ভাষ্যকার তাঁহাদের উক্তস্থানে রাখিবার কারণ কি, তাহা ব্যক্ত করিলেন।

রামের ন্যায় আদর্শপুরুষকে প্রাকৃতজনের মতো দুঃখভোগ করিতে দেখিয়া যখন জন-সাধারণের মনে ধর্মাশ্রয়ের উপর একটা সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন প্রাকৃতেরা যাহাকে দুঃখ বলে, অপ্রাকৃতের কাছে তাহা যে বাস্তবিক দুঃখ নহে, বরং ইহা কোনরূপ উদ্দেশ্যসাধনের উপায়-মাত্র—এই তত্ত্বটুকু বুঝাইবার জন্য গিরিশচন্দ্র নরদেহধারী রামের সহিত নরভাগ্য-নিয়ন্তা বিধাতার সম্বন্ধ প্রয়োজন-মতো দেখাইয়া গিয়াছেন। অন্য দেবতাকে না আনিয়া বিধাতা বা মহামায়াকে উপস্থিত করায় নাট্যকারের দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞানের (Propriety) পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

রাম-চরিত্রের অপর দিকের পরিচয় পাওয়া যাইলেও তাঁহার পত্নীপ্রেমের প্রগাঢ়তা দেখিবার সুযোগ এতক্ষণ ঘটে নাই। বিবাহের পর হইতে নানারূপ বিপত্তির আবর্তে রামের জীবন ঘূর্ণ্যমান ছিল, এবং সেই আবর্তের মধ্য-হইতে তাঁহার চরিত্রের অনেক মহত্ত্ব উঠিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, পত্নীর প্রতি কর্তব্যের উল্লেখ তাহার মধ্যে থাকিলেও পত্নী-প্রেমের প্রগাঢ়তা দেখা যায় নাই। 'সীতাহরণ' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে রামচন্দ্র কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। খর-দূষণ সমরে নিপাতিত হইয়া দণ্ডকারণ্যের বনস্থলী প্রায় শত্রুশূন্য হইয়াছে, এমন অবস্থায় পত্নীর দিকে নজর দেওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়াছিল। চিত্রকূট পর্বতের সান্নিধ্যে গুহকের আশ্রমে রামের পত্নীপ্রেম ফুটিবার একবার অবসর হইয়াছিল, কিন্তু অন্য ঘটনার প্রাবল্যে তাহা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র যে পরিস্থিতির (Situation) মধ্যে এই প্রেম-ছবিখানি আঁকিয়াছেন, বাস্তবিক তাহা উপভোগের সামগ্রী।

বিবাহের পর সীতা শ্বশুর গৃহে আসিয়া হাসির পরিবর্তে অশ্রুর আধিক্য দেখিয়াছিলেন। বনবাসবার্তা, শ্বশুরের মৃত্যু, বনবাসকালীন নানাবিধ উপদ্রব প্রভৃতি ঘটনা-পরম্পরা সীতার চিত্তের প্রসন্নতা নষ্ট করিয়াছিল। তাই দণ্ডকারণ্যের পুষ্পিত অটবীর শোভা, এইরূপ নিশ্চিন্তভাব অবসরে

সীতার চক্ষে বড় মধুর ঠেকিয়াছিল। তিনি মনের আনন্দে গান গাহিয়া 'কুসুম-দশনা' বল্লরীকে গীতিছন্দে এইরূপ বলিতেছেন :—

"হাসি কোথা শিখিলি সই, ওলো কুসুম কলি।
হাসি ভালবাসি, যদি শিখি হাসি,
হাসি-হাসি বাঁধিব লো প্রাণ-অলি" ইত্যাদি—

বিষাদিনী সীতার মুখে হঠাৎ এই হাসির গান শুনিয়া রাম বলিলেন :—

"কারে বাঁধিবারে প্রাণেশ্বরী,
কুসুমের হাসি শিখিতে করেছ সাধ?
জানত-জানত আমি ভালবাসি জানকীর হাসি।
বিহঙ্গিনী গায় সুমধুর
যবে তুমি রহ মম পাশে,
মৃদুভাবে শুনাও সঙ্গীত মোরে;
সে মৃদু লহরে প্রাণ ভরে,
তাই পাখী গায় লো ললিত।
সই ব'লে দেখাইলে কমলিনী, সেই মৃদুভাবে—
যে মৃদুলহরে প্রাণ নাচে,
তাই কমলিনী ভালবাসি।
কুরঙ্গিনী সঙ্গিনী তোমার,
তাই সচেতন নয়ন তাহার
ভালবাসি প্রাণ প্রিয়ে।
প্রাণ দেখাবার নয়—সীতাময় হিয়া মম—
সদা প্রাণ চায় বলি প্রিয়ে—আমি ভালবাসি,
ভালবাসি তুমি বল ফিরে।"

রাম পূর্বোক্ত কথাগুলির মধ্যে প্রেমের যে প্রগাঢ়তা দেখাইলেন, তাহা গিরিশচন্দ্রের পূর্বগামী বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে একান্তই দুর্লভ ছিল। সীতার সংগীতের ধ্বনি পাখীর কলস্বরে আছে, তাই বিহগী সুন্দর গায়, সীতা বনবাসিনী বলিয়া সহচরীহীনা, তাই কমলিনীকে তিনি সহচরী করিয়া লইয়াছেন, আমিও তাই কমলিনীকে ভালবাসি,—কুরঙ্গীর নয়নে সীতা-নয়নের সাদৃশ্য বর্তমান দেখিয়া সীতার সহচরী কুরঙ্গীকেও আমার ভাল লাগে—এই যে সকল বিষয়ে সীতাময়ভাব—ইহা রামের প্রেমের প্রগাঢ়তার পরিচায়ক।

বিরহের তীব্রতা দেখাইতে হইলে প্রেমের বিশালতা দেখানো নিপুণ নাটককারের কার্য। সীতাহরণের পর রামের বিরহের তীব্রতা দেখাইবার জন্য গিরিশচন্দ্র তাহারই পূর্বে প্রেমের বিশালতা দেখাইয়া দিলেন। এইবার বিরহের তীব্রতা দেখুন।

রাম কুটীরে ফিরিয়া সীতার অদর্শন ব্যাপারটাকে প্রথমে কৌতুক বলিয়া ধরিয়াছিলেন। পরে ভাবিলেন কৌতুক হইলে এত কাতরতার পরও করুণারূপিনী নীরব থাকিবেন কেন? রাম তখন

নিজেই কাতর হইয়া পড়িলেন। ক্রমে কাতরতার মাত্রা বাড়িয়া গিয়া সব সীতাময় দেখিতে লাগিলেন। শুষ্ক পত্রের সঞ্চালনে জানকীর পদশব্দ,—পক্ষীর কূজনে সীতার কণ্ঠস্বর প্রভৃতি উন্মাদকর বিভ্রান্তি তাঁহার উপস্থিত হইল। পদার্থ-বিদ্যায় বলে পদার্থের অতিশয় উষ্ণতা বা শৈত্য গুণধর্মে পৃথক হইলেও ক্রিয়া ধর্মে এক ফল প্রসব করিয়া থাকে, তজ্জন্য রামের নিকট তাঁহার প্রেমের প্রগাঢ়তা বা বিরহের তীব্রতা গুণধর্মে পৃথক হইলেও উন্মাদনা-রূপ ক্রিয়া-উৎপাদন বিষয়ে উভয়ের শক্তি অভিন্ন ছিল।

রাম তখন সীতা-বিরহ-জনিত শোকাবেগের প্রাচুর্যে মূর্ছিত হইলেন। মূর্ছা-ভঙ্গে জানিতে পারিলেন যে বন পাতি-পাতি করিয়া খুঁজিবার পরও সীতা মিলিল না, তখন অকস্মাৎ সীতার মৃত্যু-কল্পনা করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন:—"লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ। কেহ কি বধিল জানকীরে?" লক্ষ্মণ উত্তরে বলিলেন:—"নিশ্চয় এ রাক্ষসের মায়া—ভেদিতে না পারি প্রভু!" জানকীর শোকে দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য রাম বলিলেন:—"মায়া চূর্ণ করি আমি বাণে!" লক্ষ্মণ রামের উন্মাদনার লক্ষণ দেখিয়া বলিতেছেন:—"প্রভু! ধরি রাজীব চরণ, কারে বাণ করিবে ক্ষেপণ?" শোকোন্মত্ত রাম উত্তর দিলেন:—"পর্বত কাটিব, সাগর শুষিব বাণে; বল সীতা কোথায় লক্ষ্মণ? হানি বাণ ব্রহ্মাণ্ড ভেদিব।" লক্ষ্মণ রামের চৈতন্য-সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন:—"দয়াময়। অপরাধী বিনা, অন্যের কি হেতু লবে প্রাণ?" লক্ষ্মণের এই বাক্যে রামের জ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পর, সীতাহীন জীবন ভারমাত্র মনে করিয়া রাম প্রাণত্যাগ শ্রেয়ঃ বিবেচনাপূর্বক লক্ষ্মণকে বলিলেন—"জ্বাল কুণ্ড ত্যজিব এ প্রাণ!" লক্ষ্মণ দেখিলেন সব বুঝি শেষ হইয়া যায়, তাই অন্য পথ ধরিয়া বলিলেন—"প্রভু! আগে সীতা করি অন্বেষণ।" লক্ষ্মণের কথায় রামের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল, রাম বলিলেন:—"অবোধ লক্ষ্মণ, কুটিরে রয়েছে সীতা—সন্ধ্যাকালে বাহিরে না যায়।" রামের পুনরায় ধৈর্যচ্যুতি দেখিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন—"নফর কি কবে আর দেব। ধৈর্য ধর রঘুনাথ।" রাম বলিলেন:—

> "তবে কোথা সীতা?
> আহা রাজার দুহিতা, আমা হেতু বনবাসী!
> শুনি, মহী সীতার জননী,
> দুহিতারে হেরিয়ে কুটীরে—
> নিজ বাসে সেই বা লইল?
> ভাইরে লক্ষ্মণ—আমারে ছাড়িয়ে জানকী না রহে তিল!
> কোথা সীতা! কোথা পাব সীতা।"

উপরিস্থ কথাগুলির মধ্যে শোকের কি গভীরতাই না প্রকাশ পাইয়াছে!

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, রাম চরিত্রকে বিশ্লেষণ করিতে যাইলে সত্যপালন তাঁহার চরিত্রের এক বিশিষ্ট ধর্ম বলিয়া অনুমিত হইবে। পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম বনবাসী হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের অবলম্বন—সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী সীতা বনবাসিনী অবস্থাতেই রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হইয়াছেন। জানকী-বিরহজনিত বেদনায় রাম হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মত্তবৎ চারিদিকে অন্বেষণ করিতেছিলেন। পথমধ্যে পিতৃবন্ধু জটায়ুর কাছে সীতাহরণ বৃত্তান্ত শুনিলেন, এবং তাঁহারই পরামর্শে ঋষ্যমূখ পর্বতে সুগ্রীবের সখ্যতা লাভের জন্য গমন করিলেন। সুগ্রীবও তাঁহার

বতো রাজ্যহারা ও বনবাসী, সুতরাং উভয়ের হৃদয়-বিনিময়ে বিলম্ব হইল না। উভয়ে উভয়ের উপকারার্থ অগ্নি-সাক্ষ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। এখানে রামের আর এক সত্যপালনের সুযোগ ঘটিল। এটি মিত্রসত্য। পিতৃসত্য পালনের জন্য যেমন পিতার মৃত্যু-জনিত কলঙ্ক রামকে স্পর্শ করিয়াছিল! মিত্র-সত্য পালনকালে সেইরূপ বালিবধ-কলঙ্ক তাঁহাকে কলঙ্কিত করিয়াছিল। কেন এ কলঙ্ক তাঁহাকে স্পর্শ করিল তাহার কৈফিয়ৎ রাম নিজে এইরূপে দিতেছেন :—

"অন্যায় সমর ? কিবা ডর, অন্যায় হরিল মোর সীতা!" সীতাবিরহের উন্মাদনা তখনও রামকে পরিত্যাগ করে নাই, তাই রাবণ কর্তৃক অন্যায়রূপে সীতাহরণের সহিত তাঁহার পূর্বোক্ত বালিবধরূপ অন্যায় সমরের তুলনা অস্বাভাবিক হয় নাই; কিন্তু উন্মাদনায় বশে যাহা কিছু করুন না কেন, রাম ক্ষত্রিয় সন্তান, অন্যায় সমর যে যুদ্ধনীতি-বিগর্হিত ব্যাপার, তাহা তিনি বুঝিতেন, তাই বালীর মুমূর্ষু অবস্থায় এইরূপ বলিয়াছেন :—

"বীরবর!
শোকে মম আকুল হৃদয়;
হিতাহিত না বিচারি মনে
করিলাম অঙ্গীকার
মিত্র-সত্যে ছাড়িয়াছি শর।"

এখানে মিত্র-সত্যপালনরূপ কর্তব্য প্রবল হওয়ায় রাম পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়া অন্ধের মতো তাহাই পালন করিয়াছিলেন, অন্য দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর পান নাই। কিন্তু আজ বালীর আসন্ন-কাল উপস্থিত দেখিয়া রামের করুণ-হৃদয় মমতায় গলিয়া গিয়াছিল, তাই অন্যায় সমরে প্রাণ-ত্যাগরূপ ক্ষোভ বালীর মন থেকে দূর করিবার অভিপ্রায়ে তিনি একটু আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়া তাহার মনে এইরূপে আত্মপ্রসাদ আনিলেন :—

"শুন সত্যতত্ত্ব কপীশ্বর।
কাল পূর্ণ তব,
পরম শিক্ষার দিন দেখ দিব্য জ্ঞানে
আমি মাত্র নিমিত্ত এ স্থলে;
দীননাথ দীনে করেছেন দয়া।
সুগ্রীব অধিক দীন কেবা ছিল আর।
দীন সহোদর তব—
রাজ্যে অর্ধ অধিকার,
বাহুবল অধিক তোমার,
ভয়ে ঋষ্যমুখে আছে ঋষিসনে,
না গণিলে মনে কভু;
দীননাথ শুনিল দীনের দীর্ঘশ্বাস।
মম বনবাস, জানকী হরণ বনে,
দীননাথ দীনে বন্ধু দিল।

এবে দীন তুমি,
দীননাথ শুনে তব মনস্তাপ।
অতুল-গৌরবে বীর গর্বে ত্যজ ধরা,
পড়েছ কপট-শরে
চরাচরে এ কথা কহিবে।
ম'রে হেন কীর্তি কহ কার?
বীর্যবান্! কীর্তিমান্ তুমি,
মুক্তকণ্ঠে বলি আমি।

রাম চরিত্রের ইহাই একটি রহস্য। যখন যে সত্য প্রবলভাবে রামকে আশ্রয় করে, তিনি অকুতোভয়ে তাহা পালন করিয়া যান, এবং সেই কৃতকর্মের জন্য কখন কখন তাঁহাকে অপযশ বা গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কাতর হন নাই। রামের এ বৈশিষ্ট্য গিরিশচন্দ্র দক্ষতার সহিত দেখাইয়াছেন।

রাবণ-বধ নাটকের রাম

রাবণ-বধ নাটকখানি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ প্রতাপ জহরীর ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। রাবণ-বধ না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না, তজ্জন্য এই নাটকে পুনরায় তাঁহার দর্শন পাওয়া গিয়াছে। এতদূর অগ্রসর হইয়া পাছে আত্মবিস্মৃত রাম স্বাভাবিক দয়াবশে রাবণের রাক্ষসী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করেন, সেই আশঙ্কায় ব্রহ্মা রামকে তাঁহার পূর্ব ঘটনা এইরূপে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন:—

"আপনবিস্মৃত তুমি ব্রহ্মসনাতন,
যেন না হও বিস্মৃত
জনক-নন্দিনী সীতা রাবণের ঘরে,
শক্তিশেল লক্ষ্মণের বুকে,
অলঙ্ঘ্য সাগর পরেছে বন্ধন,
প্রাণ দেছে অসংখ্য বানর 'জয়রাম' নাদে
উদ্ধারিতে সীতা দেবী,
কাঁদে গৃহে তাদের প্রেয়সী;
ভুল না, ভুল না, ত্যজ না হে ধনুর্বাণ
রাক্ষস-মায়ায় মায়াময়!
যদি তব শরে সকরুণ স্বরে
রাবণ করে হে স্তুতি,
রেখ মনে, হে অখিল পতি!
সকাতরে ব্রহ্মা যাচে রাবণ-নিধন।"

শুধু যে রামের মনে জিঘাংসা-বৃত্তি জাগাইবার জন্য ব্রহ্মা ঐরূপ বলিয়াছিলেন তাহা নহে, পাছে রাম ভবিষ্যতে রাবণের মৃত্যুবাণ গোপনে আনাইতে ইতস্ততঃ করেন, তজ্জন্যও এত কথা স্মরণ করাইয়া গেলেন।

ব্রহ্মার পূর্বোক্ত সন্ধান ব্যর্থ হয় নাই। ব্রহ্মা দীক্ষিত রাম রাবণ-বধে কৃতসংকল্প হইলেন। ব্রহ্মা রাবণের রাক্ষসী মায়ার যে ভয় করিয়াছিলেন, তাহা অমূলক নহে। তবে কপটাচারীর পরিবর্তে রাবণ প্রকৃত ভক্তের মতো আসন্ন-কালে রামের স্তুতি এইরূপে করিয়াছিলেন :—

"সাগর-ভূধর-তরুবর-
স্থাবর-জঙ্গম, ভুজঙ্গম বিহঙ্গম আদি
বিরাজিত প্রতি লোম-কূপে,
ভৃগু-পদ চিহ্ন বক্ষ-স্থলে ;
নিরুপম শ্যাম কান্তি,
শ্রীচরণে পতিত-পাবনী গঙ্গা,
ওহে প্রভু দয়াময়,
কর কর অস্ত্রাঘাত,
ত্যজিয়া রাক্ষস-বপু
পুলকে গোলোকে চলে যাই।
অনাদি তুমি হে আদি-সৃষ্টির কারণ,
জনার্দন ! পালন তোমাতে।
ভগবান করুণা-নিধান,
কর ত্রাণ অভাগা রাক্ষসে
অন্তিমে, হে অন্তক-অরি।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী
দেহ শ্রীচরণ ব্রহ্মরন্ধ্রে,
এ তাপিত প্রাণ
ব্রহ্মরন্ধ্র-ভেদি' লয় হ'ক্ রাঙ্গাপদে !
পতিত-পাবন তার হে পতিতে,
ভক্তি-স্তুতি-বিহীন এ মূঢ়-জনে,
অগতির গতি বিশ্বপতি বিশ্বনাথ,
হে মুরারি রক্ষ-অরি।
দাও দাসে শ্রীচরণে স্থান।"

এরূপ করিয়া স্তব করিতে পারিলে প্রাকৃত শত্রুর হৃদয়-জয় করা যখন অসম্ভব নহে, তখন রামের অলৌকিক হৃদয় তাহাতে মুগ্ধ না হইবে কেন ? রাবণের স্তবে আত্মবিস্মৃত রামের বিস্মৃতি দূর হইয়া স্বরূপ উপলব্ধি হওয়ায়, লক্ষ্মণের 'ব্রহ্ম-অস্ত্রে করুন সংহার' কথার প্রতিবাদে রাম এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

"জান না বিশেষ তত্ত্ব বালক লক্ষ্মণ,
বধিলে রাবণে,
বল রাম-নাম কেবা লবে এ জগতে আর।
ভক্ত পিতা মাতা মম, ভক্ত মমপ্রাণ,
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া
ভক্তের কোমল-কায় করিয়াছি অস্ত্রাঘাত,
অস্ত্র স্পর্শ না করিব কভু ;
দারুণ প্রহার সহিয়াছে কত লঙ্কা-অধিকারী—
ছার রাজ্যধন, ধিক্ ধিক্ সীতা।
রটিল কলঙ্ক নামে,
এত দিনে রাম-নাম উঠিল ধরায়।
ফুটিলে কণ্টক মম ভক্তের চরণে,
শেল সম বাজে হৃদে।
ওঠ লঙ্কেশ্বর!
অক্ষয় শরীরে ভোগ কর লঙ্কাসুখ,
কাজ নাই সীতা, ফিরে যাই বনবাসে।"

রামের খেদে ভক্ত-বৎসলের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পাছে রাম রামাবতারের আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া যান, তাই গিরিশচন্দ্র ঐ রাবণের দ্বারাই অপূর্ব কৌশলে রামের মনে ভাবান্তর আনিয়াছিলেন, নতুবা রাবণবধ সুদূর-পরাহত হইত। 'রাবণ-বধ' নাটকের দর্শক বা পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

রাম-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইবার কালে ভবিষ্যৎ জীবন-যাপনের জন্য রাম যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাতে দেব-দ্বিজ-ভক্তির উল্লেখ ছিল। দ্বিজভক্তির পরিচয় বশিষ্ঠ ও পরশুরামের সহিত ব্যবহারে জানা গিয়াছিল। দেব-ভক্তি সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে উল্লেখ থাকিলেও এ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 'রাবণবধ' নাটকই দেব-ভক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ-স্থল।

রাম দেখিলেন যে নিস্তারিণী দুর্গা সংহাররূপিণীর বেশে রাবণের সহায় হইয়াছেন, তিনি তখন রণজয়-আশা পরিত্যাগপূর্বক সমুদ্র সলিলে জীবন বিসর্জন দিবার সংকল্প করিয়া একে একে সকলের কাছে বিদায় লইতেছেন। ব্রহ্মা এই অবসরে অকালবোধনার কথা রামের নিকট তুলিলেন। রাম তৃষিত চাতকের মতো ব্রহ্মার বাক্যসুধা আকণ্ঠ পান করিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিলেন।

ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত ভক্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। রামের তাহাই হইয়াছিল। সপ্তমীর পর অষ্টমীর পূজান্তেও দেবীর সন্দর্শন লাভ ঘটিল না, তখন রাম নিজ ভক্তির কৃত্রিমতা ও পূজার ত্রুটি বিবেচনা করিয়া বিষণ্ণ হইলেন। আজ নবমী তিথি, দেবী আরাধনার শেষ দিন। বিভীষণের পরামর্শে দেবীদহ হইতে আনীত শতাষ্ট নলিনী দ্বারা রাম পূজার সংকল্প শেষ করিতে লাগিলেন। নীলপদ্ম লইয়া কৃত্তিবাসের অনুকরণে এবং ভারতচন্দ্রানুকৃত বিবিধ ছন্দে গিরিশ-চন্দ্রের রাম ভগবতীর স্তবস্তুতি করিতেছেন। একশত সাতটি পদ্ম উৎসর্গীকৃত হইয়াছে—মাত্র একটি

পদ্ম উৎসর্গের জন্য বাকী, কিন্তু ভগবতী সেই পদ্মটি গোপনে হরণ করিলেন। রাম হস্ত প্রসারিত করিয়া পদ্ম না দেখিয়া বিস্মিত হইয়া সংকল্প ভঙ্গের ভয়ে হনুমানকে বলিতেছেন :—"যাও পুনঃ দেবীদহে—আন এক পদ্ম আর।" হনুমান বলিলেন যে, দেবীদহে মাত্র একশত আটটি পদ্ম ছিল, আর নাই। ছলনাময়ী ছলনা করিয়াই পদ্ম হরণ করিয়াছেন, তখন দৃঢ়ব্রত রাম বলিলেন :—

"ভাঁল বুঝিব ছলনা—
মোরে নীলোৎপল আঁখি
সংসারে সকলে ব'লে ;
আনরে লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ,
এক আঁখি দেবী পদ-তলে
অর্পিব এখনি ভাই,
সংকল্প না হবে ভঙ্গ,
দেখি রণ-রঙ্গিণীর রঙ্গ,
কত দুঃখ দেন আর।"

চক্ষু উৎপাটনার্থ বাণ-যোজনার সঙ্গে সঙ্গে সব গোল মিটিয়া গেল। আত্মদানেই দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ হইল। পূজ্য-পূজকের মধ্যে এইখানেই যত গোল। যেখানে আত্মদান নাই, সেখানে ভগবৎ সাক্ষাৎকার বা তাঁহার করুণালাভ অসম্ভব। রামের আত্মদানের সঙ্গে সঙ্গে দেবীর কৃপালাভ ঘটিল। দেবীর সঞ্জীবনী মন্ত্রে প্রাণ পাইয়া রাম নব উদ্যমে যুদ্ধাভিযান প্রস্তুত করিলেন—রাবণ বধ হইয়া গেল।

সহধর্মিণীকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা স্বামীর ধর্ম, তাই সীতাকে বিপন্মুক্ত করিয়া রাম স্বামীর কর্তব্য পালন করিলেন। যে সীতাবিহনে তিনি চতুর্দিক অন্ধকার দেখিয়াছিলেন, ক্ষত-বিক্ষত দেহে রণসমুদ্র পার হইয়া যাহাকে উদ্ধার করিলেন, সেই রামের প্রাণ হইতে প্রিয়তম সীতা তাঁহারই সম্মুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, রামের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। অন্তবিধ সত্য তখন তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার কালে তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যস্থিত 'ক্ষুদ্র হ'তে রহে যেন রঘুবংশ মান' বাক্যটি তাঁহার মানসপটে হাজির হইল এবং দীর্ঘ বিরহের পর পত্নীদর্শনলাভ অপেক্ষা বংশমান তাঁহার কাছে বড় হইয়া গেল। লক্ষ্মণের 'সীতা আসিতেছেন' কথার উত্তরে রাম দৃঢ়প্রতিজ্ঞের মতো বলিলেন—"আসুক জানকী নাহি মম প্রয়োজন।" পরে সীতার উদ্দেশে এই কথাগুলি বলিলেন :—

"শুন শুন জনক-নন্দিনি,
রঘু-বধূ তুমি,
করিলাম দুষ্কর সমর
রাখিতে বংশের মান।
ছিলে দশ মাস রাক্ষসের ঘরে,
অযোধ্যা-নগরে
না পারিব লইতে তোমারে,
না পারিব কুলে দিতে কালি।

যথা ইচ্ছা করহ গমন,—
যাও তব জনক-সদনে, ইচ্ছ যদি।
কিষ্কিন্ধ্যা নগরে সুগ্রীবের ঘরে
থাক গিয়ে যদি সাধ মনে,
কিংবা রহ লঙ্কাপুরে, যথা ইচ্ছা তব।"

রামের এই অদ্ভুত পরিবর্তন দেখিয়া সকলে নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। পরে সর্বসম্মতিক্রমে সীতার অগ্নি-পরীক্ষা আরম্ভ হইলে, সীতা দেবতামণ্ডলীকে সাক্ষী রাখিয়া ও সতীকুলরাণী দাক্ষায়ণীকে প্রণাম করিয়া, মহাগুরু রামের চরণে প্রণতিপূর্বক অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন।

রাম এতক্ষণ সত্যপালনের জন্ত কোনমতে ধৈর্য ধরিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন অগ্নির লেলিহান রসনা কুসুম-নির্মিতা সীতাকে গ্রাস করিল, তখন 'হা-সীতা হা ননীর পুতলি' বলিয়া মূর্ছিত হইলেন। রামচরিত পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, কখন তিনি বজ্রাদপি কঠোর—কখন বা কুসুমাদপি কোমল হইয়া তাঁহার কার্যাবলি সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র রামের এই বৈশিষ্ট্য প্রকৃত নাটককারের স্বষ্টিতে দেখাইয়াছেন।

সীতার অগ্নি-প্রবেশের অব্যবহিত পরেই রামের সীতা-বিরহ পুনরায় জাগিয়া উঠিল এবং তজ্জনিত তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিম্নলিখিত কথাগুলির মধ্যে সুপ্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে :—

"ভাইরে লক্ষ্মণ! আনি দেহ সীতা মোরে,
ধিক্! ধিক্ জন্ম রাজকুলে
কলঙ্কে সতত ডর।
কলঙ্কের ভয়ে ত্যজিলাম প্রাণের বনিতা সীতা!
চলে গেলে জানকী আমার,
কুশাঙ্কুর বিঁধিত চরণে—
দেখিতাম ফিরে ফিরে তিলে শতবার।
দেখ চেয়ে,
পর্বত-প্রমাণ বহ্নি গর্জে নভঃস্থলে;
আর কি পাব রে
কুসুম-নির্মিতা জানকী আমার ভাই।
হা সীতা! হা জানকী আমার!
আরে আরে দারুণ অনল—
এত বল তোর বুকে?
হারানিধি হরিলি আমার।
ফিরে দেহ সীতা মোর,
দেহ মম হৃদয়-রতন—
রামের সর্বস্ব ধন ফিরে দে অনল।
দেখ নাই লঙ্কার দুর্গতি,

এত দর্প তোর, উত্তর না দেহ মোরে ?
আনরে লক্ষ্মণ, আন ধনুর্বাণ,
অনন্ত সলিলে সৃষ্টি ডুবাব এখনি।"

পূর্বোক্ত উন্মাদনার মধ্যে রামের পত্নীপ্রেম শতমুখে উচ্ছলিয়া উঠিয়াছে।

সীতার বনবাস নাটকের রাম

'সীতার বনবাস' নাটকখানি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ প্রতাপ জহুরীর ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এ নাটকের রাম আর বনবাসী নহেন—রাজ্যেশ্বর। সুতরাং প্রজাসত্য তখন তাঁহার প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। রাজার জীবন যে কিরূপ দায়িত্বপূর্ণ, প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে লক্ষ্মণ ও দুর্মুখের কথোপকথনকালে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। রামের প্রজা-বাৎসল্য পুত্র-নির্বিশেষে প্রজাপালনেই পরিসমাপ্ত হয় নাই, রাজ্যের কোন নিভৃত অন্তরালে কোন প্রজা রাজা বা রাজ্যশাসনের প্রতি কোন প্রকারে অসন্তুষ্ট আছে কি না, তাহার অনুসন্ধানের জন্য তিনি গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রামের রাজ্যশাসন নীতি (State policy) অনেকটা সুনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্রের (Bureaucracy) অনুরূপ ছিল। রাম যখন সেই গুপ্তচর প্রমুখাৎ শুনিলেন যে, লঙ্কার অগ্নি-পরীক্ষার পরও সীতা-চরিত্রে প্রজারা কলঙ্ক তুলিতেছে, তখন প্রজাসত্য ও বংশমর্যাদা রামকে উদ্‌ভ্রান্ত করিল এবং নিম্নলিখিত কথাগুলি সহসা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল :—

"ভুবন-পাবন দিন দেব !
তব বংশে রটিল অখ্যাতি।
করি ব্রহ্মবধ আনিনু কলঙ্ক ঘরে ;
স্বয়ংবর-কালে—দর্পে বাহুবলে
চালিনু হরের ধনু,
ভাঙ্গিনু সে ধনুক প্রবীণ—
মৃড়-মৃড় স্বরে ডাকিল শঙ্করে
মহা-শরাসন,
উল্কাপাত হইল ধরায়,
কাঁপিল বসুধা-শির,
হায়, হায়। বিবাহে প্রলয় হেন।
রাজ্যে রাজ্যভ্রংশ, খসিল বংশের চূড়া
দশরথ রঘুবংশোজ্জ্বল ;
যুদ্ধ রক্ষঃসনে, গহন-কাননে
ব্রহ্মবধ সীতা লাগি ;
অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক সীতার তরে।"

ললাটলিপি অবশ্যম্ভাবী হইলেও সে একটা পূর্বলক্ষণ দিয়া যায়। সীতার বনবাসরূপ অদৃষ্টলিপিরও একটা পূর্বাভাব রামের মুখ দিয়া গিরিশচন্দ্র দক্ষ নাটককারের মতো প্রকাশিত করিয়াছিলেন :—

"না বুঝিতে পারি সন্তপ্ত প্রাণের খেলা,
আছি পালঙ্ক উপরে সীতা সনে—
বুঝিতে না পা'রি,
জাগ্রত কি নিদ্রিত তখন ;
দেখিলাম—মন্দোদরী ধরিয়ে তারার কর
পাছে পাছে নিকষা রাক্ষসী—
কহে তিন জনে একস্বরে,—
* * 'সতীনারী তব সীতা'—
সেই ব্যঙ্গস্বর এখন' জাগিছে অন্তরে আমার।"

ইতিবৃত্ত-লেখক কৃত্তিবাস এ অংশে নীরব থাকিলেও চরিত্র-লেখক নীরব থাকিতে পারেন নাই।

দুর্মুখের নিকট হইতে সীতার কলঙ্কবার্তা শুনিয়া অবধি রামের অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়াছিল নাটককার ঐ দ্বন্দ্ব মনস্তাত্ত্বিকের ভাষায় এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"উদ্বেলিত হৃদয় আমার, হও স্থির—
একি ভীষণ তরঙ্গ খেলা।
দুর্গম সমরে বিচলিত চিত হয়নি কখন,
নাগপাশে ছিনু স্থির।
হায় বিধি ! কে বুঝে তোমার লীলা ?
একি বিপরীত ভাব মনে।
মমতায় বিগলিত প্রাণ,
কভু প্রাণ শ্মশান সমান,
হেরি তমাচ্ছন্ন দিকচয় ;
পুনঃ উঠে মনে বিপিনে বিজনে,
কেলি সীতাসনে ;
কি হ'ল, কি হ'ল কলঙ্কে পুরিল দেশ।
(ভূতলশায়িনী সীতাকে দেখিয়া)
মরি মরি কনক-লতিকা
হৃদয়ের হার মম,—
অভাগা রামের নিধি
মরি মরি শুয়েছে ধূলায়।
উঠ উঠ ! ফুল্ল কমলিনী
রাঘব-হৃদয়-মণি,
উঠ উঠ আনন্দ আমার।
গাইছে সঙ্গিনী তব বিহঙ্গিনী সনে,
বহিব কলঙ্ক-ভার,

চন্দ্রানন হেরি ভুলিব হৃদয়-জ্বালা,
আমোদিনী, মেল ফুল্ল আঁখি।"

উপরিস্থ কথাগুলির মধ্যে একদিকে যেমন কবিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে, অন্য দিকে তেমনি রামের তৎকালীন মনের অবস্থা সুকৌশলে ব্যক্ত হইয়াছে।

দাহ্য বস্তু অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষা করিয়া থাকে। দূতমুখে আনীত সীতা-চরিত্রের প্রতি লোকের সন্দেহ বার্তা, রামের নিকট তেমনি প্রমাণের অপেক্ষায় ছিল। রামের উপরি-উক্ত প্রেম-সম্ভাষণের উত্তরে পতি-সংবর্ধনার্থ সীতা গাত্রোত্থান করিবামাত্র তাঁহার অবয়বাচ্ছাদিত রাবণের চিত্র ভূমিতলে অঙ্কিত দেখিয়া রামের সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া গেল। কিছু পূর্বে স্ফুরিত প্রজাসত্য ও বংশমর্যাদা এই ঘটনায় এমনি প্রবল হইয়া উঠিল যে, রাবণের চিত্র অন্য কোন কারণেও যে অঙ্কিত হইতে পারে, এ বিচার করিবার অবসর রামকে আর দিল না।

সীতাকে বর্জন করাই রামের সংকল্প দাঁড়াইল। ইহাতে সীতাময়-জীবন রামের সংসার যাত্রা দুর্বিবহ হইয়া উঠিয়াছিল। জগতের কোন বস্তু তাঁহার ভাল লাগিল না। দণ্ডকবনের ও অযোধ্যার যে সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য সীতার সহানুভূতির সহিত জড়িত হইয়া রামের প্রীতিবর্ধন করিত এখন সে গুলি সীতার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবে ভাবিয়া রামের চক্ষে তাহাদের আর সে মধুরতা রহিল না। তিনি এখন এইরূপ অনুভব করিতে লাগিলেন :—

"দিনকর! স্বর্ণকর তব
আর না দানিবে আনন্দ অন্তরে মম;
হে চন্দ্রমা!
ফুরাল তোমার হাসি!
সুন্দর সরসী—
ঢল-ঢল বিমল-সলিলে
শুকাইল অভাগা-নয়নে।
ফুল্ল সরোজিনী সহ—
ফুরাইল ভ্রমর গুঞ্জন;
ফুরাইল মধুরতা রমণীর স্বরে!
ধরা কারা সম—
সিংহাসন কনক-পিঞ্জর—"

সীতাকে ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া রাম কল্পনা-চক্ষে জাগতিক সৌন্দর্যে এই সব বিপর্যয় দেখিতে পাইলেন এবং ভাবাতিশয্যে তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য নষ্ট হইবার উপক্রম হইতেছে বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ ভাব-লতিকাকে হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য কাঠিন্য গ্রহণপূর্বক লক্ষ্মণকে দৃঢ়তা সহকারে এইরূপ বলিলেন —"রে লক্ষ্মণ, জানকীরে রেখে এস বনে, কলঙ্কিনী জনক-দুহিতা।" স্থৈর্য আসিয়াছে। নানারূপ বাদানুবাদে জানকী-ত্যাগ যুক্তিপূর্ণ ইহাই লক্ষ্মণকে বুঝাইতেছেন, কিন্তু ঐ স্থৈর্যের মধ্যেও মমতা উঁকি-ঝুঁকি দিতে ছাড়ে নাই। নাটককার রামের তখনকার মনের অবস্থা কি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন দেখুন : —

"হায়! হায়! হায়!
কলঙ্ক এ কুলে।
রঘু-কুলে কলঙ্ক রটনা!
সূর্য রাহু-গ্রাসে,
ভস্মরাশি যজ্ঞের অনলে,
রম্যবন প্লাবন কবলে!
হা সীতা—হা মমতার ধন
বিষময় তুমি হেন!
সীতার উদ্ধার লাগি অম্বিকার পদে
অর্পিতে নয়ন তুলিলাম করে বাণ,
সে সীতারে করিব বর্জন
হৃদ্-পিণ্ড ছেদি মহা শরে।
যাও সীতা লয়ে বনে,
কলঙ্ক-আগুনে বাঁচাও হে গুণনিধি।
ওহো কাঁদে প্রাণ ভাইরে লক্ষ্মণ!"

সীতা বিসর্জিতা হইবার পর রামের শূন্য হৃদয়-সিংহাসনে বংশমান ও প্রজাসত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

বশিষ্ঠদেব ঠিকই বুঝিয়াছিলেন যে, সীতাহারা রামের জীবন বেশী দিন স্থায়ী হইবে না, তাই তিনি বলিতেছেন :—

"শক্তিহীন কে রহে চেতন—
শক্তিহীনা অযোধ্যা নগরী,
শক্তিরূপা বিপিন নিবাসী
রাজ্য পরিহরি আজি।"

কিন্তু শক্তিহীনের মধ্যে চৈতন্য শক্তি সঞ্চারিত করিতে হইলে উত্তেজনার আবশ্যক করে। বশিষ্ঠদেব তজ্জন্য নিম্নলিখিত উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যদ্বারা রামের নষ্ট চৈতন্যকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন :—

"উঠ জগৎ গোঁসাই!
উঠ হে লক্ষ্মণ শূর।
রাজকার্য মহাযজ্ঞ
জানকী আহুতি যার।
বাঁধ মন, ধর বীর পণ,
রাখহ বংশের মান—
উদ্‌যাপন করহ কঠিন ব্রত।"

ঋষিবাক্য বিফল হইবার নহে, ঔষধ ধরিয়া গেল। এত অত্যুজ্জ্বল জ্ঞানদীপ রামের কর্তব্যময় জীবন-পথে আর কেহ জ্বালেন নাই। জানকী রাজকার্যরূপ মহাযজ্ঞের আহুতি-স্বরূপ জ্ঞান হওয়ায় রামও মন্ত্রদীক্ষিত অনুগত শিষ্যের মতো গুরু-নির্দেশিত পথে জীবনযাত্রার গতি ফিরাইয়া দিলেন।

বশিষ্ঠের সঞ্জীবনী-মন্ত্রে চৈতন্যলাভ করিয়া রাম অতঃপর বহুবর্ষ ধরিয়া অপত্য-নির্বিশেষে প্রজাপালনদ্বারা রাজধর্ম এবং কলঙ্কিনী-অপবাদগ্রস্তা সহধর্মিণীকে বর্জনপূর্বক নিষ্কলঙ্ক রঘু-বংশের মান উভয়ই রক্ষা করিয়াছিলেন। পূর্বতন রাজ-চক্রবর্তীদের নিয়মানুসারে অশ্বমেধ, রাজসূয়াদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে আদিষ্ট হইলে, ত্যক্ত-পত্নীক রাম কিরূপে তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন জনসাধারণের মনের এই সংশয় সুবর্ণময়ী সীতামূর্তি নির্মাণ করাইয়া রামচন্দ্র মিটাইয়া দিয়াছিলেন। পত্নৈক-প্রাণ রাম কেবল যে, প্রজাসত্য ও বংশমানের খাতিরে পবিত্রা জানকীকে বনবাসিনী করিয়াছিলেন, একথা দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ না করিয়া ঐ মূর্তি-ঘটিত ব্যাপারে তিনি প্রতিপন্ন করিয়া গেলেন।

অশ্বমেধের যজ্ঞাশ্ব লইয়া রামের সহিত লব-কুশের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পর, সেই সংগ্রাম-কোলাহলের মধ্যেও তিনি সীতাকে ভুলিতে পারেন নাই। লব-কুশের নয়নের সহিত সীতা-নয়নের সাদৃশ্য দেখিয়া রাম উহাদের উপর ব্রহ্মজাল-অস্ত্র নিক্ষেপ করেন নাই।

যুদ্ধান্তে যজ্ঞস্থলে বাল্মীকি প্রমুখাৎ রাম শুনিলেন লবকুশ তাঁহারই ঔরসজাত সন্তান এবং সীতা বাল্মীকির আশ্রমেই প্রতিপালিতা হইতেছেন। বাল্মীকির এবংবিধ কথায় রাম লব-কুশকে ক্রোড়ে লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে বাল্মীকি সীতাকে সভাস্থলে আনিবার জন্য পুষ্পকরথ পাঠাইবার আদেশ দিয়া রামকে বলিলেন যে এ-দুটি দুঃখিনী সীতার ধন, এবং মাত্র তিনিই এদের তোমার করে সমর্পণ করিতে পারেন। আমার এই শিশু শিষ্যদ্বয় সংগীতবিদ্যায় কিরূপ পারদর্শিতা-লাভ করিয়াছে উপস্থিত তাহার পরীক্ষা হোক্। বাল্মীকির ইঙ্গিতে সভামণ্ডপ তখন কুশীলবের 'গাও বীণা গাওরে' শীর্ষক রামায়ণ গানে মুখরিত হইয়া উঠিল। রামভক্তগণ গীতিচ্ছন্দোচ্চারিত জানকীরামের গুণগ্রামে হৃদয়ে অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। সাহানা-রাগিনীর মিলন-সুর সহসা "কাঁদ বীণা কাঁদ রে, গর্ভবতী সতী সীতানারী বর্জ্জন" শীর্ষক গানের অংশে আসিয়া বেহাগ-রাগিণীর করুণসুরে বাজিয়া উঠিল। রামের চিন্তাস্রোত তাহাতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি ঐ সংগীত বন্ধ করিয়া দিলেন।

লক্ষ্মণ ইত্যবসরে সীতা-সমভিব্যাহারে সভাতলে উপনীত হইলেন; সীতাকে দেখিয়াই রাম সহসা চিন্তামগ্ন হইলেন, কিন্তু রামের এবারের চিন্তা বিশেষ বেদনাপূর্ণ ছিল; কারণ গত অগ্নি পরীক্ষার অবস্থা তাঁহার স্মৃতি-পথে আরূঢ় হওয়ায় রামকে অধিকতর কাতর দেখা গিয়াছিল। সীতা দেখিলেন যে, তাঁহার উপস্থিতিকে লক্ষ্য করিয়াও রাম নীরব রহিয়াছেন, তাই তিনি বলিলেন:— "নাথ কেন নাহি শুনি শ্রীমুখের বাণী প্রভু!" রামের আলোড়িত হৃদয়াবেগ প্রধাবিত হইবার সুযোগ খুঁজিতেছিল, সীতার কথায় সেই বেগধারা নিম্নলিখিত কথার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল:—

"প্রিয়ে। চাহে প্রাণ বাহু প্রসারিয়ে
লই হৃদে হৃদয়ের নিধি,
হৃদি-বেগ করি সংবরণ।
ডরি প্রাণেশ্বরী মন্দভাষী জনে,
লঙ্কাপুরে দেখিল অমর-নরে
অগ্নির পরীক্ষা তব।

মন্দ লোকে সন্দ করে তায়,
কহে ছায়াবাজী—পরীক্ষা সে নয়।
আজি পুনঃ অযোধ্যা নগরে
দেহ সে প্রমাণ সতি,
কর প্রাণেশ্বরি রবিকুল মুখোজ্জ্বল।"

উপরিউক্ত কথায় পর সভাসদ্ পরিবেষ্টিত রাম সীতার পরীক্ষা দর্শনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। সীতা কিন্তু সকলের কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়া জননী মেদিনীর ক্রোড়ে আত্ম-বিসর্জন করিলেন। এই আকস্মিক ঘটনায় সকলেই কিং-কর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া গেলেন। লব-কুশ কাঁদিতে লাগিল। রাম স্তব্ধীভূত অবস্থায় কলের পুতুলের মতো লব-কুশকে রোদন-সংবরণ করিতে বলিয়াই যখন বুঝিলেন যে জানকী বাস্তবিকই তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার শোকের অবধি রহিল না। দ্বিধা-বিভক্ত মেদিনী সীতাকে গ্রাস করিয়াছে দেখিয়া বসুমতীকে উদ্দেশ করিয়া রাম বলিলেন :—

"বসুমতি! দেহ সীতা ফিরে,
চির দুঃখী রাম,
হ'য়ো না নিঠুর, দেহ গো উত্তর
বাঁচাও রাঘবে ধরা,
দেহ ত্বরা জানকী আমার!"

অনুনয় বিফল হইল। বসুমতীকে নিরুত্তর দেখিয়া শোকোন্মত্ত রামের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন :—

"এত দর্প না! দেহ উত্তর,
সকাতরে ডাকি আমি!
তুলেছিনু বাণ আমি বিন্ধিতে সাগরে,
সীতাহরণের দোষে মরেছে রাবণ,
আন রে লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ,
কাটিয়া মেদিনী করিব রে খান্-খান্॥"

ক্রোধ যে নিরর্থক নহে, তাহার একটা যুক্তি ঐ কথা কয়টির মধ্যে রাম দেখাইলেন। আত্ম-বিস্মৃত রাম শোকাভিভূত অবস্থায় লক্ষ্মণকে ধনুর্বাণ আনিতে আদেশ করিলেন, লক্ষ্মণ অন্যবারের মতো নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া ত্রস্ত-পদে রামের আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। এরূপ করিবার কারণ কি? লঙ্কা ব্যাপারে লক্ষ্মণের মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, পাবকশিখারূপিণী জানকীকে অনল ভস্মীভূত করিতে পারিবেন না—কারণ অনলের ভক্ষ্য অনল হয় না। সুতরাং শোকোন্মত্ত রামের তৎকালীন ধনুর্বাণ আনিবার আদেশ উন্মত্তের প্রলাপ ভাবিয়া তিনি মান্য করেন নাই। এবারে কিন্তু লক্ষ্মণ নিজেই প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, কারণ তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে, অবমানিতা সীতা ধরাবক্ষে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন, আর ফিরিবেন না, তাই দুঃখ ও ক্ষোভে বিমনা থাকায় অবিচারে রামের আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। রামও এই অবসরে ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া বলিলেন :—

"শুন বাণ! যদি গুরুপদে থাকে মতি,
পূজে থাকি আত্মাশক্তি ভগবতী,
বিদ্ধ আজ মেদিনীরে—
সপ্ত-তল কর ভেদ, যাও যথা জনক-নন্দিনী!
বধ যেবা হয় বাদী,
আন সিংহাসন সহ শিরে লয়ে॥"

ব্রহ্মা দেখিলেন আত্ম-বিস্মৃত রাম বুঝিবা প্রমাদ ঘটান, তাই তৎক্ষণাৎ তথায় আবির্ভূত হইয়া শূন্যে কমলাসনে লক্ষ্মীরূপা সীতাদেবীকে দেখাইয়া রামকে 'রাখ সৃষ্টি সৃষ্টির পালন, হেরি নিজ মায়া মায়াময়' বলিয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন।

লক্ষ্মণ-বর্জন নাটকের রাম

লক্ষ্মণ-বর্জন নাটকখানি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বীডন্‌স্‌ট্রীটস্থ প্রতাপ জহুরীর ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এ নাটকের রাম জীবন নাটকের শেষ অঙ্কে উপনীত হইয়াছিলেন। রাম-চরিত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইবার কালে রাম তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন যাত্রার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণকে বিসর্জন দিবার পূর্ব পর্যন্ত সে প্রতিজ্ঞার প্রায় সমস্তটাই পূর্ণ করিয়া লইয়াছিলেন। কেবল প্রতিজ্ঞান্তর্গত—

"ব্রাহ্মণ সজ্জন সুধীর সচিবগণে
গুরুজনে নমস্কার মম,
প্রসাদে সবার
পারি যেন করিবারে পিতৃ-মুখোজ্জ্বল"

কথাগুলির মধ্যগত 'ব্রাহ্মণ-প্রসাদে পারি যেন করিবারে পিতৃমুখোজ্জ্বল' বাক্যাংশের অপরোক্ষ প্রমাণ আমরা এ পর্যন্ত পাই নাই। পরোক্ষভাবে ব্রাহ্মণ সত্য-পালনের উল্লেখ মাঝে মাঝে থাকিলেও প্রত্যক্ষভাবে উক্ত অনুষ্ঠানের কোন কার্য দেখিবার সুযোগ পাঠক বা দর্শকের ঘটে নাই। তাড়কা-নিধনকালে বিশ্বামিত্রের আজ্ঞা পালন, রামের পিতৃ আজ্ঞাধীন প্রথম জীবনে ঘটিয়াছিল, সুতরাং পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞার পূর্বেই তাহা সম্পাদিত হইয়াছিল। বক্ষ্যমান নাটকই ব্রাহ্মণ সত্য-পালনের প্রশস্ত ক্ষেত্র।

রামের আত্ম-বিস্মৃতি লোপ করিয়া তাঁহার জাগরণকে পাকা করিবার জন্য ব্রহ্মা যে কৌশলজাল বিস্তার করিতেছিলেন, লক্ষ্মণ-বর্জন নাটকের প্রথম দৃশ্যে কালপুরুষ ও ব্রহ্মার সংলাপের মধ্যে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

রাবণ-নিধনের জন্য রামাবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল। রাবণ-বধের পর ব্রহ্মা দেখিলেন যে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। আত্ম-বিস্মৃত রামের সংসার-বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল করিবার জন্য সীতার বনবাস-ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছিলেন, তাই অন্তর্বত্নী জানকী বনবাসিনী হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন যে সীতাকে এখন অবনী-তল হইতে সরাইতে না পারিলে রামের গোলোক-প্রত্যাবর্তনের বিলম্ব হইবে, তাই বনবাসান্তে সীতার পাতাল প্রবেশ বিধিলিপি করিয়াছিলেন। রাজ সভাতলে

সর্বসমক্ষে আপনার সতীধর্মের মহিমা দেখাইয়া সীতা মেদিনীগর্ভে আত্ম বিসর্জন করিবার পর ব্রহ্মা রামের জীব-লীলা শেষ করাইবার উদ্দেশ্যে কালপুরুষকে রাম-সন্দর্শনে পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কালপুরুষ তাই ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"কহ বিধি, এ কি হে নিয়ম তব,
এ খেলা বুঝিতে নারি মূঢ় আমি।
অঙ্কুরিত পরমাণু দীপে ভানুরূপে,
ছোট রেণু—ব্রহ্মাণ্ড বিকাশ (তাহে) ;
পুনঃ কোন প্রাণে, আজ্ঞা দেহ মোরে,
নিভাইতে উজ্জ্বল তপনে,
কহ হলে ঘটাতে প্রলয়!
তব অনুগামী,
নহি কোন দোষে দোষী, আমি,
তবে কি হেতু হে পদ্মযোনি,
দেহ দাসে কলঙ্কের ভার ?
হের, সপ্তদ্বীপ ধরা, রাম-রাজ্যগত,
আঁখি-বিনোদন নন্দন-গঞ্জন শোভা,
রাম-বিনা হইবে শ্মশান।"

ব্রহ্মা তদুত্তরে বলিলেন.

"শুন, তত্ত্ব—
দেখিছ যে বিপুল-ব্যাপিনী শোভা,
শবদেহ সম অচেতন,
শক্তিহীনা জনক-নন্দিনী বিনা!
উদিল যামিনী,
কহ, ভানুর কি প্রয়োজন তবে ?
বুঝ চিত্তে হে কালপুরুষ
আড়ম্বরে নাহি সার।

যেই প্রজাহেতু—
জনক-নন্দিনী বিসর্জিলা ভগবান,
সেই সূর্যবংশ সিংহাসন,
সিংহাসনে বসি সনাতন,
শুন তবু প্রজার রোদন—
শুন রোদন-সঙ্গীত
বিচঞ্চল অনিল যাহার।

হাটে-ঘাটে-বিপিনে-কান্তারে
পথে-মাঠে গোঠে
কাঁদে 'হা সীতা—হা সীতা' ব'লে,
অন্ন ঘরে—অন্ন নাহি খায়,
সন্তানের মুখ নাহি চায়,
পতি সতী না সম্ভাষে পরস্পরে
পাখী নাহি গায়, সলিল শুকায়,
নিরানন্দ উপবন।"

সীতার বিরহে রোরুদ্যমানা প্রকৃতির চিত্রটি গিরিশচন্দ্র যেরূপ দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন তাহা বড়ই মর্মস্পর্শী। বিশ্বের এই অব্যক্ত রোদন ইহাপেক্ষা অন্তর্দাহিনী ভাষায় তাঁহার পূর্বগামী কোন বাঙ্গালী নাটককারই প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এ-তো গেল সর্বসাধারণের শোক! রাম এই শোকে কি করিতেছেন? 'হের রাজীবলোচন দীনমনে ধরাসনে,। যে প্রজারঞ্জক রামকে সিংহাসনে বসাইয়াও প্রজারা তৃপ্ত হইতে পারে নাই, সেই রাম আজ 'ধরাসনে', জানকী ধরাবক্ষে প্রাণবিসর্জন করিয়াছিলেন বলিয়াই বুঝি-বা রাম 'ধরাসন' আর ছাড়িতেছেন না! মহাবীর লক্ষ্মণ কিরূপ? 'অশক্ত অনন্ত শক্তিধর'। রামলক্ষ্মণ লইয়াই ত্রেতাযুগের মাহাত্ম্য, তাঁহারা যখন শক্তি-হীন হইয়া পড়িয়াছেন, তখন যুগ-লয় অবশ্যম্ভাবী; বিশেষতঃ সীতাময়জীবন রামের সীতাহীন প্রাণ বেশীদিন স্থায়ী হইবার নহে, তজ্জন্য নাট্য-কবি ব্রহ্মার মুখ দিয়াই বলাইতেছেন:— 'ব্রহ্মদিবা ফুরায় ফুরায়, যুগ লয় হইবে সত্বর।'

ত্রেতায় সূর্যবংশের গৌরবের পর দ্বাপরে চন্দ্রবংশের গৌরব আরম্ভ হইয়াছিল, তাই নাট্য-কবি বলাইতেছেন—'আসিবে রজনী, হাসিবে মেদিনী—শশধর দরশনে, এ গগনে ভানু নাহি শোভে,— ব্রহ্মা কালপুরুষকে অধ্যাত্ম-তত্ত্বের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে আরও বলিলেন:—

"হের, স্পর্শ করি মোরে,
করি স্থান পান ধাইতেছে মহাকাল
জ্যোতিঃমাঝে আপনি হইতে লয়,—
কার্যফল আপনি ফলিছে
নিমিত্তের ভয় কিবা তায়?"

ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ হইতে উদ্ভূত স্থান বা কাল পরস্পর পরস্পরকে গ্রাস করিয়া মহাকাল-কবলিত হইতে চলিয়াছে, এবং ঐ মহাকাল নিজেই ব্রহ্ম-জ্যোতিঃতে বিলীন হইবে। এই কার্যগুলি কার্য-কারণ নিয়মে আপনা হইতেই ফলিতেছে, সুতরাং রামকে জগৎ হইতে সরাইবার জন্য তুমি নিমিত্তের ভয় করিতেছ কেন? বিশেষত:—

"পতিব্রতা-শাপে
আপনা-বিস্মৃত নারায়ণ,
টুটিবে সে মোহ তব দরশনে।
যাও আশুগতি লোক-হর,

সন্ন্যাসীর বেশে,
কর গিয়ে রাম দরশন—
সাধুজনে না নিন্দিবে তোমা।"

কালপুরুষের সহিত ব্রহ্মার পূর্বোক্ত কথোপকথন ব্রহ্মলোকেই হইয়াছিল। লক্ষ্মণ-বর্জনের সময় মর্ত্যবাসীর কাছে সীতা-বিরহজনিত শোক অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হইলেও তাহার প্রাখর্য তখনও নষ্ট হয় নাই। নাটককার সেই ব্রহ্মলোকস্পর্শী শোকের একটি চিত্র দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখাইয়াছেন। করুণ-সংগীতের তীব্রতা সহ্য করিতে না পারিয়া রাম লব-কুশের রামায়ণ-গানের শেষাংশ অসম্পূর্ণ রাখিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে ঐ পরিত্যক্তাংশই এখন অযোধ্যার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রিয় হইয়া উঠিল, কারণ নিবারণ করিবার আর কেহ রহিল না—সকলেই শোকে সমাচ্ছন্ন। তাই 'কাঁদ বীণা কাঁদ রে' সংগীতটি অযোধ্যার গ্রামে ও নগরে সর্বত্র উচ্চকণ্ঠে গীত হইতে লাগিল।

মানুষের জীবনে দেখা গিয়াছে যে, যখন কোন মঙ্গল বা অমঙ্গল সম্মুখীন হইয়া আসে, তৎ-সম্বন্ধীয় একটা ছবি পূর্ব থেকেই মানুষের মানস-পটে হাজির হয় coming events cast their shadows before), কালপুরুষ সন্দর্শনলাভের অব্যবহিত পূর্বেই রামের মনে নাটককার ঐরূপ একটা ভাবোদয় করাইয়াছিলেন। রামকে তাঁহার লীলাবসানের কথা এবং তিনি যে কেবল অযোধ্যার দেবতা নহেন—ত্রিকালের ও ত্রিলোকের দেবতা—এই সব কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য কালপুরুষ রাম-সন্দর্শনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই রামের আত্ম বিস্মৃতি কাটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং তাহার নিদর্শন নাটকের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। রাম মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন :—

"কহ নারায়ণ!
কত দিন দেহভার আর,
কতদিন মোহ,
কতদিন জানকী-বিরহ সহি।
খোল দৃষ্টি নারায়ণ—
কার্য কার্য কার্য,
কার্য বিনা নহে মোহ দূর;
* * *.
কার্যে গভবতী শাপে আপনা বিস্মৃত;
কার্যে জানকী-বর্জন,
কার্যে পুনঃ ধরিব চরণ—
বৃন্দাবনে গোপ বালা রাধিকার;
কার্যে লক্ষ্মণে ত্যজিব,
দ্বাপরে পূজিব বলরামে,
কার্যে বালিবধ,
বধিবে অঙ্গদ ব্যাধরূপে পুনঃ মোরে;

কার্যে ক্ষত্রকুলক্ষয়, যতুকুল লয়,
চৈতন্য-উদয় স্থাপিতে তারিতে ভবে।"

এই কথাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কালপুরুষের আগমন-ব্যপদেশে রামের কেবল যে মোহ কাটিয়াছিল, তাহা নহে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভবিষ্যদৃষ্টি পর্যন্ত খুলিয়া গিয়াছিল। তাহা না হইলে যুগ-ত্রয় ঘটিত কার্যের ঐরূপ অদ্ভুত বর্ণনা তিনি করিতে পারিতেন না। এমন কি, অতি শীঘ্র সম্পাদ্য লক্ষ্মণ-বর্জন পর্যন্ত তাঁহার আর অজ্ঞাত রহিল না। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আসিয়া কালপুরুষ রামের সহিত গোপন সাক্ষাৎ কামনা করিলে পর, রাম লক্ষ্মণকে তাঁহাদের নির্জন আলাপের প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। কালপুরুষ বুঝিয়াছিলেন যে রামের ভবলীলার শেষ আকর্ষণ লক্ষ্মণকে সরাইতে না পারিলে হয়তো বা লীলাবসানের আরও কিছু বিলম্ব হইতে পারে; তাই তিনি রামকে এইরূপে সত্যবদ্ধ করাইলেন যে, তাঁহাদের এই গোপন আলাপের সময় যে কেহ গৃহ-প্রবেশ করিবে তাহাকেই তিনি বর্জন করিবেন। সত্যবদ্ধ রাম ব্রাহ্মণের অভিসন্ধি বুঝিয়া বলিতেছেন—

"ভাল দ্বিজ, উচ্চ আশা পুরাব তোমার।
হে লক্ষ্মণ, পিতৃসত্য-পালন দোসর!
আইস, রহ প্রহরী দুয়ারে,
দেখো, সত্য নাহি নড়ে মম,
বিপ্রকার্যে বিঘ্ন নাহি ঘটে।"

এদিকে দুর্বাসা ব্রহ্মার আদেশে অযোধ্যায় আসিয়া দ্বারী লক্ষ্মণের কাছে রামের সহিত শীঘ্র সাক্ষাতের প্রয়োজন জানাইলে লক্ষ্মণও রামের নিষেধাজ্ঞার কথা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, কিন্তু যাহা বিধি-লিপি, তাহা অন্যথা হইবার নহে। ক্রোধী তাপস অনুনয়-বিনয়ে শান্ত হইলেন না, বরং উদ্দীপ্ত হইয়া অযোধ্যাপুরী ধ্বংস করিতে চাহিলেন। লক্ষ্মণ অযোধ্যার পরিবর্তে নিজ জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মনে মনে বলিলেন—'অযোধ্যার হেতু রাম বর্জিল সীতায়, রাখিব অযোধ্যাপুরী আত্ম বিসর্জনে।' দেশাত্মবোধের ইহাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে, অবিচলিত-চিত্তে দুর্বাসাকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মণ রাম-সমীপে উপনীত হইলেন। দুর্বাসার উপবাস-জনিত পারণের কথা শুনিয়া কালপুরুষ সন্দর্শনের পর প্রকৃতিস্থ ও ত্রিকালজ্ঞ রাম বুঝিলেন যে, ইহা তপোধনের ছল মাত্র, তাই দুর্বাসাকে বলিতেছেন:—

"রুদ্র-অংশে তুমি তপোধন!
ক্ষুদ্র আমি কি সাধ্য আমার
নিবাইতে বৎসরের ক্ষুধানল তব,
নিজগুণে ভক্তিবারি পানে
তৃপ্ত না হইলে ঋষিরাজ?"

এই সাক্ষাতের অবশ্যম্ভাবী ফল লক্ষ্মণবর্জন বুঝিতে পারিয়া রাম লক্ষ্মণ গুণ-গরিমায় উৎফুল্ল হইয়া দুর্বাসাকে বলিলেন—

"রুদ্রদেব! বহু স্থানে গমন তোমার,
ভাই ভাই দেখেছ অনেক,

দেখেছ কি কভু হেন ছায়া সম সাথী
মম প্রাণের লক্ষ্মণ সম ?
দাসে দেব কোরো না বঞ্চনা ?"

এই পর্যন্ত বলিয়া রঘুনাথ ক্ষান্ত হইলেন এবং উভয় দূতের আগমনের কারণ লক্ষ্মণকে বুঝাইবার জন্য এইরূপ বলিতে লাগিলেন :—

"দেখ চেয়ে ব্রহ্মার প্রেরিত অন্য দূত—
তপোধনে ! চেন কি পুরুষে ?
দেখ চেয়ে ভাই রে লক্ষ্মণ !
মোহ দূর মূরতি ভীষণ,
নিত্য ক্রিয়া জীব স্থলে ;
বদ্ধ মোহ-পাশে, টুটে মোহ ত্রাসে,
বিলাসী চমকি চায় ;
হাসি' সাধুজন, করে আলিঙ্গন
মায়া-বিভঞ্জন মহাকায়,
অমু ত্রিভুবন, কম্পিত তপন
যার ভয়ে কাঁপে ব্যোম,—
জীবক্ষয় কাল, হের সম্মুখে উদয়,
ব্রহ্মদূতরূপে আজি।
দেখ ব্রহ্মদূত—রুদ্রতেজ তপোধন।
হের উচ্চ সমাগম অযোধ্যায় আজি,
সুলক্ষ্মণ লক্ষণে বুঝহ,
উচ্চ কর্ম এ সবার,
সত্যবান্ বুঝ সত্য স্রোত।
রহ নিজ গৃহে—
ঋষিরাজ সেবিয়ে ভেটিব তোমা।"

উপরিউক্ত বাক্যে প্রতিপন্ন হইল যে ব্রাহ্মণ-সত্যপালনরূপ কর্তব্য তখন রামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং লক্ষ্মণই সেই সত্য-সাগর-পারের একমাত্র তরণী। পাছে মোহবশে লক্ষ্মণ উক্ত সত্য-পালনে ইতস্ততঃ করেন, তজ্জন্য রাম প্রথমে নিজ-পক্ষে কালপুরুষের আগমনের কারণ কি তাহা লক্ষ্মণকে বুঝাইয়া, পরে লক্ষ্মণপক্ষে তপোধনের উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত করিলেন। লক্ষ্মণ যাহাতে অকুণ্ঠিত-চিত্তে তাঁহার বর্জন-সংবাদ গ্রহণ করিতে পারেন, তজ্জন্য পূর্ব থেকে লক্ষ্মণকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছিলেন।

কালপুরুষ বিদায় চাহিলে রাম তাঁহাকে নিজ দেহত্যাগ-সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন—'কার্যপূর্ণ সরযূর নীরে।' পরে দুর্বাসাকে বলিতেছেন :—

"তমোগুণে তুমি তপোধন !
অযোধ্যার সার দ্রব্য অর্পিনু তোমারে

নিভাইতে ক্ষুধানল তব,
তমোগুণে অনন্ত অনল
সরযু-সলিলে
দেহ দিবে দক্ষিণা চরণে।
এবে তৃপ্ত হও দেব,
ভক্তি-অর্ঘ্য করি দান,'

বলিয়া রাম—

"ব্যোম্-ব্যোম্ ব্যোম্ রুদ্রেশ্বর
ব্যোম্ দিগম্বর ;
অংশে পূর্ণ বিরাজিত,
ব্যোম্ তমোময় ব্যোম্ ভূতক্ষয়
জয় জয় মহাকাল !"

ইত্যাদি বাক্যদ্বারা রুদ্রেশ্বরের ও তমোগুণী দুর্বাসার স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবান্তে প্রার্থনা করিতে-ছেন —'এসো তমোগুণে প্রদীপ্ত আগুনে জ্বালাও প্রবল মোহ।' এই উপাসনা প্রসঙ্গে রাম এতই তন্ময় হইয়াছিলেন যে তমোগুণীর আরাধনা করিতে করিতে বিশ্ব সংসার তমোময় দেখিয়াছিলেন এবং ভাষাও তদনুরূপ হইয়া 'তমঃ—তমঃ' শব্দে উচ্চারিত হইল। তমঃ যখন আসিয়াছে, তখন তমের সংহারকার্য বাকি থাকিবে কেন ? তাই রাম বলিয়াছিলেন - 'দেহ শূল, ভেদি নিজ হৃদি !'

স্তবান্তে তুষ্ট হইয়া দুর্বাসা চলিয়া গেলেন। রাম মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া নিজ জীবন পর্যা-লোচনার অবসর পাইলেন। ঈশ্বরাবতার নিজ জীবনের কার্য-পরম্পরা দ্বারা জীবকে কর্তব্যনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দেন। রামের নিম্নলিখিত চিন্তাধারার মধ্যে সে তথ্য প্রকটিত হইয়াছে :—

"ধরি দেহ, দুঃখ-সুখ সহিনু সকলি।
হে প্রিয় সন্তান নর,
মায়াঘোরে গর্ভবতী-শাপে
কাঁদিনু জনম লভি,
চারি অংশে সহিনু বেদনা
বুঝিতে যন্ত্রণা তব।
হে মানব, হের মেদ-অস্থি নির্মিত এ কলেবর,
রোগ-শোকাগার অন্ত দেহ সম,
মর্মে বাজে সম ব্যথা,
কিন্তু প্রেমে জয় রিপু মম,
তাপপূর্ণ দেহ—সুখাগার প্রেমে।
হে সুজন, জনস্থলে হের লীলা মম—
বাল্যকালে হেরি শশী—
পরাণ উদাসী, উল্লাসে ভাসিয়ে

চাহিনু চাঁদের পানে,
আধ-ভাষে কহিনু মায়েরে
ধ'রে দিতে সুধাকরে—
হেরি বারি-পাত্রে চাঁদে, ধাইনু ধরিতে,
ব্যগ্র চিত্তে সলিল পরশি,
কোথা শশী, বিচঞ্চল জল !
কাঁদিনু জননী-মুখ চাহি ;
কাঁদি কিন্তু বুঝিনু তখনি
শশী সুধাকর নীলাম্বরে—
করে তারে ধরিতে নারিব,
কাঁদিব চাহিব যত !"

ইহার ভাবার্থ এই যে, সৌন্দর্য পিপাসু মানুষ জাগতিক নশ্বর সৌন্দর্যের পশ্চাতে ফিরিয়া আশাহত হইতেছে বটে, কিন্তু দীপালোকভ্রান্ত পতঙ্গের মতো পুনরায় তাহাতেই পুড়িয়া মরিতেছে। রাম বলিতেছেন এরূপ করিলে চলিবে না। জলপাত্রে শশীর প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহাকে শশী-ভ্রমে ধরিতে যাইলেই ক্ষুব্ধ হইতে হইবে। শশীকে ধরিতে হইলে যেমন নীলাম্বরে উঠিতে হয়, সেইরূপ প্রকৃত সৌন্দর্য উপভোগ করিতে হইলে সকল সৌন্দর্যের আধারভূত জগদীশ্বরকে ধরিতে হইবে। যে সকল নশ্বর জাগতিক সৌন্দর্য অবিনশ্বর ঐশ্বরিক সৌন্দর্যের কণামাত্র পাইয়া লোকের বিভ্রম উৎপাদন করিতেছে, তাহারা সেই মূলেরই প্রতিবিম্ব মাত্র।

সত্যপ্রেমিক রামের সমুদয় কার্য প্রেমপূর্ণ ছিল, তাই তিনি বলিয়াছেন সংসারে ভ্রাতৃপ্রেম পাইতে হইলে নিজেকে ভ্রাতৃপ্রেমিক হইতে হইবে। ত্যাগের দ্বারাই পূর্ণতা আসে। এবংবিধ চিন্তায় রামের মন যখন সমাচ্ছন্ন তখন বশিষ্ঠদেব সেখানে উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ-বর্জন সম্বন্ধে তাঁহার কি অভিমত রাম তাহা জানিতে চাহিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। বশিষ্ঠদেবকে এত শীঘ্র সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে দেখিয়া রাম গৃহীর মনোব্যথা তাপসের প্রাণে জাগাইবার জন্য লক্ষ্মণের গুণ-গরিমার ব্যাখ্যান দিলেন। শোচ্যের গুণগ্রামের ব্যাখ্যান-দ্বারা তৎপ্রতি মমতা-প্রকাশই শোকের ধর্ম। লক্ষ্মণের প্রতি বশিষ্ঠের মমতা জাগাইতে গিয়া রাম নিজেই কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন দেহীর শোক নররূপী রামকে আশ্রয় করিল। দেহী মাত্রেই শোকাধীন—অপ্রাকৃত দেহী শোক হজম করিতে পারেন, প্রাকৃত দেহী তাহা পারে না, এই মাত্র প্রভেদ।

বশিষ্ঠ রামের কথায় এইরূপ বলিলেন :—

"তব ন্যায়-স্রোত বহে অন্তরে-অন্তরে।
যেবা তব চরণ সেবিবে, তোমারে বুঝিবে,
তোমা না ডরিবে আর।
কি ভার তাহার প্রভু সত্য হেতু ত্যজিতে তোমায় ?
ত্রেতা যুগে সত্য লোপ এক পাদ,

তবু সত্যাশ্রয়ী মানব, সম্পদ·
দেখাবে বর্জ্জন-গুণে,
এ সম্পদে চাহ চির-অনুগত জনে
বঞ্চিতে হে দয়াময়!
এ কি ন্যায় তব, ন্যায়বান্?

*   *   *

গৌরব বাড়াতে গতি যার তব পদে,
হে বিপুল গৌরব!
বিপুল গৌরব দান হে অনুজে তব,
দেহ অযোধ্যা-রক্ষণ, সত্যের পালন,
লোক-আকিঞ্চন পদ পদাশ্রিতে কল্পতরু!"

যেমন শিষ্য, তেমনি গুরু বটেন। গুরু রামের প্রাণের কথারই প্রতিধ্বনি করিলেন। রাম মুখে যাহাই বলুন, অন্তঃকরণ তাঁহার ন্যায়পূর্ণ ছিল। রাম বুঝিলেন যে শোকের প্রাবল্যে যদি লক্ষ্মণ বর্জন না করি তাহা হইলে লক্ষ্মণ যে, এ যাবৎ তাঁহার প্রতি নিঃস্বার্থ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে তাহার প্রতিদান করা হয় না, উচ্চ সম্পদ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা হয়। স্বার্থপর জীবেরাই এরূপ করিয়া থাকে। শোকের কাতরতা রামকে তখনও একেবারে ছাড়ে নাই। বশিষ্ঠদেব তাহা বুঝিয়া মনে মনে স্থির করিলেন এইবার উপযুক্ত ঔষধ দিব, তাই বলিতেছেন :—'ভবত্রাণ। পল ব'য়ে যায়।'—হে ভবের ত্রাণকর্ত! তোমার ব্রাহ্মণ সত্য-পালনের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। সত্যযুগের পর ত্রেতায় সত্যপালনই রামাবতারের মূলমন্ত্র ছিল। রাম তৎক্ষণাৎ ঐ সত্যপালনের জন্য লক্ষ্মণ সমীপে উপস্থিত হইয়া বিনাড়ম্বরে বলিলেন :—

"ভাই মনোভাব নিরখ' বদনে গুণধর!
পাষাণে না দান প্রেম আর—
সত্যমূর্তি প্রস্তর গঠন!"

ইঙ্গিতজ্ঞ লক্ষ্মণ রামের ইঙ্গিত বুঝিলেন। লক্ষ্মণ বর্জিত হইলেন। গিরিশচন্দ্রের রামায়ণসম্পর্কিত দৃশ্যকাব্যের নায়ক চরিত্রের সব কথাই প্রায় বলা হইল।

পরিজন-সমভিব্যাহারে রাম এখন দেহ-বিসর্জনের জন্য সরযু-তীরে দাঁড়াইলেন। তাড়কাবধ ও লক্ষ্মণবর্জনের দ্বারা ব্রাহ্মণসত্য, বনগমন দ্বারা পিতৃসত্য, বালিবধ দ্বারা মিত্রসত্য, রাবণ-বধ দ্বারা দেবসত্য, সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও দেহত্যাগ দ্বারা বংশমান-সত্য, সীতার বনবাস দ্বারা প্রজাসত্য যথা-রীতি পালন করিয়া রাম তাঁহার জীবন-ব্রত প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিলেন। মাত্র কালপুরুষের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন নিজ দেহ বিসর্জন দিয়া সেই প্রতিজ্ঞাপূরণ করিতে আজ নদী-গর্ভে দাঁড়াইলেন। চুম্বকের সহিত লৌহের যেরূপ সম্বন্ধ রামের সহিত তাঁহার পরিজনবর্গেরও সেই সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল এবং সেই আকর্ষণ-বলেই তাঁহারাও রামের অনুগমন করিয়াছিলেন। রাম কাহাকে আহ্বান, কাহাকে বা বিদায় দিতেছেন। মধুময়ের সকল কাজই মধুময়। আহ্বান বা বিদায়ের ভাষা কি মর্মস্পর্শী!

মাতৃগণকে আহ্বান করিয়া প্রথমে কৌশল্যার প্রতি :—

"মাগো অশেষ যন্ত্রণা
পেয়েছ জননী তুমি—
গর্ভে ধ'রে এ সন্তানে,
চির ঋণী জননী তোমার আমি,
এ পরমকালে কহি জনস্থলে
মাতৃ ঋণ নাহি যায় শোধ,
লয়ে কোলে সরযূ-সলিলে
রেখ মা অভয়া পায়।"

কৈকেয়ী উদ্দেশে— "কেকয়ী-জননী কীর্ত্তিস্তম্ভ-মূল মম
রাম ব'লে কোলে নে মা ছেলে ;"

সুমিত্রা উদ্দেশে— "সুমিত্রা-জননী নয়নের মণি-তব,
দিছি ডালি এ সলিলে,
চল দেখি কোথায় লক্ষ্মণ।"

ভরত ও শত্রুঘ্ন উদ্দেশে- "ভাইরে ভরত, ভাই শত্রুঘ্ন,
চল অন্বেষণ করি হারানিধি,
সুলক্ষণ লক্ষ্মণে আমার।"

সুগ্রীব উদ্দেশে— "হে সুগ্রীব-মিতা কপি সেনা সনে
চল যম-জয়ী রণে।"

এই পর্য্যন্ত আহ্বান, এইবার বিদায় দেখুন : -

"হনুমান। রহ রাম-নাম লয়ে ভবে,
মন্ত্রী জাম্ববান। জ্ঞানবান,
দিব্যজ্ঞানে লভহ যৌবন পুনঃ।
পুনঃ দেখা হবে কালে ;
মিত্র বিভীষণ। সাধুজন তুমি,
দিয়ে বলি আপন সন্তানে
করিলে তোমার হিত,
কদাচিৎ বাদি-পক্ষ তব
ত্যজিব না রক্ষঃরণ-মিতা,
তুমি আমি সম চিরদিন
মোহহীন প্রবীণ বুঝিবে।"

এই পর্য্যন্ত মিত্র-সম্বন্ধীয় বিদায়ের পালা। এইবার উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় উপস্থিত। প্রাকৃতেরা বিষয়-বৈভব উত্তরাধিকার-সূত্রে ভোগ করিবার জন্য দিয়া যান। অপ্রাকৃত রাম 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি' এই মূলমন্ত্রটিকে তাঁহার বংশদুলাল কুশী-লবের হস্তে সমর্পণ-পূর্ব্বক বলিতেছেন :—

"বৎস কুশীলব !
বংশের আকর দিনকর,
নিত্য তেজোময় জ্যোতি যাঁর,
দেখ যেন সে কুলে না স্পর্শে মলা।'

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই অমূল্য-ধন রাম পুনরায় উত্তরাধিকারীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত-মনে কালপুরুষকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন: 'হে পুরুষ। কার্য্য সাঙ্গ এতদিনে তব সরযু-সলিলে—" বলিয়া 'নারায়ণ' উচ্চারণপূর্বক দেহ-বিসর্জন করিলেন। রাম-লীলার অবসান হইল।

গিরিশচন্দ্র নাটকের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে রাম-চরিত্রের আদ্যন্ত যেরূপ দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন বাঙ্গালার আর কোন নাট্য-কবি সেরূপ মনোহারী চিত্র তাঁহার পূর্বে আঁকিতে পারেন নাই। ইহা গিরিশচন্দ্রের হাতে-খড়ি হিসাবে লেখা পৌরাণিক দৃশ্যকাব্যের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে!

রামায়ণাবলম্বিত পৌরাণিক দৃশ্যকাব্যের নায়িকা-চরিত্র

সীতাই রামায়ণাবলম্বিত দৃশ্যকাব্যের নায়িকা। রাম চরিতালোচনার প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে যে রাম বা সীতা নর-নারীরূপে চিত্রিত হইলেও তাঁহারা কেহই মরজগতের আসল লোক ছিলেন না। মাঝে মাঝে সীতা-চরিত্রের অসাধারণত্বে লোকের মনে পাছে অস্বাভাবিকতার ছায়া আসিয়া পড়ে, তজ্জন্য নাটককার প্রথম হইতে তাঁহার কাব্যের দর্শক বা পাঠক সাধারণকে ঐ কথা জানাইয়া দিয়াছেন।

'সীতার বিবাহ' নাটকের নায়িকা

'সীতার বিবাহ' নামক নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে সীতার প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছে। কৃত্তিবাসের অনুকরণে গিরিশচন্দ্র সীতাকে মনোমত পতি-লাভার্থ দেবতার নিকট বরপ্রার্থিনী অবস্থাতেই দেখাইয়াছিলেন; তবে পুরাণকার ও নাটককারের মধ্যে প্রভেদ এই,—নাটককার তাঁহার নায়িকাকে কৃত্তিবাসের সীতার ন্যায় হুতাশন, গজানন, মহেন্দ্র, বরুণ, মহাদেব, কাত্যায়ণী প্রভৃতি বিবিধ দেবদেবীর পূজারতা দেখান নাই। যাঁহাকে রামৈকপ্রাণ হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি কার্যে ও ঘটনায় একনিষ্ঠার পরিচয় দিতে হইবে, তাঁহার প্রথম পরিচয় একনিষ্ঠের ন্যায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ধ্যানরতা করিলে, পাছে চিত্ত-বিক্ষেপজনিত মনের একাগ্রতার ব্যাঘাত ঘটে, তাই গিরিশচন্দ্র সীতাকে স্ত্রীলোকের চির-প্রচলিত প্রথানুযায়ী আশুতোষের পূজারিণী করিয়া একান্তচিত্তে বিচিত্র ছন্দোবন্ধে শিবের স্তবরতা দেখাইয়াছেন।

নাটকীয় চরিত্রের প্রথম সাক্ষাৎ লইয়াই যত গোল। যিনি যত সুকৌশলে নায়ক বা নায়িকাকে দর্শক বা পাঠকের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করাইতে পারিয়াছেন তিনি তত পরিমাণে সেই চরিত্রের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুকৌশলী নাটককার এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাই, যে সীতা নিজ জীবন বলি দিয়া পতি-নারায়ণ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার পুণ্যময়ী স্মৃতি আজ কত যুগ-যুগান্তের পরও ভারতবর্ষের হিন্দু অধিবাসীর মানস-মন্দিরে সমানভাবে পূজা পাইতেছে, যাঁহার পুণ্যশ্লোক চরিতাদর্শ আজও ভারত রমণীর সতী-ধর্মকে

জাগ্রত রাখিয়াছে, ভারত-শিরোমণি সেই সীতাকে ভগবৎসমীপে পতি-ভিক্ষার্থিনীরূপে দেখাইয়া তাঁহার নাট্যজ্ঞানের গভীরতা প্রকাশিত করিলেন।

নাট্যক্রিয়ার অগ্রগতি-পথে সীতা চরিত্রের যে সকল অমানুষিকতা প্রকাশিত হইবে, সেগুলির সহিত অভ্যস্ত করাইবার জন্য নাটককার তাঁহার এই নাটকের পাঠক বা দর্শককে সীতা চরিত্রের নিম্নলিখিত দেবীভাবের সহিত অল্পে-অল্পে পরিচিত করাইয়া গিয়াছেন।

গুরুভার-নিবন্ধন দুর্বল জন-সাধারণের কাছে হর-ধনুর উত্তোলন অসম্ভব হইলেও সীতা অনায়াসে ঐ ধনুকটিকে একপাশে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার শক্তিমূর্তিই প্রকটিত হইয়াছিল; ক্রীড়া-সঙ্গিনীদের সহিত খেলিতে খেলিতে খেলিবার পাত্র হইতে অন্ন লইয়া রাজ-সদস্যদের আমন্ত্রণ-পূর্বক তাঁহাদের সকলকে, সমাগত ভিখারী ও সঙ্গিনীগণকে একযোগে অন্ন-দান ব্যাপারে তাঁহার অন্ন-পূর্ণা মূর্তিই বিকশিত হইয়াছিল; নিঃসঙ্গজীবন ভারবহ বলিয়া স্বপ্নাবস্থায় গোলোকের ছবি মনে আনিয়া সীতা তাঁহার পতি-বিরহজনিত কাতরতার মধ্যে প্রেম-ঘন দেবীমূর্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। সীতা এখন মায়াকে আশ্রয় করিয়া জগতীতলে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, তজ্জন্য মায়িক অবস্থার ভিতর দিয়াই ঐ সকল শক্তির বিকাশ সীতাকে দেখাইতে হইয়াছে। বালিকাসুলভ ক্রীড়ার মধ্যে ধনুর উত্তোলন এবং খেলা-পাত্র হইতে রাজসভাস্থ ব্যক্তি ও ভিখারীগণকে অন্নদান প্রভৃতি রহস্য তাঁহার সুপ্তা দৈবীশক্তির পরিচায়ক হইলেও তাঁহার জাগতিক কর্মজীবনের ভিতর দিয়াই ঐগুলিকে দেখাইতে হইয়াছিল। গোলোক-বিষয়ক ব্যাপারটির মধ্যে সীতার আত্মানুভূতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইহা মায়িক জীবের সুলভ লভ্য অবস্থা না হইলেও একান্ত দুর্লভ নহে। মায়ামুগ্ধ জীবের জীবনে এমন মুহূর্ত কখন-কখন দেখা যায়, যখন তাহার স্বরূপানুভূতির অবসর ঘটে, কিন্তু মায়ান্ধ জীব সেই মুহূর্তটিকে ধরিয়া রাখিতে পারে না—ঐ টুকুই মায়ার খেলা। এই অবস্থাটি দুর্লভ বলিয়াই কৌশলী নাটককার সীতার জাগ্রৎ অবস্থার ভিতরে পূর্বোক্ত চিন্তার উদয় না দেখাইয়া নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নের মধ্যেই উহা প্রকটিত করিয়াছিলেন।

সীতার স্বয়ংবর-সভায় রাজন্যবর্গ সমবেত হইয়াছেন। আজ হরধনুর্ভঙ্গের পরীক্ষা হইবে। প্রাসাদের অলিন্দ হইতে কুলাঙ্গনাগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া সভা নিরীক্ষণ করিতেছেন। সীতার নয়ন-ভ্রমরও সেই অলিন্দ হইতে উড়িতে-উড়িতে সরোবর-সদৃশ বিশাল সভামধ্যস্থ রামের দেহ-পদ্মে আসিয়া আশ্রয়-লাভ করিল। সীতার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। দিগম্বরের নিকট অভিলষিত বরলাভার্থ তিনি পূর্বে যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আজ তাহার সিদ্ধিলাভ ঘটিল, কিন্তু ঐ আনন্দের অন্তরালে একটু ভয়ও তাঁহার ছিল, তাই এইরূপ বলিয়াছেন :—

"আহা নব দুর্বাদল শ্যাম
কে বসেছে সভা-মাঝে!
এ মাধুরী কভু কি দেখেছি আর?
মন আমার ও রাজীব-পদে
যাচে আত্ম-সমর্পণ।
দিগম্বর! দেহ বর
দাসী যাচে তব পদে,

আপনি আসিয়া ভাঙ্গ নিজ শরাসন ?
নহে ভূতপতি ভূতক্ষয় ধনু তব,
কে করিবে পরাজয়
সদয় না হ'লে সদাশিব।"

কিন্তু ভয়-বিহ্বলা সীতা স্বচক্ষে দেখিলেন যে সকলের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়া রামই হরধনু ভাঙ্গিলেন বরদাতা শিবের আশীর্বাদে রামকে লাভ করিতে পারিয়াছেন জানিয়া সীতা হর্ষাবেগে মূর্ছিতা হইলেন, এবং সেই মূর্ছিতাবস্থায়—"ভাল ভাল চিনেছি তোমারে, এতদিনে মনে হ'ল দাসী বলে, জানিলে কি আসিতাম ধরা-মাঝে !"—ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগ করিলেন। পূর্বে স্বপ্নাবস্থায় যাহা বলিয়াছিলেন, এখানে মূর্ছাবশে তাহারই প্রতিধ্বনি করিলেন।

এগুলি সীতার কন্যকাকালের চিত্র। এই কালে তাঁহার বালিকাসুলভ চপলতা ছিল না। ছিল কেবল একাগ্রতা ও আপনাকে ভবিষ্য-জীবনের উপযোগিনী করিয়া তুলিবার চেষ্টা। এতাবতা গিরিশচন্দ্র সীতার কার্য বা চিন্তার মধ্য দিয়া তাঁহার ঈশ্বরীমূর্তির পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু যিনি ঈশ্বরাবতার রামের পত্নিত্বপদে আরূঢ়া হইতে যাইতেছেন তাঁহার দেহ-সৌন্দর্য কিরূপ এবং প্রণয়ের গভীরতাই বা কতখানি তাহা দেখাইবার সুযোগ তিনি পান নাই। বিধাতৃ-বিধানে সীতারাম মিলন অভিপ্রেত হইলে সীতাকে রামের মনোহারিনী বেশ-ভূষায় সাজাইবার জন্য ব্রহ্মা রতিদেবীকে ধরণীতলে পাঠাইলেন। এটি নাটককারের স্ব-কপোল কল্পিত ঘটনা, কিন্তু এই ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া সীতা-চরিত্রের গুহ্য-রহস্য নাটককার যতটা বেশী প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, তাহা যাচাই করিয়া দেখিলে ঐ প্রক্ষিপ্তাংশের মূল্য আসল অপেক্ষা কোন অংশে কম হয় না।

রতি সীতাকে খুঁজিতে খুঁজিতে জনকরাজার অন্তঃপুরস্থ উদ্যান-মধ্যে ধ্যানরতা দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া রতি মনে মনে বলিতেছেন :—

"আহা মরি কি মাধুরী হেরি,
নয়ন ভরিল রূপে।
কমলারে কেমনে সাজাব ?
কোথা রত্ন পাব ?
রত্নাকর-সার রত্ন রমা।
জিনি কাদম্বিনী মুক্ত বেণী
কেশরাশি চুম্বিছে চরণ-তল।
নখর-নিকরে সুধাকর খেলে থরে থরে,
মরি হাসে শশি-শ্রেণী
শ্রীপদ নলিনী দলে।
* * *
মরি অমল-কমল আঁখি ঢল-ঢল,
মুখ নিরমল রঞ্জিত ঈষৎ-রাগে,
অনুরাগে ভ্রমর ভ্রমিছে দলে

অন্ধ মধু আশে—
কেহ করে, কেহ বা অধরে
কেহ বা চরণ-তলে।
নিরুপমা রমেশ-রমণী।
পদ্মযোনি কেন বা প্রেরিল মোরে?
অন্যমনা রাজীবলোচন বিনা—
যেন স্থলপদ্ম প্রভাত অরুণ-আশে।"

এই রূপবর্ণনার মধ্যে কবিত্ব যে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা গিরিশচন্দ্রের পূর্বগামী নাট্যকারদের নাট্য-সাহিত্যে একান্তই দুর্লভ ছিল। অনাবিল কবিত্বের সূচনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যে প্রথম দেখা গিয়াছিল, তৎপরে গিরিশচন্দ্রেই তাহা পুনরুদ্ভূত হইল। বেশকারিণী রতি সাজাইতে আসিয়া নিজেই সীতার অনুপম রূপমাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি বুঝিলেন যে সীতার ধ্যানভঙ্গ করিতে হইলে তাঁহার তখনকার মনের অবস্থানুযায়ী বাক্য-প্রয়োগ করিতে হইবে। তাই রতি একটি বিষাদপূর্ণ গান গাহিলেন, রামের বিরহ-কাতরা জানকী গীতান্তে আবেগভরে রতিকে বলিলেন :—

"কে তুমি রূপসী বসি একাকিনী
কর গান, পুনঃ তোল তান?
গীত তব সকরুণ।
বল কার তরে প্রাণ তব ঝুরে
কেন গাও বিষাদ-সঙ্গীত?"

বিবাহোপলক্ষ্যে দশরথকে মিথিলায় আনিবার জন্য রাম ইতোমধ্যে অযোধ্যায় গিয়াছেন, এবং সীতা রামেরই আগমন-প্রতীক্ষায় আছেন, সুতরাং এই ক্ষণবিরহিণীর সহিত চির-বিরহিনীর হৃদয়-বিনিময়ে বিলম্ব হইল না। কথোপকথনের মধ্যে সীতা রতিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

"যদি গুণবতি
দয়া করি রহ মিথিলায়,
শুধাব তোমায় কেন পতি তব
যান সদা তোমা ত্যজি?
আমি রহি একাকিনী—ভালবাসি শুনিতে কাহিনী,
ভগ্নী সম সদা সেবিব তোমারে।"

নবানুরাগিনী সীতা রামের অদর্শনে বিরহ যে কি পদার্থ তাহা বুঝিয়া লইয়াছিলেন, তাই সহৃদয়তার সহিত রতির বিরহবেদনায় সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারিলেন। সীতা শুনিলেন যে পতির জিগীষাই তাঁহার সখীকে পতি-সঙ্গ সুখ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে, তাই তিনি বলিলেন :—"ভাল সখি—কি হেতু না যাও তুমি পতি পাছে পাছে?" রতি উত্তরে জানাইলেন যে তাঁহার পতি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান না। এ কথা শুনিয়া সীতা বলিতেছেন :—

"দেখ সখি,
কেঁদ ধরি পতির চরণে;

তাহে যদি নাহি লন সাথে,
যেও অলক্ষিতে পশ্চাতে তাঁহার ;
যদি ভগবতী করেন করুণা,
পাই যদি রঘুপতি পতি,
তিলেক না রব আমি তাঁহারে ছাড়িয়ে।".

এই সমবেদনার মধ্যে সীতার ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইংরাজীতে ইহার একটা সমার্থক কথা আছে—"the beginning holds within it its end', অর্থাৎ পরিণত জীবনে যাহা অবশ্যম্ভাবী বাল্যজীবনে তাহারই বিকাশ দেখা যায়। সীতার বিবাহিত জীবনের পতিভক্তি ও একনিষ্ঠা তাঁহার কন্যকাজীবনে এইরূপে প্রতিভাত হইতেছিল। রতি কিন্তু নিজ কর্তব্য ভুলেন নাই ; সীতাকে মনোমত করিয়া সাজাইয়া দিবার জন্য তাঁহার অঙ্গে অলঙ্কার-বিন্যাস করিতে লাগিলেন, সীতা তাহাতে বলিতেছেন :—

"অলঙ্কারে কি কাজ তাহার
রাম যার কণ্ঠহার,
প্রাণ আমার বিকাইবে তাঁর পায়।
ভাল সখি! কোথা তুমি
শিখিলে সাজাতে ?"

বলাবাহুল্য রতি ছদ্মবেশেই সীতার কাছে আসিয়াছিলেন, এবং এ পর্যন্ত তাঁহার প্রকৃত পরিচয় সীতাকে জানিতে দেন নাই। লোকে কাম ও রতির সাহায্যে জগতে প্রেম-তত্ত্ব শিখিয়াছে। কি করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিতে হয়, সে বিষয়ে কামপত্নী রতি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন, তাই সীতার পূর্বোক্ত কথার উত্তরে তিনি বলিতেছেন :—

"শিখেছি পতির কাছে।
শিখিয়াছি রমণী-নয়নে
কজ্জলের ছলে রাখিতে গরলরাশি,
প্রেম-ফাঁসি রঞ্জিত অধরে,
বেণী বিনাইয়া ফণিনী সমান
বাঁধিতে পুরুষ প্রাণ।
কেবা বলবান্ খুলিতে বন্ধন,—
কাতরে লুটায় পায়।"

রমণীর এরূপ ছলনাময়ী শোভা সীতার ভাল লাগিল না, তাই তিনি বলিলেন :—

"কহ সখি কি কথা তোমার—
রামচন্দ্র লুটিবেন পায়!
এলাইয়া দেহ মোর বেণী—
দেহ সাজাইয়ে
যাহে দাসী বলি লন গুণনিধি।"

সীতার এবংবিধ কথায় রতি মনে-মনে বুঝিলেন যে সীতার প্রেম-পাথার অতলই বটে ; কিন্তু পরীক্ষা করিবার সুযোগ তিনি তখনও ছাড়িলেন না, বলিতেছেন :—

"সখি জান না সরলা তুমি,
পুরুষ কঠিন অতি ! ঠেকেছি শিখেছি,
সঁপি প্রাণ পতি-পদতলে ;
পায়ে ঠেলে দাসী তাঁর
চলে যান যথা তথা,
মনোব্যথা বলেছি তোমায় ।"

সীতা তামসিক বা রাজসিক প্রেমের অধিকারিণী ছিলেন না, কোনরূপ পীড়ন বা বাধা দ্বারা তাঁহার স্বতঃ-নিঃসারিত প্রেম-প্রবাহ রুদ্ধ হইবার নহে, তাই রতির বাক্যের উত্তরে তিনি বলিলেন :—

"যদি পতি মোরে ঠেলেন চরণে,
রব তবু পদ-তলে,
আঁখিজলে ধোবো পা-দুখানি,
মম গুণমণি কৃপা করিবেন তাহে ।
শুনেছি স্বজনি, দয়ার সাগর রাম
অবলায় বাম না হবেন তিনি কভু,
দেহ বেণী ঘুচাইয়া মোর !"

ইহার তাৎপর্য এই যে, পতি যদি বাস্তবিকই সতীকে পায়ে ঠেলেন, তাহা হইলে সেই পদতল আশ্রয় করিয়াই সতীকে থাকিতে হইবে, কারণ পদ সেবা হইতে বঞ্চিত হইবার তাঁহার অধিকার নাই । রতির পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই, তাই বলিলেন :—

"এ বেণী কি ঘুচাব স্বজনি,
কাদম্বিনী-শ্রেণী বিনায়েছি সযতনে,
ফুলমালা বিজলী খেলিছে তাহে,
হৃদয়ের চাঁদে অবাধে বাঁধিবে তায় ;
প্রাণ বিকাইবে পায়
হৃদয়ে-হৃদয়ে রবে সুখে চিরদিন ।
রূপ-ফাঁদে না বাঁধিলে সই
পুরুষ কি রহে স্থির ?
মলিনী-নলিনী না সম্ভাষে মধুকর,
সুখ-সরোবর কলেবর,
লাবণ্য সলিল তায়
যৌবন-কমল হাসে
মধু-আশে রহে বাঁধা মধুকর ।"

এরূপ কুহকিনী ভাষাকে আশ্রয় করিতে না পারিলে রতি বিশ্ব-বিমোহিনী হইতে পারিতেন না। পরের মন কেনা যাঁর ব্যবসায়, ভাষার শক্তিই তো তাঁর মূলধন। নাটককার রতিকে সে মূলধন থেকে বঞ্চিত করেন নাই। বৈচিত্র্য লইয়া জগৎ—একের যাহা ঔষধ, অন্যের রোগবৃদ্ধির কারণ তাহাই। রতির প্রাগুক্ত কথায় সীতার তাহাই হইল। সীতা দেখিলেন যে, রতি কিছুতেই তাঁহার কথা শুনিতেছেন না। রূপ-ফাঁদ ব্যতীত স্বামীকে বশ করা যায় না, বারংবার এরূপ বুঝাইতেছেন, সীতা তখন ভিন্ন পথ ধরিলেন, নিজস্বামী গর্বে স্ফীতা হইয়া বলিয়া উঠিলেন :—

"সখি। হেন মধুকরে আদরে কি ফল বল?
দিনমণি-সম রাম রঘুমণি
মলিনী নলিনী নাহি করিবেন হেলা,
স্বামী কি ঠেলেন কভু সতীরে চরণে?
কুরূপার সতীত্ব ভূষণ!
বেশে মুগ্ধ ব্যভিচারী যেই।
জিতেন্দ্রিয় রাম-গুণধাম
প্রেম বিনা কে পারে কিনিতে?"

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ এত লঘু নহে যে, মধুকর নলিনীকে মলিনী দেখিয়া পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রীলোক কুরূপা হোক্ বা সুরূপা হোক্ সতীত্বই তার ভূষণ; ব্যভিচারীরাই নারীর সুবেশের অপেক্ষা করে। আমি কি এমন হেয় পতি লাভ করেছি যে শোভার বিনিময়ে তাঁর প্রেম ক্রয় করিব? জিতেন্দ্রিয় রামকে কিনিবার একমাত্র উপায় প্রেম—রূপ নহে। সীতার অকাট্য যুক্তিতে রতি পরাস্ত হইয়া নীরব রহিলেন।

কর্তব্যজ্ঞান প্রণোদিত প্রেম রাজসিক এবং আপনা হইতে উদ্রিক্ত অনুরাগ-বর্ধিত প্রেম সাত্ত্বিক (Platonic)। সীতা সেই সাত্ত্বিক প্রেমের অধিকারিণী ছিলেন। অনুরাগ কাহারও শিক্ষা বা চেষ্টার ফলে উৎপন্ন হয় না, ইহা মনুষ্য হৃদয়ে স্বতঃউৎসারিত প্রবাহমাত্র। অনুরাগ প্রসূত সাত্ত্বিক প্রেমই জগতে দ্বৈত-মতের সৃষ্টি করিয়াছে। দ্বাপরের গোপী-প্রেম বা কলির বৈষ্ণবপ্রেমের তুমি প্রভু আমি দাস-ভাব সাত্ত্বিক প্রেমেরই দ্যোতক। রামের প্রতি সীতার প্রেম এই জাতীয় ছিল।

রাম-বনবাস নাটকের নায়িকা

'রাম-বনবাস' নাটকের সীতা আর অনূঢ়া নহেন—বিবাহিতা। পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া ভর্তৃগৃহে আসিয়াছেন। সীতাচরিত্রের অপূর্বতা তাঁহার পত্নিত্বে। নাটককার নানা দিক দিয়া সীতার এই পত্নিত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রামের বনবাস-সংবাদ সীতার নিকট পৌঁছিবার পূর্বে তিনি ঊর্মিলার সহিত উদ্যান-বিহারে রত ছিলেন, এবং প্রাণ-পতিকে উপহার দিবার জন্য পুষ্পমালা গাঁথিয়াছিলেন; এই মালা-গাঁথা লইয়া উভয়ের মধ্যে একটু রঙ্গরসও চলিতেছিল। ঠিক সেই সময়ে রাম উদ্যান মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। রাম তাঁহার বনবাস-সংবাদ জানকীকে জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে এই অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতকালে অযোধ্যায় থাকিয়া সীতা যেন শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করেন। এই মর্ম-ভেদী সংবাদে ভাবরূপিণী সীতা কিন্তু অবিস্মিতার মতোই বলিলেন :—

"চাও প্রভু কাহারে সঁপিতে
দয়াময় ?
আমি আমি-নয়
রামময় প্রাণ মম !
তুমি যাবে বনে, রহিব ভবনে,
কেমনে কহিলে নাথ ?
দাসী শ্রীচরণে—
ধ্যানে-জ্ঞানে চরণ সেবিব আশ।
যথা যাবে যাব সাথে-সাথে,
দাসী বিনে সেবা কে করিবে ?"

প্রভু, তুমি কি নিশ্চল দেহ-পিণ্ডকে তোমার জনক-জননীর সেবার জন্য রাখিয়া যাইতে চাহিতেছ ? দয়াময় ! আমার তো পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। কায়ার সহিত ছায়ার যে সম্বন্ধ, তোমার সহিত আমারও ঠিক তাহাই। কায়া চলিয়া যাইলে ছায়া তাহার অনুগামিনী হইয়া থাকে। এ চিরন্তন-প্রথা তুমি ভাঙ্গিতে চাহিতেছ কেন ? তুমি যখন আমার দেহের প্রাণস্বরূপ, তখন তুমি চলিয়া যাইলে এ প্রাণহীন দেহদ্বারা কার্য কিরূপে সম্ভবপর হইবে ? জীবনে-মরণে যে সেবার অধিকার লইয়া আসিয়াছে, তাহার প্রতি এরূপ ছলনা কেন কর প্রভু ? ইহাই পূর্বোক্ত বাক্যগুলির মর্মার্থ।

রাম সীতাকে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ দেখিয়া বনপথের ক্লেশ ও বন্য জন্তুর ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সীতা তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না, বলিলেন :—

"এ কঠিন বাণী কেন কহ চিন্তামণি,
সতী পতি ছাড়ি রহে কবে ?
বিধি বিড়ম্বনে, সত্যের পালনে
দুঃখ তব দয়াময় !
অকারণে কেন দুঃখ দিবে মোরে ?
তব সনে—
গহন বিপিনে রব রাজরাণী হোয়ে ;
রাম মম হৃদয়ের রাজা
অধিনীরে ঠেল না চরণে,
দাসী বিনে সেবা কে করিবে তব ?"

সতী ও পতি অভেদাত্মা—তাঁহাদের বিচ্ছেদ অসম্ভব। রাম সীতার হৃদয়রাজ্যের রাজা তাঁহার বাহিক সিংহাসন অযোধ্যার স্বর্ণসিংহাসন হোক্ বা বন্য তরুমূলই হোক্, সীতার পক্ষে দুইই সমান। কারণ তাঁহার হৃদয় সিংহাসন উভয় অবস্থাতেই পূর্ণ—শূন্য নহে, রাম তথায় অহরহঃ বিরাজ করিতেছেন। এ যুক্তি টিকিল না দেখিয়া রাম তৃতীয় যুক্তির অবতারণা করিলেন। নিশাচর-নিসেবিত বনে নারী-অবমাননার ভয় দেখাইলেন। তখন সীতার উত্তর এইরূপ দাঁড়াইল :—

"নাথ। পতি বিনে কে রাখে নারীরে?
এক নারী দুই ধনুর্ধারী
রক্ষিতে নারিবে প্রভু?
স্বচক্ষে দেখেছি ভাঙিতে হরের ধনু,
গভীর গর্জনে স্বর্গ রোধ বাণে
দেখেছি নয়নে নাথ।
পদাশ্রিতা নারী, নাহি কারে ডরি
হেন বীরপতি-সহবাসে।
তুমি বনে যাবে, এ রাজ্যে কে রবে,
হেথা কে রক্ষিবে মোরে;
যেই রাজ্য কাড়ি লবে,
ভার্য্যা তারে দিবে,
হেন কি বাসনা তব?
দয়াময়। এ কথা নিশ্চয়,
পদাশ্রয় কভু না ছাড়িব;
যাব সাথে কে রোধিবে মোরে?
*　　*　　*
প্রাণনাথ, কোরো না হে মানা;
মানা না মানিব—
প্রাণ দিব শ্রীচরণে।
ঋষিগণে অদৃষ্ট-গণনে কহিত জনকে সদা
'পতিসনে যাবে বনে'—
শুনি, প্রাণ আনন্দে নাচিত মোর।"

আমি যে কেবল পতির সম্পদের সাথী হইয়া পতিসেবা অপূর্ণ রাখিব, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে, তাই ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার পতি-নারায়ণ-ব্রত পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে বিপদেও তাঁহার সাথী হইবার সুযোগ দিতেছেন। আর তুমি বাধা দিও না। এবার নিষেধ করিলে আমি নিশ্চয়ই শ্রীচরণে প্রাণত্যাগ করিব। সীতার যুক্তিতে রাম পরাস্ত হইয়া তাঁহাকেও বনপথের সঙ্গিনী করিলেন। সীতার পত্নিত্বের এরূপ গরীয়সী মূর্তি জগতের সাহিত্যে বিরল।

বনগমন-কালে রাম বল্কল পরিধান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাত্বিক প্রণয়াধিকারিণী পতির অনুযায়ী বসন না পরিয়া সালংকৃতা অবস্থাতেই অনুগমন করিয়াছিলেন। এ বৈষম্যের কারণ কি? কৃত্তিবাস কারণ দর্শাইতেছেন—বধূর বল্কল বসন দেখিয়া দশরথ ক্রন্দন করায় তাঁহার সভাসদেরা সীতাকে সালংকৃতাবস্থায় বন-গমনের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। সীতা কিন্তু অবিকারচিত্তে কিরূপেই বা এ আদেশ গ্রহণ করিলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে কৃত্তিবাস নীরব, কিন্তু নাটককার কিরূপ সুন্দর কৌশলে এ সমস্যার সমাধান করিয়াছেন দেখুন।—বনগমনের জন্য সীতা দশরথের কাছে বিদায়-প্রার্থনা করিতে আসিলে

সীতাকে নিরাভরণা দেখিয়া দশরথ এইরূপ বলিয়াছিলেন :—"অলঙ্কার তোমার জননী ? অধিকারী নহি মা বধূর ধনে—যেও না মা বিনা আভরণে।" রাম-বিরহ-কাতর শ্বশুরের আদেশ সীতা বিনা ওজরে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নাট্যকার বাধ্য-বাধকতার এইরূপ সম্বন্ধ উপস্থিত করিয়া চরিত্র-চিত্রণের কৃতিত্ব দেখাইলেন।

সীতাহরণ নাটকের নায়িকা

সীতাহরণের সীতা পত্নী-জীবনের এক নূতন অধ্যায়ে উপনীতা হইয়াছিলেন। ঝড়ের পূর্বে প্রকৃতি যেমন শান্ত মূর্তি ধারণ করে সীতাহরণের পূর্বে সীতারামকেও তেমনি নিশ্চিন্ত দেখা গিয়াছিল। দণ্ডকারণ্যের নিভৃত প্রদেশে উভয়ে বিরলে প্রেমালাপে বিভোর ছিলেন। রাম তাঁহার হৃদয়গুহা-নিঃসৃত অজস্র প্রেমধারায় প্রণয়িনীকে স্নান করাইতেন, সীতা স্নানান্তে নিজ দেহ-মনকে পবিত্র করিয়া পতি-নারায়ণ-ব্রত পালনের জন্য আপনাকে তাহার উপযোগিনী করিয়া তুলিতেন।

মানুষ যে ভাবে ভাবিত হইয়া তন্ময়ত্ব লাভ করে, রঙ্গিন পরকলা-নিঃসৃত রঙ্গিন দৃষ্টির মতো বিশ্ব-সংসারকে তদ্ভাবে ভাবিত দেখে। তাই সীতা যে সংগীত দ্বারা রামের চিত্তপ্রসাদ আনিতেছিলেন তাহার লক্ষীভূত প্রাণী হইল—শুক ও সারিকা। বনচারী অপর প্রাণিনিচয়ের মধ্য হইতে পরস্পরা-লিঙ্গন-বদ্ধ শুক-সারিকেই বাছিয়া লইবার কারণ সারিকা তাঁহারই মতো 'মুখে মুখে-চোখে চোখে' তাহার প্রাণপতিকে সর্বদা রাখিয়া থাকে। বাহ্য প্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির এইরূপ সামঞ্জস্য বিধান করিতে গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব অসাধারণ ছিল।

সীতার পত্নিত্বের শান্তিময় দিকটা এইখানেই শেষ হইল। যদিও তাঁহার এদিকের জীবনের মধ্যে নানারূপ বাধা-বিপত্তি, উদ্বেগ-চিন্তা দেখা গিয়াছিল, তিনি কিন্তু সেগুলিকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেন নাই, কারণ এগুলির সকল সময়েই রাম তাঁহার পার্শ্বে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার জীবনের যে অধ্যায় এখন হইতে দর্শক বা পাঠকের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইবে তাহা সীতার নারীমর্যাদা-রক্ষার দিক। এ বিভাগে তিনি একক—রাম তাঁহার সহায় ছিলেন না। দেখা যাক্ এ বিভাগে তাঁহার কৃতিত্ব কতটা।

রাবণ ছদ্মবেশে সীতাহরণ করিয়াছেন। সীতা দেখিলেন যে, এ সময়ে নারীসুলভ কাতরতা আনিলে সংজ্ঞা-লোপের সম্ভাবনা আছে, এবং তাহা হইলে তাঁহার হরণ-সংবাদ রঘুপতির কাছে পৌছিবার কোন উপায় থাকিবে না; তাই চৈতন্যরূপিনী তারার উপর তাঁর চৈতন্যরক্ষার ভার সীতা দিয়াছিলেন। রাবণ বিমানরথে শূন্যপথে সীতাকে লইয়া যাইতেছেন এবং সীতার মন যাহাতে তাঁর প্রতি আসক্ত হয় তজ্জন্য নানা উপায়ে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতেছিলেন। সীতা মহা সংকটে পড়িলেন। একদিকে নারীমর্যাদা রক্ষা, অপরদিকে রামকে সংবাদ প্রেরণ। এই উভয়-সংকটের মধ্যে সীতার মনোভাব কিরূপ হইয়াছিল নাটককার নিপুণ লেখনীদ্বারা তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন :—

"ওহে মৃত্যু! ধর্মরাজ তুমি—
ধর্মরক্ষা কর অবলার।
শিব সীমন্তিনি! শিব নিন্দা শুনি
ত্যজেছিলে দেহ সতি!

গতি কর মা আমার ;
সতীরে বঞ্চনা ক'র না মা হৈমবতি।
আশুতোষ, কাতরে করুণা কর,
সদাশিব, শিব-দেহ দেহ মোরে।
হে তপন, অনল-আকর তুমি,
স্পর্শিয়াছে পামর আমারে,
ভস্ম কর কলঙ্কিনী-দেহ।
সমীরণ, আন শীঘ্র রাম ধনুর্ধারী,
দুরাচারী রাক্ষসে নাশিতে।
দেবর লক্ষ্মণ দেখ আসি,
ঠেকিয়াছি তোমারে নিন্দিয়ে,
আসিয়া করহে ত্রাণ!
তরু, লতা, গুল্ম, ফুল, ফল,
ধর্ম সাক্ষী
ক'য়ো কথা ব'ল রঘুনাথে,
রাবণ হরিল সীতা।
বিহঙ্গিনী। সঙ্গিনী আমার,
দেহ বার্তা রঘুনাথে,
সীতা তাঁর রাক্ষসে হরিল।
কুরঙ্গিনী যাও দ্রুতগামী
প্রতিধ্বনি বিপিন-বাসিনী—
হাহাকার-ধ্বনি বহলো রামের কাণে।"

সীতা গগন-পথে যাহাকে সম্মুখে দেখিয়াছিলেন তাহাকেই সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত রঘুনাথকে তাঁহার হরণ-বার্তা জানাইতে অনুরোধ করিলেন। তাই সীতার উক্তির মধ্যে দেবতা, অরুণ, সমীরণ, তরু, গুল্ম, লতা, ফুল, ফল, বিহঙ্গ, কুরঙ্গ, প্রতিধ্বনি প্রভৃতি আরণ্য বিষয়ের সম্বোধন দেখা গিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের দেশ-কাল-পাত্র-জ্ঞান অসাধারণ ছিল।

সীতা লঙ্কার অশোক-কাননে চেড়ী-রক্ষিতা হইয়া দিনযাপন করিতেছেন। এখানে উদ্বেগ, চিন্তা ও পীড়নের মধ্যে তাঁহার দিন কাটিতেছিল, কিন্তু তাঁহার নারী-মর্যাদা সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহার হরণকালে যাহাকে যাহাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি রামকে সংবাদ-প্রেরণের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাদের নিকট হইতে রামের কোন বাণী আসিতেছে কি-না, জানিবার জন্য তিনি নিত্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন—

"নিত্য ফোটে নভঃস্থলে তারকা মণ্ডল
দণ্ডক কাননে যথা,
মনে মনে কহি কত কথা—

নাহি বুঝে ব্যথা,
না দেয় উত্তর তারা;
কান পাতি অনিল চলিলে,
কিছু যদি বলে মোরে;
বিহঙ্গিনী গাহিলে সুধাই
উত্তর না পাই;
কোথা রাম, কোথা রাম আমার!
দিবা-নিশি দুরন্ত তাড়নে
কতদিন রহেপ্রাণ,
শোকানলে কতদিন জীব?
বুঝি রামে না হেরিব আর!"

এগুলি হতাশ্বাসের উপযুক্ত মনোবেদনায় পূর্ণ।

রাবণ-বধ নাটকের নায়িকা

'রাবণ-বধ' নাটকের নায়িকা উদ্বেগ-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে জীবন কাটাইলেও নারী-জীবনের মহা গৌরবময়ী পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছিলেন। অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে নারীজাতির শ্রেষ্ঠগৌরব শূন্য হইতে দেখিয়া তিনি যে দুঃখ-প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা নাটকীয় ভাষায় বড়ই মর্ম-স্পর্শী :—

"এই কি লিখেছ ভালে রে দারুণ বিধি!
হে নাথ! এ পদাশ্রিত জনে
কি কারণে ঠেল পায়?
জাগরণে-শয়নে-স্বপনে,
রামনাম বিনে, কভু নাহি জানে দাসী;
গুণমণি! নাহি সাধ মনে হইতে তোমার রাণী,
যাচি নাহি সিংহাসন,
মাত্র আকিঞ্চন সেবিব রাজীব-পদ,
তাহে নাথ ক'র না বঞ্চনা।
কোন্ দোষে অপরাধী শ্রীচরণে?
কহ অধিনীরে কেন ত্যজ গুণনিধি?
সতীনারী আমি, কহি চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী করি,
সাক্ষী মম দিবস-শর্বরী,
সাক্ষী রুক্ষকেশ, মলিন বদন,
সাক্ষী শীর্ণকায়,
সাক্ষী আপাদমস্তক বেত্রাঘাত,
সাক্ষী বয়ানে রোদন-চিহ্ন।

সাক্ষী দেখ নয়নের নীর ঝরিতেছে অবিরল,
সাক্ষী পবন-নন্দন হনু
সাক্ষী বিভীষণ, সাক্ষী নাথ তোমার অন্তর।
তবে যদি নিতান্ত ঠেলিলে পদে রাজীবলোচন,
নাহি খেদ আর,
পাইয়াছি পতি-দরশন।
আজ্ঞা দেহ অনুচরে সাজাইতে চিতা,
হয়ে হর্ষ-যুতা
ত্যজি দেহ স্বামীর সম্মুখে।"

এই উক্তিগুলি কি মহামহিমময়ী নারী-মহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

সীতার বনবাস নাটকের নায়িকা

'সীতার বনবাস' নাটকের সীতাকে লক্ষ্মণ তপোবন দেখাইবার ছল করিয়া বনবাস দিতে লইয়া গিয়াছিলেন। নানাবিধ দুর্নিমিত্ত দেখিয়া সীতা অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতে চাহিলে, দেবরের মুখে তাঁহার বনবাসের আদেশ জানিতে পারিলেন। এই আকস্মিক কথায় তিনি প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিকট ঐ দুর্নিমিত্তগুলিই তখন বরণীয় হইয়া উঠিল। বাহ্যপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির এই মিলন-সাধন-ব্যাপার গিরিশচন্দ্রের নাটকে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়।

সীতার আত্মমর্যাদা-রক্ষার দিক ছাড়া এ নাটকে তাঁহার নারীজীবনের অপর সার্থকতা লক্ষ্য করা গিয়াছিল। সেটি সীতার মাতৃ-মূর্তির দর্শন লাভ। যদিও লক্ষ্মণ বা হনুমানের প্রতি ব্যবহারে সীতার বাৎসল্য-রসের পরিচয় ইতঃপূর্বে কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহা কিন্তু সীতার পতিপ্রেমের গৌরবময় ছায়া-তলে নিষ্প্রভ ছিল। 'সীতার বনবাসের' সীতা গর্ভবতী ছিলেন, সুতরাং পুত্রস্নেহ তাঁহার যাবতীয় চিন্তার মধ্যে প্রকটিত হইতেছিল, বনবাসের পূর্বে গর্ভবতী অবস্থায় ঊর্মিলার সহিত উদ্যান-বিহার-কালে স্বপ্নাবেশে সীতা বলিয়াছিলেন :—'দেখ নাথ! কার এ সন্তান, করিতেছে স্তন্য পান!' পুনরায় বনমধ্যে লক্ষ্মণ যখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ভেদী চীৎকারের মধ্যে পুত্রস্নেহ অপ্রকাশিত রহিল না, সীতা বলিতেছেন :—

"কোথা যাব, কেমনে রাখিব প্রাণ,
বাঁচাইব রামের সন্তান—
বড় সাধ ছিল মনে, নবদূর্বাদল শ্যাম-কোলে
দিব তুলে নব দূর্বাদল-শ্যাম-সুত,
প্রেম-সূত্রে গাঁথিব নূতন ফুল,
সাধে মাগো ঘটেছে বিষাদ।"

বাল্মীকি বনবাসিনী সীতাকে আশ্রয় দিয়াছেন। ব্রতচারিণী সীতার কাছে এখন জননীর প্রেম একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়া দাঁড়াইল, তাই জগন্মাতার কাছে তিনি জননীর প্রেম এইরূপে ভিক্ষা করিতেছেন :—

"জগন্মাতা! শিখাও গো দুহিতারে
জননীর প্রেম ছিন্ন অন্ত্র ভুরি,
প্রেমে বাঁধা রেখ মা সংসারে.
ওরে কে অভাগা এসেছ জঠরে!"

কুশ ও লব জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সীতা তাহাদের লইয়াই এখন দিন কাটাইতেছেন। তিনি যে সীতা এবং রঘুমণি যে কুশীলবেরই পিতা একথা তাহাদের কাছে সীতা গোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু পাছে তাঁহার পতি-নারায়ণ-ব্রত পালনের ব্যাঘাত হয়, তজ্জন্য ব্রতকথা শুনিবার মানসেই কুশীলবের মুখে রামগুণগান তিনি নিত্য শ্রবণ করিতেন। বাল্মীকির তপোবন-সান্নিধ্যে হঠাৎ একদিন সৈন্য-কোলাহল শুনিয়া সীতা কুশীলবের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পরে যখন তাহাদেরই অঙ্গে অস্ত্রাঘাত-চিহ্ন দেখিলেন, এবং সৈন্য-কোলাহলে তপোবন মুখরিত হইয়া উঠিল, তখন মাতৃ-স্নেহ-কবচে কুশীলবের দেহ মণ্ডিত করিয়া ঋষির আশ্রম রক্ষার নিমিত্ত তাহাদের যুদ্ধে পাঠাইলেন। মাতৃস্নেহ-কবচটি নাট্যকার এইরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন :--

"মাথায় দে রাঙ্গা পা, মহেশ-মোহিনী—
কেশ রাখ দেব দিগম্বর,
পদ্মযোনি রক্ষা কর কমল-নয়ন,
জিহ্বা রাখ দেবী বীণাপাণি;
রক্ষ-বাহু নারায়ণ, রক্ষ বক্ষ ত্রিলোচন,
কটি রাখ কেশর-বাহিনী;
দেবতা তেত্রিশ কোটি অঙ্গরাখ গুটি-গুটি,
সঙ্গ রাখ অনঙ্গমোহন!
রেখ মনে নিস্তারিণী! অভাগার ধন—
অন্ধের নয়ন—মাগো সীতার জীবন!"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মধ্যগত দেবী-কবচের বিভিন্ন অঙ্গরক্ষাকারী দেবতার মতো এ মাতৃ-কবচেও ভিন্ন-ভিন্ন দেবতার নামোল্লেখ আছে। জাতীয় জীবনের সংস্কৃতি এরূপ কৃতিত্বের সহিত গিরিশচন্দ্রই তাঁহার নাটকের ভিতর দিয়া সাধারণকে দিয়া গিয়াছেন।

রণজয় হইয়া গিয়াছে। বাল্মীকির সঞ্জীবনী-মন্ত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বরক্ষার্থ আগত রামচন্দ্রাদি কুশীলবের যুদ্ধে প্রাণ পাইলেন। সীতা রাম-সন্দর্শনে গিয়াছেন। রামের মুখে পুনরায় তাঁহার পরীক্ষার কথা উঠিলে, সীতা নারীত্বের এ অবমাননা আর দ্বিতীয়বার সহ্য করিতে পারিলেন না, তাই অভিমান-ভরে বলিলেন :—

"দেখাব প্রমাণ নাথ তোমার আজ্ঞায়,
কিন্তু এক ভিক্ষা গুণনিধি!
নাহি দিব পরীক্ষা অনলে।
ন্যায়বান্ রাজা তুমি
ধর দুটি দুঃখিনীর ধন।

কুশীলব! দুঃখিনীরে জননী তোদের—
সঁপে যাই দয়ার-নিধান রবিকুল-রবি করে।
হে প্রভু! জন্ম-জন্মান্তরে
যেন পাই তোমা মম স্বামী।
যেন সীতানাম কেহ নাহি ধরে ভবে।
করেছিলে কাননে বর্জন,
রেখেছি জীবন প্রাণেশ্বর—
তোমার তনয়ে দিতে হে তোমার কোলে।
শুনেছি মেদিনী! জন্ম মম তব গর্ভে,
দে মা অভাগীরে স্থান,
নাহি স্থান সীতার সংসারে।
জনম দুঃখিনী দুহিতা তোমার মাগো!
এস বসুমতি সতি!
নিয়ে যাও তনয়ারে।"

—বলিয়া সীতা নিজ জীবন বলি দিলেন। পতি-নারায়ণ-ব্রত উদ্‌যাপিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে নায়িকা চরিত্রের সহিত আমাদের পরিচয়ও শেষ হইল। গিরিশচন্দ্রের সীতা চরিত্র কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সর্বত্রই গৌরবময়ী নারী-মহিমায় পূর্ণ। আদর্শ চিত্র-চিত্রনে গিরিশচন্দ্রের শক্তি অপরাজেয়।

গিরিশচন্দ্রের পূর্বে পৌরাণিক-বিভাগে যে সব নাটকের নাম পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে 'ভদ্রার্জুন', 'রুক্মিণীহরণ', 'শর্মিষ্ঠা', 'রামাভিষেক', 'সতী' ও 'হরিশ্চন্দ্র' মৌলিক নাটক, বাকিগুলি সংস্কৃতনাটকের বঙ্গানুবাদ বা যাত্রার পালা। কিন্তু ঐ সকল নাটকে মানবচিত্তের লঘুভাব চিত্রিত হইয়াছিল, কোনরূপ উচ্চভাব-দ্বারা মানুষের মনকে ঐগুলি উন্নীত করিতে পারে নাই। ভগীরথের ন্যায় নাট্যসাহিত্য-ক্ষেত্রে ভাবগঙ্গা প্রবাহিত করিয়া গিরিশচন্দ্র নিজেও ধন্য হইয়াছেন, এবং অনেক পতিতেরও উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালী কৃত্তিবাসের হাতে অযোধ্যাধিপ সীতারাম চরিত্র দুইটির বাঙ্গালিয়ানা বেশ প্রকটিত হইয়াছে, তাই তাঁহার ভাষ্যকার তাহার ব্যতিক্রম করেন নাই।

মহাভারত হইতে গৃহীত পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য

রামায়ণের পর গিরিশচন্দ্র মহাভারত হইতে তাঁহার দৃশ্যকাব্যের আখ্যানবস্তু গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামায়ণের ন্যায় এই বিরাট গ্রন্থের আদ্যোপান্ত তিনি গ্রহণ করেন নাই, মাত্র কেন্দ্রস্থিত চরিত্রগুলি লইয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

অভিমন্যু-বধ নাটক

অভিমন্যু-বধ নাটককারের মহাভারত সম্বন্ধীয় প্রথম নাটক, এখানি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ প্রতাপ চাঁদ জহরীর ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

পরবর্তীকালে এই নাটককে অবলম্বন করিয়া বহু গীতাভিনয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। বীররস এ নাটকের স্থায়িভাব এবং বীরের মৃত্যুজনিত শোক ইহার আলম্বন বিভাব। হাস্যরস ইহাতে নাই, মধ্যে মধ্যে বীভৎস-রস প্রবেশ করাইয়া নাটককার সঞ্চারী-রসের কার্য চালাইয়াছেন। কেন্দ্রবর্তী চরিত্রগুলি কিরূপ হইয়াছে তাহার আলোচনা মহাভারতীয় দৃশ্যকাব্যগুলির উপসংহার-কালে করা হইবে। এই দৃশ্যকাব্যের নায়ক অভিমন্যুর বীর্যের কথা এখানে মাত্র বলা হইল।

ভুবনবিজয়ী বীর অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী বীর্যবতী নারী-সুভদ্রা অভিমন্যুর যথাক্রমে জনক ও জননী, তাই অভিমন্যুর অতুল বীরত্বে গুম্ভিত না হইবার প্রতিবন্ধক কিছু ছিল না। জ্যোতিষীর কথায় গ্রহ-বৈগুণ্য দোষ কাটাইবার জন্য সুভদ্রা মাত্র একদিনের জন্য পুত্রকে রণগমনে নিষেধ করিয়াছিলেন, অভিমন্যু কিন্তু এ বিলম্বও সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া মাতাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

"মা-গো, সহস্র ঋণে ঋণী আমি তব,
যতদিন বহিবে কালের স্রোত,
সে ঋণ না হবে পরিশোধ;
চাহ সে ঋণে মা উদ্ধারিতে মোরে,
কৃপা তব অতুল ঈশ্বরি!
কিন্তু মাতঃ, অস্থি হেতু পিতৃঋণে ঋণী আমি,—
মান হেতু পুত্রের কামনা,
প্রাণ হেতু পিতৃমান দিব বিসর্জন?
নারিব জননি, ক্ষম বুঝি অবুঝ সন্তানে।
দেহ পদধূলি, রণমৃত্যু চাহে ক্ষত্রবীর;
জন্মে কত নর-দেহধারী অগণন,
দিনে-দিনে পলে-পলে রয় যায় কালের কবলে,
কিন্তু বীর্যবানে না ভুলে ধরণী,
কীর্ত্তি তার চলে অগ্রসরি,
দেখাইয়া পথ অন্য বীরে,
লক্ষ হৃদি হয় উত্তেজিত,
শুনি গুণগ্রাম-গান তার।"

পত্নী-উত্তরা স্বামীকে শ্বশ্রূর পূর্বোক্ত অনুরোধ-রক্ষা করিতে বলিলে অভিমন্যু স্ত্রীকে এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন :—

"হেন উপদেশ,
কহিও ভ্রাতার কাণে মৎস্যরাজসুতা!
প্রেমকথা বিলাস-ভবনে,
কত ব্যের সনে সম্বন্ধ নাহিক তার।"

শত্রুর মধ্যে লঘু-গুরু বিচার পদ্ধতি পাণ্ডবদের বৈশিষ্ট্য, অভিমন্যু তাই এ ভেদ-জ্ঞান রাখিতেন, সমরাঙ্গণে দ্রোণাচার্য সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলিতেছেন :—'পিতৃগুরু উপরোধে না বধিব দ্রোণে, কবি

নিরস্ত্র সময়ে, সম্মানে তুলিব নিজরথে।' বিরথ ও নিরস্ত্র অভিমন্যু সপ্তরথী পরিবেষ্টিত হইয়া বলিয়াছিলেন :—'কাটিল দণ্ড রাধেয় দুর্জন; মরিয়ে দেখাব দুর্যোধনে, পাণ্ডব মরণ-রীতি।' শেষ নিঃশ্বাস পড়িবার পূর্বে অভিমন্যু বলিলেন :—

"পড়িয়াছি বীরের শয্যায়;
কিন্তু নিঃসহায় পড়িনু অন্যায় রণে।
* * * *
হে পাণ্ডব-সখা, দেহ দেখা এ সময়,—
হরি তনু যায় রাঙা পায়,
অনাথে হে দেহ স্থান।
প্রাণ যায়-যার ফিরে চায়,—
মোহে দুনয়নে বহে বারি,
তার' নিজগুণে চক্রধারী।"

আশা-আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবার এরূপ আত্মত্যাগ পুরাণে বিরল। গিরিশচন্দ্র কৃতিত্বের সহিত সেই ছবি আঁকিয়াছেন।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস নাটক

'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' গিরিশচন্দ্রের মহাভারত-সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় নাটক, এখানি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারি তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ প্রতাপ চাঁদ জহুরীর ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। কেন্দ্রিক চরিত্র ছাড়া পীঠমর্দের চরিত্রাবলির মধ্যস্থিত কীচক চরিত্রে নাটককার তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকার অপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কামুকের ক্ষুধা (carnal appetite) উদ্রিক্ত হইলে কাম্যবস্তুর প্রতি কিরূপ ভাষা প্রযুক্ত হয় এবং কামুকের শারীরিক লক্ষণের কি কি পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাহা নাটককার নিপুণভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। নাটককার নাট্য-সাহিত্যের আসরে তখনও নূতন আগন্তুক, কিন্তু চরিত্র-চিত্রণ ব্যাপারে গুণপনা দেখাইয়াছেন।

অজ্ঞাতবাসকালে সৈরিন্ধ্রীরূপিণী দ্রৌপদীকে বিরাটরাজার অন্তঃপুরস্থ উপবনে পুষ্পচয়নরতা দেখিয়া মৎস্যরাজ-শ্যালক কীচক যে মোহিনী ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা এইরূপ :—

"প্রফুল্ল বদন, প্রফুল্ল কমলকায়,
ঢল-ঢল লাবণ্য-সলিল,
হৃদি-হ্রদে বিকশিত যুগ্ম শতদল!
যৌবন উজান বহে,
প্রাণ দহে মদনের শরে।
বিম্বাধরে ক্ষরে সুধা,
প্রাণ রাখ সুধাদানে বিনোদিনী।
রাজ-সেনাপতি, রাজার শ্যালক,
কীচক আমার নাম।"

কামান্ধ ব্যক্তি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকে, তাহাতে আবার কীচক নিজ-বাহুবলে দুর্বল ভগিনী-পতির রাজত্বে সর্বে-সর্বা হইয়াছে, তাই তাহার উপর তাহার ভগিনী সুদেষ্ণার অপরিসীম স্নেহের অধিকার সে লইতে ছাড়ে নাই। আদুরে ভ্রাতার মতো জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কাছে যাহা অকথ্য এরূপ ভাষার প্রয়োগ করিতেও সে কুণ্ঠাবোধ করে নাই, সে বলিয়াছে :—

"চলে গেল খর শর হানি বুকে,
চলে গেল নিতম্ব দুলায়ে।
*   *   *
বাড়াতে সোহাগ, ছলে করে রাগ,
*   *   *
জানি ভাল দুষ্টার আচার—
মন-প্রাণ যার পানে ধায়,
তারে কভু ফিরিয়ে না চায়,
কথা শুনে ক্রোধে যায় চলি—
উন্মাদ করিতে তারে।
*   *   *
জর-জর উন্মত্ত অন্তর।
লজ্জা ত্যজি কহি বার-বার,
বিলম্বিলে সহোদরে না পাইবে আর!"

অভিসার-প্রতীক্ষের উদ্বেগ-চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা কীচকের নিম্নলিখিত কথার মধ্যে কেমন প্রকাশিত হইয়াছে :—

"এখন' সুদেষ্ণা নাহি প্রেরিল তাহারে।
আহা, কিবা বিম্বাধর অলসে বিভোর—
সুধাপানে মুগ্ধ হ'য়ে নয়নে চাহিয়ে,
এলোকেশ বেড়িয়ে বাঁধিব বাহু।
ওই মৃদু পদ-সঞ্চালন—
ছার ভৃত্যগণ।
সুদেষ্ণার মুখে ছাই; কার কণ্ঠস্বর—
ছি! ছি! কর্কশ বায়স-ধ্বনি—
কালি সব করিব নিধন।
*   *   *
নিবিড় নিতম্ব ঢাকা কেশ-আচ্ছাদনে
যমুনা উজান—বিনা বায়ে দোলে যেন।
হৃদি-হ্রদে যুগল কমল—
তরঙ্গিত লাবণ্য-হিল্লোলে!"

কিন্তু ব্যর্থকাম কামুকের দৈহিক জ্বালা প্রকৃতির স্নেহ-সিঞ্চনেও দূরীভূত হয় না, তাহার নমুনা নাট্যকার ভাষার সাহায্যে কেমন সুন্দরভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন, দেখুন :—

"শিরায়-শিরায় পিপীলিকা-সারি ধায়—
ওহো কুরে খায় মস্তিষ্ক আমার!
হইলাম ভূতগ্রস্ত-সম।
প্রভাত সমীরে শীতল না হয় প্রাণ,
জ্বলে,—দেহজ্বলে, উষ্ণতালে না পরশে বায়ু,
উষ্ণ ওষ্ঠ সলিলে সরস নাহি হয়।
অগ্নি-শিখা করে,
নিশির শিশিরে শীতল না হয় জ্ঞান।"

প্রত্যাখ্যাতের প্রতিশোধ-স্পৃহা জাগ্রত হইলে ভাষাও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া যায়, তাহার নমুনা :—

"এ গরল-বাতি আগে নিভাইব—
পরে পদাঘাতে করি দূর—দিব অবজ্ঞার প্রতিফল।
মাদক সেবায় এ অনল করিব প্রবল,
যাহে তাপে হয় অধীরা বিহ্বলা।"

ঐ সময়ে অভীষ্টবস্তুকে দূরে দেখিয়া কামুকের অন্তর্দ্বন্দ্ব এইরূপে প্রকাশিত হইল :—

"ওই দাঁড়াইল, সরস চাহিল যেন,—
অঙ্গ-আবরণে বড় আড়ম্বর আজি,—
মুক্তকেশ চালিয়ে দেখায়।

*　　*　　*

বুঝি, বল না হইবে প্রয়োজন!
বলে মধু হয় অপচয়,
ধীরে যায় - চাহে ফিরে-ফিরে,
ভাবভঙ্গী মনোভাব করিছে প্রকাশ।
ভাল, ভাঙ্গি এ কৃত্রিম মান।"

সৈরিন্ধ্রী ও কীচকের সংলাপ মধ্যে কীচকের বাহুবল প্রসঙ্গে সৈরিন্ধ্রী বিরাটরাজ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে কর-প্রদানের কথা তুলিলে কীচক গর্বোক্তি সহকারে তাহার যে উত্তর দিয়াছিল তাহার অন্তরালে নিজ চরিত্রের গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে :—

"হ্যাঁ-হাঁ, কর নয়, তবে কহি শুন—
যাই যুদ্ধ-হেতু, হেরি রণবেশ মোর
মুগ্ধ হ'য়ে সুন্দরী জনেক লয়ে গেল গৃহে তার।
আর, সখ্যতা মম কুরুকুল সনে,
আসিয়াছে লোভে, কিঞ্চিৎ দিলাম ধন।

সখ্যতা কারণে নিমন্ত্রণ রক্ষাহেতু যাইতে হইল,
বসাইল যুধিষ্ঠির দক্ষিণ আসনে।
মম কার্য ওই মত, যারে বাড়াইব
স্থান দিব আমার উপরে ;
কিন্তু কোপে পড়িলে আমার,
নিস্তার কাহার' নাহি আর।

* * *

মোরে জানে পুরবাসিগণে ;
সুন্দরী যে আছে যথা,—
আজি বা দুদিন পরে ভোগ্যা মোর।"

এই বাক্যগুলির ভিতর দিয়া গিরিশচন্দ্র বিশেষ দক্ষতার সহিত কীচকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নাট্যসাহিত্যে চিত্রিত করিয়াছেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মুদ্রিত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিরচিত 'অজ্ঞাতবাস' নাটকে কীচক চরিত্র প্রাণহীন হইয়া চিত্রিত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্র নাথের কাল-মধ্যে ঐ নাটকসম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত হইয়াছে।

এই নাটকের মধ্যে গিরিশচন্দ্র আর একটি বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাত করিয়াছেন যাহা তাঁহার পরবর্তী নাটকগুলির মধ্যে মূর্তিমান হইয়া উঠিয়াছিল। এই নাটকের চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের মধ্যে 'পাগ্‌লা ব্রাহ্মণের' চিত্রটি ভবিষ্যৎ বিদূষকের অগ্রদূত হইয়া দেখা দিয়াছিল।

সংগীত-বিভাগে নাটককারের গুণপনা ইতঃপূর্বে 'আগমনী', 'সীতারবনবাস' ও 'সীতাহরণ' নাটকের গানের মধ্যে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিলেও এই নাটকের 'ওমা কেমন যোগী ছি-ছি লাজে মরি' গানটি দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। পরবর্তীকালে এই নাটককে ভিত্তি করিয়া বহু শখের যাত্রা দল গঠিত হইয়াছিল।

দক্ষযজ্ঞ নাটক

মহাভারতের গল্পাংশ হইতে পৌরাণিক নাটক রচনা করিবার কালে গিরিশচন্দ্র অন্যান্য পুরাণ হইতেও তাঁহার নাটকের উপযোগী মাল্-মসলা সংগ্রহ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই, এবং তাহারই ফল-স্বরূপ মহাভারত ব্যতিরিক্ত দুই তিনখানি অন্যবিধ পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সকল নাটকের জন্য পৃথক অধ্যায় না খুলিয়া এই অধ্যায়ের মধ্যেই ঐগুলির আলোচনা দেওয়া হইল।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই তারিখে গিরিশচন্দ্র শিবপুরাণ বা দেবী ভাগবতের গল্পাংশ লইয়া তাঁহার পরবর্তী নাটক দক্ষযজ্ঞ রচনা করেন, এবং ইহা শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত গুর্মুখ রায়ের বীডন্‌স্ট্রীটস্থ স্টার থিয়েটারে ঐ তারিখে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এই নাটক লইয়া স্টার থিয়েটার খোলা হইল।

নাটককার এই নাটকে নাট্যসাহিত্যরূপ দেহের অন্নময় ও প্রাণময় কোষ অতিক্রম করিয়া মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের সন্ধান সর্বপ্রথমে নাটকের দর্শক বা পাঠকমণ্ডলীকে প্রদান করিলেন। ভাবের খেলা প্রাণময় কোষে আরম্ভ হইলেও, ইহা প্রধানতঃ মনোময় কোষেই ক্রীড়িত হইয়া থাকে। ভাবের খবর গিরিশচন্দ্রের পূর্বগামী কোন নাট্যকারই রাখেন নাই। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে :—

"জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃনাং ভবতি মুক্তয়ে ॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসার বন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥"

ইহার ভাবার্থ এইরূপ :—"সেই দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানিগণেরও চিত্তকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া বিষয়-বিমুগ্ধ করিয়া থাকেন। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিত্য পরিবর্তনশীল বিশ্ব তৎকর্তৃক সৃষ্ট। তিনি প্রসন্না ও বরদারূপে অতিশয় সন্নিহিতা হইলেই মনুষ্যগণ মুক্তিলাভের যোগ্য হয়। তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা, পরমা ও অপরমা সুতরাং বন্ধন ও মুক্তি উভয়েরই হেতু। সেই সনাতনী মা সর্ব এবং ঈশ্বরেরও ঈশ্বরী।" (সাধন-সমর)

এই তত্ত্বভিত্তির উপর দক্ষযজ্ঞ নাটকখানি প্রতিষ্ঠিত। নাট্যকবির অনুভূতি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় যে ছবি দেখিয়াছিল, তাহা নাটকোক্ত মহামায়া চরিত্রের মুখ দিয়া ঐ নাটকের তপস্বিনী চরিত্রকে বলিবার ভঙ্গীতে নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে :—

"শুন তপস্বিনী,
দেহ হ'তে যে হেতু সৃজিনু তোরে ;—
আছি মুগ্ধ নিজ মায়া-পাশে,
মায়া-পাশে বাঁধিতে মহেশে এ বেশে এ লীলা মম।
শিব নাহি বিমুগ্ধ হইলে জীব নাহি রবে ধরা মাঝে,
আনন্দ উৎসব—বহুরূপে ক'রব আনন্দ লীলা।"

উপরি বর্ণিত কবির অনুভূতি-বোধ্য বিষয়ের ও উদ্ধৃত চণ্ডীমন্ত্রের তাৎপর্যের মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। তপস্বিনী চরিত্রটি কবির মৌলিক সৃষ্টি, পুরাণে নাই। লীলা করিতে হইলেই লীলা-সহচরীর প্রয়োজন হইয়া থাকে। এক এক কল্পে বা মন্বন্তরে নূতন প্রজাপতি লইয়া সৃষ্টি আরব্ধ হয়। দক্ষ প্রজাপতির সময়েও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই, তাই মহামায়া তপস্বিনীকে বলিতেছেন :—

"দেখ, নাহি একার্ণব আর ; স্তম্ভিত লহর-মালা,
শ্যামকান্তি ধরা শোভে তায় ;
মায়ার প্রভাবে ভৃঙ্গগুঞ্জে কুসুম-সৌরভে,
রাজ্য এবে, যথা ছিল একাকার।"

এই কথাগুলির মধ্যে জল হইতে জগৎ-সৃষ্টির কি সুন্দর বর্ণনাটি কবির লেখনীমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অচল পর্বতশ্রেণী যেন একার্ণবের 'স্তম্ভিত লহর-মালার' প্রতীক,—উদ্ভিদ্‌রাজ্য যেন 'শ্যামকান্তি ধরার' রূপ,—বহুরূপে করিব আনন্দলীলার দ্যোতক যেন 'ভৃঙ্গগুঞ্জে কুসুম সৌরভে।'

এখন গল্পাংশের ভিতর দিয়া নাটকীয় চরিত্রগুলি কিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার বিচার আবশ্যক। অহংকার পতনের মূল কারণ, তাই ব্রহ্মাপুত্র দর্পী দক্ষ নাটকের দর্শক বা পাঠকের সম্মুখে প্রথম আবির্ভূত হইয়াই বলিতেছেন :—

"মম করে আদরে অর্পিল তাত
প্রজা স্থাপনের ভার ;
দক্ষ নাম দক্ষজানি' দিল ।
কি কৌশলে করি ভবে প্রজার স্থাপন ?"

দক্ষ পূর্ব-পূর্ব মন্বন্তর-প্রচলিত প্রজাস্থাপনের উপায়-সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্লেষণ করিতেছিলেন :—

"সমাজবন্ধনে কেমনে মানব রবে ? একতা বন্ধন !
কিন্তু কোন্ সাধারণ প্রয়োজনে একতা বন্ধনে
রবে জীব ধরাতলে !
একতার মূল প্রয়োজন ? * *
প্রয়োজন বিনা একতাবন্ধনে
কভু না মানব রবে ।"

সৃষ্টির গতি অব্যাহত রাখিবার জন্য যে চেষ্টা দক্ষের পূর্ববর্তী মন্বন্তরে হইয়াছিল তাহার প্রতিবাদ-স্বরূপ দক্ষ এইরূপ বলিতেছেন,—

"কতদিনে ওঠে কথা মায়ার বন্ধন,—
অনুমান, অনুমান, যুক্তিমাত্র নাহি তাহে—
মায়া—মায়া ।
কিবা মায়া, কহ কেবা জানে ?
মায়া বলি' বর্ণনা যাহার,
মায়া নাম দিলে তারে
এ সংসারে মায়া নয় কি বা ?
তুমি মায়া, আমি মায়া,
মায়া ব্যোম, তরুলতাগণে !
তবে মায়ার বন্ধনে কি হেতু না রহে নর ?"

দক্ষ তাঁহার প্রজাস্থাপনারূপ সংশয়ের একটা মীমাংসা অবশেষে এইরূপে করিয়া লইলেন :—

"হিতচিন্তা সাধারণ সবাকার নিজ হিত-হেতু ।
ডরে নারে রহিতে সংসারে, যে সংসারে মৃত্যুভয় ।
অনাচার মৃত্যুর কারণ—"

উপরিউক্ত স্বগতোক্তিগুলির মধ্যে দক্ষের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হইয়াছে। কি করিয়া এই নবসৃষ্ট ধরামাঝে প্রজা স্থাপিত হইতে পারে তিনি তাহার ভিত্তি অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কেহ একতা-বন্ধন—কেহ বা মায়াবন্ধন প্রজারক্ষার কারণ বলিয়া থাকেন, কিন্তু দক্ষের কাছে তাহাও যুক্তিহীন বোধ হইল। তিনি ঠিক করিলেন নিজ হিতহেতু হিত-চিন্তাই সাধারণ মানুষের ধর্ম, কিন্তু তাহারও অন্তরায় মৃত্যুভয়, সুতরাং মৃত্যুভয়ই যাবতীয় অনাচারের মূলীভূত কারণ। তাই দক্ষ বলিতেছেন :—

"এতদিনে পারিনু বুঝিতে
কেন প্রজা না হ'ল স্থাপন—

শিবপূজা সৃষ্টিনাশ হেতু।
বিরিঞ্চির ঘটিয়াছে বুদ্ধিভ্রম।
* * অনাচার নিবারণ—
শিবের দমন, অগ্রে প্রয়োজন;
মৃত্যু নিবারণ সংসারে উচিত আগে।
নহে ক্ষণস্থায়ী পুরে কি সুখে রহিবে জীব?
লয় কর্ত্তা শিব,
লয় নিবারণ না হবে কখন,
অনাচারী শিব নিবারণ বিনা।"

শিবের শিবত্ব কাড়িয়া লইতে বদ্ধপরিকর হইয়া বিপ্লবী দক্ষ দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার সকল বিপরীত প্রচেষ্টা বিমুখ করিয়া ঘটনা-চক্রে তাঁহারই কন্যা সতী শিবকেই বরমাল্য অর্পণ করিয়াছেন। ব্রহ্মা তখন দক্ষের ভ্রম এইরূপে বুঝাইতে লাগিলেন:—

"আছ তুমি মায়াবলে বিস্মৃত সকলি।
মহামায়া কন্যারূপে ঘরে—তপফলে
পাইলে কুমারী—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী,
মায়ার বন্ধন বিনা সৃষ্টি নাহি রয়,
তাই মাতার উদয় তব গৃহে।"

এই কথার উত্তরে অপমানিত ও অহংকার-দৃপ্ত বিপ্লবীদক্ষ ব্রহ্মাকে বলিলেন:—

"কিন্তু তব কার্যে—মহাকার্য ফলিবে আমার।
স্বার্থশূন্য দক্ষ প্রজাপতি,
প্রচার হইবে ভবে,—ধাতা!
আজি হ'তে মমতা করিনু ছেদ।"

নাটকের বীজ এইখানেই উপ্ত হইল। উর্ণনাভের লূতাতন্তুর মতো দক্ষ নিজের মৃত্যু-জাল নিজেই সৃষ্টি করিলেন। সনাতন মায়াবন্ধনে প্রজারক্ষা সম্ভবপর নহে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া বিপ্লবী দক্ষ প্রতিজ্ঞা করিলেন—'আজি হ'তে মমতা করিনু ছেদ।' ঘটনাজাল ক্রমশঃ জটিল হইতে লাগিল। ভৃগুমুনি প্রজাবৃদ্ধিকল্পে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে পর দক্ষরাজ সেখানে নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে শিবের প্রণাম পাইলেন না, যজ্ঞস্থলস্থ অপর দেব-সমাজ কিন্তু সসম্ভ্রমে দক্ষ-প্রজাপতিকে নমস্কার করিয়াছিলেন। এই ঘটনার প্রতিশোধ লইবার সংকল্প লইয়া দক্ষ মন্ত্রীকে বলিলেন:—

"আজ্ঞা মম করহ পালন,
মহাযজ্ঞ আয়োজন করহ সত্বর,
ত্রিভুবনে হেন প্রথা করিব স্থাপন,
যজ্ঞে নিমন্ত্রণ পুনঃ নাহি পায় শিব,
শিবহীন যজ্ঞ হবে ভবে।
* * ব্রহ্মার বচনে প্রজাপতি আমি,

তিন লোক প্রজা মম।
সম্মান-বিভাগ কে করিবে আমি না করিলে ?"

দক্ষের এই মহাযজ্ঞের সংবাদ ত্রিভুবনে জাহির করিবার ভার পাইলেন নারদ। ব্রহ্মা দক্ষকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য বহু বুঝাইলেন, দক্ষ কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন, বলিলেন :—

"বুঝিলাম, প্রজাবৃদ্ধি নহে তব অভিমত ;
কিংবা বিধি নাহি জান সন্তানের তপোবল।
হ'লে প্রয়োজন, অগনন পঞ্চানন সৃজিবারে পারি,
কিন্তু মম মতে সংহারে কি কাজ ?
সৃষ্টি-স্থিতি, অহংজ্ঞানে উন্নতি-সাধন।"

ব্রহ্মা উত্তরে বলিলেন :—

"লয় নিবারণ! হেন যুক্তি কে দিল তোমারে ?
লয় বিনা উন্নতি না হয় ;
অধোগতি উন্নতি বিহীনে—অমঙ্গল ফল তার।
শুন পূর্বের কাহিনী,
ক্ষীরোদ-বাসিনী প্রসবিল তিন জনে, *
আমি, বিষ্ণু, হর ;
তপ-তপ-তপ হইল আকাশবাণী,
তিনজনে মুদিত নয়নে বসিলাম ধ্যানে,
মহার্ণবে ভেসে এল শব-দেহ,—
পূতিগন্ধে বিষ্ণু পলাইল,
চতুর্মুখ হইল আমার—
চারিদিকে ফির'তে বদন, গন্ধ নিবারণ হেতু ;
অধিকার পঞ্চানন করিল শবেরে।
মহাশক্তি শব-বেশে, করিল আসন তলে !
অকস্মাৎ শূন্যে হইল মহাদেব নাম।
জগদ্ গুরু মহাদেব, সনাতন পুরুষ প্রধান,
স্বেচ্ছায় প্রকৃতি যাহে দিল আলিঙ্গন।
* * মহাশক্তি বিমুখ তোমার।
জ্ঞানচক্ষে নেহার কারণবারি—

* চণ্ডীতে ব্রহ্মার স্তবের মধ্যে ইহার সমার্থক কথা আছে, যথা—"বিষ্ণু শরীর গ্রহণমহমীশান এব চ। কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ।" "অর্থাৎ—বিষ্ণু, আমি ও ঈশান—আমরা তিন জনেই যখন তোমা হইতে শরীর গ্রহণ করিয়াছি, (আমাদের শক্তি যখন তোমারই শক্তি) সুতরাং, তোমার স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে ?" (ইতি সাধন-সমর)

জলে বহ্নি মহার্ণব মাঝে,
লয় কালে জলে এ বাড়বানল।"

বিপ্লবী দক্ষ তখনও নিরুত্তর হন নাই, বলিলেন :—

"জড়প্রকৃতির ডর তব বিধিমতে ধাতা!
তব প্রথামতে ভাঙ্গড়ে দেবত্ব দান!
উচ্চবিধি আপন সম্মান, পরীক্ষিতে আছে সাধ,
যাহে সদাচার পাইবে সম্মান,—
স্বেচ্ছাচার রবে হীন।
জড় কারণ-সলিলে বহ্নিজলে,
ভয় কিবা তাহে চতুর্মুখ?
জড় চেতন-অধীন চিরদিন।
তপোবলে অনল জ্বালিব,
যাহে হবে লয় কারণ-সলিল।
* * পিতঃ! সঙ্কল্প না ভঙ্গ হবে মোর।
জামাতা আমার নমস্কার না করিবে মোরে—
দণ্ড যদি নাহি দিই তার,
কালি পত্নী নাহি মানিবে বচন।
ভাবিছ হুতাশ, কারণে অনল হেরি;
ভেবে দেখ মনে, সৃষ্টি হবে ছার-খার,
প্রভুত্ব হারালে স্বামী।
বহ্নি কারণ-সলিলে,
বজ্র পুরন্দর-অস্ত্রাগারে
চক্র বিষ্ণু করে,—
তাহে কি ডরায়, পিতা,
অহং-জ্ঞানী জনে?"

ব্রহ্মা এইবার দক্ষকে যে উত্তর দিলেন, তাহা বাস্তবিক মর্মান্তিক। দক্ষের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে তাহার উত্তর আর আসে নাই,—

"অহঙ্কার কর তুমি যেই শক্তিবলে,
সেই শক্তি দুহিতা তোমার,
তনুত্যাগে মহাশক্তি যাবে তোরে ছাড়ি,
শিব-নিন্দা শক্তি নাহি সয়!
* * শুন তত্ত্বকথা,—
মিলি তিন জনে কত তপোবলে,
তুষ্টা হইল মহাদেবী, তাই সতীরূপে আইল ধরণীতলে,

নহে, সৃষ্টি না হ'ত স্থাপন।
দেখিয়াছি বার-বার করিয়া কল্পনা,
শিব-শক্তি সম্মিলন বিনা,
সৃষ্টি-স্থিতি নাহি হয়।"

ব্রহ্মার উপরিউক্ত বচনের তাৎপর্য এই যে মহাশক্তিই পর স্ব—সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তাঁহারই কার্য। ব্যষ্টি-শক্তির সাধ্য নাই যে ইহার বিপর্যয় ঘটাইতে পারে। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় একসূত্রে গ্রথিত। একের টানে অপর গুলিতেও টান ধরে, সুতরাং দক্ষের লয়-নাশ পদ্ধতিতে সৃষ্টি-স্থিতিও টিকিবে না, উহা ঐ লয় কার্যেরই সহায়তা করিবে মাত্র। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর মহাশক্তির ব্যক্ত অবস্থার কার্যকরী ব্যষ্টিশক্তি-মাত্র—এক কথায় লীলা-সহচর।

নাটকান্তর্গত দক্ষ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নাটককার এইখানেই একরূপ শেষ করিয়াছেন। শিব-শক্তি নাশের চেষ্টায় দক্ষ নিজের বিনাশ-সাধন নিজেই করিলেন। দক্ষচরিত্রের বাকী অংশটুকু কেবল ঘটনাসংঘাত আনয়ন ও অন্যচরিত্রের পরি-পূরণের জন্য নাটকে স্থান পাইয়াছে। নাটককার নিপুণ শিল্পীর মতো দক্ষচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, কোথাও তাহা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই ধরণের চরিত্র পৌরাণিক নাটক-বিভাগে গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণ নূতনতর সৃষ্টি বলা চলে।

প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে সতী, তপস্বিনী, প্রসূতি ও মহাদেব বাকী আলোচ্যের বিষয় রহিয়া গেল। মহামায়া যিনি চণ্ডীতত্ত্বে পরব্রহ্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তিনি লীলা-মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য দক্ষালয়ে সতী নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চণ্ডীতে উক্ত আছে,—

'দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদালোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে।'

অর্থাৎ চণ্ডীদেবী নিত্যা এবং এই জগৎই তাঁহার মূর্তি, তথাপি দেবতাদিগের কার্যসিদ্ধির জন্য যখন আবির্ভূতা হন, নিত্যা হইলেও তখন তিনি উৎপন্না বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাকেন।

সতী তাঁহার জন্মগ্রহণের কিছুকাল পরে মাতা প্রসূতিকে নিজমায়া দেখাইয়া মায়ামুগ্ধা করিয়াছিলেন। প্রসূতি দক্ষকে সে কথা এইরূপে বলিতেছেন :—

"কোলে লয়ে সুধাইনু সতীকে আমার,
কত পুত্র আছে তোর? উঠি দ্রুত
বিল্বমূলে বসিল সহসা;
শত রবি-ছবি ফুটিল উদ্যানে অকস্মাৎ;
নাহি সতী আর, উজ্জ্বল কিরণময়ী প্রতিমা সুন্দর।
কত শত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব লোটে পায়,
করজোড়ে তিন লোকে মা বলে ডাকিছে,
হাস্যময়ী করুণা প্রতিমা,
কৃপা কণা সবারে দানিছে।"

মহামায়া মাত্র জননীকে মায়ামুগ্ধ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, শিবদ্বেষী পিতাকে পর্যন্ত স্বপ্নে দেখাইলেন যে, তিনি নিজ কন্যা সতীকে ভোলানাথ-করে সমর্পণ করিতেছেন। পরে একদিন পিতৃমুখে গল্পচ্ছলে

ভোলানাথ করে কন্যা-সমর্পণ বার্তা শুনিয়া অবধি বালিকা-সতী ভোলানাথের পরিচয় জানিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। তপস্বিনীর নিকট শিবের পরিচয় পাইয়া সতী বলিলেন—

'ভোলা কেন গো সন্ন্যাসী ?
হয় সাধ মনে, আনি তারে করি গৃহবাসী।'

এই বাক্যটি দক্ষের প্রজারক্ষণ ও সমাজ-বন্ধনের সঙ্গে একার্থবোধক ছিল। বিপ্লবী দক্ষ মায়াবন্ধনের যে ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা যে ত্রুটি নহে, যথার্থ পন্থা, তাহা দেখাইবার জন্য সতী ঐরূপ বলিলেন। বিবাহ দ্বারা প্রজা-প্রজনন সমাজ-বন্ধনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তপস্বিনী সতীকে শিবের ত্যাগ-মাহাত্ম্য এই সুযোগে এইরূপে বুঝাইতেছেন :—

"কোথা আর আছে তাঁর স্থান ?
ব্রহ্মলোক, গোলোক, অমরপুরী
বিতরি অমরগণে, ভূতপ্রেত সনে
শ্মশানে করেন বাস।
হীনজনে স্নেহ অতি তাঁর।"

সতী মনে মনে শিবকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। আরাধনায় তুষ্ট হইয়া শিব সতীর সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তৎপ্রদত্ত বরমাল্য গ্রহণ করিলেন। সতী প্রার্থনা দ্বারা শিবকে জানাইলেন, —'প্রভু ভোলা তুমি, ভুল না আমারে।' মহাদেব এই কথার মধুর প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন—'ভোলা আমি তোর ধ্যানে সতি।' প্রকৃতিপুরুষের অদ্ভুত সমন্বয় নাট্যকবি ঐ দুইটি কথার ভিতর দিয়া সাধন করিয়া দিলেন। ব্রহ্মা তাই বুঝাইয়া বলিতেছেন :—

"পুলকে দেখরে তিন লোক,
শিব শক্তি ধরা মাঝে!
হবে ভবে প্রজার রক্ষণ,
হৈমবতী আপনি জননীরূপে।"

দক্ষালয়ে যজ্ঞের সংবাদ নারদ-প্রমুখাৎ শুনিয়া সতী জনকসদনে যাইবার নিমিত্ত মহাদেবের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। মহাদেব সেখানে তাঁহার অবমাননার কথা তুলিলে প্রকৃতিপুরুষ যে অভেদাত্মা সতী তাহা এইরূপে বুঝাইতেছেন :—

"প্রভু, ত্রিসংসারে তব অপমান,—
যজ্ঞভাগ না দিবে তোমারে,
তবে কেন ভাব মম অপমান হেতু ?
নাথ, তব মানে মানী,
তোমা বিনা এ সংসারে নাহি জানি,
নহি ভিখারিণী—রাজরাণী কেবা মম সম ?
পতিপ্রেম ঐশ্বর্য্য আমার।"

অতঃপর মহামায়া দশ মহাবিদ্যা-প্রভাবে মহাদেবকে বিমুগ্ধ করিয়া পিত্রালয়ে আসিয়াছেন। প্রসূতি সতীর আগমন-বার্তায় আনন্দিত হইয়া বলিলেন :—

"কৈ সতী, কৈ সতী মা আমার!
ওমা স্বর্ণলতা কালি হ'য়ে গেছে,
বুঝি স্বপ্ন ফলে গো আমার।
ওমা, মা আমার!
ওমা স্বপ্নে তোরে দেখিয়াছি কালী।
স্বপ্নে সতী ছেড়ে গেছে মোরে,
ওমা, মায়েরে কি ছেড়ে যাবি?"

সতী তদুত্তরে জানাইলেন :—

"ওমা, আইনু মা নিমন্ত্রণ বিনা,
তাই ত গো হ'লো দেখা।
ওগো সাধে কি হয়েছি কালী!
ও মা দুহিতা তোমার,
পতি বিনা নাহি জানে আর;
ত্রিসংসারে অপমান তাঁর
শুনিনু নারদ মুখে,
ভেবে কালী হয়েছি জননি।"

এই দ্ব্যর্থ-বোধক 'কালী' শব্দ-দ্বারা যজ্ঞের ধ্বংসাত্মক পরিণতি ও দুহিতার প্রতি স্নেহ উভয়ই প্রকাশিত হইয়াছে। শব্দ-চয়ন বিষয়ে নাট্যকবি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। যজ্ঞস্থলে পিতৃমুখে পতির প্রতি ধিক্কার শুনিয়া সতী বলিলেন :—

"চিরদিন পতি মোর শিখান সুনীতি,
জগৎগুরু মহাদেব!
পিতা! কন্যা আসে পিতার সদনে,
কালামুখ তাহে কিবা?
* * পিতা, শিবগুরু শতবার কব।
তুমি প্রজাপতি—সুনীতি শিখাবে ভবে,
পিতা হ'য়ে পতিনিন্দা শিখায়ো না মোরে।"

বার-বার পিতৃমুখে পতিনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া সতী যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে নন্দীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"যারে নন্দি! ফিরে যা কৈলাসে,
কহিস্ মহেশে,
জন্মিলাম অপমান হেতু তাঁর।
ছার প্রাণ আর না রাখিব।
* * দিগম্বর! ক্ষমা কর অধিনীরে—
এ অন্তিমে হৃদ্-পদ্মে দেহ আসি দেখা,
ভোলা, ভোলা! কোথা তুমি এ সময়!"

হৃদয়কোরক প্রস্ফুটিত হইবার কালে পিতৃমুখে 'ভোলানাথ' নাম সতী প্রথম শুনিয়াছিলেন। দেহাবসান কালেও সেই 'ভোলা' শব্দ উচ্চারিত হইল। মহামায়ার সকলই মায়াময়! নাট্যকবি সতী চরিত্রের দেবীভাব কোথাও ক্ষুণ্ন করেন নাই, অথচ মানবীদেহের সহিত ঐ ভাবের অপূর্ব সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

তপস্বিনী চরিত্রটি পৌরাণিক নহে, নাটককারের মৌলিক সৃষ্টি। তপস্বিনীকে লীলা-সহচরী করিবার জন্য মহামায়া নিজ দেহ হইতে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। যাহাতে সতীর কল্যাণ সাধিত হয় তপস্বিনীর উপর প্রসূতি সেই ভার দিয়াছিলেন। তপস্বিনী তাঁহার ধ্যাননেত্রে সতীর ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি ও বিধাতার নবসৃষ্টি কৌশল নিম্নলিখিত ভাবে দেখিয়াছিলেন :—

"ওরে নবীন নয়ন! যার বরে হও প্রস্ফুটিত;
হের বিস্মৃতকালের দ্বার উদ্‌ঘাটিত সম্মুখে তোমার।
এ কি, একাকার একার্ণব!
মহান্ উদ্ভব কে পুরুষ তিনজন?
হের-হের তব ভাতি সম তরুণ তপন,
হের ফোটে শশী; নবীন জীবনে ঝিকি-ঝিকি
ঝকে তারাগণ। দেখ-দেখ নবীন পবন
দ্বন্দ্ব করে নীর সনে! হের তরঙ্গ বিশাল;
দেখ, দেখ—স্তম্ভিত লহর মালা!
নাহি আর বিলোল লহরী,
সোপানিত ধবল কৈলাস;
হৃদাকাশে বিকাশে নবীন ছবি;
কে রে বামা হর-উরু পরে?
ডরে না পবন চলে! আহা এলোকেশী
—দোলে রাঙা পা-দুখানি! আহা
রজত-মৃণাল করে বামারে কে আদরে রে—
ধ'রে কায়-কায? মুখ পানে চায়,
না ফিরে নয়ন আর! ছি! ছি!
লজ্জাহীন কেমন সন্ন্যাসী?
উলঙ্গ, কি রঙ্গ হের!
একি ঘোর আবরণ!
রে নয়ন আর না দেখিতে পাই।"

নাট্যকবির লেখনীমুখে একার্ণব হইতে জাগতিকরূপ কি সুন্দরভাবে রূপায়িত হইয়াছে! পুরুষ-প্রকৃতির কি অপূর্ব মিলন সংসাধিত হইয়াছে! নাটকের দর্শক বা পাঠক একান্তে বসিয়া ইহা উপভোগ করুন। তপস্বিনীর কৌশলে হর-গৌরীর মিলন সাধিত হইয়াছিল। ঘটনার সংযোজনার জন্যই এই চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে তজ্জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত স্থানে তপস্বিনীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই।

প্রসূতি চরিত্রে একাধারে রাজ্ঞীত্ব, মাতৃস্নেহ ও পতিভক্তির সুন্দর চিত্র নাট্যকার চিত্রিত করিয়াছেন। ভক্তিমতী জননীর প্রেম যেরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় প্রসূতি চরিত্রে তাহার অভাব ছিল না। নিজে সতী ছিলেন বলিয়া সতীত্বের মহিমা তাঁহার কাছে অবিদিত ছিল না। সতী-নারী ছায়ার ন্যায় পতির অনুগামিনী হন্ সত্য, কিন্তু পতির অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্কের প্রয়োগ করিতে প্রসূতি পশ্চাৎপদ্ হন নাই। পাষাণ-মূর্তি দক্ষের নিকট প্রসূতির সমুদয় অভিমান-অভিযোগ বৃথা হইল। সতী বা হরের নাম দক্ষপুরীতে নিষিদ্ধ বচন হইয়া দাঁড়াইল। তপস্বিনীর প্ররোচনায় স্বামীর কল্যাণ কামনা করিয়া প্রসূতি শিবপূজায় মনোনিবেশ করিলেন। ইহাতে হিতে বিপরীত ফল ফলিল; স্বামীর কাছে তিনি অপরাধিনী হইলেন।

সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন। যজ্ঞস্থলে দক্ষের দর্শন না পাইয়া প্রসূতি কন্যা-শোক ভুলিয়া পতিশোকে কাতর হইয়া নিতান্ত ভক্তিমতীর মতো মহাদেবের কাছে পতিভিক্ষা করিলেন। প্রসূতির ভাষা তখন এইরূপ :—

"জানি প্রভু পতি মোর দোষী,
ওহে প্রেমময় পরম সন্ন্যাসী,
তবু আমি দাসী তাঁর। সতি-পতি,
পতি দেহ মোরে, সতীর জননী যাচে।
তুমি প্রভু, জগতের পতি,
কুমতি-সুমতি সকলই হে সনাতন।
দক্ষ কেবা—নিন্দিবে তোমায় ?
তোমার ইচ্ছায় শিব-দ্বেষী হ'ল পতি।
ওহে অগতির গতি,
কর দয়া পতিহীন জনে।
ভোলা দিগম্বর, তুষ্ট হও হর।
দেখ হে অন্তর—অন্তর্যামী ভগবান্ ;
মোর প্রাণে কি আঘাত দেছে সতী।
তাহে পতিহীনা,
কর হে করুণা,
শিবময় করুণা আধার।"

প্রসূতির প্রার্থনায় যজ্ঞস্থলে ছাগমুণ্ডধারী দক্ষের আবির্ভাব হইল। দক্ষের আসল মুণ্ড পূর্বেই যজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রসূতি চরিত্রটি নাট্যকবির তুলিকায় বিশিষ্টরূপ পাইয়াছে।

মহাদেব এই দৃশ্যকাব্যের সর্বশেষ প্রধান চরিত্র, কিন্তু নাট্যকবির অঙ্কন-গুণে সর্ব প্রধান চরিত্র বলিলেও চলে। নাট্যসাহিত্যের পাঠক বা দর্শকেরা ইতঃপূর্বে যাত্রাভিনয়ের মহাদেবের সহিত পরিচিত ছিলেন। সে চরিত্রে বৈচিত্র্য ছিল না। মহাজ্ঞানী ও প্রেমিককে গঞ্জিকাসেবীরূপে চিত্রিত দেখা যাইত। গিরিশচন্দ্র মহাদেব চরিত্রে বৈশিষ্ট্য আনিয়াছেন। যিনি যুগে যুগে মহাশক্তির

আরাধনায় ভোগৈশ্বর্য পরিত্যাগপূর্বক শ্মশানবাসী হইয়াছিলেন, মাতৃ নাম-মাহাত্ম্য প্রচারে যিনি পঞ্চমুখ, মহাশক্তির ক্ষণিক অদর্শন তিনি সহ্য করিবেন কিরূপে!

প্রথমে দক্ষযজ্ঞের পরিণাম চিন্তা করিয়া মহাদেব সতীকে দক্ষালয়ে বিদায় দিবারকালে এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

"সতি। না জানি কি আছে তব মনে ;
তুরীয় তোমার লীলা !
সতি, তুমি অন্তরে বাহিরে,
হৃদ্‌পদ্মে তব রূপ,—সেরূপ বিরূপ কেন হেরি ?
কাঁদে প্রাণ অভিমানে,—
হৃদ্‌পদ্মে ফিরে নাহি চাহে সতী ;
কহ হৈমবতি, কোন্ দোষে দোষী দাস ?
কেন হৃদ্‌পদ্ম শূন্য জ্ঞান হয় ?
হের বক্ষবাহি বহে ধারা,
তারা হারাব কি তোরে আমি ?
কারণ-বাসিনী, তব মর্ম বুঝিতে অক্ষম !"

সতী হরের ঐ কথা শুনিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন :—"বিশ্বনাথ, অত ভাঙ, নাহি দিব আর।" মহাদেব কিন্তু ইহার চমৎকার উত্তর দিয়াছিলেন :—

"বিষপানে রহিল চেতন—কৃপায় তোমার দেবি !
এবে ভাঙে হই অচেতন কৃপার অভাব তব।"

অশিব কল্পনা শিব চরিত্রে সম্ভবে না, তাই নারদের বিরুদ্ধ প্ররোচনার উত্তরে শিব নির্বিকার চিত্তে বলিলেন :—

"কি সম্ভব, কিবা অসম্ভব –
জ্ঞানাতীত জেনো সার।
ইচ্ছাময়ী শক্তির প্রভাবে কি ফল ফলিবে—
কে পাইবে তত্ত্ব তার ?
ইচ্ছায় সংসার, লয় বার-বার,
ইচ্ছাময়ী ইচ্ছার প্রভাবে ;
ইচ্ছায় মহেশ, ব্রহ্মা, হৃষীকেশ,
সে ইচ্ছায় যজ্ঞ আয়োজন,—
শুন তপোধন, হও সেই ইচ্ছাধীন।"

রিপুঞ্জয়ী শিবের মনে নারদ বিকার উপস্থিত করিতে পারিলেন না, শিব তখনও বলিতেছেন :—

"দ্বেষ নাহি স্পর্শে মোরে ঋষি।
রহ কার্যে, কার্য বিনা নাহি পরিত্রাণ।
ইচ্ছায় তাঁহার, হের কার্যে ব্যাপৃত সংসার ;

কার্য হেতু সৃষ্টি মম ;
সত্ব, রজ, তম—ত্রিভাগ এই কার্য হেতু
এক শক্তি অনন্ত আধারে
কার্য করে অনন্ত আকার,
অহঙ্কারে ভাবে 'আমি করি'
ত্যজ অহঙ্কার, নির্ব্বিকার কার্যে রহ রত।
ফলাফল দেখি কিবা প্রয়োজন ?
ফলে কার্য যেই শক্তি বলে,
ফলাফল কর তাঁরে সমর্পণ।"

মহাদেব পৃথক অস্তিত্বের কামনা রাখিতেন না, সতী বিনা তিনি শিব নহেন, শব মাত্র এইরূপ বুঝেন। দক্ষযজ্ঞ সম্বন্ধে নারদের মনে যে বিরুদ্ধ কল্পনা জাগিয়াছিল তাহার নিবৃত্তি-কল্পে মহাদেব তাঁহাকে সবশেষে এইরূপে বুঝাইলেন :—

"যজ্ঞপূর্ণ হইবে নিশ্চয়,—
সামান্য সে নহে দক্ষপতি,
যার তপে তুষ্টা ভগবতী,
জন্মিলা তনয়া রূপে ঘরে,—
তিন লোকে হেন শক্তি কার, যজ্ঞবিঘ্ন করে তার ?
আমি শিব যে শক্তি-অধীন,
সে শক্তি প্রভাবে যজ্ঞ করে দক্ষপতি :
যজ্ঞ হবে—যাবে অহঙ্কার।
প্রেমে, নহে অহংকারে প্রজা রবে ভবে,—
ভ্রমে দক্ষভাবে অহঙ্কারে রবে ভবে জীব,
সে ভ্রান্তি ঘুচিবে ; প্রেমে রবে ধরা—
যজ্ঞে হইবে প্রচার।"

দক্ষযজ্ঞের মূলতত্ত্ব শিবের উপরিউক্ত বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। মহামায়ার মায়ায় জীব ও জগৎ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে ; কার্য-কারণ সম্বন্ধ জীব কিরূপে বুঝিবে. কার্য দেখিয়া কারণের অনুমান জন্মে এবং কারণ দেখিয়া কার্যের সংঘটন যে হইবে তাহা বুঝা যায়। কিন্তু কোন্‌টা কি কার্য এবং কোনটাই বা তাহার কারণ তাহা দুজ্ঞেয়। মহামায়া বুঝাইয়া না দিলে বুঝা যায় না। সত্ব-রজ-তমোগুণে প্রকৃতির যে লীলা চলিতেছে—তাহার একটির বিপর্যয়ে সমুদয়টি বিপর্যস্ত হইয়া উঠে। এই সত্য-তত্ত্বটি দক্ষযজ্ঞ নাটকের মধ্য দিয়া গিরিশচন্দ্র প্রমাণিত করিলেন।

সংগীতবিভাগে নাটককার ক্রমশঃই নিপুণ হইতে নিপুণতর হইতেছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত সংগীতগুলি প্রায় শতাব্দী অতিক্রম করিবার উদ্যোগ করিলেও অমর হইয়া রহিয়াছে :—
(১) 'ফিরে চাও প্রেমিক সন্ন্যাসী। ঘুচাও ব্যথা কও না কথা, কা'র প্রেমে হে উদাসী ?' (২) 'এলো তোর খ্যাপা দিগম্বর।' (৩) 'ওহে হর, বাঘাম্বর, কৃপা কর অবলায়।' (৪) 'নাচ বাহু তুলে,

ভোলা তাবে ভুলে।' স্থানাভাবে গানের প্রথম ছত্র মাত্র উদ্ধৃত হইল। এ নাটকখানি তত্ত্বপূর্ণ হইলেও বিষাদান্ত।

মনোমোহন বসু ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে তাঁহার সতী নাটক অভিনয় করাইয়াছিলেন। ঐ নাটকটি অতিরিক্ত গার্হস্থ্যভাবাপন্ন হওয়ায় সতীর দেবীভাবের সঙ্করণশীলতার ব্যাঘাত করিয়াছিল। ঐ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মনোমোহনের কাল-মধ্যে দ্রষ্টব্য।

ধ্রুবচরিত্র নাটক

গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী পৌরাণিক নাটক ধ্রুবচরিত্র ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগস্ট তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ গুমুখ রায়ের স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। মহাভারতের কেন্দ্রবর্তী উপাখ্যান-ভাগ না লইয়া পার্শ্ববর্তী গল্পাংশ হইতে ইহার আখ্যান-বস্তু গৃহীত হইয়াছিল। ধ্রুবের তপস্যা ও হরিপাদপদ্মলাভ ইহার ঘটনা। পূর্ণবয়স্কের চরিত্র-চিত্রণ ব্যাপারে নাটককার ইতঃপূর্বে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। শিশু-চরিত্র-গঠনে তাঁহার হস্তকৌশল দৃশ্যকাব্যে এই প্রথম প্রদর্শিত হইল।

সপত্নীর মামুলি ঈর্ষা এ নাটকেও আছে। সুরুচির অন্তর্জ্বালার মধ্যে

> 'নাহি গেল ছোট রাণী নাম।
> ছোট, ছোট, ছোট।
> ছোট হ'যে চিরদিন কেন রব ?
> *   *   *
> যদ্যপি আমার, অংশ কেন দিব সতিনীরে ?'

এই চিন্তাই সর্বোপরি হইয়া উঠিল।

প্রথমা মহিষী সুনীতি স্বামীর সন্তানমুখ মিটাইবার আশায় স্বেচ্ছায় সপত্নী-পীড়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা -

> 'চিরদিন নৃপতির সন্তানের সাধ,
> অভাগিনী নারিনু সন্তান দিতে কোলে
> তাই মাটি খেয়ে কহিনু রাজায়
> বিবাহ করিতে পুনঃ।'

সুনীতির সহিষ্ণুতা অপরিসীম ছিল, তাই তাঁহার মনোবেদনার চূড়ান্ত আক্ষেপ-ধ্বনি সপত্নীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তাড়নায় ধীরভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে :—

> 'বল যত আসে মুখে,
> কোন্ দিন নাহি সহি ?
> সকলি ত সয়, সয় যবে পতির বিরহ।'

এই কথাগুলির মধ্যে বেদনার তীব্রতা থাকিলেও প্রতিহিংসা-বৃত্তি ছিল না।

সুরুচির প্ররোচনায় বড়রাণী সুনীতি বনে বিসর্জিতা হইলেন তাহাও আবার ছলে, বিদূষকের উপর সে ভার অর্পিত হইয়াছিল। বন পথের প্রথম পীড়া আরম্ভ হইলে অনভ্যস্তা সুনীতি বিদূষককে বলিলেন :—

"ডাক প্রাণনাথে—আর না চলিতে পারি।
হের শ্রমবারি ঝর্ ঝর্ ঝরে গায় ;
ছিন্নকায় কণ্টকের ঘায় ;
রাজার মহিষী, বনে কবে আসিয়াছি বল ?
বল গিয়ে প্রাণনাথে, অপরাধ নাহি লন,
আর নারি চলিবারে,
কৃপা করি আসুন এ স্থানে।"

কিন্তু পরে বিদূষকের মুখে স্বামীর আসল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়াই সুনীতি বলিলেন :—

"গুণমণি কৃপা করি দেখা দাও।
খেদ নাই ঠেলেছ হে পায়,
দাসী চায় এ অন্তিমে দরশন।
স্মরি পদ বিপদে পড়িয়ে,
পতি বিনা কে আছে নারীর ?"

ধ্রুবের মতো অলৌকিক চরিত্রবান্ শিশুর জন্ম-পরিবেশটি নাট্যকবি কিরূপ দক্ষতার সহিত সৃষ্টি করিবার আয়োজন করিতেছেন, তাহা সাধারণের দেখিবার ও বুঝিবার সামগ্রী হইয়াছে। সুনীতির অতৃপ্ত স্বামীভোগ-স্পৃহা মুনিপত্নিগণের সহবাসে দমিত হইল না। দৈনিক আশ্রম-জীবন-যাপনের মধ্যে তাঁহাদিগকে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন :—

"লইয়ে কলসী—বারি লয়ে আসি,
জলে যদি হেরি মুখ,
লজ্জা পাই মলিন দশায় মোর,
পাছে পতি মোরে দেখে।
হেরি ফুলকুল অতুল আদরে,
ভাবি বনফুল-হারে,
গেঁথে দিব মালা গলে।
ওমা প্রাণ তো বোঝে না,
নিত্য করি কুটীর মার্জনা,
নিত্য নবপাতা সাজাই শয্যার পরে ;
নিত্য-নিত্য বিফল বাসনা,
তথাপি কামনা নিত্য-নিত্য জাগে প্রাণে,
এত দুঃখে মরণে না হয় সাধ।"

সুনীতি তাঁহার স্বগতোক্তির মধ্যে একস্থানে আরও বলিতেছেন :—

"প্রাণনাথে পূজেছিনু অট্টালিকা মাঝে ;
প্রাণ চায়, বারেক পূজিতে তাঁরে এ বিজন বনে।

ধুই পা-দুখানি, খুলে বেণী যতনে মুছাই ;
দুর্বাদলে তরুতলে আদরে বসাই,
ফুল তুলে দিই উপহার।
আনি বনফল, নিঝরের জল,
পদ্মপত্রে সলাজে নিকটে রাখি,
প্রভু যদি কুটীরেতে যান,
ঢাকিয়ে বয়ান পাছু পাছু যাই ধীরে।
আরে আরে কেন প্রাণ হও উন্মাদিনী ?"

মৃগয়া করিতে আসিয়া দুর্যোগের মধ্যে ঘটনা-চক্রে সুনীতির সহিত রাজার মিলন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। রাজার প্রেমসুধা বর্ষণের মুখে চিরাকাঙ্ক্ষিতের ভাষায় সুনীতি বলিলেন—

'নাথ, নাথ কত বল।
চিরদিন পিপাসী এ প্রাণ,
মত্ত হবে এত সুধা পানে।'

নিশায় আকাঙ্ক্ষিতার বহু ইপ্সিত মিলন সম্পাদিত হইল। প্রভাতে উঠিয়া স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হইবার কালে সুনীতির বিদায়-কালীন ভাষা কি মর্মস্পর্শী ! :—

"দেখা পাই বা না পাই,
মনে রেখো কিঙ্করী তোমার ;
আর ভার নাহি দিব প্রাণনাথ।
* * নাথ! আমি কাঙ্গালিনী—
যাচ্ঞা অধিক নাহিক মোর।
সাধ নাথ মিটেও মেটে না।
অধিক মিনতি নাহি করি শ্রীচরণে,
কভু মনে ক'রো বনবাসী দাসীরে তোমার,
তৃষ্ণা মম পয়োধি শুষিতে চাহে।
* * এস নাথ, কত ক্লেশ পেয়েছ কুটীরে ;
সাধ হয় মরণ সময়,
মরিব তোমারে হেরে ; কিন্তু নহি ভাগ্যবতী,
অধিক মিনতি আর পদে না করিব,
মনে প্রভু রাখ বা না রাখ,
ব'লে যাও রাখিব হে মনে।"

এই তপোবন-পরিধির মধ্যেই ধ্রুব যথাকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ধ্রুবের সহিত দর্শক বা পাঠকসমাজের প্রথম পরিচয়—'আজ খেল্‌বো খালি, ঘরে যাব না' শীর্ষক গানখানির মধ্য দিয়া হইয়াছে। গৃহত্যাগ ও ভাবী তপস্যার ইঙ্গিত ঐ গানটির ভিতর রহিয়াছে। ধ্রুবের সারল্য ও সত্যনিষ্ঠা তাহার বাল্যসহচরগণের সহিত ক্রীড়াসুলভ কথোপকথনের মধ্যে, যথা—'মা যে

ব'লেছে চোর হ'তে নাই' এবং 'মাকে যে ভাই সব বল্‌তে হয়' বাক্য দুইটিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ধ্রুবের উত্তম বসন-ভূষণের অভাবজনিত বেদনা সুনীতির অপত্যস্নেহকে আরও গভীর করিয়া তুলিল, তাই মুনিপত্নিগণকে তিনি বলিতেছেন—

'অভাগিনী আমি, অধিক না চাই ;
যেন বেঁচে থাকে ধ্রুব মোর কর আশীর্বাদ,
মা বলে ডাকুক্‌ চিরদিন।'

শৈশব সঙ্গীদের সহিত নাচিয়া-গাহিয়া ধ্রুবের দিন কাটিতে লাগিল। পূর্ব-পূর্ব জন্মকৃত সাধন-সংস্কার ধ্রুবের সংগীতের ভিতর দিয়া বাহির হইয়াছিল। ধ্রুব গাহিল—'ফুটিলে ফুল ধ্রুব তোলে না, ফুলে পূজা হ'বে তা'ত ভোলে না'—ইত্যাদি।

একদা সহচরের প্ররোচনায় ধ্রুব উত্তানপাদ রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিজ পরিচয় দিয়া উত্তম বসন-ভূষণ চাহিল। রাজা মুগ্ধহৃদয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ক্রোড়ে লইবার জন্য ধ্রুবের হস্তধারণ করিলে ধ্রুব একপদ রাজ-সিংহাসনে অপর পদ মৃত্তিকায় রাখিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে বিমাতা সুরুচি তদবস্থ ধ্রুবকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন :—

'কভু কিরে ভজেছিলি হরি,
সিংহাসনে পাবি স্থান ?
ত্যজি কলেবর,
জন্ম-জন্মান্তরে হরির সাধন করি,
পার যদি জন্মিতে জঠরে মোর,
তবে তোর পূরিবে বাসনা।'

বিমাতার এবংবিধ কথায় ধ্রুব বিস্ময়-বিমুগ্ধের মতো বলিয়াছিল :—

'কেন তুমি কর মানা ?
দেখিলাম আসিতে নগরে,
পিতা কোলে করে সবাকারে,
আমি যাই পিতার সদন,
কি কারণ কর গো বারণ ?
মহারাজ পিতা মম, থাকি বনে,
আসিয়াছি বসন-ভূষণ তরে,
কোলে লও পিতা ?'

ধ্রুব বিমাতার কটুবাক্য শুনিয়া ও পিতার নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া পথিমধ্যে রাজবয়স্য বিদূষকের স্নেহলাভ করিতে পারিয়াছিল। ধ্রুব তাই প্রথমেই বিদূষককে এইরূপ প্রশ্ন করিল :— 'কার করিলে সাধন পিতা লন কোলে ?' বিদূষক এগুলি আশাহতের কথা বুঝিয়া তাহাকে বসন দিতে চাহিলে, রাজপুত্র ধ্রুব ভিক্ষুকের মতো অপরের নিকট হইতে উহার প্রার্থী হইল না, তাই তাহা জানাইবার জন্য বিদূষককে এইরূপ স্তোকবাক্য বলিল :—

'আর অলঙ্কার নাহি চাহি—
মার কাছে যাই,
সুধাইব কার পদ করিলে সাধন—
পিতা দেন আলিঙ্গন।'

বিদূষক ধ্রুবের এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর এড়াইবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্যবিধ উপায়ে সান্ত্বনা করিতে চাহিলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধ্রুব দ্বিতীয়বার তাঁহাকে ঐ প্রশ্নই করিয়াছিল, বিদূষক তখন বলিতে বাধ্য হইল—

'নাহি কাঁদ শিশু, হরিপদে রাখ মন,
আশীর্ব্বাদ করি আকিঞ্চন পূরিবে তোমার।'

সংশয়-পীড়িত অভিমানী ধ্রুব মাতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল—

'কোথা হরি বল মা আমায়,
সাধন করিব তাঁরে,
হরির না করিলে সাধন যেতে নাই পিতৃস্থানে,
কেন মোরে বলনি জননি ?'

নানারূপ প্রশ্ন ও পরিপ্রশ্নের দ্বারা ধ্রুব মাতার কাছে জানিতে পারিল যে, হরি পদ্মপলাশলোচন এবং মহাবনে তিনি থাকেন। মাতৃমুখে জটিলের গল্প শুনিয়া আরও সে জানিতে পারিল যে, বিপদে পড়িলে 'দাদা—দাদা' বলিয়া ডাকিলেও হরি বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। মাতার এইরূপ প্রবোধ-বচন লইয়া ধ্রুব সে রাত্রিতে নিদ্রা গিয়াছিল। কিন্তু সে সহসা নিদ্রোত্থিত হইয়া বলিল—

'তবে আর ভয় কিবা, মা—
না জাগাব না,
জাগিলে মা যাইতে দিবে না।
নাই, ভয় নাই আর,
বনে ডাকিলেই দেখা পাব ;
নহে কেন জটিল দেখিল ?
দয়াময়। পদ্মপলাশলোচন হরি।
কাঁদিবে জননী—
কিন্তু হরি-সাধন-বিহীন আমি,
দুঃখিনীর কি করিব উপকার ?'

এইরূপ সংকল্প-বিকল্পের মধ্যে নিদ্রিত মাতার নিকট হইতে ধ্রুব নিম্নলিখিতরূপে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল:—

'ধ্রুব মাগে বিদায় জননি, যদি,
দেখা পাই হরি পদ্মপলাশলোচন,
আসিব মা বন্দিতে চরণ।
নহে, জনমের মত বিদায় মাগে গো ধ্রুব ;
কোথা পদ্মপলাশলোচন।'

মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত ধ্রুবের হরিসাধনার প্রথম সোপান হইল—'হরি পদ্মপলাশ-লোচনের নাম-জপ'। পূর্ব জন্মার্জিত সংস্কার যখন তাহার এই সাধনার সঙ্গে আসিয়া যোগ দিল, পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর মুখে বালকোচিত 'হা-হুতাশ তখন আর দেখা গেল না, যুবকের দৃঢ়তা ঐ স্থান অধিকার করিল। সে তখন বলিতে পারিল—'যদি পদ্মপলাশলোচন না পাই, জলে ঝাঁপ দিব, ছার প্রাণ রাখ্‌ব না, যে জীবনে পদ্মপলাশলোচন দর্শন পেলেম না, সে জীবন বৃথা, জীবন আর রাখ্‌ব না।' ধ্রুবের সাধনার এই দ্বিতীয় সোপানে মহাদেব পথনির্দেশকরূপে ও নারদ গুরুরূপে দেখা দিয়া তাহার সাধনা পূর্ণ করিবার জন্য তাহাকে পরিচালিত করিলেন। তপস্যার আন্তরিকতা পরীক্ষার জন্য তপোবিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল,—এটি সাধনার তৃতীয় বা শেষ সোপান। এই সোপানের কৃচ্ছ্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ধ্রুব আকাঙ্ক্ষিত হরিপাদপদ্ম ও ধ্রুবলোক নামে অখণ্ডিত এক ভক্তিরাজ্য লাভ করিয়াছিল। ধ্রুবের চেষ্টায় তাহার মাতাপিতা ও বিদূষক হরিচরণ লাভ করিলেন। নাটককার বালকোচিত ঘাত-প্রতিঘাত ও সাধনোচিত সংঘাতের মধ্য দিয়া ধ্রুব চরিত্র বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

তাঁহার পৌরাণিক নাটক-নিচয়ের মধ্যে এই নাটকেই নাটককার সর্বপ্রথম বিদূষক চরিত্রের সমাবেশ করিলেন। 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকের 'পাগ্‌লা ব্রাহ্মণ' বিদূষকের অগ্রদূত রূপে দেখা দিলেও সে চরিত্রটি বিদূষকের প্রকৃত গুণসম্পন্ন ছিল না। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে 'বিদূষক' নামক পৃথক পরিচ্ছেদে দেওয়া হইবে।

ধ্রুবের পিতা উত্তানপাদ রাজা স্ত্রৈণ ছিলেন। দ্বিতীয় পত্নী সুরুচির প্রতি তাঁহার যে টান ছিল তাহা রূপজ ও প্রৌঢ়ের যুবতী সঙ্গলাভেচ্ছায় মোহসঞ্জাত, তাই তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। রাজা একস্থানে বিদবককে এইরূপ বলিয়াছেন :—

"নাহিক অভাব, মনে মম অভাব সকলি।
ভাবহীন প্রাণ বহি। কি বুঝিবে সুখে দুঃখ কত।
রাণী রাজা ব'লে ভালবাসে,
বয়স্য না সত্য বলে ত্রাসে;
না চাহিতে সিদ্ধ হয় প্রয়োজন;
আকিঞ্চন, আশা, হৃদে নাহি করে বাসা আর।
পরিতোষ, পরিতোষ!
অসন্তোষ এ হ'তে অধিক কি বা।"

ভোগৈশ্বর্যের কৃত্রিমতার মধ্যে রাজা সুখ শান্তি খুঁজিয়া পান নাই, তাই পূর্বোক্তরূপে মনোখেদ জানাইয়াছেন। কৃত্রিম শৃঙ্খলা অপেক্ষা অকৃত্রিম বিশৃঙ্খলায় সুখ আছে, তাই রাজা পুনরায় বলিতেছেন :—

'বনে ব্যাঘ্র নাহি শুনে রাজা আমি,
ভয়ে কুরঙ্গ না লুটে পায়,
তরুলতা সম্ভ্রমে না নমে,
রাজ্যে কপটতা চারিদিকে।'—

এই বাক্যগুলির মধ্যে রাজার অন্তর্বেদনা স্পষ্ট অনুভূত হইয়াছে। এইরূপ অনুশোচনা প্রাণে জাগিয়াছিল বলিয়াই রাজা পরিণামে হরিপাদপদ্ম লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

সংগীতবিভাগে নাটককার ক্রমশঃই সিদ্ধ-হস্ত হইতেছিলেন। 'আয়রে আয় হরি ব'লে বাহুতুলে নেচে আয়' প্রভৃতি গানগুলি বহু প্রখ্যাত হইয়াছিল। নাটকের উপসংহারকালে মহাদেব ও নারদের দীর্ঘ-সংলাপের মধ্যে নাটকীয় কৌতূহলটি আক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে লাগিল, প্রথিতযশা নাট্যকারের এ দোষ গৌরব-হানিকর সন্দেহ নাই, কিন্তু গিরিশচন্দ্র তখনও নাট্যসাহিত্যে জাদুকরের ন্যায় সিদ্ধ-হস্ত হইতে পারেন নাই। নাটকখানি মিলনাত্মক।

নলদময়ন্তী নাটক

গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী নাটক নলদময়ন্তীর গল্পাংশ মহাভারত হইতে গৃহীত; ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ স্টার থিয়েটারে ইহা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের প্রাথমিক পৌরাণিক নাটক-সমূহের মধ্যে এ দৃশ্যকাব্যখানিতে তাঁহার প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় আছে।

হংসমুখে সংবাদ পাইয়া এই দৃশ্যকাব্যের নায়ক নলের মনে দময়ন্তীপ্রাপ্তির আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল। নল তখন যুক্তির অবতারণা করিয়া বলিয়াছিলেন—'আরে মন। রত্ন কার করে আশা? ত্রিভুবন রত্ন করে আকিঞ্চন?' প্রেমিকের মনের স্বাভাবিক ধর্ম অনুসারে নল তৎপরে বলিয়াছেন:—'হায়। কেন মনে হয় সে আমায় ভালবাসে।' মানুষের মনের দ্বন্দ্বের সহিত স্বভাবের মিল নলের মুখে নিম্নলিখিত কথার মধ্য দিয়া নাট্যকবি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন:—'দেখ সখা।—ব্যাকুল ভ্রমর গুঞ্জরি' জানায় মনোজ্বালা; মুদিত নলিনী ফিরে নাহি চাহে আর; এ কি— এ কি কঠিন ব্যাভার! দেখ সখা, নিরাশায় ভ্রমরা ফিরিল।'

নল পুণ্যশ্লোক রাজা ছিলেন, ধর্মের মূলনীতি তাঁহার অবিদিত ছিল না, তাই দেবতারা যখন দময়ন্তীর করপ্রার্থী হইলেন, তখন নলের চিন্তা এইরূপ দাঁড়াইল:—'আরে, সত্যঘাতী মন। কেন হ'ও বিচঞ্চল? * * দুর্লভ রতন, পার যদি, যত্নে কর দেবে সমর্পণ। * * যদি ভালবাস, সুখে তার কি হেতু অসুখী তুমি?' কিন্তু মুখে বলিলেও নলের অন্তঃকরণ তখনও প্রস্তুত হয় নাই, তাই বলিয়াছেন:—'ছি। ছি। দুর্নিবার নয়নের ধার।'

রাজা নল দেবাদেশে তাঁহাদের দৌত্যকার্যের ভার লইয়া স্বয়ং দময়ন্তী সকাশে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং দময়ন্তীকে দেবতাদের মধ্য থেকে কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিয়া লইবার কথা বলিলেন। দময়ন্তী কিন্তু তাহার নিম্নলিখিত উত্তর দিয়াছিলেন:—'* * নহি দ্বিচারিণী; হংসমুখে শুনি, তব পায়ে দিছি প্রাণ, আশ্রিতে হে ক'র না আঘাত; আমি নারী, বাঞ্ছা করি নরে, না চাহি অমরে;—নল মম হৃদয়ের রাজা।' দময়ন্তীর এবংবিধ কথায় নলের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। নল তখন দৃঢ়তার সহিত সে চাঞ্চল্য দূর করিয়া দময়ন্তীকে বুঝাইতেছেন যে, 'দেব কার্যে নরে ধরে দেহ ইত্যাদি'—কিন্তু দময়ন্তীর এবারকার উত্তরে নল নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। উত্তরটি বাস্তবিকই প্রাণস্পর্শী:—

'প্রভু, কি দিয়া করিব দেব পূজা?
দেহপ্রাণ,—কিছু আর নহে মোর,
দেবগণে সাক্ষী করি' কহি—
সকলি হে দিয়েছি তোমায়;

জানি নাথ, তুমি হে আমার,—
দানে তব নাহি অধিকার।'

প্রশান্ত উচ্চাশয় ও ধর্মিষ্ঠ নল স্বয়ংবর সভায় দময়ন্তী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কলিদেবের জিঘাংসার লক্ষ্যীভূত হইয়া ভ্রাতা পুষ্করের মায়া অক্ষক্রীড়ায় কিরূপে হৃতসর্বস্ব হইয়াছিলেন পুরাণ-পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। কলিগ্রস্ত নল দময়ন্তীর কাছে জন্মের মত বিদায় প্রার্থনা করিতে আসিলে দৃশ্যকাব্যের দময়ন্তী যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা ইতঃপূর্বের নাট্য-সাহিত্যে বিরল :—

"কারে নাথ। দাও হে বিদায়?
আমি ছায়া তব, বরিয়াছি নল মম প্রাণেশ্বরে,
বরি নাই রাজা নল। আমি পত্নী তব,—
কোথা রব তোমা ছেড়ে? * *
বার-বার বলেছ আদরে—
আমি তব জীবনের সহচরী। * *
দিন যাবে ;—এ কুদিন নাহি রবে।
গেছে রাজ্যধন—জীবন যাপন পরিশ্রমে অনায়াসে হবে।
"কুটীর বাঁধিব,—সুখে তথা রব দুইজনে।
উঠিব প্রভাতে বন্দী বিহঙ্গম-গানে ;
তরুগণ ফলে-ফুলে রাজকর দিবে ;
কুরঙ্গ, ময়ূরী আসি' ধীরি-ধীরি
অতিথি হইবে কত ;
প্রেমের সংসার—দিন বয়ে যাবে সুখে।"

দময়ন্তীর চরিত্রবল ও পত্নীত্বের গরীয়সী মহিমা বাস্তবিকই অপূর্ব। কলির প্রভাবে নলের প্রকৃতি চঞ্চল হইলেও তখনও তিনি দুর্মতিগ্রস্ত হন নাই। দময়ন্তীর মুখে নলের তখনকার প্রকৃতি এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে :—

'ধৈর্য্য-বীর্য্য-গাম্ভীর্য্য
যাঁহার প্রচার ভুবনময়,
ক্ষিপ্তপ্রায় চঞ্চল প্রকৃতি,
খানেক নহেন স্থির। শূন্য অভিপ্রায়,
পুতলীর প্রায়, যথা আঁখি ধায় যান তথা।'

স্বামীর বর্তমান অবস্থান্তর জনিত খেদ দময়ন্তী প্রকৃত প্রণয়িনীর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"হায় প্রাণেশ্বর মম—
কতযত্নে রেখেছিল মোরে।
উপবনে অরুণ-কিরণে হ'ত যদি রঞ্জিত বদন,
করে ধ'রে যতনে আমার প্রাণনাথ বসিতেন তরুতলে
বস্ত্র দিয়ে মুছাইয়ে মুখ,

রণে যেতে শতবার শুধিতেন মোরে—
'অঙ্গে কি লেগেছে ব্যথা ?'
হায়! যতকথা সব আছে মনে ;—
কি যতনে এ যতন দিব প্রতিশোধ ?
নাথে পুনঃ রাজ্যেশ্বর হেরি মরিবারে পারি
— সে দিন ভুলিব জ্বালা।"

এরূপ সমবেদনা দুর্লভ।

নলদময়ন্তী পদব্রজে বনপথে তিনদিন অনশনে দিন কাটাইতেছেন। শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত দম্পতী খাদ্যের অদর্শনে বারি দর্শন করিবা-মাত্র দময়ন্তীর জন্য নল এইরূপ বলিলেন :—'বারি, তুমি জীবের জীবন। দময়ন্তী! অভাগিনী! বারি কর পান, স্নিগ্ধ হ'বে প্রাণ!' ঠিক সেই সময়ে কলি পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল, নল খাদ্যের লোভে পক্ষী ধরিতে অগ্রসর হইলে ঐ পক্ষীরূপী কলি নলের পরিধেয় বস্ত্র, যাহা তিনি তীরে রাখিয়া জল আনিতে গিয়াছিলেন তাহা লইয়া প্রস্থান করিল। বিবস্ত্র নল দময়ন্তীকে নিকটে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দময়ন্তীর তৎকালীন উত্তর তদবস্থ নলেরই উপযুক্ত হইয়াছিল :—

'নাথ! এক বস্ত্র পরিব দুজনে,
বনে অর্থহীন শ্রমজীবী মোরা—
লজ্জা কি বা তাহে প্রভু ?'

নল ক্রমশঃ কলির প্রভাবে অভিভূত হইয়া পড়িতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব-সংস্কার লব্ধ ধর্মবুদ্ধি তখনও তাঁহাকে ছাড়ে নাই, উহা তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিল। তাই নল বলিলেন :—

"কলির ছলনে আত্মহত্যা উঠে মনে!
* * কেঁদ না কেঁদ না প্রিয়ে।
সতর্ক করেছে কলি ; পাপে মন নাহি দিব আর।
দুর্মতি আমায় লোভে মজাইতে চায়!
অক্ষযুদ্ধে লোভে না ফিরিনু ;
লোভে পক্ষী আশে গেল বাস,
শান্তি আশে আত্ম-বিসর্জ্জন
কদাচন করিব না প্রাণেশ্বরি!"

ঐ শ্রান্ত-ক্লান্ত দম্পতী তরুতলে নিদ্রা গিয়াছেন। নলের সহিত একবাসে আছেন জানিয়া দময়ন্তী নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কলিগ্রস্ত নল এই অবসরে সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন যে, তাঁহার সহবাস-সুখ দময়ন্তীকে পিত্রালয়ে যাইতে দেয় নাই। তাঁহার অদর্শন ঘটিলে বিদর্ভনগরে ফিরিয়া যাইতে দময়ন্তী কালবিলম্ব করিবে না, কিন্তু একবস্ত্র অন্তরায় হইয়া উঠিল, কলির প্রভাবে তাহাও সত্বর বনলব্ধ অস্ত্রে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। চিন্তামণির শ্রীচরণে অর্ধবাসা দময়ন্তীকে সমর্পণ করিয়া নল উদ্‌ভ্রান্ত মনে ও ত্রস্তপদে ঘোর বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এত করিয়াও কলি নলের মনে দময়ন্তীজনিত বিচ্ছেদ আনিতে পারিল না, তাই কলি বলিয়াছে,—'বিচ্ছেদ হইল,—কিন্তু প্রাণে-প্রাণে অবিচ্ছেদ প্রবাহ বহিছে।'

নিদ্রা-ভঙ্গের পর প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া দময়ন্তীর মনে স্বামিবিচ্ছেদ-জনিত যন্ত্রণা অতি তীব্রভাবেই দেখা দিল। শোকোন্মত্তা দময়ন্তী বনমধ্যে যাহা সুলভ সেই বস্তুগুলিকে, যথা—স্রোতস্বতী, পাখী, শাখী, লতা, গিরিবর প্রভৃতি যাহাকেই সম্মুখে দেখিয়াছিলেন তাহাকেই সম্বোধন পূর্বক স্বামীর বার্তা জানিতে চাহিলেন। নাটককারের পূর্ব-লিখিত 'সীতাহরণ' নাটকের অপহৃতা সীতার রামের নিকট সংবাদ প্রেরণের সাদৃশ্য এ অংশে রহিয়া গিয়াছে। ভাষা পৃথক হইলেও ভাবের মিল রহিয়াছে এটি গিরিশচন্দ্রের পক্ষে অগৌরবের কথা।

নলরাজের পরীক্ষা তখনও কলি শেষ করে নাই। দাবানল সৃষ্টি করিয়া নলের দয়াধর্মলোপের এবং অজগর দ্বারা দময়ন্তী-গ্রাসের ব্যবস্থা সে করিয়াছিল, কিন্তু উক্ত দম্পতী পূর্ব জন্মার্জিত পুণ্যবলে কলির সে অপচেষ্টা বিফল করিয়া দিয়াছিলেন। পতিনিষ্ঠ দময়ন্তীর সে সময়ে কাতর প্রার্থনা এইরূপ হইয়াছিল :—

'অন্তিমে হে অন্তরের সার !
কৃপা করি, দেখা দাও একবার।
দময়ন্তী মরে,—বারেক দেখ হে আসি—
যায় প্রাণ অহি-গ্রাসে,
ভগবান্! রক্ষা করো নলরাজে'

কিন্তু নল ও দময়ন্তী উভয়ের জীবনই অভাবনীয় উপায়ে রক্ষিত হইয়াছিল। পতিই ভগবান সতীর এইরূপ নিষ্ঠা দময়ন্তীর রক্ষাকর্ত্রী হইয়াছিল, এবং নলরাজের রক্ষার ভার জগদীশ্বরের উপর অর্পিত হওয়ায় তিনিও সতীর প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

নল অনন্ত-সহোদর কর্কটকে নিজ বক্ষে তুলিয়া লইয়া কলি সৃষ্ট দাবানল হইতে তাহাকে বাঁচাইয়াছিলেন। নলের বক্ষে উক্ত কর্কটের দংশনকার্য বাহ্যত কৃতঘ্নতার চিহ্ন দেখাইলেও কার্যত উহাতে কৃতজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, কারণ ঐ ভুজঙ্গ নিজ মুখেই নলকে এইরূপ বলিয়াছে :—

'হের, নিজ অঙ্গ হইয়াছে কুৎসিত-আকার ;
দুঃসময়ে স্বর্ণকায়ে কিবা কাজ ?
স্মরণে আমার পূর্ব্বকান্তি পাবে রাজা,
জেনো মহারাজ। আমি সখা তব।'

কর্কটদ্বারা পরিবর্তিত আকার-প্রাপ্ত নল তখনও দময়ন্তীর চিন্তা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। দেহের পরিবর্তনের সহিত মন পরিবর্তিত হইল না, নল তখনও বলিয়াছেন :—

'কুৎসিত আকার হিত হেতু মম।
কান্তি আর নাহি চাই,
হেমকান্তি দময়ন্তী দিছি ডালি,—
পূর্বরূপে হব লোকে ঘৃণার ভাজন !'

অর্ধাঙ্গিনী পত্নীর প্রাণাংশচ্ছেদনকারী নল স্বাধীন জীবিকা ছাড়িয়া পরাধীন জীবন যাপনের ভয়ে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

'দময়ন্তি! প্রাণেশ্বরি!
প্রাণ ছিঁড়ে সাধে কি এসেছি চলে?
হ'তে হ'বে পরের অধীন—জীবননির্বাহ হেতু!'

দময়ন্তী চেদীরাজ গৃহে রাজমাতার অনুগ্রহে আশ্রয় পাইয়াছেন। রাজমাতা দূর হইতে ঐ পতি-পাগলিনীকে দেখিতে পাইয়া গৃহে আনিবার পূর্বে এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

'ধাত্রি! দেখ পাগলিনী প্রায়,
কে রমণী ধায়, অধ বাসে—
বিমলিনী-বেশে—তবু যেন কাঞ্চন মৃত্তিকা মাঝে।'

নাটককার লেখনীর এক এক টানে রূপ বর্ণনার অপূর্ব কৌশল দেখাইয়াছেন। উপরি লিখিত ছত্রত্রয় তাহারই একটি নিদর্শন।

কলি অবশেষে স্বেচ্ছায় নলের কাছে পরাজয় স্বীকার করিল। ধর্মিষ্ঠ নল কলির প্রভাবে ধর্মচ্যুত হন নাই, তাই নল-মাহাত্ম্য কলি এইরূপে কীর্তন করিল :—'সত্য করি সম্মুখে তোমার,—যেবা তব নাম লবে—মম অধিকার তাহার উপর না রহিবে আর।' ধার্মিকের প্রতিশোধ-স্পৃহা থাকে না, তাই নল কলির কথায় যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে পূর্বে পাওয়া যায় নাই। উত্তরটি এই :—

'মম দুঃখে ঘুচে যদি মানব-যন্ত্রণা—
ছল নহে—বর তব কলি!
যাও নিজ স্থানে, করেছি মার্জ্জনা,
নহ তুমি দোষী, ভুঞ্জিলাম নিজ কর্ম্মফল।'

নল কর্কটের কৃপায় পূর্বকান্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন। পতি-পত্নীর মিলন বড়ই মধুর ভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল। চেদীরাজগৃহে স্বয়ংবরের আয়োজন দেখিয়া নল অভিমান-ভরে দময়ন্তীকে বলিয়াছিলেন—

'সারথির বেশে,
এসেছি এ দেশে তোমারে দেখিতে প্রিয়ে।
কার গলে পুনঃ দেহ মালা—
রাজবালা দেখিতে হইল সাধ।
কোন্ ভাগ্যধর আদরে ধরিবে পুনঃ কর!—
দেখে গেছি মলিন বদন, চাঁদমুখে দেখে যাব হাসি।'

নলের ঐ কথায় দময়ন্তী যে প্রত্যুত্তর করিলেন তাহাও বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে সুলভ নহে :—

"নলরাজ আশে হয়েছিনু স্বয়ংবরা;
নলরাজ আশে পুনঃ স্বয়ংবরা ভান।
হের বেশ—পুষ্পহার করে নাহি সাজে আর!—
নয়ন-আসারে গেঁথে মালা দিব গলে।
সাক্ষ্য দাও, জগৎপ্রাণ সমীরণ—
বল কার তরে প্রাণবায়ু বহে মোর?"

নলদময়ন্তী গিরিশচন্দ্রের শক্তিশালী পৌরাণিক নাটক। ইহা এককালে নাট্যাকাশে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছিল। এই নাটক অবলম্বন করিয়া পরবর্তীকালে বহু গীতাভিনয়ের পালা রচিত হইয়া দেশবাসীকে আনন্দ-দান করিয়াছে। ইহার সংগীতগুলি যেমন কবিত্বপূর্ণ তেমনি মধুর সুর-তান-লয়ে গঠিত হইয়া বাঙ্গালার নগরে ও গ্রামে বহুবর্ষ ধরিয়া গীত হইয়াছিল। স্থানাভাবে উল্লিখিত হইল না। নাটকখানি মিলনাত্মক।

বৃষকেতু দৃশ্যকাব্য

গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য বৃষকেতু ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রেল তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। প্রাচীনকালের 'শিশুবোধ' নামক গ্রন্থের 'দাতাকর্ণ' হইতে ইহার আখ্যানভাগ গৃহীত। এখানি খাটি পৌরাণিক নহে, কারণ উপপুরাণ ইহার ভিত্তি, তথাপি এই বিভাগের মধ্যেই ইহাকে সন্নিবিষ্ট করা হইল। কর্ণের দান-ব্রতের পরীক্ষা ও উদ্‌যাপন ইহার বর্ণনীয় বিষয়। সত্যব্রত পালকের গার্হস্থ্য ধর্মের পরিবেশটিকে নাটককার বৃষকেতুর একটি বাক্যের মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণুর—'নাও, নাও কাট' শব্দের উত্তরে বৃষকেতু বলিয়াছিল:—'বাবা, লাগ্‌লে কাকে ডাক্‌তে হয়, দীননাথকে ডাক্‌তে হয়? কাট তবে, আমি দীননাথকে ডাকি!' এই একটি নাটকীয় কথার মূল্যে সমুদয় দৃশ্যকাব্যখানির মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে।

দক্ষিণা না দিলে ব্রতের উদ্‌যাপন সিদ্ধ হয় না, তাই কর্ণ বৃষকেতুকে কাটিবার কালে রাণীকে সম্বোধন করিয়া সর্বশেষে এইরূপ বলিলেন:—

"রাণি অনেক সয়েছ,
আর সহ আমা-হেতু;
কাতর হইলে দ্বিজ নাহি করিবে ভক্ষণ,
রাজ্য দিব ব্রাহ্মণে দক্ষিণা,
পরে দোঁহে চিতানলে করিব প্রবেশ;
ভেবো না মহিষি! শীঘ্র যাব বৃষকেতু গেছে যথা।'

একাঙ্ক দৃশ্যকাব্যের সামান্য ক্ষেত্র-মধ্যে ভাবের চরমোৎকর্ষ উপরের ঐ দুইটি বাক্যের ভিতর দিয়া নাট্যশিল্পী দেখাইয়া দিয়াছেন। নাটকখানি দৃশ্যত বিষাদান্ত হইলেও আধ্যাত্মিক মিলনান্ত।

শ্রীবৎস-চিন্তা নাটক

শ্রীবৎস-চিন্তা গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী পৌরাণিক নাটক। কাশীরামদাসের মহাভারত হইতে ইহার আখ্যানভাগ গৃহীত, এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ স্টার থিয়েটারে ইহার প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। লক্ষ্মী ও শনির পৌরাণিক কলহের ক্রীড়নক হইয়া শ্রীবৎসরাজ কিরূপ নাস্তানাবুদ হইয়াছিলেন তাহার চিত্র এই দৃশ্যকাব্যের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।

এই নাট্যক্ষেত্র মধ্যে নাটককারের ফলিতজ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় প্রাথমিক জ্ঞানের কিছু-কিছু পরিচয় আছে, যথা শনি লক্ষ্মীকে বলিতেছেন:—

"শান্তি কারে নাহি দিতে পারি ?
মম উপদেশে মোক্ষফল (১) লভে তুচ্ছ নরে ;
কৃপায় তোমার মজে পাপ-ঘোরে।
* * তুমি কৃপা কর, যে তোমারে করে পূজা,
কিন্তু যেই ঘৃণা করে মোরে,
আমি কভু না পাসরি তারে,
কৃপায় আমার, দিব্যজ্ঞান(২) পায় সেই জন।"

লক্ষ্মী তখন শনিকে উত্তরে বলিলেন :—'এস ভ্রমি ত্রি-সংসারে, রন্ধ্র গত (৩) দেখি তুমি কার ?' শ্রীবৎস একস্থানে চিন্তাকে বলিয়াছেন :—'কিন্তু শনি, রাজযোগ (৪) সুদৃষ্টিতে তাঁর, কোপে (৫) রামচন্দ্র যান বনে।' শনির আক্রমণ-সম্বন্ধে শ্রীবৎস ও বাতুলের কথোপকথনের একাংশে এইরূপ আছে :—

শ্রীবৎস— "কে বলে হে বাতুল তোমায়,
জ্ঞান-গর্ভ কথা কহ।

বাতুল —'আমার জ্ঞান-গর্ভ কথা, না হ'লে মহারাজের সামনে শনি এসে উদয় হয়, ভেবে দেখুন, ভাবনাটা কিছু একঘেয়ে রকম। একরাত্রে যে ওর অন্ত পাবেন, এমন তো আমার বোধে আসে না। মহারাজের এমন কি বেয়াড়া মেধা যে বিশ বৎসরের (৬) কাজ এক রাত্রে কোর্‌বেন ? সবে মহল দখল কোরেছে কি না, একটু জোর-দস্ত আজকে আছে, মহল শাসিত হ'লে একঘেয়ে চল্‌বে।"

শ্রীবৎস ও চিন্তার সংলাপ-মধ্যে শনি সম্বন্ধীয় উক্তি এইরূপ :—

"অহো কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর (৭ ভীষণ,
বিঘূর্ণিত আরক্তলোচন (৮)
জলপান করিল আসিয়ে,
স্নানের সে বারি। * * বুঝিলে কি এতক্ষণে—
কেন রাজ্য হবে বন ? (৯) * *
প্রিয়ে, পূর্ব্বে তুমি দেখছ আমায়,
দেখ, নাহি সে আকার (১০),

✓ জ্যোতিষিক পরিভাষার ব্যাখ্যা :—(১) জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি মোক্ষফল দিবার কারক। (২) দিব্যজ্ঞান-লাভ শনির কারকতার অন্তর্গত বিষয়। (৩) জ্যোতিষে লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানকে 'রন্ধ্র' বলে। ৮মে শনি থাকিলে রন্ধ্রগত শনি কহে। ফল:—মৃত্যু বা মৃত্যুতুল্য ক্লেশ। (৪) শনি কেন্দ্র-কোণপতি হইলে বা উহাদের সহিত সম্বন্ধ করিলে এবং শনির পঞ্চম, নবম বা তৃতীয় স্থানস্থ স্নেহদৃষ্টিতে রাজযোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার ফল :—ধন, সম্মান ও সম্পত্তিলাভ। (৫) দুঃস্থানস্থ বা দুঃস্থানাধিপ শনি কেন্দ্রে থাকিলে শনির কোপ বুঝায়। (৬) বিংশোত্তরী মতে শনির দশা ১৯ বর্ষ-ব্যাপী হইয়া থাকে, কিন্তু নাট্যকবি—এক বৎসর বেশী বলিয়াছেন, এ ত্রুটি সামান্যই। (৭) জ্যোতিষে শনির কারকতার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ও কুক্কুর দুইই পাওয়া যায়। (৮) শনির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট জাতকের চক্ষু গোলাকার, রক্তবর্ণ বিশিষ্ট ও কোটরগত হইয়া থাকে। (৯) দুঃস্থানাধিপ শনি চতুর্থে থাকিলে রাজ্য বনে পরিণত হয়। (১০) শনি দণ্ডাকার বলিয়া শনিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রায়ই শীর্ণকায় ও লম্বা

একা ঘোর আশঙ্কায় (১১)—জনপূর্ণ অট্টালিকা মাঝে ফিরি।
* * ছায়া, ছায়া (১২) চারিদিকে।"

শনি ও বাতুলের সংলাপের একাংশ এইরূপ :—বাতুল শনির প্রতি—"বলি সাত সাত দিন যে উপোস (১৩) করে পড়েছিলুম, তখন শেখাতে পার নাই লুঠ (১৪) কর্‌তে? দেব্‌তা, দীক্ষাটা কিছু দেরিতে দিতে এলে।" শ্রীবৎস ও চিন্তার কথোপকথনের অপরাংশে আছে :—

শ্রীবৎস— "শুনি, শনি অধিকার দ্বাদশ বৎসর (১৫),
গতমাত্র তিন দিন তার। * *
চিন্তা— প্রভু, শনি আর অধিক কি চায়,
ভেদ (১৬) কোরে তোমায় আমায়
মনোবাঞ্ছা পূরিবে তাহার।"

শনি আর একস্থানে শ্রীবৎসকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

'ত্যজ—ত্যজ সুখ-আশা,
যতদিন রবে মম অধিকার;
রাজ্য গেছে, নারী গেছে হবি পরাধান (১৭)।'

দৃশ্যকাব্যের শেষ দৃশ্যে শ্রীবৎস ও শনির উক্তি-প্রত্যুক্তি এইরূপ :—

শ্রীবৎস— "দেব কর আশীর্ব্বাদ।
শিক্ষা মম ছিল বাকি,
দরিদ্রের দীনতা (১৮) বুঝেছি এতদিনে,
সন্তানে রেখ মা পায়।"
শনি— "সুখে থাক নরনাথ।
শুন অম্বুসুতা, গুরু আমি (১৯)
শিক্ষা অন্তে তব অধিকার।"

এই দৃশ্যকাব্যের মধ্যে নাটককার ধনিক-শ্রমিক প্রশ্ন (Capital *versus* Labour), প্রজাতন্ত্র শাসন-নীতি (Democracy), রাজতন্ত্র (Autocracy) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিষয়ক বিবিধ জ্ঞানের কথা প্রথম

হইয়া থাকে। (১১) শনিগ্রস্ত হইলে নিঃসঙ্গ অবস্থা ভাল লাগে এবং মনোমধ্যে ভয় তাহার আর একটি লক্ষণ। (১২) এরূপ কিংবদন্তী আছে যে রবির ঔরসে ছায়ার গর্ভে শনির জন্ম হইয়াছিল। ছায়া কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণবর্ণই শনির প্রিয়। (১৩) শনি দুঃস্থানাধিপ বা দুঃস্থান গত হইলে উপবাস বা অন্নকষ্ট প্রায়ই সেই জীবের ঘটিয়া থাকে। (১৪) চৌর্য্যবৃত্তি, ডাকাতি বা লুঠ দুঃস্থানগত শনির জীবিকা। (১৫) অষ্টোত্তরী মতে শনির দশা ১০ বৎসর, সম্ভবতঃ ইহাতেও ২ বৎসরের ভুল হইয়াছে। (১৬) মিলন না করিয়া ভেদ রাখাই শনির কারকত্বার অন্যতম কাজ। (১৭) দাসত্ব ও পরাধীনতা শনির বৃত্তি। (১৮) শনিদ্বারা অভিভূত ব্যক্তি দরিদ্র হয় এবং দীনতাই তাহার অবলম্বনীয় হইয়া থাকে। (১৯) শনি দিব্যজ্ঞানদাতা বলিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রে গুরুস্থানীয়। দেবগুরু বৃহস্পতি শনির প্রতি স্নেহদৃষ্টি সম্পন্ন হইলে ঐ ফল প্রায়ই ফলিতে দেখা যায়।

নাট্যকবির জীবন-চরিতে তাঁহার জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে এ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান নাট্যকারের ছিল।

অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। দারিদ্র্য-বিধানতন্ত্র (Proletarianism) সম্বন্ধীয় আলোচনাও ঐ দৃশ্যে আছে। এমন কি বিংশ শতাব্দীর অধুনা-প্রচলিত গান্ধী-অনশন প্রথার দৃষ্টান্তের অভাবও এ নাটকে নাই। কবিরা যে ভবিষ্যদ্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া থাকেন কাল এতদিনে তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে। ধনহীনের স্বভাব সম্বন্ধে নাট্যকবি নিম্নলিখিত অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন :—

'ধনহীন মতিহীন চিরদিন
কাল্পনিক দুঃখ সদা তার,
নিজ কর্ম্মদোষে দীনতা তাহার,
না করে বিচার;
রুষ্ট হয় হেরি সুখী জনে,
ভাবে মনে-মনে, ধনবান্ সদা করে অসম্মান।'

শ্রীবৎস-চিন্তার নাট্যবীজ প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে উপ্ত হইয়াছে, এবং বন্দিগণের সংগীত-মধ্যে ইহার ভবিষ্যৎ কায়া-সম্প্রসারণের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে। বন্দিদের সংগীতটি এইরূপ :—

"তরুণ অরুণ, প্রখর তপন অস্তাচলগামী নেহার রাজন্,
সময়—সমীরণ জিনিয়ে গমন, বহে কাল যেন রহে হে স্মরণ!
গৌরব ছবি নেহার মেদিনী, আসিবে বেড়িবে তিমির-যামিনী।
জীবন-উৎসব, উঠে জনরব, নিদ্রা আবরণে বেড়িবে নীরব।
আসে মহাদিন মহা নিদ্রাধীন, ঘুমাইবে আর না হবে চেতন।"

লক্ষ্মী ও শনির মান বিচারের দিন আগতপ্রায় দেখিয়া শ্রীবৎসের অন্তর্দ্বন্দ্ব এইরূপে আরম্ভ হইয়া গেল। নাটককার মনস্তাত্ত্বিকের মতো ঐ দ্বন্দ্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীবৎস একস্থানে বলিয়াছেন :— "তুল্য দোঁহে, দেবতার ছোট-বড় কিবা!" অন্যত্র :—

'তুল্য—যুক্তিতে সমান,
কিন্তু প্রাণ কারে বলে বড়?
শনি নামে কায় কণ্টকিত হয়,
* * লক্ষ্মী নাম নিলে প্রাতে মাতে প্রাণ।'

আর একস্থানে আছে :—'ধর্ম্মময় শনি, ধর্ম্ম বিনা লক্ষ্মী কভু নহে স্থিরা।'
রাজার কথা শুনিয়া যুক্তি-বিন্যাসের সাহায্যে চিন্তা রাজাকে এইরূপ বুঝাইতেছেন :—

"যদি অভেদ উভয়, একের সম্মানে
অন্যের রহিবে মান। যেই পুরুষ প্রধান,
যত্নে রাখে রমণীর মান; ধর্ম্মবান্ আদরে নারীরে।
বীর্য্যবান্ রণে দেয় বিসর্জন প্রাণ,
রাখিতে নারীর মান।
অবলার বল সর্ব্বত্র প্রবল—
হীন যেই সেই নাহি বুঝে,
ভয়ে সেই নাহি পূজে রমণীরে।"

এইরূপ সন্দেহ-দোলায় পড়িয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া অনন্যোপায় অবস্থায় শ্রীবৎস বাতুলের শরণাপন্ন হইলেন। বাতুল রাজাকে বলিল :—'যদি সমান মান রাখ্‌তে চান তো উভয়কেই অপমান করুন।' বিবিধ যুক্তি-পরম্পরা রাজার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া তুলিল। সহসা দৈব আসিয়া রাজার বিচারের সহায়তা করিলেন। ঘটনাটি এইরূপ—রাজসভায় মন্ত্রীকর্তৃক কনক ও রজত আসনদ্বয় যথাক্রমে রাজার বিচার আসনের দক্ষিণ ও বামভাগে স্থাপিত হইয়াছিল। যথানির্দিষ্ট সময়ে শনি ও লক্ষ্মীকে রাজসভায় প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া মন্ত্রী বলিলেন :—

'পবিত্র করুন রাজপুর, ভূপতি আগতপ্রায়,
করুন উভয়ে নিজ-নিজ আসন গ্রহণ।

শনি নিজ মনোমধ্যে বিচার করিয়া লইয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন ; সেই বিচারটি এইরূপ :—

'সিংহাসনে বসি রাজা করিবে বিচার,
বামে লক্ষ্মী বসিবে তাহার, এ নহে সঙ্গত,
আমি বসি এ আসনে।'

লক্ষ্মী ও শনি স্ব-স্ব আসনে বসিয়া রাজার বিচার-প্রার্থী হইলে শ্রীবৎস শনিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন :—

"ধর্ম্মতুমি, আপনি বিচার করিয়াছ গ্রহদেব,
বসিলে আসনে বামে হবে তব স্থান,
—কমলা দক্ষিণে ; শাস্ত্রে কয় দক্ষিণে প্রধান,
— কনক-রজতাসন প্রমাণ তাহার।"

রাজার বিচার প্রণালী দেখিয়া লক্ষ্মী শ্রীবৎসকে আশীর্বাদ করিলেন এবং শনি আপনাকে অবজ্ঞাত মনে করিয়া বলিলেন :—

'তাচ্ছিল্য আমায়, অচিরে পাইবি ফল।
আমি ছায়ার সন্তান,
শীঘ্র রাজ্য হবে অন্ধকার।'

শনি-পীড়ায় শ্রীবৎসরাজ কিরূপে সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন দৃশ্যকাব্যের দর্শক বা পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এই দৃশ্যকাব্যের বাতুল চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের মৌলিক সৃষ্টি, পুরাণে ইহার অস্তিত্ব নাই। বাহ্যদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে বাতুল চরিত্রটি বাতুলের মতো বোধ হইবে। তাহার খাপছাড়া সংক্ষিপ্ত বচন-বিন্যাস প্রলাপ-উক্তি বলিয়াই মনে হইবে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্নের কাছে ঐগুলি জ্ঞানগর্ভ ও সমীচীন। শব্দ-সংযোগের অন্তরালে সত্যপ্রকাশের যে ইঙ্গিতটি আছে তাহা বাস্তবিকই উপভোগের সামগ্রী। প্রায়োপবেশনে কৃতসংকল্প বাতুলকে শ্রীবৎস অন্ততঃ তাঁহার উপরোধে সে দিন কিছু খাইতে বলিলে বাতুল এইরূপ বলিয়াছিল :—"উপরোধ রাখ্‌তেম, কিন্তু বড় পা কামড়ায় আর পেট কচ্‌লায়, আবার সাত-সাতদিন তো এমনি ক'রে কাট্‌বে। প্রাণ রাখ্‌তে যে নেহাৎ নারাজ ছিলাম, তা নয়, কিন্তু সুবিধা কিছু কম ; আর উদক-পানে আত্ম-হত্যাও কত্তে হয় না, একুশ দিনও উপবাস থাক্‌তে হয় না, এরই মধ্যে কিল-লাথিতে এক রকম হয়। কোটাল সাহেবের কিলে বোধ হয় সাতদিন

এগিয়েছি। বন্ধু, উপরোধ রাখ্‌তে পাল্লেম না। চৌদ্দদিন পেছুতে পারি না, চৌদ্দদিন কেন একুশ দিন বল—আর এক কোটালিতে গিয়ে টেনে-টুনে পৌঁছুতে পার্‌লেই, আজ্জিই এক রকম হবে।"

বাতুলের মনে উপরিলিখিত নির্বেদ কেন আসিয়াছিল তাহার উত্তর সে রাজাকে এইরূপে দিয়াছে :—"সংক্ষিপ্তসার শুনে নিন্। জল হ'লো না, খাজনা দিতে পারলেম্ না—বড় ছেলেটার বুক ডলে মেরে ফেল্লে, আর আমায় জেলে দিলে, মাগীটাকে টেনে নিয়ে গেল, ছেলেগুলাও অন্নাভাবে মারা গেল। জেলের পর ভিক্ষা, তারপর চুরি, তার পর ফের জেল, আর শেষটা মহারাজের দেখা আছে।" বাতুল চরিত্রের ছায়া গিরিশচন্দ্রের বহু পরবর্তী কালে রচিত সামাজিক নাটক 'প্রফুল্লের ভজহরি চরিত্রে' কিছু পড়িয়াছে, কিন্তু উভয়ের জীবনের গতি ভিন্ন-ভিন্ন পথে পরিচালিত হইয়াছিল।

বাতুল নিজেকে ভাল করিয়া পর্যালোচনা করিয়া লইয়াছিল। ভাল বা মন্দ কোন অবস্থাতেই তাহার আসক্তি ছিল না। রাজার বন্ধুত্বে বা রাজপ্রদত্ত সুখে সে এইরূপ বলিয়াছিল :—"না বাবা, ঘুম হবার যো নাই, আজ রাস্তার সেই সুকোমল কাঁকর নাই, আর মাঝে-মাঝে কোটাল সাহেবের হুঙ্কার নাই, আবার বিষস্য বিষমৌষধং—উদরে অন্ন পড়েছে। * * রাজার বড় গতিক ভাল নয়, আমি শনির প্রাণের দোস্ত; আমায় জায়গা দাও বাড়ীতে। মনটা বড় রকমারি জিনিস,—সকালে বলে মর, বিকালে বলে খালি-গদীতে শোও। এতদিনের পর রাজা হচ্ছেন আত্মীয়, ইচ্ছা কচ্ছে আমার, হাঃ হাঃ ক'রে হাসি, পেটে অন্ন পোড়ে ভয় এসে খাড়া হয়েছেন। বলি, ঘুমুবি না কি ?—দেখাব শালা বেশী দেরী নয়, কাল সকাল হোক্, ফের শোওয়া চাস্ কি না। ছিঃ প্রাণ, তুমি বড় হুজুগে।"

শনি ও লক্ষ্মীর মধ্যে কাহার মান রাখিবেন এই দুশ্চিন্তায় পড়িয়া শ্রীবৎস যখন নিশাযাপন করিতেছিলেন, তখন বাতুল রাজার সাড়া পাইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল :—"ঐ যা বল্‌ছেন মহারাজ, শনির কৃপায় কিছু জ্ঞানের বৃদ্ধি পায়; দেখেন নাই সকালে মরে মজা পাব ব'লে মস্তে যাচ্ছিলুম, কিন্তু কমলা উদরে আসাতে সে জ্ঞানের কিছু বৈলক্ষণ্য জন্মেছে। শনি-লক্ষ্মী দুপাশে আছেন, মাঝখানে আছেন ভয় --ঐ ভয়-মহাশয়কে একটু ঠাণ্ডা কর্‌তে পারেন, তা হলেই আপদ চোকে।"

বাতুল কৃতঘ্ন নহে, তাই অন্নদাতা রাজার বিরুদ্ধে রাজ্য-মধ্যে বিদ্রোহ যখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তখন বিদ্রোহীদের সহিত মিশিয়া রাজার রক্ষার উপায় সে ঠিক করিয়া লইয়াছিল। বিদ্রোহীরা প্রথমে তাহাকে দলে ভিড়াইতে অসম্মত হওয়ায় বাতুল তাহাদের এইরূপ বলিযাছিল :—"বলি, রূপের চটক তো তোমাদের চেয়ে একটুও ফারাক্ নাই,—ঐ মড়াখেকো দাঁতে কর্ত্তালে, ঐ উনুন ঝিঁকে বদন, ঐরূপ কোটরগত পদ্মনয়ন—পরামর্শ টা কি তাই বল না, কেউ কোথায় নেই—রাত্ ঝাঁ-ঝাঁ কর্‌চে ?" বিদ্রোহী প্রজারা রাজা-রাণীকে বধ করিতে চায় দেখিয়া বাতুল বুদ্ধিবলে তাহাদের অন্যত্র সরাইয়া দিবার জন্য এইরূপ বলিয়াছিল :—'বলি, রাজাকে কাট্‌বে তো উদিকে উঠ্‌তে যাচ্চো কোথা ? তুমি কাট্‌বে বলে রাজা নেয়ে সিঁদুর পরে ঐ ঘরে বসে আছে! ঘোড়সওয়ার হ'য়ে রাজা সট্‌কেছে তা জান ? রাজা কোথা আছে আমি জানি, কিন্তু দলে না নিলে আমি বল্‌বো না। ঐ যে বেণের বাড়ী লুঠ করবে এলি, রাজবুদ্ধি বুঝ্‌বি কি, সেইখানে গে সেঁধিয়েছে—জানে সেখানে কেউ কিছু বল্‌বে না।' বাতুলের কথায় বিদ্রোহীদল অন্যত্র রাজার অন্বেষণে ধাবিত হইল। বাতুল তখন এইরূপ বলিয়াছিল :—'এই তো'লুম্ চারদল ফেরা রাজাকে খবর দিই কি করে ? যেমন ক'রে হোক্ রাজাকে বাঁচাতেই হবে।

বলি, রোখ্‌টা কমলার না শনির? ছুটি-ছুটি অন্ন পেলে তো আর শনি ট্যা-ফোঁ কর্‌তে পারে না। এ একারও পাপ, বাহারও পাপ, ঘুঁটের পাঁশ-নৈবিদ্দি দুজনকেই দিতে হয়।'

কৃতজ্ঞ বাতুল অবশেষে কৌশল করিয়া রাজা-রাণীকে' রাজবাটী হইতে অন্যত্র সরাইয়া দিল। শ্রীবৎসের ভবিষ্যৎ শুভের জন্য লক্ষ্মীদেবী বাতুলকে লইয়া শ্রীবৎসের পিতৃবন্ধু বাহুরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন এবং শ্রীবৎসের নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিনিধি দ্বারা রাজ্যশাসনের প্রস্তাব ঐ বাতুলকে দিয়া উক্ত রাজসভায় করাইবার ব্যবস্থাও তিনি করিলেন। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্মী ও শনির সহিত বাতুলের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা বস্তুতঃই উপভোগ্য। গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধি-ভয়ে উহার পাঠোদ্ধারে বিরত হওয়া গেল। সওদাগর ও বাতুলের সংলাপও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইগুলি দৃশ্যকাব্যের দর্শক বা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। গম্ভীর হাস্যরসের অবতারণায় (Serio-Comic display of laughter) গিরিশচন্দ্র যে ক্রমশঃ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবেন তাহার আভাস এই নাটকের বাতুল চরিত্রে প্রথম পাওয়া গেল।

শ্রীবৎস ও চিন্তা এই দৃশ্যকাব্যের নায়ক-নায়িকা। তাঁহাদের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে তাঁহাদের চরিত্রগত প্রেম, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ কিরূপে বিকশিত হইয়াছে তাহা দেখিবার জন্য কয়েক-ছত্র এখানে উদ্ধৃত হইল। পত্নীর পতিনিষ্ঠা ও প্রেমের গভীরতা নিম্নলিখিত কথাগুলির মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে :—

"যজে রে প্রাণের প্রাণ। ওহে শনি,
শুনি ধর্ম্মরাজ তুমি, এ জন্মে
যদ্যপি পুণ্যকার্য্য কিছু থাকে মোর; যদি-
নারী হ'য়ে হই দেব দয়ার ভাজন,
ক্ষম দোষ গ্রহরাজ। যেবা শাস্তি হয়,
দাও প্রভু, দাও হে আমায়,
কৃপা করি কর দেব স্বামীরে মার্জ্জনা।
* * যদি পতি-সেবা-পুণ্য থাকে মোর,
অর্পি আমি সে পুণ্য রাজায়;
পাপে তাঁর কর অধিকারী।"

সপটের চেষ্টার বিরুদ্ধে সতীত্ব-রক্ষা করিবার জন্য চিন্তার কাতর-প্রার্থনার কয়েক ছত্র এইরূপ :—

"ওহে জগৎলোচন রবি ধর্ম্ম রাখ দুঃখিনীর।
* * পবিত্র পাবক! পবিত্র অন্তরে
ডাকি হে তোমারে। * নন্দিনী কাতরা,
এস ত্বরা, জরা' দেহ মোরে।"

শ্রীবৎসরাজের দ্বিপত্নীযোগ পুরাণকারেরই পরিকল্পনা; নাটককার এ ঘটনার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না, তবে তিনি এক প্রহেলিকার ভিতর দিয়া দ্বিতীয় পত্নীর সহিত রাজার মিলন সংঘটিত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পত্নী ভদ্রার সহিত মিলনের অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শ্রীবৎসের ধারণা এইরূপ ছিল যে, এ মিলন চিন্তার সহিতই সম্পাদিত হইতেছে, তাই তিনি আবেগভরে—'চিন্তা, চিন্তা

কোথা তুমি? হা শশিমুখী প্রেয়সী আমার।' এই মাত্র বলিয়াই মূর্ছিত হইয়াছিলেন। নাটককার নায়কের অকৃত্রিম পত্নীপ্রেম এইরূপে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, পুরাণকার কিন্তু তাহা করেন নাই।

নাটককার এই নাটকের মধ্যে ধীবর, সওদাগর, গ্রাম্যস্ত্রীলোক প্রভৃতির কথাবার্তা এত ফেনাইয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহাতে নাটকের মূলক্রিয়াজনিত কৌতুহল স্থানে স্থানে ব্যাহত হইয়াছে। এটি এ নাটকের দোষ। তজ্জন্য বহুগুণসত্ত্বেও নাটকখানি জনপ্রিয় হয় নাই। নাটকখানি মিলনান্তক।

সংগীতবিভাগে নাট্যকার এই দৃশ্যকাব্যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ঐগুলি যেমনি সরল তেমনি কবিত্বপূর্ণ। নিম্নে চারিটি গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল, রসিক পাঠক গ্রন্থমধ্যে বাকি অংশ দেখিয়া লইবেন। (১) চিন্তার গীত :—'মানময়ী তুমি, তোরি মানে মানী, তোরি মানে মাগো আমি রাজরাণী, ছাড় ছলনা মাগো বলনা, কাঙ্গালিনী কিসে রাখি মা মান।' (২) লক্ষ্মীর গীত :—'ডাক্‌লে আমি রইতে নারি, যে ডাকে তার কাছে আসি। সলিলে সদাই ভাসি মিষ্টভাষী ভালবাসি, ডাকে যে সরল প্রাণে, প্রাণ টানে মোর তারি পানে, তারে কই মনের কথা, তারি কাছে বসে হাসি।' (৩) লক্ষ্মীর গীত :—'প্রাণ আমার কেমন করে, নিত্যি তোরে দেখ্‌তে আসি। তুমি যাও জলে ভেসে, নয়ন-জলে আমি ভাসি।' (৪) লক্ষ্মীর গীত :—'বারিতে জনম আমার, তাই বুঝি বয় নয়নবারি।'

প্রহ্লাদ চরিত্র নাটক

গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী পৌরাণিক নাটক প্রহ্লাদচরিত্রের আখ্যানবস্তু মহাভারত হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এখানি দুই অঙ্কে সমাপ্ত, এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ তদানীন্তন স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

এই নাট্যকাব্যখানি মিত্র ও শত্রুভাবে হরি সাধনার লীলাভূমি। পরমভক্ত প্রহ্লাদ হিরণ্য-কশিপুর পুত্ররূপে জন্ম লইয়া মিত্রভাবে সাধনা করিয়া প্রেমভক্তিপ্রভাবে সর্বত্র হরিদর্শনের ফলে হরিপাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু শাপগত পূর্ব সংস্কার বশে অরিভাবের সাধনায় সর্বত্র হরিময় দেখিয়া ঐ বরেণ্য শত্রুকরে প্রাণ বিসর্জন দিয়া তাঁহার এই শেষ জন্মের বৈরী-সাধনার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত ধরণীতলে রাখিয়া গিয়াছেন। পথ ভিন্ন হইলেও উভয়ের লক্ষ্য বস্তু এক। নাটককার বৈরীসাধনার বৈশিষ্ট্য এ নাটকে নিপুণভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এ বিষয়ের একটু আলোচনা আবশ্যক।

হিরণ্যকশিপু দৈত্যরাজ, বলবীর্যের অভাব তাঁহার নাই; বিশেষতঃ তাঁহার ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকুলের আততায়ী হরির সহিত সংগ্রামে বিপর্যস্ত ও নিহত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য হিরণ্যকশিপু হরি-নিধনে কৃতসংকল্প হইয়া রাজসভা-মাঝে উচ্চকণ্ঠে এইরূপ বলিয়াছিলেন: 'তুলি ভুজ কহি সভা-মাঝে—প্রতিশোধ, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ!' বৈরীরূপে হরিসাধনার ইহাই হইল তাঁর বহির্জগতে প্রকাশের জন্য বীজমন্ত্রের প্রভাব এবং ঐ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তিনি রাজ্যমধ্যে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া হরিভক্তের উচ্ছেদ-সাধনে ব্রতী হইলেন। অবশেষে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার অঙ্গজ প্রহ্লাদই হরিভক্ত, তাই বলিয়াছেন :—

'কোথা শত্রু করি অন্বেষণ,
শত্রু নিজ-গৃহে, কহ পুত্র,

কে তোরে বলিল, হরি নহে অরি,
কার হেন কুবুদ্ধি ঘটিল !'

প্রহ্লাদকে কুলধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য রাজা শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। ফল তাহাতে বিপরীত দাঁড়াইল। এক প্রহ্লাদের পরিবর্তে পাঠশালার ছাত্রবৃন্দের জনে-জনে প্রহ্লাদের নিকট হইতে হরিভক্তি লাভ করিয়া রাজ্যময় হরিসংকীর্তন আরম্ভ করিয়া দিল। হিরণ্যকশিপু বিষম সংকটে পড়িলেন। নারদের মুখে তিনি শুনিয়াছিলেন যে হরি কামরূপী,—মীন, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি বিবিধ মূর্তি ধারণ করিয়া থাকেন, তাই বলিতেছেন—'কামরূপী হরি কহিল আমারে ঋষি, সেই বা আসিয়া পুত্রে দিল উপদেশ ?' পুত্রের শিক্ষা-বিষয়ে ব্যর্থকাম হইয়া রাজা ভিন্ন-পথে তাহার চরিত্র-সংশোধনের উপায় দেখিলেন। নিজ বংশ মর্যাদার কথা প্রহ্লাদের কাণে শুনাইবার জন্য বলিলেন :—

"ইন্দ্রজয়ী জ্যেষ্ঠতাত তব প্রাণ দেছে হরির সমরে,
আরে রে অজ্ঞান, দৈত্য হ'য়ে সে হরির কর গুণগান !
দেখ জগৎমণ্ডলে কোন্ কুলে হেন যশোরাশি —
কোন্ কুলে দাস রবি-শশী, কোন্ কুলে ইন্দ্র আজ্ঞাকারী ?
হেন উচ্চবংশে জন্ম তোর * *
বড় সাধ মনে সিংহাসনে তোমারে স্থাপিব,
হরি অন্বেষণে আপনি যাইব, বধিব সে
মায়াময় দুরাচারে ; পুত্র হ'য়ে পিতৃসাধে নাহি হও বাদী।"

পুত্রের প্রতি স্নেহশীল পিতার বিবিধ চেষ্টা ফলবতী হইল না দেখিয়া হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের ইষ্ট-দেবতা বদল করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন :—'আরে রে অধম, এখনও মাগহ পরিহার, কহ কৃষ্ণ ছার, ভজ দৈত্যকুলেশ্বরী কালী,—মার্জনা যদ্যপি চাও।' সব কিন্তু বৃথা হইল, প্রহ্লাদ হরিনাম সার করিয়া লইলেন। মমতা বর্জন করিয়া ক্রোধের বশে রাজা পুত্রের বধাজ্ঞা দিলেন। মায়া কিন্তু তখনও ইতস্ততঃ করিতে ছাড়ে নাই ; রাজা বলিতেছেন : —

'যে নন্দনে করি দরশন পরিতৃপ্ত হয় প্রাণ
সেই কাল হ'য়ে দংশিল হৃদয়ে !
অভাগা কে আছে এ সংসারে।
বধ করে আপন কুমারে।'

মন্ত্রী ফিরিয়া আসিয়া সংবাদে জানাইল প্রহ্লাদ মরে নাই, অস্ত্র দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। রাজা কিন্তু মায়ায় এমনি মুগ্ধ যে নিজ পুত্রের ঐরূপ বীর্যে উৎসাহিত হইয়া বলিলেন :—

"যুগ-যুগান্তর পূজিয়া শঙ্করে সদয় করিনু তাঁরে,
তাঁর বরে অস্ত্রে মম অভেদ্য শরীর,
দেখ পুত্র মম আমা হ'তে বীর,
বিনা বরে অস্ত্র নাহি পশে কায়।
আরে পাপমতি হরি !
হেন পুত্রে ছলে কর পর।"

হিরণ্যকশিপুর সমুদয় ক্রোধ তখন পুত্রের উপর হইতে হরির উপর আসিয়া পড়িল। পুত্রগর্বে বিস্ফারিত বক্ষে বলিলেন :—

"আয় হরি বারেক সমরে,
মিটাই রে মনের এ জ্বালা।
দেখি বজ্রমুষ্টি যায়, মায়ারূপী—
মায়া তোর যায় কি না যায়
আরে ক্রুর নিঠুর কপট!
ছলে কর পিতা-পুত্রে ভেদ,
হরি! পেলে তোরে—মিটাই এ খেদ।
* * আরে ভীরু, জান মনে-মনে—
শঙ্কর সাধনে নাহি মোর পরাজয়,
জান তুমি কামরূপী হীনমতি হরি,
মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ শরীরে, কিংবা অন্য
কলেবরে সম্মুখীন হইতে নারিবে,
তাই লুকাইয়া আছ ডরে।"

রাজা প্রহ্লাদকে পুনরায় নিকটে ডাকাইয়া স্নেহভরে বুঝাইলেন :—

"বীর্য্যবান্ পুত্র তুমি দৈত্যকুলে,
করি মানা নাহি হরি কর আবাহন,
আন হরি সম্মুখে আমার,
দৈত্যকুলে অন্য কোন ভার,
নাহি আর দেব তোরে।
* * আমা হ'তে কেহ উচ্চ হয়,
এ সংসারে কেহ নাহি চায়;
পিতা প্রাণপণে দিবানিশি করে রে কামনা—
পুত্র উচ্চ হোক্ শতগুণে আমা হ'তে,
বোঝ না, বোঝ না মর্ম্মের বেদনা,
উপযুক্ত পুত্র যার শত্রু অনুগত,
নরক ভীষণ নহে তার!"

রাজার এরূপ অকৃত্রিম স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রহ্লাদ হরিপ্রেমে মাতিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। স্নেহশীল পিতা কিন্তু তখনও আশা ছাড়েন নাই, বলিতেছেন—'চাহ ক্ষমা, এখনও রে মার্জ্জনা করিব তোরে। বল হরি অরি, ইষ্টদেব শঙ্করে প্রণাম কর।' এ শাসন-বাক্যও প্রহ্লাদ অবহেলা করিল। রাজা তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে করী-পদতলে পিষ্ট হইবার আদেশ দিলেন। করী প্রহ্লাদকে শুণ্ডের সাহায্যে পদতল হইতে তুলিয়া পৃষ্ঠোপরি স্থাপিত করিল। এই সংবাদ পাইবা-মাত্র দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হিরণ্যকশিপু সর্পবিষে প্রহ্লাদ-শিশুকে হত্যার আদেশ দিলেন। বৈরীসাধনার ক্রম রাজাকে

তখন আরও উন্নত করিয়া তুলিয়াছিল। তাই পার্থিব ধন-সম্পদের বিনিময়ে তিনি শত্রুরূপী হরির সাক্ষাতের জন্য এইরূপ বলিতেছেন :—

"দেহ কেহ হরির সংবাদ। দিব রাজ্যধন,
দিব সিংহাসন, চিরদিন রব রে অধীন,
দেখাইয়া দেহ যদি হরি। * *
আরে তোর অদ্ভুত প্রতাপ।
বর হলো শাপ, আত্মহত্যা করিবারে নারি।
* * দেখ্‌, হরি,
বধি তোর ভক্তের জীবন,
দেরে দরশন,
দরশন দেরে দুরাশয়!"

হরি-মাহাত্ম্যে সর্পবিষও অমৃতে পরিণত হইয়া হরিভক্ত প্রহ্লাদকে জীবিত রাখিল। হিরণ্য-কশিপু অদ্ভুত শক্তিশালী তনয়কে শেষবার এইরূপে বুঝাইতে লাগিলেন :—

"অসীম ক্ষমতাশালী তুমি,
পূজ কালী করাল বদনী।
এইক্ষণে মন্ত্রিগণে আনি,
রাজ্যে তোরে করি অভিষেক।
ত্যজ পুত্র কুবুদ্ধি তোমার,
কৃষ্ণ অতি অসার কপট,
বীর তুমি মহাবীর্য্যবান্‌,
কেন তার মানো অধীনতা?
হও রাজ্যেশ্বর,
দেব, যক্ষ, অমর, কিন্নর
ডরে তোর দাস হবে।
তবে কীর্ত্তি রহিবে অতুল,
দৈত্যকুলে গৌরব বাড়িবে।
আমি যাব হরি অন্বেষিব,
নাগপাশে বাঁধিয়া আনিব,
দেখাইব দৈত্য হ'তে বলী নহে হরি।"

অপার্থিব রাজ্যের অধিকারী প্রহ্লাদ পিতৃপ্রদত্ত পার্থিব রাজ্যের মায়া অনায়াসে কাটাইয়া হরি-প্রেমে বিভোর হইয়া রহিলেন। ক্রোধান্ধ রাজা দৈত্যকুল-কলঙ্ক সন্তানকে তখন অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করিবার আদেশ দিলেন, এবং আরও বলিয়া রাখিলেন তাহাতেও যদি উহার জীবন রক্ষিত হয়, তাহা হইলে বুকে পাথর বাঁধিয়া উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হইতে উহাকে সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষিপ্ত করিবে। যেরূপে হউক প্রহ্লাদের নিধন-বার্তা তিনি শুনিতে চাহিলেন।

বৈরীসাধক হিরণ্যকশিপু ক্রমশঃ অরি-সাধনার আরও উচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিয়া বলিতেছেন :—

"দেখি কোথা হরি,
শুনি দেখা দেয় নয়ন মুদিলে,
দেখি আমি নয়ন মুদিয়া ;
আয় হরি, হৃদ্‌পদ্মে দেব তোরে স্থান—
আয় আয় তীক্ষ্ণ খড়্গে করি হৃদি খান্ খান্।
আয় প্রবঞ্চক ! পুত্রশোক পাসরিব বধিয়া তোমায় ;
রহ-রহ, কোথায় লুকাবি ?
জলে, স্থলে, শূন্য—সমীরণে খুঁজিয়া ধরিব তোরে ;
আয় হরি আয়, ধরি তোর পাব,
কর রণ দৈত্যের সহিত !
আরে ভীরু ছলে কর পুত্রে পর।
আরে রে বর্ব্বর পুত্র কি নাহিক তোর ?
রে নিষ্ঠুর ! একি তোর বীরপনা,
বীরপুত্র পিতা হ'য়ে করি বধ।
হায় ! কিসে দিব প্রতিশোধ,
কেমনে রে শান্ত করি ক্রোধ ?
শুনি ভক্ত তোর পুত্র-সম,
আয় তোর ভক্ত রক্ষিবারে,
দেখ ভক্তে দৈত্য বধ করে।
হরি ! যদি তোরে পাই,
তুচ্ছ করি ভুবনের অধিকার,
দেরে মূঢ় বারেক সমর,
মম যুদ্ধে যদি তোর রহে রে জীবন,
করি পণ—ত্যজি ত্রিভুবন বিশ্বপ্রান্তে
বসি গিয়ে শিব-আরাধনে।"

রাজার সাধনার ক্রম তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিল। শত্রুর অন্বেষণ-কাতর হইয়া তিনি অন্তরে বাহিরে সর্বত্র হরি-দর্শন করিতে লাগিলেন। বহির্দৃষ্টিদ্বারা বৃক্ষে হরি দর্শন করিয়া তাহাতে পদাঘাত করিতেছেন। একাগ্রতা বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ মস্তিষ্কে তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। রাজা এইরূপ বলিতেছেন :—'চুপ্ চুপ্। কথা কওয়া উচিত নয়, দুরাচার পালাবে, ঐ হরি আসছে!' কখন বা বলিতেছেন :—'হা ভ্রাতঃ বরাহ-দন্তে তোমার অঙ্গ বিদীর্ণ হ'য়েছে, বীরবর, ক্ষণেক বিশ্রাম কর, আমি বরাহ নিধন কর্‌ছি।' পরক্ষণেই আবার বলিতেছেন ;—'কি বল মন্ত্রি ! প্রহ্লাদ কালী ব'লেছে, দুরাচার হরি নাম আর নেয় না। আমার পুত্র, আমার পুত্র আমার, চুপ্ চুপ্ ঐ হরি আসছে।' পুনরায়

বলিলেন :—'কি অগ্নিতে মরে নি? সকলে প্রবঞ্চক, আমি এক-কালে নিধন করবো— এই হরি, এই হরি।' নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভাবে মস্তিষ্কের উপর কি সুন্দর প্রতিক্রিয়া!

মন্ত্রীর ডাকে রাজার বাহ্য-সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

"মন্ত্রি! ত্রিসংসার হেরি হরিময়।
নিশিদিনে শয়নে স্বপনে হরি নাহি ভুলি,
কিন্তু মম অন্তরের কালি নাহি গেল,
হরি না আইল, রাজ্য ধন বিফল সকলি,
প্রতিশোধ দিতে যদি নারি। * *
আয় মূঢ় কূর্ম্ম-কলেবরে, কিংবা এস বরাহ-শরীরে,
সিংহ, ব্যাঘ্র, নর, অমর, কিন্নর—ধর, শীঘ্র যে মূর্ত্তি বাসনা তোর
দেখা পেলে বুঝি তোর বল,
ভাঙ্গি তোর ছল, হায়! আর নাহি সয়,—
গেল গেল সকলি মজিল। * *
দেখা দিয়ে কোথায় লুকায়,
পাছে পাছে অরি, ধরিতে না পারি।
ধেয়ে গেলে তথা আর নেই।
নিশ্চয় নিকটে আছে, কিন্তু দুরাশয় মহা মায়াময়,
হেন অরি কেমনে করিব পরাজয়?"

বিক্ষিপ্ত মস্তিষ্ক রাজা তখন প্রহ্লাদকে নিকটে ডাকাইয়া স্ফটিকস্তম্ভযুক্ত রাজ-সভাতলে পাদচারণা করিতে করিতে হরির বিদ্যমানতা সম্বন্ধে তাঁহাকে বহু প্রশ্ন করিলেন। সর্বস্থানেই হরি আছেন প্রহ্লাদ এইরূপ বলিলে পর রাজা তাঁহাকে সর্বশেষ এই প্রশ্ন করিলেন :—'মমতায় নিজহস্তে বধি নাই তোরে, যদি না দেখাও হরি স্তম্ভের ভিতর, খড়্গাঘাতে লব তোর প্রাণ'—বলিয়াই সবলে স্ফটিক স্তম্ভে পদাঘাত পূর্বক আস্ফালনের সহিত বলিলেন—'আরে ভ্রাতৃঘাতী কপট পামর! স্তম্ভে আছ লুকাইয়ে।' নৃসিংহরূপী হরি স্তম্ভ বিদারণ-পূর্বক নির্গত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া বধ করিলেন। বৈরী-সাধনা করিয়া রাজা কশিপু হরি ক্রোড়েই স্থান পাইলেন। হিরণ্যকশিপুর চরিত্রে গিরিশচন্দ্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিপুণতার সহিত দেখাইয়া গিয়াছেন। চিরাচরিত ধারার বৈলক্ষণ্য নাট্যসাহিত্যে এই প্রথম দেখা গেল; নাটকটির মধ্যে স্ত্রী-চরিত্রের প্রাধান্য নাই, মাত্র দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে প্রহ্লাদের মাতা কয়াধুর প্রবেশ আছে। কোন ঘটনা-সংঘাতের জন্য তাঁহাকে আনা হয় নাই, নিশাকালে রাজার মানসিক বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায় কি না—এই কথা কয়টি কয়াধু মন্ত্রীর কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ কাজটুকু নাটককার অন্য কাহারও দ্বারা করাইতে পারিলে, নাটকখানি সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীচরিত্রহীন হইত।

প্রেমভক্তির চরিতার্থতালাভ প্রহ্লাদের দিক হইতে নাটকটির অপর বর্ণিতব্য বিষয়। গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায় ব্যঞ্জনবর্ণের আদ্যক্ষর দেখিয়া কৃষ্ণনাম স্মরণপূর্বক প্রহ্লাদের মনে যে ভাবোদয় হইয়াছিল তাহাই উক্ত প্রেম-ভক্তির প্রথম স্ফুরণ। নাটকীয় ভাষায় ইহা বড়ই মধুর হইয়াছে :—

'নামে তৃপ্তপ্রাণ,
অন্তরে আনন্দ-উৎস বহে শতধারে,
হৃদয়ে না ধরে, বহে ধারা নয়ন-যুগলে।'

ঐ প্রেম ক্রমশঃ প্রহ্লাদকে জ্ঞানমার্গে উন্নীত করিল, তখন তিনি পিতাকে বলিতে পারিয়াছিলেন :–

"পিতা, কালা-কালী কেন কর ভেদ,
এক ব্রহ্ম জগৎ—ঈশ্বর, নানারূপ ভক্তের বাসনা মতে।
থাকিলে বাসনা, পিতামাতা করি উপাসনা,
মোহবশে মাগি নানা বর, কল্পতরু বিভু পদাৎপর,
বরদাতা পিতামাতা-রূপে,
সখারূপে খেলা করি ঈশ্বরের সনে।
প্রেমের কামনা, প্রেমদান মাত্র উপাসনা,
এক আত্মা অভিন্ন হৃদয় ; প্রেমময় লীলা,
প্রেমে আত্মবিসর্জন, ঘুচে তাহে জীবের বন্ধন,
নিত্যানন্দময় হয় প্রাণ।"

প্রহ্লাদের ঐশীজ্ঞান প্রসূত প্রেম ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। তখন তাঁহার মনে এই ভয় জাগিল—'যদি মম দুর্বল হৃদয়, মৃত্যুকালে নামে করে কলঙ্ক অর্পণ।' প্রহ্লাদ সাধনার শেষ সোপানে অধিরোহণ করিয়া সর্বত্র হরি দর্শন করিযাছিলেন। তাই তাঁহার পিতা যখন সম্মুখস্থ স্তম্ভের ভিতর হরি আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভক্তের মান রাখিবার জন্য হরি তখনি ঐ স্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া বৈরীসাধক হিরণ্যকশিপুকে নিজ অঙ্গে বিলীন করিয়া লইয়াছিলেন।

এই দৃশ্যকাব্যের নাটক-হিসাবে গুরুত্ব অধিক, কিন্তু ইহা জনপ্রিয় হয় নাই। রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রহ্লাদচরিত্র ইহার এক মাস পূর্বে বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়া তাহার মধুর সংগীতধ্বনি প্রভাবে দর্শক সাধারণের মন মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল। নাটকখানি মিলনাত্মক, প্রহ্লাদের সহিত হরির নিত্য মিলনে ইহার পরিসমাপ্তি।

প্রভাসযজ্ঞ নাটক

গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী পৌরাণিক নাটক প্রভাসযজ্ঞ আখ্যানভাগের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের কাছে ঋণী। এখানি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে—বীডন্‌স্ট্রীটস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। মধুর, করুণ, বাৎসল্য, হাস্য, সখ্য ও শান্ত—এই ষড়বিধ রস নাটকখানির মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে ক্রীড়া করিয়াছে। কোন কেন্দ্রগত রসের আকর্ষণী শক্তি ইহার মধ্যে ছিল না, তজ্জন্য এখানি দর্শক বা পাঠক-সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারে নাই। মধ্যে-মধ্যে কবিত্ব ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ দ্বারা ইহা যথাক্রমে কবি ও জিজ্ঞাসুর আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া দিয়াছে মাত্র।

কবিত্বের দুই-চারি লাইনের নমুনা এইরূপ :—

"এই কি সে সুখ-বৃন্দাবন!
যথা মোহন বাঁশরী সনে গুঞ্জিয়া ভ্রমর,

রাধা নাম-গান শুনাইত নলিনীরে ?
যথা পুষ্প-পুঞ্জ ঈর্ষ্যায় ফুটিত
লুটিতে ধরার পদ-তলে।"

সংগীতের কবিত্ব ও সুরের মাধুর্য এ নাটকে যথেষ্টই আছে। নিম্নে তাহার নমুনাস্বরূপ দুই-চারিটি গীতের উল্লেখ করা গেল।

(১) 'কোথায় আছে যদি সে আমার ?
কেন তবে কুঞ্জবনে হেন দশা বাধিকার ?
তরুলতা কেন শূন্য, বনপাখী শোকপূর্ণ,
কেন ব্রজ শূন্যাচ্ছন্ন, ওঠে কেন হাহাকার ॥
বাঁশরী ফিরায়ে দেছে, রাধা নাম ভুলে গেছে,
না হ'লে বাজিত বাঁশী রাধা ব'লে শতবার ॥'

(২) 'এস রে কানাই কোথা আছ ভাই,
মরে রে রাখাল দেখ না, দেখ না।
* * লয়ে বনফল, চক্ষে বহে জল,
ওরে কানু তোরে আর কি পাব না ॥
হাম্বা রবে ধেনু ডাকিছে তোমায়,
সকাতরে চায় দূর-যমুনায়,
তৃণ না পরশে আঁখি জলে ভাসে,
তুমি কি বেদনা বঝ না, বুঝ না ॥'

(৩) 'চল লো বেলা গেল লো, দেখ্‌বো রাধা শ্যামের বামে।
দু'কথা শুনিয়ে দিব কপট নিঠুর বাঁকা শ্যামে ॥
বল্‌বো কি পড়ে মনে, ননী-চুরি বৃন্দাবনে ;
কাল কি হয় না ভাল, এম্‌নি কি গুণ কৃষ্ণ নামে ॥
যুগলে দিব মালা, ভুল্‌বো সই প্রাণের জ্বালা ;
মোহন ছাঁদে রূপের ফাঁদে,
কাঁদবে পড়ে রতি-কামে।'

(৪) 'সয় বলে কি এতই প্রাণ সয় ?
প্রাণ মন সমর্পণে এতই কি সে দোষী হয় ?
ছি, ছি সখি ! কি লাঞ্ছনা, কেন সব এ যন্ত্রণা ?
জীবন থাকিতে সখি, যাতনা তো যাবার নয়,
ছিঃ ছিঃ সখি ছার বাসনা, তবু তার উপাসনা,
আশা বিসর্জ্জন দিয়ে, তবু পথ চেয়ে রয় ॥'

কি মধুর ও প্রাণস্পর্শী এই সংগীতগুলি! দেশের আপামর সাধারণের মুখে-মুখে এই গানগুলি আজ পর্যন্ত ফিরিয়া থাকে।

আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ নাটককার ইহাতে কিরূপভাবে করিয়াছেন তাহা দেখা যাক্ ব্রজলীলা ও গোলোকলীলার পার্থক্য সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এইরূপে বুঝাইয়াছিলেন :—

"গোলোকলীলায় নাহি ভরে ভক্তের পরাণ,
দেবদেবী ক্রিয়া, মানবের হিয়া ধারণা করিতে নারে।
নরলীলা বোঝে নরে,
দেখাই মানবে, যে মায়ায় বদ্ধ আছ ভবে,
সেই মায়া আমারে অর্পণ কর।
নন্দ-যশোদার প্রায়, পুত্রভাবে বাঁধহ আমায়,
কিংবা রাখালের সম, সখ্য-প্রেম কর দান ;
হও যদি সখি, প্রাণ রাখি পদতলে,
মধুরে-মধুরে বাঁধ রে আমারে,
মধুপ্রেম যেবা অভিলাষী ;
ব্রজবাসী শিক্ষা দেয় নরে,
কি প্রেমের তরে, গোধন চরাই ব্রজে ;
পরীক্ষায় নহে মম স্বগণ কাতর,
বিচ্ছেদ-জ্বালায় কাঁদে নিরন্তর ;
তবু শুদ্ধ প্রাণে মনে মনে জানে—আমার আমার ধন !"

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের কাছে বৃন্দাবন-প্রেমের প্রকৃতস্বরূপ এইরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

"হে উদ্ধব ! ব্রজে একাকার,
সুখদুখ জিজ্ঞাসিব কার ?
সবে কৃষ্ণময়, দুখ-সুখ লয়,
আত্মাময় পরমাত্মা-ধ্যানে ;
দিব্যজ্ঞানে যোগেব নয়নে,
নাহি কালজ্ঞান রয়েছে সমান,
শতবর্ষ যামিনী-সমান গত।
নিশা-অবসানে পূর্ব্ব-ত পাইল আমায।
বাহ্যিক এ ক্লেশ,
এ প্রেমে কি আছে দুঃখলেশ !"

আয়ান ও রাধিকার সংলাপের মধ্যে রাধা-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে তথ্য ফুটিয়াছে, তাহা প্রেম ও কামের মধ্যে এত সূক্ষ্ম পরদার ব্যবধানে রাখা হইয়াছে যে, উহা দেখিতে ও বুঝিতে হইলে রাধিকার উক্তির মতো দিব্যচক্ষু ও জ্ঞানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। রাধিকা আয়ানের কাম-ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"ভক্তিডোরে বেঁধেছ আমায়,
কোথা যাব সে ডুরি ছেদিয়া ?

দিব্যচক্ষু করিনু প্রদান,
হের বিদ্যমান আদ্যাশক্তি আমি সনাতনী,
বিশ্বময়ী বিষ্ণু-প্রসবিনী,
আছি কৃষ্ণজায়া, আমারে বিদায় দেহ।
যুগ-যুগান্তর করিয়া কঠোর তপ—
আমারে কিনেছ তুমি,
তাই যেতে নারি,
তাই হরি-পরিচরি,
বাধা আছি তোমার আবাসে:
ভ্রমে আছ ভুলে, মোরে না চিনিলে,
রমণী না ভাব আর।"

আয়ান ও রাধিকা সম্বন্ধীয় বহু জল্পনা-কল্পনার নিবৃত্তি নাটককার ঐ কথা কয়টির মধ্যে কেমন সাধন করিয়া গেলেন।

প্রভাস-যজ্ঞে ত্রিভুবন নিমন্ত্রিত হইয়াছিল, কিন্তু ব্রজবাসিদের কেন নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, এ তথ্যের উদ্‌ঘাটন শ্রীকৃষ্ণ নারদের কাছে নিম্নলিখিতরূপে করিয়াছেন:—

"হে নারদ! ঋষি তুমি!
কিবা জ্ঞান গূঢ়ীর নিয়ম;
হ'লে নিমন্ত্রণ ব্রজবাসিগণ জীবন ত্যজিত সবে—
মনে হ'তো কৃষ্ণ ভাবে পর;
কে কোথায় পিতায়-মাতায়,
নিমন্ত্রণ করি আনে?
হেন তব হয় কি হে মনে,
দাদায়-আমায় হবে নিমন্ত্রণ?—"

পরে রাখাল-বালক ও জননী সম্বন্ধে বলরামকে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়াছেন:—

"পথে-পথে আসিতে রাখাল,
বন-ফল আনিবে ধটিতে বাঁধি,—
লয়ে ক্ষীর-ননী আসিবে জননী।
ব্রজবাসী যার যেই ভাবে,
প্রভাসে আসিবে—ব্যগ্র প্রাণ হেরিতে সে ছবি।
* * মম ব্রজবাসী জানে মোরে ব্রজের রাখাল,
জানে মনে, আজও ধেনু লয়ে ফিরি বনে,
প্রেমের স্বপন—ভঙ্গন করিব দাদা রথ পাঠাইয়ে?"

'প্রভাস যজ্ঞ' নাটকখানি ভাবুক ভিন্ন অপরের পক্ষে বুঝা কঠিন। প্রভাসে ব্রজবাসীর মিলন কল্পিত হওয়ায় নাটকখানি মিলনাত্মক।

জনা নাটক

জনার গল্পাংশ মহাভারত হইতে গৃহীত; এখানি গিরিশচন্দ্রের শক্তিশালী পৌরাণিক নাটক-সমূহের অন্যতম। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে ইহা সর্বপ্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাটকখানি নর ও দেবতার ক্রীড়াভূমি। নাটকীয় প্রধান চরিত্রগুলির মনোমধ্যে ঐকান্তিক বাসনার উন্মেষ ও নাট্যক্রিয়ার বিচিত্র গতি-পথে সেই-সেই বাসনার চরিতার্থতা-সাধন নাটকখানির উদ্দেশ্য।

নীলধ্বজের ঐকান্তিক বাসনা এইরূপ ছিল:—'বাঁশরী বয়ান ত্রিভঙ্গিমঠাম, নররূপী নারায়ণে পাই দরশন।' জনার প্রবল বাসনা এইরূপ:—'ভাগীরথি-পদে মতি রহে চিরদিন, বাল্যকালে মাতৃহীনা আমি—মার কোল, চিরদিন করি আকিঞ্চন।' প্রবীরের বাসনার বৈশিষ্ট্য এইরূপ:—'ভুবনবিজয়ী রথী দেহ মোরে অরি, মরি কিংবা মারি—ঘুচুক সমর-বাঞ্ছা মোর।' স্বাহার বাসনা এইরূপ:—'পতি মাত্র গতি অবলার, তব পদে নিরবধি স্থির রহে মতি।' উপরিউক্ত বাসনাগুলি কিরূপ বিচিত্র গতিপথে সফলতালাভ করিয়াছিল নাটকের দর্শক বা পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত হইয়াছেন।

প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে প্রবীর, জনা ও বিদূষক অন্যতম। বিদূষক-সম্বন্ধে পৃথক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। প্রবীর বীর মাতৃভক্ত যুবক, মাতৃ-আশীর্বাদ তাঁহার অক্ষয় রক্ষা-কবচ, জাহ্নবীর বরে তিনি অজেয়, তাই অপরের বীরত্বের অহংকার তিনি সহ্য করিতে পারেন না। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব প্রবীর ধরিয়াছিলেন, তাহার হেতু তিনি নিজ মুখেই এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন:—

'যজ্ঞ অশ্ব দেশে-দেশে ফেরে,
অর্জ্জুন রক্ষক তার। লিখিয়াছে অহঙ্কারে,—
ঘোড়া যে ধরিবে ফাল্গুনী বধিবে তারে।'

বিশ্ববিজয়া অর্জুনের অশ্ব স্বামী ধরিয়াছেন জানিতে পারিয়া প্রবীরের স্ত্রী মদনমঞ্জরী বিস্মিতা হইলেন। প্রবীর তদুত্তরে ক্ষত্রিয়ের বিশেষত্বের পরিচয় নিম্নলিখিত ভাষায় পত্নীকে দিয়াছিলেন:—

'চমৎকৃত কেন চন্দ্রাননে!
সত্য যেই ক্ষত্রিয়-নন্দন,
রণ তার চির আকিঞ্চন;
উচ্চ অধিকার ক্ষত্রিয়ের সম আছে কার?
সম মান জীবনে-মরণে!
হলে রণজয় মান্য লোকময়,
পড়িলে সমরে দম্ভ-ভরে যায় স্বর্গপুরে।'

মদনমঞ্জরীর শঙ্কা ইহাতেও বিদূরিত হইল না। নারায়ণ অর্জুনের রথের সারথি, ইহাই তাঁহার ভয়ের কারণ হইয়াছিল। প্রবীর ক্ষত্রিয়োচিত দম্ভের সহিত তখন পত্নীকে বলিলেন:—

'হেন হেয় পতি সাধ কিরে তোর?
অহঙ্কারে ধরিয়াছি ঘোড়া, প্রাণভয়ে দিব ছেড়ে?
সম্মুখ-সংগ্রামে পাণ্ডবে না ডরি,
নাহি ডরি নারায়ণে।'

পাছে জনার্দন রুষ্ট হন, তাই মদনমঞ্জরী তখনও ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। প্রবীর ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ভালরূপেই বুঝিতেন, উত্তরে এইরূপ বলিলেন :—

'নিজ কর্ম করিলে সাধন,
রুষ্ট যদি হন জনার্দ্দন,
নারায়ণ কভু তিনি নন।
ধর্মের স্থাপন হেতু হন অবতার;
নিজ ধর্মে রুচি আছে যার,
তার প্রতি বহু প্রীতি তাঁর,
তবে কেন ভাব অকারণ।'

নীলধ্বজ কিন্তু অর্জুনকে যজ্ঞাশ্ব ফিরাইয়া দিতে চাহেন, তাই প্রবীর মাতার কাছে আসিয়া অভিমান-ভরে এইরূপ অভিযোগ করিতেছেন :—

"ভয়ে পূজা ঘৃণা করে বীর।
ফিরে দিতে যাই যদি বাজী,
ঘৃণায় অর্জুন কথা নাহি কবে মম সনে;
ফিরায়ে বদন বীরগণ হাসিবে সকলে।
শুনি মাতা, জাহ্নবীর বরে পাইয়াছ মোরে;
কাপুরুষ পুত্র কি দেছেন ভাগীরথী?
রণে যদি না যাই জননী, দেবতার হবে অপমান।
* * পিতার নিষেধ যদি, না করিব রণ
ফিরে দিব হয়, কিন্তু লোকময়—
কলঙ্ক ভাজন রাখিব জীবন ছার,
মনে স্থান দিও না জননি।
রণে যদি যেতে মোরে মানা,
বন্দিয়া চরণ,—
বিদায় লইয়া যাই জন্মের মতন।"

মাতার আদেশে মাতৃ-আশীর্বাদ শিরে বহন করিয়া প্রবীর রণক্ষেত্রে অতুলবিক্রমে পাণ্ডবদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন, কিন্তু এক দেব-চক্রান্তে পড়িয়া আজ তিনি সহসা বিভ্রান্ত হইয়া লাবণ্যবতী এক নায়িকার রূপলালসায় মুগ্ধ হইলেন। নায়িকার প্রতি রূপমুগ্ধ প্রবীরের ভাষা নাট্যকার কিরূপ পরিবর্তিত করিয়াছেন দেখুন :—

"প্রফুল্ল যৌবন, বনে হেন না ফুটে কুসুম—
তুলনায় সম যেবা তব,
কিবা রাগ রঞ্জিত বদনে,
কৌমুদী আদরে খেলে,
মন্দ বায় অলকা উড়ায়,

জিনি মণি অধর রক্তিম পদ্মমুখে ;
নয়ন-খঞ্জন করিছে নর্তন,
মাধুরী-লহরী ছুলে যায়,
সে লহরে ভাসে মম প্রাণ।
ফিরে চাও সুহাসিনি !
দেহ পরিচয়, রাজার তনয়—
আজি কিঙ্কর তোমার!"

ইহাতে বীর্যের ঝলক্ নাই—আছে কেবল লালসার তীব্রতা ও মৃগতৃষ্ণা। পরিশেষে প্রবীর কর্তৃক ঐ উপভুক্তা নায়িকা প্রান্তরস্থিত শ্মশানে প্রবীরকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার রণসজ্জা অপহরণ করিয়া লইল, কারণ শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় উহাই তাহার কাম্য ছিল। মায়ামুগ্ধ প্রবীর প্রকৃতিস্থ হইবার পূর্বে হঠাৎ সেই স্থানে অর্জুনকে দেখিতে পাইলেন। নানারূপ প্রশংসাবাদের পর অর্জুন প্রবীরের নিকট হইতে যজ্ঞাশ্ব ফেরৎ চাহিলেন। প্রবীর কিন্তু ইহার উপযুক্ত উত্তর দিয়াছিলেন :—

"রণ সাধ অবসাদ যদি ধনঞ্জয়,
চাহ যদি ফিরে দিব হয় ;
কিন্তু হে বিজয় !
বুঝিতে না পারি,
উপহাস কর কি আমার সনে ?
ফাল্গুনী সমর-ক্লান্ত সম্ভব না হয় !"

অর্জুন এ কথায় প্রবীরকে জানাইয়া দিলেন যে দেবরোষে অদ্য তাঁহার পরাজয় ঘটিবে। অর্জুনের মুখে 'পরাজয়' শব্দ শুনিয়া প্রবীর এইরূপ বীরোচিত উত্তর দিয়াছিলেন :—

"অশ্ব দিব ফিরাইয়া পরাজয় মানি,
ভেব না সম্ভব কভু।
দেবতার বলে যদি বলী তুমি আজি,
দেবরোষ যদি মোর প্রতি,
ক্ষত্রিয় শোণিত বহে ধমনীতে মম,
রণে নাহি দিব ক্ষমা।"

প্রবীরের ঐ কথায় অর্জুন হঠাৎ তাঁহাকে সেই স্থানেই রণে আহ্বান করিলেন, আপনাকে নিরস্ত্র দেখিয়া প্রবীর দেবরোষের কারণ বুঝিতে পারিলেন। সেই অবকাশে অর্জুন-সারথি শ্রীকৃষ্ণ নিম্নলিখিত মন্তব্যটুকু করিয়াছিলেন—'নরের সহিত বাদ নরের সম্ভবে, দেবতা-বিরুদ্ধে যুদ্ধে পতন নিশ্চয়।' এইরূপ টীকা-টিপ্পনী প্রবীরের অসহ্য বোধ হইল, তাই শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন :—

"বুঝিয়াছি চক্রী।
চক্র সকলি তোমার। * *
ছল মাত্র বল তব * *
জগবন্ধু নারায়ণ যদি হে কেশব।

একের কি হেতু বন্ধু বৈরী অপরের ?
পাণ্ডবের সখা, আর নহ সখা কার ?
মিষ্টভাষে উপদেশ দিতেছ আমায়,
ক্ষাত্র ধর্ম দিব বিসর্জন—
বিনা যুদ্ধে পরাজয় মাগি ?"

শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রবীরকে বুঝাইলেন যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান তাঁহারই উপদেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সুতরাং যজ্ঞাশ্ব তাঁহার অনুরোধে অর্জুনকে ফিরাইয়া দেওয়া হোক, ইহাতে অপযশ নাই, কারণ রণে প্রকৃত প্রস্তাবে তুমিই জয়ী হইয়াছ। প্রবীর কিন্তু এ স্তোক-বাক্যে সম্মত হইলেন না, কহিলেন :—

"অনুরোধে ফিরাইব বাজী ?
না, অনুরোধ না মানিব।
সম্মুখ-সমরে প্রাণ দিব,
প্রাণে মম জন্মেছে ধিক্কার।
ব্যভিচারী ফিরিলাম নারীর পশ্চাতে—
কামোন্মত্ত হইয়ে নিশায়।
গঙ্গার করেছি অপমান ;
জাহ্নবীর উপদেশ ঠেলি'
ধনু-অস্ত্র অর্পিলাম বারাঙ্গনা করে।"

প্রবীর অবশেষে অর্জুন-প্রদত্ত অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করিতে-করিতে ধরাশায়ী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রবীরের আত্মত্যাগ ও বীর্য নাটককার নিপুণ-হস্তে চিত্রিত করিয়া বেদব্যাস-বর্ণিত চরিত্রের মান শতগুণে বাধত করিয়াছিলেন। এরূপ চরিত্র ইতঃপূর্বের নাট্যসাহিত্যে দেখা যায় নাই। পূর্বোল্লিখিত প্রবীরের ঐকান্তিক বাসনা এইরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইল।

জনা চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের নূতন পরিকল্পনা। মহাভারতীয় জনা চরিত্রের উপর নূতন অঙ্গরাগ দিয়া নাটককার সম্পূর্ণ নূতন মূর্তিতে জনাকে পাঠক বা দর্শক সমাজে খাড়া করিয়াছেন। জনা মাহিষ্মতী পুরীর বীর্যবতী রাজমহিষী ও বীর্যবান্ পুত্রের জনয়িত্রী। অর্জুনকে যজ্ঞাশ্ব প্রত্যর্পণ করা রাজার অভিমত, প্রিয় সন্তানের মুখে এ কথা জানিতে পারিয়া জনা ঐ ব্যাপারকে অন্যভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই প্রবীরকে তিনি এইরূপে বুঝাইলেন :—

"বৎস! ত্যজ মনস্তাপ,
প্রবল প্রতাপ পাণ্ডব ফাল্গুনী শুনি।
তুমি নৃপতির নয়নের নিধি,
তাই রাজা নিবারে তোমারে সমরে যাইতে যাদুমণি!
বলবানে পূজাদান আছে এ নিয়ম,
রণস্থলে বীর করে বীরের আদর।
শুনিয়াছি নর-নারায়ণ ধনঞ্জয়,
লজ্জা নাহি হেন জনে সম্মান প্রদানে।"

এই কথাগুলির মধ্যে পুত্রের প্রতি মমতা ও রণনীতির উল্লেখ আছে। প্রবীর কিন্তু জননীকে বুঝাইলেন যে 'ডরে পূজা ঘৃণা করে বীর', অধিকন্তু জাহ্নবীর বরে যখন তাঁহার জন্ম হইয়াছে, তখন রণে কাপুরুষতা দেখাইলে দেবতার অবমাননা হইবে। পুত্রের এবংবিধ কথায় জনার প্রাণ পুত্রস্নেহে ভরিয়া উঠিল, আবেগভরে তিনি সন্তানকে বলিলেন—'নয়ন-আনন্দ তুমি জীবন আমার, ভাবি মনে পাছে তোর হয় অকল্যাণ।' প্রবীর মাতাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, রণমৃত্যু ক্ষত্রিয়পুত্রের সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর আকিঞ্চন। কোন্ ক্ষত্রিয় রমণী ভীরু পুত্র কামনা করেন? অশ্ব-প্রত্যর্পণ করা যখন পিতার ইচ্ছা, তখন তাঁহার ইচ্ছার অন্তরায় হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, কিন্তু প্রবীরের পক্ষে এ কলঙ্কময় জীবন-যাপন করা আর উচিত হইবে না!

জনা স্থির-চিত্তে ক্ষত্রিয়ের অপমানের কথা বুঝিলেন এবং ধীরভাবে পুত্রকে বলিলেন—"স্থির হও, আমি বুঝাইব ভূপে। হয় হোক্ যা আছে মা জাহ্নবীর মনে, রণ সাধ যদি তোর, রণ পণ মম।" এই কথাগুলির মধ্যে ধৈর্য বীর্য ও পুত্রের অভিমান-প্রসূত কথার যথার্থ প্রত্যুত্তর আছে। এইবার জনা নানা প্রকারে রাজাকে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, নীলধ্বজ কিন্তু তদ্বৈপরীত্য সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। জনা ইহাতে ধীরভাবে রাজাকে এইরূপ বলিলেন :—

"তব আজ্ঞা শিরোধার্য মম মহারাজ!
কিন্তু প্রভু! ক্ষত্রিয় জননী,
রণে যেতে পুত্রে কেন করিব নিষেধ?"

নীলধ্বজ তখন জনাকে পাণ্ডবদের জয়গান শুনাইতে আরম্ভ করিলেন, জনা তাহাতে অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন :—

"পাণ্ডবের কীর্তিগান শ্রবণে নাহিক সাধ মম।
জানি প্রভু তোমার চরণ,
পূজা করি জাহ্নবীরে। *
দেববরে দেব সম জন্মেছে কুমার,
ক্ষাত্র ধর্ম-আচরণে করিয়াছে সাধ,
তাহে বাদ কি কারণে সাধ নরনাথ?"

নীলধ্বজ জনাকে আরও বুঝাইতে লাগিলেন যে কৃষ্ণার্জুন নর-নারায়ণরূপে ধরার ভার হরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাঁহারা পূজ্য, পূজনীয় ব্যক্তিকে পূজাদান শ্রেষ্ঠ রাজনীতি। রাজার এই কথার উত্তরে জনা বলিলেন :—

"পূজ্যজনে পূজাদান অবশ্য বিধান,
পূজা আশে আসে নাই ধনঞ্জয়,
দিয়ে লাজ ক্ষত্রিয় সমাজে
বীরদম্ভে ফেরে ল'য়ে বাজী, যেন কহে—
'আছ কেবা শক্তিমান্, আগুয়ান্ হও রণে?
হেন রণ-আবাহন উপেক্ষা যে করে

শত ধিক্‌ হেন অস্ত্রধরে ;
মৃত্যু শ্রেয়ঃ হেয় প্রাণ হ'তে।
পুত্রের কল্যাণ প্রভু কর কি কামনা ?
কেন তবে দাও তারে কলঙ্কের ডালি ?
* * বীর মাতা পুত্রের বীরত্বে করে সাধ।"

নীলধ্বজ পত্নীর দৃঢ়তা দেখিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন—'রণ যদি আকিঞ্চন তব বীরাঙ্গনা, যাও রণে নন্দনে লইয়ে, জেনে শুনে করিব না নারায়ণে অরি।' অপমানিতা জনা দৃঢ়তার সহিত জানাইলেন :—

"দেহ আজ্ঞা, যাব রণে নন্দনে লইয়া,
আজ্ঞা মাত্র চাই ;
এক গোটা পদাতিক সঙ্গে নাহি লব,
তনয়ে করিব রথী, সারথি হইব।
নারায়ণ অরিরূপী যার,
করতলে গোলোক তাহার,
সুসময় উদয় ভূপাল।
অরিরূপে নারায়ণ আসিয়াছে ঘরে।
রাজ্য ছার, জীবন অসার,
অতুল গৌরব ভবে রাখ নরবর—
কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের সনে বাদ করি।"

জনার মন্ত্রণা ও উদ্দীপনা বৃথা হইল, নীলধ্বজ কৃষ্ণবিরোধী হইতে পারিলেন না।

বীরমাতা তখন পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিদায় দিয়াছেন। প্রবীর দিবাভাগের মধ্যে রণজয় করিয়া সহসা নিরুদ্দিষ্ট হইলেন, এবং কেহই তাঁহার সন্ধান পাইতেছে না। এই সংবাদে পুত্রৈকপ্রাণা জনা বিচলিতা হইলেন। রাজ-জামাতা অগ্নিদেব অন্বেষণ তৎপর হইয়া রাজপুরী মধ্যে নানা দুর্দৈব নিরীক্ষণ করিয়া রাজমহিষীকে দুর্গাদেবীর আরাধনা করিতে বলিলেন। অগ্নির কথায় জনার উত্তর একনিষ্ঠ সাধিকার মতোই হইযাছিল :—

"দুর্গা কেবা। তারে নাহি জানি ;
শুনি মায়ের সতিনী,
কি কারণে অর্চ্চনা করিব ডাকিনীর ?
শঙ্করে নাহিক মম ডর,
শিরে যারে ধরে গঙ্গাধর,
দুস্তর তারিণী দুরিতহারিণী—
সদয়া দাসীর প্রতি। নারায়ণ,
ত্রিলোচন, ভবানী না গণি,
জানি মাত্র জাহ্নবী জননী ;
অমঙ্গল রহে কোথা মঙ্গলার বরে ?"

অগ্নি তখন জনাকে বলিতে বাধ্য হইলেন যে ভাগীরথী ও পার্বতী অভেদ, ভেদ করা উচিত নহে। এই প্রসঙ্গে জনার উত্তর বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল :—

"ভাগীরথী পার্বতী অভেদ যদি জান,
তবে কেন অন্য নাম আন?
নিশ্চয় দেবত্ব তব হয়েছে ভৈরবে,
নহে কহ পতিত পাবনী এক আত্মা ডাকিনীর সনে?"

অনন্তশরণা জনা স্বীয় ইষ্টদেবীকেই বড় বলিয়া জানেন। ইহাতে জনার নিষ্ঠাই প্রকাশিত হইয়াছে।

পুত্রের অকস্মাৎ নিরুদ্দেশে উদ্বেগকাতরা জনা পাগলিনীর মতো অন্বেষণ করিতে করিতে প্রবীরকে শ্মশানরূপ রণক্ষেত্রে প্রাণশূন্য দেহে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"ওই-ওই—ওই যে কুমার।
বাপ্ ধন পড়েছ সংগ্রামে,
তাই যাদুমণি এস নাই মার কাছে?
হা পুত্র, হা প্রবীর আমার!"

এরূপ মর্মভেদী হাহাকারের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ জনার মানসিক পরিবর্তন ঘটিল। তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃপুরে যেখানে তিনি তাঁহার পুত্রস্নেহকে আদরে স্থান দিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে প্রতিহিংসা-বৃত্তি সহসা জাগ্রত হইয়া দেখা দিল। জনার ভাষা তখন এইরূপ হইল :—

"মমতা এস না বক্ষে মম, * *
নখাঘাতে উৎপাটন করিব নয়ন,
বিন্দু বারি যেন নাহি ঝরে।
বীর-অবতার, অসহায় পড়েছে কুমার,
প্রেত-আত্মা তার, নিত্য আসি মা বলে ডাকিবে,
নিত্য আসি করিবে ভৎর্সনা! * *
শোণিতের সনে বহ গরল প্রবাহ,
বৈশ্বানর খেল শ্বাসসনে, পুত্রহন্তা বৈরীরে নাশিতে।
চক্ষু হতে প্রলয়-অনল ছোট।
হিংসা-তৃষ্ণা শুষ্ক কর হিয়া,
কক্ষচ্যুত হও দিনকর।
উঠরে প্রলয়ধূম বিশ্ব আবরিতে,
পুত্রঘাতী অরাতি জীবিত।"

প্রতিহিংসা-পরায়ণার ভাষা কিরূপ তীব্র উম্মাসম্পন্ন হয় নাট্যসাহিত্যের দর্শক বা পাঠকেরা এই তাহার প্রথম পরিচয় পাইলেন। রণ-শায়িত কুমারের মুখপানে চাহিবামাত্র জনার স্নেহসিন্ধু মথিত হইয়া উঠিল, তাই তিনি বলিলেন :—

"ঘুমাও নন্দন, অগ্রে করি বৈর-নির্যাতন,
শোব শেষে তোরে ধরি কোলে। * *

দেখে যাই শেষ দেখা. আহা বাপ্‌ধন !
পলক পোড়ো না চোখে নেহারি বাছারে।"

প্রতিহিংসাবৃত্তি ও পুত্রস্নেহ পাশাপাশি থাকিয়া কেমন ক্রীড়া করিতেছে !
প্রবীরের স্ত্রী মদনমুঞ্জরী সহমৃতা হইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। জনা পুত্রবধূকে শোককাতরা দেখিয়া বলিলেন :—

"কাঁদ উচ্চৈঃস্বরে, শোক কর বালা,
শোক নাহি জনার হৃদয়ে * *
তীক্ষ্ণ অস্ত্রধার বেজেছে বাছার কায়,
বুঝি মর্মস্থল জলে,
কর তায় ধারা বরিষণ। * *
রুধির তৃষায় জলে জনার অন্তর।"

মদনমুঞ্জরী ভগ্নহৃদয়ে স্বামিপদতলে প্রাণত্যাগ করিলে পর জনার বিদায়-কালীন ভাষা এইরূপ হইল :—"গুণবতি ! ঘুমাও পতির কোলে, চলে জনা প্রতিবিধিৎসিতে।" ঐ শ্মশানভূমি পরিত্যাগের পূর্বে জনা যে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন তাহা সত্যই রোমাঞ্চকর !

জনা ঘৃণায় নীলধ্বজের রাজ্য ত্যাগ করিয়া দূরস্থিত ভীষণ প্রান্তর অতিক্রম-পূর্বক মরুভূমি বেষ্টিত দুরন্ত শ্মশানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মনের প্রকৃতি যেমন বিশৃঙ্খল, তদনুযায়ী প্রাকৃতিক দৃশ্যও তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন :—

"চল পাপ রাজ্য ত্যজি,
পতি তোর পুত্রঘাতী অরাতির সখা।
চল পুত্রশোকাতুরা—
চল বালুময় বেলায় বসিয়ে দেখিবি বাড়বানল।
চল যথা আগ্নেয় ভূধর,
নিরন্তর গভীর হুঙ্কারে উগারে অনলরাশি।
চল যথা বাসুকির শ্বাসে দগ্ধ দিগ্‌দিগন্তর।
চল যথা ঘোর তমোমাঝে,
খেলে নীল প্রলয়-অনল—
লক্‌-লকি বিশ্বগ্রাসি-জিহ্বা।"

মাতার অনুসরণকারিণী স্বাহা জনাকে এই সময়ে 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, জনা তাহাতে বলিয়াছিলেন :—'কে রাক্ষসী মা বলিস্ মোরে ? মরেছে প্রবীর, মরেছে কুমার, পুত্র-পুত্রবধূ মম পড়িয়ে শ্মশানে, ফুরায়েছে মা বলা আমার !' শোকোন্মত্তা জনা না থামিয়া ক্রমাগত চলিয়াছেন, আর মুখে বলিতেছেন :-

"হুহুঙ্কারে দীর্ঘশ্বাস ছাড় সমীরণ !
ঘোর ঘন গভীরগর্জনে কর ধারা বরিষণ,
মরেছে প্রবীর, শোক-অশ্রু ঢালে নাহি কেহ।

* * তিমির বসনে বজ্র-অগ্নি আভরণে
সাজ নিশা ভয়ঙ্করি।
হেরি হৃদয়ের প্রতিরূপ মম,
ঘনবক্ষে যেন ক্ষণ-প্রভা।
অস্ত্রাঘাত কুমারের অঙ্গে যত,
আছে থরে-থরে হৃদয় মাঝারে—
হেরে জনা,—আর কেহ নাহি দেখে।"

পুত্রশোকাতুরার এরূপ প্রাণোন্মাদিনী ভাষা তদানীন্তন নাট্যসাহিত্যে দুর্লভ ছিল।

জনার দ্বিতীয় অনুসরণকারী উলুক ভগিনীকে গৃহে প্রতিগমন করিতে বলায় জনার উত্তর তদানীন্তন নাট্যসাহিত্যের দর্শক বা পাঠক সমাজকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়াছিল :—

"সহোদর? বধেছ কি পাণ্ডব অর্জুনে?
পাণ্ডব-শোণিতে বাছার কি করেছ তর্পণ?
শকুনি-গৃধিনী বজ্র ওষ্ঠে করিছে কি পাণ্ডবের চক্ষু উৎপাটন?
অরিমুণ্ড লয়ে রণস্থলে গেণ্ডুয়া কি খেলায় পিশাচ?
শত্রুমেদে কায়াপুষ্টি করেছে মেদিনী?
শত্রু-অস্থি-মালা পরেছে কি রণভূমি?
সহোদর! সহোদর যদি ত্বরা দেহ সমাচার,
নিষ্পাণ্ডবা ধরা তব শরে?"

উলুক বহুকষ্টে জনাকে বুঝাইল যে শোক করিলে কুমারের জীবন শমন-সদন হইতে ফিরিয়া আসিবে না, এবং তাহাতে শত্রুনাশও হইবে না, সুতরাং গৃহে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। উলুকের এই কথায় জনার মনে সহসা ভাবান্তর আসিল, জনা বলিলেন :—'প্রতিশোধ নাহি হবে! তবে পাপ প্রাণ কি কারণে রাখি' বলিয়া 'প্রতিহিংসা' শব্দ মুখে উচ্চারণ করিতে-করিতে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেই সম্মুখে কলনাদিনী জাহ্নবীকে দেখিতে পাইয়া অভিমানভরে তাঁহার পবিত্র সলিলে জনা ঝম্পপ্রদান করিলেন। তাঁহার বিদায়কালীন ভাষা এইরূপ :—

"এলে কি মা কলনিনাদিনি!
অভাগিনী নিতে কোলে?
দেখ-দেখ, পুত্র শোকাতুরা দুহিতা তোমার তারা।
দেখি মা গো আঁধার সংসার,
কেহ নাহি আর, তাই রণস্থলে—
পুত্রে ফেলে তোর কোলে জুড়াতে এসেছি!"

মাতাকে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া কন্যার অভিমানপূর্ণ অভিযোগ এই পর্যন্ত! এইবার তাঁহার অন্তর্দাহের পরিমাণ জনা মাতাকে জানাইতেছেন :—'দেখ মা গো পশি অন্তঃস্থলে, নিদারুণ হুতাশন জ্বলে; কত তাপ বাড়ব-অনলে, দাবানলে তাপ কিবা! কত তাপ সহস্র তপনে? ঈশানের ভালে বহ্নি তাহে তাপ কিবা? তাপহরা হর এ দারুণ জ্বালা।"

জনা চরিত্রে নারীহৃদয়ের নূতন রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। ইতঃপূর্বে নাট্যসাহিত্যের আসরে কৌশিকীবৃত্তি-সম্পন্না নারীরাই প্রাধান্যরক্ষা করিয়াছিলেন, আজ গিরিশচন্দ্র তাহাতে বৈচিত্র্য আনিলেন, এবং জনার ঐকান্তিক বাসনাও চরিতার্থতা লাভ করিল।

জনা নাটকের অন্যান্য ছোট-ছোট চরিত্রের মধ্যে বৃষকেতুর চরিত্রে নাটককার অভিনবত্ব আনিয়াছেন। জাহ্নবীর ক্রোধানল হইতে অর্জুনকে বাঁচাইতে গেলে ঐ ক্রোধবহ্নিকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া উহার তীব্রতা নষ্ট করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের উপরি-লিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইলে ইহা স্থির হইয়াছিল যে উহার এক অংশ অর্জুন, দ্বিতীয় অংশ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ও তৃতীয় অংশ বৃষকেতু গ্রহণ করিবেন; কিন্তু কৃষ্ণভক্ত বৃষকেতু শ্রীকৃষ্ণের অংশও নিজে গ্রহণ করিতে চাহিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

"তব অংশ দেহ এ দাসেরে।
নিত্য কত ক্ষুদ্র কীট পোড়ে হে অনলে,
এ পতঙ্গ রোষাগ্নিতে যদি যায় জলে,
কমলাক্ষ! তাহে ক্ষতি কিছু নাহি হবে।
তুমি ব্যথা পাবে—এ যাতনা সহিতে নারিব।
রাঙ্গা পায় জানায় কিঙ্কর, ব্রজেশ্বর ক'র না বঞ্চনা।"

জনার ক্রোধাগ্নি লক্ষীভূত অর্জুনের পরিবর্তে কৃষ্ণ-মায়ায় অশ্বত্থ বৃক্ষকে ভস্মীভূত করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিজ দেহে অশ্বত্থের সেই তাপ গ্রহণ করিয়া জনাকে বিষহীনা ভুজঙ্গীর মতো করিয়াছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণের কথায় বৃষকেতু বলিলেন :—

"আজ্ঞ দাসে কহ বিশ্বরূপ,
বৃক্ষদেহে সহিতেছ যেই রোষানল,
কিসে সে শীতল হবে?
সাধ হয় হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়ে
লেপি প্রভু অশ্বত্থের গায়,
যদি ক্ষণেক জুড়ায় ঘোর জ্বালা।"

বৃষকেতুর এইরূপ আত্মদান-কাহিনী ভোগসর্বস্ব জগৎবাসীর পরম উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে। না হইবে কেন? কর্ণপুত্র বৃষকেতুর জীবন শ্রীকৃষ্ণ-পদে পূর্বেই উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। ঈশলব্ধ প্রাণ তাঁহাতেই পুনরর্পিত হইবে—ইহার বৈচিত্র্য তাঁহার কৃতজ্ঞ মনের অন্তরালে এতদিন লুক্কায়িত ছিল।

গঙ্গারক্ষকদ্বয়ের ভূমিকায় নাটককার মানবচরিত্রের এক নূতনরূপ (type) দেখাইয়াছেন, জনার সংগীতবিভাগে গিরিশচন্দ্রের কৃতকার্যতা অসীম। কি প্রেম-সংগীত, কি কৃষ্ণবিষয়ক সংগীত, কি বৈভ-সংগীত সকল বিভাগেই তিনি এখন সিদ্ধ-হস্ত হইয়াছিলেন। জনার সংগীতগুলি আজও লোকে ভুলিতে পারে নাই, বহুস্থানে ঐগুলি গীত হইতে শুনা যায়। নাটকের ও সংগীতের ভাষা বিশেষ কবিত্ব-পূর্ণ। গৈরিশ ছন্দ মূলতঃ অমিত্রাক্ষর হইলেও উহার যতিস্থানে মাঝে-মাঝে মিল থাকায় জনার ভাষা বড়ই মধুর শুনাইয়াছে। এই নাটককে ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যতে বহু গীতাভিনয়ের পালা রচিত হইয়াছিল। স্থানাভাবে গানগুলির প্রথম ছত্রও উদ্ধৃত হইল না, অনুসন্ধিৎসু পাঠক নাটকের মধ্যে তাহা দেখিয়া লইবেন। জনা নাটকখানি গিরিশ নাট্যশিল্পের অদৃষ্টপূর্ব ট্র্যাজেডি।

পাণ্ডবগৌরব নাটক

গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবগৌরব' পৌরাণিক নাটক; মহাভারতের পরিশিষ্ট-হিসাবে লিখিত 'হরিবংশের' দণ্ডীপর্ব হইতে ইহার গল্পাংশ সংগৃহীত। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ ক্লাসিক থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। আশ্রিতরক্ষা-ধর্মকে ভিত্তি করিয়া এই দৃশ্যকাব্যের প্রাণ গঠিত হইয়াছে। নাটকটির নায়ক-নায়িকা, প্রতিনায়ক-প্রতিনায়িকা এবং তাঁহাদের পীঠমর্দগুলির যাবতীয় চেষ্টা নাটককার কিরূপ কৌশলে ঐ আশ্রিত পালন ধর্মের অনুকূলে বা প্রতিকূলে রাখিয়া তাহারই পূর্ণতাসাধনে সফলকাম হইয়াছিলেন, তাহা জন-সাধারণের বাস্তবিকই উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে।

কারণ না থাকিলে কার্যের সৃষ্টি হয় না, তাই প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে—"বনে রহ অশ্বিনী হইয়ে, যামিনীতে হ'য়ো নারী। অষ্টবজ্র-দর্শনে হইবে পূর্ববৎ"—উর্বশীর প্রতি দুর্বাসার এই অভিশাপবাণীর মধ্যে পরে প্রতিপাদ্য আশ্রিত-রক্ষারূপ কার্যের কারণ নিহিত রহিয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে—নারদের প্ররোচনায় শ্রীকৃষ্ণের তুরঙ্গী-গ্রহণে যে অভিলাষ জন্মিয়াছিল তাহাতেই ঐ কারণের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। তৃতীয় দৃশ্যে—দ্বারকার কক্ষমধ্যে সুভদ্রার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত-পালন-ধর্ম সম্বন্ধে—

'শুন ভদ্রা, সার ধর্ম আশ্রিত পালন,
নিরাশ্রয়ে আশ্রয়-প্রদান।
যেবা দেয় অনাথে আশ্রয়,
চিরদিন গাই তার জয়'—

বিদায়কালীন তাঁহার এই উপদেশপূর্ণ বাণীর মধ্যেই ঐ কারণের পরিপুষ্টি দেখা যায়। চতুর্থ দৃশ্যে—উর্বশীর হরিপাদপদ্মে আত্ম-নিবেদনে ঐ কারণের ফলপ্রসূ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। পঞ্চম দৃশ্য, গঙ্গাতীরে—সুভদ্রা কর্তৃক দণ্ডীকে আশ্রয়দানের আশ্বাস হইতেই পূর্বোক্ত কারণ থেকে কার্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। এখন এই আশ্রয়দান-ব্রত নাটকের পরবর্তী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া কিরূপে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল তাহার অনুসরণ করা যাক্।

ঐকতান না হইলে সুর জমে না। নাটকের প্রথম অঙ্কে অবতীর্ণ যাবতীয় চরিত্রের মূলীভূত উদ্দেশ্যের ঐকসাধন-ব্যাপারে—এমন কি ঐ সকল চরিত্রগত মনোভাব অনুযায়ী প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেও যে একটা ঐক্য বিদ্যমান থাকে নাটককার এ নাটকে তাহা অতি সুন্দর কৌশলে দেখাইয়াছেন। দৃষ্টান্তে ইহা স্পষ্টীকৃত হইবে:—(১) চতুর্থ দৃশ্য, রাজোদ্যানে—অপ্সরাগণের মনোভাব-ব্যঞ্জক কথাবার্তার মধ্যে—'ঘন বায়ু—শ্বাস নাহি বহে' কথাগুলির দ্বারা পৃথিবীর আব্‌-হাওয়ার প্রতি তাহাদের অতৃপ্তির পরিচয় আছে এবং সেই অতৃপ্তির সহিত ঐক্যসাধন করিয়াছে—'গরজে স্বর্ণ জলধর, তার মলিন সোণার কর'—এই গানটি এবং তদনুযায়ী রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট ও সাজ-সজ্জা। (২) পঞ্চম দৃশ্য, গঙ্গাতীরে—সুভদ্রার মনোমধ্যে বিচরণশীল আশ্রিতরক্ষা-ব্রতের সহিত একধর্মী গঙ্গাতরঙ্গনিচয়ের কলনাদীয় ভাষা—যাহাকে নাটককার মূর্তিমতী গঙ্গাসহচরীদের গীতে পরিণত করিয়াছেন, যথা—

"ধবলধার বহিছে বিমল, কহিছে মৃদুল নাদে।
দ্রবময়ী হ'য়ে শিখর বাহিয়ে,

নরতাপে মম কাতর হিয়ে,
কে কোথা কাঁদে বিষাদে, প্রাণ তাহে কাঁদে"

ইত্যাদি ঐ গানটির ভাষা ও ইঙ্গিত সুভদ্রার তখনকার মনোভাবের সহিত এমন সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিল, যে ঐকতান সংগীতের মতো সকলের কর্ণে ঐ সুর বাজিয়া উঠিল; গঙ্গার তরঙ্গায়িত দৃশ্যপটও ঐ কার্যে সহায়তা করিয়াছিল। এটি গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণ নিজস্ব বিধান, তাঁহার পূর্বগামী কোন নাট্যকারই স্থাবর-জঙ্গমের এবংবিধ ঐকতান-জনিত সুরের মিল দেখাইতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় অঙ্কে- আশ্রিত-পালনধর্মের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে বহু মতামত ও ক্রিয়া বিরাটনগরে এবং দ্বারকায় প্রকাশিত বা অনুষ্ঠিত হইয়া ঐ ধর্মের জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। সুভদ্রা দণ্ডীরাজকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ভীমসেন-প্রমুখ পাণ্ডবগণ তাহার পোষকতা করায় পাণ্ডবের আজন্ম সখা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষের সলা পরামর্শ এই অঙ্কের মধ্যে রূপগ্রহণ করিয়া আশ্রিত রক্ষা ধর্মকে বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছিল।

তৃতীয় অঙ্কে—কুরু-পাণ্ডব একত্রে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। পাছে পাণ্ডবেরা এই সময়ে বিজয়ী হইয়া গৌরবান্বিত হয়, এই ঈর্ষায় কুরুপক্ষ দুর্যোধনের পরামর্শে পাণ্ডবদের সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন। ভীমসেন দুর্যোধনের সাহায্য পছন্দ করেন নাই, কিন্তু অনন্যোপায় অবস্থায় যুধিষ্ঠিরের মীমাংসার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিলেন না। তিনি মনে মনে এই যুক্তি আঁটিলেন যে, দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দ্বৈরথ-সমর প্রার্থনা করিলেই কৌরবদের সহায়তার আর প্রয়োজন হইবে না, এবং আসন্ন সময়ে অযথা লোকক্ষয়ও তাহাতে নিবারিত হইবে। সুভদ্রার প্রেরণায় ভীমই প্রকৃতপক্ষে দণ্ডীরাজকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, সুতরাং আশ্রিতরক্ষা-ধর্ম তাঁহারই প্রাণ-পণে পালিত হোক্—ইহাই ভীমের আন্তরিক ইচ্ছা। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ভীমসেনের এই অভিলাষ পূর্ণ করেন নাই, কারণ উর্বশীর শাপোদ্ধার ও ভক্তজনের মনোরথসিদ্ধি তাঁহার অন্যতম গুহ্য উদ্দেশ্য ছিল, পরবর্তী অঙ্কে তাহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। আশ্রিতরক্ষা-প্রশ্ন এ অঙ্কে আর দোলায়িত অবস্থায় থাকে নাই, তবে কি প্রণালীতে উহা রক্ষিত হইবে তাহা কেবল নির্দিষ্ট হয় নাই।

চতুর্থ অঙ্কে—দণ্ডীরাজ ও উর্বশীর মধ্যে সহসা বিভেদ উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবদের আশ্রিতরক্ষা-ধর্ম পালনের ব্যাঘাত আসিয়াছিল। সন্ধি ও বিগ্রহের মধ্যে কোনটি শ্রেয়ঃ এই অঙ্কের সর্বশেষ দৃশ্যে তাহা নির্ণীত হইয়াছিল। সুভদ্রার মধ্যস্থতায় একদিকে—দেবাসুর, নাগ, যক্ষ, দানব, রক্ষঃ, কিন্নর যাদব ও ভারতভূমির অগণন ভূপতিনিচয়, অপরদিকে—বিরাট, পাঞ্চাল, কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে রণদামামা বাজিয়া উঠিল, পরবর্তী অঙ্কে ঐ রণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

পঞ্চম অঙ্কে - দেবাসুর সংবলিত যাদব সংগ্রামে পাণ্ডবদের বিজয়-গৌরব ঘোষণা, অষ্ট বজ্রের মিলনদ্বারা দণ্ডীরাজের রক্ষা ও নব জীবনপ্রাপ্তি এবং তুরঙ্গীরূপিণী উর্বশীর শাপবিমোচন-দ্বারা তুরঙ্গী সমস্যার সমাধান ও তাঁহার পূর্বজীবন প্রাপ্তিজনিত আনন্দ যুগপৎ সংসাধিত হইয়াছিল।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক-নিচয়ের মধ্যে 'পাণ্ডবগৌরব' শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। ইহার ভাষা উন্নত ও কবিত্বপূর্ণ, সংলাপগুলি যুক্তিযুক্ত ও স্থানে-স্থানে দার্শনিক তত্ত্বে সমুদ্ভাসিত। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র ইহার কেন্দ্রশক্তি। যখন যে ক্রিয়ার মধ্য দিয়া যে ঘটনার প্রয়োজন হইয়াছে অভিকর্ষ শক্তিবলে তিনি তাহা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। এই নাটকের আসল সমস্যা যাহা কার্য-কারণ-সূত্রে

সাধারণের মধ্যে কিছু ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ কেবল সাত্যকিকে তাহার আভাস মাত্র এইরূপে দিয়াছিলেন :—

"নিরাশ্রয়া অনাথিনী বালা,
কাঁদে মহাসঙ্কটে পড়িয়ে।
প্রভুভক্ত বৃদ্ধ চাহে প্রভুর কল্যাণ,
লয়ে কৃষ্ণনাম এসেছিল দ্বারকায় ;
অবলায় করিব বঞ্চিত—এই কি বিহিত ?
প্রভুভক্ত জনে যদি ভক্তি নাহি পায়,
প্রভু-অনুগত কহ কে হবে ধরায় ?
ব্যর্থ মম হবে কৃষ্ণ-নাম,
ধর্মের হইবে অসম্মান।"

দ্বৈরথ সমর প্রত্যাশায় আগত ভীমসেনকে প্রত্যাখান করার মধ্যে কি রহস্য বিজড়িত ছিল তাহা সাত্যকি কৃষ্ণপ্রমুখাৎ শুনিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ 'সময়ে বুঝিবে প্রয়োজন'—বলিয়া রহস্যোদ্‌ঘাটন করেন নাই। নাটককার এখানে আর্টের মন্ত্রগুপ্তি (concealment of Art) রক্ষা করিয়া দর্শক বা পাঠকের আগ্রহ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। যদিও ঐ মন্ত্রগুপ্তি নাটকের উপসংহার সন্ধিকালে আর অপ্রকাশ্য থাকে নাই, তথাপি নাট্যকবি অন্তের অগোচরে উহার কার্য-পরম্পরা দেখাইয়া ভক্তের জন্য উপাস্যের বেদনা ও ভক্তের গৌরব-বৃদ্ধিতে উপাস্যের আনন্দ এই তথ্যটি প্রকাশিত করিলেন।

নর ও দেবতার সংমিশ্রণে নাটকের আখ্যানভাগ সৃষ্ট বলিয়া ইহার যাবতীয় কার্যাবলি মায়িক অবস্থার ভিতর দিয়া নাট্যকারকে দেখাইতে হইয়াছে, তজ্জন্য ইহার দেবভাবে অমানুষিকতার ছায়া স্পর্শ করে নাই। গভীর বনমধ্যস্থ অম্বিকাদেবীর স্থানে কঞ্চুকী ও সুভদ্রার গমন সৌকর্যার্থ আলোক-ধারাপাত ও সহসা আবির্ভূত কৃষ্ণসঙ্গিনীগণের সংগীতে যে অস্বাভাবিকতার ভাব জন সাধারণের মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা জগতের ইতিহাসে অসম্ভব ব্যাপার নহে। সাধনার পথে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের ইহা দৃষ্ট ঘটনা। নাট্যকবি ঐ ক্রিয়াসম্পাদনের জন্য পাত্র-পাত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন কঞ্চুকী ও সুভদ্রাকে। কঞ্চুকীর সরল অকৃত্রিম প্রভুভক্তি, নিজ প্রাণ দিয়া অন্নদাতা প্রভুর মঙ্গলকামনা তাঁহাকে ভক্তিমার্গের উন্নত সাধক করিয়া তুলিয়াছিল। সুভদ্রা শ্রীকৃষ্ণের স্ব-গণ এবং মহাশক্তি অংশে তাঁহার জন্ম, সুতরাং আলোকদর্শন ও তদ্দ্বারা মনের সন্দেহ নিরসন-পূর্বক আত্মানুভূতি লাভ করা তাঁহাদের কাছে দুর্লভ সামগ্রী ছিল না। নাটককার আর্টের খাতিরে এ দৃশ্যে শ্রীকৃষ্ণকে আলোকের প্রতীক (symbol) ও কৃষ্ণসঙ্গিনীদিগকে সন্দেহের প্রতীকরূপে দেখাইয়া দৃশ্যপট ও সংগীত তরঙ্গ দ্বারা দর্শকদের চিত্ত বিনোদনের উপায় রাখিয়া তৎসঙ্গে নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইয়াছিলেন।

মানবী ও অপ্সরা চরিত্রের পার্থক্য কোথায় তাহা দৃশ্যকাব্যের ভিতর দিয়া নাট্যকার এই প্রথম নাট্যসাহিত্যে দেখাইবার চেষ্টা করিলেন। রূপলালসায় মুগ্ধ দণ্ডীর প্রেমদান ব্যাপারকে উর্বশী এইরূপ বলিয়াছে :—

"শুনেছ অপ্সরী—নারী,
কিন্তু নাহি নারীর হৃদয়!

অপরূপ বিধির সৃজন,
রূপে ভুবনমোহিনী—বিলাসিনী ;
স্বর্গবাসে যায় লোক ভোগ আকাঙ্ক্ষায়,
পায় মাত্র প্রেমহীন দেহের সঙ্গম।"

নিজের নিষ্করুণ ব্যবহারে ক্রুদ্ধ দণ্ডীর প্রতি উর্বশী অন্যত্র এইরূপ বলিয়াছে :—

"স্বেচ্ছাধীনা, পরাধীনা স্বর্গপুরে যেই—
প্রাণময়ী ভাবে তারে ? * *
লালসায় যেই দিন যে চেয়েছে মোরে,
করিয়াছি তখনি ভজনা তার,
শাপগ্রস্ত হব এই ডরে। ইচ্ছাধীন—নহে প্রতিদান,
তপে শীর্ণ কাষ্ঠসম দেহ, হীন চিত কুরূপ কুৎসিত,
ভোগ্য দেহ সবার সেবায় ডালি!
স্বর্গে ভ্রমি কালিমা হৃদয়ে ধরি !"

উর্বশী দণ্ডীকে তাহার অতৃপ্তির কথা আরও বলিতেছে :—

"মর্মব্যথা তুমি কি বুঝিবে ?
শ্বাসরুদ্ধ হয় মম মৃত্তিকার গৃহে।
প্রান্তরে আসিযে শিরে হেরি নীলাম্বর,
হেরি উজ্জ্বল তারকামালা—
ভুবনমোহিনী বেশে ভ্রমিতাম যথা।
হেরি ছায়াপথ,—যেই পথে যাইতাম দেবেন্দ্রে ভেটিতে !
হেরি মেঘদল চলে, ভাবি মনে,—
বিদ্যুৎ-অঙ্গিনী কোন সঙ্গিনী আমার যাইতেছে কোন লোকে !
ছিল জ্যোতির্ময় জ্যোতির গঠিত কায়,
রূপের ছটায় মুগ্ধ হত ইন্দ্রের নয়ন,
এবে মাখা মৃত্তিকায় লুটায় ধরায়।
বহিয়ে মন্দার গন্ধ ছানিত সমীর—
শীতল স্পর্শিত কায়,
বহি পূতিগন্ধ ভার,—তীক্ষ্ণ
তীরসম এ সমীর বিন্ধে দেহে।
কীটপূর্ণ বারি পান—সুধা বিনিময়ে ;
মৃত্যু নাই,—
এ যন্ত্রণা কেমনে এড়াই !"

ধরায় আসিয়া দেহের পরিবর্তনের সহিত উর্বশীর মনের পরিবর্তন ঘটিল না,—অপ্সরা চরিত্রের ইহাই বৈচিত্র্য। শাপগ্রস্তা হইয়া মানবীরূপে ধরাতলে আসিলেও প্রাণ-মন মানুষের প্রেমাধীন হইল না,

ইহাই মানবীর সহিত অপ্সরা চরিত্রের পার্থক্য। অপ্সরা স্বর্গের বেশ্যা। মর্ত্যের বেশ্যার মধ্যেও কোন-কোন স্থানে প্রেমের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নাট্যকার অপূর্ব লিপি-কুশলতার সহিত অপ্সরা চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন।

এই নাটকের কঞ্চুকী চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব হইলেও ইহার নাম সংস্কৃত নাটক হইতে গৃহীত। নামের মিল থাকিলেও রূপের পার্থক্য আছে। উভয়েই বৃদ্ধ ও অন্তঃপুরচারী বটে, কিন্তু গিরিশের কঞ্চুকীর প্রভু-ভক্তি অটল-বিশ্বাসীর মতো দৃঢ়। ইহার সরলতার মধ্যে মালিন্যের ছায়া স্পর্শ করে নাই, কুটিলতার ধার তিনি ধারিতেন না। উর্বশীর 'ঘুড়িরূপ ধারণ' ব্যাপারটা তাঁহার কাছে অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কারণ বাস্তব জগতে তিনি এরূপ চিত্র দেখেন নাই। নিজে সত্যবাদী বলিয়া মিথ্যাবাদীকে পছন্দ করিতেন না। আন্তরিকতার অনুরাগী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাগ্‌-বৈদগ্ধ্যে তিনি মুগ্ধ হইয়া অবিচারে তাঁহাকেই মিতা বলিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তি প্রভুতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরিণামে ইষ্টে পৌছিয়াছিল।

রুক্মিণী চিত্রটি নাটককার বড়ই মধুরভাবে আঁকিয়াছেন। কৃষ্ণার্পিত প্রাণের পৃথক্ অস্তিত্ব রুক্মিণীতে পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্র চরিত্রটি লিপি-চাতুর্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কুরু-পাণ্ডব চরিত্রগুলির আলোচনা পৃথক পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

সংগীতবিভাগে অপ্সরাগণের সংগীতে নাটককার নূতনত্ব আনিয়াছেন উহার ভাষায় ও ভাবে। শক্তিসংগীতগুলি ও কৃষ্ণবিষয়ক গানগুলির মধ্যে নূতন সাড়া পাওয়া গিয়াছে। এই দৃশ্যকাব্যখানি গীতাভিনয়ের পালায় রূপান্তরিত হইয়া বাঙ্গালীর নগরে ও গ্রামে বহু আনন্দ বিতরণ করিয়া গিয়াছে। এখানি রোমান্টিক শ্রেণীর মেলোড্রামার পদবাচ্য হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের দৃশ্যকাব্যে কুরু-পাণ্ডব চরিত্র

মহাভারত নায়কবহুল শ্রব্য কাব্য, রামায়ণের ন্যায় একনায়কত্ব ইহার নাই। গিরিশচন্দ্র মহাভারত হইতে ধারাবাহিক ঘটনাবলি লইয়া তাঁহার নাটকগুলি রচনা করেন নাই। তাঁহার বিক্ষিপ্ত রচনাবলি হইতে মহাভারতীয় চরিত্রনিচয়ের মধ্যে কাহার কি রূপ তিনি দিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের আলোচ্যের বিষয়। কুরুপ্রধান ও পাণ্ডবরাই মহাভারতের কেন্দ্রগত চরিত্র। নাটককারের হাতে ঐগুলির কিরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে, নিম্নলিখিত আলোচনায় তাহা প্রকাশিত হইবে।

দ্রোণাচার্য

গিরিশচন্দ্রের দ্রোণ 'যথা ধর্ম, তথা জয়' এই ধারণা লইয়া কৌরব পক্ষে ও পাণ্ডব বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা—"সকলি হইবে ক্ষয়, একমাত্র রহিবে পাণ্ডব,' কিন্তু এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াও তিনি তাঁহার প্রতিপালক দুর্যোধনের হিতৈষী ও রক্ষক ছিলেন। যখন প্রতিকূল ঘটনা-স্রোত আর নিবারণ করিতে পারিলেন না, তখন—

"জন্মিয়া ব্রাহ্মণকুলে, কুক্ষণে হইনু অস্ত্রধারী।
যাগ-যজ্ঞ-মঙ্গলকামনা-রত দ্বিজ,
জীবক্ষয় বাসনা আমার!

যেই কর তুলিয়া উল্লাসে, আশীর্বাদ করিছে ব্রাহ্মণ,
সেই করে করি নর-নাশ,
দ্বিজকুল-গ্লানি আমি !—"

বলিয়া তিনি আত্মগ্লানি করিয়াছেন। সপ্তরথী একত্রিত হইয়া অভিমন্যুকে একযোগে হত্যা করিবার অপরাধে গিরিশচন্দ্র দ্রোণকে দোষী করেন নাই। রণনীতির ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া যখন অভিমন্যুর বিনাশসাধনে দুর্যোধন কৃতসংকল্প হইলেন, তখন দ্রোণাচার্য সত্যপ্রকাশ করিয়াই বলিয়াছিলেন—'মহারাজ! এই পাপে মজিবে সকলি।' নিরস্ত্র অভিমন্যুকে রণশায়ী হইতে দেখিয়া দ্রোণ বলিয়াছিলেন—'কেন আর অস্ত্রের ঝঙ্কার? উড়িয়াছে কলঙ্ক-পতাকা, পড়েছে বালক রণে।' পরে দুঃশাসন-পুত্র দূষণ মুমূর্ষু অভিমন্যুর উপর গদাঘাত করিতে আসিলে দ্রোণাচার্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—'রহ-রহ দুঃশাসন-সুত, নাহি ভয়। অতল সলিলে ঝম্প দিয়াছে মৈনাক,—উঠিবে না পুত্র আর।'

গিরিশচন্দ্রের পূর্ববর্তী, সমকালীন বা পরবর্তী কোন-কোন নাট্যকার দ্রোণচরিত্রকে হীনভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। যিনি আচার্য পদে বৃত হইয়া কুরু-পাণ্ডবদের যুদ্ধনীতি ও অস্ত্রবিদ্যার শিক্ষক, তাঁহাকে উপজীব্য পুরাণের বিশিষ্ট নির্দেশ ব্যতীত হীনরূপে চিত্রিত করিবার অধিকার কোন নাট্যকারের থাকা উচিত হয় না। গিরিশচন্দ্র এই নীতির বশবর্তী হইয়া দ্রোণাচার্যের চরিত্রে মালিন্য আনেন নাই। পুরাণকার-সৃষ্ট চরিত্রে অঙ্গরাগ দিবার অধিকার নাট্যকারের তখনি থাকে যখনি পুরাণকার উহাকে উন্নত বা অবনত করিয়া দেখান, অন্যথায় নহে।

ভীষ্ম

অতি অল্প স্থানেই ভীষ্ম চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানী ভীষ্ম গিরিশচন্দ্রের হাতে বিমলিন হন নাই। কোন স্থানেই বীরত্বের আওতায় তাঁহার আভ্যন্তরীণ অপর গুণরাশি আবরিত হয় নাই। কুরুশ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠত্ব নাট্যকার সর্বত্র বজায় রাখিয়াছেন। ভীষ্ম চরিত্র লইয়া পৃথক নাটক তিনি কেন লিখিলেন না, আজ তাহা বলা কঠিন।

অন্যগুণ অপেক্ষা সহিষ্ণুতাগুণ গিরিশচন্দ্রের যুধিষ্ঠিরে অধিক ফুটিয়াছে। এ যুধিষ্ঠিরও সত্যবাদী। অজ্ঞাতবাসকালে বিরাট রাজার কাছে পরিচয় দিবার সময়ে যুধিষ্ঠির নিজেকে যুধিষ্ঠিরের সখা বলিয়াছিলেন। নীতি-শাস্ত্র বলে—'সম প্রাণো সখা মতঃ,' অর্থাৎ একপ্রাণ না হইলে সখা বলা যায় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ সত্য-অপলাপের চেষ্টা দেখাইলেও উক্ত নীতি অনুসারে তাহা দূষণীয় হয় না। যুধিষ্ঠিরের ধর্মসেবার বৈশিষ্ট্য ইষ্টকে মিত্রভাবে গ্রহণ করিয়া, অন্য ভাবে নহে, তাই 'আশ্রিত পালন' কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি ভীমসেনের যুক্তির বিরুদ্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন—'আশ্রিতপালন কর্তব্য নিশ্চয় মানি, কিন্তু তা'হতে কর্তব্য—কৃষ্ণচরণ-শরণ।' যুধিষ্ঠিরের চরিত্র-বিষয়ক মহাভারতীয় কূট প্রশ্নের কোন সমাধানই নাটককার করিতে পারেন নাই।

ভীমসেন

ভীমচরিত্র গিরিশচন্দ্রের লেখনীমুখে নূতন আলোকসম্পাতে সৃষ্ট হইয়াছে। যাত্রা ব গীতাভিনয়ের পালায় ভীমের যে ছবি ইতঃপূর্বে জন-সমাজ দেখিয়াছে তাহা গিরিশের ভীম চরিত্র

হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। গিরিশের ভীম কাণ্ডজ্ঞান হীন স্থূলবুদ্ধি-সম্পন্ন নহেন। অভিমন্যুর প্রাণ ভীম কর্তৃক রক্ষিত না হওয়ায় ভীমের আত্ম-গ্লানি এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল:—

"হে অর্জুন! ধরি দেহ প্রতিবিধিৎসার হেতু।
নহে, তীক্ষ্ণ খড়্গে ছেদি বাহুদ্বয় ফেলিতাম জ্বলন্ত অনলে,
ছুরিকায় ছেদি জিহ্বা দিতাম কুক্কুরে,
বীর গর্ব্ব না করিত কভু আর।"

অকৃতকার্যতায় ভীমের অভিমান-সূচক বাণী এখানে কি তীব্র! কীচক নিধন-কালে ভীমের সংযতরোষ এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে:—

"ধৈর্য্য ধর অধীর অন্তর।
রোষ-অগ্নি বাহিরিবে লোমকূপে—
মূর্চ্ছা যাবে লোকে
স্ফীত শিরা ললাটে হেরিবে,
উগ্রমূর্তি ক্ষুদ্র মৎস্য দেশে কে সহিবে?
নীরবে যামিনীর ঝিল্লীরবে—
মিলাইবে রোষপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস,
শিহরিবে ভুজঙ্গ গহ্বরে শুনি,
শৃগালের নাদে আর্ত্তনাদ মিশাইবে তার।
না করিব রুধির পাতন,
সে পাপ-রুধিরে—
অপবিত্র হবে ক্ষিতি!"

কীচকের মতো অল্পবীর্য শত্রু-হননের জন্য নাট্যকার ভীমের বৃথা বাহ্বাস্ফোট দেখান নাই—ইহাতে আছে সংযত বীর্যের মৃদু প্রকাশ-ধ্বনি।

'পাণ্ডবগৌরবের' ভীম ভক্ত, শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ়বিশ্বাসী ও জ্যেষ্ঠানুগামী। পুরাণকারের স্বাভাবিক সহানুভূতি অর্জুনের দিকে থাকিলেও নাট্যকারের সহানুভূতি কিন্তু ভীমের দিকে গিয়াছিল। দণ্ডীকে আশ্রয় দেওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের সখা-পদবাচ্য না থাকিয়া অরি হইয়া দাঁড়াইলেন। এ ঘটনায় ভীমের বিশ্বাস কিন্তু অন্যরূপ ছিল। ভীম তাই মাতাকে বলিতেছেন:—

"চিরদিন সহে না যন্ত্রণা করিয়াছ ধর্ম-উপাসনা,
পাণ্ডব-বান্ধব কৃষ্ণ তব পুণ্যবলে।
ঘটে যদি হরি সহ বাদ, ভেব না বিষাদ,
তথাপি পাণ্ডব-সখা হরি,
নহে ধর্ম্মে কেবা দেয় মতি?"

আশ্রিতরক্ষা-ধর্ম সম্বন্ধীয় বাদানুবাদকালে যুধিষ্ঠিরের মনে এইরূপ একটা সংশয় জন্মিয়াছিল যে, তাঁর নির্ধারিত ধর্মপথের বিরুদ্ধাচরণ করিলে পাছে তিনি বৈষ্ণবী মায়ায় পড়িয়া ধর্মভ্রষ্ট

হইয়া যান, তাই ভীমের কথায় তিনি ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। ভীম কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

"একমাত্র উপায় কেবল ভেদিতে বৈষ্ণবী মায়া—
শিখিয়াছে দাস দেব, তব উপদেশে।
স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ যার,
তার'পরে মায়ার নাহিক অধিকার!
রাজ-ধর্ম, ক্ষাত্র-ধর্ম, আশ্রিতরক্ষণ,
রণ-আকিঞ্চন ক্ষত্রিয়ের।
পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ইষ্টদেব-গুরু—
আবাহন যে করে সমরে প্রবোধিতে তাঁরে—
ক্ষত্ররীতি চির দিন।
ভীরু করে গুরু বলি সমরে সম্মান।"

দুর্য্যোধন বা দুঃশাসনের উপর ভীমের আক্রোশ ঈর্ষা প্রণোদিত নহে, দ্রৌপদীর প্রতি অবমাননার প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় উহা প্রভাবিত ছিল।

তুরঙ্গীর জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরোধে কুরুপক্ষের সাহায্য লইতে পাণ্ডবগৌরবের ভীম আন্তরিক ইচ্ছাসম্পন্ন ছিলেন না, তাই তিনি দ্বারকায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত দ্বৈরথ-সমর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ভীমের সে অভিলাষ পূর্ণ করেন নাই, ইহাতে ক্ষোভে ও অভিমানে কৃষ্ণ-চরণে তাঁহার দীর্ঘ-নিশ্বাস ঢালিয়া ভীম গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভীম অটল বিশ্বাসে একমাত্র কৃষ্ণচরণেই আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। রণজয়-আশায় অমৃতভৈরব ও অম্বিকাদেবীর পূজা করিতে ভীম ভিন্ন পাণ্ডব-পক্ষীয়েরা সকলেই গিয়াছিলেন। কুন্তীদেবী ভীমের এবংবিধ আচরণের প্রতিবাদ করিলে ভীম বলিয়াছিলেন :—

"পীতাম্বরে পূজি দিবানিশি,
দিগম্বর পান সেই পূজা,
হর-হরি এক আত্মা
নাহি তার ভেদ।
মম মনে নাহি মাতা দ্বিধা,
দ্বিধা না করিব হরি-হর।"

আকস্মিক বিপদে বাঞ্ছাকল্পতরু হরির নিকট হইতে বর-প্রার্থনা করিবার জন্য কুন্তী ভীমকে উপদেশ দিতে আসিলে ভীমের উত্তর এইরূপ হইয়াছিল :—

"আর্ত্ত যেই—সেই করে বরের প্রার্থনা,
ডাকে বিপদ-ভঞ্জনে বিপদে হইতে পার।
কিন্তু মহা সম্পদ আমার,
আমি বর কি হেতু মাগিব?"

ভীমের ভক্তচিত্র গিরিশচন্দ্র নিখুঁত তুলিকায় আঁকিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রের অর্জুনও কৃষ্ণচরণে সমর্পিতপ্রাণ। এ অর্জুন নিজ বীর্যকে কৃষ্ণের কৃপা ভিন্ন অন্য কিছু মনে করিতেন না। অভিমন্যুর মৃত্যুজনিত শোকে শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিলে পর অর্জুন বলিয়াছিলেন :—

"পরশ-পরশে লৌহ কাঞ্চন-মূরতি,
ধরে তরু চন্দন সৌরভ মলয়ের সহবাসে,
দেখি পারি যদি, হে আদর্শ নরদেহধারি !
অনুগামী হইতে তোমার !"

এত বড় দুঃখে এরূপ ধৈর্য অর্জুনেই সম্ভব হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের অর্জুন প্রতিহিংসাবশে জ্ঞাতিক্ষয়ে ইচ্ছুক ছিলেন না, তাই বিরাটরাজের গোধন-রক্ষাকালে বলিয়াছিলেন—'পরকার্যে করিলাম বহু জ্ঞাতিক্ষয়, কি কহিবে ধর্মরাজ মোরে।" রণক্ষেত্রে শত্রুরূপী গুরুজনের সম্মান অর্জুন সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেন। বিরাটরাজার গোধন-রক্ষা-ব্যাপারে কৌরবেরা পরাজিত হইলে পর বিরাট-তনয় উত্তর ভগিনীর খেলিবার বস্ত্রের জন্য রণশায়ী বীরবৃন্দের বিচিত্রবর্ণ উষ্ণীষ-সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়াছিল। অর্জুন তখন তাহাকে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্যের বস্ত্র গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অর্জুন ক্ষত্রিয়ের রণনীতি অনুসারে নিরস্ত্র প্রবীরের অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করেন নাই, তাঁহার অস্ত্রাগারের দ্বার খুলিয়া অভিমত রণবেশে সজ্জিত হইবার সুযোগ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। বীরের প্রতি বীরের সম্মানজ্ঞান গিরিশচন্দ্র লিখিত অর্জুন চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

নকুল, সহদেব ও দুর্যোধন-চরিত্রে গিরিশচন্দ্র কোন নূতন আলোকপাত করেন নাই।

কর্ণ

'বৃষকেতু' দৃশ্যকাব্যে নাটককার কর্ণকে প্রসিদ্ধ দাতারূপে চিত্রিত করিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে নিজ সন্তানকে নিজহস্তে বলি দিয়া ব্রাহ্মণরূপ ছদ্মবেশী নারায়ণকে ঐ দম্পতী ভোগ দিয়াছিলেন। দানশীলতা ও বীর্যবত্তা ব্যতীত কর্ণ চরিত্রের অপরগুণ নাটককার দেখান নাই। কর্ণ কুরুপক্ষীয় বীরগণের অগ্রণী হইয়াও অর্জুনের ঈর্ষা করিতেন। পাণ্ডবাগ্রজ চরিত্রের অন্যবিধ মহত্বপূর্ণ ঘটনাবলি লইয়া গিরিশচন্দ্র কেন পৃথক নাটক রচনা করেন নাই, আজ তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন প্রয়োজনহীন।

শ্রীকৃষ্ণ

মহাভারতের মধ্যমণি ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ। ধরার ভার লাঘবের জন্য কুরুক্ষেত্র মহাসমরে দুরন্ত পাপাচারী ক্ষত্রিয়কুলের নাশসাধন শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পনা ছিল। অত্যাচারী শাসকসম্প্রদায়ের বিলোপ-সাধন করিয়া অত্যাচারিত দীনের উদ্ধারকল্পে শ্রীকৃষ্ণের মহাভারতীয় যাবৎ চেষ্টা দেখা গিয়াছিল। এ বিষয়ে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকের শ্রীকৃষ্ণের বাণী 'সীতাহরণ' নাটকের বালীবধকালীন রামের বাণীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, যেন এক কথারই প্রতিধ্বনি বলা চলে। গিরিশচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণচরিত্র গীতার—'যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদা তদা সৃজাম্যহম্।'—এই তত্ত্বের

উপর ভিত্তি করিয়া সৃষ্ট হইয়াছিল, তাই জনার শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন :—"ধরিয়াছি নরদেহ ধরার রোদনে না করিলে মমতা বর্জন, ধর্মরাজ্য ভারতে না হইবে স্থাপন।" শ্রীকৃষ্ণ যে লীলাময়, নাটককার তাহা বিশিষ্ট প্রমাণ পাণ্ডবদ্বারা দণ্ডীরাজরূপ আশ্রিতরক্ষার ব্যাপারে দেখাইয়া গিয়াছেন। উর্বশী শাপোদ্ধার ও ত্রিভুবনে পাণ্ডবদের গৌরববৃদ্ধি—এই উদ্দেশ্যদ্বয় ঐ আশ্রিতরক্ষা-ধর্মের অন্তরালে লুকায়িত ছিল। সাত্যকি প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের লীলাসহচরেরা ঐ গুহ্য উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ না বুঝিলেও শ্রীকৃষ্ণের আঙ্গিক লক্ষণদ্বারা কিছু-কিছু বুঝিয়াছিলেন, তাই সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'হে ভুবনপাবন, রোষের লক্ষণ নাই বদনে তোমার! যেন উল্লাসে—শ্রীমুখ সুপ্রকাশ—কহমাত্র রোষ-ভাষ!' ভক্তের জন্য ইষ্টের বেদনা কিরূপ তীব্র হইয়া থাকে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের এই দিকটাই নাটককার দেখাইয়া গিয়াছেন।

সুভদ্রা

দেব-দ্বিজে ভক্তিমতী রূপে চিত্রিতা। সুভদ্রার বীরাঙ্গনার আদর্শ নাট্যকার এইরূপে দেখাইয়াছেন :—

"পতি-পুত্র যায় রণে,
বীরাঙ্গনা সাজায় সমর-সাজে,
ঘোর রণভূমে ভ্রমে বীরকুল-নারী,
সারথী হইয়ে রথে,
কাটে বেণী বিনাইতে গুণ,
বাঁধায়ে সন্তানে—
খুলে দেয় আভরণ রণব্যয় হেতু। * *
যবে যুদ্ধকার্য্যে রত বীরভাগ,
বীরপত্নী ব্যস্ত রহে দেব আরাধনে। * *
মমতা ছেদিতে শিখে
মা-ক্ষত্রিয়-সুতা ভূমিষ্ঠ হইয়ে।"

সুভদ্রা বীর রমণীর মতো তাঁহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু-সংবাদকে দৈব-বিড়ম্বনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এত বড় আত্মত্যাগ জগতে বিরল। কৃষ্ণগতপ্রাণ পাণ্ডবদের মতো সুভদ্রাও কৃষ্ণচরণে সমর্পিতপ্রাণা। 'পাণ্ডবগৌরব' নাটকের সুভদ্রা শরণাগত রক্ষারূপ ধর্ম-পালনের জন্য তুরঙ্গীসহ দণ্ডীকে আশ্রয় দিবার কালে এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

"শুন নৃপমণি বীরাঙ্গনা বিপদ না জানে।
অহেতু যদ্যপি বাদী হন চক্রপাণি,
তাঁরে আমি তিল নাহি গণি,
আশ্রিত-পালন ধর্ম মম। * *
পাণ্ডুবংশ-নারী,
পরিহরি যাই যদি তোমারে ভূপাল,—

কুলে দিব কলঙ্কের কালি। হবে অধর্ম্ম সঞ্চার,
কৃষ্ণ সখা না রহিবে আর,
পাণ্ডুবংশ ছারখারে যাবে।"

কুরু-পাণ্ডবের সমরনেতা ভীষ্মকে পাণ্ডব-কুল-লক্ষ্মী সুভদ্রা বুঝাইলেন যে, দণ্ডী-উর্বশীর বিবাদের ফলে যদি দণ্ডী-পরিত্যক্তা অশ্বিনী আশ্রয় ভিক্ষা করে এবং তাহাকে আশ্রয়দিবার জন্য সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে ভারতবংশ তাহার প্রতিবিধান করিতে সম্পূর্ণ বীর্যবান্। সুতরাং কৃষ্ণকে অশ্বিনী প্রত্যর্পণের কথা রণজয়ের পর নির্ণীত হইতে পারে, তৎপূর্বে নহে। গিরিশচন্দ্রের সুভদ্রার চরিতাদর্শ পরবর্তীকালের বহুকবির উপজীব্য হইয়াছে।

দ্রৌপদী

কেশপাশের বন্ধন দ্রৌপদী করিতেন না। দুঃশাসন তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া অপমানিত করিবার পর, সেই অপমানের প্রতিশোধ না দেওয়া পর্যন্ত দ্রৌপদী বেণীবন্ধন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। নাটককার দ্রৌপদী চরিত্রের দৃঢ়তা দেখাইয়া গিয়াছেন। সংযম-অভ্যাসের অভাব তাঁহার ছিল না। অজ্ঞাতবাস কালে বিরাট নগরে চীরবাস, ভূমিশয্যা তাঁহার নিত্য অবলম্বনীয় ছিল। সেখানে কীচকদ্বারা তাঁহার অবমাননাকে তিনি এইরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন :—

"অপমান জয়দ্রথ-ছলে, তিল না গণিনু,
আঁখিবারি অঞ্চলে মুছিনু,
চলিলাম সিংহিনী সমান—
মৃগরাজ পাছে পাছে! কিন্তু,
ভেকে কভু স্পর্শেনি ফণিনী।"

দ্রৌপদীর এইরূপ সংহত-বীর্যের তাপ নিতান্ত কম নহে! কৃষ্ণের সখী দ্রৌপদীর প্রাণও কৃষ্ণময় ছিল, নাট্যকার এ ভাবের বিপর্যয় ঘটান নাই। অপমান-লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী পাণ্ডবের প্রতি—বিশেষতঃ ভীমের প্রতি অভিমানিনী ছিলেন, পাছে তাঁহার অবমাননার প্রতিশোধ না লওয়া হয়—এইজন্য।

নাট্যকার পাণ্ডব প্রভৃতির চরিত্র কোথাও ক্ষুণ্ণ করেন নাই, বরং বর্ণ-বিন্যাস দ্বারা আরও উজ্জ্বল করিয়াছেন।

পৌরাণিক নাটকের বিদূষক-চরিত্র

নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের হস্ত-প্রয়োগের পূর্বে কি সংস্কৃত নাটকে, কি বাঙ্গালা নাটকে বিদূষক চরিত্রের অভাব ছিল না। রাজবয়স্য হিসাবে ভাঁড়ামি ও ঔদরিকতার পরিচয়-দেওয়া ছাড়া আর কোন নূতনত্বের আস্বাদন তাহাতে পাওয়া যায় নাই। গিরিশচন্দ্রই বিদূষকের নূতনরূপ দিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের পূর্বগামী নাটককার দীনবন্ধু তাঁহার নবীন তপস্বিনীর 'মাধব' চরিত্রে বিদূষকের নূতন অঙ্গরাগ দেখাইলেও গিরিশচন্দ্রের মতো কৃতকার্যতা তিনি লাভ করিতে পারেন নাই।

'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকের 'পাগ্‌লা ব্রাহ্মণ' ভূমিকাটি ভবিষ্যৎ বিদূষক চরিত্রের অগ্রদূত হইয়া দেখা দিয়াছিল। মূল আখ্যায়িকার সহিত সম্পর্কহীন বলিয়া উহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

'ধ্রুবচরিত্র' নাট্যক্ষেত্রের মধ্যে বিদূষকের পদ-চি সর্ব প্রথম স্থাপিত হইল। রহস্য ও ব্যঙ্গের

ভিতর দিয়া সত্যকথন-শীলতা এই রাজ-বয়স্যের বৈশিষ্ট্য। রাজা ও রাজপরিবারের প্রতি বিদূষক মাত্রেরই স্বাভাবিক টান তাহার চরিত্রগত ধর্ম। ধ্রুব চরিত্রের বিদূষকেরও তাহা ছিল, তবে সে যেন একটু বেশী মাত্রায় দরদী।

'নলদময়ন্তীর' বিদূষকের কার্য আরও ব্যাপক ছিল। এ বিদূষকের মনের ভয়ও তাহার অন্তঃকরণের মতো সরল। বনের ভিতর পদ্মকোরক হইতে অকস্মাৎ দেববালার আবির্ভাব ও তিরোভাব যদিও দেবমায়া-দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল, তথাপি উহাকে বিদূষক রাক্ষসীর মায়া বিবেচনা করিয়া ভয় পাইয়াছিল। দময়ন্তীর করপ্রার্থী দেবতাদের মধ্যে যমরাজকে দেখিয়া বিদূষকের ভয় শিশুর মতোই উপহাসাস্পদ হইয়াছিল। নূতনত্বের মধ্যে এই বিদূষককে নাট্যকার লোকচরিত্রজ্ঞ করিয়াছেন, তাই সে অনায়াসে পুষ্করকে বলিয়াছিল:—"মহাশয়! * * জেনে-শুনেই হাসেন না, হাস্‌লে বুঝি সৃষ্টি থাকে না?" এ বিদূষকের রাজপ্রীতি যেরূপ গভীর, পত্নীপ্রেমও ততোধিক বিশাল ছিল। এ বিদূষক স্পষ্টবাদী। পুষ্কর বিদূষককে কারাগারে বন্দী করিতে চাহিলে সে মনুষ্যত্ব-হীন প্রাচীনকালের বিদূষকের মতো ভীত হয় নাই, নৈতিক সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সে পুষ্করকে বলিতে পারিয়াছিল:—"মহারাজ! যদি কষ্ট দিতে চান—তবে, আপনার রাজ্যেই আটক রাখুন। যে রকম চুটিয়ে রাজ্য আরম্ভ করেছেন—যমরাজা এসে সলা লয়ে যাবে। হয় ত নরক থেকে তুলে পাপীগুলোকে হেথা ছেড়ে দে যাবে। শুনেছি ইন্দ্রেতে-শচীতে বাজি হ'য়েছে—যম বড় কি পুষ্কর বড়!" এই বিদূষক নল দময়ন্তীর অন্বেষণকাতর হইয়া বহুস্থান ভ্রমণের পর চেদীরাজ্যে উপনীত হইয়া বলিয়াছিল:—"* * আবার এর নাম শুন্‌ছি চেদী। রাজবাড়ী কি সাধে দেখে যাই? পাঁকে ব্যাঙ্‌ থাকে, হোমা-পাখী গিরিশৃঙ্গেই বসে।" বিদূষকের এ মন্তব্যে দরদ ও গুপ্তচর-গিরির অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাও নূতনত্বের একটা দিক।

'জনার' বিদূষক নাটককারের অপূর্ব সৃষ্টি। এ বিদূষকের ভাষা ভাবের তরঙ্গে নৃত্য করে, অথচ সতেজ ও তীক্ষ্ণ। প্রাণ-মন তাহার কৃষ্ণচরণে সমর্পিত, কিন্তু অন্যের অগোচরে গোপনে,—বিশ্বাস তাহার অকুরন্ত, তাই অগ্নিদেবকে সে বলিয়াছে—"ওই যে তোমার ঠেলায় প'ড়ে বিশবার 'হরি-হরি' বল্লুম, একবার নাম কল্লে তরে যায়!" গুপ্ত-সাধক বলিয়া ইষ্টদেবের উদ্দেশে ব্যাজ-স্তুতি সে ব্যবহার করিয়া থাকে। এই বিদূষকের বিশ্বাস-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বৃষকেতুকে ঐ নাটকের মধ্যে এক স্থানে এইরূপ বলিয়াছেন—

> "বিশ্বাস তাঁহার—
> জীবনে বারেক যেই স্মরে মম নাম,
> পুলকে গোলোকধামে অন্তে পায় স্থান।"

নীলধ্বজের রাজত্বে দেবতারা বিভিন্ন প্রকারে পূজিত হওয়া সত্ত্বেও আজ নীলধ্বজ অবস্থার ফেরে বিকল। জনা পুত্রশোকে উন্মাদিনী, পুত্রবধূ মদনমঞ্জরী সহমৃতা, বংশের দুলাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর প্রবীর ছলে মুগ্ধ হইয়া যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। রাজত্বের এই প্রকার বাস্তব পরিণতি দেখিয়া বীরভক্ত বিদূষকের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। তাহার ধারণা এইরূপ জন্মিল যে, পারলৌকিক শুভের নিয়ন্তা যিনি, ঐহিক শুভ তিনি নিয়ন্ত্রিত করিবেন না কেন? এই যুক্তিবলে বিদূষক ব্রাহ্মণীকে বলিতেছে:—"* * দু কাঁড়ী নোড়ানুড়ী সহর জুড়ে ছিলেন, বরাবর পূজো খেয়ে এলেন, আর কাজের বেলা কেউ

নয়? আচ্ছা, থাকুন দিঘীর জলে ঠাণ্ডা হয়ে। * * যেমন নরবংশ নাশ ক'চ্ছ, তোমার কুভীর বংশ নাশ করবে আমি ছাড়বো না। যেখানে যা পাব হাতাব, আর দিঘী-সই করবো। তোমার কুভীর ঝাড়কে গেড়ে তার পর রাজবাড়ীতে যাচ্ছি; এরা ডাঙ্গায় থাক্‌তে রাজার বড় ভাল বুঝি না!" কি বীর-বিশ্বাসীর উক্তি!

দৃঢ়-বিশ্বাসী বিদূষক কৃষ্ণনামের মহিমা জানে, তাই একস্থানে ব্রাহ্মণীকে সে বলিয়াছে—"আরে মাগী, এই যে রাজবাড়ীতে হাহাকার উঠে গেল দেখ্‌লি নে? নামের গুণে ঐ টুকু, এবার স্বয়ং উদয়। (বস্ত্র দিয়া চক্ষু বন্ধন)", চক্ষুবন্ধ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিদূষক ব্রাহ্মণীকে বলিয়াছিল:—"খুসী, তোর কি? (দূরে হরিধ্বনি শুনিয়া) ওরে বাপ্‌রে ঐ ঐরাবত-ধ্বনি উঠেছে, এ কি কাণে আঙ্গুলে সানে?" ভক্ত-বিশ্বাসী বিদূষক নিজ বিশ্বাসে অবিচলিত থাকিয়াই ব্রাহ্মণীকে বলিতেছে:—"আরে, রেখে দে তোর জপ, ও নামের ঠেলা জানিস্ নে।" ব্রাহ্মণী নিজ চত্বর মধ্যস্থ শুষ্কবৃক্ষকে সহসা মঞ্জুরিত হইতে দেখিয়া বিদূষককে তাহা চক্ষু খুলিয়া দেখিতে বলিলেন। বিদূষক চক্ষুর বস্ত্র অপসারিত না করিয়া বলিয়াছিল—"ঐ যে মধুর রব এখানে অবধি আস্‌ছে, গাছ ত গাছ, গাছের বাবাকে গজাতে হবে না?"

বিদূষকের দৃঢ় বিশ্বাসের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তাহার সম্মুখীন হইয়াছেন। এখানকার সংলাপটি বড়ই মধুর। বিচ্ছিন্নভাবে প্রদর্শিত হইলে রসভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা আছে, তাই সমস্তটি উদ্ধৃত হইল। রসিক পাঠক একান্তে বসিয়া রস উপভোগ করুন:—"শ্রীকৃষ্ণ—'আচ্ছা ঠাকুর, যদি হরি এসে তোমার সাম্‌নে দাঁড়ায়, তা' হ'লে তুমি কি কর?' বিদূষক—'গুটি-গুটি গে রথে চড়ি, আর কি করি?' শ্রীকৃষ্ণ—'আর হরি যদি এসে থাকে?' বিদূ—'কই—কোন্ দিকে? বাম্‌নী, চোখে কাপড দে, চোখে কাপড় দে।' শ্রীকৃষ্ণ—'ব্রাহ্মণ, সত্যই আমি একবার ডাক্‌লে থাক্‌তে পারি না।' বিদূ—'তবে এসেছ?' ব্রাহ্মণী—'না গো না, ও একজন বুড়ো বামুন।' বিদূ—'হাঁ, আমি বুঝে নিয়েছি; বাম্‌নী বুঝিস্ নে ও কখন্ বুড়ো, কখন্ ছোঁড়া, তার কিছু ঠিকানা নেই।' শ্রীকৃষ্ণ—'ব্রাহ্মণ, তুমি আমায় ভয় কর কেন?' বিদূ—'যখন এসে দাঁড়িয়েছ, সে সব ত চুকে গিয়েছে। কিন্তু সাফ্ বল্‌ছি, রথায় নিয়ে যাও, তুমি যে চাবুক হাতে ক'রে, কি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধ'রে এসে সাম্‌নে দাঁড়াবে, আমি তাতে চোখ্ খুল্‌ছি নি। যদি দেখা দেবে, বাঁশী ধ'রে তোমার রাধিকাকে ডেকে সাম্‌নে দাঁড়াবে, আমি চোখের কাপড় খুল্‌ছি' শ্রীকৃষ্ণ—'ঠাকুর, আমি ব্রজ ছাড়া অনেক দিন, সেরূপ কি করে ধর্‌বো?' বিদূ—'চেপে যাও না, যে না জানে তার কাছে ভিরকুটি ক'রো। পাণ্ডবেরও ঘোড়া হাঁকাও, আর রাধার কুঞ্জে গিয়ে শোও, এ আমি পাকা জানি। তা না হ'লে বেদ মিথ্যা হবে। ভাব্‌ছ বুঝি বোকা বামুন খবর রাখে না? খবর না রাখলে তোমায় অত ভয় কর্ত্তেম না।' শ্রীকৃষ্ণ—'দ্বিজোত্তম, তোমার অসীম ভক্তি, দেখ তোমার পাদস্পর্শে আমার অশ্বত্থদেহ পল্লবিত হয়েছে, তুমি ধন্য, তোমার বিশ্বাস ধন্য।' বিদূ—'ধন্য-ধন্যই তো কচ্ছ, যা বল্‌লুম তা কর না, তা' নইলে আমি চোখ খুল্‌ছি নি কালাচাঁদ! ঐ যে বুড়ো থুথ্‌ড়ে বৃষকেতু খেগো রূপে এসে দেখা দেবে, তাতে আমি রাজী নই। মুরলী-ধর হও তো হও, নইলে সোজা পথ আছে, চলে যাও! আর চতুর্ভুজ কর, তার আর চারা কি, কিন্তু চোখের কাপড় আমি খুল্‌ছিনে।"

শ্রীকৃষ্ণ বিদূষকের নির্বন্ধাতিশয়ে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন, বিদূষক আনন্দে অধীর হইয়া চোখের বাঁধন খুলিয়া বলিল :—"ওরে বামনি দেখ্ দেখ্ দেখ্, এখন গোলোকেই যাই আর বৈকুণ্ঠেই যাই, আর দুঃখ নাই।"

গিরিশচন্দ্রের বিদূষক চরিত্রের সম্পূর্ণ কারি-গরি এখানে উদ্‌ঘাটিত হইল। ধীরভক্তবিশ্বাসীর এরূপ নিখুঁত ছবি বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে আর নাই। গিরিশচন্দ্র এ বিভাগে মৌলিকতার দাবী করিতে পারেন।

কমলেকামিনী নাটক

গিরিশচন্দ্রের কমলেকামিনীর গল্পাংশ মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ-চণ্ডী হইতে সংগৃহীত। এখানিকে উপপুরাণ বলা যায়। অতি প্রাচীন বঙ্গসমাজের একটি চিত্র জনশ্রুতি মণ্ডিত হইয়া কিরূপে চণ্ডী-মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছিল, তাহাই এই নাটকের আখ্যানবস্তু। নারদ, বিশ্বকর্মা, দারুব্রহ্মা, হনুমান, চণ্ডী, পদ্মা, প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্রের সহিত ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগর, শালিবাহন, লহনা, খুল্লনা প্রভৃতি সামাজিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের সংমিশ্রণে এই অদ্ভুত দৃশ্যকাব্যখানি গঠিত হইয়াছে। তজ্জন্য ইহাকে পৌরাণিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা গেল। এখানি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ তদানীন্তন স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

বিভিন্ন নরচিত্ররূপ (different types of man) প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে এই নাটকের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তজ্জন্য নাট্যক্রিয়ার গতি (action) স্থানে-স্থানে মন্থর হইয়া ঔৎসুক্যের ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। পূর্বগামী নাটককার দীনবন্ধুর দোষ গিরিশচন্দ্রের এ নাটকের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছিল। গুরুমহাশয়, দুর্বলা, লহনা, কারিগর, মাঝিগণ (যায় তাহাদের বহুবিখ্যাত সংগীত 'ঈশান কোণে ম্যাঘ উঠ্যাছে, কত্তিছে গোঁ-গোঁ—ওরে ডিঙ্গা বেঁধে থো) প্রভৃতি ভিন্ন-ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট মানুষ ও তাহাদের সংলাপগুলি বেশ ফুটিয়াছে; কিন্তু খুল্লনা, শ্রীমন্ত প্রভৃতি প্রধান চরিত্রগুলির চিন্তাধারার মধ্যে বৈচিত্র্য না থাকায় উহাদের উক্তি একঘেয়ে হইয়াছে। স্থানে-স্থানে গানের উপর গান, স্তবের উপর স্তব সন্নিবিষ্ট হওয়ায় নাট্যক্রিয়ার গতি স্বচ্ছন্দগতিশীল না থাকায় ইহা যেন নাটক হইতে যাত্রাগান বা গীতাভিনয়ের পালায় রূপান্তরিত হইয়াছে। শ্রীমন্তের 'চরম সময় হও মা উদয়, দেখে মরি তারা শ্রীপদনলিনী' গানখানি বহু বিখ্যাত, আজ প্রায় ৬০।৬২ বৎসর কাটিয়া যাইলেও ইহার লোক-প্রসিদ্ধি একটুকুও কমে নাই।

কমলেকামিনীর সঙ্গে-সঙ্গেই গিরিশচন্দ্রের দৃশ্যকাব্যের পৌরাণিক বিভাগের আলোচনা শেষ হইল।

পৌরাণিক দৃশ্যকাব্যের নাটকত্ব

পাশ্চাত্ত্য নাটক-বিজ্ঞানের তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া অনেকে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলিকে স্পষ্টত যাত্রার পালা না বলিলেও যাত্রালক্ষণাক্রান্ত এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে তাঁহার নাটকে 'ভক্তিরসের প্রাবল্য' 'অলৌকিক অপ্রাকৃত ব্যাপারের অবাধ সমাবেশ', 'নাটকের চরিত্রগুলির কোন স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা ফুটিয়া উঠে নাই এবং তাহাদের ক্রিয়াকর্ম নিরন্তর কোনো ধর্মভাব বা দেবমাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার জন্য গড়িয়া উঠিয়াছে।'

দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষই নাটকের প্রাণ তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে, কিন্তু তাহার প্রকাশক্ষেত্র সর্বত্র ঠিক একরূপ হয় না। পৌরাণিক নায়ক-নায়িকার কর্মজীবনের ধারা ও পরিণতি যাহা পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে তাহার ব্যতিক্রম করিবার সাধ্য হিন্দু ধর্মবিশ্বাসী নাটককারের থাকে না, কারণ আজও পুরাণ-শাসিত ধর্ম এই দেশে চলিতেছে। শহরের কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া বাঙ্গালা দেশের জনসাধারণ পল্লীগ্রামবাসী ও অর্ধ শিক্ষিত। পুরাণবর্ণিত কৃষ্ণ, রাম, শিব, বিষ্ণু, কালী, দুর্গা, তারা তাঁহাদের ইষ্ট দেবদেবী। প্রচলিত আখ্যায়িকার বিপর্যয় ঘটাইলে লোকের ধর্মহানির আশঙ্কা আছে, তাই গিরিশচন্দ্রকে নাটকীয় চরিত্র সৃজন ব্যাপারে বিশেষ সংযত হইতে হইয়াছিল। দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি বিষয়ে তিনি কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন তাহার বিচার তাঁহার প্রত্যেক নাটকের পৃথক আলোচনা প্রসঙ্গে করা হইয়াছে।

পৌরাণিক নাটকের আরম্ভ, অগ্রগতি ও পরিণতি পুরাণজ্ঞ পাঠক ও ক মাত্রেই জানেন বলিয়া ঘটনা সংস্থাপনের নূতনত্ব আর কোথা হইতে আসিবে? পুরাণ-চিহ্নিত চরিত্রই ঐ ঘটনাবলীর ঘটক। ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা তাহা নাটকীয় হইয়াছে কিনা তাহা দেখাই উহার নাটকত্বের বিচার।

অলংকার শাস্ত্রোক্ত নয়টি রস, যথা—আদি, হাস্য, করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও শান্ত এবং তাহার সহিত বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত এই কয়টি যথা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও আদিরসের অন্তর্গত মধুর রস লইয়াই মানুষের যত কারবার। নাটকের মধ্যে এই রসের কোনো কোনোটির পরিপাক থাকে! 'ভক্তি' চিত্তেরই একটা বৃত্তি (faculty of mind)। নাটকীয় পাত্র-পাত্রীরা ঐ বৃত্তির খেলা দেখাইলেই 'ভক্তিরসের' প্রাবল্যে তাহারা অপাংক্তেয় হইবে কেন? সেই খেলাটি ঐ নায়ক-নায়িকার প্রকৃতির অনুকূল বা প্রতিকূল হইয়াছে কি না সমালোচকেরা তাহাই দেখিবেন। পৌরাণিক জগতে দেবতা ও মানুষের অবাধ সংমিশ্রণ ছিল। নাটকীয় চরিত্রগুলির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা তাঁহাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া হয় সাফল্য, না হয় অসাফল্য লাভ করিয়া থাকে। গৌণভাবে যদি ধর্মভাব বা দেবমাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়া যায়, তাহাতেই বা বিরক্তির কারণ হইবে কেন? নিম্নস্তরের যৌনতত্ত্ব প্রচারের বেলায় কি উক্তরূপ প্রচার বাঞ্ছনীয় হয় না?

নাটক-দর্শনের ফল আনন্দ লাভ। সেই আনন্দ অধিকারীভেদে ভিন্নরূপ ধারণ করে। এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের উচ্চভাবমূলক নাটকের আলোচনাকালে আরও কিছু বলা হইবে। পাশ্চাত্ত্য Mystery জাতীয় নাটক দেশ ও জাতিভেদে নানা আকারে দেখা দিয়াছে এবং জাতির সংস্কৃতি ধরিয়াই তাহা গড়িয়া উঠিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে যেগুলি বিষাদান্ত তাহার অন্তর্গত দুই একখানি নাটকে নাটক শেষ হইবার পর তিনি ক্রোড়াঙ্ক সন্নিবেশ করিয়াছেন। ঐ ক্রোড়াঙ্কের বিষয় পাঠক বা দর্শক সাধারণের জন্য নহে, তাই 'ক্রোড়াঙ্ক'রূপ এক বন্ধনীর বেষ্টনে উহাকে দেখাইয়াছেন। মর জগতের ক্রিয়াকলাপে দেবচরিত্রের বিচ্ছেদ ঘটিলেও অমরত্ব-নিবন্ধন তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত মিলন নিত্যধামে হইয়া থাকে। নাটকের দর্শক ও পাঠকদের মধ্যে যাহাদের মন দ্বিধাবিভক্ত 'প্রাণময় কোষে'র উপরি কোঠায় উঠিয়াছে তাঁহারাই উহা বুঝিতে সক্ষম।

উচ্চভাব-মুলক বিভাগ

গিরিশচন্দ্র এইবার যে বিভাগে হস্তক্ষেপ করিলেন তাহাতে তাঁহার অনন্তসাধারণ প্রতিভা বহুমুখী হইয়া দেখা দিয়াছে। জীববিজ্ঞানে (Biology) প্রমাণিত হইয়াছে যে কর্মমাত্রেই ভাবজ এবং যে কর্ম যত উৎকট তাহার পশ্চাতে তৎপ্রণোদিত ভাবরাজিও ততোধিক উৎকটভাবে দেখা দেয়। নাটককার এই তত্ত্বভিত্তির উপর তাঁহার এই বিভাগীয় নাটকগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আধ্যাত্মিক বিচারে মানুষের আত্মা পঞ্চকোষিক। আত্মার অন্নময় কোষ—এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড, প্রাণময় কোষ—সৃষ্টিস্থিতিক্রিয়া শক্তি, মনোময় কোষ—বহুভাবে ব্যক্ত হইবার সংকল্প, বিজ্ঞানময় কোষ—যে জ্ঞানে এই বহুত্ব সংকল্প ধৃত হইয়া আছে, আনন্দময় কোষ—যে স্থলে আত্মার স্বরূপ কেবলানন্দময়। মানুষের মন এই পঞ্চকোষে বিচরণ করে। বিজ্ঞানময় কোষকে দেবলো॰ বলা হইয়া থাকে, এখানে আত্মবোধ উপসংহৃত হইলে চৈতন্যময় ব্রহ্মসত্তার দর্শন হইয়া থাকে। ভূলোক—অন্নময় কোষ বা স্থূল দেহ; প্রাণময় কোষ তাহারই সন্ধিস্থল, উহা উর্ধ্বাধক্রমে দুইভাগে বিভক্ত। উর্ধ্ব দিকস্থ অংশ, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষগুলি ক্রমশ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। নিম্নদিকস্থ প্রাণাধ ও অন্নময় কোষ দুইটি স্থূল ও স্থূলতর। স্বভাবতঃ জীবের মন এই নিম্নস্থ তিন কেন্দ্রেই বিচরণ করে, যথা—মণিপুর, স্বাধিষ্ঠান ও মূলাধার। অন্নময় ও প্রাণময় কোষের মধ্যেই এই তিনটি চক্র বিরাজিত আছে।

উপন্যাস ও নাটকের বিষয়বস্তু ও তাহাদের নায়ক-নায়িকার ভাব-প্রণোদিত ক্রিয়াকলাপ এই তিনটি স্থূল কেন্দ্রের গতাগতি লইয়া ব্যস্ত। জগতের মোহ ও বহুত্বের আনন্দক্রীড়া জীবের মনে যদি জগদীশ্বরের কৃপায় ভাব-বিদ্রোহ উপস্থিত করে তাহার প্রথম খেলা প্রাণময় কোষের উর্ধ্বাধে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এবং ক্রমশঃ উহা উর্ধ্ব দিকে সূক্ষ্মগতি লাভ করিয়া মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে যাইয়া পৌছায়। বহুকোষিক মানব-মন বিবর্তনের প্রসাদে কখন কি ভাব লইয়া খেলা আরম্ভ করে তাহার ক্রিয়া গিরিশচন্দ্রের এই বিভাগীয় নাটকের মধ্যে অনুশীলিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য যে নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহা তত্ত্বহিসাবে এতদিন নাট্যসাহিত্যে দুজ্ঞেয় ছিল। অধিকারীভেদে ভাবের বিচিত্র গতিভঙ্গী কিরূপ রস পরিবেশন করে তাহার চিত্র নাট্যকার আঁকিয়াছেন। ইহার কোনোটা মনের আনন্দ সমুদ্রে ডুবিয়া আছে, কোনোটা বা বিজ্ঞানময় কোষের জ্ঞান সমুদ্রে জ্ঞান সঞ্চয়ে ব্যস্ত, কোনোটা বা প্রাণময় কোষ থেকে ভাব বহন করিয়া মনোময় কোষে তাহা ছড়াইয়া দিতেছে।

গিরিশচন্দ্র একাধারে পালাকার (play-wright) ও নাটককার (dramatist) ছিলেন। যখন মঞ্চাধিকারীর পকেটের দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন তখন তিনি পালাকার, আর যখন আত্মমুখ মনের (subjective mind) দিকে চাহিয়াছেন তখন বিষয়মুখ (objective) মন দিয়া নাটক গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার জন্য নিরপেক্ষ কৃতি সমালোচকের প্রয়োজন। আমার এ ক্ষীণ চেষ্টা তাহার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবে মাত্র।

চৈতন্যলীলা নাটক

চৈতন্যলীলা এ বিভাগের প্রথম নাটক। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২রা আগস্ট তারিখে বীডনস্ট্রীটস্থ তদানীন্তন স্টার থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। চৈতন্যদেব ঐতিহাসিক চরিত্র নিঃসন্দেহ

কিন্তু নাটককার নাটকে তাঁহার দেবভাব-মাত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তজ্জন্য ঐতিহাসিক পর্যায়ের মধ্যে ইহা সন্নিবিষ্ট হইল না। নাটককার স্বয়ং ইহাকে ভক্তিমূলক নাটক বলিয়াছেন।

ষড়রিপুর তাড়নে মনুষ্যসমাজ বিধ্বস্ত হইতেছিল, তাই পাপ পূর্ণমাত্রায় চৈতন্যের সমসাময়িক ভারতভূমি কলুষিত করিয়াছিল। সেই পাপ-ভার হরণের নিমিত্ত এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য চৈতন্য-দেবের অবতারত্ব কল্পিত হইয়াছে। নানারূপ যুক্তির ভিতর দিয়া গিরিশচন্দ্র গীতার এই অবতার-বাদ নাটকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নারায়ণেরই অবতার-গ্রহণের কথা শাস্ত্রে কথিত আছে, তাই নাটকান্তর্গত 'পণ্ডিতচরিত্র' প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে চৈতন্যের অবতার-গ্রহণ প্রসঙ্গে ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

"অবতারে যে সব লক্ষণ—
অবয়বে করি দরশন,
কিন্তু হেরি গৌর বরণ
বিস্ময় হতেছে মনে,—
শ্যামবর্ণ অবতার চিরদিন।"

এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বলিয়াছিলেন :—

"অদ্ভুত এ লীলা—এক অঙ্গে রাধাশ্যাম।
পুরুষ-প্রকৃতির এক দেহে রতি—
জীবে গতি করিতে প্রদান,
বুঝহ যুক্তিতে ঈশ্বর শক্তিতে 'হ্লাদিনী শক্তিসার—
'হ্লাদিনী শক্তির আধার।
গৌর আকার—এক অঙ্গে সগুণ-নির্গুণ।"

আর এক স্থানে মূর্তিমতী 'ভক্তি' মূর্তিময় 'বৈরাগ্যকে' চৈতন্যলীলা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"বাহ্য রাধা অন্তঃ কৃষ্ণ অপূর্ব এ ভাব", সুতরাং এ লীলার উদ্দেশ্য বা রহস্য বাহ্যতঃ এক প্রকার বলাই হইল। রাধিকার প্রেমোন্মাদ ভাব ও শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্যবিষয়ক জ্ঞানের দ্যোতনা নিমাই দেহে যুগপৎ ক্রীড়া করিয়াছিল। এ লীলা সম্বন্ধে 'ভক্তি' 'বৈরাগ্যকে' এই দৃশ্যকাব্যের মধ্যে আর একস্থানে বলিয়াছেন :—

"নহে জড় নয়ন গোচর তাহা,
ভাবুক হৃদয় তন্ন-তন্ন হেরে সমুদয়। * *
লীলা অন্তরে-অন্তরে বাহে তার নাহিক প্রকাশ।
* * ভেদজ্ঞান—প্রধান প্রকৃতি মানবের (তার);
লীলা যবে একত্রে হেরিবে—ভেদ জ্ঞান যাবে,
প্রেমে পাবে সনাতন। * *
কলিযুগে দীক্ষামাত্র—নাম,
প্রেমামৃত পান, হরিনাম সাধন কেবল,
যেই নাম—সেই হরি করিতে প্রচার,

নদীয়ায় প্রভু অবতার। * *
আপামর পাবে দিব্যজ্ঞান।"

জিজ্ঞাসুর চৈতন্য-সম্বন্ধীয় অনেক প্রশ্নের মীমাংসা এই কয়টি কথার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

অবতার-আখ্যা পাইলেই লীলা-সহচরের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাই নিত্যানন্দরূপী বলরামের এবং শ্রীদাম, সুদাম—এমন কি গোপীদেরও লীলা সহচর হইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। 'ভক্তি' ও 'বৈরাগ্যের' নিম্নলিখিত সংলাপের মধ্যে ঐ ঘটনা সুপ্রকাশিত হইয়াছে:—

"নীলাচলে ভাবে মগ্ন অবধূত চলে,
নিত্যানন্দ নাম—ঐ দেহে বিরাজেন বলরাম।
হের নদীয়ায় ভক্তবৃন্দ জ্যোতির্ময় কায়;
কেহ সখা, সখীভাবে কেহ,
আত্মাসনে আত্মার বিহার,
ভাব তাহে সার—
আধার প্রভেদ মাত্র তাহে।
একমাত্র বিরাজে পুরুষ,
প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ,
ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রকাশ।"

কৃষ্ণলীলার সহিত চৈতন্যলীলার সামঞ্জস্যরক্ষা নাটককার 'ভক্তি'র মুখ দিয়া এইরূপে করিয়াছেন:—

"ভাবুক হৃদয় হেরেছে সকল লীলা;
মৃত্তিকা ভক্ষণে কৃষ্ণের বদনে—
চতুর্দশ ভুবন হেরিলা নন্দরাণী।
মৃত্তিকা ভক্ষণে শচীর কুমার—
ভুবনের সমাচার কহিল মাতারে।
মিশ্রের পাদুকা বহিলেন ভগবান,
সবিস্ময়ে জনক-জননী শুনিল নূপুরধ্বনি—
নূপুরবিহীন পায়। যথা গোপগৃহে
মাখন-হরণ, ঘরে-ঘরে করিয়ে ভ্রমণ—
খাদ্য-দ্রব্য চুরি করে হরি।
প্রেমের কৃত্রিম-কোপে ধায় প্রতিবাসী
ধরিতে গৌরাঙ্গ-শশী,
শচীর শাসন বন্ধনের অনুরূপ।
দন্তের দলন, দানব-নাশন—
হয় নিত্য প্রেমের লীলায়,
হেরে মুখ প্রেমে গলে প্রাণ,
দম্ভ আর নাহি পায় স্থান, যার দ্রব্য যায়,

সেই পুনঃ চায়—আসি পুনঃ করুন হরণ।
গোষ্ঠলীলা—শিশু সনে খেলা,
সখ্য-প্রেম বিতরণ। প্রেমিকের সনে
মধুলীলা—ভাতিবে যৌবনে।"

জ্ঞানমার্গের নীরস পথ অপেক্ষা ভক্তি-মার্গের সরস পথে জীব সহজেই আকৃষ্ট হয়, কারণ ভক্তি অন্তরের ধন! হেতু-বস্তুর সে বিচার করে না, ইষ্টের উদ্দেশে স্বতঃই সে চুম্বক আকৃষ্টের মতো হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া ধাবিত হয়। জ্ঞানের পথে কিন্তু, যাহাতে দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহা সর্বথা পরিত্যাজ্য; ভক্তিপথে সুখ-দুঃখ নির্বিচারে ভোগ করিতে হইবে। নাটককার অদ্বৈতাশ্রমে ভক্তসাধক হরিদাসের মুখে এই তথ্যটি প্রকাশিত করিয়াছেন। হরিদাস গোপনারী সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—"কৃষ্ণধন সার, হিতাহিত নাহিক বিচার, জ্ঞানহীনা গোপাঙ্গনা অবশ্য কহিব; বিনা বস্তুর বিচার ভক্তিলাভ করেছিল অনায়াসে।"

চৈতন্যলীলা-নাটকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-সম্বন্ধে নিমাই এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন :—

"কে করে নির্ণয়—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়,
কোটি কোটি হইতেছে মুহূর্ত্তেকে,
মায়ায় সৃজন, মায়ায় পালন, মায়ায় নিধন পুনঃ।
এক-বহু মায়া আবরণে,
যুগ-বর্ষ-পল মায়ায় সকল,
মায়া বলে স্থান নিরূপণ,
ভ্রান্তিরূপা মায়ায় প্রভেদ-জ্ঞান। * *
বাসনায় জগৎ সৃজন,
কর জীব বাসনা বর্জন,
নিত্যধন পাবে অনায়াসে;
বাসনায় মনের জনম, মন সৃষ্টি করে এ শরীর।
অনন্ত বাসনা উঠে তায়,
ভাসে মন বাসনা-সাগরে;
মোহ-অন্ধকারে আপনা পাসরে,
শিব ভুলি হয় জীব।"

এখন নাটক-হিসাবে চৈতন্যলীলার স্থান কোথায়, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন। নায়ক চরিতকে বেষ্টন করিয়া যে নাট্যক্রিয়ার উদ্ভব হইয়াছিল তাহার ক্রম-বিকাশ দৃশ্যে-দৃশ্যে, অঙ্কে-অঙ্কে অবাধগতিতে চলিয়া উহারই স্বাভাবিক পরিণতি-লাভ চৈতন্যলীলা নাটকে ঘটিয়াছিল। সমস্ত ঘটনাই ঐ এক পরিণতির কেহ বা পরিপোষক রূপে—কেহ বা পরিপন্থী-হিসাবে ঘাত প্রতিঘাত তুলিয়া সহায়তা করিয়াছিল। উভয়ের লক্ষ্যস্থল কিন্তু এক। নাটকের আভ্যন্তরীণ চরিত্রগুলির মধ্যে জগাই-মাধাই চরিত্র দুইটি চিত্তাকর্ষক। প্রাকৃতিক নিয়মে প্রায় দেখা যায় যে, প্রথম জীবনে যে ব্যক্তি যত বড় পাষণ্ড থাকে, পরিণত জীবনে সে তত বড় ভক্ত ও সাধু হইয়া উঠিয়াছে। জগাই-মাধাই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। লোক চরিত্র হিসাবে এ দুইটি অনবদ্য।

এক জাতীয় সমালোচক আছেন তাঁহারা দৃশ্যকাব্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক আলোচনা পছন্দ করেন না। তাঁহাদের যুক্তি এই—যে উহা স্বভাবসঙ্গত নহে। চৈতন্যের চরিত্র সামাজিক সত্য ঘটনা, সুতরাং এক হিসাবে ইহা ঐতিহাসিক। তাঁহার প্রেমোন্মাদ-ভাব যাহা তাঁহার চরিতকার চৈতন্য-ভাগবতে বা চৈতন্যচরিতামৃতে চিত্রিত করিয়াছেন, নাটককার তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই এই নাট্যসৌধখানি নির্মাণ করিয়াছেন, সুতরাং ইহার মধ্যে অস্বাভাবিকতার ছায়া দেখিতে যাইলে চলিবে কেন? আর্টের খাতিরে চরিত্রের অঙ্গরাগ দূষণীয় নহে—না থাকাই দূষ্য। বৈষ্ণব শাস্ত্রের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ রসের অভিব্যক্তি ইহার মধ্যে পাইবেন।

এই নাটকের অভিনয়কালে দুইটি অভাবনীয় ঘটনার সমাবেশ হইয়াছিল। তাহার প্রথমটি, সর্বধর্ম-সমন্বয়ের নায়ক যুগপ্রবর্তক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব এই নাটকের একজন দর্শক হিসাবে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ তদানীন্তন স্টার থিয়েটারে উপস্থিত হইয়াছিলেন; এবং দ্বিতীয়টি রঙ্গালয়ে সর্বপ্রথমে হরি-সংকীতনের প্রচলন এই নাটকেই করা হইয়াছিল, তজ্জন্য কতকগুলি প্রাণস্পর্শী সংগীত-লহরী নাটককার এই নাটকের অবয়বে প্রবিষ্ট করাইয়া সংগীত-সাগরে দেশবাসীকে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। এ নাটকের অভিনয়-কালে বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হরিনামে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। সম-সাময়িক সংবাদপত্র ইহার সাক্ষ্য দিয়াছে। রঙ্গমঞ্চের দ্বারা যে সমাজ সংস্কার সাধিত হইতে পারে তাহার সংবাদ রঙ্গমঞ্চের দর্শকরা এই প্রথম পাইল। বহু পরবর্তীকালে এই নাটক ও নাটককারের অপর নাটক 'নিমাই সন্ন্যাসে'র সংমিশ্রণে 'নদের নিমাই' বা 'নদীয়া বিনোদ' নামক দুইখানি চমকপ্রদ গীতাভিনয়ের পালাগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ঐ পালাগ্রন্থে সংগীতের আধিক্য ব্যতীত সংলাপগুলির বিশেষ কিছু পরিবতন সাধিত হয় নাই। আজ দেশবাসীরা ঐ পালার অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছেন। মৌলিক নাট্যকবির ধন্য এই সংযত নাট্য-কৌশল, যে তাহা সর্বকালে আনন্দ দিতে পারে।

নিমাই সন্ন্যাস নাটক

এই বিভাগের দ্বিতীয় নাটক 'নিমাই-সন্ন্যাস', যাহাকে নাটককার চৈতন্যলীলার দ্বিতীয় ভাগ নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ তদানীন্তন স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। চৈতন্যলীলার পরিশিষ্ট বলিয়া ভাবের ঐক্য এ নাটকে দেখা গিয়াছে।

"অন্তঃ কৃষ্ণ বহির্রাধা" ভাবের রহস্য এ নাটকে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতার-গ্রহণ যে প্রচ্ছন্নভাবে সংঘটিত হইয়াছিল তাহার কারণ রাধিকাদ্বারা শ্যাম অঙ্গ বেষ্টনরূপ তত্ত্বের মধ্যে লুকায়িত আছে, খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইতে হয়। বিশিষ্ট বিজ্ঞানময় কোষের এ-সকল লীলা অন্নময় বা বড় জোর, প্রাণময় কোষের সাধনা লইয়া যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের কাছে কৃত্রিম বলিয়াই অনুমিত হইবে, কিন্তু তা' বলিয়া ইহা অস্বাভাবিক নহে, ইহা প্রকৃতই ঘটিয়াছিল। ঐ পথের পথিক হইয়া দৃষ্টিভঙ্গী বদল করিলেই সকল অসামঞ্জস্য সুসমঞ্জস হইয়া উঠিবে।

নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণ ও তাহার পরবর্তী ঘটনাবলি এ নাটকের উপজীব্য। ইহার বুনানী (weaving) নাটকোচিত (dıamatic) হয় নাই। পারিপার্শ্বিক বিষয়ের (side-issues) দিকে বেশী নজর থাকায় নাটকের মূল বিচার্য্য বিষয়ের (main issue) গতি মন্থর হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য

দর্শক বা পাঠকের মনে কোন কৌতূহল জাগে নাই; কেমন একটা একঘেয়ে সুর (monotony) ধ্বনিত হইয়াছে। নাটকের শেষ অঙ্কে সার্বভৌম ও নিমাইয়ের জ্ঞান ও ভক্তিমার্গ সম্বন্ধীয় বিতর্কের মধ্যে জটিল দার্শনিক তত্ত্বের সমাবেশ দেখা যায়। সার্বভৌম প্রদর্শিত ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় নিরাকার, নির্গুণ নির্বিশেষ প্রভৃতি বিশেষণগুলি যে, ঈশ্বরের কেবল বিশেষণ এ মত খণ্ডন করিয়া নিমাই যুক্তিদ্বারা তাঁহার সাকার মতেরও প্রতিষ্ঠা করিলেন। ষড়ভুজ-মূর্তি ধারণ করিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রচ্ছন্ন অবতার-মূর্তি দেখাইয়া নিমাই উপনিষদের ঐ নিরস সাধককে প্রেম-ভক্তির সরস পথে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রে বৈচিত্র্য ছিল না। বাহ্য বিরহের সহিত আন্তর বিরহের কোন সম্বন্ধ নাই, এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস নাট্যকবি এই চরিত্রের ভিতর দিয়া করিয়াছেন। এই সাধনার পথ সহজসাধ্য নহে, পদস্খলনের সম্ভাবনা অধিক, তাই বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে নিমাইয়ের দেবদেহে অবস্থিতির পরিকল্পনা আনিয়া নাট্যকার তাহার সিদ্ধিলাভের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন।

এই নাটকটি জনপ্রিয় না হইবার কারণ অনধিকারীর সম্মুখে সূক্ষ্মতত্ত্বের পরিবেশন করা হইয়াছিল। ভাব উচ্চস্তরে উঠিলে ক্রমশ সূক্ষ্মতালাভ করে। সেই সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিবার লোকসংখ্যা নাট্যশালার সাধারণ দর্শক বা পাঠকের মধ্যে বেশী থাকে না। পাশ্চাত্ত্য Miracle জাতীয় নাটকের প্রভাব 'চৈতন্যলীলা' ও 'নিমাই-সন্ন্যাসের' উপর কিছু দেখা যাব উহাদিগের অতিমানবীয় লীলাভঙ্গীতে, তবে কুত্রাপি জাতীয় সংস্কৃতি হারায় নাই। নিমাই সন্ন্যাসটি তত্ত্বাংশপ্রধান হওয়ায় ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিতে না পারায় নাটকের সৌন্দর্য হারাইয়াছে। নাটককার হিসাবে, তাই গিরিশচন্দ্রের এ নাটকে প্রথম পরাজয় ঘটিল। সংগীতবিভাগে ইহার দুই-তিনটি গান, বিশেষতঃ 'শুকাল মালতী মালা প্রাণনাথ এলো না'—গানটি চির নূতন হইয়া রহিল।

বুদ্ধদেব চরিত নাটক

এই বিভাগের তৃতীয় দৃশ্যকাব্য 'বুদ্ধদেব চরিত' ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে বীডনস্ট্রীটস্থ তদানীন্তন স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানির নায়ক ঐতিহাসিক চরিত্র হইলেও নাটকে তাঁহার দেবভাবই চিত্রিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র স্যর্ এডুইন্ আর্নল্ডের লাইট্-অফ্-এশিয়া (Light of Asia) নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে ইহার ঘটনা ও ভাবরাজি গ্রহণ করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া লইয়া এরূপ অভিনব রূপ দিয়াছিলেন যে দর্শক বা পাঠক সমাজ এই নাটকের রমণীয়তায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। কলিকাতা-শহরের বাগবাজার অঞ্চলের নন্দলাল বসু মহাশয়ের বাড়ীতে দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে পাঁটাবলি প্রথা এই নাটকের প্রভাবেই বন্ধ হইয়া যায়। এমন কি স্বয়ং আর্নল্ড সাহেব এই নাটকের অভিনয় দেখিতে আসিয়া নাট্যকারের ও বঙ্গ নাট্যশালার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছিলেন। অধুনা পরলোকগত গিরিশচন্দ্রের শর্টহ্যাণ্ড-লেখক অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্র' নামক গ্রন্থ এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে।

হিন্দুর দশ অবতারের মধ্যে বুদ্ধদেবের স্থান আছে। নাটককার এই নাটকের পূর্ব-সূচনায় গোলোকধাম-দৃশ্যে বিষ্ণু ও দয়ার সংলাপের মধ্যে কবি জয়দেব কৃত 'প্রলয়পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদম্' নামক অবতার স্তোত্রের ব্যাখ্যায় অভিব্যক্তি-বাদের মধ্য দিয়া সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা

করিয়াছেন। অবতারতত্ত্বের পশুদেহজনিত বিবর্তন * শেষ করিয়া নরদেহে ঐ অভিব্যক্তি আরম্ভ হইলে এই ক্রম-বিবর্তনটী নাটককার সুন্দর কৌশলে বুঝাইয়া দিয়াছেন। বুদ্ধাবতার সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন :—

"বিদ্যাদর্পে দর্পিত ব্রাহ্মণ, অস্ত্রবলে না হবে শাসন,
সে দর্প দমিব বিদ্যাবলে।
ব্রাহ্মণের উপদেশে পথহারা নর,
ধর্মে ডরি করে সবে নিষ্ঠুর আচার,
নব বিধি করিয়া প্রচার, ভ্রম দূর করিব সবার,—
'অহিংসা পরমোধর্ম' করিব ঘোষণা। * * *
যাগ-যজ্ঞ হবে নিবারণ,
দেবার্চ্চনে প্রাণীর হনন নাহি হবে ধরামাঝে। * *
আত্মোন্নতি করিতে সাধন—
নরগণ করিবে যতন,
কর্মে কর্মনাশ আশে, নির্বাণ প্রয়াসে
রিপুগণে করিয়ে দমন,
সদাচারী হইবে মানব।"

বৌদ্ধদর্শনের অহিংসা, জীবে দয়া, কর্মদ্বারা কর্মনাশ করিয়া নির্বাণলাভ প্রভৃতি তত্ত্ব নাটককার এই নাটকের মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছেন।

নাটকের ক্রিয়া (action) প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বিতীয় অঙ্ক হইতেই আরব্ধ হইয়াছিল। 'জরা, রুগ্ন, মৃত, ভিক্ষু করি দরশন, রাজার নন্দন ভবন ত্যজিয়া যাবে'—এই বিধিলিপির বিরুদ্ধে কুমার সিদ্ধার্থকে গৃহধর্মী করিবার জন্য রাজা শুদ্ধোদন যে বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন, নাটকের দর্শক বা পাঠকসমাজ তাহা অবগত আছেন, সিদ্ধার্থের বিধিলিপি কিন্তু ঐ বিরুদ্ধ অভিযানের ভিতর থেকেও প্রকাশিত হইবার সুযোগ খুঁজিয়াছিল। উদ্যান-প্রবিষ্ট দেববালাদ্বয়ের সংলাপের মধ্যে সিদ্ধার্থের ঐ জাতীয় মানসিক চাঞ্চল্য এইরূপে দেখা গিয়াছে :—

"সঙ্গী সনে নাহি করে খেলা,
নাহি নগর ভ্রমণ, অশ্ব-সঞ্চালন;
পাছে ক্ষুদ্রকীটে দলে পদে—
সশঙ্কিতে করিত চরণ-ক্ষেপ;
হিংস্রজন্তু করিলে নিধন,
করিত রোদন।"

গৃহধর্মী সন্তানের এই সকল বিরুদ্ধ মনোভাবের নাশ-কল্পে রাজা গোপা-নাম্নী এক সুন্দরী নারীর সহিত সিদ্ধার্থের বিবাহ দিয়া রাজপুত্রকে উপবনমধ্যস্থ নারীমহলে আবদ্ধ করিলেন। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার

* কবি নবীন সেন কর্তৃক পদ্যে অনূদিত 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর' উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য

নিবারণ মানুষের সাধ্যাতীত। উপবন মধ্যস্থ প্রকৃতির শোভা দেখিয়া সিদ্ধার্থের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রভাতকালীন শোভা মধ্যাহ্নে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং মধ্যাহ্নের শোভা সায়াহ্নে পরিবর্তিত হইতেছে। কভু শান্ত স্নিগ্ধ প্রকৃতি—কভু মেঘ-ঝঙ্কার ও তাণ্ডব নর্তন। এই সকল ক্রমিক পরিবর্তন দেখিয়া-শুনিয়া সিদ্ধার্থ বলিতেন :—'হ'ত অনুমান, চক্রাকারে হয় ঘূর্ণ্যমান, দিবানিশি, পক্ষ, ষড়ঋতু—যেন নহে নিয়ম অধীন, স্বেচ্ছাধীন চিরদিন চক্র ঘুরে'; সিদ্ধার্থের এই সকল ক্ষুদ্র মনোবিকার কিন্তু রূপযৌবন সম্পন্না নবপরিণীতা প্রণয়িণীর সহবাসে দূর হইয়া যাইত। দম্পতীর সংলাপের মধ্যে 'ছায়ার' কথা শুনা গিয়াছিল। এত সুখের মধ্যেও ছায়া আত্মগোপন করিতে পারে নাই। পত্নী-মনের ছায়াজনিত শঙ্কা দূর করিবার মানসে নাটককার সিদ্ধার্থের মুখে কবিত্বপূর্ণ প্রেমালাপ দিয়াছিলেন। প্রদীপ নিবিবার আগে যেমন জ্বলিয়া উঠে, এ যেন অনেকটা সেইরূপ :—

"আহা প্রিয়ে! বসন্ত উষায় শতদলে শিশির যেমতি,
কেন সতি, অশ্রুবিন্দু নয়নে তোমার?
জান না কি, হাসিমুখ ভালবাসি তোর?
আহা প্রিয়ে এ কি নবভাব,
হাসি-সনে মিশে আঁখি-বারি!
দেখি-দেখি বসন্তে বরিষা!
প্রিয়ে, তব নয়ন চুমিয়ে বারিবিন্দু করি দূর,
তরুণ অরুণে কমলে শিশির বিন্দু যথা।"

বিধিলিপি খণ্ডিত হইল না। সিদ্ধার্থের মনে যথাকালে বৈরাগ্য আনিবার জন্য ঐ উপবনের মধ্যেই দেববালাদ্বয় গোপার সখীরূপে উদ্বোধন সংগীত আরম্ভ করিয়া দিল। এই সংগীতটি বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে অমূল্য সম্পদ হইয়া আছে। জন-সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সমুদয় গানখানি এখানে উদ্ধৃত হইল। গীতকারের রচনা-লাবণ্য গানের প্রতি ছত্র বাহিয়া ঝরিয়াছে :—

"জুড়াইতে চাই—কোথায় জুড়াই?
কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই?
ফিরে-ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।
কে খেলায়! আমি খেলি বা কেন?
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন!
এ কেমন ঘোর, হবে না কি ভোর?
অধীর—অধীর যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই।"

সংগীতের এই 'আস্থায়ী' অংশের মোহিনীশক্তি প্রভাবে সিদ্ধার্থের মনে প্রথম টান ধরিল, তাই তিনি দেববালার পরিচয় জানিতে উৎসুক হইলেন। দেববালা তখন সংগীতের 'অন্তরা' ও 'সঞ্চারী' বিভাগের ভিতর দিয়া এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছিল :—

"জানি না কেবা, এসেছি কোথায়,
কেন বা এসেছি, কেবা নিয়ে যায় ?
যাই ভেসে-ভেসে, কত-কত দেশে,
চারি দিকে গোল, উঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়,
এই আছে আর তখনি নাই।"

সংগীতের এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ গীত হইবার পর সিদ্ধার্থকে উন্মনা দেখা গেল। দেববালারা তখন গানের 'আভোগ' নামক শেষ অংশটি এইরূপে গাহিল :—

"কি কাজে এসেছি—কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন কি খেলা হ'ল।
প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি,
যাই যাই কোথা কূল কি নাই।
কর হে চেতন, কে আছ চেতন,
কতদিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন ?
যে আছ চেতন, ঘুমাও না আর ;
কর তমোনাশ, হও হে প্রকাশ,
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়,
তব পদে তাই শরণ চাই।"

দেববালার ঐরূপ উদ্দীপনাময় সংগীতের প্রেরণায় সিদ্ধার্থ সারথি-সমভিব্যাহারে উপবনের বাহিরের জগৎ দেখিবার জন্য সর্বপ্রথম নগরভ্রমণে বাহির হইলেন। রাজাদেশে সজ্জিত উৎসব-মুখরিত নগরশোভা সিদ্ধার্থের প্রাণে শান্তি আনিল না। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—'অধীন যে জন, সে কেমনে শিখাইবে স্বাধীনতা ?' সিদ্ধার্থের মন যখন সন্দেহ-দোলায় এইভাবে দুলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে দূতমুখে তাঁহার সদ্যজাত পুত্রের জন্মসংবাদ শুনিয়া আনন্দ-প্রকাশের পরিবর্তে তিনি এইরূপ বলিলেন :—

"বন্ধনের উপর বন্ধন ! নিত্য নব বিড়ম্বনা,
ওঠে প্রাণে বাসনা সাগর,
দুস্তর বাসনা—
বুঝি বাসনাই বিড়ম্বনা !
সুখ আশা—আশামাত্র,
সুখ কিবা নাহি জানি।"

সত্যতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু সিদ্ধার্থের সম্মুখে এই শুভমুহূর্তে বিধিলিপি যথাক্রমে বৃদ্ধ, রুগ্ন, মৃত ও ভিক্ষুককে আনিয়া হাজির করিলেন। নাটকের চরম পরিণতির বীজ (climax) এই খানেই উপ্ত হইল। সিদ্ধার্থ বৈরাগ্যের তাড়নায় তত্ত্বানুসন্ধিৎসার জন্য গৃহত্যাগ করিলেন। বৈরাগ্যের এমনি আকর্ষণ যে স্নেহময় মাতাপিতা, প্রেমময়ী জীবনসঙ্গিনী, প্রাণোপম নবজাত পুত্র, লোভনীয় রাজ্যৈশ্বর্য কিছুই তাঁহাকে পশ্চাতে ফিরাইতে পারিল না। তিনি বলিলেন :—

"কিবা ফল, অন্ধমাঝে অন্ধ হ'য়ে র'হে ?
ফিরিছে বিষম চক্রে মানব সকল,
রোগ-শোকে সতত বিকল,
মৃত্যুমাত্র পরিণতি !"

অরণ্য মধ্যে কঠোর তপ-নিরত সিদ্ধার্থ তখনও সত্যতত্ত্ব পান নাই, বলিতেছেন :—

"যদবধি দেহে আছে প্রাণ, করি সত্যের সন্ধান।
ফোটে ফুল সৌরভ হৃদয়ে ধরি',
সৌরভ বিতরি' আপনি শুকায়।
মৃত্যু ভয় আছে কি কুসুমে ?
উচ্চ শাল-তাল—অভ্রভেদী শির আনন্দে হেপায়,
অনিলে করিয়ে আবাহন—
রয়েছে মগন আপন আনন্দ ভরে।
হেরি জ্ঞান হয় মৃত্যুকে না ডরে।
তরু মম গুরু—তাপ, হিম, বাত্যা,
জল শিখায়েছে সহিতে সকল।
আছে সমভাবে, আত্মকার্য নাহি ভোলে,
তবে কিহেতু বা স্বকার্য ভুলিব ?
মগ্ন হই পুনঃ মহাধ্যানে।
ত্যজিয়াছি সকল মমতা—
জীবনে মমতা কিবা হেতু ?"

কৃচ্ছ্র সাধনায় দেহপাতের সম্ভাবনা দেখিয়া বিধিলিপি সিদ্ধার্থের জীবনরক্ষার্থ দেববালাদের নিম্নলিখিত সংগীতের ভিতর দিয়া তাঁহার প্রাণে নূতন ভাবের প্রেরণা পাঠাইলেন। সংগীতটি এইরূপ :—

"আমার এ সাধের বীণে—
যত্নে গাঁথা তারের হার,
যে যত্ন জানে বাজায় বীণে,
উঠে সুধা অনিবার।
তানে-মানে বাঁধ্‌লে ডুরি,
তারে শতধারে বয় মাধুরী,
বাজে না আল্‌গা তারে,
টানে ছিঁড়ে কোমল তার!
সাধের বীণের মরম যে জানে,
সে ত তার বাঁধে না টানে,
দীনের কথা মধুর গাথা শুনে সে প্রাণে ;

যে জোর ক'রে ডোর বাঁধ্‌বে টানে,
বীণা নীরব রবে তার।"

কঠোর সাধনার পথে উন্নতশীর্ষ পাদপ অর্থাৎ প্রকৃতি যেমন সিদ্ধার্থের উপদেষ্টা হইয়াছিল, আজ তেমনি দেববালার পূর্বোক্ত সাধন-বিষয়ক সংগীতটি তাঁহাকে দেহ বাঁচাইয়া মধ্যবিধ ক্লেশকর সাধনার পথে পরিচালিত করিল, কারণ দেহ চলিয়া যাইলে, কারে লইয়া সাধনা চলিবে?

সাধনায় সিদ্ধি পাইতে হইলে পরীক্ষা দিতে হয় ইহাই সনাতন নিয়ম, তাই বিম্বসার রাজার পুত্রেষ্টি যজ্ঞাগারে লক্ষ প্রাণীবধ নিবারণ-কল্পে সিদ্ধার্থ যূপকাষ্ঠমূলে দাঁড়াইয়া নৃপতির নিকট হইতে প্রাণিবধযজ্ঞ দান-স্বরূপ ভিক্ষা চাহিলেন। ভিক্ষার ভাষা কি সহানুভূতিপূর্ণ!—

"* * দেখ নীরব ভাষায় ছাগ-পাল মুখ তুলে চায়!
যদি নৃপ, কৃপা নাহি কর,
দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ?
* * রাজকার্য দুর্বল পালন, দুর্বল এ ছাগ-পাল;
হায়! হায়! ভাষায় বঞ্চিত,
নহে উচ্চৈস্বরে ডাকিত তোমায়—
'প্রাণ যায় রক্ষা কর নরনাথ!' * *
হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম-উপার্জন? * *
প্রাণদানে নাহিক শকতি,
হে ভূপতি, তবে কেন কর প্রাণনাশ?
প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে * *
কিন্তু যদি বলিদান বিনা তুষ্টা নাহি হ'ন ভগবতী—
দেহ মোরে বলিদান!
দ্বাদশ বৎসর করেছি কঠোর তপ,
যদি তাহে হ'য়ে থাকে ধর্ম-উপার্জন,
করি রাজা তোমারে অর্পণ—সুপুত্র হউক তব।
যদি তব থাকে কোন পাপ,
পুত্র বিনা যার হেতু পেতেছ সন্তাপ,
ইচ্ছায় সে পাপ আমি করিব গ্রহণ,
বধ রাজা আমার জীবন,
নিরাশ্রয় ছাগগণে কর প্রাণদান! * *
আপন ইচ্ছায় তব কার্যে অর্পি নিজ কায়,
তাহে তব নাহি পাপ! রাখ, রাখ যোগীর মিনতি,
বসুমতী কলুষিত ক'র না ভূপাল!
স্বার্থ হেতু ক'র না হে কোটি প্রাণি-বধ।
কোথায় ঘাতক, রাজকার্যে বধ মোরে!"

আত্মদান-তুল্য পরীক্ষা আর কি হইতে পারে? সে অবস্থায় মার, সন্দেহ, মোহ, মায়া প্রভৃতি সাধনার অন্তরায়-সমূহ সাধককে আর বিচলিত করিতে পারিল না। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সিদ্ধার্থ নিম্নলিখিত জ্ঞানসম্পদ লাভ করিলেন :—

"জনম, বর্দ্ধন, মৃত্যু—অবস্থা কেবল ;
যেন বা প্রণয়, আনন্দ-যন্ত্রণা—
মানসিক অবস্থার ভেদ।
যতদিন না ফোটে নয়ন,
মায়ারোধ যতদিন না হয়—এ সব,
তদবধি নাহি যায় দুঃখ-সুখ ভোগ ;
অবিদ্যাজনিত ছল যেইজন জানে,
টুটে তার জীবন-মমতা ; * *
পঞ্চভূত হ'যে সম্মিলন, জীবজ্ঞান করিছে সৃজন,
জীবজ্ঞানে তৃষ্ণার উদ্ভব, বেদনা সন্তান তার।
সে তৃষ্ণায় যত কর পান, না হয় নির্বাণ,
বৃদ্ধি হয় অগ্নি যথা আহুতি প্রদানে ;
আমোদ প্রয়াস, উচ্চআশ,
ধনলিপ্সা, যশোলিপ্সা আদি, তৃষ্ণানলে ঘৃতাহুতি।
সযতনে জ্ঞানিজন তৃষ্ণা করে দূর।
কর্মফলে দুঃখসুখ ভোগ,
কর্মগত ভোগ সহে ধৈর্য্যে বাঁধি প্রাণ,
নিগ্রহে ইন্দ্রিয় হয় হত,
ক্রমে তায় হয় কর্মনাশ,
কর্মধ্বংসে পবিত্রতা করে অধিকার,
নির্বিকার উপাধিবিহীন, স্বপ্নবৎ অবিদ্যা ফুরায়।
দেবের দুর্লভ অতুল বৈভব,
জরা-মৃত্যু হীন নির্বাণ রতন করে লাভ।
জেনেছি জেনেছি—
পূর্বতন বোধিসত্ত্ব-বংশোদ্ভব আমি,
নাহি মম নাম, নাহি মম জন্মভূমি,
গোত্র, জাতি, বর্ণ বা জীবন।
জ্ঞানালোক—জ্ঞানালোক—
তিমির নাহিক আর !"

জ্ঞানলাভের পর বুদ্ধদেব আপামর-সাধারণে ঐ জ্ঞানরত্ন বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রভাবে রাজা শুদ্ধোদন, গৌতমী, গোপা, রাহুল নাটকের উপসংহার কালে জ্ঞানরত্ন লাভ করিলেন।

পাশ্চাত্ত্য Miracle জাতীয় নাটকের প্রচারাত্মক কাজ গিরিশচন্দ্র এইখানে দেখাইলেন। বহু প্রচলি মহাবাণী সার্থক হইল :—'স জাতঃ যেন জাতেন জাতিবংশো সমুন্নতিম্। পরিবর্তনি সংসারে মৃত কোবা না জায়তে !'

নাটককার এ নাটকের সংগীত বিভাগে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। (১) 'চলে যাই আপ মনে চাই না কারো পানে, গোপনে প্রাণের কথা কই প্রাণে প্রাণে।' (২) 'বস্‌লো অলি ফুলে ফুলে গায়, সই লো প্রাণ শিউরে উঠে মলয়া হাওয়ায়' প্রভৃতি গানগুলি আজও সংগীতজগতে শীর্ষস্থান অধিকা করিয়া আছে। স্থানাভাবে আংশিক উদ্ধৃত হইল।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নাটক

'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকখানি এই বিভাগের চতুর্থ সংখ্যা; ইহা গিরিশচন্দ্রের বিজয়-বৈজয়ন্তী বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন এরূপ ভাবপূর্ণ নাটক পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যে আর নাই। ইহার আখ্যান ভাগ বৈষ্ণবীয় 'ভক্তমাল' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ তদানীন্তন স্টার থিয়েটারে ইহা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। বারাঙ্গনায় ন্যস্ত প্রেম কিরূপে শ্রীভগবানে সমর্পিত হইয়াছিল, তাহারই অভিব্যক্তি এই নাটকের প্রধান রস। পূর্বরাগ, মিলন, বিরহ, মা প্রভৃতি প্রণয়ের যাবতীয় অবস্থা এই নাটকটির মধ্যে ক্রীড়া করিয়াছে। নাটকের অন্তর্নিহিত প্রেমের যাবতীয় লক্ষণ নাটককার প্রথমেই গ্রীক নাটকের প্রস্তাবনার (Prologue) মতো কৌশলে ভিক্ষুকের 'ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে' শীর্ষক গানের ভিতর দিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা ভাবুকের চিন্তার বস্তু। চিন্তাশীল দর্শক বা পাঠক গভীরভাবে নাটকের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিলে ইহার রস অনুধাবন করিতে পারিবেন না। রসকে অলংকার শাস্ত্রকার—'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ' বলিয়াছেন, তাই অনাস্বাদিত ব্যক্তিকে ইহা বুঝান কঠিন।

বিল্বমঙ্গল নামক এক ধনী ব্রাহ্মণযুবক ইহার নায়ক। প্রেম কি অবস্থায় উন্নীত হইলে ভগবৎ-প্রেম লাভ হয়, নাটককার তাহার প্রক্রিয়া এই নাটকের প্রথম দৃশ্য হইতে দেখাইতে শুরু করিয়াছেন। চিন্তামণির সামান্য অনাদরে বিল্বমঙ্গলের মানপূর্বক নায়িকার গৃহ-ত্যাগ করিয়া যাওয়া, পুনরায় ঐ ক্ষণিক বিচ্ছেদের তাপে চিন্তামণির গৃহেরই কোন নিকটবর্তী স্থানে থাকিয়া তজ্জন্য তীব্র জ্বালা অনুভব করা, মান-সহকারে মিলনের চেষ্টা করিয়া ঐ চিন্তামণি কর্তৃক পুনরায় প্রত্যাখ্যাত হওয়া, পরে চিন্তামণির ঈষৎ আদর-সোহাগ পাইয়াই মানের অপসারণ প্রভৃতি বিল্বমঙ্গলের যাবতীয় বৈদগ্ধ্যক্রীড়া চিন্তামণির প্রতি অকপট প্রণয়ের ফল-স্বরূপ দৃশ্যে-দৃশ্যে এই নাটকের মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে।

বিল্বমঙ্গলের প্রেমটি রূপজ নহে, তাহা তিনি নিজেই চিন্তামণির রূপবর্ণনাকালে বলিয়াছেন—'দেখ্‌তে এমন কি ? চিম্‌ড়ে ছুঁড়ীপানা, তবে আমার নজরে পড়েছিল, তাই'। সুতরাং এ প্রেম তাঁর মনোময় কোষের অন্তরতম প্রদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। কারণ ইহার উপরেই বিজ্ঞানময় কোষের জ্ঞান ও বুদ্ধি রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। এ প্রেম একবার জাগিলে প্রণয়-বস্তুকে দূরে রাখা যায় না, প্রাণের নিকটতম প্রদেশে ধরিয়া রাখিতে সাধ যায়। তাই চিন্তামণিকে দেখিবার জন্য বিল্বমঙ্গলের প্রাণ নানাবিধ ছল-ছুতার অবসর খুঁজিত। পিতৃশ্রাদ্ধরূপ কার্য শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিবার অবসর বিল্ব-মঙ্গলের কোথায় ? মনে তাঁহার যে টান ধরিয়াছে, একটি রজনীর ব্যবধানও তিনি দিতে নারাজ।

কোনরূপে শ্রাদ্ধ সারিয়া লইয়া অপরাহ্ণ কালেই ভোলা চাকরের সাহায্যে চিন্তামণি ও তাহার লোকজনের জন্য পাঁচ চ্যাঙারি খাবার, তন্মধ্যে তিন চ্যাঙারি চিন্তামণির নিজ নামে তুলিয়াও বিল্বমঙ্গল তৃপ্তি পাইতেছেন না, আরও লইতে চান, কিন্তু বহিবার শক্তি নাই। চিন্তামণিকে দিবার জন্য 'পরশ্বদিবস এক শত টাকা চাই'—দেওয়ানজীকে ইহা বলিবামাত্র দেওয়ানজী—বাড়ী বন্ধক ব্যতীত উহা সংগৃহীত হইবার অন্য উপায় নাই—এই কথা বিল্বমঙ্গলকে জানাইয়া দিল। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য বিল্বমঙ্গল তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না—এমনই অভাবনীয় মনের টান।

সাধনা তীব্র হইলেই বিঘ্ন দেখা দেয়। প্রবল ঝড়বৃষ্টি বিল্বমঙ্গলের নদীপারের ব্যাঘাত আনিল। যাত্রার বেগে সিন্দুকের চাবি পর্যন্ত বিল্বমঙ্গল গৃহে ফেলিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে ভৃত্য ভোলার চৌর্যবৃত্তির সুবিধা হইল। দারুণ দুর্যোগের জন্য খেয়া-ঘাটে পারের নৌকা ছিল না। পার্শ্বের শ্মশানঘাট হইতে মোটা কাঠ ভাসাইয়া নদীপারের সংকল্প লইয়া বিল্বমঙ্গল শ্মশানে প্রবিষ্ট হইলে প্রজ্বলিত চিতার পার্শ্বে উপবিষ্টা এক পাগলিনীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ পাগলিনী তাহার অভীষ্ট-চিন্তামণির জন্য ব্যাকুল। পাগলিনীর কথায় প্রেরণা পাইয়া বিল্বমঙ্গল অনন্যোপায় অবস্থায় সন্তরণ দ্বারা নদীপারের সংকল্প লইয়া নদীতে ঝম্প-প্রদান করিলেন। নাটকের প্রথমাঙ্ক এইখানেই শেষ হইয়াছে।

চিন্তামণির প্রতি বিল্বমঙ্গলের আকর্ষণ কতটা বেগবান্ তাহা নাটককার দ্বিতীয় অঙ্কে দেখাইয়াছেন। চিন্তামণির আলয়ের চতুঃপার্শ্বস্থিত উচ্চ প্রাচীরের এক অংশ হইতে সহসা বিল্বমঙ্গলের পতন-শব্দে থাকমণি চীৎকার করিয়া উঠিল। চিন্তামণিও সেই শব্দে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে বিল্বমঙ্গল মাটিতে পড়িয়া গোঁ-গোঁ শব্দ করিতেছেন। চিন্তামণির কাছ থেকে একটু জল চাহিয়া তাহা খাইয়া প্রকৃতিস্থ হইবার পর বিল্বমঙ্গলের প্রথম বাক্যস্ফূর্তি এইরূপ হইল :—'চিন্তামণি, তোমার গলাধরে আমি ঘরে যাই চল।' সেরূপ করা হইলে পচা মড়ার দুর্গন্ধে চিন্তামণির শরীর ও আলয় ভরিয়া উঠিল। চিন্তামণি সবদিক দেখিয়া তখন থাককে ডাকিয়া এইরূপ বলিল—'ওলো থাকি সর্বনাশ ক'রেছে। পচা মাস—পোকা থিক্-থিক্ কচ্ছে; বিছানামাদুর সব ভরে গেছে লো—সব ভরে গেছে! আমি মাথা-মুড় খুঁড়ে মরব।' এই ঘটনায় চিন্তামণি বিব্রত হইল বটে, কিন্তু তাহার মনে হঠাৎ এক সন্দেহ জন্মিল যে, এই দুর্যোগে বিল্বমঙ্গল নদীপার হইল কিরূপে? বাড়ীর তেলপানা পাঁচীল টপ্‌কালেই বা কি ক'রে? চিন্তামণির এবংবিধ কথা শুনিয়া বিল্বমঙ্গল সরলভাবেই উত্তর করিলেন—'কেন চিন্তামণি? তুমি যে দড়ী ফেলে রেখেছিলে চিন্তামণি!'

নাটকের রস বুঝাইবার জন্য এখানকার উভয়ের সংলাপটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হইল; খণ্ড-বিখণ্ডিত করিলে রসের অনুভূতিও খণ্ডিত হইবে। সংলাপটি এইরূপ :—"চিন্তা—'শুন্‌চিস্ লো থাকি, ঠাট্টা শুন্‌চিস্? আমি মানুষের জন্য দড়ী ফেলে রাখি।' বিল্ব—'সত্যি চিন্তামণি দড়ী ধ'রে উঠিচি'। চিন্তা—'থাকি, তুই আমার বয়সে বড়, তোর সাক্ষাতে বল্‌চি বাছা, এমন জলনে আর কখন পড়িনি। একটা পয়সা চাইলে সাতদিন ভাঁড়া-ভাঁড়ি, বাড়ী-ঘর-দোর সব বাঁধা পড়েছে, এখন মৈ বেয়ে পাঁচীল টপ্‌কে লোকের বাড়ীর ভিতর পড়া।' বিল্ব—'সত্যি চিন্তামণি, মৈ বেঁ উঠিনি, দড়ী দে উঠিচি। আর দাওয়ানকে আজ বলে এসেছি পরশু একশ টাকা এনে দেবে।' চিন্তা—'তবে রে মড়া। খেংরে বিষ ঝেড়ে দোব; তোর দড়ী দেখাবি চল্ ত।' বিল্ব—'চল চিন্তামণি, আমি দড়ী দেখাব, চল * *

এই গ্যাখ, দড়ী গ্যাখ।' চিন্তা—'কৈ দেখি (প্রাচীরের নিকটে গিয়া) ও গো, মাগো, এ যে অজাগর গোখ্‌রো সাপ।' বিল্ব—'অ্যাঁঃ—গোখ্‌রো সাপ?"

এই সব দেখিয়া-শুনিয়া চিন্তামণির মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। সে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বিল্বমঙ্গলের দিকে চাহিয়া বলিল—'এ কি! তুমি কাল সাপ ধরে উঠেছিলে? তুমি আমার মুখপানে চেয়ে রয়েচ যে?' বিল্ব—'তোমায় দেখ্‌ছি।' চিন্তা—'কি দেখ্‌ছ?' বিল্ব—'তুমি বড় সুন্দর!' চিন্তা—'তুমি নদী পেরুলে কি করে?' বিল্ব—'আমি নদীতে ঝাঁপ দিলুম,—ভাব্‌লুম সাঁত্‌রে পার হব, কিন্তু বড় তুফান, মাঝখানে এসে ঢেউ লেগে আমার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যেতে লাগ্‌ল; এমন সময় একখানা কাঠ ভেসে যাচ্ছিল—' চিন্তা—'তোমার গায়ে অত দুর্গন্ধ কিসের?' বিল্ব—'আমি ত তোমায় বলিচি, তা আমি বল্‌তে পারি নি।' চিন্তা—'সাপ্‌টা অনায়াসে ধর্‌লে!' বিল্ব—'চিন্তামণি, বোধ হয়, তুমি কখন প্রাণ দাও নি। তা'হলে বুঝ্‌তে—প্রাণ অতি তুচ্ছ, তা হলে জান্‌তে, সাপেতে দড়ীতে বিশেষ প্রভেদ নাই।' চিন্তা—'তুমি কি উন্মাদ?' বিল্ব—'যদি আজও না বুঝে থাক, নিশ্চয় তুমি প্রেমিকা নও, কিন্তু তুমি অতি সুন্দর!—অতি সুন্দর!' চিন্তা—'কি ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ক'রে দেখ্‌ছ?' বিল্ব—'দেখ্‌চি তোমার কথা সত্যি কি মিছে, আমি যে উন্মাদ এ পরিচয় কি তুমি আগে পাওনি? তুমি নিদ্রা যাও, আমি সমস্ত রাত্রি তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি; তুমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লে দশ দিক্‌ শূন্য দেখি; তোমার চক্ষে জল পড়্‌লে আমার বুকে শেল বাজে! এতেও কি বুঝ্‌তে পার নি, আমি উন্মাদ কি না? আমার সর্বস্ব ঋণে বিকিয়ে যাচ্চে, একবারও তার প্রতি চাইনি, নিন্দা অঙ্গের আভরণ করিচি। আজ কি তোমার বোধ হয়, এ কথা আমি সত্য বল্‌ছি? (সর্পের প্রতি দেখাইয়া) আমি উন্মাদ কি না, গ্যাখ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ। সত্য চিন্তামণি—আমি উন্মাদ; কিন্তু তুমি সুন্দর!—অতি সুন্দর!' চিন্তা—'আচ্ছা, বকচ কেন?' বিল্ব—'জানি না। অবশ্যই তুমি অতি সুন্দর, নৈলে এতদিন কার পূজা করিচি? তোমায় দেখ্‌চি, তুমি দেবী কি রাক্ষসী! যদি দেবী হ'তে আমার মনের ব্যথা বুঝতে, নিশ্চয় তুমি রাক্ষসী! কিন্তু অতি সুন্দর! অতি সুন্দর!' চিন্তা—'চল, তুমি কি কাঠ ধরে এলে আমি দেখব।' বিল্ব—'তোমার এখনও অবিশ্বাস? চল।"

নদীতীরে আসিয়া চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে জিজ্ঞাসা করিল—"কৈ, কাঠ কৈ? বিল্ব—ওই! চিন্তা—(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া শব দেখিয়া) 'এ কি! এ যে পচা মড়া, গ্যাখ, আমার অবিশ্বাস নাই। তুমি সত্যই উন্মাদ!—তোমার ঘৃণা নাই, লজ্জা নাই, ভয় নাই, তুমি দড়ী ব'লে সাপ ধর, কাঠ ব'লে পচা মড়া ধর! দেখ, আমি একদিন কথা শুনতে গিয়েছিলুম; আমার আজ কথাটি মনে পড়্‌ল। এই মন, আমি বেশ্যা, যদি আমায় না দিয়ে হরি পাদপদ্মে দিতে, তোমার কাজ হ'ত, তোমায় আর অধিক কি বলব? * * গ্যাখ, আমাদের সকলই ভান বোধ হয়; কিন্তু এ যদি ভান হয়, এমন ভান কিন্তু কখনও দেখি নি।"

চিন্তামণির উপরিউক্ত কথায় বিল্বমঙ্গলের চিন্তাধারা বদ্‌লাইয়া গেল। তিনি তখন ঐ পচা মড়ার কথা ভাবিতেছিলেন, এবং তাঁহার সেই স্বগত চিন্তার মধ্যেই বলিয়া উঠিলেন:—

"এই পরিণাম! এই নরদেহ—
জলে ভেসে যায়, ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল,
কিংবা চিতা-ভস্ম পবন উড়ায়!

এই নারী—এরও এই পরিণাম।
নশ্বর সংসারে তবে হায়! প্রাণ দিছি কারে?
কার তরে শবে করি আলিঙ্গন?
দারুণ বন্ধনে ছায়ায় বাঁধিয়া রাখি।

ক্রমে প্রাতঃকাল হইয়া আসিল, তাই বিল্বমঙ্গল বলিলেন—

'ওই উষা—ও' ও ছায়া।
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা এ সকলি।
হেরি আজ নিবিড় আঁধার;
আমি কার? কে আছে আমার?
কার তরে জীবনের উত্তাপ বহন?
শূন্য অভিপ্রায়ে ঘুরিতেছি নশ্বর—
নশ্বর ছায়া মাঝে।
কোথা কে আছ আমার? দেখা দাও,
যদি থাক কেহ, জুড়াই প্রাণের জ্বালা,
প্রাণ-মন করি সমর্পণ।
কদাকার ছায়ার সংসার;
হেথা কোথা প্রেমের আধার?
কোথায় সে প্রেমের পাথার—
মম প্রেমের প্রবাহ মিশে যায় হবে লয়?
কোথা আছ কে আমার, বল?
সাধ হয় দেখিতে তোমারে,—
আপনজন দেখি নাই জন্মাবধি!
কোথা যাব? * * কে দেখাবে আলো?
খুঁজে লব আমার যে জন।"

উপরিউক্ত মানসিক সংলাপটি সমুদয় নাটকটির মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। ইহা স্বতঃস্ফূর্ত—ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। এই সংলাপরূপ কীলকের (pivot) উপর নাটকের ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকলাপ (action) ঝুলিতেছিল। ঐটি এবং চিন্তামণির সহিত উপরিউক্ত কথোপকথনটি যেন ওজন করিয়া লেখা হইয়াছে। ইহার কোন শব্দ উঠাইয়া লইলে বা বদল করিলে উহার তেজ বা শক্তি (force) যেন হ্রাস বা শিথিল হইয়া যায়। বিল্বমঙ্গলের জীবনের গতি এই ধাক্কায় পরিবর্তিত হইয়া গেল। মানুষের সুপ্ত চৈতন্য কখন কি ভাবে, কাহার কি কথায় জাগ্রত হইয়া উঠে বুঝা দুঃসাধ্য।

নদীতীরে চিন্তামণিকে কাঠ দেখাইতে যাইয়া টহলদারের 'কি হায়! আর কেন মায়া? কাঞ্চন কায়া ত রবে না' শীর্ষক গানের ইঙ্গিতে বিল্বমঙ্গলের প্রথম নিদ্রাভঙ্গ হইল; তাঁহার জাগরণ শুরু হইল চিন্তামণির—'এই মন, আমি বেশ্যা, যদি আমায় না দিয়ে হরি-পাদপদ্মে দিতে, তোমার কাজ হ'ত'—কথার মধ্যগত আকর্ষণী শক্তির টানে; কিন্তু ঐ জাগরণ পাকা হইল তখনি, যখনি বিল্বমঙ্গলের মন প্রগ্ন

করিয়াছিল—"কে দেখাবে আলো ? খুঁজে লব আমার যে জন"—কথার উত্তরে। পাগলিনী ঠিক সেই মুহূর্তে বিল্বমঙ্গলের সম্মুখীন হইয়া নিম্নলিখিত গানের মধ্য দিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিল। সমুদয় গানখানি এইরূপ :—'আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে। যেখানে যাই সে যায় পাছে, আমায় বল্‌তে হয় না জোর ক'রে। মুখখানি সে যত্নে মুছায়, আমার মুখের পানে চায়, আমি হাস্‌লে হাসে, কাঁদ্‌লে কাঁদে, কত রাখে আদরে। আমি জান্‌তে এলেম তাই, কে বলে রে আপন রতন নাই ; সত্যি মিছে ছাখ, না কাছে, কচ্চে কথা সোহাগ-ভরে।' পাগলিনীর গানে বিল্বমঙ্গল যথার্থই অনুভব করিলেন :—"আছে—আমার কাছে-কাছে আছে ! নৈলে ঘোরতর তরঙ্গমধ্যে কে আমায় শব-দেহ ভেলা দিলে ? করাল কালসর্পের দংশন হ'তে কে আমায় বাঁচালে ? কে আমায় ব'লে দিলে, সংসারে আমার কেউ নাই ? কে আমায় এখন বল্‌ছে—'আমি তোর আছি।' কে তুমি ? তোমার কি রূপ ? অবশ্যই তুমি পরম সুন্দর'—এই কথাগুলি মনে করিতে করিতে বিল্বমঙ্গল গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। চুম্বকের লৌহ-আকর্ষণী শক্তির মতো বিল্বমঙ্গলের নিঃস্বার্থ-প্রণয়ের টানে চিন্তামণির মনেরও পরিবর্তন দেখা দিল। দ্বিতীয় অঙ্কের আবেষ্টনীর মধ্যে এই সকল ঘটিয়াছিল।

বিল্বমঙ্গলের বেশ্যায় ন্যস্ত প্রেমের বিবর্তন তৃতীয় অঙ্ক হইতে আরব্ধ হইল। মনোময় কোষের সাধকের প্রকৃতি এই যে, ভাল না বাসিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। তাঁহার ভালবাসা অহৈতুক, প্রতিদানের দিকে তাঁহার লক্ষ্য থাকে না—ভালবাসিয়াই তাঁহার আনন্দ। প্রাণময় কোষ হইতে উন্নীত হইয়া বিল্বমঙ্গলের এই ভাব জাগিয়াছিল। চিন্তামণি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইবার পর নশ্বর উপাস্তের বেদনাময় পরিণতি দেখিয়া বিল্বমঙ্গল অবিনশ্বর উপাস্তের সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন। সাধনরাজ্যে আন্তরিকতাই সিদ্ধিলাভের সোপান। বিশ্বপ্রাণ ব্যষ্টিপ্রাণের বেদনা বুঝিয়া নিমিত্তগুরুরূপে দেখা দিয়া ইষ্ট-লাভের উপায় বলিয়া দিলেন। সোমগিরির নির্দেশমত বিল্বমঙ্গল তাঁহার প্রেম শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণপূর্বক সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সাকার উপাসনায় প্রতীকের আবশ্যক করে, নতুবা কাহার ধ্যানে চঞ্চল মনকে তিনি বাঁধিয়া রাখিবেন। সোমগিরির উপদেশে চিত্রে অঙ্কিত রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির ধ্যানে বিল্বমঙ্গল আত্মনিয়োগ করিলেন। পূর্ব সংস্কার কিন্তু এখানে সাধনার অন্তরায় হইল। অন্তরিন্দ্রিয় বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যেই বিষয়ভোগ করিয়া থাকে। বিল্বমঙ্গলের মনরূপ অন্তরিন্দ্রিয় এ যাবৎ চক্ষুরূপ বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপভোগ করিয়া আসিয়াছে, এবং তাহাই আজ তাঁহার সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। তাই, পথিমধ্যে বণিকের রূপবতী স্ত্রী অহল্যাকে দেখিয়া বিল্বমঙ্গলের মন পুনরায় রূপতৃষ্ণায় পাগল হইয়া উঠিল। তিনি যে পরস্ত্রী এ বিচার করিবার শক্তি তাঁহার আর রহিল না। বিল্বমঙ্গলের চৈতন্য যদিও এখন আর সুপ্ত নাই, তথাপি নূতন জাগরণ বলিয়া সংস্কার-বশে মধ্যে-মধ্যে মোহাচ্ছন্ন হইতেছিল, তাই বহিরিন্দ্রিয় চক্ষুকে উদ্দেশ করিয়া তিনি এইরূপ বলিয়াছেন :—

"আরে রে নয়ন।
মন্মথের তুই রে প্রধান সেনাপতি।
ছদ্মবেশে আপন হইয়ে,
শত্রু ডেকে আন ঘরে।
সুখ আশে সতত বিকল,
মূঢ় মন নাহি বুঝে ছল,

সাপিনীরে হৃদে দেয় স্থান—ঈশ্বরের স্থান যথা।
সে করে দংশন,
তবু আঁখি আনে প্রলোভন,
জ্বালায় ব্যাকুল—
পোড়া প্রাণ পুনঃ তারে দেয় কোল ;
শত লাঞ্ছনায় ধিক্কার না হয়,
তবু ছলে আঁখি বলে,
'জুড়াবার এই ধন!' ধন্য সংস্কার!
মন পশু তুমি। তোমায় কি দিব দোষ?
চল মন যথা আঁখি নিয়ে যায়।"

নূতন সাধক পূর্ব-সংস্কারে অভিভূত হইয়া সংযমের সীমা হারাইয়া অহল্যার পশ্চাৎবর্তী হইয়া বণিক-ভবনে উপনীত হইলেন।

নাটককার এই অঙ্কেই নাটকের পরাকাষ্ঠা (Climax) আনিয়াছেন। যে পরিস্থিতির (situation) ভিতর দিয়া ইহা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা বিস্ময়কর ও অপূর্ব। সাধকের সম-পর্যায়ে বা স্তরে আনিবার জন্য এই দৃশ্যের নাটকীয় পরিবেশটিকে উচ্চ-অধিকারী নর-নারীতে পূর্ণ রাখা হইয়াছিল কারণ সাধক যে স্তরের লোক তাঁহার সহিত ক্রিয়মান বণিক বা তাঁহার পত্নীও সেই এক-স্তরের লোক হওয়া চাই, সাধনরাজ্যের ইহাই নিয়ম। শ্রীভগবানের সান্নিধ্যলাভ করিতে হইলে সকলকেই চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

ধর্মিষ্ঠ বণিক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার কালে গৃহে অতিথি ফিরাইব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সস্ত্রীক গৃহস্থাশ্রম আরম্ভ করিয়াছিলেন। আজ তাঁহাদের চরম পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইয়া-ছিল। বিল্বমঙ্গল যে স্তরের লোক তাহাতে কপটতা নাই, তাই তিনি সরলভাবে তাঁহার মনোভিলাষ গৃহস্বামীর কাছে ব্যক্ত করিলেন। স্বামীর কাছে উপনীত হইয়া তাঁহারই পত্নীর উপভোগবাসনা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে আর আছে কি না জানি না। নাটককার শুধু ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ভাব ও ভাষার দিক দিয়া তাহাতে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। বিল্বমঙ্গল বণিককে বিনাড়ম্বরে এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

"নারী তব সুবেশা সুন্দরী ;—
বাপীকূলে হেরি তার রূপের মাধুরী,
আঁখির ছলনে, পূর্ব-সংস্কারে,
মুগ্ধ মম পাপ মন।
পশু-মন কোন মতে না মানে বারণ—
সদা উচাটন, দরশন কতক্ষণে পাবে পুনঃ,
সেই আশে আছি বসে তব বাসে।
ইচ্ছা যদি হয় তব অতিথি-সৎকার—
কর অঙ্গীকার, একা মম সনে—

দিবে আনি পত্নীরে তোমার,
অলঙ্কারে ভূষিতা সুন্দরী,
আজি নিশা হবে মম আজ্ঞাকারী।
পাপ ব্যক্ত করিনু তোমারে,
যেবা হয় কর মতিমান্।"

পূর্বে বলা হইয়াছে যে উচ্চ অধিকারসম্পন্ন আবেষ্টনীর মধ্যে নাটকের চরম পরিণতি ঘটিয়াছিল। ধার্মিক বণিক অতিথির মুখে যাহা অশ্রাব্য তাহা শুনিয়া বিচলিত হইলেন না, কারণ দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যে বিল্বমঙ্গলের আগমনকে দেবতার ছলনা ভাবিয়া তদনুরূপ মনোভাব লইয়া পত্নীসকাশে তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

"* * ধন্য তব রূপের মাধুরী,—
নারায়ণ-সেবা করিব এ রূপের ছটায়।
শুন প্রিয়ে, * * ধর্ম্ম সার এ ছার জীবনে,
পরীক্ষার স্থল এ সংসার।
অতি যত্নে ধর্ম্ম রক্ষা হয়। * *
দেবের কৃপায়,
অনায়াসে এতদিন গেছে চলে,
আজি দেবের ইচ্ছায় পরীক্ষার দিন, সতি—
হের, দীন-হীন মলিন বদন,
দ্বারে আসি করে আকিঞ্চন,
আজি রাত্রে পতি হবে তব।
শুন, সুলোচনা অতি আশ্চর্য ঘটনা—
পতির সম্মুখে যাচে আসি পত্নী তার!
ধর্ম-মর্ম বুঝেছ কি সতি?
গৃহিণী আমার, কর অতিথি সৎকার!"

সতীত্বের অভিমান সহসা জাগিয়া উঠিয়া অহল্যাকে অসম্মত করাইল। বণিক তখন ভিন্ন যুক্তি দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইলেন :—

" * * তুমি হে আমার—
মম ধন বিতরণে কেন হও বাদী?
সত্য সার, সত্য বিনা কিছু নাহি আর।
* * ধর্ম উপার্জনে তোমারে করিব দান।
পুনঃ কহি পরীক্ষার দিন;
আগে ছিল ভাবিতে উচিত,
যবে উচ্চাশয় ভাবি আপনায়,
দুই জনে গোপনে করিনু পণ—

অতিথি না ফিরিবে আবাসে,
আসিবে যে আশে, পুরাইব সে বাসনা,
ধর্ম মাত্র সাক্ষী তার।
* * আজি মম পরীক্ষার দিন,
পরীক্ষা করিব প্রেম তব,
সত্যে কর পতিরে উদ্ধার,
হের ধর্ম সাক্ষী এখনও– তখনও।”

পতিগতপ্রাণা অহল্যা অগত্যা পতির উপরেই শুভাশুভের ভারার্পণ করিয়া বিল্বমঙ্গলকে পালঙ্কের উপর বসিতে বলিলেন। অহল্যার সরল আহ্বানে মনোময়-কোষের সাধক বিল্বমঙ্গলের বিজ্ঞানময় কোষের দ্বার খুলিবার প্রয়োজন হওয়ায় ঐ সাধকের প্রাণে প্রবল তরঙ্গাভিঘাত উপস্থিত হইল, তাই বিল্বমঙ্গল তখন অহল্যাকে ধীরভাবে বলিলেন—'না, আমি তোমায় দেখব—এই খান থেকেই দেখ্‌ব।' সাধনার এই অকস্মাৎ বিবর্তনে বিল্বমঙ্গল মনে মনে নিজ জীবন পর্যালোচনা করিয়া বুঝিলেন যে নয়নই প্রতিবারে তাঁহাকে বিপথগামী করিয়াছে, তাই নিজ মনকে এইরূপে বুঝাইতে লাগিলেন :—

“মন তুমি আঁখির গরব কর ?
নিত্য ডর পাছে যায় এ রতন,
দ্যাখ্ তোর আঁখির আচার।
সেই মাংস-অস্থি কাষ্ঠ ভ্রমে,
প্রাণের তাড়নে দিলে যারে আলিঙ্গন—
সেই মত গলিত হইবে বাহ্যিক এ লাবণ্যের আবরণ—
সেই রত্ন ভাব তুমি সংসারের সার ?
ভাব মন বৃথা জন্ম তার,
এ রতন বঞ্চিত যে জন ?
বুঝ মন, নয়ন তোমার কিছু নাহি হেরে,
অসার যে বস্তু,
তাহে কহে নিত্য ধন।
এর ছলে কতদিন রবে ভুলে ?”

এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি অহল্যার অলংকার থেকে দুইটা কাঁটা চাহিয়া লইলেন, এবং তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া স্বামীর নিকট যাইতে অনুমতি দিলেন। ইত্যবসরে বিল্বমঙ্গল মনকে উদ্দেশ করিয়া শেষবার বলিলেন—

“মন, এখন'কি আঁখির মমতা কর ?
শত্রু তোর শীঘ্র কর বধ।
দিব আমি উত্তম নয়ন,
যেই আঁখি ব্রজের গোপালে
'আমার' বলিয়ে তুলে নেবে কোলে—

অন্তে সব হেরিবে অসার।
যাও যাও নশ্বর নয়ন।”

চর্মচক্ষুর বিনিময়ে জ্ঞানচক্ষু পাইবার আশায় বিজ্ঞানময় কোষের সাধক বিল্বমঙ্গল ঐ কাঁটা দ্বারা নিজ চক্ষু বিদ্ধ করিলেন, নাটকও সঙ্গে সঙ্গে চরম পরিণতি লাভ করিল।

মূল ক্রিয়ার চরম পরিণতি লাভের পর নাটকে যে ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে, তাহা অবশিষ্ট ক্রিয়ার স্বভাব-সঙ্গত পরিণতি (natural sequence) সম্পাদনার জন্য প্রয়োজন হইয়া থাকে। চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে নাটককার তাহাই করিয়াছেন। চিন্তামণির জীবন নাশের জন্য গুপ্তভাবে সংগৃহীত বিষে থাক ও সাধক নিজেদের অপমৃত্যু ঘটাইল। পরশমণি সংস্পর্শে লৌহ যেমন কাঞ্চনমূর্তি ধারণ করে বিল্বমঙ্গলের সংসর্গে আসিয়া চিন্তামণিও সেইরূপ প্রথমে বৈরাগ্য ও তৎপরে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিল। ভিক্ষুক অসৎ-সংসর্গে পড়িয়া পাপকার্যে রত থাকিলেও সাধকের মতো অকৃতজ্ঞ ও জিঘাংসা-পরায়ণ ছিল না, তাই পুনরায় সৎসঙ্গে আসিয়া লোভ পরিত্যাগপূর্বক চৌর্যবৃত্তি ছাড়িয়া জীবনের শেষভাগে ‘ননীচোরা’ লাভ করিতে পারিয়াছিল। সত্যকথনশীলতার জন্য ভিক্ষুকের পরাগতিলাভ ও আত্মগোপনের জন্য সাধকের অপমৃত্যু-লাভ নাটককার উভয়ই দেখাইয়াছেন।

অহল্যা-বণিক চরিত্রের দ্বারা বিল্বমঙ্গল এই শিক্ষালাভ করিলেন যে, সাধনপথে নিরঙ্কুশ না হইলে গত্যন্তর নাই। চিন্তামণি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিল্বমঙ্গল প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে, চিন্তামনি হয়তো অন্যগতপ্রাণা তাই তিনি ভিক্ষুককে পয়সা দিয়া তাহার প্রহরার কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গলের মন থেকে তখনও ঐ অঙ্কুশটুকু যায় নাই। বণিক যখন নিজ পত্নীকে বিল্বমঙ্গলের উপভোগের জন্য নিরঙ্কুশভাবে ছাড়িয়া দিলেন, তখনই বিল্বমঙ্গলের বিজ্ঞানময় কোষের দ্বার সম্পূর্ণভাবে খুলিয়া গিয়া তাঁহার জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত করিল, এবং ক্রমশঃ তিনি দগ্ধস্বর্ণের মতো পরিশুদ্ধ হইয়া সংস্কারমুক্ত অবস্থায় ইষ্টলাভ করিয়াছিলেন। ভক্তমালগ্রন্থে বিল্বমঙ্গলকে মহাপুরুষ বলা হইয়াছে, নাটককার সকল দিক দিয়া তাঁহাকে সেই পদে উন্নীত করিলেন। পার্থিব প্রণয় বৈরাগ্যের পথে বিবর্তন পাইয়া কিরূপে অপার্থিব প্রেম-ভক্তিতে রূপান্তরিত হইল, তাহা আর গুপ্ত রহিল না।

নাটকে আছে বিল্বমঙ্গল গুরূপদেশে বৃন্দাবনে যাইয়া ইষ্ট লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ তত্ত্বেরও একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। ‘সাধন-সমরে’ আছে—বিজ্ঞানময় কোষে অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বে পরমাত্মা বিশেষভাবে অনুভূতিযোগ্য হয়। সাধক দেহাদি হইতে আত্মবোধ অপসৃত করিয়া এই ধী-ক্ষেত্রে আরোহণ করেন এবং পরমাত্মা জীবের প্রতি স্নেহবশেই যেন বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবতরণ করেন। এই স্থানেই জীব ও পরমাত্মার মিলন সংঘটিত হয়। ইহাই বৈষ্ণবীয় বৃন্দাবন ধাম—এইখানেই রাসলীলা হয়। রসস্বরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়শক্তিরূপিণী গোপীগণ পরিবেষ্টিতা আরাধিকা জীব-প্রকৃতির সহিত এই স্থানেই রমণ করেন। গোপী বা ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহ যখন আত্মার মহাকর্ষণে বিষয়রূপ কুল পরিত্যাগ করিয়া তীব্রবেগে বংশীধ্বনির অনুসরণে কৃষ্ণান্বেষণে পরিধাবিত হয়, রাধিকা—‘জীব আমি’ যখন সম্পূর্ণ-ভাবে কৃষ্ণপ্রেমে পরমাত্ম মোহে মুগ্ধ হইয়া এই বুদ্ধিময় ক্ষেত্ররূপ বৃন্দাবনে উপনীত হয়, তখনই আত্মমিলনের মহা সন্ধিক্ষণ। এইখানে সকলই আছে, কিন্তু বোধ দ্বারা তাহা গঠিত অর্থাৎ চিন্ময়। জড়ভাব এখানে তিরোহিত। বণিক ও অহল্যা তাঁহাদের ধর্মরক্ষার পুরস্কার-স্বরূপ এই ক্ষেত্রেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিলেন

পাগলিনী চরিত্রটি অপূর্ব, ইহা গিরিশচন্দ্রের মৌলিক সৃষ্টি, ভক্তমাল গ্রন্থে ইহার অস্তিত্ব নাই। সোমগিরি খাঁটি সন্ন্যাসী, কোনরূপ সংস্কারের তিনি বশীভূত ছিলেন না। পরাবিজ্ঞানের (theology) অনুরাগী ব্যক্তিরা এই নাটকের মধ্যে ঐশীতত্ত্ব ও মানুষের সহিত ইহার মনোবিকলনকারী সম্বন্ধের বহু পরিচয় পাইয়াছেন। ভক্তিমার্গের সাধকেরা ইহার অন্তর্গত ভাবের খেলায় মুগ্ধ হইয়া যান।

শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শে একদিন শ্রীবৃন্দাবনধাম চৈতন্যময় হইয়া উঠিয়াছিল, তাই বৈষ্ণবেরা আজও নাটককার-বিরচিত—'জয় বৃন্দাবন, জয় নরলীলা' শীর্ষক গানটি গাহিয়া নিজেদের সুপ্ত চৈতন্যকে জাগ্রত করিয়া তুলেন। ইহার সংগীত বিভাগ অপরাজেয়। দুই চারিটি গানের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে, বাকিগুলি যথা—

১। 'ছাড়ি যদি দাগাবাজি, কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারি',
২। 'যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে',
৩। 'আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব',
৪। 'আমায় বড় দেয় দাগা',
৫। 'সাধে কি গো শ্মশানবাসিনী',
৬। 'ওমা কেমন মা কে জানে,'
৭। 'ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে'

সংগীতরাজ্যে স্থায়ী আসন পাতিয়া রাখিয়াছে; স্থানাভাবে ঐগুলির প্রথম ছত্র মাত্র উদ্ধৃত হইল। মহাকবি গিরিশচন্দ্র এই নাটকের অবয়বের ভিতর দিয়া ঘাত-প্রতিঘাতরূপ অপূর্ব নাটকীয় কৌশলে প্রার্থিতকে প্রেয়বস্তু ও দর্শক বা পাঠককে নাট্য-সুষমা যুগপৎ দান করিয়াছেন। নাটকখানি অধ্যাত্ম রাজ্যে মিলনাত্মক। ভবিষ্যৎ সমালোচকরা নূতন করিয়া ইহার সংজ্ঞা দিবেন।

রূপ-সনাতন নাটক

রূপ সনাতন উচ্চভাবমূলক দৃশ্যকাব্য-বিভাগের পঞ্চম সংখ্যা। 'চৈতন্যলীলা'য় ভাবসমুদ্র প্রথম মন্থিত হইয়াছিল এবং সেই মন্থনের ফলে যে তরঙ্গ-বিক্ষোভ জন্মিয়াছিল, তাহারই এক একটি লহরী লইয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার এক একখানি উচ্চভাবমূলক নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, এখানি তাহারই পঞ্চম লহরী। নাট্যসাহিত্যের মন্ত্রদীক্ষা প্রকৃত প্রস্তাবে গিরিশচন্দ্রের হাতেই হইয়াছিল। ভারতীয়, তথা বাঙ্গালার সাধনার কৃষ্টি যাহা এতকাল তাহারই আকাশ, বাতাস ও মৃত্তিকার সহিত বিজড়িত ছিল, জাতীয় নাটকের স্রষ্টা গিরিশচন্দ্রের হাতে তাহার এই নূতন-সংস্কার লাভ হইল। সুতরাং গিরিশচন্দ্র যে কেবল বাঙ্গালার প্রকাশ্য জাতীয় রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তাহা নহেন, নাট্যসাহিত্যের গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতম ব্যক্তি তাঁহার পূর্বে আর কেহই ছিলেন না, ইহা অত্যুক্তি নহে, বাস্তব ঘটনা।

এই নাটকখানি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে মে তারিখে বীডন স্ট্রীটস্থ তদানীন্তন স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি সামাজিক সমস্যামূলক হইয়াও এক হিসাবে ঐতিহাসিক, কারণ রূপ-সনাতনের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধিও আছে। চৈতন্য-ভাগবত বা চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে ইহার গল্পাংশ গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু সনাতনের ভাবোন্মাদনাই নাটককার চিত্রিত করিয়াছেন, তজ্জন্য ইহাকে উচ্চভাবমূলক পর্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইল। নাটক হিসাবে ইহার সফলতা নাই। ইহার যাবতীয়

ক্রিয়া (action) যেন এক দুর্জ্ঞেয় দৈবশক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। মায়িক দৃষ্টিতে তাহা অস্বাভাবিক। সনাতনের সংসার, তাঁহার প্রতিপক্ষের পরিবারবর্গ, তাঁহার কর্মস্থানের কর্মচারিবৃন্দ সকলেই যেন চৈতন্যদেবের অজ্ঞাত শক্তিপ্রভাবে অকস্মাৎ চৈতন্য গোষ্ঠীতে পরিণত হইয়া গেল। বৈষ্ণব শাস্ত্রের 'ঘৃণা-লজ্জা-ভয়, তিন থাকতে নয়'—বৈষ্ণবীয় সাধনার এই প্রাথমিক অন্তরায়গুলি নাটকীয় কোন-কোন চরিত্র কিরূপ অভাবনীয় উপায়ে অতিক্রম করিয়াছিল, সে খবর নাটকের দর্শক বা পাঠক সমাজ পাইয়াছেন। পাত্র-পাত্রীর অধিকার ভেদে এ সকল সম্ভবপর হইলেও নাট্যক্ষেত্রগত চরিত্র-নিচয়ের মধ্যে ঈশান ও শ্রীকান্ত ব্যতীত আর সকলের একরূপ গতিলাভ করা যেন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। স্থানে-স্থানে নাটকীয় পরিবেশ (situation) বেশ চমকপ্রদ হইলেও ইহার প্রভাব (effect) নাটকীয় ভাবে (dramatic) সম্পাদিত হয় নাই। নাটকখানি জনপ্রিয় না হইবার কারণ তাহাই। নাটককার হিসাবে গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় পরাজয়ের কথা এই নাটকে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

অধ্যাত্মরাজ্যের কতকগুলি রহস্য নাটককার এই নাটকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি রহস্যের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, অপরগুলি যথাক্রম লিখিত হইল :—(১) সনাতন তাঁহার কুলবধূদের আচরণ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—'এরাই ধন্য! যে গৌরাঙ্গকে নিয়ে সংসারী, তারই যথার্থ সংসার।' (২) সনাতন ও বল্লভের সংলাপের মধ্যে রূপ-গোস্বামীর বিষয়-তৃষ্ণার অভিমান-সম্বন্ধে বল্লভ এইরূপ বলিয়াছেন—'তাঁর মিনতি এই—তাঁর এখনও বিষয়-অভিমান আছে, সেই ভক্তিপথের কণ্টক সমস্ত সম্পত্তি যেন দীন লোককে দান করা হয়।' (৩) বৈরাগ্যকাতর সনাতন গোস্বামীর কাতরতায় বল্লভ উপদেশচ্ছলে এইরূপ বলিয়াছেন :—'বলের প্রয়োজন নাই স্রোতের তৃণ হউন, গৌরাঙ্গ যখন আকর্ষণ করবেন, তখন সংকল্প-বিকল্প রোহিত হবে, ঘরে যাব কি না যাব, একথা থাকবে না,—ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, উদ্বিগ্ন হবেন না।' (৪) জীবন-নামক লোকবিশেষের হাতে দেওয়া রূপগোস্বামীর একখানি পত্র সনাতনের মনে বৈরাগ্য আনিবার সহায়তা করিয়াছিল। সে পত্রটিতে এইরূপ লেখা ছিল :—'যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী ? রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা—ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃস্থিরং, ন সদিদং জগদিত্যবধারয়'—অর্থাৎ যদুপতির মথুরাপুরী কোথায় গেল, রঘুপতির অযোধ্যাপুরীর দশাও তদবস্থ—এই সব কথা মনে মনে বিচারপূর্বক নিজমন প্রস্তুত করিবে, এই জগতের অস্তিত্ব নাই, এটি জানিও, মায়ার আশ্রয়ে ঐরূপ বোধ হইয়া থাকে। (৫) সুবুদ্ধি ও করুণার কথোপকথনের মধ্যে দৃঢ়বিশ্বাসী করুণা সুবুদ্ধিকে এইরূপ বলিয়াছেন :—'তুমিও গৌরাঙ্গ নাম মুখে এনেছ আজ হ'তে তুমি বৈষ্ণব, দেখ অমৃতকুণ্ডেতে ইচ্ছায় নাব—আর কেউ ঠেলেই ফেলে দিক্, সে অমর হবে তার আর সন্দেহ নাই; গৌরাঙ্গ-নাম ভ্রান্তে-অভ্রান্তে, অনিচ্ছায়-ইচ্ছায়, ভক্তিতে বা ব্যঙ্গে যে করবে, সে ধন্য।' (৬) সনাতন ও ছদ্মবেশী অলকার সংলাপের মধ্যে সনাতন গোস্বামী এইরূপ বলিয়াছেন :—

> "ঈশ্বর কৃপায় হয় বৈরাগ্য সঞ্চার,
> নহে মোহ-ডোর ছিঁড়িতে কে পারে ?
> কর্তব্যের কর অভিমান ?—
> স্থির মনে চিন্ত মতিমান্—
> হয় কিবা নয় ইহা মোহের ছলনা।

'আমার এ নারী'—এই হেতু যত্ন তার ;
'আমি' দেখ প্রধান এ স্থলে।
আত্ম-পর মোহের বিচার ;
'আমি', 'আমি' অভিমান– কর্ত্তব্যের হেতু।
* * আছে যার 'আমি' অভিমান,
আসক্তিতে বদ্ধ সেই জন ;
মোহ-অন্ধকার নাহি ঘুচে তার। * *
ভুলি নিরঞ্জন অভিমানী মন
অহঙ্কারে ভাবে—করি কর্ত্তব্যসাধন ;
হরিপ্রেম সার, কিছু নাহি আর।"

(৭) নবাব ও সনাতনের মধ্যে কথোপকথনের একাংশ দেওয়া হইল। নবাব সনাতনকে ভক্তির প্রাবল্যে ক্রন্দনশীল দেখিয়া বলিলেন :—"এ-ক্যা, তুম আওরাৎ হো ?" সনাতন তদুত্তরে বলিয়াছিলেন :—

"কে রাখে পুরুষ-অভিমান ?
একমাত্র পুরুষ প্রধান,
সকলে প্রকৃতি তাঁর ;
সবে জড়—সেই ত চেতন—
সেই সর্ব্বভূতে জীবের জীবন।
মোহ-তমো মাঝে সেই মাত্র জ্যোতির্ম্ময়,
হর্ত্তা-কর্ত্তা সেই জগৎপতি।"

ভক্তিশাস্ত্রের এই সকল চরম বাণীর মধ্যে 'নিমাই-সন্ন্যাস' নাটকের ভাব এ নাটকেও দেখা গিয়াছে। কিন্তু ইহা সেই একই কথার পুনরুক্তি নহে, কারণ 'চৈতন্যলীলা', 'নিমাইসন্ন্যাস' ও 'রূপসনাতন' নাটকত্রয় চৈতন্যরূপী একই নায়কের লীলাক্ষেত্র, সুতরাং ভাবের সামঞ্জস্য না থাকাই দূষ্য।

ভাবরাজ্যে যাহা সম্ভবপর, অ-ভাবে থাকিলে তাহা হাস্যকর হইয়া উঠে। চিত্রের হাসি বা ইঙ্গিত নিত্য দর্শনীয় ঘটনা নহে বলিয়া জন-সাধারণের কাছে তাহা অস্বাভাবিক মনে হয়। নাটককার কিন্তু, মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন, তাই তিনি ঐরূপ লিখিতে পারিয়াছিলেন। অলকার চেষ্টায় সনাতন কোন মতেই নবাবের কারাগার হইতে মুক্ত হইতে চাহেন নাই। নবাবের কর্মচারী রামদিন তখন 'বন্দীর স্বাধীন-ইচ্ছা নাই' সনাতনকে এইরূপ বুঝাইলে সনাতন বলিয়াছিলেন :—"যতদিন এ পাঞ্চভৌতিক দেহপিঞ্জরে বদ্ধ, ততদিন সকলেরই অধীন, কিন্তু ইচ্ছা আমার গৌরাঙ্গের রাঙা পায়ে লিপ্ত।" ছদ্মবেশী ঈশানের প্ররোচনায় কারাধ্যক্ষ রামদিন কর্তৃক সনাতনের শৃঙ্খল উন্মোচিত হইল, এবং তাহাদের দ্বারা গৌরাঙ্গের নাম-গান সৃষ্ট এক সম্মোহকর আবহাওয়ার মধ্য দিয়া সনাতনকে কারামুক্ত করা হইয়াছিল।

চৈতন্যদেব সনাতনকে কাশীধামে রূপগোস্বামীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে দিবার অভিলাষী ছিলেন না, কারণ তাহাতে সনাতনের মায়িক মনোভাব পুনরায় দেখা দিতে পারে, তজ্জন্য তিনি অনুপমকে ত্বরায় রূপগোস্বামীর সহিত প্রেমের রাজ্য বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। সনাতনও পরিশেষে

চৈতন্যদেবের আদেশে রূপের সহিত বৃন্দাবন ধামেই সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কারণ সেটি প্রেমের রাজ্য, মায়ার অধিকার সেখানে নাই। সনাতন অবশেষে সেইখানেই মদনমোহনের কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। পঞ্চকৌষিক জীবাত্মা মনের সাহায্যে যখন সাধনমার্গের উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে থাকে তখন প্রাণময় কোষের উপরিতল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং অবশেষে আনন্দময় কোষের মধ্যে ডুবিয়া যায়, তখন জীবাত্মার পৃথক অস্তিত্ববোধ আর থাকে না। বৈষ্ণবীয় ভক্তিশাস্ত্রের মতে এরূপভাবে বিচরণ করিবার ক্ষমতা অল্পসংখ্যক পাত্র-পাত্রীর মতোই নাটকের অল্পসংখ্যক দর্শক বা পাঠকের হইয়া থাকে।

নাটকের মতো 'রূপসনাতনের' সংগীতবিভাগেরও আকর্ষণী-শক্তি ছিল না। মাত্র 'যখন আস্‌বে তুফান ভাসিয়ে নে যাবে। সে যে অকূল পাথার নাইক সাঁতার, কূল-কিনারা কে পাবে?'—শীর্ষক গানখানি কিছু সাড়া তুলিয়াছিল। ভাবরাজ্যে নাটকখানি মিলনাত্মক।

পূর্ণচন্দ্র নাটক

পূর্ণচন্দ্র নাটকখানি এই বিভাগের ষষ্ঠ সংখ্যা। এখানি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ তারিখে গোপাল লাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এই থিয়েটার বীডন্‌স্ট্রীটে ছিল, এখন তাহার চিহ্ন পর্যন্ত নাই, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ সেই স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। রাজা রাসালুর গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার এই দৃশ্যকাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন, এখানি জনপ্রিয় নাটকের অন্যতম।

"ঈশ্বর-প্রত্যয় একমাত্র আশ্রয় সংসারে।
* * অতি শঠ কপট সংশয়,
কেবা জানে কবে আসে কি বা বেশে?
সুখ-দুঃখ উভয় সহায় তার। * *
যদি কভু হয় মতিভ্রম * *
যোগীবরে ক'রোরে স্মরণ।
অন্তর্যামী জেনেছি নিশ্চয়, কৃপা হ'বে তাঁর—
সংশয় হইবে নাশ। * *
মঙ্গল-আলয় দুঃখ দেন নয়ে তার শিক্ষার কারণ;
মূঢ় মন না বুঝে সে অপার করুণা,
ভাবে—
কেন বিনা দোষে এ হেন যন্ত্রণা?"

গুরু উপদেশ-লব্ধ উপরিউক্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া পাঞ্জাব প্রদেশের শতদ্রু নদীতীরস্থ শিয়ালকোট রাজ্যের রাণী ইচ্ছা ঐ গুরু-সন্ন্যাসীর আশীর্বাদে প্রাপ্ত তাঁহার একমাত্র পুত্র পূর্ণচন্দ্রকে ঐ ভাবেই মানুষ ও শিক্ষিত করিয়াছিলেন। ঐ শতদ্রুর অপর পারে লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়িকা, অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বরী মৃত রাজার একমাত্র দুহিতা কুমারী সুন্দরা মনোমধ্যে নিম্নলিখিত রূপ একটা স্বামীর আদর্শ স্থাপন করিয়া অভিলষিত বরের আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন:—"আমি যার দাসী হব, সে

কি স্ত্রীলোকের কথায় গোঁপ মুড়িয়ে যায়? আমার যিনি পতি, বীর-ধীর-প্রশান্ত তাঁর স্বভাব। যে আমার পতি, আমি দেখলেই জানতে পারব, তিনি এলেই তাঁর চরণে আমি অবনত হব। পতির জন্যে আমি যা করেছি, বোধ করি কোন নারী তা' করে নাই। দেখলেম পৃথিবীতে পুরুষ নাই। যে বিদ্যা-গর্বে গর্বিত, আমার সঙ্গে বিচারে সে মূর্খের ন্যায় নির্বাক হ'ল; যে ধনগর্বে গর্বিত, আমার ধনাগার দেখে চমকিত হ'ল; রূপ-গর্বিত—আমার রূপ দর্শনে দাস হ'য়েছে। পুরুষের প্রধান গর্ব তরবারি, রণস্থলে বিপক্ষরাজ আমার পতাকা দর্শনে তরবারি ত্যাগ করেছে। তবে, তুমি আমায় কারে বরমাল্য দিতে বল, কার দাসী হ'তে ব'ল?"—স্বামীর যোগ্যতা সম্বন্ধে সুন্দরা তাহার সখী সারীর কাছে একদিন এই মন্তব্যটি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই দৃশ্যকাব্যখানি উপরি-লিখিত গুণসম্পন্ন নায়ক ও নায়িকার ক্রিয়া কলাপের (action) ক্ষেত্র। সন্ন্যাসীর বর-প্রসাদে লব্ধ-জীবন পূর্ণচন্দ্র বাল্যসীমা অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পদার্পণ করিলে রাজকার্য শিক্ষার জন্য তিনি তাঁহার পিতৃ-সন্নিধানে নীত হইয়াছিলেন। পূর্ণের অনবদ্য রূপ দেখিয়া তাঁহার বিমাতা, বৃদ্ধ শালিবান রাজার দ্বিতীয় পক্ষের নবীনা-যুবতী-মহিষী, লুনা, সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া কামাসক্তা হইয়া সপত্নীপুত্রের কাছে কু-প্রস্তাব করিয়াছিল।

গর্ভধারিণী মাতার পবিত্র স্নেহনীড় হইতে পিতার স্নেহময় ক্রোড়ে বসিবার জন্য সবেমাত্র-আগত পূর্ণচন্দ্র বিমাতার ঐরূপ ব্যবহারে এরূপ মর্ম-পীড়িত হইলেন যে পূর্বের আদর্শমণ্ডিত শিক্ষার প্রভাবে তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন:—

"এই কি প্রথম শিক্ষা পশিয়া সংসারে!
হেন ছার কারাগারে কেন রহে নর,
কেন ডরে বিসর্জন দিতে কলেবরে?"

নাট্যকার এই দৃশ্যমধ্যে বিমাতা ও সপত্নীপুত্রের সংলাপটি অতি যত্নের সহিত গ্রথিত করিয়াছেন। একদিকে কামুকার লালসাময়ী বাণী, অপর দিকে পিতৃস্নেহ লাভেচ্ছায় সবেমাত্র সংসারে প্রবিষ্ট পুত্রের সংসারাশ্রমের প্রতি প্রথম বীতরাগ। অনুসন্ধিৎসু পাঠক নাটকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার রস গ্রহণ করুন, আংশিক পাঠোদ্ধারে রসভঙ্গ হইবে। পূর্ণচন্দ্রের সংসার-বিতৃষ্ণা তখনই পূর্ণরূপে দেখা দিল, যখন তাঁহার পিতা প্রকৃত স্ত্রৈণের মতো লুনার পরামর্শে বিচার-না-করিয়া তাঁহাকে অন্ধকূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবার আদেশ দিলেন। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে লুনা ও শালিবানের কথোপকথনের মধ্যে এবং তৃতীয় দৃশ্যে লুনা, শালিবান, পূর্ণ ও ইচ্ছ্রার সংলাপের ভিতর দিয়া নাটককার যে নাটকীয় প্রভাব (dramatic effect) প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব।

সন্ন্যাসী গোরক্ষনাথের কৃপায় পূর্ণচন্দ্র অবশেষে কূপোত্থিত হইয়া নবজীবন পাইয়াছিলেন। সংসার-প্রবেশের মুখে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁহার লাভ হইয়াছিল, তাহার ফলে তাঁহার মনে তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। প্রাণদাতা সন্ন্যাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতার টানে তাঁহাকে গুরুপদে বসাইয়া পূর্ণচন্দ্র নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি-বলে সংশয়হীন প্রাণে গুরুনির্দিষ্ট পথে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইষ্টজ্ঞানে গুরুপূজা পূর্ণচন্দ্রের সাধনার বৈশিষ্ট্য। অবিচারে গুরু-আজ্ঞা পালন করিতে হইবে এইরূপ স্বীকৃতি লইয়া গোরক্ষ-নাথ পূর্ণচন্দ্রের ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গল যেমন সোমগিরি কর্তৃক সাধূত্তম আখ্যা পাইয়াছিলেন,

সেইরূপ পূর্ণচন্দ্রকেও গোরক্ষনাথ সাধুত্তম বলিয়াছিলেন। কেন এইরূপ বলিলেন তাহা বুঝাইবার জন্য তাঁহার অপর শিষ্য সেবাদাসকে তিনি এইরূপে বুঝাইলেন :—

"বিনাদোষে নিক্ষিপ্ত হইল অন্ধকূপে,
তথাপি হৃদয়ে দৃঢ় রাখিল বিশ্বাস,
ঈশ্বর মঙ্গলময়—করুণা আলয়,
বহু পুণ্যে হয় বৎস, হেন জ্ঞানোদয়।"

বাজীকর যেমন বন্য পশুকে বশীভূত করিয়া লোক সমাজে ক্রীড়া দেখাইয়া বেড়ায়, নায়িকা সুন্দরাও সেইরূপ পশুপ্রকৃতি নর লইয়া ক্রীড়া-কৌতুক করিতে ভালবাসিতেন। গোরক্ষনাথ পরোক্ষভাবে সুন্দরার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার কৃপায় সুন্দরার সুশিক্ষার অভাব ছিল না। আজ সেই গোরক্ষনাথ দ্বারা প্রেরিত নবীন সন্ন্যাসী পূর্ণচন্দ্রকে হঠাৎ তাঁহার অতিথিশালায় ভিক্ষার্থী হইয়া আসিতে দেখিয়া সুন্দরার মনের সে গর্ব, সে তেজ খর্ব হইয়া গেল, এবং তাঁহারই চরণতলে তিনি প্রাণমন সমর্পণ করিয়া বসিলেন। এমনি বিধিলিপি! সখী সারী অবাক হইয়া সুন্দরার এই অভাবনীয় পরিবত্ন লক্ষ্য করিল। ভাবী নায়ক-নায়িকার এখানকার সংলাপটি এতই মধুরভাবে নাটককার রচনা করিয়াছেন যে নাট্যসাহিত্যে তাহা অপূর্ব। পাঠক সম্প্রদায়ের কৌতুহল-নিবৃত্তির জন্য ঐটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল :— "পূর্ণ (নেপথ্য হইতে) 'কে আছ?—ভিক্ষা দাও।' সু—'আহা, বীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি! সারি, এ দিকে ডাক।' সা—'যোগীবর, এদিকে আসুন!' পূ-(নেপথ্য হইতে) 'আমি তরুতলবাসী, পুরে প্রবেশ নিষিদ্ধ!' সু—'সারি, বল এ অতিথিশালা।' সা—'এ অতিথিশালা, কারুর বাসস্থান নয়।' (পূর্ণের প্রবেশ) পূ—'এ কি সাধ্বী সুন্দরা দেবীর অতিথ্‌শালা?' সা—'হ্যাঁ।' পূ—'কৃপা ক'রে দেবীকে ডেকে দিন, আমি তাঁর হস্তে ভিক্ষা ল'ব। নারীকুলে তিনি ধন্যা; গুরুদেব আমায় তাঁর হস্তে ভিক্ষা নিতে আদেশ দিয়াছেন; তিনি গোরক্ষনাথের কৃপাভাজন—আমি তাঁর চরণোদ্দেশে প্রণাম করি।' সু—'ছি! ছি! যোগীবর, করেন কি? দাসীর নাম সুন্দরা।' পূ—'আপনি পুণ্যবতী, আপনার চরণকৃপায় আমি গুরুদেবের সেবা কর্‌ব—ভিক্ষা দিন। (সুন্দরার ভিক্ষা প্রদান ও পূর্ণের প্রস্থান)' সু—'দেখ্‌ সারি, সত্যমিথ্যা বোঝ, যেমন এই প্রস্তর খণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত কর্‌লে না, তেমনি আমার প্রতিও দৃষ্টিপাত কর্‌লে না।' সা - 'তাইত! আর কিছু নয়, রোদে ঘুরে-ঘুরে, গাঁজা খেয়ে ভোম্‌ হ'য়ে আছে, অত ঠাওর করে নি'। সু—'সারি, তুমি বোঝ না, আমি যোগীর লক্ষণ পড়েছি—সে সমস্ত লক্ষণ এই নবীন সন্ন্যাসীতে বিরাজমান;—উচ্চ ধ্যান, শূন্যদৃষ্টি প্রকাশ কর্‌ছে—হৃদয়ে ঈশ্বর পদ বিরাজিত, তথায় আমার ন্যায় তৃণের স্থান নাই।' সা—'(দূরে পূর্ণকে আসিতে দেখিয়া) আ মরি! ঐ দেখ আবার আস্‌ছে—

'দারুণ রূপের ফাঁদে,
রবিশশী প'ড়ে কাঁদে!
গতিহীন হয় সমীরণ॥
উথলে সাগর জল,
ঢলে পড়ে হিমাচল,
বাঁধা পড়ে আপনি মদন॥'—

কি সন্ন্যাসী ঠাকুর, আবার ফিরে এলে যে?' (পূর্ণের পুনঃ প্রবেশ) পূ—'দেখুন্ সুন্দরা দেবি, আমি সন্ন্যাস-ধর্মের নিয়ম জানিনি—আমি আপনার মণিমুক্তা গ্রহণ ক'রে গুরুদেবের নিকট অপরাধী হয়েছি; গুরুদেব ভোজ্যবস্তু ব্যতীত গ্রহণ করেন না। আপনার মণিকাঞ্চন গ্রহণ করুন—কৃপা ক'রে কিঞ্চিৎ ভোজ্য-সামগ্রী আমায় দান করুন।' সু—'আপনার গুরুদেব কোথায় অবস্থিতি কর্‌ছেন?' পূ—'তিনি অদূরে বটবৃক্ষ মূলে বিশ্রাম কর্‌ছেন, কৃপা ক'রে আমায় ভোজ্য-সামগ্রী দিন, গুরুসেবার সময় অতীত হচ্ছে। * *' সু—'আমার পুরীর দ্বারে আসুন, আমি খাদ্যদ্রব্য লয়ে প্রভু গোরক্ষনাথ সন্দর্শনে যাব।' পূ—আপনি অতি পুণ্যবতী, প্রভুর দর্শনে আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।' সু—'যোগীবর, সত্য কি মনস্কামনা পূর্ণ হবে? দেখ, মিথ্যা-আশ্বাস দিও না।' পূ—'দেবি, উঠুন, আমি প্রভুর দাসানুদাস—আমায় এত বিনয় কেন? আপনি ঈশ্বরদর্শনে যাবেন, আপনার অবশ্যই শান্তিলাভ হবে।' সু—'আমি শান্তি চাই নি, স্বর্গ চাই নি, মোক্ষ চাই নি, হে নবীন সন্ন্যাসি। বল আমি যা প্রার্থী, তা পাব?' পূ—'কল্পতরুপদে যা যাচ্‌ঞা কর্‌বেন, তাই পাবেন।' সু—'প্রভু গোরক্ষনাথ! দেখো যেন তোমার শিষ্যের বাক্য মিথ্যা না হয়।"

বিনা পরীক্ষায় কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না, এ কথা গিরিশচন্দ্র তাঁহার বহু নাটকে প্রমাণিত করিয়াছেন। পূর্ণচন্দ্রেরও পরীক্ষা আরম্ভ হইল। শিবের অবতার গোরক্ষনাথ শিষ্যগণকে দেখাইতেছেন যে, কি ভীষণ পরীক্ষায় তিনি তাঁহার অন্যতম প্রিয় শিষ্য পূর্ণচন্দ্রকে এবার নিক্ষেপ করিলেন। সুন্দরারই পরিচর্যার ভার তিনি পূর্ণচন্দ্রকে দিলেন। সুন্দরার রূপ গোরক্ষনাথের মুখে নাটককার কিরূপ অনবদ্য ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, দেখুন:—

"সুন্দরা সুন্দরী, বিধাতার নির্জনে গঠন;
কলেবরে ঋতুরাজ যেন বিরাজিত,
মদন ধরিয়া ধনু নয়নে প্রহরী,
হেরি কেশদাম অভিমানে ঝরে কাদম্বিনী,
ধরণ-প্রভাবে চঞ্চলা দামিনী,
সহ-সহচরী নিতম্বে প্রহরী রতি—"

এইরূপ অনিন্দ্য সুন্দরীর পরিচর্যায় গোরক্ষনাথ তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে নিযুক্ত করিলেন।

পূর্ণচন্দ্রের সংসর্গে সুন্দরার রাজসিক প্রেম ক্রমশঃ সাত্ত্বিক প্রেমে উন্নীত হইতে লাগিল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, সারী যখন সুন্দরার হাতে মদিরা অর্পণ করিয়া বলিল যে, পূর্ণচন্দ্রকে ইহা সেবন করাইলে তাঁহার মন তোমাতেই আসক্ত হইয়া পড়িবে, ইহা জটাধারী সন্ন্যাসী প্রদত্ত মহৌষধ। সুন্দরা তৎক্ষণাৎ উহা সারীকে প্রত্যর্পণ করিয়া তিরস্কার-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন:—

"দূরে করহ নিক্ষেপ। ভেবেছ কি মনে,
পশু সনে করিয়াছি প্রণয়-বাসনা?
চাহি প্রাণে প্রাণ বিনিময়,
নহে পশুক্রিয়া! ভাব কি স্বজনি,
মেষ সম পতি করি সাধ?
ডোরে বাঁধা রবে, পাছে পাছে যাবে,

ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ মুখপানে চাবে,—
থাকিলে সে সাধ পূর্ণ হ'ত এতদিনে।
আসি কতজন পরিত বন্ধন;
নহে পত্নী, হতেম ঈশ্বরী।
আমি স্বামী, তারা হত নারী!
ছি! ছি! নারী হ'য়ে জান না নারীর প্রাণ?
রমণীর সাধ—মনে মনে,
হৃদয় আসনে, সযতনে রাখিতে পতিরে,
হৃদয়-ঈশ্বর—নিরন্তর তাঁর পদসেবা।
উচ্চ-আশ নারী রাখে কিবা!
বার-নারী যত্ন করি চাহে প্রেমদাস।
যোগীবর আমার ঈশ্বর,
অভিলাষী তাঁহার চরণ।"

নাটকের মধ্যে আর একটু অগ্রসর হইলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে সুন্দরা একছড়া সুন্দর মালা গাঁথিয়া পূর্ণচন্দ্রের গলায় দিবার জন্য আনিয়াছিলেন। পূর্ণচন্দ্র কিন্তু ঐ মালা শিবের গলদেশে প্রদান করিতে উৎসুক হইলে, সুন্দরা প্রতিবাদে বলিয়াছিলেন:—

'এক ভিক্ষা রাখ যোগীবর!
যতনে কুসুম তুলি গেঁথেছি এ হার,
ধর উপহার, পর গলে,
তৃপ্ত কর তৃষিত নয়ন।'

পূর্ণ তদুত্তরে বলিলেন:—

"জান না, জান না,
কি শোভা পাইবে হার শঙ্করের গলে।
মাংস পিণ্ডোপরে ফুলহারে কি শোভা হেরিবে?
শবোপরে ফুলের কি শোভা?
করে যাঁরে পবনে ব্যজন,
যাঁর তরে ভাতিছে তপন,
বনরাজি ধরে ফুল যাঁর পূজা হেতু,
যাঁর নাম ভবার্ণব-সেতু,
সেই অস্থিমালা-গলে দেহ ফুলমালা;
না রহিবে বাসনা-জঞ্জাল,
নির্মল অন্তরে ফুলহারে হের দিগম্বরে!"

পূর্ণচন্দ্রের এবংবিধ কথায় নায়িকা সায় দিতে পারিলেন না, কারণ পূর্ণচন্দ্রকেই তিনি স্বামী ও প্রাণেশ্বররূপে পূর্বেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। পায়ে ঠেলিলেও তিনি সেই পদে কিঙ্করী হইবার সাধ

রাখেন। পূর্ণচন্দ্র সুন্দরার অভিলাষ বুঝিয়া অন্তর্বিধ যুক্তিদ্বারা তাঁহার নিকট হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিলেন। তিনি সুন্দরাকে বুঝাইলেন যে তাঁহার জীবন গুরুপদে সমর্পিত, তাঁহাকে যোগভ্রষ্ট করিয়া সুন্দরার কি লাভ হইবে? কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া যে একমাত্র গুরুপদে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, এ সংসারে গুরুবিনা যাহার অন্য গতি নাই, তাহার প্রতি এ বিড়ম্বনা কেন? অবশেষে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়া সুন্দরার নিকট হইতে তিনি এইরূপে বিদায় লইলেন :—

"অলীক সম্বন্ধ তুমি আন কি কারণ?
দৈহিক রমণ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব কেবল,
আত্মায় আত্মায় আত্মিক রমণ,
সে রমণ না হয় ভঞ্জন,
গুরুপদে একত্রে মিলন
আনন্দের লীলা অবিরাম।
সঁপ মন শঙ্কর চরণে, এক আত্মা হব দুইজনে,
চিরদিন রবে, সে মিলনে বিচ্ছেদ না হবে;
করহ আত্মায় মন লয়,
ভৌতিক সম্বন্ধ যত করি পরিহার,
হেরিবে পুরুষ সনে প্রকৃতি বিহার;
একজ্ঞানে বহুজ্ঞান ঘুচিবে তোমার,
নর-নারী ভেদজ্ঞান রহিবে না আর।"

সুন্দরা পূর্ণচন্দ্রের পূর্বোক্ত যুক্তিগুলি শুনিয়া নিজমন হইতে ভেদজ্ঞান রহিত করিতে পারিলেন না, তবে তিনি আর এখন স্বামীর সাধনার পথে কণ্টকস্বরূপ রহিলেন না। উভয়ের ভিন্নমুখী সাধনা কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল নাটকের দর্শক বা পাঠক সমাজ তাহা বিদিত আছেন, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গিরিশচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রের চরিত্রে দার্শনিক Platoর 'আত্মায়-আত্মায় মিলন তত্ত্ব' ব্যক্ত করিলেন। এইরূপ মিলনকে Platonic love বলা হয়।

পূর্ণচন্দ্র-নাটকের রচনাশৈলী (style) ভিন্ন-প্রকৃতিক। নাটককারের মামুলি রচনা-রীতি এ নাটকে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। চৌদ্দ অক্ষর সমন্বিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ, গৈরিশ ছন্দ ও চলিতকথা মিলাইয়া যেখানে যাহা খাটে তাহা বসাইয়া নাটককার এ নাটকের ভাষা-গঠন করিয়াছেন; মধ্যে মধ্যে পয়ারছন্দের প্রয়োগও ইহাতে আছে। কিন্তু এ সকলের সংমিশ্রণ সত্ত্বেও ভাষা নাট্যকারের হাতে শ্রুতিকটু না হইয়া সতেজ ও মধুর হইয়াছিল।

গিরিশচন্দ্র এই নাটকের মধ্যে মানুষের বহু জাতি রূপ (type) দেখাইয়াছেন। সেবাদাস, দামোদর, সারী পরস্পর স্বতন্ত্র হইলেও প্রত্যেকটি পূর্ণ চিত্র। লুনা ও জম্বু নীচ চামারবংশীয় চরিত্র-দ্বয় নাটককার প্রধান বিচার্য-বিষয়ের (main issue) মধ্যে ইহাদের স্থান রাখিয়াছেন, তজ্জন্য তজ্জাতীয় কতকগুলি প্রকাশভঙ্গীকেও (expressions) নাটকের মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন, যথা;—লুনা রাজার স্ত্রৈণত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছে—(১) 'রাজাকে মলের মতন পায়ে দিয়ে আমি বাজিয়ে বেড়াই।' পূর্ণের রূপ-বর্ণনা প্রসঙ্গে লুনা বলিয়াছে—(২) 'চাঁদপানা মুখ', 'ফুলপানা দাঁত'।

শালিবান রাজা তিন দিন লুনার প্রাসাদে অনুপস্থিত ছিলেন। পুত্রের আগমনজনিত উৎসবানন্দের ব্যবস্থা করিতে তাঁহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল, তাই জমু রাজার ঐরূপ ব্যবহারকে লুনার কাছে এইরূপে প্রকাশিত করিতেছে—(৩) 'কৈ, আজ তিন দিন বেটা আস্‌বার রোস্‌নাই কচ্চে, তোর মুখে ঝাড়ু মারে নি?' পুত্রশোকে ইচ্ছ্রার বিবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া জমু বলিয়াছে—(৪) 'গোরু বিষ খেয়ে যেমন হয়, ঐ দেখ তোর সতীন অগ্নি হ'য়েছে।' ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি ছোট-ছোট বাক্যাংশ নাটককার বসাইয়াছেন, যেমন—(৫) 'ঝুঁটি-গলায়,' 'পয়জার দিয়ে খেদাড়ে দেওয়া,' 'বুদ্দি শুন্‌লি জুতা খাবি' ইত্যাদি। অনুন্নত সম্প্রদায় লইয়া নাটক রচনা করিলে এরূপ কথাগুলির প্রয়োগ সমীচীন, অন্যথায় নাটকখানি অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। ভাষার জাদুকর গিরিশচন্দ্র এ তথ্য জানিতেন। ছোট-লোকের প্রতিশোধ-স্পৃহা কতদূর নৃশংসতর হয়, তাহার চিত্র নাটকে বেশ ফুটিয়াছে।

ইহার সংগীতবিভাগে নূতন-নূতন ভাবের ইঙ্গিত আসিয়াছে, যেমন:—(১) 'যে ধর্ত্তে পারে ধরা দিই তারে। বাঁধা থাকি মিনি স্থতোর সোহাগের হারে।' (২) 'এসেছে নবীন সন্ন্যাসী, আঁখিতে দেয় লো ফাঁকি, হাসিতে পরায় ফাঁসী।' (৩) 'ছি! ছি! লো হ'ল এ কি দায়, ঘন-ঘন কেন যোগী মুখের পানে চায়?' (৪) 'মরি কুঁচ নয়নে খোঁচ মারে প্রাণে।' (৫) 'জয় পরমেশ্বর পরম ভিখারী, কল্মষের-গুরু যোগ আচারী।' (৬) 'যোগাসনে মহাধ্যানে মগ্ন যোগীবর।' (৭) 'ধরা ত দেয় না হাওয়া ফুলে-ফুলে চলে যায়।' স্থানাভাবে গানগুলির প্রথম ছত্র মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার নূতন সংজ্ঞা এই, যে নাটকখানি অধ্যাত্ম রাজ্যে মিলনাত্মক এবং ইহা বড়ই জনপ্রিয় হইয়াছিল।

'পুরণ ভকত' নামে এই নাটকখানি হিন্দীভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

বিষাদ নাটক

'বিষাদ' এই বিভাগের সপ্তম নাটক। ইহা ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর তারিখে বীডনস্ট্রীটস্থ গোপাল লাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। গ্রীক দার্শনিক (Plato) আত্মার সহিত আত্মার মিলনকে Platonic love বলিয়াছেন। ইহাকেই কামগন্ধহীন প্রেম বলা হয়। গিরিশচন্দ্র এই নাটকের নায়িকা—সরস্বতীচরিত্রে তাহাই দেখাইয়াছেন। পুরাণে এরূপ ধরণের চিত্র কিছু আছে। পুরাণোক্ত মদালসা চরিত্রের ভাব ইহাতে আছে।

মাধব চরিত্রটি নাটককারের নূতন সৃষ্টি। নাটকের অন্তর্গত যাবতীয় নাট্যক্রিয়া (ac.ion) মাধব একাই নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। এই দৃশ্যকাব্যের নায়ক অলর্ক মাধবের হাতের ক্রীড়নক, স্বাতন্ত্র্য তাহার ছিল না। অলর্কের লালসারূপ অগ্নিকুণ্ডে ক্রমাগত ইন্ধন যোগাইয়াছেন—মাধব। অলর্কের সুন্দরী সাধ্বী পত্নী সরস্বতীর অন্তরে যে বিরহ বহ্নি অহরহঃ জ্বলিতেছিল, তাহার মূলেও মাধবের সম্পূর্ণ হাত ছিল। এক ব্যক্তির অধীনে নাটকে যাবতীয় ক্রিয়ার সম্পাদনা এরূপভাবে নির্ভর করিতে অন্য কোন নাটকে প্রায় দেখা যায় না। নাটকে নায়ক, উপনায়ক, প্রতিনায়ক ও তাহাদের পীঠমর্দাদির বিভিন্নমুখী ক্রিয়া থাকে, এবং সেগুলি তাহাদের স্বাধীন কর্তৃত্বেই সম্পাদিত হয়। নাটককার কিন্তু এ নাটকে মাধবের হাতে সমুদয় ঘটনার ভার রাখিয়াছেন, তিনি যেন মন্ত্রশক্তিবলে নাটকের ঘাত-প্রতিঘাতের নিয়ন্তা। এরূপ চরিত্র বাস্তবিকই অপূর্ব। নাট্যকার বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে এ বিষয়ে মৌলিকতা আনিয়াছেন।

সরস্বতী কুলবধু হইয়াও প্রাণের জ্বালায় মাধবের সম্মুখীন হইয়া দিনান্তে অন্ততঃ একবার স্বামী-সন্দর্শনের অভিলাষ জানাইয়াছিলেন। মাধব সে কথায় যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে শুধু সরস্বতী কেন, নাটকের দর্শক বা পাঠকসমাজ কৌতূহলাক্রান্ত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। সরস্বতী ও মাধবের এই বিষয়ক সংলাপের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিয়া জনসাধারণকে দেখানো হইতেছে যে, কিরূপ ভাষার বাহনে উভয়ের মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছিল। একজনের ভাষা প্রাণের বেদনায় মর্মরিত ও হৃদয় হইতে স্বতঃ-নিঃসারিত, অপরের ভাষা যেন অভিসন্ধিমূলক ও দৃঢ়চিত্ততার পরিজ্ঞাপক। মাধব সরস্বতীকে বলিলেন :—

"শুন মা কল্যাণি! কুলের কামিনী—
প্রকাশ্যে এ স্থানে এসেছ কেমনে?
আমি পর—রাজার নফর,
মম সনে বাক্যালাপ নহে ত উচিত।
শুনিলে ভূপাল ঘটিবে জঞ্জাল,
ফিরে যাও সুলোচনা!"

সরস্বতী উত্তরে বলিলেন :—

"কাদম্বিনী-পালিতা তটিনী,
লোক অগোচরে পর্বত গহ্বরে বৈসে,
কিন্তু যবে সাগর-উদ্দেশে,
উন্মাদিনী বেশে ধায় বামা মনোবেগে—
সুস্থান কুস্থান নাহিজ্ঞান,
অবিরাম গতি চলে,
পতি-পদতলে মিলায় আপন কায়,—
কি অধিক বাড়িবে জঞ্জাল।
বিচ্ছেদে বিদরে প্রাণ—
মৃত্যু শ্রেয়ঃ পতি যদি নাহি পাই।"

মাধব উত্তর করিলেন :—

"আমি শত্রু তব, শুন সুকেশিনী!
* * দিবস-শর্বরী মনে মনে করি,
রাজ্যেশ্বরে কবে করিব ভিখারী—
রাজ্য কবে দিব শত্রুকরে।
পরিহরি সুন্দর ভবন, ছেদিপ্রণয় বন্ধন
পতি তব বনে বনে করিবে ভ্রমণ—
এই ধ্যানে বঞ্চি রাজপুরে।
নহি একা, চারিজন এ কার্য-সাধনে।
নিত্য আনি বার-বিলাসিনী,

যেন পত্নী সনে কদাচিৎ দেখা নাহি হয়।
নিত্য নিত্য আনি দীনজন,
ভাণ্ডারের ধন করি বিতরণ—
যেন কপর্দ্দক রাজকোষে নাহি রয়।
রাখি আমোদে উন্মত্ত নিরন্তর,
নাহি অবসর, রাজকার্যে করে দৃষ্টিপাত
নিশিদিন রহি সাথে-সাথে,
কোন মতে যেন নাহি ফিরে মন,
বুঝ মনে আমা হ'তে
উপায় কি হবে তব ?"

সরস্বতীর উত্তর :—

"মহাশয় ! কিবা প্রয়োজনে
অবলার সনে কর ছল !
যেই মত করিলে বর্ণন,
তুমি কদাচিৎ নহ সে দুর্জন,
উচ্চাশয় প্রকাশে বদন চারু,
করুণায় পূর্ণ দুনয়ন—
মহাজন। অকারণ কেন কর প্রতারণা ?"

মাধব— "শুন সুবদনি ! নহে মিথ্যা বাণী,
সত্য আমি রাজ-সংসারের অরি।
তুমি নারী,
কপটতা নাহি করি তোমা-সনে।"

সর— "সত্য তুমি অরি ?"

মাধব— "সত্য !"

সর— "সত্য যদি অরি—নাহি ডরি !
হোক্ তব অভীষ্ট পূরণ,
যায় রাজ্য যাক্ ছারখার,
শূন্য হোক্ রাজার ভাণ্ডার
হোন্ পতি বারনারী রত—
খেদ নাহি করি তায় ;
দিনান্তে বারেক দরশন,
এ জীবনে বাঞ্ছা-মাত্র মম।
তাহে তুমি নাহি হও বাদী—
পায়ে ধ'রে সাধি,

বড় সাধ পতি-দরশনে,
কৃপা করি পুরাও বাসনা।"

মাধব— "আমি সেই সাধে বাদী।
রাজ্য যদি রহে, তাও প্রাণে সহে,
ধন-জন রহে, তাতে নাহি তত ক্ষোভ,
করি প্রাণপণ,
কদাচন তব সনে না হয় মিলন—
বৃথা এ সাধনা বালা!"

বহু চেষ্টা করিয়াও সরস্বতী মাধবের দ্বারা স্বামী সন্দর্শন-লাভে কৃতকার্য হইলেন না, অগত্যা তাঁহাকে অভিসম্পাত করিয়া স্থান-ত্যাগ করিলেন। মাধবও অবিচলিত চিত্তে সে অভিশাপবাণী গ্রহণ করিলেন!

উপরি উক্ত সংলাপ-মধ্যগত রহস্যের মধ্যে নাটকের ভবিষ্যৎ-ক্রিয়া নাটককার দর্শক ও পাঠকের কাছে প্রহেলিকাময় করিয়াছেন। এ মন্ত্রগুপ্তি নাটক যত বেশী অগ্রসর হইয়াছে, ততই গভীরতর হইয়া জন-সাধারণের কৌতূহলের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছিল—এ কৌশলটি প্রশংসার্হ। অতৃপ্তির প্রতিমূর্তি অলর্ক আমোদের সন্ধানে মাধবের পশ্চাতে যতই ঘুরিয়াছে, মাধব ততই তাহার সম্মুখে নব নব আশা-মরীচিকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অলর্ক সরল বিশ্বাসী, মাধবের শিক্ষায় সে আমোদকেই স্বর্গসুখ মানিয়া লইয়াছে। এক বিষয়ে অতৃপ্তি জন্মিলে অন্যের সন্ধানে সে ঘুরিয়া বেড়াইত। সে শিখিয়াছে সব বস্তু যেমন সাধনা-সাপেক্ষ, আমোদও সেইরূপ উপাসনা দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। তাহার বিশ্বাস এইরূপ হইয়াছিল যে, রাজ্য, ধন সব-কিছুই আমোদের নিমিত্ত। কাশ্মীররাজ ও কনোজরাজের রাজ্য-আক্রমণের কথা শুনাইয়া মন্ত্রী অলর্ককে কিছুদিনের জন্য আমোদ-প্রমোদ স্থগিত রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। অলর্ক তদুত্তরে তাহার জীবনের সংকল্প কি তাহা স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিল :—

"শুন মন্ত্রি! সিংহ-শিশু স্বেচ্ছায় কাননে খেলে,
কিন্তু করী হেরি বিমুখ কি কভু
বিদারিতে মস্তক তাহার?
আমি রাজপুত্র। অরি নাহি ডরি।
বৈরী যবে হবে সম্মুখীন,
রাজোচিত করিব ব্যাভার?
শুন সংকল্প আমার—
মিত্রগণ-বেষ্টিত আমোদে রব রত,
শত্রু-শবে শয্যা রচি মুদিব নয়ন।"

অলর্কের এরূপ বলিবার কারণ হইয়াছিল তাহার মাতৃদত্ত 'কৌটার' শক্তি যাহা সে নিত্য পূজা করিত; তাহার এরূপ বিশ্বাস ছিল যে উহা কাছে থাকিতে বিপদের কোন সম্ভাবনা তাহার নাই।

পৃথিবীর মহাকর্ষ-শক্তির মতো নাটকের কেন্দ্রবর্তী মাধব-চরিত্রটি দুর্জ্ঞেয় হইলেও নাট্য ক্রিয়ার মধ্যে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিলে তাঁহার দুষ্ক্রিয়ার পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা উদ্দেশ্যমূলক বলিয়াই বোধ হয়। আমোদের মধ্যেও তিনি নিরাসক্ত থাকিতেন, কিন্তু

নিরানন্দ তাঁহার ছিল না। খোসামুদের চাটুবাদ তাঁহার নাই, সংযত ভাষায় স্পষ্ট কথাই তিনি বলিতেন। মাধব রসিক, নারীমহলে তাঁহার প্রতিপত্তির কারণ এই রসিকতা। কথার মোহে তিনি অলর্ককে মুগ্ধ রাখিতেন, এমনি তাঁর বাগ্‌বিভূতি।

বেশ্যা লইয়া উন্মত্ত স্বামীর বিরহ সরস্বতীর ক্রমশঃই তীব্র হইতে লাগিল। সহসা তিনি একদিন বৃদ্ধ মন্ত্রীর সম্মুখে আসিয়া বেশ্যা হইবার প্রস্তাব করিলেন, এবং বেদনাবিধুর প্রাণে কিরূপে বেশ্যা হইতে হয় তাহার পরামর্শ চাহিলেন। বিস্ময়বিমুগ্ধ মন্ত্রী বেশ্যার চরিত্র স্থূলতঃ বুঝাইয়া দিয়া কুরুচিসম্পন্ন পুরুষেরা যে তাহাতে আসক্ত হয় তাহাও সরস্বতীকে বলিলেন। সরস্বতী প্রতিবাদে জানাইয়া দিলেন যে, তিনি পতিনিন্দা শুনিবার জন্য এখানে আসেন নাই। বেশ্যারা নিশ্চয়ই গুণসম্পন্না, নতুবা তাঁহার স্বামী কেন তাহাতে আসক্ত হইবেন? এখানে বৃদ্ধ মন্ত্রীর মুখে নাটককার কিরূপ মোহিনী ভাষার বাহনে বেশ্যার চরিত্র বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা নাট্যরস-পিপাসুর তৃপ্তির জন্য দেওয়া হইল। মন্ত্রী বলিলেন :—

"বেশ্যা সম নিগু'ণা কি ধরে মা ধরণী?
বারনারী পাপ-সহচরী, জীবন চাতুরীময় ;
মরুভূমি প্রাণ—কোমলতা' নাহি পায় স্থান,
কুটিলতা কাল-ফণী বৈসে তাহে,
বেশভূষা মরীচিকা তায়।
প্রেম আশে মত্ত যুবা ধায়—পিপাসায় জর জর,
শেষে কুটিলতা-ভুজঙ্গ-দংশনে,
হলাহল-চিহ্ন ফোটে কালিমা বদনে,
লোকে মুখ দেখাইতে নারে,
তবু মুগ্ধ মায়াময় মরীচিকা-ঘোরে।
* * অবয়ব নারীর সমান, কিন্তু
ঋক্ষ-ব্যাঘ্র-শ্বাপদ নিচয়
তুলনায় কেহ নহে সমতুল।
ধর্ম-কর্ম, মান-ধন, জীবন-যৌবন
কুলটা সকলই হরে—
স্পর্শে তার নরকে নিবাস—
বার নারী এ হেন পিশাচী।"

মন্ত্রীর ঐরূপ ব্যাখ্যান সরস্বতী ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা দেখিয়া মন্ত্রীকে কহিলেন :—

"পাপ-সহচরী কেমনে তাহারে কহ?
যারে মম স্বামী সমাদরে,
তার সম পুণ্যবতী কে আছে জগতে? * *
মন্ত্রি! রাখ প্রাণ, রাখহ বচন—
দেখাও সেই রমণী-রতন,

যার প্রেমে মাতি দিবারাতি
পতি মম ফেরে তার সাথে।
সত্য কহি দাসী হব তাঁর—
* * আমি অপবিত্রা—পতি ঠেলেছেন পায়।
যেই জন তাঁর আদরিণী,
মম ঠাকুরাণী,
পবিত্র হইব তাঁর চরণ পরশে।"

মন্ত্রী রাণীর এবংবিধ কথায় পুরাণের কাহিনী স্মরণ করিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন :—

"শুনেছি পুরাণে, শিবের কারণে
কুচনী সাজিলা ভগবতী।
তব রীতি শিবার সমান—
নরে নাহি হয় তুল!"

যৌন-জ্ঞান না যাইলে সাত্ত্বিক প্রণয় জন্মে না, কারণ যৌনজ্ঞানে কামজ প্রণয়ের যে উৎপত্তি হয় তাহা পরস্পর স্বার্থসাপেক্ষ। মাধব ক্রমশঃ অলর্ককে নিঃস্বার্থ প্রণয়ের দিকে টানিয়া আনিতেছিলেন। শিক্ষক ছাত্রকে যেমন প্রশ্ন ও পরিপ্রশ্নের দ্বারা শিক্ষিত করিয়া তুলেন, মাধবও তেমনি অলর্ককে উক্ত প্রকারে প্রেমের বিভিন্ন অবস্থার কথা বলিয়া প্রেম কি তাহা বুঝাইয়া দিলেন, উহার সারাংশ কতকটা এইরূপ—'দুইটি প্রাণ এক হওয়ার নাম প্রেম।' অলর্ক উজ্জ্বলা নাম্নী বেশ্যা লইয়া প্রেম-চর্চা আরম্ভ করিল।

স্বামী-সন্দর্শন আশায় সরস্বতী অবশেষে বালকের ছদ্মবেশে 'বিষাদ' ছদ্ নাম লইয়া উজ্জ্বলার গৃহে বাস করিবার জন্য আসিলেন। তাঁহার সরল ও মিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া উজ্জ্বলা তাঁহাকে নিজ গৃহেই স্থান দিল। সরস্বতী তখন অলর্ক ও উজ্জ্বলাকে গলা-ধরাধরি করিয়া বসাইয়া প্রেমিক-প্রেমিকার যুগল-মূর্তি দেখিয়া তাঁহার বহুকালের পিপাসিত নয়নকে তৃপ্তি দিলেন। নিষ্কাম প্রেমিক দেখিয়া সুখী হন, কেন? তাহা তিনি জানেন না। সে প্রেমের ধর্মই বুঝি এইরূপ। আত্মবিসর্জন করিয়া সে প্রেমিক আনন্দ পান। তাঁহার প্রাণে প্রেমের এক অদ্ভুত তরঙ্গ চলে, এবং সে তরঙ্গের নৃত্যে তাঁহার প্রাণ দুলিতে থাকে। দুঃখ তখন সুখমাখা অবস্থায় এবং সুখ দুঃখে ঢাকা পড়িয়া বিপরীত তরঙ্গের খেলা খেলিয়া তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয়। এরূপ প্রেমিকের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ভয় থাকে না, ভাল মন্দের বিচার নাই। গগনের বিমল বারির মতো সুস্থান কুস্থান জ্ঞান তাঁর থাকে না। সরস্বতী এই জাতীয় প্রেমের অধিকারিণী হইয়াছিলেন।

বৈষ্ণব শাস্ত্রের সুপরিজ্ঞাত পয়ারে আছে—'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।' সাধনমার্গে প্রাণময় কোষের ঊর্ধ্বে উন্নীত জীবাত্মাই পরমাত্মার প্রেমে মাতিয়া উঠে। যদিও নিম্নস্তরীয় ভূ-কেন্দ্রের অর্থাৎ অন্নময় কোষের অতৃপ্তি হইতেই এই জাতীয় প্রেমের প্রথম প্রেরণা আসে। দেবলোকের অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোষের উচ্চ স্তরে উঠিলে জীবের আর নিম্নগতি ঘটে না, এবং তখনই কামের পূরক 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' ডুবিয়া গিয়া 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা জাগিয়া । মহাভাব স্বরূপিণী রাধিকার প্রেম এই জাতীয় ছিল, তাই এই পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিষাদ

নাটকের নায়িকা সরস্বতীর স্বামীরূপ কৃষ্ণেন্দ্রের প্রীতির জন্য বেশ্যালয়ে দাসির বৃত্তি পর্যন্ত করিতে হইয়াছিল। নাটকই তাহার সাক্ষ্য দিবে।

অলর্ক একদিকে রাজ্য ও ধন উজ্জ্বলার চরণে সমর্পণ করিয়া তাহাকেই রাজ্যের রাণী করিয়া প্রকৃত প্রেমিক হইতে চাহিতেছে,—অপর দিকে উজ্জ্বলা তাহার এতদিনের প্রেমিকার অভিনয় রাজ্য হাতে আসিতেই বিষাদান্ত নাটকের সৃষ্টিকল্পে অলর্কের জীবনদীপ নির্বাপিত করিবার চক্রান্তে ঘুরাইয়া দিল। ধনের কি আশ্চর্য মোহিনী শক্তি! রাজ্য হস্তগত করিয়া উজ্জ্বলা রাজাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিল, এবং সে নিজে পুরুষরূপী বিষাদের প্রণয়প্রার্থিনী হইয়া নূতন অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার অন্তর্নিহিত কুলটা বৃত্তি আজ আবার জাগ্রত হইয়া উঠিল।

পুরুষবেশী স্ত্রীলোক তাহার নিজ জাতিকে (own sex) যে ঠকাইতে পারে তাহার প্রতীক এই বিষাদরূপী সরস্বতী। কেহ-কেহ বলেন এ ঘটনা অস্বাভাবিক। এ মন্তব্য ঠিক নহে, কারণ কেহই স্বভাবের সম্পূর্ণতা নিরীক্ষণ করেন না—পৃথিবীর এক প্রান্তে যাহা সম্ভব হয়, অপরপ্রান্তে তাহা অসম্ভব বোধ হইতে পারে মানুষের জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতার জন্য। এমন পুরুষ দেখা গিয়াছে যে, না সাজাইলেও তাহাকে স্ত্রীলোকের আকৃতিবিশিষ্ট মনে হয়। যদি আবার সাজ-গোজ (make up) দ্বারা তাহাকে মেয়ে সাজানো হয়, বা ঐরূপে কোন স্ত্রীলোককে পুরুষ সাজানো যায়, তাহা হইলে তাহার স্বজাতির (own sex) মধ্যে বিভ্রম ঘটিতে বিলম্ব হয় না। শেক্সপীয়রের জগৎ বিখ্যাত কমেডিগুলি ইহার অলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। 'মার্চেন্ট অফ্ ভিনিসের' নায়িকা 'পোর্সিয়ার' পুরুষ বিচারকের ছদ্মরূপ গ্রহণ; 'য়্যাজ-ইউ-লাইক্-ইটের' নায়িকা রোজালিণ্ডের 'গানিমিড্' ছদ্মনাম লইয়া দরিদ্র কৃষকের ছদ্মবেশে আশ্রয় ত্যাগ করা; 'সিম্বেলিনের' নায়িকা ইমোজিনের 'ফিডেল' ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া পুরুষের ছদ্মবেশে স্বামী অন্বেষণার্থ বহির্গত হইয়া অভূতপূর্ব উপায়ে স্বামী-লাভ করা; 'টুয়েল্‌ফ্‌থ্ নাইটের' ভায়োলা 'সিজারিও'-নামধারী পুরুষের ছদ্মবেশে একদিকে লেডি অলিভিয়ার প্রণয়লাভ করা ও অপরদিকে ডিউক আর্সিনিওকে তাঁহার প্রেমদান ব্যাপার অনেক অসম্ভবকে সম্ভবপর করিয়াছে। সুতরাং নেপোলিয়ানের ভাষায় বলা যায়, যে জগতে কিছুই অসম্ভব নাই।

বিষাদ-রূপী সরস্বতী অলর্ককে কারাগার হইতে অভাবনীয় উপায়ে মুক্ত করিয়া বনমধ্যস্থ এক কুটীরে লইয়া আসিয়াছেন। কাশ্মীররাজও ভগিনীর সন্ধানে ফিরিতেছিলেন। হঠাৎ দুইজন অস্ত্রধারীকে নিজ কুটীরে প্রবেশোন্মুখ দেখিয়া বিষাদ উহাদিগকে উজ্জ্বলা প্রেরিত ঘাতক মনে করিয়া দ্বাররোধ-পূর্বক আগন্তুকদের সম্মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার স্বামীর উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত অস্ত্র নিজবক্ষে ধারণ করিয়া নিষ্কাম প্রেমের আদর্শ (the ideal of Platonic love) জগতে স্থাপনপূর্বক ধরাধাম পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যু ঘটিবার পূর্বে স্বামী লইয়া গৃহিণী হইবার সুযোগ সরস্বতীর আসিয়াছিল, কিন্তু নিঃস্বার্থপ্রেমের (Ethereal love) প্রেরণায় সে সুযোগও তিনি দেহ-বিনিময়ে গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। এরূপ চরিত্র বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রই প্রথমে অঙ্কিত করিলেন।

অলর্কের মৃত্যুতে নাটকের কেন্দ্র শক্তির আধার মাধব আজ মর্মাহত হইলেন। তিনি এখন বুঝিলেন যে কুকার্যদ্বারা সৎ-অভিসন্ধি সিদ্ধিলাভ করে না। এই কথার প্রতিধ্বনি একদিন স্বামী বিবেকানন্দ—'চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না'—কথার মধ্যে করিয়া গিয়াছেন। নাটকের উপসংহার-সন্ধিকালে পত্নীশোকে বিহ্বল অলর্কের সম্মুখীন হইয়া নাটকের মন্ত্রগুপ্তি বা রহস্য, যাহা

নাটকের আরম্ভকালীন মুখ-সন্ধির মধ্যে মাধব ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, আজ এইরূপে তিনি তাহার রহস্যোদ্‌ঘাটন করিলেন :—

"এক মাতৃগর্ভে জন্ম তোমার আমার,
আছে আর তিন সহোদর।
মাতৃ-উপদেশে কিশোর বয়সে,
চারিজনে হইয়াছি বনবাসী—
দিবানিশি কৃষ্ণপদ করি ধ্যান।
পরে লোকমুখে শুনি,
সহোদর সংসারে বিলিপ্ত মম।
তাই রাজা ত্যজিয়া গহন,
রাজ্যমধ্যে করিনু প্রবেশ।
আমি কনোজ মাতাই, কাশ্মীর রাজার কাছে যাই,
অন্তরের ছিল অভিলাষ, নৃপমণি!
ছাড়ি রাজ্যবাস সন্ন্যাস-আশ্রম করিবে গ্রহণ,
পাঁচ ভাই আনন্দে বঞ্চিব।"

যে সুধালাভের আশায় মাধব সমুদ্র-মন্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন আজ তাহাতে সুধার পরিবর্তে গরল উঠিল। মাতৃদত্ত সম্পুট যাহার অভ্যন্তরে—'বিপদে কাণ্ডারী জেন শ্রীমধুসূদন, তাপ দূর হবে সার কর শ্রীচরণ'—লিখিত ছিল, তাহা কিন্তু অলর্কের শোকমোচনে কার্যকরী হইল না, কাজেই উহা নদীজলে নিক্ষিপ্ত হইল। অলর্ক স্বপ্নে মাতার ও পত্নীর ছায়ামূর্তি দেখিয়া বুঝিল যে, মধুসূদনের শরণাগত না হইলে ঐ লোকে পৌঁছিয়া তাঁহাদের সঙ্গসুখ লাভ করিতে পারিবে না। নিষ্কাম প্রেমিকা সরস্বতী সূক্ষ্মশরীরে স্বামীকে জানাইয়া দিলেন যে, তিনি গোলোকে আসিয়া রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির পূজা একেলাই করিতেছেন, তুমি আসিলেই যুগলে ঐ যুগলমূর্তির উপাসনা সার্থক করিয়া তুলিব। 'হ্যাম্‌লেট' নাটকে শেক্সপীয়র জাগ্রত অবস্থায় হ্যাম্‌লেটকে তাঁহার পিতার ছায়ামূর্তির সম্মুখীন করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নের মধ্যে তাহা দেখাইয়া লোক-সন্দেহের অবকাশ আর দিলেন না।

মাধব যে চক্রান্তজাল বিস্তৃত করিয়াছিল তাহার শেষ রক্ষা হইল না। উজ্জ্বলা প্রতিহিংসাবশে মাধবকে হত্যা করিয়া নিজে আত্মহত্যা করিল। নাটককার নিষ্কাম প্রেমের যে আদর্শ এই নাটকে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক-তত্ত্বে পূর্ণ।

সংগীতবিভাগে নাট্যকার কতকগুলি অমরসংগীত এই নাটকের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন :—(১) 'আমরা চার রকমের চার বিরহিনী', (২) 'সখি নাহি জানিনু সোহি পুরুষ কি নারী—রূপ লাগ রৈ হৃদয় হামারি', (৩) 'হেরি চম্পক কলি পড়ে ঢলি-ঢলি আমা বিনা সে কি জানে', (৪) 'চাও চাও মুখ ঢেক না সরম সবে না', (৫) 'প্রেমের এই মানা, না হলে প্রেম ত রবে না।' স্থানাভাবে গানগুলির প্রথমছত্র মাত্র উদ্ধৃত হইল।

ভাষা ও যুক্তিবিন্যাসের দিক দিয়া মনে হয় গিরিশচন্দ্র নাটকখানিকে বিশেষ যত্ন-সহকারে লিখিয়াছিলেন। ইহার একখানি হিন্দি-অনুবাদও হইয়াছে। এই নাটকখানির বহু সুখ্যাতি শুনা

যায়। মরজগতে এখানি বিষাদান্ত হইলেও অধ্যাত্মরাজ্যে মিলনান্ত। ইহার নূতন সংজ্ঞা আবশ্যক।

নসীরাম নাটক

'নসীরাম' এই বিভাগের অষ্টম নাটক। এখানি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এই নাটক লইয়া ঐ স্টার থিয়েটার মহা-সমারোহের সহিত খোলা হইল।

বিরজাকে কেন্দ্র করিয়া এই নাটকের মধ্যে যে প্রণয়-কাহিনীটি রূপ পরিগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহা কিরূপে বিরূপতা লইয়া নাট্যগতি পরিবর্তিত করিল, তাহার ক্রিয়া (action) নাটকে প্রদর্শিত হইয়াছে। চারিশ্রেণীর নারি-জাতির মধ্যে বিরজা পদ্মিনী-জাতীয়া ছিলেন। তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় বহুস্থানে আছে। রাজকুমার অনাথনাথের প্রতি তাঁহার প্রণয় স্বার্থলেশ-শূন্য, বিরজা তাই সরলপ্রাণে তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি রাজকন্যা নহেন, মন্ত্রীর ছলনায় রাজকন্যা-রূপে এখানে প্রেরিতা হইয়াছিলেন। ইহার উত্তরে প্রেমিক অনাথনাথ বলিলেন যে বিরজা রাজকন্যা হোন্ বা না হোন্ তিনিই তাঁহার হৃদয়েশ্বরী। এ কথায় বিরজা তৃপ্তি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার প্রাণের নিভৃত কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। উত্তরটি এইরূপ :—

"কি দিব উত্তর, আছে কি উত্তর,—
অমৃতে অসাধ কার? কিন্তু সুধা নহে সবাকার,
দেব-কন্যা করে পান। ঘৃণ্য বটে,—
কিন্তু দাসী তব-সহবাসে হেরেছে হীনতা তার।
পূর্ণচন্দ্রে করিব না কলঙ্ক-অর্পণ।
সন্ধিভঙ্গে মগধ মজিবে, দেখিতে নারিব কভু মাতৃভূমি-নাশ।
অবনীতে অবসান মম অভিনয়।
কেন আত্মঘাতী হব, রাজদণ্ডে বধ মোর প্রাণ।"

অনাথনাথ বিরজার এরূপ সহৃদয়তাপূর্ণ কথায় অভিভূত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ-পূর্বক মগধরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন। বিরজা তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন :—

"শুন, ভালবাসি, ক্ষুদ্রপ্রাণে যত ধরে
ভালবাসা। কিন্তু কেন কলঙ্কিত করিব তোমায়?
আমি নাহি জানি মম কুল-পরিচয়,
মন্ত্রী মাত্র করেছে পালন।
যবে তব জন্মিবে তনয়,
কি কহিবে, কোন্ কুলোদ্ভবা তার মাতা?
ঘৃণা করি লোকে কবে তায়,
কাম বশে কুলটায় বরিল তাহার বাপ।
এই পরিণাম হেতু মজাব তোমায়?

ছার এ জীবন, রব ঘৃণার ভাজন।
মনে-মনে সবে কবে দুশ্চারিণী;
লোক-অপবাদ-ব্যথা দিব তব প্রাণে।
নারী ব'লে কেন কর ঘৃণা,
প্রাণের না রাখি তত ব্যথা,
গুপ্তচর—বধ কর রাজার-কুমার।
হাসি যদি ভালবাস, মরিব হে হাসিতে-হাসিতে।"

সরলবিশ্বাসী অনাথনাথ কিন্তু কলঙ্কের ভয় করিলেন না। পিতাকে সমুদয় কথা বলিয়া বিরজাকে তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিরজা অগত্যা আর প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না; পরমেশ্বরের উপর সমুদয় ভবিষ্যৎ অর্পণ করিয়া অনাথনাথকে মন-প্রাণ সমর্পণ করিলেন।

রাজা কিন্তু বিরজারূপিণী গুপ্তচরের প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা দিয়াছিলেন। বিরজাকে চক্ষে দেখিবার পর কামাসক্ত হইয়া সে আজ্ঞা তিনি স্থগিত রাখিলেন। বিরজা কারাগারে বন্দিনী হইলেন। সোনা বিরজাকে মুক্তি দিবার জন্য কারাগারে উপস্থিত হইয়াছিল। নিজের সতীত্ব হারাইয়া সতীর দুঃখ সোনা ভালরূপেই বুঝিয়াছিল, তাই সে বিরজাকে বুঝাইয়া দিল যে রাজা তাহার রূপমুগ্ধ হইয়াছেন। ইহাতে বিরজা ক্ষুব্ধ হইয়া সোণাকে জানাইলেন যে সেরূপ কিছু ঘটিলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। সোনা এ কথায় যে উত্তর করিয়াছিল তাহা ইতঃপূর্বের নাট্যসাহিত্যে পাওয়া যায় নাই। উত্তরটি এই:—"তুমি সতী, বিপদ ডেকে এন না, যারা সতীত্ব হারিয়েছে, তারা জানে যে, কি রত্ন কামুক পুরুষের ছলে ভুলে তারা হারিয়েছে। পর স্পর্শে প্রাণ যেন গেল, তোমার। দেহ তো পতির—সে দেহ কামদৃষ্টিতে দেখ্‌বে এই কি তোমার সাধ?"—এইরূপ যুক্তিপূর্ণ উত্তর পাইয়া বিরজা আর কাল-বিলম্ব না করিয়া সোনার পরামর্শমতো তাহারই কাপড় পরিয়া কারাগার ত্যাগ করিলেন।

নসীরাম চরিত্রটি নাটককারের অপূর্ব সৃষ্টি। এ জাতীয় মহাপুরুষ ইতঃপূর্বের নাট্যসাহিত্যে দেখা যায় নাই। ইঁহার প্রেমোন্মাদ ভাবের সম্পূর্ণ ছবি দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরিত্রে অর্ধ শতাব্দীরও কিছু অধিককাল পূর্বে কেহ-কেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। নসীরামের কথাবার্তায় রামকৃষ্ণ-কথামৃতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়ীর পাগ্‌লা-বামুন-আখ্যা নসীরামেও বর্তিয়াছে। রামকৃষ্ণের প্রভাব গিরিশচন্দ্রের উচ্চভাবমূলক নাটকের অনেকগুলির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এখানি সেগুলিরই অন্যতম।

প্রেমিক অনাথনাথকে কাপালিক জানাইল যে রাজা অর্থাৎ অনাথের পিতা বিরজার প্রণয়প্রার্থী হইয়াছেন এবং অচিরাৎ এ বিবাহ সম্পাদিত হইবে। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে অনাথনাথের মর্মস্থলে যে আঘাত আসিয়া পৌঁছিল তাহাতে তাঁহার জীবনের গতি সহসা পরিবর্তিত হইয়া গেল। মানব-জীবনের প্রতি তাঁহার যে ধিক্কার জন্মিল অবিশ্বাসিনী মাতার কার্যে হ্যাম্‌লেটের মনে যে নির্বেদ আসিয়াছিল, মাত্র তাহার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। পুত্রবধূর প্রতি রাজার আসক্তি দেখিয়া অনাথনাথ নিম্নপ্রকার মর্মবেদনা অনুভব করিয়াছিলেন:—

"কেবা জলে এ দারুণ বিষে,
পিতা হ'য়ে শত্রু হয় কার,

কেবা করে হেন ব্যবহার ?
ধিক্ হেয় প্রাণ কেন রাখি আর,
সত্য মিথ্যা সবিশেষ তত্ত্ব লব।
স্মৃতিলোপ হয় কি মরণে—
মরণে কি জ্বালা হয় দূর ?
মহানিদ্রা লোকে বলে,
সে নিদ্রায় দেখে কি স্বপন ?
হলাহল প্রাণে আর না সহিতে পারি !"

এই মর্মবেদনার সহিত হ্যামলেটের মর্মবেদনার সামঞ্জস্য দেখা গিয়াছে, তবে প্রভেদ এই—শেক্সপীয়র জাতীয়-সংস্কৃতির অভাবে খুল্লতাতের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য হ্যামলেটকে পাগল সাজাইয়া পাগলামীর ভান করাইয়াছিলেন ; অনাথনাথের সে সব কিছু বালাই রহিল না, জাতীয় কৃষ্টিবশে নাটককার তাঁহাকে নসীরামরূপ মহা-পুরুষের সঙ্গলাভ করাইয়া তাঁহার জীবনের গতি ভিন্নপথে পরিচালিত করিয়া দিলেন।

নসীরামের কি কথায় অনাথনাথের জীবনের গতি পরিবর্তিত হইল, তাহা বুঝিবার জন্য উভয়ের সংলাপের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—নসীরাম অনাথনাথকে বলিলেন—"আর তুমি যদি দিনকতক হরি-হরি কর্‌তে, তা'হলে আমি বুঝ্‌তেম যে, এগুলো ভোলা যায় কি না ? অনাথ—'হরি কে—হরি কি আছেন ?' নসী—'তা'নিয়ে তোমার মাথা-ব্যথা কেন ? জল্ জল্ করলে যদি তেষ্টা মেটে, তো জল নাই থাক্‌লো।' অনাথ—'তা কি হয়' ? নসী—'হয় না হয় পরখ ক'রে দেখলে বুঝতে পার। হরি নেই বলে কারা জান, যাঁরা একবার হরি হরি করেন, মনে করেন হরিকে খুব কৃপা করেছি—তবু হরি কেন এসে তাঁর বাপের বাগানের মালী হয় না; আর হরি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে না কারা জান, যাদের হরিনাম কর্‌তে কর্‌তে প্রাণ ভরে যায়, * * তারা সাবকাশ পায় না যে জিজ্ঞাসা করে, হরি, তুমি আছ কি না ? ততক্ষণ আর দুটো হরিনাম কর্‌বে।"

অতঃপর নসীরাম তাঁর বাল্যকালের ইতিহাস অনাথনাথকে শুনাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন যে হরিনামে বেশ মজা। অনাথ তাহাতে বলিয়াছিলেন—"মজাটা কি ?' নসী—'ঐ ভাবনাগুলো নাই। দেখ-দেখি, এ রকম হ'লে তোমার সুবিধা হয় কি ? মর্‌তেও চাই নি, বাঁচতেও চাই-নি, ও সব ভাবিই নি, জানি ও একদিন সুখ, একদিন দুঃখ আছে ; সুখ-দুঃখ দু'শালা সঙ্গের সাথী, ও যা হবার হোক্, আমি করি হরিবোল। * *' অনাথ—'নসীরাম, তোমার কি সংসারে চাইবার কিছু নাই ?' নসী—'চাইবার মত জিনিষ একটা দেখিয়ে দাও, পাই-না-পাই, তবু একবার চাই। সব ভুয়ো, সব ভুয়ো, সব ভুয়ো; সুন্দরী ছুঁড়ী—পুড়ে ছাই হবে, লোকজন—কোথায় যাবে, তার ঠিকানা নাই, টাকাকড়ি—আজ বল্‌ছো তোমার, তোমার হাত থেকে গেলেই ওর, আবার ওর হাত থেকে গেলেই তার—না যদি খরচ কর তো দু'হাতে দু'মুটো ধুলো ধর না কেন, বল, এই আমার টাকা * * একটা জিনিসের মত জিনিস দেখিয়ে দিতে পার তো চাই।' অনাথ—'তুমি যে হরি-হরি কর, হরিকে চাও না ?' নসী—'আরে দূর্‌,—যে আমার জন্ম ঘুরে বেড়ায়, তারে আবার চাব কি ? * *' অনাথ—'তুমি কি বল, হরি তোমার জন্ম ঘুরে বেড়ায় ?' নসী—'বেটা ঘুরবে না ? আমি তো আমি—পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ সবার জন্ম ঘুরে

বেড়ায়। কি খাবে, কোথায় থাকবে, আমি ওই মজা দেখে বেড়াই। খালি লুকোচুরি খেল্‌ছে—সকলেরই সাম্‌না-সাম্‌নি বেড়াচ্ছে, সকলকে দিচ্ছে, কিন্তু সবাই মনে কর্‌ছে, আমি বাগিয়ে নিলেম। * *' অনাথ—'আচ্ছা, নসীরাম, তোমায় যদি কেও বন্দী করে?' নসী—'বন্দী করে কি?—করেছে, পাঁচ-ভূতে করেছে, নইলে আমি রাজা-রাজড়ার বেটা, এমন ক'রে পড়ে থাকি? * *' অনাথ—'তুমি রাজপুত্র?' নসী—'তুমি কি বল হেংলা ঘরের ছেলে? তা হ'লে কেন লাপনা করে বেড়াতেম্‌। আমার বাবার হুকুম না হ'লে গাছের পাতাটাও নড়ে না।' অনাথ—'তবে তোমায় পাঁচভূতে বন্দী করেছে কেমন করে?' নসী—'বাবা বেটা মাথা পাগ্‌লা, দিলে দিন কতক বন্দী করে—সখ, সখের উপর কাজ। কে কথা কইবে বাপু * * সে যে কর্ত্তা।' অনাথ—'নসীরাম, তুমি আমার কাছ থেকে যেও না।' নসী—'আমি যাব না, তুমি না সরে যাও?' এইরূপ যুক্তিপূর্ণ অথচ প্রাণ-স্পর্শী বাণী শুনিয়া কাহার হৃদয় না মুগ্ধ হয়। অনাথনাথ মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

অনাথনাথ অবশেষে পিতার মুখে স্বকর্ণে বিরজা-ঘটিত ব্যাপার শুনিয়া সংসার ছাড়িয়া হরি সাধনার উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। মনের মধ্যে যে সংশয়টুকু ছিল গুরুরূপী নসীরাম তাহা দূর করিয়া দিলেন। গুরুর শেষ উপদেশটি এইরূপ:—"যে যতটুকু আপনার ভাবনা ভাব্‌বে, সে ততটুকু তফাতে থাক্‌বে। ভাবের ঘরে চুরি করবি নি, ঠিক্‌ঠাক্‌—কেউ কাটতে আসে ফিরে চাইবি নি, মজাসে হরিবোল—হরিবোল বল্‌বি—হরি বেটার বাপের মাথাব্যথা, তলোয়ার এনে ধরবে।"

এই নাটকের কাপালিকের ক্রিয়া দেখিয়া 'ওথেলো'র ইয়াগোকে মনে পড়ে, উচ্চাভিলাষ ও প্রতিহিংসা ইয়াগোর অস্ত্রবল ছিল। কাপালিকও উচ্চাভিলাষ-প্রণোদিত হইয়া নৃশংসতার বাকী কিছু রাখে নাই। কাপালিকের চিরাচরিত ধর্মের নামে সে যে চক্রান্তজাল বিস্তার করিয়াছিল, অবশেষে তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া সে মৃত্যুবরণ করিল। কাপালিকের চক্রান্ত ইয়াগোর চক্রান্ত অপেক্ষা জটিলতর ছিল।

সোণা চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের অভিনব সৃষ্টি। সিদ্ধ হইবার মানসে কাপালিক সোণার সতীত্ব নাশ করিয়া তাহাকে তাহার ভৈরবী করিয়াছিল। সোণা কাপালিককে নিজহস্তে হত্যা করিয়া এ অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছিল। সতীত্ব হারাইয়া সোণা সতীত্বের মহিমা বুঝিয়াছিল। তাই সে বিরজার সতীত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছে। নারী জীবনের মহত্বের গরিমা অনাথনাথের মাতৃ-সম্বোধন হইতে সোনা প্রথম অনুভব করিতে পারিয়াছিল। এ নূতন রসের আস্বাদনে সে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছে। কাপালিকের সঙ্গে কালীর সেবা করিয়া সোণা অবসর মতো কালী-নাম গাহিয়া বেড়াইত। সোনার মাতৃসংগীত আজও যেন রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহে প্রতিধ্বনিত হইতে শুনা যায়, এমনি মধুর সে সংগীতগুলি। রাজার প্রতি সোণা তাহার প্রতিহিংসা ভুলিয়া যায় নাই, কারণ তাহার সতীত্ব-নাশ-ব্যাপারে কাপালিকের কথায় সায় দিয়া ঐ রাজা সোণার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এ প্রতিশোধ-স্পৃহা নসীরামের প্রভাবে আসিয়া অবধি আর জিঘাংসা-মূলক হয় নাই। সোণা তাহার জীবনে স্নেহের স্বাদ পায় নাই, তাই সে নসীরামের অকৃত্রিম স্নেহে অভিমান করিল। এ অভিমানের অন্তরালে সে তাহার হৃদয়ের প্রেম-ভক্তির দ্বার রুদ্ধ রাখে নাই, বরং অজস্রধারে উহাকে প্রবাহিত হইতে দিয়া সে তাহার অন্তঃকরণের ছল-চাতুরী, যাহা তাহার কর্মময় জীবনের অবলম্বন ছিল, তাহা ধুইয়া-মুছিয়া যাইবার অবকাশ দিয়াছিল। জাদুকর যেমন

কুহক-দণ্ডবলে দর্শকমণ্ডলে বিস্ময় উৎপাদন করে, নসীরাম সেইরূপ তাঁহার হরিনামরূপ তারণমন্ত্র-বলে নাটকীয় চরিত্রগুলিকে মুক্তির পথে লইয়া গেলেন।

নসীরাম-নাটকের চরম-পরিণতি (climax) তৃতীয় অঙ্কে পরিসমাপ্ত হইয়াছিল, ঘটনাজালের বিস্তৃতি গুটাইবার জন্য চতুর্থ অঙ্কই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু নাটককার উপসংহারকে আরও একটু ফেনাইয়া পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে নাটকীয় প্রভাব (dramatic effect) লঘু হইয়াছিল, তাই নাটকখানির অভিনয় রঙ্গমঞ্চে বেশী দিন চলে নাই।

নসীরামের সংগীতবিভাগে নাট্যকারের কৃতিত্ব অসাধারণ। সোণার শ্যামা-সঙ্গীত আজও প্রতি নগরের বৈঠকখানায় ও দূর গ্রামের কুটীরে গীত হইতে শুনা যায়। গানগুলির প্রথম ছত্র এইরূপ:—(১) 'কে বলে রে সর্বনাশী, নাম নিলে তোর হয় আনন্দ', (২) 'তোর মুখ দেখে কি হয় না লো ভয়, কোন গুণে মা বলে তোরে', (৩) 'আমি ভস্ম মাখি জটা রাখি পরি গলে ফণির হার', (৪) 'মদমত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়', (৫) 'ভাতারকে পুরে গালে উঠ্‌লো কাকধ্বজ-রথে।' মাধুলীর প্রণয়-সংগীতের মধ্যে—'ব্যথা পাবে সরল প্রাণে ব্যথা দিও না' ও পাহাড়ীদের—'বাঁকা শ্যাম বাজায় বাঁশী', 'বাজা মাদল বোল হরিবোল' প্রভৃতি গানগুলির তুলনা নাই। এই Melo-dramaটি দর্শক বা পাঠকের চিত্তরঞ্জন করিয়াও শেষের দিকে রচনার দোষে জনপ্রিয় হয় নাই।

করমেতি বাঈ নাটক

করমেতি বাঈ এই বিভাগের শেষ নাটক, সংখ্যায় ইহা নবম। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে ইহা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহার উপাখ্যান-ভাগ বৈষ্ণবীয় 'ভক্তমাল' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। নাটককার সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ এই দৃশ্যকাব্যের ভিতরে করিয়াছেন। নাটকের উপসংহার-কালে জ্ঞান ও ভক্তির বিশ্লেষণ এত সূক্ষ্মভাবে সাধিত হইয়াছে যে, খেই হারাইয়া যাইলে বুঝা কঠিন হইয়া উঠে।

ভক্তিমার্গের সাধিকা কিরূপে শুদ্ধা-ভক্তি বা প্রেম-লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিশিষ্ট রূপ নাটককার করমেতি চরিত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন। অজ্ঞান-তমসার ভিতর হইতে প্রেমের আকর্ষণে কিরূপে বিমল জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়াছিল তাহার প্রকৃষ্ট রূপ নাট্যকার আলোক চরিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন।

পরিবেশ ও শিক্ষার প্রভাব মানুষের জীবনে প্রতিফলিত হয় একথা জীববিজ্ঞান মানিয়াছে, কিন্তু পূর্বজন্মের সংস্কার মানুষের ইহজন্মের ক্রিয়া-কলাপকে যে প্রভাবিত করিতে পারে এ কথা জীববিজ্ঞান স্পষ্টত স্বীকার না করিলেও অস্বীকার করে নাই। পূর্ব-জন্মার্জিত সংস্কার সাধনার পথে কিরূপে সহায় হইয়া উঠিয়াছিল তাহার আভাস করমেতি চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। সংস্কারগুলি এইরূপে ক্রীড়া করিয়াছিল:—(১) করমেতির মনোমধ্যে ইষ্টের অনুভূতি,—যেমন, করমেতি অম্বিকাকে একস্থানে বলিয়াছেন:—"দেখ-দেখ কেমন ফুল ফুটে আছে। আমার মনে হ'চ্ছে যেন কে বসে আছে, তার রাঙা পা দুখানি দুল্‌ছে"; (২) করমেতির দ্বৈতবোধ (duality) এবং তজ্জন্য নিঃসঙ্গ না থাকার ভাব,—যেমন, করমেতি তাঁহার পিতাকে বলিয়াছেন:—"বাবা, আমি একেলা নেই, আমি একবারও একেলা থাকিনি, আমার সঙ্গে কে থাকে"; (৩) পূর্ব ও পরজন্ম রূপ অস্পষ্ট বেষ্টনীর মধ্যে ইহজন্মের সাময়িক

অনুভূতি,—যেমন, করমেতি বলিতেছেন :—"কেউ জানে না কোথায় ছিলুম, কেউ জানে না কোথায় যাব, আগাশেষ জানে না, মাঝে দিন কতকের জন্যে করমেতি নাম দিয়েছে। আমিও ডাকলে করি 'হুঁ'। আচ্ছা, এখানে কি হ'চ্চে, এমন সব কচ্চে কেন? খেলা কচ্চে, খেলা কচ্চে। এত খেলেছে যে, খেলা কি সত্যি মনে নেই! আমিও খেলেছি, আমারও মনে নাই;" (৪) সামাজিক নীতির (Morality) কথা যাহা পরোক্ষে করমেতি শুনিয়া আসিয়াছেন তাহার প্রভাব,—যেমন, খানসামারূপী, আলোককে তিনি একস্থানে বলিয়াছিলেন :—"না, তোমার সঙ্গে কথা কওয়া আমার উচিত নয়। কথা ক'য়ে কুকর্ম করেছি।"—এই সব সংস্কারলব্ধ জ্ঞান কি করিয়া করমেতির সাধনার সহায় হইয়াছিল, তাহা নাটকের দর্শক বা পাঠকমাত্রেই নাটকখানির অগ্রগতি-পথে দেখিয়াছেন, ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন কুসঙ্গপ্রয়াসী আলোকের মনে করমেতির এ সকল কার্য-পরম্পরা যথেষ্ট প্রভাব সঞ্চার করিতে পারিয়াছিল, যাহার ফলে—'প্যান্-পেনে', 'ঘ্যান্-ঘেনে', 'মুখ্-মোচানে', 'পা-টিপুনে' স্ত্রীর মামুলি ভালবাসার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া আলোক করমেতিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে পারিয়াছিল :—"এ যদি আমার হয়, এ কি গোলামী করে? কখন না। এ কি মিছে মন যোগায়? কখন না। এ কি দেখানো সেবা করে? না, না, কখন না। ছি ছি! আমি পত্নী ফেলে গণিকা নিয়ে ছিলেম! বাবা পাপ-পুণ্যি কিছু বুঝ্‌তে পাত্তুম্ না। এখনও যে পারি, তাও বল্‌চিনি। কিন্তু পাপের অন্য সাজা থাকুক্ বা না থাকুক্, এই রত্ন বুকে না রেখে ভাঙা কাঁচ বুকে দিয়ে বুক আঁচ্‌ড়েছি। এর যদি ভালবাসা পাই ত ফকির হই।"

করমেতির সংস্পর্শে আলোকের তামসিক প্রেম ক্রমশঃ রাজসিক ভাব ধারণ করিল। করমেতির 'আপনাতে আপনি না থাকার ভাব', 'অঘোর' থাকার মতো 'পরাধীন' অবস্থা আলোক বুঝিতে পারিত না, তাই কিরূপে করমেতিকে সে বশীভূত করিবে তাহার সন্ধানে সর্বদা ফিরিত। আগমবাগীশের প্ররোচনা সত্ত্বেও আলোকের মনে করমেতির শ্যাম-সম্বন্ধীয় সন্দেহ পাকা হইয়া বসিল না। প্রেম কি বস্তু এবং তাঁহার প্রতি আলোকের ভালবাসার ওজন বুঝাইবার জন্য করমেতি আলোককে এইরূপ বলিয়াছিলেন :—"তুমি ভালবাসা জান না, তুমি ভালবাসার ভান ক'রো না, জান্‌লে তুমি ও কথা বল্‌তে না, আমায় তোমার হ'তে বল্‌তে না। তুমি আপনার মনেই বুঝ্‌তে যে, যারে ভালবাসি তার, আর কারুর হওয়া যায় না। যদি ভালবেসে থাক, আমি দেখি, কেমন তুমি আর কারুর হও? আপনি আর কারুর হয়ে, তুমি আমায় তোমার হ'তে বল?" করমেতির উপরিউক্ত সরল ব্যাখ্যার মধ্যে ভালবাসার আসল মর্ম (Key note) উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। রাজসিক-প্রণয়ী আলোকের করমেতিকে উপভোগ করিবার বাসনা তখনও যায় নাই, তাই সে করমেতির উপরিউক্ত প্রণয়ের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। প্রেম যখন উপরের স্তরে উঠে, তখন তাহার ধর্ম এইরূপ হয় যে, সে প্রণয়ের পাত্র বা পাত্রীকে ভুলিতে পারে না, অষ্টপ্রহর তাহারই ধ্যানে ও জ্ঞানে বিভোর হইয়া থাকে।

কুচক্রীর পরামর্শে আলোক করমেতিকে ষোল আনা পাইবার লোভে শ্যাম দেখাইবার ছল করিয়া নিজগৃহে আনিল, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল দাঁড়াইল। করমেতি বলিলেন :—"তুমি কাকে ভুলিয়ে এনেছ? ভাবছ 'আমাকে'?—এই মাটির দেহটাকে? মাটি পড়ে থাক্‌বে আমি শ্যামের কাছে যাব! শ্যাম আমার অন্তরে-অন্তরে, শিরায়-শিরায়, মজ্জায়-মজ্জায় প্রবেশ করেছে, তুমি ছাড়াবে কেমন ক'রে।

* * আমি শ্যামকে পাব, * * আমার ভালবাসা আমায় বিশ্বাস দিয়েছে। তুমি ভালবাস না, তোমার সকলি অবিশ্বাস, তাই তুমি আমায় ছল ক'রে এনেছ।"

করমেতি আরও শুনিলেন যে, শ্যামকে কষ্ট দিবার জন্য আলোক তাঁহাকে এখানে আবদ্ধ রাখিয়াছে। করমেতি তখন শ্যামকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে এইরূপ বলিলেন:—"তুমি ছাড়া ত আর আমার কেউ নেই শ্যাম! * * যা প্রাণ চলে যা, শ্যামের কাছে চলে যা, যে কাণে শ্যামের নিন্দে শুনেছি, সে কাণ হেথা পড়ে থাকুক! যে চক্ষে শ্যামের নিন্দুককে দেখেছি, সে চোখ হেথা পড়ে থাকুক্। যে দেহে এ পাপগৃহে সেঁদিয়েছি, সে দেহ হেথা পড়ে থাকুক্।" আলোকের কথায় করমেতি অবশেষে নগ্ন প্রকৃতির মধ্যে শ্যামকে দেখিবার জন্য কাতর প্রাণে জানালার ভিতর দিয়া বহিঃপ্রকৃতি দেখিতে লাগিলেন এবং ভাবাতিশয্যে উহার মধ্যে শ্যামের প্রতিমূর্তি দেখিয়া তাহা ধরিবার জন্য জানালা হইতে ঐ বহিঃপ্রান্তরের মধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। আলোক করমেতিকে এরূপে আত্মঘাতিনী হইতে দেখিয়া মূর্হাপ্রাপ্ত হইল এবং মূর্ছাভঙ্গে করমেতির মতো সেও জানালা দিয়া নীচে লম্ফ দিল। করমেতির সমগতি লাভ করা তাহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে অক্ষতদেহে বাঁচিয়া গেল।

শ্যামের কৃপায় করমেতিও কোন আঘাত পান নাই। পরে বনপথে হাঁটিয়া প্রান্তর মধ্যে দুইজন রাজদূতকে দেখিতে পাইয়া আত্মগোপন করিবার মানসে করমেতি ঐ স্থানে পতিত একটি মৃত মহিষের দেহাভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইলেন। শৃগাল ঐ মহিষটির উদরের অভ্যন্তর-ভাগ ভক্ষণ করিয়া করমেতির প্রবেশপথের সুবিধা করিয়া দিয়াছিল। রাজদূতগণ চলিয়া যাইলে করমেতি নিষ্ক্রান্তা হইলেন। টুকরো দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিল। সে আরও বুঝিয়াছিল যে, শ্যাম কোন লোক নহে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এই অভাবনীয় ঘটনায় সে এরূপ অভিভূত হইল যে, রাজার বিজ্ঞাপিত হাজার টাকা পুরস্কার, যাহা করমেতিকে ধরাইয়া দিলে সে অনায়াসে লাভ করিতে পারিত তাহার লোভ ত্যাগ করিয়া সে করমেতিরই সেবায় আত্মনিয়োগ করিল।

করমেতির অদর্শন আলোকের প্রাণে দারুণ ব্যথার সৃষ্টি করিল, কিন্তু পথিমধ্যস্থ এক ফকিরের কথায় তাহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইবার সূচনা হইল। ফকির আলোককে এইরূপ বলিয়াছিলেন:—"সে (করমেতি) যারে চায় তার কাছে যাও। সে যদি না চায়, তার পায়ে ধর। এর পেছুতে যেমন ঘুরেছিলে, তার পেছনে তেমনি ঘোর। তার মন ভুলিয়ে তোমার ইয়ারের (করমেতির) সঙ্গে মিলিয়ে দাও। যদি পার—তোমার ব্যথা যাবে। সে তার ইয়ারকে পেয়ে যখন হেসে-হেসে চাইবে, যখন ইয়ারের সঙ্গে দোস্তি কর্ব্বে, সে যদি তোমার প্রাণে বরদাস্ত হয়, তা হ'লে তোমার প্রাণের ব্যথা যাবে।" ফকিরের উপরিউক্ত কথায় এবং তৎপূর্বে করমেতির ঐ জাতীয় উপদেশে আলোক মনস্থির করিতে পারিল না, বা তাহার পূর্ব স্মৃতি মুছিয়া গেল না। আলোক তখন সম্মুখবর্তী যমুনা নদীর কালো জলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল,—ভাবিল, তাহা হইলে মনের মধ্যে আর বিঘ্ন উঠিবে না।

শ্রীকৃষ্ণ সেই মুহূর্তে ব্রাহ্মণবালক বেশে আবির্ভূত হইয়া আলোককে বলিলেন—"তুমি কি পাগল! যমুনার জলে প্রাণ দিতে যাচ্ছ, মনের হাত এড়াব ব'লে? ম'লে কি হয়, তা ত জান না। ম'লে মন যদি সঙ্গে থাকে, তা হ'লে কি হবে?" শ্রীকৃষ্ণের কথায় আলোক বলিল—"মৃত্যু নিশ্চয়, কিন্তু

ম'লে কি হয়, জানা নেই। মন যদি যায় কি থাকে? থাকে, থাকে—আভাস পাচ্ছি থাকে। তবে সেই আমি, মন যা করে করুক, মনের কথায় থাকবো না। সেই আমি, সেই আমি।" আলোক ব্রাহ্মণরূপী কৃষ্ণমুখ-নিঃসৃত বেদান্তের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া ঐ কথাগুলি বলিতে পারিয়াছিল। অজ্ঞান অন্ধকার হইতে কিরূপে সে জ্ঞানপথে আসিয়া সোঽহম্-তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিল, নাটককার তাহার চিত্র এই দৃশ্যকাব্যের মধ্যে দেখাইয়াছেন। করমেতি বিষ্ণুলোক হইতে আসিয়া প্রেম শিখিবার জন্য রাধিকার সখী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণের কৃপায় তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছিল। নিষ্কাম প্রেমের দ্যোতক রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি যথাক্রমে ভক্তি ও জ্ঞানমার্গের সাধকদ্বয় দর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের যুগলমূর্তি পুরুষ-প্রকৃতিরই প্রতীক; বেদান্তের সোঽহম্‌তত্ত্ব ও ভক্তিশাস্ত্রের 'যুগলমিলন-তত্ত্ব' একার্থজ্ঞাপক, বড়ই সূক্ষ্ম ইহার বিশ্লেষণ। গিরিশচন্দ্র সে কার্য দক্ষতার সহিত সাধন করিয়া গেলেন।

'করমেতি বাঈ' দৃশ্যকাব্যে নাট্যকার (১) 'সুরয চন্দ্রমা কাঁহা ছিপায়া কাঁহা ছিপায়া তারা,' (২) 'তুমে করার কিয়া আবি ইয়াদ্ হ্যায় ইয়া নেহি,' (৩) 'তোম্ ত নেই করার কিয়া ময় পিছে ফিরা। কসুর তোমায়া না, কসুর মেরা' প্রভৃতি সংগীতের ভিতর দিয়া নূতন ভাবের কথা প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গানগুলি বহুকাল জীবিত থাকিয়া নাট্যামোদীদের আনন্দ বিতরণ করিয়াছে; হিন্দী সাহিত্যও ঐ গান দুখানির দ্বারা গৌরবযুক্ত হইয়াছে।

এই দৃশ্যকাব্যের রচনাশৈলী নূতন ধাঁচের। রসগ্রাহী দর্শক বা পাঠক ব্যতীত এ রস গ্রহণ করা সুকঠিন, অভিনয়ের ত্রুটি থাকিলে তো কথাই নাই! অধুনা শিক্ষিত অভিনেতা ও অভিনেত্রী সহযোগে এ নাটকখানি নূতন করিয়া অভিনীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অষ্টাদশ শতকের জার্মান কবি গ্যেটে (Goethe) বলিয়াছেন যদি কোন কবির ভাবাদর্শ (soul) Sophoclesএর মতো উচ্চস্তরের হয়, তাহার প্রভাব মানুষের উপর নৈতিক না হইয়া যায় না। "(If a poet has as high a soul as Sophocles, his influence will always be moral)" 'করমেতি বাঈ' নাটকের ভাবাদর্শ তাই গিরিশচন্দ্রের হাতে মামুলি নায়িকার সাধারণ ক্ষেত্র হইতে নৈতিক ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছে।

টুকরো, দেমো, আগমবাগীশ, অম্বিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র চরিত্রে নাটককারের লোকচরিত্র-জ্ঞানের পরিচয় আছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের সহিত না মিশিলে এ অভিজ্ঞতা জন্মে না। *এ নাটকখানি বাহ্যতঃ বিষাদাত্মক, কিন্তু আন্তর-মিলনাত্মক। এ শ্রেণীর নূতন নামকরণ আবশ্যক।*

গিরিশচন্দ্রের উচ্চভাবমূলক দৃশ্যকাব্যের আলোচনা এইখানেই সমাপ্ত হইল। রঙ্গমঞ্চের দূষিত আব্‌হাওয়া এ বিভাগীয় নাটকগুলির অভিনয়-দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক ও উচ্চভাবমূলক দৃশ্যকাব্যগুলির ক্রমিক অভিনয় দেখিতে দেখিতে তদানীন্তন হিন্দুসমাজের মধ্যে অধ্যাত্মভাব কিরূপ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল সে সম্বন্ধে সমসাময়িক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' কবি নবীন সেনের 'অমিতাভের' সমালোচনা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল তাহার মর্মানুবাদ এইরূপ:—"গত ১৫ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা দেশে আধ্যাত্মিক উন্নতি কি পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার পরিমাপ করিলে বুঝা যায় বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের শক্তি সে অবদানের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। এ শক্তি নাট্যালয়ে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল ধর্ম সম্বন্ধীয় বা পৌরাণিক

নাটকসমূহের ক্রমিক অভিনয়-দ্বারা। ঐ সকল নাটক যেন কয়েক বৎসর ধরিয়া দেশবাসীর প্রাণের সাড়া লইয়াই রচিত হইয়াছিল। *

Nicholl, Marriott, Bradley, Moulton, Morgan প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্ত্য নাট্য-সমালোচকগণ পৃথিবীর নানাবিধ নাট্যসাহিত্যের আলোচনা করিয়া নাটক সম্বন্ধীয় কতকগুলি সংজ্ঞার সৃষ্টি করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহারা অজ্ঞ বলিয়া আধুনিক বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের আলোচনা করেন নাই। কিন্তু সে দিন অধিক দূরে নাই যে দিন পৃথিবীর জন-সংখ্যার বিচারে সপ্তম স্থান অধিকারিণী বঙ্গভাষায় লিখিত আধুনিক নাট্যসাহিত্য যাহাকে গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্ম ক্ষেত্রের গতাগতি লইয়া সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাহা আর উপেক্ষিত হইয়া থাকিবে, তখন আরও কতকগুলি নাটকীয় নূতন সংজ্ঞা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইবে।

সামাজিক বিভাগ

আমরা ক্রমশঃ গিরিশচন্দ্রের সামাজিক দৃশ্যকাব্য-বিভাগে প্রবেশলাভ করিলাম। সমাজের স্বাভাবিক গতিভঙ্গী, তাহার সমস্যা, সংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয় সামাজিক নাটক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। বর্ণ-বিদ্বেষ ও বৃত্তি-বিরোধও ইহার অন্তর্গত হইবার জিনিস।

প্রফুল্ল নাটক

এই বিভাগের প্রথম নাটক 'প্রফুল্ল' ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রেল তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহার কতকগুলি সমস্যামূলক (problematic) এবং বাকিগুলি সামাজিক দোষগুণের স্বাভাবিক পরিণতি সাপেক্ষ (subjective of natural sequence) প্রফুল্ল নাটকখানি দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্গত।

দরিদ্র অবস্থা হইতে সম্পদ শিখরে আরূঢ় কোন কলিকাতাবাসী গৃহস্থ-পরিবারের কর্তা যোগেশ কর্ম হইতে অবসর লইবার পূর্বে পূর্ণ নিশ্চিন্ততা লাভের জন্য শান্তি-নীড় বাঁধিবার উপক্রম করিবার কালে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় কিরূপে সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, এবং সেই ঘটনাজনিত মানসিক আঘাতে অভ্যস্ত কু-অভ্যাসের ফলে তিনি তাঁহার সাজানো সংসার কিরূপে নষ্ট করিয়াছিলেন তাহার চিত্র লইয়া এই দৃশ্যকাব্য-খানি রচিত হইয়াছে। যোগেশ নাটকের নায়ক। এক কড়া গো-দুগ্ধের উপর এক বিন্দু গো-মূত্র পতনের মতো সর্ববিধ গুণমণ্ডিত যোগেশের নিয়মিত সুরাপানরূপ কু-অভ্যাসটি নাটকের ভাষায় বলিতে যাইলে তাঁহার 'সাজান বাগান' কিরূপে শুকাইয়া দিয়াছিল তাহার বিবরণ উক্ত নাটকের প্রতি ছত্রে মর্মরিত হইয়া উঠিয়াছে—এমনই নাটককারের রচনা-শক্তি।

---

* "One result of the spiritual revival of Bengal that has been gathering force during the last decade and half, is the spiritualising of the national literature. This is most apparent on the stage, religious and mythological dramas have been, during the past few years, the order of the days." কবি নবীন সেনের 'আমার জীবন' ৫ম ভাগ, পৃষ্ঠা ৪৩ হইতে সংগৃহীত।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যোগেশ যখন নিশ্চিন্ত হইবার জন্য তাঁহার বৈষয়িক ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিয়া সমুদয় ভারতবর্ষ বেড়াইবার সংকল্প লইয়া প্রকৃত আমোদ উপভোগের নিমিত্ত মদের গেলাস হাতে ধরিয়া স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন :—'বড়-বৌ আজ বড় আমোদের দিন,'—তখন সেই আমোদের ধ্বনি তাঁহার কর্মচারী পীতাম্বর কর্তৃক আনীত ব্যাঙ্ক ফেল্ হওয়ার সংবাদে,—"অ্যাঁ। অ্যাঁ। আমার যে যথাসর্বস্ব সেথা! আজ বড় আমোদের দিন! আজ বড় আমোদের দিন! আবার ফকির হলুম * * যাও পীতাম্বর, যাও—খাতা তয়ের কর গে, ইন্‌সল্‌ভেণ্ট কোর্টে দিতে হবে। আমি এখন জেলে বেড়াতে যাই"—কথাগুলির মধ্য দিয়া প্রকৃত আমোদের অকস্মাৎ ব্যর্থতায় 'ফকিরী' আমোদ তাহার প্রথম নাটকীয় আঘাত দ্বারা কিরূপ মর্মভেদী হাহাকারের প্রতিধ্বনি তুলিল তাহা একান্তে বুঝিবার সামগ্রী। এই অদ্ভুত ট্র্যাজিক নাট্যগৃহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার দ্বার এইখানেই উদ্‌ঘাটিত হইল।

অ্যারিস্‌টট্‌লের tragedy নাটকের সংজ্ঞা অনুসারে নায়ক যোগেশ তাঁহার সমুন্নত অবস্থা থেকে পড়িলেন এবং ঐ পতনটি তাঁহার মদ-খাওয়া রূপ একটি ভুল অভ্যাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত ('the tragic hero falls from a position of lofty eminence, and the disaster that wrecks his life may be traced not to deliberate wickedness but to some great error of frailty').

যোগেশের নীতি (morality) ভিন্ন প্রকৃতিক ছিল। তিনি কারবারী লোক—'লেন-দেনে' খাড়া থাকা (honesty and straight-forwardness in dealings) তাঁহার কারবারী মূলধন (asset) ব্যাপারী-মহলে সুনাম ও বিশ্বাস রক্ষা করিয়া তিনি এতদিন চলিয়াছিলেন, আজ সর্বস্বান্ত হইয়াও ঐ বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে চাহিলেন না। বর্তমান বিপদে ব্যাপারীদের ডাকাইয়া বিষয় বিক্রয় করিয়া সেই বিক্রয়-লব্ধ অর্থে তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ভ্রাতা রমেশকে ব্যবস্থা করিতে বলিলেন।

রমেশ শিক্ষিত এটর্ণী হইয়াও স্বভাবে অতিমাত্রায় স্বার্থপর, তাই কূটবুদ্ধি ও দুর্নীতি দ্বারা সে পরিচালিত হইতে চায়। যোগেশের অর্থ যাহাতে পাওনাদারের উদরস্থ না হইয়া তাহার ভোগে আসে—এমন কি অপর ভ্রাতা সুরেশকেও বঞ্চিত করিয়া—তাহার জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। যোগেশকে মাতাল করিতে না পারিলে রমেশের অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিবে না, তাই সে এক অভিনব কৌশলে বিকারগ্রস্ত (delirious) রোগীর সম্মুখে যেমন চিকিৎসকের অনভিপ্রেত খাদ্য লোকে ভ্রম-বশে ফেলিয়া যায়, সেইরূপ ভঙ্গীতে যোগেশের সম্মুখে মদের বোতলটিকে কোন পরবর্তী মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্তের (Psychological moment) কার্য সম্পাদনার জন্য রমেশ যেন ভ্রমবশেই রাখিয়া গেল।

কৃতকার্যতার এমনই মোহ যে পরিশ্রমে ও চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয়—এইরূপ ধরণের একটা বিশ্বাস যোগেশের মনে এতদিন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় আজ তাহার ভিত্তি শিথিল হইয়া গেল। রমেশের গুপ্ত ইঙ্গিতে যোগেশের পুত্র যাদব যখন সুরেশের ঘাকড়ী-চুরির কথা তাহার পিতাকে আসিয়া বলিল, যোগেশের মনে তখন এইরূপ চিন্তা উদিত হইল :—"আমার মনে মনে স্পর্দ্ধা ছিল যে, পরিশ্রমে—চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয়, সে দর্প চূর্ণ হ'ল। চেষ্টায় ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া রোধ হয় না, দরিদ্র হওয়া রোধ হয় না, ভাই চোর হওয়া রোধ হয় না, বৃদ্ধমাকে বৃন্দাবনে পাঠান হয় না, চেষ্টায় কোন কার্যই হয় না। আমি আজীবন চেষ্টা কল্লেম, কি ফল পেলেম? চিন্তা! চিন্তা! চিন্তায় চিরকাল গেল। * * আজ কোন কথার তত্ত্ব কর্‌বো না, যা হয় হোক্; আজ থেকে আমার চেষ্টা রহিত।" রমেশ কর্তৃক পূর্ব হইতেই রক্ষিত সুরার বোতলটি সম্মুখে দেখিয়া—"এই যে সুরাদেবী! যখন

কৃপা ক'রে এসেছ, আমি পরিত্যাগ করবো না, আজ থেকে তোমার দাস (মদ্যপান)"। নাটকীয় আঘাতের দ্বিতীয় প্রতিঘাত এইখানেই শুরু হইল। উপর্যুপরি প্রতিঘাত-পরম্পরায় যোগেশের মন বিস্মৃতি খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, তাই যাদবের প্রতিবাদ সত্ত্বেও যোগেশ মদ খাইতে খাইতে বলিয়াছিলেন—'তুমি যাও, আমি তোমার বাবা নই। বিস্মৃতি! বিস্মৃতি! আমায় বিস্মৃতি দান কর।'

যোগেশ ক্রমে ক্রমে মদের বোতলে 'লোকলজ্জা' ও 'মাতৃসম্মান' উভয়ই ডুবাইয়া দিলেন, এবং মাতার সম্মুখে মদ খাওয়ার সংকোচ মিটাইয়া দিবার উদ্দেশে বলিলেন—"আর মাকে ভয় করি নি। আমি যে লক্ষ্মীছাড়া! লক্ষ্মীছাড়ার ভয় কি?" অতুল ঐশ্বর্য কর্পূরের মতো হঠাৎ উবিয়া যাওয়ায়, যোগেশের মনে ঐ ঘটনা এমনই গভীর রেখাপাত করিয়া দিল যে পূর্বোক্ত বাক্যগুলি যেন আপনা হইতেই নিঃসৃত হইয়া গেল।

রমেশ যে সুযোগের অবসর খুঁজিতেছিল, আজ তাহা উপস্থিত হইল। যোগেশকে মাতাল দেখিয়া তাহার স্বার্থবিজড়িত কাগজপত্র সই-মোহর করিয়া লইল; কিন্তু মাতাল হইলেও এ ঘটনা বুদ্ধিমান যোগেশের অবিদিত রহিল না। আঘাতের পর আঘাত আসিয়া সংসারের কুৎসিত রূপ, চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠায় যোগেশের আত্ম-বিশ্বাস অপহৃত হইয়াছিল। রমেশকে উদ্দেশ করিয়া তাই তিনি এইরূপ বলিলেন—"কি-কি, কি ভাব্‌ছ? কাজ গুছিয়েছ; আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। যা খুসী কর, আমায় মদ দাও।"

ঘটনা পরম্পরায় মোহ্যমান হইয়া অন্যকথার প্রসঙ্গে যোগেশ তাঁহার মাতাকে বলিলেন—" * * রমেশ মাতাল দেখে সই করে নিয়ে গেল। কে জানে কি সে—চেষ্টা ক'রে তো এই করলুম্! মনে কচ্চো মাত্‌লামি কচ্ছি? না মনের দুঃখে বল্‌ছি, বল্‌তে বল্‌তে আগুন জ্বলে উঠে, জল দিই (মদ্য পান)। মা, তুমি কিছু বলো না, তোমার বড় ছেলে আজ মরেছে।"

বাহিরে সাধুর মুখোস পরিয়া নাটকের মধ্যে রমেশ ক্রমশঃ যে চক্রান্তজাল বিস্তৃত করিতেছিল তাহার মধ্যে ব্যাঙ্কের দেওয়ান, পীতাম্বর, জ্ঞানদা, উমাসুন্দরীও আবদ্ধ হইলেন। রমেশ যোগেশকে প্রকৃতিস্থ হইবার সুযোগ আর দিল না, এমন করিয়া ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সে সাজাইয়া তুলিতেছিল। ব্যাঙ্কের পুনর্জীবিত হইবার সংবাদ সে গোপন রাখিল। পাওনাদারকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে বিষয়টা বেনামী মর্টগেজ করিয়া হস্তগত করিবার জন্য কাঙ্গালী ডাক্তারের সাহায্যে ঔষধের ছদ্মনামে বোতল-ভরা মদ খাওয়াইয়া যোগেশকে উত্তেজিত করিতে লাগিল।

পূর্ব হইতে শিখাইয়া-পড়াইয়া জ্ঞানদা ও উমাসুন্দরীকে রমেশ নিজ কার্য উদ্ধারের সহায় করিয়া লইল। মাতাল অবস্থায় সইকরা পূর্বদিনের কাগজগুলি বেনামী মর্টগেজ দলিল জানিতে পারিয়া যোগেশ উত্তেজিত কণ্ঠে রমেশকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"রমেশ, রমেশ, শোন-শোন আমি সই করেছি?" রমেশ বলিল—"আজ্ঞে আপনি করেছেন কি?—আমি সই করিয়ে নিয়েছি, আমি তো বল্‌ছি।" যোগেশ হতাশ্বাসে বলিলেন—"তবে জোচ্চোর হয়েছি!" যোগেশ রমেশকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—'মর্টগেজ কি ব্যাপারীদের দেখিয়েছ?' রমেশ যোগেশের কথায় সায় দিল, তখন যোগেশের রুদ্ধ আবেগ নিম্নলিখিত কথাগুলির ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইল—"তবে তো কাজ অনেক এগিয়েই রেখেছ। ভাই, একটা কথা আছে, 'বিষম-সমিস্যে' তার মানে আমি বুঝ্‌তুম্ না—আজ বুঝ্‌লুম, আমার 'বিষম [illegible]'। [illegible] অনুরোধ, স্ত্রীর অনুরোধ, হয় ভাই জোচ্চোর, নয় আমি জোচ্চোর, তা

একজনের উপর দিয়েই স'ক্। কুনাম রটুতে দেরি হয় না। মাতাল নাম রটেছে, এতক্ষণ জোচ্চোর নাম্‌ও বাজ্‌লো। মা, তুমি জান, ছেলেবেলা থেকে আমার উপর দিয়ে অনেক সয়েছে; আজও স'ক্। বড়বৌ, খুব কোমর বেঁধে এসে দাঁড়াবে—জচ্চুরি করে বিষয় রাখ্‌বে। পার ভাল, আমি বাধা দেব না। আমার—আমার সব ফুরিয়েছে! যখন সুনাম গেছে—সব গেছে—সব গেছে, আর কিসের টানাটানি? আর মমতাই বা কিসের? ভায়া তো রেজেষ্টারী করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছ, চল, শুভস্য শীঘ্রং। আমি কাপড় ছেড়ে আসি, পথে শিখিয়ে দিও, কি বল্‌তে হবে। মা তোমার না ওষুধ নিয়ে ছেলে হয়েছিল? বেশ ওষুধ নিয়েছিলে!—একটি মাতাল, একটি জোচ্চোর, একটি চোর!" নরভাগ্য কি সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়া মানুষকে নাচায় নাট্যকার এখানে তাহাই দেখাইলেন। নাটকীয় পরাকাষ্ঠার দিকে আগাইয়া চলার ইহা একটা কৌশল।

এই বেনামী মর্টগেজ-সইয়ের ব্যাপারে যোগেশ মনোমধ্যে বিষম আঘাত পাইয়াছিলেন। তাঁহাকে বিচলিত দেখিয়া তাহার স্ত্রী জ্ঞানদা অগত্যা তাঁহাকে বিষয়-বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করিতে বলিলেন। এই কথার উত্তরে যোগেশের কথাগুলি কি হৃদয়ভেদী! যোগেশ বলিলেন—"আর গোড়া-কেটে আগায় জল কেন? সুনাম খুইয়েছি! সুনাম খুইয়েছি! জীবনের সার-রত্ন হারিয়েছি—পিতৃবিয়োগে দরিদ্র হয়েছিলুম, কিন্তু পরশমণি সুনাম ছিল, সেই পরশমণি যাতে ঠেকেছে, সোণা হ'য়েছে—সে রত্ন আর আমার নাই! চল রমেশ, তবে তয়ের হও!"

রমেশ কাঙ্গালী ও জগমণির সাহায্যে সুরেশকে মাকড়ী-চুরির অপরাধে পুলিসে গ্রেপ্তার করাইল। পীতাম্বর রেজেস্‌টারী অফিস থেকে যোগেশকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া চুরি অপরাধে সুরেশের গ্রেপ্তার হইবার সংবাদও তাঁহাকে জানাইল। যোগেশ ইহাতে যে উত্তর দিলেন, তাহা এইরূপ:—"আমায় কি বল্‌তে এসেছ—যাও, মেজবাবুর কাছে যাও, যাও মার কাছে যাও, যাও বড় বো'র কাছে যাও। যারা বিষয় রক্ষা কচ্ছে, তাদের কাছে যাও। আমি রেজেষ্টারী অফিসে এক কলমে বিষয়-মান-মর্য্যাদা তোমাদের মেজবাবুকে দিয়ে এসেছি। বাকি প্রাণ, তার ওষুধ এই। (বোতল প্রদর্শন)।" এখানে পরাভিতের অভিমান কেমন তাহার কার্য করিতেছে। পীতাম্বর বিশেষ জেদ ধরিলে যোগেশ আরও বলিয়াছিলেন:—"আমি কিছু শুনবো না বলেই মদ খাচ্ছি, প্রাণ বেরুবে ব'লে মদ খাচ্ছি। আমার মহাজন শুঁড়ী, কারবার মদ খরিদ, লাভ জ্ঞান বিসর্জ্জন; এই তে যদ্দিন যায়।" উমাসুন্দরী ও জ্ঞানদা সুরেশের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে কথা বলিতে আসিলে যোগেশ তাঁহার পূর্বের প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতার কথা বলিয়া বর্তমান নিরুপায় অবস্থার কথা তাঁহাদের জানাইয়া দিলেন।

জ্যেষ্ঠপুত্রের গুণগরিমা স্মরণ করিয়া উমাসুন্দরী তখন সুরেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া যোগেশকে মদ খাওয়া বন্ধ রাখিতে বলিলেন। অভিমানী যোগেশ তাহাতে বলিলেন—"ভাল, তোমার ঋণ তো শোধ দিয়েছি, রেজেষ্টারী ক'রে দিয়েছি, আর তোমার অনুরোধ কি? যা কারুর হয় না, তা আমার হয়েছে, মাতৃ-ঋণ শোধ গিয়েছে!" মাও ক্ষুব্ধচিত্তে সমান অভিমান-ব্যঞ্জক-স্বরে পুত্রকে বলিলেন:—"* * যোগেশ, তুই এ কথা বল্‌লি? তোর যে আমি বড় পিত্তেস্ করি।" মার এবংবিধ কথায় যোগেশের প্রাণের ক্ষতদ্বার দিয়া পুনরায় রক্তমোক্ষণ আরম্ভ হইল, তাই মহা অভিমানভরে তিনি বলিলেন—"মা তুমি মাতালের পিত্তেস্ কর? জোচ্চোরের পিত্তেস্ কর? বিশ্বাসঘাতকের পিত্তেস্ কর? এমন পিত্তেস্ রেখ না; যাও তোমার মেজ ছেলের কাছে যাও, যে বিষয় রক্ষা ক'চ্চে, সে সব

দিক রক্ষা করবে। মা, বড় প্রাণ কাঁদ্‌ছে তাই একটি কথা তোমায় বল্‌ছি—মনে করে দেখ, যখন আমি কাজকর্ম্ম ক'রে সন্ধ্যার পর ফিরে আস্‌তুম, আমার মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হ'ত, মনে হ'ত আবার মাকে প্রণাম কর্‌বো, আবার ভায়েদের মুখ দেখ্‌বো, আবার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ কর্‌বো, আবার ছেলের মুখচুম্বন করবো; সমস্ত দিন কাজে ভুলে থাক্‌তুম, আস্‌বার সময় মনে হ'ত যে আমার জুড়ী চল্‌তে পাচ্চে না, আমি উড়ে বাড়ীতে যাই। দশ মিনিট দেরি, আমার দশঘণ্টা বোধ হ'তো। গাড়ী থেকে নেবে দোরে ছেলেকে দেখ্‌তেম্, উপরে উঠে ভায়েদের দেখ্‌তেম্, বাড়ীর ভিতর তোমাদের দেখ্‌তেম, বাড়ী আসতেম্—স্বর্গে আস্‌তেম্। আজ সেই বাড়ী আমার নরক। বাড়ী আমার না, জোচ্চুরি ক'রে এ বাড়ীতে রয়েছি। * * বাঃ কি সুখের সংসার! তবে আমায় কাকে দেখ্‌তে বল? আমার আর শক্তি কৈ? জোচ্চোর—জোচ্চোর—জোচ্চোর, মা, আমি জোচ্চোর! ছি! ছি ছি। উমাসুন্দরী কাতরস্বরে বলিলেন—"বাবা, আমায় তুমি কেন তিরস্কার কচ্চো? আমি তোমার বিষয় দেখি নি, আমি প্রাণরক্ষার জন্য অনুরোধ করেছিলেম। তুমি টাকার শোকে মদ ধল্লে, সকলে বল্লে, তুমি বাড়ী বেচ্‌লে প্রাণে মারা যাবে।" আশাহত যোগেশ উত্তর দিলেন—"প্রাণের জন্য, তুচ্ছ প্রাণ যেতোই বা? মা তুমি কাঞ্চন ফেলে কাঁচে গেরো দিয়েছ, মান খুইয়ে প্রাণের দরদ করেছ। সমস্ত বেচে যদি আমার দেনা শোধ না হ'ত, যদি আমি জেলে যেতেম, যদি টাকার শোকে আমার মৃত্যু হ'তো, আমার মনে এই শান্তি থাক্‌তো, এ জীবনে আমি কারুর সঙ্গে প্রতারণা করি নি। সে শান্তি আজ বিদায় দিয়েছি, আর ফির্‌বে না।"

পীতাম্বর যোগেশকে বার-বার প্রকৃতিস্থ হইতে বলিতেছিল। যোগেশ ঐ এক কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া পীতাম্বরের 'সব ফির্‌বে, সব পাবেন' কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন—"কি ফির্‌বে, কি পাব? স্বীকার করি টাকা ফিরে পেতে পারি, কিন্তু কলঙ্ক কখনই ঘুচ্‌বে না, কারুর কখনও ঘুচে নি, রাজা যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যাবাদী বলে। এ দুঃখের সংসারে ভগবান একটি রত্ন দেন, সে রত্ন যার আছে সে ধন্য! সুনাম! রাজার মুকুট অপেক্ষাও সুনাম শোভা পায়, দীন-দরিদ্র এ রত্নের প্রভাবে ধনী অপেক্ষাও উন্নত, বিজ্ঞের পরম বিজ্ঞতার পরিচয়, মূর্খ বিদ্বান্ অপেক্ষাও পূজ্য হয়। সে রত্ন আমার নাই, আছে মদ—চল হে যাই!"

মদের দ্বারা বিস্মৃতি আনিবার চেষ্টা করিয়াও যোগেশ সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা হইতে পারেন নাই; মদের নেশা একটু ছুটিলেই পূর্বকথা প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল, তাই গৃহমধ্যে রমেশকে দেখিতে পাইয়া ভৎর্সনাপূর্ণ ব্যঙ্গ-স্বরে বলিয়াছিলেন—"ভ্যালা মোর ভাইরে! চাঁদরে! তোমায় পাঁচ পাঁচ বৎসর ফেল করেছিল? কি অবিচার! কি অবিচার! এতদিন যে বাড়ীটে শ্মশান কত্তে পাত্তে, সুরেশকে জেলে দাও, যেদোর গলায় পা দাও, আমার জন্য ভেবো না—আমি মদ খেয়েই থাক্‌বো।" রমেশ এই কথার উত্তরে—'কি মাত্‌লামি কচ্চো' বলিলে যোগেশ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন:—"সাবাস্! সাবাস্! উকীল কি চিজ্! ও দেরি না—দেরি না, শুভকর্মে বিলম্ব না,—যেদোর গলায় পা দাও, আর বুড়ো মাকে চাল-কুম্‌ড়ী কর; আর মা আমার রত্নগর্ভা—একটি মাতাল, একটি উকীল, একটি চোর।"

বুদ্ধিমান যোগেশের বুঝিতে বাকী রহিল না যে কাঙ্গালীচরণ ও তাহার স্ত্রী জগমণি রমেশের কুকার্যের সহচর হইয়াছে।

রমেশ সুরেশকে জেলে দিয়াও ক্ষান্ত হইল না, তাহার বিষয়ের অংশ লিখিয়া লইবার জন্য জেলখানাতেও হাজির হইয়াছিল। সুরেশ কিন্তু কাঙ্গালীকে সঙ্গে দেখিয়া কাগজ সই করে নাই।

যোগেশের অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ-অবস্থার ভিতরে পীতাম্বর ব্যাঙ্কের পুনর্জীবিত হইবার সংবাদ যোগেশকে দিল। সুরেশের জেল-খাটুনি লাঘবের জন্য টাকার প্রয়োজন হওয়ায় চেক-বই পুনরুদ্ধার ও রমেশের নামে টাকা জমা দিবার আদেশ নাকচ করিবার জন্য যোগেশকে সঙ্গে লইয়া পীতাম্বর ব্যাঙ্কে যাইতেছিল। পথিমধ্যে ঠিকাগাড়ী ভাড়া করিবার জন্য পীতাম্বর একটু অগ্রসর হইতেই দুইজন যোগেশের পূর্ব-পরিচিত ব্যাপারী তাঁহাকে 'জোচ্চোর' বলিয়া অপমানিত করিল। একজন ইতর-জাতীয়া মাতাল-স্ত্রীলোক মদের পয়সা না পাইয়া ঐ ব্যাপারীদের কথার পুনরুক্তি করিয়া যোগেশকে দ্বিতীয়বার অপমানিত করিল। যোগেশ অপমানের তীব্র জ্বালায় ব্যাঙ্ক ও সুরেশের কথা ভুলিয়া গিয়া প্রাণের জ্বালা মিটাইবার জন্য শুঁড়ীর দোকানে প্রবিষ্ট হইয়া মদে আত্ম-বিসর্জন করিলেন। ঘটনাস্রোত মানুষকে কিরূপ অতিষ্ঠ করিয়া তুলে নাট্যকার দৃশ্যে-দৃশ্যে তাহাই দেখাইতেছেন।

রমেশের পরামর্শে জগমণি উমাসুন্দরীর কাছে আসিয়া সুরেশের জেল ও পাথরভাঙ্গার কথা যে ঘটনাটি সকলে এতদিন তাঁহার কাছে গোপন রাখিয়াছিল তাহা সে প্রকাশিত করিয়া দিল। উমাসুন্দরী শোকাবেগে মূর্ছিতা হইলেন। মূর্ছাভঙ্গে মানসিক আঘাতে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইল। পীতাম্বর মাতাল যোগেশকে শুঁড়ীর দোকান হইতে পূর্ণ মত্ত অবস্থায় গৃহে আনিল। মাকে মাটিতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া যোগেশের মন সেই পূর্ণ মত্ত অবস্থাতেই বলিয়া লইল :—"ও পড়ে কে—মা? তুল্‌ছো কেন? তুল্‌ছো কেন? ঘুমুক্; হয় মদ খাও, নয় ঘুমোও; বড়-বৌ, তুমি মদ খাও, আমি মদ খাই, পীতাম্বর মদ খাও—" অপমানের তীব্র জ্বালা ভুলিবার জন্য যোগেশ যে পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন তাহার এই করুণ পরিণতি দেখিয়া দুঃখ হয়! যোগেশ অবশেষে মাত্‌লামীর চূড়ান্ত করিলেন। তাঁহার একমাত্র বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত পীতাম্বরের মাথায় ইট ছুঁড়িয়া তাহাকে আহত করিলেন। নাটকীয় ঘটনা চরম পরিণতির দিকে কেমন অগ্রসর হইতে লাগিল।

রমেশ তাহার সহচরদের পরামর্শে ঘরের পয়সা খরচ করিয়া মাতাল লাগাইয়া যোগেশের মদের খরচ এতদিন নিজে যোগাইতেছিল, আজ তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। দিবারাত্র মদ খাইয়া যোগেশ বদ্ধ মাতালে পরিণত হইয়াছিলেন। মদ না হইলে তাঁহার চলিত না, তাই তিনি জ্ঞানদার বাড়ীবেচা টাকা কাড়িয়া লইয়া মদ খাইয়া তাহা নিঃশেষিত করিলেন। আর একদিন স্ত্রীর ঘর ভাড়ার টাকা স্ত্রীকে লাথি-মারিয়া ফেলিয়া দিয়া একরূপ কাড়িয়া লইয়াই মদের খরচ চালাইয়াছিলেন। অবশেষে একদিন যাদবকে দোকানে খাবার কিনিতে দেখিয়া হাত মোচড় দিয়া তাহার কাছ থেকে চার আনা পয়সা কাড়িয়া লইয়া নেশা চালাইয়াছিলেন। সর্বশেষে ভিক্ষা! এমনি মদের মাহাত্ম্য!

জ্ঞানদা নিজের আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া যাদবকে চারিটি টাকা দিয়া তাহা তাহার কাপড়ের খুঁটে ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিলেন, এবং খুচরা দুই আনা হাতে দিয়া দোকান হইতে কিছু খাবার কিনিয়া খাইবার জন্য তাহাকে কাছ ছাড়া করিয়া দিলেন। জ্ঞানদার অবসন্ন দেহ পথিমধ্যেই মৃত্যু-পথের যাত্রী হইল। যোগেশ ভিক্ষালব্ধ চারিটি পয়সা মদের জন্য যোগাড় করিয়া মুমূর্ষু জ্ঞানদাকে পথে দেখিতে পাইলেন। পয়সার অভাবে মদের নেশা ভাল জমে নাই, তাই তিনি জ্ঞানদাকে বলিলেন—"মচ্ছো, রাস্তায় মত্তে এসেছ? তোমাদের এতদূর হয়েছে? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!" জ্ঞানদা যাদবকে পীতাম্বরের বাড়ী পাঠাইয়া দিবার জন্য যোগেশকে মৃত্যুকালীন শেষ অনুরোধ করিলেন। যোগেশ, তদুত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই :—"তুমি রাস্তায়, যেদো

সেথায় মরবে কেমন?—তা বেশ! আমি বলতে পারি নি, মিছে কথা বলবো না, পারি যদি পীতাম্বরকে চিঠি লিখবো। আমার ঘাড়ের ভূতটা এখন তফাতে দাঁড়িয়ে আছে, যদি শীগ্‌গির না ঘাড়ে চাপে, তা হ'লে পারবো; আর ঘাড়ে চাপলে আমি কি করবো! কি বল, আমি লাথি মেরেই তোমায় মেরে ফেলেছি, কেমন? * * কি করবো বল, ভূতে মেরেছে, চারা নেই। মচ্ছো, মর—মর! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা-হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!" যোগেশের ঐ মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাসটি আকাশে-বাতাসে মিশিয়া গেল, প্রতিধ্বনি আর উঠিল না! প্রাসাদ-মধ্যস্থ উদ্যানজাত কুসুমকোরক আজ পথের ধূলি-কণার উপর ঝরিয়া পড়িল!

ক্রমবর্ধমান পারিবারিক দুর্ঘটনাবলি যোগেশের অন্তর্দাহ এতই বৃদ্ধি করিয়াছিল যে, তাঁহার অশ্রু চক্ষু হইতে না গড়াইয়া বাষ্পাকারে মস্তিষ্কে উঠিতে লাগিল। সেই উষ্ণ তাপে তাঁহার জ্ঞানস্মৃতি পুড়িয়া ছারখার হইল। জ্ঞানদার মৃত্যু তাঁহার অন্তস্তলে যে ধাক্কা পৌঁছাইয়া দিল, তাহাতে তাঁহার শোক-পরম্পরা একটি খেয়ালের (mono-mania) সৃষ্টি করিয়া আংশিক মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশিত করিল। 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল'—এই বুলি লইয়া যোগেশ পথে পথে ভিক্ষা করিয়া তাঁহার মদের নেশা চালাইতে লাগিলেন। হায়! কি মহান্ চরিত্রের কি অদ্ভুত পরিণতি!

রমেশ তাহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য বিষয়-সম্পত্তি ও অর্থকেই ভালবাসিয়াছিল এবং ঐ লালসা চরিতার্থ করিবার প্রতিকূলে যে কেহ দাঁড়াইয়াছিল তাহাকেই নির্মূল করিয়াছে। বিষয় ও বাড়ী দখল করিবার পর জ্ঞানদাকে সে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিল। জ্ঞানদা পথিমধ্যে মৃত্যু বরণ করিলেন, যোগেশ মদে পাগল, রমেশের সংগৃহীত খবরে সুরেশ মৃত, মা উন্মাদিনী, একমাত্র বিষয়ের ভাবী উত্তরাধিকারী যাদব তখনও জীবিত রহিয়াছে। আজ তাহারই হত্যার ষড়যন্ত্র চলিতেছে! পাপের পরাকাষ্ঠার দিনে রমেশের পত্নী প্রফুল্ল উক্ত কার্যের প্রতিবন্ধক হইলেন। তিনি তাঁহার মহিয়সী মাতৃত্বের মহিমায় রমেশের হস্তে নিহতা হইলেন; তাঁহার প্রাণের বিনিময়ে বালকের প্রাণ এক অদ্ভুত উপায়ে রক্ষিত হইল। কিরূপে? তাহা নাটকের দর্শক বা পাঠকের অবিদিত নাই। দুষ্কার্যের যাহা স্বাভাবিক পরিণতি তাহা রমেশের এবং তাহার সহচর—কাঙ্গালী ও জগমণির লাভ হইল। বালা ও বেড়ী পরিয়া পুলিশের কারাগারে তাহারা প্রেরিত হইল। রমেশের মন তখন যেন অস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিল—"সুখের লাগিয়া যে ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল। অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥" নাটকও এইখানে শেষ হইয়াছে।

নাটককার এই নাটকে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন। কাঙ্গালী ও জগমণির চরিত্রে গিরিশচন্দ্র যে নৃশংসতার ছবি আঁকিয়াছেন তাহা বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের মধ্যেও যে থাকিতে পারে এ সংবাদ তাঁহার পূর্ববর্তী কোন নাটককারই দিয়া যান নাই। বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যে ইহা সম্পূর্ণ নূতন। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে বলা যাইতে পারে যে ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় নাট্যকবি শেক্সপীয়রকেও গিরিশচন্দ্র এরূপ ধরণের চরিত্র-চিত্রণ-ব্যাপারে হটাইয়া দিয়াছেন।

পীতাম্বর, শিবনাথ, ভজহরি, এক একটি পৃথক জাতিরূপ (type), প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ। উমাসুন্দরীর ন্যায় কর্ত্রী, জ্ঞানদার ন্যায় গৃহিণী এবং সর্বশেষে প্রফুল্লের ন্যায় সরলা স্নেহশীলা কর্তব্য-পরায়ণা ও অদ্ভুত আত্মত্যাগশীলা বধূ ও ভাবিগৃহিণী আধুনিক যৌথ হিন্দু-পরিবারে দুর্লভ হইলেও নাটক-কারের জীবিতকালে একান্ত সুলভ ছিল না।

গিরিশচন্দ্রের আদর্শ একান্নবর্তী পরিবারের স্বপ্ন যাহার পুটপাক তিনি মাকে বৃন্দাবনে পাঠাইবার সময় চড়াইয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালীর চিরাচরিত সংস্কার 'গৃহিণীম্ গৃহমুচ্যতে' আদর্শের ভিতর দিয়া রূপায়িত হইয়াছিল। উমাসুন্দরীর স্থানে জ্ঞানদা গৃহের কর্ত্রী হইলেন, এবং পাছে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়, তাই যোগেশ গৃহের ভবিষ্যৎ গৃহিণী প্রফুল্লকে উমাসুন্দরী ও জ্ঞানদার সাহায্যে সর্বতোভাবে তৈয়ারী করিয়া লইতেছিলেন। ভাবী একান্নবর্তী গৃহ-সরোবরের প্রফুল্ল কমল সদৃশ 'প্রফুল্ল' তাই চরিত্রের দিক দিয়া দর্শক বা পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছেন। অনেক সমালোচক নাটকের প্রফুল্ল নামকরণ অযথা হইয়াছে এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। সুগৃহিণী হওয়া একান্নবর্তী সংসারের কেন্দ্রীয় আকর্ষণ। প্রফুল্ল চরিত্রটি সেই আদর্শেই গঠিত। ভাশুর-পুত্রের জীবন-রক্ষা করিবার জন্য সে নিজ প্রাণ বলি দিয়া উহার অন্ত্যেষ্টি সম্পাদন করিলেন। রমেশ কর্তৃক যোগেশের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। সুতরাং নাটকের নামকরণ যে অযথা হয় নাই, তাহা বুঝা গেল।

নাটককার এই নাটকের মধ্যে তাঁহার বৈষয়িক আইন-জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সুরেশ চরিত্রে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। সে আমোদ উপভোগের জন্য কুসঙ্গ করিলেও কাপুরুষ ছিল না। তাহার বংশের কুলবধূকে পুলিশের সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার দায় হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য সে মিথ্যা হইলেও নিজে কবুল করিল যে বাক্স ভাঙ্গিয়া মাকড়ী চুরি সে-ই করিয়াছে এবং নিজ বন্ধু নিরপরাধ শিবনাথকে চোর অপবাদ হইতে বাঁচাইবার জন্য কাঙ্গালীর পাঁচ টাকা নোট চুরির দাবীও সে নিজের ঘাড়ে লইয়াছিল—এই সব ক্ষুদ্র ঘটনায় সুরেশের পুরুষত্বই বিকশিত হইয়াছে।

এত বড় নৈতিক চরিত্রবান যোগেশ—যাঁহার চরিত্র বাঙ্গালী মাত্রেরই গর্বের বস্তু—তাঁহার দেহের অবসাদ ও ক্লান্তি অপনোদনের নিমিত্ত 'ঔষধার্থ সুরাপানের' অভ্যাস রাখা কোন কোন নীতিবাদীদের সমর্থনযোগ্য হইলেও ঐরূপ কার্যের আশ্রয় লওয়া যে ভাল নহে, তাহা নাটককার নাটকের বিষাদান্ত পরিণতিদ্বারা দেখাইয়া দিলেন। সুরাপানের আশ্রয় না লইয়া যোগেশ যদি সাহিত্য বা ধর্মালোচনাদ্বারা তাঁহার চিত্তবিনোদনের উপায় করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্রের এইরূপ পরিণতি ঘটিত না। নাটককার তদানীন্তন বঙ্গসমাজের এই ত্রুটি দেখাইয়া নাটকের সার্থকতা থেকে নাটকখানিকে বঞ্চিত করেন নাই।

মদন ঘোষ চরিত্রটি নাটকের বিষাদময় আবহাওয়া থেকে দর্শক বা পাঠককে হাঁফ ছাড়িবার অবসর দিবার (relief) জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র এরূপ চরিত্রকেও বৃথা আনেন নাই তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য যাদব যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তাহাকে বাঁচাইয়া যোগেশের বংশরক্ষা করিবার নিমিত্ত মদনের বিবাহবাতিক ঐ বিপদজনিত মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়ায় রূপান্তর গ্রহণ করিল এবং সে যাদবকে বাঁচাইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করিল।

নাটকের ভাষা এমন সুস্পষ্ট ও যথাযোগ্য যে, চরিত্রগুলি কথা কহিলেই তাহাদের প্রকৃত রূপ বাহির হইয়া আসে। ধন্য নাট্যকারের রচনা-কৌশল! সংগীতবিভাগেও পারদর্শিতার ন্যূনতা দেখা যায় না। (১) '(ও আমার) ঘরে থাকা এই চোটে মুস্কিল। ডাগুরা নাগর বরণ দু-পোড়া, বদনখানি বাদার বিল,' (২) 'মা তোর এ কোন্ দেশী বিচার। আমি ডেকে বেড়াই পথে পথে, দেখা দাও না একটিবার,' (৩) 'মন আমার দিন কাটালি, মূল খোয়ালি, ভাল ব্যাসাত কল্লি ভবে'—প্রভৃতি গানগুলি বৈচিত্র্য ও ভাবে বাঙ্গালীসমাজে স্থায়ী আসন করিয়া লইয়াছে। স্থানাভাবে সম্পূর্ণ

উদ্ধৃত হইল না। এখানি ট্র্যাজেডি শ্রেণীর নাটক এবং ইহার বিষাদান্ত ক্রিয়াগুলি অসাংসিদ্ধিকভাবে নিষ্পন্ন হয় নাই।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রথম সামাজিক নাটকে অসামান্য সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। ইহার হিন্দি অনুবাদ হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ এই নাটকখানিকে এম্-এর পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

হারানিধি নাটক

হারানিধি এই বিভাগের দ্বিতীয় নাটক, এখানি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি সামাজিক দোষগুণের স্বাভাবিক পরিণতি-সাপেক্ষ শ্রেণীর অন্তর্গত।

যবনিকাপাতের পূর্বে নাটকের সর্বশেষ কথা 'হারানিধিটি' যে কোন্ ব্যক্তি তাহা উক্ত নাটকের দর্শক বা পাঠকের বুঝিতে বাকী থাকে নাই। নাটকের আখ্যানবস্তু জটিল ঘটনাপূর্ণ। মোহিনীমোহন বিশিষ্ট ধনী ও সম্পত্তিবান্ ব্যক্তি, সুতরাং এক হিসাবে তিনি সমাজপতি; কিন্তু সামাজিকদের উপর তিনি কিরূপ অত্যাচারী ছিলেন, তাহার চিত্র নাটককার নাটকীয়ভাবে এই নাটকে চিত্রিত করিয়াছেন। ধন-গর্বে তিনি এতই উন্মত্ত ছিলেন যে, তাঁহার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং বহু উপায়ে উপকারী বাল্যবন্ধু হরিশকে তিনি উদ্‌বাস্তু ও নানা প্রকারে নিপীড়িত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। যদিও নাটকের গতি ভিন্নপথে গিয়াছিল, তথাপি মোহিনীর দেনার জামীন হইয়া হরিশ যখন তাঁহার বাস্তুভিটা পর্যন্ত খোয়াইতে বসিলেন, তখন মোহিনী হরিশকে এইরূপ বলিয়াছিলেন:—"তোমার ঠেঁয়ে বাড়ীটুকু চেয়েছিলুম, তুমি কাণ মোলে দিতে এলে। সে ঘা' আমার অন্তরে-অন্তরে আছে। তুমি গেরস্ত মানুষ, অত তেজ কেন? বড়লোক চাচ্ছে, দর-দাম ক'রে সস্তা-মস্তায় ছেড়ে দাও; তা হ'লে ত আর এ সব কৌশল কর্‌তে হ'ত না। তা-নয় তুমি একেবারে বেঁকে বস্‌লে? পৈতৃক ভিটে—ভদ্রাসন-বাড়ী—কত ফ্যারেকাই তুল্‌লে। আমার গাড়ীর দরকার হ'লে এক-পো পথ লোক গিয়ে আস্তাবলে খবর দেবে, আর তুমি বাড়ী, বাগানবাড়ীর সাম্‌নে বসে ভোগ কর্‌বে? আনো-নাও-খাও—দশ হাজার টাকার জন্য যার ভদ্রাসন বিকোয়, তার এত তেজ কেন?"

হরিশ অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া মোহিনীর প্রতি তাঁহার পূর্বকৃত উপকার স্মরণ করাইয়া দিতে যাইলে মোহিনী শ্লেষভরে বলিলেন—"গরীব লোকের আর কাজ কি? বড়লোকের জন্য মাথা দেবে, বড়লোকের জন্য মেয়েমানুষ যোগাবে, কুকুরের মত দুটি খাবে, আর থাক্‌বে। * * আরে মূর্খ, তুই জানিস্‌নি যে, গেরস্ত মানুষ আবার বড়লোকের বন্ধু কি? কেউ আত্মীয় হন, কেউ হাই ধরেন, কেউ ক্ষণজন্মা বলেন, আমি মনে মনে হাসি! থাক্ কুকুর বেটারা, পাঁচটা জানোয়ার পুষি নি? পাঁচটা আস্‌বাব রাখি নি?"—এই বাক্যগুলির মধ্যে যে কুৎসিত ইঙ্গিত আছে তাহা স্বতঃসিদ্ধ, ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

মদমত্ত মোহিনী হরিশকে তাঁহার কর্মচারী বানাইতে চান, তাই আরও বলিলেন—"তোমায় এত কথা বোঝানোর আবশ্যক কি, তা জান? প্রথম ত তুমি যোগ্য লোক, তোমায় আমার সংসারে কাজ কর্‌তে হ'বে, তাতে যত বন্ধুত্ব কর্‌তে পার, যত কম মাইনেয় থাক্‌তে পার। ঠিক বোঝ,—তুমিও

যেমন কম মাইনের চাকর খোঁজ, আমিও তাই চাই। আর দ্বিতীয়ই বল, আর প্রথমই বল, 'মোহিনী' —ব'লে যে গদীতে এসে ঠেস্ মেরে ব'স্‌তে, এক ঘর লোক—কিছু সমীহ কর্‌তে না—ডাক্‌লে 'হুজুর' ব'লে এসে দাঁড়াতে হবে—এইজন্তেই আমার বাকি ক্লেম (claim) কিনে লওয়া। এখন রেগেছ, রাগো; কাল সকালে এসে ব'ল, কবে থেকে আমার চাক্‌রী নেবে?"

মোহিনীর উপরিউক্ত কথায় হরিশ প্রাণে বড়ই আঘাত পাইয়া বলিলেন :—"যদি খেতে না পাই, যদি পরিবারবর্গ অনাহারে মরে, যদি খণ্ড-খণ্ড ক'রে কেউ কাটে, তবু কি তুই মনে করেছিস্ তোর চাক্‌রী আমি গ্রহণ কর্‌ব?" কুচক্রী মোহিনী সমধিক ধৈর্য সহকারে উত্তর দিলেন—"বলে যাও, বলে যাও, মুখে-বলা, কাজে করা অনেক তফাৎ। যেমন বলেছিলে—'আমি প্রাণান্তেও ভদ্রাসন দেব না,' আবার কায়দায় পড়ে দিলে, তেম্‌নি কায়দায় পড়ে চাক্‌রী স্বীকার কর্‌তে হবে; আমি একদিন সময় দিলুম, বিবেচনা কর। বন্ধু মানুষটা অ্যাটাচ্‌মেণ্ট (attachment) বার করে আর যেন বাড়াবাড়ি কর্‌তে হয় না; মাইনে সিজ (seize) কর্‌লেই ত দাঁত ছির্‌কুটে পড়্‌তে হবে! কি কর্‌বে? যেমন সময় তেমনি চল্‌তে হয়, উপায় ত নেই! আমরা বড়লোক, এ রকম না কর্‌লে চল্‌বে কিসে, বল? গাড়ী রাখ্‌তে হবে, ঘোড়া রাখ্‌তে হবে, বাগান রাখ্‌তে হবে, রাস্তা-ঘাট-হাঁসপাতালের চাঁদা দিতে হবে, ভোজ দিতে হবে, পার্টি দিতে হবে। বড়লোকের ত আর অন্য রোজগার নেই, ঐ আমাদের রোজগার। * * বড় হিন্ধে ছেড়ো না, তোমার আমি ভাল কর্‌বো। কেন চাক্‌রী-বাক্‌রী খুইয়ে পথের ভিখারী হবে? মোসাহেবরা বলে—'বড় মাছের কাঁটাটাও ভাল,' বুঝেছ, আমি তোমার ভাল কর্‌ব।"

মোহিনী এইরূপই কঠোর চরিত্রের লোক। শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার আদুরে কন্যা হেমাঙ্গিনীর হাত দিয়া যে সব দান-খয়রাত করেন, তাহারও কৈফিয়ৎ ঐ নাটকের মধ্যে একস্থানে তিনি তাঁহার স্ত্রীকে এইরূপ দিয়াছিলেন :—"তুমি মনে কর আমি মেয়ের হাতে টাকা দিয়ে গরীবের বাড়ী পাঠাই, দয়া শেখাতে? তা নয়—খবরের কাগজে লিখবে যে, মোহিনী বাবু সদাশয়; তাঁর কন্যা দীন-দুঃখীর বাড়ী-বাড়ী গে, যার অন্ন নেই তারে অন্ন দেয়, যার বস্ত্র নেই তারে বস্ত্র দেয়, দশটা বাড়িয়ে লেখে—এ খুন, দাগাবাজী, ঘর-জ্বালানোর হজ্‌মীগুলি।" ধন্য নাটককারের মোহিনী-চরিত্রের পরিকল্পনা!

হরিশ শিক্ষিত ও কর্তব্যনিষ্ঠ পুরুষ, সরকারী অফিসে কর্ম করেন। দয়া, পরোপকার ও গরীবকে অন্নদান তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। পরিবারবর্গ লইয়া সৎভাবে জীবনযাপন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আজ মোহিনীর টাকার জামীন হইয়া তাঁহারই ষড়যন্ত্রে তিনি সর্বস্বান্ত হইলেন। মোহিনী কর্তৃক মাহিনা আটকের ভয়ে সরকারী কর্মে ইস্তফা দিয়া প্রকৃত নিঃস্ব অবস্থায় হরিশ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

হরিশের জামাতা অঘোর নিরুদ্দিষ্ট—কাহারও কাহারও মতে সে মৃত। এই অঘোর চরিত্রটি বিচিত্র। নাটককার এই চরিত্রের ভাব ও ভাষায়, তাহার চতুরতা ও রসিকতায় এবং তজ্জন্য নাটকের মধ্যে রস-সৃষ্টিতে এত নিপুণতা দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে এ প্রকৃতির চরিত্র আর নাই বলিলেও চলে। অবস্থাবৈগুণ্য বা বিপদ কোন অবস্থাতেই অঘোরের ধৈর্যচ্যুতি হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়া অঘোর মনের দুঃখে সৎমায় গহনা চুরি করিয়া পশ্চিমে ফেরার হইয়াছিল। ঘটনাচক্রে এক গর্ভবতী স্ত্রীলোক-হত্যার মিথ্যা অভিযোগে সে পুনরায় পশ্চিম হইতে পলাতক আসামীর মতো কলিকাতায় ফিরিয়া গা-ঢাকা দিয়া বেড়াইতেছিল! লোক ঠকাইয়া, কখনো অন্ধ ভিক্ষুক

সাজিয়া, কখন বা চুরি-রাহাজানি করিয়া কোন রকমে সে দিনপাত করিতেছে। নব'র মুখে নিজ-স্ত্রী সুশীলার আত্মত্যাগ, সংযম ও স্বামীর ফটোগ্রাফ-পূজার কথা শুনিয়া অঘোরের প্রাণে একটা সাড়া আসিয়া পৌছিল। তাহার অন্তঃকরণের নিবিড়তম প্রদেশ হইতে কে যেন তাহাকে ঐ বিবাহিত স্ত্রীর দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল এবং তাহার মনে হইতে লাগিল যে, দেব-চরিত্র না হইতে পারিলে এ দেবীলাভ তাহার হইবে না।

নব চরিত্রটি ক্ষুদ্র হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। হরিশের দূর-সম্পর্কীয় ভ্রাতা বলিয়া হরিশের সংসারেই সে প্রতিপালিত হইতেছে। অঘোরকে সে-ই প্রথম চিনিয়াছিল। হরিশের দুর্দিনে নব তাঁহাকে ছাড়ে নাই, অন্নদাতার উপকার করাই তাহার কাম্য ছিল। হরিশ যখন ভদ্রাসন ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন, নব তখন তাঁহাকে বাড়ী দখলে রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিল। নবর যুক্তি এই ছিল যে, মানুষের অদৃষ্ট দুজ্ঞে য়। অশুভ বিষয়ে বিলম্ব করিলে, চাই কি সুফল ফলিতেও পারে ঐ যুক্তিবলে সে হরিশকে বলিয়াছিল :—"আমি মূর্খ হই, আর যা হই, কিন্তু দেখেছি ভাত খেতে বসেছি—খাওয়া হলো না, জলের গেলাস্ তুলছি হাত থেকে পড়ে গেল, এগুলোও হয়; আর না হয় নেই-নেই, তখন পথ দেখ্ বো, কিছু না পারি আদালতে ত ব্যাপারটা কি শুনিয়ে দেব। মোহিনী বাবু যে কত সজ্জন, তা'ত লোকে জান্‌বে।"

মোহিনী পূর্বেই হরিশের স্থাবর-সম্পত্তির দখলীদার হইয়াছিলেন। এখন গৃহত্যাগ করিবার মুখেই হরিশের যাবতীয় অস্থাবর-সম্পত্তি ও স্ত্রীধন আদালতের সাহায্যে মোহিনী অবরুদ্ধ (seize) করিয়া লইলেন। এই উপলক্ষ্যে মোহিনী ও তাঁহার সরকার গুণনিধি, হরিশ ও তাঁহার স্ত্রী-কন্যার প্রতি অপমানকর বাক্য-প্রয়োগের সুযোগ লইয়াছিলেন। হায়! অদৃষ্টের কি লজ্জাকর পরিহাস! আদালতের লোকজন ও বাড়ীর পুরুষ অভিভাবক চলিয়া যাইলে সুশীলাকে একাকী পাইয়া মোহিনী তাঁহার কাছে কু-প্রস্তাব করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। কাদম্বিনী কিন্তু এই সংকটে সুশীলার রক্ষাকর্ত্রী হইয়াছিলেন।

এই কাদম্বিনী চরিত্রটি নাটককারের আর একটি অপূর্ব সৃষ্টি। মোহিনীকে ভালবাসিয়া এই পদস্খলিতা নারী কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে তৎকর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন এবং তাহার অনুতপ্ত জীবন বিসর্জন করিতে যাইয়া হরিশের পুত্র নীলমাধব কর্তৃক কিরূপে রক্ষিত হইয়াছিল নাটকের দর্শক ও পাঠকের তাহা অজ্ঞাত নাই। নীলমাধব কাদম্বিনীকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া তাহার জীবন সমাজের সেবায় কিরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহাও কাহারও অবিদিত থাকে নাই। আধুনিক কথা-সাহিত্যে এইরূপ পতিতার গৌরবান্বিত জীবন-যাপনের কথা শুনা যাইলেও একষষ্টিতম বৎসর পূর্বের বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যে বিশেষতঃ সামাজিক নাটকের ভিতরে ঐরূপ চরিত্রের সমাবেশ-করা নাটককারের পক্ষে সৎ-সাহসের পরিচায়ক ঘটনা। তজ্জন্য গিরিশচন্দ্রকেই ঐরূপ ধরণের চরিত্র-সৃষ্টির অগ্রণী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কাদম্বিনীর বিস্ময়কর পরিণতি দেখিয়া আনন্দের উদ্রেক হয়!

সুশীলা চরিত্রটি বড়ই মধুর। বিবাহের পর পনের দিন-মাত্র স্বামী-ঘর করিয়া স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হইলে পর তাঁহার ফটোগ্রাফখানি লইয়া জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইয়া দেওয়া নানা প্রলোভনপূর্ণ সংসারে অল্প সংযমের কথা নহে! সুশীলা ঐ সংযমের অধিকারিণী ছিলেন। ঐ চিত্রখানির নিত্যপূজা করা তাঁহার কাজ ছিল। পারিবারিক দুর্ঘটনার মধ্যে কয়দিন পূজা করিতে না পাইয়া আজ নিভৃতকক্ষে

পূজা করিবার সুবিধা পাইয়া সুশীলা এইরূপ বলিতেছেন :—"প্রাণনাথ! সঙ্গতি ছিল না, ফুলের মালা কিনিতে পারি-নি, চক্ষের জল মালা গেঁথেছি, পর। * * যে দিন তোমার মুখ দেখেছিলুম, আমার কত সাধ মনে হয়েছিল, আজও সাধের সমুদ্র প্রাণে খেলে! * * যখন তুমি নিদ্রা যেতে—আমি অনিমিষ-নেত্রে দেখ্‌তুম,—যত দেখতুম, ততই সাধ বাড়্‌তো; সে সাধ আমার ফুরোয় নি, সহস্র বৎসরে ফুরোবার নয়! মনের সাধ মনেই মিলিয়ে আছে, সাগরের ঢেউ সাগরে মিলিয়ে আছে! হায় নাথ! কোথায় তুমি?"—ঠিক এমনি সময়ে ঐ পূজাগৃহের জানালার বাহিরের দিকে অঘোর সঙ্গোপনে দাঁড়াইয়া সুশীলার পূজা-পদ্ধতি নিরীক্ষণ করিতেছিল। সুশীলার মনোবেদনা দূর করিবার অভিপ্রায়ে দৈববাণীর মতো নাটকীয় ভাবে—'সুশীলা, যদি দিন পাই দেখা হবে'—বলিয়া নাটকীয় ভাবেই ঐ স্থান হইতে অঘোর অন্তর্হিত হইয়া গেল, এবং যাইবার কালে আকর্ষণের যে টান দিয়া গেল তাহাতে সুশীলার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

নীলমাধব নাটকের আর একটি আদর্শ চিত্র। ধার্মিক পিতার পুত্র হইয়া উচ্চ-হৃদয় বন্ধু সহবাসে যেরূপ চরিত্রের কল্পনা লোকে করিতে পারে নীলমাধব সেরূপ চরিত্রবান্ পুরুষ। পরোপকার তাহার জীবনের ব্রত ছিল। শত্রু-মিত্র-নির্বিশেষে সে তাহা পালন করিয়াছে। আহত হইয়া পথে পতিত গুণনিধির প্রতি দয়া-প্রকাশ-কালে—'মোহিনী ব্যাটার সর্বনাশ কর্‌বো, তাতে পাপ নাই'—গুণনিধির এই কথার উত্তরে নীলমাধব যাহা বলিয়াছিল তাহাতে তাহার হৃদয়ের মহত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। সেই কথাগুলি এই :—"পাপ নাই এ কথা মুখে এনো না। একবার লোভের বশীভূত হ'য়ে আমাদের সর্বনাশ করেছ, এবার রাগের বশীভূত হ'য়ে আর একজনের সর্বনাশ করতে চাচ্ছ? ছিঃ! ছিঃ! বয়েস হয়েছে, এখনও শেখ!" স্বামী বিবেকানন্দের সেবাধর্মের আদর্শ নীলমাধব চরিত্রের মধ্যে দেখা যায়।

মোহিনী হরিশের চরম সর্বনাশ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার কন্যা সুশীলাকে কুপথে লওয়াইবার জন্য নবর পরামর্শে যে কৌশল করিয়াছিলেন তাহাতে পড়িয়া নিজে মাতাল কর্তৃক অবলাঞ্ছিত তো হইলেন এবং নিজ স্ত্রী ও কন্যাকে মাতাল গুণ্ডার সম্মুখে আনিয়া দিয়া এমনই তাহাদের অপমানিত করিলেন যে হেমাঙ্গিনী ঐ প্রচণ্ড মানসিক আঘাতের ফলে ঘন ঘন মূর্ছা যাইতে লাগিলেন। এখানেও রক্ষাকর্তা ঐ নীলমাধব। স্নেহের পুত্তলি কন্যার দুরবস্থা দেখিয়া মোহিনীর এই সর্বপ্রথম মনে হইল যে, পরের অপকার করিতে যাইলে নিজের অনিষ্ট বুঝি আগেই ঘটে। মোহিনীর অবিশ্বাসী মন তখনও বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে, নীলমাধব সদিচ্ছার বশীভূত হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার পরিজনবর্গকে দুর্দান্ত মাতালের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। উহার মূলে কোন দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত আছে এরূপ একটা ধারণা মোহিনীর মনে হইয়াছিল। হায়! পাপী মনের ধর্ম বুঝি এইরূপই!

ইংরাজীতে একটা কথা আছে—"to pay him in his own coins," ইহার সমার্থক কথা বাঙ্গলায় এইরূপ :—'মর্মব্যথা বুঝাইতে হইলে মর্মে আঘাত করিয়া বুঝাইতে হয়।' মোহিনী কর্তৃক সুশীলার প্রতি অবমাননার প্রতিশোধ নব ও অঘোর উপরিউক্ত নীতি বলেই মোহিনীর স্ত্রী ও হেমাঙ্গিনীর উপর পূর্বোক্ত প্রকারে লইয়াছিল।

নাটককার তাঁহার 'হারানিধি' নাটকখানিকে একটা নৈতিক সিদ্ধান্তের (moral theory) উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সে সিদ্ধান্তটি এইরূপ—'অত্যাচারের প্রতিশোধ অত্যাচারীকে

ভালবাসিয়া ও তাহার ভাল করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।' এ নীতিটি জনসাধারণের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন হইলেও বিশাল জগতের কোন কোন সামাজিকের পক্ষে কঠিন নহে, কারণ মানুষের স্তর-ভেদ সব সমাজের মধ্যেই আছে। মোহিনী ও হরিশের পরিবার মধ্যে যে মনোমালিন্য মোহিনীর অত্যাচারে রূপ লইয়াছিল ধরণী ডাক্তারের চেষ্টায় ও নীলমাধবের বদান্যতায় তাহা কিরূপে পুনরায় প্রীতিসূচক মিলনে পরিণত হইল দর্শক ও পাঠক তাহা দেখিয়াছেন।

ধরণী ডাক্তার এই মিলনের অগ্রদূত হইয়া হৈমবতী ও সুশীলার কাছে প্রস্তাব করিলেন যে হেমাঙ্গিনীকে তাঁহার সাংঘাতিক মানসিক পীড়া হইতে বাঁচাইতে গেলে মোহিনীবাবুকে তাঁহাদের আন্তরিকভাবে ক্ষমা করিতে হইবে এবং নীলমাধবকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা সকলে রোগিণীর কাছে বসিয়া কথাবার্তা কহিলেই রোগিণী ক্রমশঃ সারিয়া উঠিবে। চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে এরূপ না করিলে ঐ রোগের অন্য প্রতিকার নাই। এ প্রস্তাবে মোহিনী কর্তৃক নির্য্যাতিতা হৈমবতী ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, ধরণীবাবু তখন বলিতে বাধ্য হইলেন :—"মা তোমার সর্বনাশ হয়েছে ব'লে কি একজন অবলা বালিকার প্রাণরক্ষা করবে না, সর্বনাশ হয়েছে বলে কি পরোপকার করবে না? মা, তা হ'লে তো সর্বনাশ সর্বনাশই বটে। মানুষের যতই কষ্ট হোক্, যতই বিপদ হোক্, বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকতে পারে। তুমি কি এই ঘোর-বিপদে মধুসূদনকে ডেকে বলবে তোমার মনের বেগে স্নেহময়ী অবলা বালিকার প্রাণরক্ষা করতে পারলে না? বিপদ বড় নয় মা, মহত্বই বড়! বিপদের মৃত্যুর পর অধিকার নাই, মহত্ত্ব চিরদিনের সাথী * * যার পরোপকারের জন্য প্রাণ না নৃত্য করে, সে পরোপকার করতে পারে না।" ধরণীবাবুর এবংবিধ যুক্তিপূর্ণ কথায় ভক্তিমতী হৈমবতীর যাবতীয় বাধা দূর হইয়া গেল, এবং তিনি সুশীলাকে সঙ্গে লইয়া ধরণীবাবুর সহিত মোহিনী বাবুর গৃহোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

মোহিনীবাবুর পরিবারবর্গের উপর কাদম্বিনীর প্রতিশোধমূলক কার্যাবলি নীলমাধব পছন্দ করিল না। সে কাদম্বিনীকে বলিল—"তুমি কি কাজ করেছ, বুঝতে পাচ্ছো কি? তোমার ঠেঁয়ে শুনেছি, যে একদিন তুমি কুলমহিলার মর্যাদা জানতে, কিন্তু কুলমহিলাকে মাতালের মধ্যে এনেছিলে! তুমিও একদিন বালিকা ছিলে, আজ তোমার কৌশলে বালিকার প্রাণসংশয়। * * এই কি প্রতিশোধ? যদি প্রতিশোধের ইচ্ছা ছিল, অন্য প্রতিশোধ কি নাই? যে তোমায় ঘৃণা ক'রে ত্যাগ করেছিল, তারে তুমি জগতের হিত ক'রে দেখাতে পারতে যে, তুমি মহতের অপেক্ষাও মহৎ। শত্রুর অনিষ্টের জন্য যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করেছ, যদি ঈশ্বর-উপাসনায় সেই উদ্যোগ, সেই উৎসাহ থাকতো, যদি পরোপকারে সেই উদ্যোগ থাকতে', সেই উৎসাহ থাকতো, তুমি দেবী হতে। কিন্তু এখন তুমি কি? যে তোমার অনিষ্ট করেছিল, তাতে-তোমাতে প্রভেদ কি?—অগ্র-পশ্চাৎ!" এই মর্মান্তিক উপদেশে কাদম্বিনীর মনে অনুশোচনা জাগিয়া উঠিল, এবং সে সেই-দিন থেকে সর্ববিধ নীচত ত্যাগ করিয়া ত্যাগের মহান্ পথে নিজ জীবন উৎসর্গীকৃত করিল। আন্তরিক সমবেদনা মানুষকে মনুষ্যত্বমণ্ডিত করিতে কতক্ষণই বা সময় লয়।

নব তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বেশ্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া মোহিনীবাবুর কাছ থেকে বাড়ীর দলিলাদি আদায় করিয়াছিল, নীলমাধব কিন্তু ঐরূপ ঘৃণ্যপণে বাড়ী গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইল না। তাহার মতে ঐ কার্য নীচতার পরিচায়ক, ইহাতে ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্টই সাধিত হইয়া থাকে। নীলমাধব

ব্রস্তপদে মোহিনীবাবুর বাড়ীতে গিয়া ঐ দলিলগুলি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিল। মোহিনী স্তম্ভিত হইয়া নীলমাধবকে মানুষ না ভাবিয়া দেবতা জ্ঞান করিলেন।

পঞ্চম অঙ্কে নাটকের উপসংহার উপস্থিত হইয়াছিল। সুশীলার সহিত অঘোরের এবং হরিশের সহিত তাঁহার পরিজনবর্গের মিলন শুধু বাকী রহিয়া গিয়াছে। ধরণীবাবুর বন্ধু-উকিলের সাহায্যে মৃতা মাতুলানীর বিষয়ের মূল্যস্বরূপ অঘোর যে ছয় হাজার টাকা পাইয়াছিল তাহা সে ঐ উকিলের অফিসেই তাহার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ প্রতারিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিতরিত করিয়া দিল। কাদম্বিনীর সহায়তায় অঘোর-সুশীলার বহু ঈপ্সিত মিলন অভাবনীয়-ভাবে সম্পন্ন হইল। সুশীলার দেবীমূর্তি অঘোরের প্রাণের তমোনাশ করিয়া তাহার পাষাণ হৃদয়েও সৎপ্রবৃত্তি অঙ্কুরিত করিয়া দিল। সুশীলা তাঁহার পলাতক অভিমানী স্বামীকে নির্জীব চিত্রপটের পরিবর্তে সজীব পাইয়া জীবন সার্থক করিলেন।

হরিশ গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে প্রফুল্লিত দেখিলেন। কন্যার প্রতি মোহিনী কর্তৃক অবমাননার প্রতিশোধ গৃহীত হইল না মনে করিয়া ঘৃণা ও লজ্জায় তিনি আত্মহত্যা করিতে যাইয়া জামাতা অঘোর কর্তৃক ধৃত হইলেন। অঘোরের মুখে আনুপূর্বিক সমুদয় শুনিয়া হরিশ আনন্দে অধীর হইলেন। নীলমাধবের সহিত হেমাঙ্গিনীর পরিণয়-সূত্রে উভয় পরিবারকে পুনরায় প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ করিল। পারিবারিক মিলনরূপ কমেডিকে হরিশ যখন তাঁহার আত্মহত্যা দ্বারা ট্রাজেডিতে পরিণত করিতে যাইতেছিলেন, অঘোর তাহা নিবারণ করিতে যাইয়া যাহা বলিয়াছিল, নাটককার কিন্তু নাটকের ক্রিয়ার মধ্যে তাহার বিপরীত গতি দেখাইয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ নাটকের অবশ্যম্ভাবী বিষাদান্ত পরিণতিকে মিলনান্তে রূপায়িত করিয়া বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এখানি গিরিশচন্দ্রের শক্তিশালী নাটকের অন্যতম। এ নাটকের পুনরভিনয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নাটকের কাজ তাহার পাত্র পাত্রীর প্রতি দর্শক বা পাঠকের সমবেদনা ও আতঙ্ক (pity and fear) যাহা তাহারা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া উপভোগ করিয়াছে তাহাই উপস্থিত করানো। হারানিধি নাটকখানির ঘটনা-পরম্পরা এমনি প্রভাবশালী যে, ইহার তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত ঘটনাবলীকে ট্রাজেডী বলিলে কোন দোষ হইত না, কিন্তু নাটককার চতুর্থ অঙ্ক হইতে ইহার গতি-পরিণতি হঠাৎ পরিবর্তিত করিয়া ইহাকে কমেডিতে পরিণত করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য এখানি Tragi-Comedy হইয়াছে।

হারানিধির সংগীতগুলি বহু প্রচারিত, আজও তাহার নূতনত্ব নষ্ট হয় নাই। স্থানাভাবে গানগুলির প্রথম ছত্র মাত্র লিখিত হইল :—

(১) বাঁকা সিঁতে ছড়ি হাতে ভাতার এসেছে,
(২) চরণে শরণ মাগি, কিঙ্করী তোমার, হরশির নিবাসিনী হর দুঃখ ভার,
(৩) ক'র না বঞ্চনা, কর না করুণা, অন্তিমে রাখ মা ও রাঙ্গাচরণে,
(৪) গোধন ফিরে, ধীরে ধীরে ধীরে, গগনে ছাইল রেণু,
(৫) যদি যত্ন কর দিই তোমার করে, নইলে কাঁচা সোনা চাঁদের কণা আদরে রাখি ঘরে।

মায়াবসান নাটক

মায়াবসান গিরিশচন্দ্রের তৃতীয় সামাজিক নাটক। এখানি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি সামাজিক দোষগুণের

স্বাভাবিক পরিণতি-প্রাপ্ত শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া সমস্যামূলক প্রথম পর্যায়ের কাজও করিয়াছে, তজ্জন্য এটি মিশ্রভাবাপন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইল।

সামাজিকের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিলে বৈষয়িক লাভের ষড়যন্ত্র কিরূপে বহুমুখী হইয়া বাঙ্গালীর এক সুখের সংসার নষ্ট করিয়াছিল, তাহার চিত্র এই নাটকের মধ্যে পাওয়া যায়। আর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা দেখিলে নাটকের নায়ক কালীকিঙ্কর স্বয়ং বিদ্বান্ বিজ্ঞানবিদ্ অকৃতদার স্বার্থত্যাগী পরোপকারী ও বহুবিধ নৈতিকগুণের অধিকারী হইয়াও কেন শান্তি-সুখের অধিকারী হইলেন না, ঐ সমস্যার সমাধান নানা সংঘাতের মধ্য দিয়া বিচরণ করিবার পর তিনি নিজ মুখে নাটকের পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যে পরিস্ফুট করিয়াছিলেন।

অন্নপূর্ণার মুমূর্ষু অবস্থার সংবাদ পাইয়া রঙ্গিণী কালীকিঙ্করকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে চাহিলে স্বাভাবিক করুণ-হৃদয় কালীকিঙ্কর যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না, কারণ বিরুদ্ধ-ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা তাঁহার মনের পরিবর্তন তখন আ.ম্ভ হইয়াছিল। মায়াবসান নাটকের মায়া, অবসিত হইবার পূর্বে কালীকিঙ্করের মনে এইভাবে সাড়া দিতেছিল :—"মমতা, তুমি দূর হও—আর আমার হৃদয়ে স্থান দেব না। যদি না যাও, আর আমায় আলোড়িত কর্‌তে পার্‌বে না। এখনও মনে হচ্ছে, আমার বাড়ী, আমার ধন, আমার বৌ, আমার ভাইপো, আমার রঙ্গিণী, আজ থেকে সে 'আমার' দূর হলো! যারে আমার ভাবি সেই থাকে না, এই দণ্ডে 'আমার' বলা শেষ হলো। বিদ্যার গৌরব, ধর্মের গৌরব, চরিত্রের গৌরব, কথার গৌরব মাত্র। নিষ্ফল কাকবিষ্ঠা! জীবনে দুঃখই সার্থক, ভূমিষ্ঠ হয়ে দুঃখ, আজীবন দুঃখ—মরণে দুঃখ।" মায়ানাশের পূর্বে 'অস্মিতার' নাশ কালীকিঙ্কর পূর্বোক্তরূপে করিতেছিলেন। এই দৃশ্যের আর এক স্থানে আনন্দের প্রকৃত-স্বরূপ, যাহা তিনি লোকমুখে শুনিয়াছিলেন বা পুস্তকে পড়িয়াছিলেন সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-কোণ দিয়া দেখিয়া তিনি এইরূপ বলিয়াছেন :—"নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় মন! শুনেছি সে-ই আনন্দের অবস্থা! কিন্তু এ কি সম্ভব? কখন না—কল্পনা মাত্র! প্রলোভন বাক্য! সুখ-দুঃখ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, বায়ুসংঘর্ষণে ঘোরতর ঘূর্ণবায়ু উপস্থিত হয়। দীপনির্বাণ সম্ভব, নিষ্কম্প দীপ অসম্ভব! স্বভাবে অসম্ভব! ঐ যে দীপ কম্পিত হ'চ্ছে, প্রবল বায়ুতে নির্বাণ হবে, বায়ুহীন হলেও নির্বাণ হ'বে। এ দীপ নির্বাণ হ'বে, মৃত্যুতে কি জ্ঞানদীপ নির্বাণ হবে? অসম্ভব। জড়েরই পরিবর্তন—জড়েরই ধ্বংস। চৈতন্যের বিনাশ! কল্পনা করা যায় না। বিপদ্—ঘোর বিপদ্—অনন্ত বিপদ্! এ কি? এ কি আভাস? আত্মত্যাগ! সে কি? সে কি? নূতন কথা, নূতন কথা! আপনার জন্যেই সব, আপনার জন্যই যন্ত্রণা! আত্মত্যাগ সম্ভব। সম্ভব! সম্ভব!"

কালীকিঙ্করের বৈজ্ঞানিক মন তখনও জড়বাদে (materialism) দোলায়মান ছিল, আধ্যাত্মিক তত্ত্বে (spiritualism) পৌঁছিবার উপক্রম করিতেছিল মাত্র। অবশেষে তাঁহার জ্ঞানদীপ প্রজ্জ্বলিত হইলে তিনি শ্মশানক্ষেত্রে অন্নপূর্ণার শবদেহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার সংশয়ের নিরসন-সম্বন্ধে রঙ্গিণীকে এইরূপ বলিয়াছিলেন :—"শুনেছিলে কি আত্মত্যাগ? মনে করেছিলেম একটা কথার কথা চলে আস্‌ছে, তা নয়, সত্যই আত্মত্যাগ আছে; মরণে আত্মত্যাগ হবে না, আত্মা সঙ্গে যাবে; এইখানে আপনাকে বিলিয়ে দিলে তবে আত্মত্যাগ হবে। * * আমি পরহিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেম, কিন্তু শান্তি পাই নি কেন জান? মুখে বল্‌তেম্ নিষ্কাম ধর্ম—নিষ্কাম কর্ম, কিন্তু অভিমান ফল-কামনা ছাড়ে না। সুখ আশায় পরহিত করেছি, ধর্ম উপার্জন কর্‌তে পরহিত করেছি, আত্মোন্নতির জন্য পর-হিত করেছি,—

ফল কামনায় পরহিত করেছি। আজ গঙ্গাজলে ফল বিসর্জন দিয়ে পর কার্য্যে রইলেম, রইলেম কি— জগতে মিশ্‌লেম!"

স্বামী বিবেকানন্দ এই ভাব লইয়া দরিদ্র নারায়ণের সেবা করিতেন। অদীক্ষিত বৈজ্ঞানিক ও জড়বাদী বিবেকানন্দ গুরুকৃপায় যেরূপে বৈদান্তিক জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন সেই ভাবের আংশিক ছায়া লইয়া কালীকিঙ্কর চরিত্রটি সৃষ্ট হইয়াছে। বিষ-মিশ্রিত পোর্ট-ওয়াইন্ পান করিয়া মূর্চ্ছা যাইবার কালে কালীকিঙ্কর কিছুদিন পূর্বে জড়বাদীর ভাষায় বলিয়াছিলেন—'ওঃ হোলি এনার্জি!' সেই তিনিই এখন—'আজ গঙ্গাজলে ফল বিসর্জন দিয়ে পরকার্যে রইলেম, রইলেম কি – জগতে মিশ্‌লেম—' এই আধ্যাত্মিক বাণীর মধ্যে তাঁহার জড়বাদ বিসর্জন দিয়া জ্ঞানরাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং নাটকের নায়ক নাট্যকারের অভীপ্সিত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী পাইয়া নাটকের 'মায়াবসান' নাম সার্থক করিলেন।

প্রকৃতির রূপ যেমন বিচিত্র, গিরিশচন্দ্র সৃষ্ট চরিত্রও সেইরূপ বিচিত্র। একটির সহিত অপরটির মিল নাই। তাই মাধব ও যাদবের স্থায় সুবিধাবাদী কংগ্রেস সেবী হইতে আরম্ভ করিয়া পরকে দুঃখ-কষ্ট মামলা-মকদ্দমার মধ্যে ফেলিয়া আমোদ উপভোগকারী সাতকড়ির জাতিরূপ (type) পর্যন্ত দর্শক ও পাঠক সমাজ নাটকের মধ্যে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। শান্তিরামের মতো দরদী ভৃত্যের দিন নাগরিক সভ্যতাপূর্ণ সমাজ হইতে তিরোহিত হইলেও, দূরস্থিত পল্লীসমাজে আজও তাহা দুপ্রাপ্য হয় নাই। গণপতি-গণকের জাতিরূপে অভিনবত্ব আছে; পঙ্কিল চরিত্র মহান্ চরিত্রাদর্শের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার পূতরশ্মি সহ্য করিতে পারিল না; মরিয়া গেল বটে, কিন্তু পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারের পুঁটুলিটি বাহ্যতঃ ত্যাগ করিলেও অন্তরতঃ ত্যাগ করিতে পারে নাই। হলধরের জাতিরূপ বাঙ্গালী সমাজের বহুস্তরে পাওয়া যায়। সঙ্গদোষে দুই-চারিটি কুকর্ম করিলেও সে তাহার চরিত্রের বল হারায় নাই। দীননাথের জাতিরূপ এখনও দুষ্প্রাপ্য হয় নাই। 'ডো' নামীয় ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটের জাতিরূপ আধুনিক ভারতে কমিয়া যাইলেও সেকালে মিলিত। এটি বাস্তবিকই মহনীয় চরিত্র। অন্নপূর্ণা, মন্দাকিনী, নিস্তারিণীর মতো আদর্শ নারী চরিত্রের অভাব বাঙ্গালি-সমাজের মধ্যে ক্রমশঃ তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে, ধর্মবিহীন শিক্ষা ও বর্তমান পরিবেশ তাহার জন্য দায়ী।

রঙ্গিণী চরিত্রটি নাট্যকার নূতনভাবে গড়িয়াছেন। কালীকিঙ্করের ছাত্রী কি করিয়া শিষ্যায় পরিণত হইলেন তাহার সংবাদ নাটকের দর্শক ও পাঠকমাত্রেই অবগত হইয়াছেন। নারীসমাজের মধ্যে শিক্ষার প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় রঙ্গিণী-জাতীয়া মহিলার প্রাদুর্ভাব আধুনিক বাঙ্গালি সমাজের কোন কোন স্তরে দেখা যাইতেছে। নাটককার কবির ভবিষদ্দৃষ্টি দ্বারা প্রায় দ্বি-পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বে যে জাতিরূপের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আজ যেন তাহারই বিশিষ্ট নারীরূপ রাজনীতি বা সমাজনীতি ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেখিয়া সামাজিকগণ প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন।

নাটকখানি সংগীতবহুল নহে, মাত্র দুইখানি গান ইহাতে আছে, তন্মধ্যে 'মেদিনী মিশিল তরল সলিলে তপন শুষিল বারি' শীর্ষক গানখানি অপূর্ব।

নাটককার এই নাটকের মধ্যে কতকগুলি অমর-বাণী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে কয়েকটি উদ্ধৃত হইল:—

(১) বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা স্বামীর নাম মুখে আনেন না, এরূপ একটা সংস্কার তাঁহাদের আছে। কেন আনেন না? তাহার কৈফিয়ৎ অন্নপূর্ণা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে বিন্দুকে এইরূপে দিয়াছিলেন:—"ঐ নাম কচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছ? আমার ও নাম মুখে করতে নেই, পাছে হৃদয় থেকে বেরিয়ে যায়! স্ত্রীলোকের স্বামীর নাম করতে নেই; হৃদয়ে চেপে রাখতে হয়।"

(২) অন্নপূর্ণা পতি-অন্বেষণার্থ ভ্রমণ করিতে-করিতে সংজ্ঞা হারাইলে তাঁহার অনুসরণকারিণী বিন্দু পথিমধ্যে এক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার কমণ্ডলুস্থ বারি লইয়া অন্নপূর্ণার মুখে দিলেন। সন্ন্যাসী তাহাতে এইরূপ বলিয়াছেন—"সন্ন্যাসীর মায়া মমতা নিষেধ, দয়া যদি নিষেধ হয়, তা'হলে সন্ন্যাসধর্ম্ম ত্যাগ করাই ভাল! * * পতিপ্রাণার যদি প্রাণরক্ষা হয়, সংসারের বিস্তর উপকার। ধর্ম্ম ভিন্ন মুক্তি নাই, দয়া অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই। আহার রয়েছে, নিদ্রা রয়েছে, শরীরে বোধ রয়েছে, তবে কেন দয়া ত্যাগ করবো?"

(৩) কালীকিঙ্কর দিনু পুলিশ-ইন্সপেক্টারকে এইরূপ বলিয়াছিলেন:—'কখনও কুকাজে সুফল ফলে না।' এটি স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর অন্যতম ছিল।

(৪) কালীকিঙ্কর ও তাঁহার শিষ্যা রঙ্গিণীর সংলাপমধ্যে এক স্থানে রঙ্গিণী বলিয়াছেন—"পাপের দণ্ড। মার্জ্জনা নাই? তবে তো মানব-দেহ-ধারণ মহা বিপদ্। * * এ জীবন কেবল কর্ম্মপ্রবাহ, সকল কার্য্যই কলুষিত; এর যদি দণ্ড হয়, যদি মার্জ্জনা না থাকে, তা হ'লে তো অনন্ত কালেও মানুষের নিস্তার নাই!" কালীকিঙ্কর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন:—"* * কে বললে মার্জ্জনা নাই? ভগবান অপরাধ-ভঞ্জন, তিনি মার্জ্জনা করেন।"

(৫) যাদব ও মাধবের আচরণে বিরক্ত হইয়া কালীকিঙ্কর শান্তিরামকে এইরূপ বলিয়াছিলেন:—"তুই কি বলছিস্, দুর্জ্জনের সাজা হওয়াই উচিত।" ইহাতে শান্তিরাম বলিয়াছিল—"এরা দুর্জ্জন, এদের সাজা দিতে চাও, আর এদের যে বে' দিয়ে এনেছ, সেটা মনে রাখ? * * মনের পচা পাঁক উটকে দেখলে কেউ কারুকে দুর্জ্জন বলতো নি, তা আমরা মুরুখু, আমরা আর তোমাদের কি বলবো!"

(৬) রঙ্গিণী ও অন্নপূর্ণার কথোপকথনের মধ্যে রঙ্গিণী বলিয়াছিলেন:—'যে সুকাজ করবে সে কলঙ্কে না ভয় পায়। মা, দুর্জ্জনের কলঙ্ক নাই, সজ্জনেরই কলঙ্ক।'

(৭) সাতকড়ির আসলরূপ এই কথা কয়টির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাতকড়ি হলধরকে বলিতেছে:—"বিবেচনা করে দেখ, পরের ভালোতে কার ভাল বল? পরের ভাল ক'রে কার বিষয় হ'য়েছে, কারে দশজনে মেনে চলেছে, ভয় করেছে? পরের ভাল শুনতে ভাল, আপনার ভালই ভাল!"

(৮) রঙ্গিণী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে চৈতন্যের শক্তি-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন:—"সাহেব, যে মনে চৈতন্য উদয় হয়েছে, সে মন জড়বিষে কতক্ষণ আচ্ছন্ন রাখতে পারে?"

(৯) পাপীর চিহ্ন মুখে থাকে, তাই রঙ্গিণী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বলিয়াছিলেন:—"আপনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি দুর্জ্জন-শাসনের ভার আপনাকে ভগবান দিয়েছেন, নয়নপথে আমার অন্তর্দৃষ্টি করুন, মিথ্যার ছায়া মাত্র তথায় নাই!"

(১০) সাতকড়ি উকিলের বুদ্ধি সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছে :—"উকিলের বুদ্ধি কুমারের চাক্, যত ঘুরুবেন, ততই ঘুর্‌বে।"

নাটকখানি আধ্যাত্মিক রাজ্যে মিলনাত্মক এইরূপ নূতন সংজ্ঞা পাইবার যোগ্য।

বলিদান নাটক

বলিদান এই বিভাগের চতুর্থ নাটক। এখানি সমস্যামূলক (problematic) শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রেল তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। অতিরিক্ত পণ-প্রথার জন্য মধ্যবিত্ত বাঙ্গালিসমাজের কন্যার বিবাহ-দেওয়া কিরূপ দায়-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার একখানি অত্যুগ্রচিত্র গিরিশচন্দ্র এই নাটকের মধ্যে দেখাইয়াছেন। অত্যুগ্র ঘটনা লইয়াই ট্র্যাজেডি বা বিষাদান্ত নাটকের কারবার, সমালোচনা-কালে একথা ভুলিলে চলিবে না।

নাটকের নায়ক করুণাময় সর্বস্ব খোয়াইয়া ঋণের দায়ে ভদ্রাসন-বাড়ী পর্যন্ত বেচিয়া নানারূপ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অপমানের মধ্যে দুইটি কন্যাকে কোনরূপে পাত্রস্থা করিয়া তৃতীয়া কন্যার বেলায় চুক্তি-ভঙ্গের দায়ে (Breach of contract) আত্মবলি দিয়া কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার অদ্ভুত পরিণতি দর্শক ও পাঠক সমাজকে দেখাইয়া গিয়াছেন। নাটককার দক্ষহস্তে ও নিপুণতুলিকায় ঐ ছবি আঁকিয়াছেন।

পাত্রস্থা কন্যার মধ্যে প্রথমটি অকালকুষ্মাণ্ড স্বামীর হাতে পড়িয়া, বৌ-কাঁট্‌কি শাশুড়ীর উৎকট বধূ-নির্যাতন ভোগ করিয়া অবশেষে নিঃস্ব অবস্থায় পিত্রালয়ে আশ্রয় লইয়াছিল। দ্বিতীয়টি—দুইটি সতীন-পুত্র-সহ এক জরাজীর্ণ স্বামীর হাতে পড়িয়া, বিবাহের অত্যল্পকাল মধ্যে বিধবা হইয়া অত্যাচারী সতীনপুত্রদ্বারা গৃহ হইতে বিতাড়িতা হইয়া, শূন্য হস্তে ও একবস্ত্রে পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল; কিন্তু পরিশেষে নানারূপে ত্যক্ত-বিরক্ত পিতার নিকট হইতে খাবার-খোঁটা পাইয়া পুষ্করিণীর শীতল জলে ডুবিয়া-মরিয়া ইহজীবনের সকল জ্বালা শেষ করিয়াছিল। নাটকখানি সমস্যামূলক বলিয়া তৃতীয়কন্যা দ্বারা কন্যাদায়-সমস্যার পূরণ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও এক অচিন্তনীয় উপায়ে; নাটকের দর্শক বা পাঠক সে কথা জানিয়াছেন নাটকের অবয়বে। দুঃখ-কষ্ট যত ভীষণ হোক্ না কেন, যতদিন মান ছিল ততদিন করুণাময় সব সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু কনিষ্ঠা কন্যা জ্যোতির অচিন্তনীয় বিবাহ-ব্যাপারে রূপচাঁদ মিত্রের কাছে চুক্তিভঙ্গের দায়ে তিনি যেরূপ অপদস্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে প্রাণ অপেক্ষা মানকেই তিনি উচ্চাসন দিয়াছিলেন তাই উদ্‌বন্ধনে জীবন বিসর্জন দিয়া নূতন বৈবাহিকের বদান্যতার সুযোগ আর স্বয়ং গ্রহণ করিলেন না।

এই নাটকখানির মধ্যে যেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহাতে এটি বিষাদান্ত না হইয়া যায় না। মিলনান্ত হইবার বহু সুযোগ সত্ত্বেও নাটককার ইহাকে বিষাদান্তে পরিণত করিয়া তাঁহার নাট্য সম্বন্ধীয় ভূয়োজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। সমস্যামূলক নাটকের যাহা প্রয়োজন তাহার অভাব ইহাতে নাই। নাট্যকার সব্যসাচীর ন্যায় এক হস্তে কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারের অদ্ভুত পরিণতি দেখাইয়াছেন, এবং অপর হস্তে ঐ সমস্যার পূরণার্থ কিশোর কর্তৃক সমিতি গঠন, বিবাহের ক্ষেত্র-সম্প্রসারণ, সামাজিক শাস্তির বিধান-নিরূপণ ও ঘনশ্যাম প্রমুখ সামাজিকের বিনাপণে পুত্রের বিবাহ দিয়া সমাজের মধ্যে আদর্শ-স্থাপনাদ্বারা সমস্যার সমাধানের পথও দেখাইয়াছেন।

অন্তঃকরণে মধুসূদনকে বসাইয়া তাঁহারই আদেশে সে চলিত ও ফিরিত। স্বামীর সহিত তাহার দৈহিক সম্বন্ধ ছিল না, স্বামীর চরিত্র-সংশোধনের নিমিত্ত সে বহু চেষ্টা করিয়াছিল।

রমানাথ তাহার স্বামী। বিবাহের পর রমানাথ মদের ঝোঁকে লাথি মারিয়া জোবিকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। স্বামী-স্ত্রীর পরিচয় এই পর্যন্ত। জোবি কিন্তু নারীসুলভ নিষ্ঠা ও নৈতিক জ্ঞান-দ্বারা রমানাথকে পরে তাহার স্বামীরূপে চিনিয়া লইয়াছিল, রমানাথ কিন্তু তাহা পারে নাই। চুরি ও প্রতারণা রমানাথের পেশা। আজ সে বিপন্ন হইয়াই জোবির আশ্রয়ে আসিয়াছিল, জোবি ভিক্ষা করিয়া তাহার আহার যোগাইতেছে; পাছে পুলিশে সন্ধান পায়, তাই স্বামীকে গোপনে রাখিবার জন্য জোবির এই যত্ন ও চেষ্টা। কালী-ঘটক কিশোর-প্রতিষ্ঠিত সমিতির সভ্যগণকে লইয়া রমানাথকে ধরাইয়া দিবার জন্য জোবির কুটীরে আসিলে নাটকীয় ভাবায় বলিতে যাইলে জোবি তাহার জীবনের শ্বাসবায়ু, প্রাণের প্রাণ, জীবনসর্বস্বকে বাঁচাইবার জন্য আবেগপূর্ণভাষায় কিশোরপ্রমুখ সভ্যগণের কাছ থেকে রমানাথকে ভিক্ষা চাহিল। জোবির লুক্কায়িত স্বামীরহস্যটি এতদিন পরে তাঁহাদের কাছে প্রকাশিত হইয়া গেল। এই ঘটনায় তাঁহারা সকলেই জোবির কাছে শ্রদ্ধানত হইলেন।

পেটের দায়ে যাত্রাদলের বাসন মাজিয়া জোবি গান গাহিতে শিখিয়াছিল। বাঙ্গালী বধূর প্রাণের জ্বালা গানের ভাষায় ও ছন্দে রচনা করিয়া সে লোকের বাড়ী-বাড়ী উহা গাহিয়া ভিক্ষায় দিনপাত করিত। রাজপুত চারণগণ যেমন পরাধীনতার বেদনা রাজপুত্‌নাবাসীদের কর্ণে ধ্বনিত করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য তাহাদের উত্তেজিত করিত, জোবিও সেইরূপ বাঙ্গালীবধূর নির্যাতন-কাহিনী বাঙ্গালী সামাজিকের গৃহে-গৃহে গাহিয়া সমাজের চক্ষু-কর্ণ খুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। নিজের ব্যর্থ জীবনকে জোবি এইরূপে সমাজের সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছিল। ধন্য গিরিশচন্দ্রের পরিকল্পনা!

রমানাথ কিন্তু শোধরাইল না, সে পুনরায় কুকার্যের জন্য পুলিশে ধরা পড়িল। জোবি এবারে তাহার অন্তর্বস্থিত মধুসূদনের আদেশে আর তাহাকে ছাড়াইল না। পাপের ফলভোগ করিতে দিল। ব্যর্থপ্রযত্ন হইয়া জোবি তাহার জীবনের সর্বশেষ কার্য দুলালচাঁদের চরিত্র-সংশোধন করিবার পর কর্মক্ষেত্র হইতে অপসৃতা হইল। ঈশ্বরের কাছে তাহার শেষ আবেদনটি এইরূপ:—"আর কি কাজ আছে? নাঃ। ঘোরা ফুরিয়েছে, ভিক্ষা ফুরিয়েছে, চোখের জলও শুকিয়েছে! আর জোবি কাঁদ্‌বে না, আর জোবি ঘুর্‌বে না, আর জোবি কারুর জন্য ফির্‌বে না"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া—"কোথা হে মধুসূদন, ফুরালো আর কি কাজ আছে। একলা নারী রইতে নারি, থাক্‌বো গিয়ে তোমার কাছে। থাকে না দিন, দিন গিয়েছে, মনে গাঁথা সব রয়েছে, চরম দিন আজ উদয় হয়েছে—আলো ক'রে আগে চল, পাগলিনী যাবে পাছে"—এই গানটি গাহিতে গাহিতে জোবি নিরুদ্দিষ্টা হইল। জোবি চরিত্রটি অপূর্ব!

বলিদান নাটকখানি সংগীত-সম্পদে বড়ই সম্পন্ন। ইহার প্রত্যেকটি গান নির্যাতিতা বাঙ্গালীবধূর মর্মস্থল নিঙড়াইয়া রসসিক্ত করা হইয়াছে। যতদিন বাঙ্গালিসমাজ হইতে বরপণ-প্রথা দূরীভূত না হইবে, ততদিন এ গানগুলি পুরাতন হইবার নহে; স্থানাভাবে গানগুলির প্রথম লাইনটি উদ্ধৃত হইল:—(১) 'বিলিয়ে দিছিস্ পেটের মেয়ে বাজ বুকে নিয়ে সাধে', (২) 'খা'লো বনে আফিং কিনে, বাগিয়ে না হয় রাখ্‌ দড়ী, কলিতে অমর কনের শাশুড়ী', (৩) 'উলু নয় রোদন-ধ্বনি প্রাণ কাঁদে শাঁকের ডাকে, বাপ-মা যেচে পেটের মেয়ে বলি

দিতে দেয় কাকে', (৪) 'কলঙ্ক যার মাথার মণি, কোমল প্রাণে সকল সয়, লুকানো প্রেম তারই সাজে, ভয় থাকে যার তার তো নয়,' (৫) 'তুই ভিখারী কি রাজার রাণী—জানিস্ কি না বল দেখি মন।'

সামাজিক নাটকের মধ্যে বলিদান শ্রেষ্ঠ আসন পাইয়াছে, এই নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য প্রতি রজনীতে স্থানাভাবে দর্শকবৃন্দ ফিরিয়া যাইতেন। এই ট্র্যাজেডিখানি নিখুঁত নিও-ক্লাসিকের অন্তর্গত, যাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই তাঁহারা অতিশয়োক্তির দোষারোপ করিয়া থাকেন। রোমান্স ইহার অন্তর্বর্তী থাকিয়া কাজ করিয়াছে।

শাস্তি কি শান্তি নাটক

"শাস্তি কি শান্তি ?" গিরিশচন্দ্রের এই বিভাগীয় পঞ্চম নাটক। এখানি সামাজিক সমস্যামূলক শ্রেণীর অন্তর্গত। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে বীডনস্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে ইহা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এই নাটকখানি উচ্চস্তরের মনস্তত্ত্বে পূর্ণ, শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন অন্যের পক্ষে বুঝা কঠিন। প্রসন্নকুমার এক ধনাঢ্য গৃহস্থ। বিধি-বিড়ম্বনায় অল্পদিন পূর্বে বিবাহিত জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুজনিত শোক ভুলিতে না ভুলিতেই তাঁহার প্রথমা কন্যা ভুবনমোহিনী নবযৌবনে বিধবা হইলেন। ঐ কন্যার স্বামী বেণীমাধব সরল স্নেহশীল ও পত্নীগতপ্রাণ ছিলেন। বহুরূপে উপকারী বন্ধু প্রকাশের প্রতি বেণীমাধব অতিমাত্রায় বিশ্বাসশীল। আধুনিক উদার মতাবলম্বী বলিয়া বেণী তাঁহার পত্নীকে প্রকাশের সম্মুখে কোনরূপ সংকোচ করিতে দিতেন না। এই প্রশ্রয়ে প্রকাশ বন্ধুর মৃত্যুর পর স্নেহের অজুহাতে লালসার বীজ ছড়াইয়া ভুবনমোহিনীকে নানাবিধ ভোগের মধ্যে রাখিয়া তাঁহার মনে কাম-পিপাসা উদ্রিক্ত করিল। পরিশেষে বিবাহের আশা দিয়া তৎপূর্বেই প্রকাশ উভয়ের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া লইল।

প্রসন্নকুমার স্নেহশীল ভাবপ্রবণ রক্ষণশীলদলের লোক ছিলেন। ভুবন-প্রকাশের অবৈধ মেলামেশা দেখিয়া তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা প্রমদা, যে বিবাহের দিন রাত্রিকালেই আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিধবা হইয়াছিল, তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া-চিন্তিয়া ভাবের প্রেরণায় তিনি তাঁহার পুনর্বার বিবাহ দিলেন, প্রমদার এই দ্বিতীয়-বিবাহটি সুখের হয় নাই। পারিবারিক দুর্ঘটনা-প্রসূত আশাভঙ্গের ফলে স্ত্রীর মৃত্যুও প্রসন্নকুমার দেখিলেন। দৈব-দুর্বিপাকে প্রতিবাসীর এক মিথ্যা ষড়যন্ত্রের লক্ষীভূত হইয়া তিনি স্বয়ং খুনের দায়ে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়া হাতে হাত কড়ি পরিলেন। এই সকল বিরুদ্ধ ঘটনায় প্রসন্নকুমারের মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি অবশেষে সর্ববিধ দুর্ঘটনার মূলীভূত কারণ ভুবনমোহিনীকে হত্যা করিয়া নিজ জীবন বলি দিলেন। কোন পাশ্চাত্ত্য নাট্যসমালোচক ট্র্যাজেডিকে 'luxury of sorrow', 'দুঃখের বিলাস' নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রত্যেক বেদনার অন্তর্ভূমিতে একপ্রকার সুপ্ত সুখের স্মৃতি বাহির হইয়া আসে এবং তাহাই বিষাদান্তের ঘটক হইয়া কার্য করে। শাস্তি কি শান্তিতে এই জাতীয় বিষাদ ঘটিয়াছিল।

বিধবা-বিবাহ ভাল কি মন্দ—এই সমস্যার সমাধান-সম্বন্ধে নাটককার নাটকের মধ্যে ছদ্মবেশী পাগল চরিত্রের মুখ দিয়া এই কথা বলাইয়াছেন :—"শ্যামাদাস বাবু! বিবেচনা করুন, বিধবা সম্বন্ধে ঋষিদের যেরূপ ব্যবস্থা, তা, শাস্তি কি শান্তি ?" নাটকের ক্রিয়া দেখিয়া তাহার দর্শক ও পাঠক সম্প্রদায়ের উপর ঐ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার ভারার্পণ করিয়াই নাট্যকার মূক রহিলেন।

এই নাটকের মধ্যে মনস্তত্বের খেলা নাটককার অতি সুন্দর কৌশলে দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য হইতে ইহার আরম্ভ। ঐ দৃশ্যে প্রকাশ-ভুবন ও ভুবন-হরমণির সংলাপ দ্রষ্টব্য। এক এক কথার ইঙ্গিতে মানুষের মনের কবাট কেমন আপনিই উন্মুক্ত হইয়া যায়—নাটককারের এমনই সেই প্রকাশভঙ্গী। সংলাপ-রচনার এমনি বাহাদুরি যে ইহাতে ক্ষুধাতুরের ক্ষুধা-নিবৃত্তির নির্দেশ ও সংযমীর সংযমরক্ষার উপদেশ অধিকারী ভেদে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অঙ্কের পরবর্তী দৃশ্যগুলির সংলাপ-মধ্যে মনোবিকলনকারী ভাষার প্রয়োগ বহুস্থানে আছে। নাটকের অনুসন্ধিৎসু পাঠক যথাস্থানে তাহা উপভোগ করুন। এই নাটকে প্রথম অঙ্কে ক্রিয়ার সূচনা, দ্বিতীয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব, তৃতীয়ে মনস্তত্বের ভিতর দিয়া ঘটনার প্রবল ঘাত-প্রতিঘাত, চতুর্থে নাটকের বহুমুখী ক্রিয়া ঘটনার প্রাবল্যে রোমাঞ্চকর নাটকের ন্যায় চমকের সৃষ্টি করিয়াছে। পঞ্চমে নাটকের জাল গুটাইয়া নাটকখানিকে উপসংহারের পথে চালিত করিয়াছে।

পাগল চরিত্রটি নাটককারের অভূতপূর্ব সৃষ্টি। জীবন-সংগ্রামে নানাভাবে উৎপীড়িত হইয়া শাক-বিক্রয় হইতে জীবিকার আরম্ভ করিয়া তেজারতি ব্যবসায়ে কিরূপে কোটিপতি হইয়া পরিশেষে সেই উপার্জিত সম্পত্তি পরহিতব্রতে ঐ পাগলরূপী সাধু পুরুষটি নিয়োজিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পাঠক ও দর্শকসমাজ নাটকের অবয়বে অবগত হউন। এরূপ চরিত্র নাট্যসাহিত্যে একান্তই দুর্লভ। বিবেকানন্দের সেবাধর্ম এই চরিত্রের মূলগত আদর্শ। হরমণি পাগলের সংস্পর্শে আসিয়া নবভাবে তাহার জীবন গঠিত করিয়া লইয়াছিল। গঙ্গাতীরে ডুবিয়া মরিতে আসিয়া সে নূতন জীবন লাভ করিল। নির্মলা চরিত্র অপূর্ব আত্মত্যাগে পূর্ণ। গৃহলক্ষ্মী-নাটকের বিরজা চরিত্রের ছায়া এই চরিত্রে পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল, গৃহলক্ষ্মী ও শাস্তি কি শান্তি শক্তিশালী সামাজিক নাটকের অন্যতম। যোগেশ, উপেন্দ্র ও প্রসন্নকুমার—নায়কত্রয় মহান্ চরিত্রবান্ হইয়াও কিসের অভাবে কেহ পাগল, কেহ-কেহ বা মৃত্যু বরণ করিল, তাহার একমাত্র কারণ তাঁহারা কেহই ঈশ্বর-নির্ভরশীল ছিলেন না। নাটককার এই চিত্র নাটকোচিত গুণে স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন।

শাস্তি কি শান্তির গানগুলি বড়ই মধুর, ব্যথাতুরের আত্মনিবেদনে ঐগুলি পূর্ণ, স্থানাভাবে প্রথম ছত্র মাত্র উদ্ধৃত হইল :—(১) 'কেন দিবানিশি ভাসি আঁখিজলে। মৃদু-মৃদু ভাবে হৃদি পরশে, কে বলে—'তাপিত তনয় আয় রে কোলে'!' বিধবার অন্তর্ব্যথা এই গানটিতে সুন্দর ফুটিয়াছে :—(২) 'কুসুমে আমার নাহি অধিকার, কেন বা কুসুম তুলিব আর।' ছদ্মবেশী স্বামী-সম্বন্ধে হরমণির গীতটি এইরূপ :—(৩) 'ধরি ধরি যেন মনে হয় হেন, ধরিতে তাহারে নারি। দেখা দিয়ে যায়, অমনি লুকায়, আঁখি ভরে আসে বারি।' স্বামী পরিত্যক্তা প্রমদাকে হরমণি এইরূপে অনাথনাথকে স্মরণ করিতে বলিয়াছে :—(৪) 'ভবে কাজ রয়েছে, কাজ ফেলে গেলে তাঁর কাছে যাব কি ব'লে।' ভুবনমোহিনীকে আত্মহত্যা করিতে নিষেধ করিয়া তাহার কলঙ্ক দূর করিবার নিমিত্ত কলঙ্কভঞ্জনকে হরমণি এইরূপে ডাকিতে বলিয়াছে :—(৫) "যদি শরণ নিতে পারি রাঙ্গা পায়। নাম নিলে তাঁর হৃদয় ভরে, কলঙ্ক কোথায় পালায়!" হিংসা-দ্বেষ ছাড়িয়া ভগবানের মঙ্গলময় রাজ্যে সকলের মঙ্গল-কামনা লইয়া প্রবেশ করা সম্বন্ধে হরমণি ভুবনমোহিনীকে এই গানটি শুনাইয়াছে :—(৬) "প্রাণময় প্রাণনাথ আমার। ব্যথা কারো দিলে প্রাণে বাজে ব্যথা তাঁর।" এ নাটকখানি রোমান্টিক শ্রেণীর ট্রাজেডি।

গৃহলক্ষ্মী নাটক

গৃহলক্ষ্মী ষষ্ঠ সামাজিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ইহার চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন, পঞ্চম অঙ্কটি তাঁহার পিস্তুত ভাই শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় লিখিয়া দিয়া নাটকখানিকে সম্পূর্ণ করিয়াছেন। গৃহলক্ষ্মী 'শাস্তি কি শান্তির' পূর্বে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু অসম্পূর্ণ-বিধায় বহুপরে অভিনীত হইয়াছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাটককার স্বর্লোকে বসিয়া ইহার সাফল্যমণ্ডিত যশঃ (posthumous glory) উপভোগ করিয়াছেন। এখানি সামাজিক দোষ গুণের স্বাভাবিক পরিণতি প্রাপ্ত শ্রেণীর অন্তর্গত।

গিরিশচন্দ্র কোন প্রবন্ধে বাঙ্গালা ভাষার সামাজিক নাটক সম্বন্ধে আপসোস্ করিয়া এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—"দোষ গুণ লইয়া (সামাজিক) নাটক রচিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালার গুণ দূরে থাকুক, বড় রকমের একটা দোষও নাই। দোষের ভিতর :—বড় জোর নাবালককে ঠকাইয়াছে, কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে. কৌন্‌সুলীর জেরাতে হটে নাই। গৃহে অস্ত্রহীন দুই একজন পাইক ছিল, তাহাদের মারিয়া ডাকাইতি করিয়াছে, এই মাত্র দোষের চিত্র। লাম্পট্য দোষের বিবরণ,—দুই একটা বেশ্যা রাখিয়াছে, কেহ বা এক পরিবারস্থ থাকিয়া কুলাঙ্গনাকে বাহির করিয়াছে, কেহ বা পড়্‌শীর কুলাঙ্গনা বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছে। গুণের কথা,- বড়জোর কেহ পিতৃশ্রাদ্ধে কাঙ্গালীভোজন করাইয়াছিল, রাস্তা নির্মাণের জন্য টাইটেল আশে রাজাকে চাঁদা দিয়াছে। * * যাঁহারা বাঙ্গালার বড় বড় চরিত্র, তাঁহারা পলিশিবাজ। স্বয়ংগোপনে থাকিয়া একজন পনের টাকা মাহিয়ানার প্রিণ্টারকে খাড়া করিয়া মানহানির কয়েদ-খাটা তাহার উপর দিয়া, কোন এক ম্যাজিস্‌ট্রেটের অত্যাচার বর্ণনা পূর্বক প্রবন্ধ লেখেন। এই সকল উচ্চ চরিত্র, অদ্যাবধি রাজদ্বারে সত্যকথা বলিতে কেহ সক্ষম হন নাই। যাহা কাগজে লিখিয়াছেন, তাহার থুতু খাইয়া মার্জ্জনা চাহিয়া দণ্ড হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সামাজিক নাটকে ত এই সকল চরিত্র উঠিবে!"

উপরি-উক্ত আক্ষেপবাণী মিটাইবার জন্য নাট্যকার শেষবয়সে গৃহলক্ষ্মী লিখিয়াছিলেন। নাটক-কারের সম-সাময়িক সামাজিক আব্-হাওয়ার মধ্যে বাঙ্গালিসমাজ কূট-মাম্‌লাবাজ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। রাজনৈতিক কারণে ঐ বাঙ্গালিসমাজ সমষ্টিভাবে বাহুবলের পরিচয় দিতে পারে নাই। গিরিশচন্দ্র উনবিংশ শতকের লোক, তাঁহার পূর্ববর্তী অষ্টাদশশতকেও বাঙ্গালীর ঐ একই খ্যাতি ছিল। সত্য হউক—মিথ্যা হউক মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি ঐ দোষের সাক্ষ্য দিয়াছে। মেকলে সাহেব বাঙ্গালি-চরিত্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা জাতি-হিসাবে ঠিক না হইলেও, কতকগুলি লোক সম্বন্ধে একেবারে মিথ্যা নহে। তাই গিরিশচন্দ্র সব্যসাচীর মতো এক হস্তে বাঙ্গালীর বিশিষ্ট গুণাবলি-পূর্ণ চরিত্রাদর্শ আঁকিয়া, অপরহস্তে যে দোষাবলির জন্য বাঙ্গালী ইতিহাসে কলঙ্কিত হইয়াছিল সেই সকল দোষ-পূর্ণ চরিত্র সংযোগে গৃহলক্ষ্মী নামক বিষাদান্ত নাটকখানি রচনা করিয়া গেলেন।

বিংশশতকের প্রথমপাদের বাঙ্গালী ধনী গৃহস্থ-ঘরের খাঁটি চিত্র নাটককার বহু দিনের পর দক্ষ হস্তে আঁকিয়াছেন। বহু শতকের পুঞ্জীভূত জাতীয়-সংস্কার যাহা বাঙ্গালী হিন্দু-সংসারের মজ্জায়-মজ্জায়

প্রবিষ্ট হইয়া একান্নবর্তী পরিবার গড়িয়া তুলিয়াছিল কিসের আকর্ষণে তাহা গঠিত ছিল এবং কিসের অভাবেই বা তাহা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল তাহার আণুবিক্ষণিক বিশ্লেষণ এই নাটকখানির মধ্যে নাটককার করিয়াছেন। প্রফুল্ল নাটকে যাহার সূত্রপাত, গৃহলক্ষ্মীতে তাহারই পরিণতি। যোগেশের 'সাজান বাগান' যেমন শতচেষ্টাতেও মঞ্জুরিত হইল না, তাঁহার গুণধর উকিলভ্রাতা রমেশের দ্বারা উহা উষর ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল, গৃহলক্ষ্মীতেও সেইরূপ উপেন্দ্রের সাজানো ধর্মের সংসার কুলধ্বজ-পুত্র নীরদের দ্বারা অধর্মের আবাসভূমে পরিণত হইল। কিরূপে এইরূপ হইয়াছিল, তাহা নাটকের দর্শক বা পাঠক মাত্রেই নাটকের অবয়বে দেখিয়াছেন।

গৃহলক্ষ্মীর চরিত্র-বিন্যাস ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত অপূর্ব, এমন কি অপরাজেয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহার লিখনভঙ্গী ও ভাবপ্রকাশভঙ্গী এমনি চমৎকার যে পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠতম নাটকের পার্শ্বে বসিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। উপেন্দ্রের মস্তিষ্কের উপর নাটকীয় ক্রিয়ার সংঘাত এমনি তীব্রভাবে আসিয়াছিল যে, সে আপনাকে জীবন্মৃত জ্ঞান করিল। প্রফুল্লের যোগেশও আপনাকে মৃত সাব্যস্ত করিয়াছিল; মস্তিষ্কের কি বিষাদময় প্রতিক্রিয়া! বিরজা চরিত্রের তুলনা নাই। এরূপ সংযত নিষ্ঠাবতী স্বার্থলেশশূন্যা জাতীয় সংস্কারের বর্তিধারিণী আদর্শ গৃহিণীর অভাবেই হিন্দুর ধর্ম-নীড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্মথ ও ফুলী চরিত্র দুইটি রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায় প্রবর্তিত সেবাধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত। উভয়ের অন্তর্নিহিত সুপ্ত যৌন-পিপাসা কেমন অচিন্তিতভাবে উভয়ের অজ্ঞাতসারেই বিবেকানন্দ-সেবিত বিশ্বপ্রেমে পরিবর্তিত হইয়া গেল। নাট্যকারের পূর্ববর্তী নাটক মায়াবসানের কালীকিঙ্কর ও রঙ্গিণী চরিত্রের ছায়া যথাক্রমে মন্মথ ও ফুলী চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। জাতিরূপ (type) হিসাবে নকুলানন্দ অবধূত, হারু, কুমুদিনী, শরৎ পরস্পর-বিরুদ্ধ ছাপ বহন করিয়াও সম্পূর্ণ পৃথক চরিত্র। এ নাটকখানি ট্র্যাজিক শ্রেণীর অন্তর্গত।'

সংগীতবিভাগে নাট্যকারের পূর্ব খ্যাতি এ নাটকেও অক্ষুণ্ণ আছে, স্থানাভাবে প্রথমছত্রগুলি দেওয়া হইল:—(১) 'হে দীনশরণ বন্ধন-মোচন, তাপে তাপ বার ত্রিতাপ বারণ,' (২) 'শিহরি মা মনে হ'লে, কাল সকালে নিয়ে যাবে। মরি ত্রাসে কৈলাসে গে, কেমনে মা দিন কাটাবে॥'

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক দৃশ্যকাব্যের আলোচনা এই গৃহলক্ষ্মীর সঙ্গে-সঙ্গেই শেষ হইল। এই বিভাগের দোষ-গুণের কথা নাটকগুলির পৃথক পৃথক আলোচনা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

ঐতিহাসিক বিভাগ

ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের সতর্কবাণী এইরূপ :—'It is not the function of the poet to relate what has happened but what may happen according to the law of probability and necessity' অর্থাৎ 'যাহা ঘটিয়াছে তাহাই যে দিতে হইবে তাহা নহে, যাহা সম্ভববোধে বা প্রয়োজন অনুসারে ঘটিতে পারে তাহা ঐতিহাসিক নাটকে থাকিলেই চলিবে।

আনন্দ-রহো নাটক

আনন্দ-রহো গিরিশচন্দ্রের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। শুধু ঐতিহাসিক নাটক বলিলে সবটা বলা হইল না, এই নাটকেই গিরিশচন্দ্রের নাটক রচনার হাতে-খড়ি হইয়াছিল, কারণ ইহার পূর্বে তিনি গীতিনাট্য, অর্থাৎ নাটিকা ছাড়া কোন নাটক লেখেন নাই। ইতিহাস-মাত্রই পুরাতনের প্রসঙ্গ, কল্পনার মিশ্রণ তাহাতে থাকিবেই, কারণ ঐতিহাসিক চরিত্রের আসল কথা বা ঘটনা রেডিও, বেতার, খবরের কাগজ ও গ্রামোফোনের যুগে ধরিয়া রাখিবার সুযোগ হইয়াছে, কিন্তু পুরাকালে তাহা ছিল না। সুতরাং কল্পনার সাহায্যে ঐতিহাসিক চরিত্রকে আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক সত্যের, যতটা কাছা-কাছি আনিয়া নাটক বা উপন্যাসের মধ্যে রূপ দেওয়া যায়, ততটা সত্যকারের উহা ঐতিহাসিক নাটক বা উপন্যাস বলিয়া গণ্য হইবে। এবং কোন কাল্পনিক ঘটনা ইতিহাসকে বিকৃত না করিয়া সরস করিয়া তুলিলে উহার কাল্পনিক জীবন আপনা হইতে স্খলিত হইয়া ঐতিহাসিক তথ্যে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। গিরিশচন্দ্র এই জাতীয় ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছেন

আনন্দ-রহো নাটকে নাটককার অতিমাত্রায় কল্পনার আশ্রয় লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইলেও মূল ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে তিনি বিকৃত করেন নাই। হলদিঘাটের যুদ্ধের পর রাণা প্রতাপসিংহ যে কয়টা দিন বাঁচিয়াছিলেন, একরূপ জীবন্মৃত অবস্থাতেই দিন কাটাইয়া গিয়াছিলেন, নাটকে তাঁহার সে চিত্র অক্ষুণ্ণই আছে। আকবর রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন, নারায়ণ সিংহের সহিত তাঁহার সংলাপে ইহার যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নারায়ণকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য এক স্থানে আকবর বলিয়াছেন :—"তোমার সাহস আমার বুদ্ধির দ্বারা চালিত হউক, উভয়ে সাম্রাজ্য ভোগ করি। যখন আমার তোমার ন্যায় সাহস ছিল, তখন এ প্রবীণ বুদ্ধি ছিল না, প্রবীণ বুদ্ধির সহিত সে সাহস নাই।" মানসিংহের গুপ্ত ষড়যন্ত্র ধরিয়া ফেলিয়া আকবর একস্থানে মানসিংহের উদ্দেশে এইরূপ বলিয়াছেন :—"মানসিংহ! তোমার ন্যায় শত শত্রু-দমনে আমি সক্ষম। সিংহ বলবান, কৌশলে পিঞ্জরাবদ্ধ! সাগর বলবান, কিন্তু ক্রীতদাসের ন্যায় মনুষ্য বহন করে। তুমিও বলবান, কিন্তু আকবরের বুদ্ধিবলে ক্রীতদাস।" মানসিংহ ক্ষমতাদৃপ্ত বীর ছিলেন, কিন্তু নীচ স্বার্থপরতাই তাঁহাকে পতনের পথে চালিত করিয়াছিল। ষড়যন্ত্রে অসতর্ক ব্যক্তির পতন অবশ্যম্ভাবী, তাই মানসিংহ সর্বদা সতর্ক থাকিতেন। নাটকে তাঁহার চরিত্রের এই দিকটা ফুটিয়াছে।

নাটকের অভ্যন্তরে কয়েকটি চমৎকার প্রকাশভঙ্গী আছে। নবীন নাট্যকার ভবিষ্যতে যে বড় নাট্যকার হইবেন তাহার ইঙ্গিত ঐগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। সেলিম যখন নিদ্রিতা লহনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার দেহ-শোভা গোপনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন তখনকার মনোভাব তিনি এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন :—"নিশ্বাস-প্রশ্বাসে যেন কুচযুগ আমায় আহ্বান

কচ্চে।” কামুন একস্থানে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছে:—“উঃ! আকাশে একটিও তারা নেই, বিদ্যুৎগুলো যেন লড়াই কত্তে-কত্তে আকাশটা মেপে চলেছে।” যমুনা ঐ দৃশ্যে দেবীর সহিত বিদ্যুতের তুলনা এইরূপে করিয়াছে:—“মা তারা! বিদ্যুৎগুলি যেন তোমার রাঙ্গা পা’র মতন খেলা ক’রে লুকুচ্চে।”

নাটকটির কেন্দ্রগত লক্ষ্য কি, ঠিক বুঝা যায় না। সব চরিত্রগুলি যেন পৃথক পৃথক চিত্রের মতোই দেখাইয়াছে। ঐগুলির এক উদ্দেশ্য-নিরূপণে সহায়তা বা বিরোধিতা দেখা যায় না। নাটকের ক্রিয়া এরূপে চলে না, তজ্জন্য গিরিশচন্দ্রের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক দোষশূন্য হয় নাই। ইহার ভাষাও আড়ষ্ট, সাবলীল গতি তাহার নাই। নাটকের কেন্দ্রগত চিত্র বেতালের কথার ধুয়া—‘আনন্দ-রহো’, প্রতি সু বা কু ঘটনার প্রকাশ কালেই ধ্বনিত হইয়াছে। গুপ্তচর-গিরির ইহা উৎকৃষ্ট নিদর্শন সন্দেহ নাই, কিন্তু নাটকের মধ্যে বেতালকে নির্লিপ্তের মতোই দেখা গিয়াছে, দ্বেষ-হিংসা তাহার কার্যের মধ্যে ছিল না; জীবসেবাই তাহার লক্ষ্য, সৎপ্রচেষ্টায় তাহার আনন্দ। সৎচিদানন্দের তৃতীয় অবস্থা ‘আনন্দ’ যেন তাহার অভিপ্রেত, যদিও তাহাকে কখন-কখন গঞ্জিকা সেবনরূপ বাহ্য-প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ আনন্দ আনিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহা যেন বেতালের বাহ্যরূপ মাত্র। গুপ্ত ষড়যন্ত্র যেমন নাটকটির প্রাণ, গুপ্তসাধকের কার্যও তেমনি নাটকটিকে প্রহেলিকাময় করিয়াছে।

নারী চরিত্রের মধ্যে যমুনা এবং পুরুষ চরিত্রের মধ্যে নারায়ণ সিংহ খণ্ড চরিত্রাবলির ভিতর রূপ লইয়াছে, বাকিগুলি কলিকামাত্র, ফুটিবার সুযোগ পায় নাই। সংগীত বিভাগে এই কয়খানি গান—(১) ‘তুলে নে রাঙ্গা কমল রাঙ্গা পায়ে সাজবে ভাল’, (২) ‘পাষাণী পাষাণের মেয়ে বাদ সেধেছ আমার সনে,’ (৩) ‘বাঞ্ছা পূর্ণ কর মা শ্যামা ইচ্ছাময়ী কল্পতরু’ (৪) ‘নেচে নেচে চল মা শ্যামা দুজনে তোর সঙ্গে যাবো’—বহু প্রচলিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে প্রথম ছত্রমাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল। আজও দূর পল্লীগ্রামে ঐগুলির সাড়া পাওয়া যায়। এখানি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২১শে মে তারিখে ভুবন-নিয়োগীর গ্রেট ন্যাশনেল, যাহা গিরিশচন্দ্র নাম বদল করিয়া ন্যাশানল থিয়েটার রাখিয়াছিলেন তাহাতে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাটকখানি উদ্দেশ্যহীন বলিয়া কোন শ্রেণীর অন্তর্গত করা চলে না।

চণ্ড নাটক

ঐতিহাসিক পর্যায়ের দ্বিতীয় সংখ্যা চণ্ড নাটক। এখানি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহার গল্পাংশ টড্ সাহেবের রাজস্থান হইতে গৃহীত। নাটককার এ নাটকে চতুর্দশ অক্ষর-সমন্বিত মাইকেলী অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, স্থানে স্থানে মনোহারিত্ব থাকিলেও মাইকেলের ছন্দের মতো সাবলীল গতি বা উপমান উপমেয়ের লালিত্য ইহাতে নাই। চণ্ড নাটকে কল্পনার সাহায্য থাকিলেও এখানি ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ।

এক বৈবাহিক রহস্যরূপ কীলকের (pivot) উপর নাট্যসৌধটি গঠিত হইয়াছে। বাপ্পারাও-বংশাবলির স্মৃতিমণ্ডিত চিতোর, ঐ বিবাহিত নারীর কৌশলে কিরূপে রাঠোরদিগের করতলগত হইয়াছিল, এবং কিরূপেই বা তাহাদের হস্ত হইতে পুনরুদ্ধার-প্রাপ্ত হইল, তাহার বিবরণ নাটকের

বিষয়। আত্মত্যাগ-পরায়ণ স্বদেশ বৎসল শিশোদীয়কুলের মুখোজ্জ্বলকারী চণ্ড এই নাটকের নায়ক, লেশমাত্র স্বার্থ তাঁহাতে জড়িত ছিল না। মহারাণা লাক্ষ গুঞ্জমালার বিবাহব্যাপারে রহস্যচ্ছলেই চণ্ডকে বলিয়াছিলেন যে, সে সিংহাসনের অধিকারী হইবে না, তাহার বিমাতাপুত্রই উহাতে বসিবে। চণ্ড সেই পিত্রাদেশের অন্যথা করেন নাই, যদিও তাঁহার পিতা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগের সংকল্প লইয়া গয়াধামে যাত্রা করিবার পূর্বে তাঁহাকেই সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, চণ্ড বিমাতাপুত্র মুকুলকে পিতৃ-সিংহাসনে বসাইয়া পিতার পূর্ব-প্রতিজ্ঞার সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন। কর্তৃত্বাভিমানিনী রাঠোরনন্দিনী গুঞ্জমালা ঈর্ষাবশে চণ্ডকে মুকুলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী অপবাদ দিয়া রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলেন। রাঠোররাজ রণমল্ল কন্যার নিমন্ত্রণে চিতোরে আসিয়া নাবালক মুকুলকে নামে মাত্র রাণা রাখিয়া স্বয়ং রাজ্য-পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এই রণমল্লই আবার কিরূপে রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইয়াছিলেন নাটকের দর্শক বা পাঠকমাত্রেই তাহা জ্ঞাত আছেন।

চণ্ডের ভ্রাতা রঘুদেব এই নাটকের আর একটি আদর্শ চরিত্র। কৈশোরে সন্ন্যাসব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ আকুমার সন্ন্যাসী মনের বলে প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী এক উপযাচিকা নারীকে মাতৃসম্বোধন করিয়াছিলেন। চিতোরের মঙ্গলকামী পূর্ণরাম ভট্টরাজ চণ্ড ও রঘুদেব সম্বন্ধে একস্থানে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সর্বতোভাবে ঠিক। বিবাহব্যাপারে আত্মত্যাগ দেখাইয়া প্রশংসা পাইলে পর পূর্ণরাম চণ্ডকে এইরূপ বলিয়াছিলেন :—"আমি আর জানি না, আমিই ত নারিকেল এনেছিলেম। খুব নাম, খুব সুখ্যাতি, খুব আত্মত্যাগ—সে তো সুখ্যাতির পালা। এখন নিন্দার জ্বালা সইতে পার, তবে না বাহাদুরি।" আর রঘুদেবকে উদ্দেশ করিয়া ঐ ভাট এক সঙ্গেই এই কথা বলিলেন :—"তুমি সন্ন্যাসী, ছুরি মারুলে কথা না কও, তবে তো জানি।" চণ্ড বা রঘুদেব নিজ-নিজ কার্য দ্বারা যথাকালে পূর্ণরামের পূর্বোক্ত সুখ্যাতির অধিকারী হইয়াছিলেন, নাটক তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে।

গুঞ্জমালা নারীসুলভ ঈর্ষাবশে সপত্নীপুত্রের বিদ্বেষিণী হইয়া পরিশেষে নিজপুত্রের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র উপস্থিত হইলে কিরূপে সেই বিদ্বেষ-বহ্নি স্বয়ং নির্বাপিত করিলেন নাটকের মধ্যে তাহার সন্ধান আছে। এ চরিত্রটিও বেশ ফুটিয়াছে।

কুশলা-নাম্নী ধাত্রী-চিত্রটি ঐতিহাসিক পান্না চরিত্রের দ্বিতীয়-সংস্করণ। বিজয়ীর জাতিরূপটি (type) নারীজাতীয় দুর্বলতায় আরম্ভ হইলেও শেষে অত্যাচারীর প্রতিহিংসা-চরিতার্থতায় ও নিহত প্রেমাস্পদের গুণগ্রাহিণী হইয়া গৌরবময়ী হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ণরাম চিতোরনগরীর প্রকৃত মঙ্গলকামী ভাট, স্বদেশপ্রীতি তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। এরূপ বিশ্বাসী পাত্রের জাতি-রূপ ঐতিহাসিক নাটকে নাট্যকার এই প্রথম দেখাইলেন। রণমল্লে বৃদ্ধ কামুকের জাতি-রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, কামপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য চিতোরের নাবালক রাণা—নিজ দৌহিত্রকে পর্যন্ত গুপ্তহত্যা করিবার পথে তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন, কুশলার সতর্কতায় তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই।

নাটকখানি যত্নের সহিত লিখিত হওয়া সত্ত্বেও দর্শক-সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারে নাই। লিখনভঙ্গী স্থানে-স্থানে চমৎকার। পিতৃরাজ্য হইতে বিতাড়িত চণ্ডকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশে রঘুদেব এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

"মেঘে ঢাকা সূর্য নাহি রবে চিরদিন,
মেঘান্তে সুবর্ণরশ্মি অধিক সুন্দর।

ছিন্ন মেঘমালা শোভে ইন্দ্রচাপরূপে
হেমরাশি মাখি কায় আঁখি বিনোদন।"

পিতৃভূমির উদ্দেশে চণ্ডের বিদায়-প্রার্থনাটি এইরূপ :—

"মেলানি তোমার ঠাঁই মাগি হে চিতোর।
সুন্দর নগর; জন্মভূমি স্বর্গাধিক—
গরীয়সী, মাগি হে বিদায়, হে চিতোর-
বাসী, পুণ্যধাম অধিকারী, নমস্কার—
ছেড়ে যাই সহোদর জীবনের সর।"

উপযাচিকার ব্যর্থ প্রণয়লিপি সম্বন্ধে রঘুদেব এইরূপ বলিয়াছিলেন :—

"দংশে অহি আয়ুহীনে, মহাকাল ফিরে
সাথে মহাফাঁস ধরি, মৃগয়াকানন
তার এ সংসার। কিবা লীলা! ঘৃণা-দ্বেষ
ভালবাসা একবস্তু বহুরূপ ধরে।
মগ্ন নরে স্নেহে গলে, বিদ্বেষ ঘৃণায়;
সম ঘৃণ্য স্নেহ-দ্বেষ নাহি বোঝে হায়!"

নাটককার চণ্ডের মুখ দিয়া রাঠোর-অধিকৃত চিতোর দেখিয়া অলংকারবহুল ভাষায় এইরূপ বলাইয়াছেন :—

"পিতৃ-পিতামহ দেবালয়, আজি তথা
বিহরে রাঠোর—রম্য নন্দনকাননে
দুরন্ত দানবদল, রাণা-সিংহাসনে
মারবার কিরাত-বর্ব্বর, কেশরীর
গহ্বরে জম্বুক, বক্স-চণ্ডাল বেদীতে,
রাজহস্তী ভুজঙ্গ বেষ্টনে জর-জর,
সুন্দর চিতোর এবে পিশাচের ঘর।"

দীপমালাশোভিত দেওয়ালী নিশায় রাজমাতা কর্তৃক আহূত হইয়া চণ্ড চিতোরে প্রবেশ করিতেছেন, তাহার বর্ণনাটি এইরূপ :—

"আকুল নগর, চল যাই, আবাহন
করে দীপমালা শিখা দোলাইয়া, ভল্ল-
মুখে, তীক্ষ্ণ অসিধারে অভ্যর্থনা তথা,
মিষ্টালাপ অস্ত্রে-অস্ত্রে ঝণৎকারে, ঘোর
সিংহনাদে, শিষ্টাচার শত্রু শিরশ্ছেদ।
মহোল্লাস মহারঙ্গ মহান্ মেলার,
ভৈরব-উৎসব আজি ভৈরবী নিশায়।
* * লহ সঙ্গে দোসর বিক্রম পথভ্রম

নাশি রণশ্রমে, চল যাই শাব তথা
গৌরব অশন, তৃষা তৃপ্তিকরি হেরি
রক্তস্রোত রক্তপ্রস্রবণ, শত্রু শবে
রচিত কুসুম শয্যা, মুণ্ডে উপাধান,
ফেরব সঙ্গীতরোল বিকট করাল,
চঞ্চুপুটে পাকসাটে গৃধ্র দিবে তাল।"

মধ্যে মধ্যে ছন্দকাঠিন্য থাকিলেও ভাবসম্পদে ইহা পুষ্ট।

সংগীত-সম্পদে এ নাটকখানি ধনী নহে। ভীলগণের সংগীতে নূতনত্ব আছে মাত্র, যথা:— "কাড়া সাড়া দিলে খাড়া দাঙ্গা মিলে, কাড়ি বুড়ী বোলে, কুড়্-কুড়্ ঝাইরে কুড়্-কুড়্ ঝাই, বড় মিঠা লড়াইরে মিঠা লড়াই।" শ্রেণী হিসাবে নাটকখানি ট্র্যাজি-কমেডি।

কালাপাহাড় নাটক

কালাপাহাড় এই বিভাগের তৃতীয় নাটক। ইতিহাসের সহিত কল্পনার বুনানি (weaving) এ নাটকের মধ্যে আছে, কিন্তু কল্পনারই জয় হইয়াছে। ইতিহাসের পটভূমিকার উপর প্রণয়-কাহিনীটি (romance) রূপ লইয়াছে। এখানি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

কালাপাহাড় নাটকের দুইটা দিক আছে; একটা ভাবের দিক, আর একটা নাটকীয় শিল্পের দিক। দুই দিক দিয়া ইহার সার্থকতার বিচার আবশ্যক। প্রথম, ভাবের দিক, গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণ-সংঘের অন্তরঙ্গ ছিলেন। রামকৃষ্ণের তিরোধানের পর তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী বহুবিধ উপায়ে তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণের কৃপালাভের পর থিয়েটার করিবেন কি না, অভিমত চাহিয়াছিলেন। তাহাতে গুরু শিষ্যকে উহা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, তাই গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়া রামকৃষ্ণের ধর্মমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 'নসীরাম' ও কালাপাহাড়ের 'চিন্তামণি' পরমহংসদেবের ভাবাবলম্বনে রচিত চরিত্রদ্বয়। মায়াবসান নাটকের 'কালীকিঙ্কর' চরিত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ছাত্রকালীন বৈজ্ঞানিক মনোভাবের ছবি পাওয়া যায়, যদিও পরবর্তীকালে উহা ঈশ্বরমুখী হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বিল্বমঙ্গল নাটকের মধ্যে স্থানে-স্থানে রামকৃষ্ণের উপদেশাবলি দেখিতে পাওয়া যায়। নিমাই সন্ন্যাস নাটকেও রামকৃষ্ণের ভাব আছে। কালাপাহাড়ের পরে রচিত নাটকসমূহের মধ্যেও রামকৃষ্ণের উপদেশ দৃষ্ট হয়, যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইবে। সুতরাং সাহিত্য-কলার ভিতর দিয়া রঙ্গমঞ্চকে ধর্মক্ষেত্রে পরিণত করিবার ভার পরমহংস-দেবের আশীর্বাদে একা গিরিশচন্দ্রই গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশে রামকৃষ্ণ-মত প্রচারের ভার লইয়া স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বিজয়ী সম্রাটের মতো সম্মান পাইয়াছিলেন, রঙ্গমঞ্চ হইতে নাটকের মধ্য দিয়া ঐ ধর্মমত প্রচার-ব্যাপারে গিরিশচন্দ্রও সেইরূপ নাট্যসম্রাটের আসন অলংকৃত করিয়াছিলেন। হিন্দুর জাতীয় গৌরব রক্ষায় উভয়ই সমতুল্য। একজন কাম-কাঞ্চন ত্যাগী বীর সন্ন্যাসী, অপর-জন গৃহে কাম-কাঞ্চনের মধ্যে বাস করিয়াও পরিণত বয়সে অনাসক্ত পুরুষ হইয়াছিলেন। গ্রন্থকারের আসল পরিচয় তাঁহার গ্রন্থ-নিহিত ভাবরাজির মধ্যেই পাওয়া যায়, নাটকের দর্শক বা

পাঠক-সমাজ সে পরিচয় ইতঃপূর্বেই পাইয়াছেন, অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। শেক্সপীয়র বড় হইয়াছিলেন তাঁহার নির্ভীক সমালোচকগণের সমালোচনা-দ্বারা, গিরিশচন্দ্রকে এতাবতা সাহিত্যক্ষেত্রে অপাঙ্‌ক্তেয় রাখিবার কারণ কি? মনে হয় সমালোচনার অভাবই ইহার প্রকৃত কারণ। যাহা হউক আমার এই ক্ষুদ্র চেষ্টা যদি সে দ্বার উন্মুক্ত করিতে পারে তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। এই পর্যন্ত গেল কালাপাহাড় নাটকের ভাবের দিকের কথা।

নাটকীয় শিল্পের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নাটককার যে ভাবে তাঁহার নাটকীয় চরিত্রগুলিকে বিভাবিত করিতে চাহিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নাটকোচিত ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে কি না? ঐতিহাসিক হিন্দু কালাপাহাড় সহসা হিন্দুদ্বেষী হইয়া দেববিগ্রহ দগ্ধ চূর্ণীকৃত ও কলুষিত করিতে লাগিলেন, ইহারই বা কারণ কি? নাটককার মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ইমান ও চঞ্চলা চরিত্রদ্বয়কে নাটকের মধ্যে আনিয়া তাহার কারণ দেখাইলেন। কালাপাহাড়ের যবনী-প্রণয়াসক্তির কিংবদন্তী নাট্যকারের সহায় হইয়াছিল। ঐ সূত্র ধরিয়া গিরিশচন্দ্র দেখাইলেন যে ইতিহাসবিশ্রুত এতবড় একজন শক্তিমান্ পুরুষ ঘটনার প্রতিবেশের মধ্যে পড়িয়া ঐরূপ কার্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রকৃত ঐতিহাসিক-কাহিনীটি কেহই অবগত নহেন। সম-সাময়িক দলিলাদি দেখিয়া পরবর্তীকালে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা ঠিক অনুরূপ না হইলেও ঐ কিংবদন্তীকে একেবারে মুছিয়া দিতে পারে নাই, সুতরাং মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া নাট্যকার ঠিকই করিয়াছেন।

কালাপাহাড় বাল্যকাল হইতে সত্যতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। হিন্দুধর্মের তথাকথিত শাস্ত্রব্যাখ্যায় তাঁহার মনে ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে দারুণ সংশয় জন্মিয়াছিল, তাই তিনি দারু পুত্তলি জগন্নাথের দেবত্বে সন্দিহান্ হইয়া উড়িষ্যাধিপ মুকুন্দদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। মুকুন্দদেব উত্তরে বলিলেন যে গুরুবাক্যে বিশ্বাস শাস্ত্রমর্ম বুঝিবার একমাত্র উপায়। কালাপাহাড় কিন্তু, অন্ধ বিশ্বাস-দ্বারা যুক্তিশূন্য অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বরে বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পারিলেন না, তাঁহার ধারণা জন্মিল যিনি বিশ্বব্যাপী তাঁহাকে নরকলেবরে বা তাহার প্রতীকে কিরূপে পাওয়া যাইবে? জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে যে নর বাস করে তাহার বাক্যকেই বা অভ্রান্ত গুরুবাক্য বলিয়া কিরূপে মানিতে পারি? সলিলসংযোগে চুন যেমন উত্তাপের সৃষ্টি করে, ভূতসম্মিলনে জড় হইতে সেইরূপেই কি চৈতন্যের উদয় হয়? জড়ের সুপ্ত-চৈতন্য মানিয়া লইলেও জড়বৃক্ষে চেতন ফলে না কেন? মাত্র জীবের সংযোগেই জীব-সৃষ্টি দেখা যায়। চক্ষু, কর্ণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শে পদে-পদে ভ্রম অনুভূত হয়, তবে ইন্দ্রিয়ের উপর এত বিশ্বাস রাখি কেন? চিন্তামণি নামক এক মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাতের পর কালাপাহাড়ের মনে এবংবিধ বহু প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে চিন্তামণির বিশ্বাসকে যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাস বলিয়া কালাপাহাড় কটাক্ষপাত করিলে চিন্তামণি তাঁহাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন:—"আমার বল্‌ছো অন্ধ-বিশ্বাস, আমি আলোর মাঝখানে বসে আছি। আর তোমার চোখওলা অবিশ্বাস নিয়ে ভূতের মত অন্ধকারে ঘুরুছো! আমার অন্ধবিশ্বাস নিয়ে আমি জগৎ পরিপূর্ণ দেখ্‌ছি! চোখওলা অবিশ্বাস নিয়ে তুমি হাঁপিয়ে মরুছো।" এই কথোপকথনের পর কালাপাহাড় উৎসাহী হইয়া সত্যতত্ত্ব নিরূপণে উদ্‌গ্রীব হইলেন।

নাটককার কালাপাহাড় চরিত্রের ক্রমিক পরিণতি দেখাইবার জন্য যে দুইজন নায়িকার আশ্রয় লইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চঞ্চলা নাম্নী নায়িকাটি অসবর্ণা। সে কালাপাহাড়কে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে,

তাই মুকুন্দদেবের নিকট হইতে রাজবিধি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে সে চাহিয়াছিল। মুকুন্দদেব তাহার সে প্রস্তাব মঞ্জুর করেন নাই। কালাপাহাড় চঞ্চলার প্রণয়াহ্বানে কোন সাড়াই দিতেন না, সর্বদা উদাসীন থাকিতেন। তাঁহার মন তখন সত্যতত্ত্বের অনুসন্ধানে ঘুরিতেছিল, অভিসারিকা চঞ্চলার দিকে চাহিবার অবকাশ তাঁহার ছিল না। চঞ্চলা কালাপাহাড়ের এইরূপ উপেক্ষার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিতে পারিল যে এক সিংহ-ঘটিত ব্যাপারে নবাব-নন্দিনী ইমান কালাপাহাড়কে দেখিয়া অবধি আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, এ কথা কালাপাহাড় জানিতেন না। চঞ্চলার মনে তখন ঈর্ষা দেখা দিল, কিন্তু তাহার সংগৃহীত খবরের সত্যমিথ্যা পরীক্ষার জন্য সে ছল করিয়া পুরুষের ছদ্মবেশে ইমানকে তাহার ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিয়া কালাপাহাড়কে ইমানের কাছে লইয়া গেল। অনঙ্গের লীলা বুঝা কঠিন! যে কালাপাহাড় যাচিকা চঞ্চলার বহুবিধ প্রণয়-সম্ভাষণে সাড়া দেন নাই, বরং ঘৃণায় তাহা উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সেই কালাপাহাড় ইমানকে প্রথম দর্শন করিয়াই অনঙ্গ-শরে বিদ্ধ হইলেন। ধন্য অদৃষ্টের পরিহাস! মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া কালাপাহাড় চরিত্রের সমালোচনা না হইলে ঐ চরিত্রটি অসমঞ্জস বোধ হইবে এবং তাহাতে নাট্যকারের প্রতি অবিচার করা হইবে। কালাপাহাড়ের সত্য-তত্ত্বের অনুসন্ধিৎসা এই ঘটনার পর ইমানের প্রণয়াসক্তির মধ্যে ডুবিয়া গেল। উচ্চাভিলাষ ও শক্তিলাভের প্রচেষ্টা তখন তাঁহার বড় হইয়া দাঁড়াইল। ইমানের প্রণয়লাভেচ্ছায় ক্ষিপ্ত হইয়া তিনি কখনো যবনের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ, কখনো বা হিন্দুবিরোধী হইয়া দেব-দেবী চূর্ণীকৃত ও দেবমন্দির কলুষিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে চঞ্চলার ষড়যন্ত্রের লক্ষীভূত হইয়া কালাপাহাড়ের জীবন অশান্তির আলয় হইয়া উঠিল। ইমানের মৃত্যুর পর চিন্তামণির সংস্পর্শে আসিয়া জীবনের শেষ দিকে কালাপাহাড়ের মনে যদিও শান্তি আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার সহিত নাট্য-ক্রিয়ার (action) আর কোন সম্বন্ধ রহিল না।

ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে চঞ্চলা নাম্নী চণ্ডালিনীর জন্ম হইয়াছিল। চঞ্চলার যাবতীয় ক্রিয়া কালাপাহাড়ের প্রণয়লাভেচ্ছাকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নাটককার চঞ্চলা চরিত্রটিকে বাস্তবিকই চঞ্চলা করিয়াছেন। সিদ্ধান্তের স্থিরতা তাহার ছিল না। প্রণয়ের ব্যর্থতায় কখনো সে নায়কের প্রতি প্রতিহিংসা-পরায়ণা, পরক্ষণেই আবার তাঁহার জীবনহানির আশঙ্কায় শঙ্কিতা। তাহার কাম-লিপ্সা পরিতৃপ্ত না হওয়ায় তাহার অন্তর্নিহিত প্রতিহিংসা বৃত্তিকে সে জাগ্রত করিয়া ইমানের হত্যাসাধন করিয়াছিল এবং পরিশেষে আত্মহত্যা করিয়া নিজের জীবনদীপও নির্বাপিত করিল।

এই আত্মহত্যা-ব্যাপার লইয়া নাটককার আত্মহত্যাকে মূর্তদেহে নাটকের মধ্যে বাহির করিয়াছেন। বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে এ চেষ্টা সম্পূর্ণ নূতন। এই নাটকের মধ্যে প্রেতাত্মার ক্রিয়া বহুস্থানে আছে। শেক্সপীয়রের স্থায় নাটককার তাহার ছায়ামূর্তি গড়িয়াছেন। অপদেবতার (Evil spirit) ক্রিয়াও নাটকের মধ্যে আছে, তজ্জন্য আসুরিক ভীতি (Phantasy) বহুল পরিমাণে স্থান পাইয়াছে।

বীরেশ্বর চরিত্রটি নাট্যসাহিত্যে নূতন আমদানী। অবিদ্যার আশ্রয়ে শক্তি অর্জনের অভাবনীয় কাহিনী তৎকাল প্রচলিত তান্ত্রিক প্রভাব স্মরণ করাইয়া দেয়।

ইমান চরিত্রটি অপূর্ব। এমন স্থিরা ধীরা আত্মত্যাগ-পরায়ণা নারী জগতে দুর্লভ। কালাপাহাড়ের প্রতি প্রকৃত প্রণয়ের সে অধিকারিণী হইয়াছিল।

চিন্তামণি-চরিত্র সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবই ঐ চরিত্রের আদর্শ। তাঁহার উপদেশাবলি যেন মূর্তিমান্ হইয়া যখন যাহাকে যে কথা বলা প্রয়োজন হইয়াছে তাহাই বলিয়াছেন। প্রেম-ভক্তি ও বিশ্বাসের জলন্ত প্রতিমূর্তি চিন্তামণি স্পর্শমণির মতো যাহাকে ছুঁইয়াছেন তাহাকেই রূপান্তরিত করিয়াছেন। ইহা অন্তরে উপলব্ধির বস্তু, ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝানো কঠিন। কালাপাহাড়ের প্রতি চিন্তামণির উপদেশের নিষ্কর্ষ এইরূপ :—"মন থেকে (সব) ছাড়তে হয়, প্রেমের বেড়ার ভিতর থাকতে হয়, তা হলে আর ধরতে পারে না। * * দেখ, ঐ অবিদ্যা-মায়ারূপ পিশাচটা ছাড়িয়ে ফেল্, প্রেম ভিন্ন ছাড়াতে পারবিনে, ভূত-প্রেত নিয়ে খেলা ভূতনাথের শোভা পায়, তিনি প্রেমময়, তাই তাঁর শোভা পায়, না হলে ভূতের রোজার ভূতেই ঘাড় ভাঙে। * * ভূত তোর বশ নয়, তুই ভূতের বশে; আবার তাদের দরকার হলে আস্‌বে; মায়া রে মায়া, অবিদ্যা-মায়া! তারে তুই পারবি? কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোল্, বিদ্যা-মায়ার শরণাপন্ন হ, প্রেমে রিপু জয় কর্। * * সাধ আর কারে বলে বল? এইটে করবার নাম সাধ। অনেক সাধ করেছ বটে, কিন্তু সাধের মত সাধ একটাও কর নি। সাধের জিনিস হরি, সাধ করে যদি হরি চাও পাবে। * * কথা বিশ্বাস কর, বড় সোজা হয়ে বড় গোল হয়েছে, বিশ্বাস বড় সোজা। সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে যেও না। সরল বিশ্বাসে সরল প্রাণে ডাক পাবে।"

চিন্তামণি মূর্তিপূজার রহস্য বীরেশ্বরের কাছে এইরূপে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন :—

"দেবদেবী সর্ব্বশক্তিমান,
জ্ঞানচক্ষে দেবদেবী হেরে দেবপ্রিয়,
নহে কাষ্ঠ-প্রস্তর পুত্তলী!
কর সন্দেহভঞ্জন,
যে ভাবে যে ভাবে, সেই ভাবে পাবে,
জেনো, ভগবান ভাবের অধীন।
মুসলমান করি দারুজ্ঞান—
জগন্নাথ অগ্নিকুণ্ডে করিল নিক্ষেপ,
চিরকাল দারুদগ্ধ হয়,
দগ্ধ দারুকায় হেরিল যবন-আঁখি।
ছিল মনে তব সাধ, দেবমূর্তি করিবে উদ্ধার
কৃপা দেবতার, একা তোমা হ'তে মহাকার্য্য সংপূরণ,
রাখ মতি স্থির,
অজ্ঞান-তিমির জ্ঞানালোকে কর দূর,
দিব্য চক্ষে হের চিন্ময়,
চৈতন্য অরুণালোকে হৃদি-শতদল আনন্দে হাসিবে,
ভক্তিদেবী বসিবেন বিমল আসনে,
মনোমালিন্য ঘুচিবে, পাইবে পরম শান্তি,
ভ্রান্তি না রহিবে।"

নাটকমধ্যস্থ কতকগুলি পুরাতন ঘটনার সংগতিরক্ষার জন্ত লেটো চরিত্রের সমাবেশ নাট্যকার করিয়াছেন। চিন্তামণি ও লেটোর সংলাপের ভিতরে বা লেটো ও দোলেনার আলাপনের স্থানে-স্থানে এমন কোন-কোন প্রসঙ্গ আছে যাহা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের নিভৃতে সম্পাদিত হইবার যোগ্য। নাট্যকার ঐগুলিকে প্রকাশ্তে আনিয়া সাহসের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু নাটকের দর্শক বা পাঠক সাধারণ না বুঝার দরুণ তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারেন নাই।

নবাবের কারাগার হইতে কালাপাহাড়ের মুক্তিদান ব্যাপারে নাটককার যে কৌশলের আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার ইন্দ্রজাল-কুহকে নাটকের পাঠক বা দর্শক সমাজ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে এরূপ কৌশল ইতঃপূর্বে দেখা যায় নাই।

নাটকের ভাষা গদ্য-পদ্য ও মাইকেলী অমিত্রাক্ষর ছন্দে এবং অতি অল্প স্থানে গৈরিশ-ছন্দে লিখিত। গদ্য ও পদ্যে বেশ লালিত্য আছে। চৌদ্দ অক্ষর-অমিত্রাক্ষর ছন্দে গৈরিশ ছন্দের মনোহারিত্ব নাই। এ নাটকখানি সংগীতবহুল নহে। গানের নূতনত্বের মধ্যে প্রেতাত্মার গান আছে; যে আবহাওয়ার মধ্যে উহারা বিচরণ করে গানের উপাদানও সেই-সেই জিনিস লইয়া। অপর সংগীতের মধ্যে দোলেনার—'কেঁদে ফিরে যায়। সে ত আসে মম আশে, কেন মন নাহি চায়'—ইত্যাদি গান খানি বহু প্রচলিত হইয়াছিল। এ নাটকখানি নাটক হিসাবে শক্তিশালী হইলেও বিভিন্ন সময়ে বহুবার অভিনীত হয় নাই। এখনি ঐতিহাসিক পটভূমিকার উপর মেলো-ড্রামা। প্রণয়কাহিনী ও রোমাঞ্চকর ঘটনা এক সঙ্গে কাজ করিয়াছে।

ভ্রান্তি নাটক

ভ্রান্তি চতুর্থ ঐতিহাসিক নাটক। এখানি ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১২শে জুলাই তারিখে বীডনস্ট্রীটস্থ ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। মুরশিদকুলিখাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর সময়ে বাঙ্গালার জমিদারদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা গিয়াছিল। বিদ্রোহী জমিদারদিগকে নবাব সরকারে কিরূপে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত তাহার চিত্র এই নাটকখানির মধ্যে আছে। দুর্গন্ধময় আবর্জনাপূর্ণ অনাবৃত স্থানের 'বৈকুণ্ঠ' নাম দিয়া তাহার মধ্যে বিবস্ত্র করিয়া নগ্নগাত্রে ও বন্ধনাবস্থায় জমিদারগণকে অনশনে-অনিদ্রায় রাখিয়া পীড়ন করা হইত। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে কল্পনার আবেষ্টনের মধ্যে ফেলিয়া নাটককার এক অপূর্ব প্রণয়-কাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছেন। রাজসাহীর জমিদার উদয়নারায়ণের কন্তার বিবাহ-ব্যাপারে একটি ভ্রান্তি জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ হাওয়ায়-হাওয়ায় পুষ্ট হইয়া উহা কিরূপে মহাঝড় তুলিয়াছিল তাহাই এই নাটকের রহস্ত।

যমজের মধ্যে ভ্রান্তিবশে কেমন করিয়া এক কৌতুকপূর্ণ মিলনান্ত নাটকের সৃষ্টি হইতে পারে তাহা শেক্সপীয়র 'ভ্রান্তি-বিলাসের' (comedy of errors) মধ্যে দেখাইয়া গিয়াছেন, মাত্র একটি নামের ভুলে কিরূপে এক বিষাদপূর্ণ-মিলনান্ত (Tragi-comedy) নাটকের সৃষ্টি হইল গিরিশচন্দ্র তাহা এই নাটকের মধ্যে দেখাইয়া গেলেন। যদিও নিরঞ্জন-পুরঞ্জন বা ললিতা-মাধুরীর পুনর্মিলনে নাটকটি মিলনান্তরূপ (comedy) গ্রহণ করিয়াছিল, তথাপি তাহাদের দুর্দশার স্মৃতি দর্শক বা পাঠকের মনে এরূপ বেদনার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল যে ঐগুলিকে ভুলিয়া গিয়া এটিকে খাটি মিলনান্ত নাটক বলিতে স্বভাবতঃ কুণ্ঠা জন্মিয়াছে।

এ নাটকের নূতনত্ব এই, নর-নারীর প্রণয়ে নিঃস্বার্থতা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিরঞ্জন-পুরঞ্জন বা ললিতা-মাধুরী ঐ ত্যাগধর্মের জীবন্ত প্রতীক। নিরঞ্জন-পুরঞ্জনের অকৃত্রিম বাল্য-প্রীতি এই অপূর্ব ত্যাগ-মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছে। কাল্পনিক এক ভ্রান্তির কুহকে পড়িয়া দুইটি জমিদার-বংশ কিরূপ বিপর্যস্ত হইয়াছিল তাহার চিত্র অক্ষুণ্ণভাবে নাটককার দেখাইয়াছেন। এরূপ কৌশলে নাটকখানি গ্রথিত হইয়াছে, যে স্থানে-স্থানে দর্শক বা পাঠকের মনে হইয়াছে যে ভ্রান্তির অপনোদন বুঝি বা এইবার হইবে, কিন্তু ভুল ভাঙ্গিতে-ভাঙ্গিতে আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ধন্য নাট্যকারের কৌশল! গিরিশচন্দ্রের চরিতকার অবিনাশবাবু ঠিকই বলিয়াছেন যে অধিকাংশ সাংসারিক সুখ-দুঃখ কল্পনা-প্রসূত এবং ভ্রান্তির উপরই তাহারা প্রতিষ্ঠিত, সত্যের সহিত তাহাদের সংশ্রব সামান্যই।

স্বামী বিবেকানন্দের জাতি-নির্বিশেষে নর-নারায়ণের সেবাব্রতের ভাব লইয়া এই নাটকের রঙ্গলাল চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে। কু-সংস্কারপূর্ণ 'ভিতরে একরূপ—বাহিরে অন্যরূপ' আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের অন্ধকারময় দিক্‌টা নাটককার নিপুণ তুলিকায় চিত্রিত করিয়া পতনোন্মুখ হিন্দুসমাজকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। পতিতা রমণীর জীবন উন্নীত করিবার পন্থা গিরিশ বাবুর পূর্বগামী নাট্যকারেরা কেহই তাঁহাদের নাট্যসাহিত্যে দেখাইয়া যান নাই। নাট্যকার নর্তকী গঙ্গা-বাইয়ের চরিত্রে সেই চিত্র প্রতিফলিত করিয়াছেন। রঙ্গলালকে ভালবাসিয়া গঙ্গার কামজপ্রেম কিরূপে সাত্ত্বিক প্রেমে উন্নীত হইয়া ক্রমশঃ বিশ্বপ্রেমে ছড়াইয়া পড়িল, তাহার প্রত্যক্ষ চিত্র নাটকের মধ্যে পাওয়া যায়। গঙ্গা ও রঙ্গলালের সংলাপ-মধ্যে তাহাদের প্রেম যেন তরঙ্গ-ভঙ্গে নৃত্য করিতে থাকে।

অন্নদা আর একটি অপূর্ব চরিত্র। বিনা দোষে স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা অন্নদা বিকৃতমস্তিষ্কা হইয়াছিলেন, কিন্তু আপনার সতীধর্ম বজায় রাখিয়া কিরূপে যথাকালে পরিবারবর্গের অচিন্তনীয় পুনর্মিলনে সহসা প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বামীর চিতায় মৃত্যু বরণ করিলেন, তাহার মাধুর্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

নাটকটিকে সংগীতের খনি বলা যায়। যতই নাটকের ভিতরে প্রবেশ করা গিয়াছে, সংগীত-গুলি ততই মধুর হইতে মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে। ঐ অমর গানগুলির প্রথম ছত্র-মাত্র স্থানাভাবে উদ্ধৃত হইল :—(১) 'সাধ করে সে ডাকে আদরে তারে আদর করি' (২) 'লাল বৃন্দাবন নিধুবন লালি' (৩) 'কে জানে কেমন, যেন হারিয়ে গেছি, বিলিয়ে দিছি, নই তো আর তেমন' (৪) 'এ কি দায়! মন কেন তায় চায়? পায় কি না পায় ভাবে না হায়! উধাও হয়ে ধায়!' (৫) 'ফের হে দিনমণি! যেও না কলঙ্কঘোরে ফেলিয়া দীনারমণী!' (৬) 'নাই তো তেমন বনে কুসুম মনে যেমন ফুটে ফুল' (৭) 'কালো-কোকিল তানে প্রাণে হানে শর' (৮) 'ত্রিকাল-মোহিনী, যোগিনী সোহিনী মুক্তিযোগ-রঙ্গিণী' (৯) 'কেন চাহিব তারে-যারে দিয়েছি পরে' (১০) 'এত নয়ন-জল ঢালি, কই সরস হয় কলি?' (১১) 'চমকি-চমকি রহে বিজুরী' (১২) 'সাধে কি বিবাদে যতন করি' (১৩) 'রসনা কুটিল ফণী মানা মানে না'

এই নাটকখানি বহুবার অভিনীত হইয়াছে; অবৈতনিক শৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের মধ্যেও ইহার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এখানি শক্তিশালী নাটকের অন্যতম, এবং ট্র্যাজি-কমেডি শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে।

সৎনাম নাটক

এই বিভাগের পঞ্চম নাটক সৎনাম ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রেল তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। মোগল বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে 'সৎনামী' নামক এক ধর্ম-সম্প্রদায় তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। নাটককার ঐ বিদ্রোহকে অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণবী নাম্নী জনৈকা রাজপুত্ রমণী এই বিদ্রোহের নেত্রী ছিলেন। কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের তৎকাল-সংঘটিত দ্বন্দ্বের জন্য এই নাটকখানির অভিনয় পুলিশ-কতৃপক্ষ কর্তৃক ইহার চতুর্থ অভিনয়-রজনীতে বন্ধ রাখা হইয়াছিল। কতকগুলি মুসলমান নাটকের কোন-কোন স্থলে আপত্তি জানাইয়াছিলেন, তাঁহাদের ইচ্ছামত সেই-সেই স্থান সংশোধন করিয়া লইয়া গিরিশচন্দ্র পরবর্তীকালে নাটকখানি প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

এ নাটকখানি প্রকৃত ঐতিহাসিক; তৎকালে প্রচলিত দেশের সামাজিক অবস্থা বা ঘটনার কোন বৈলক্ষণ্য ইহার মধ্যে নাই। কু-সংস্কারাচ্ছন্ন স্বপ্নবিলাসী অদৃষ্টবাদী হিন্দুদের ক্রটিগুলি নাটককার চোখে-আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। বিংশ শতকের প্রথম দশকে বাঙ্গালায় যে জাগরণ আসিয়াছিল, তাহার প্রেরণায় নাটককার স্বদেশবাসীর দোষ-ক্রটি দেখাইয়া দেশমাতৃকার চরণে দেশ-প্রীতির প্রথম অর্ঘ্যস্বরূপ এই নাটকখানি অর্পণ করিলেন। নর ও নারীরাই দেশের প্রকৃত অধিবাসী। এ নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় এই, যে নর ও নারী উভয়ে না জাগিলে মাতৃভূমির উদ্ধারসাধন সহজসাধ্য হয় না। তাই নাটককার নারী কর্তৃক নরের পরিচালনার জাগতিক-নিয়ম স্বদেশহিতৈষণার ক্ষেত্রেও আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নাট্যসাহিত্যের আসরে এবংবিধ চেষ্টার অগ্রদূত গিরিশচন্দ্রকেই ধরা যায়।

হিন্দুর সামাজিক জীবনের মধ্যে ব্যষ্টিগত নারী-জাগরণের দৃষ্টান্ত থাকিলেও সমষ্টিভাবে ঐ জাগরণ দেখা যায় নাই। সামাজিক বাধার জন্য নায়িকা-বৈষ্ণবীকে দলবৃদ্ধির নিমিত্ত মোহিনী বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। নগরের বৃদ্ধা বারবনিতা সোহিনী বৈষ্ণবীকে উক্ত বিদ্যা শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করে। কুমার্গ-গামিনী বেশ্যারা বৈষ্ণবীর শিক্ষায় প্রচারিকার কাজ লইয়া তাহাদের নিকটে কুৎসিত আমোদ উপভোগের জন্য আগত কবি, চিত্রকর, গায়ক, ধনী, রাজপুত্র ও সাধারণ নাগরিকদের মতি-গতিকে দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত করিতে শিক্ষা দিতে লাগিল। নাট্যকার এই নাটকের মধ্যে রাণা প্রতাপের পতনের কারণ, নানক-প্রবর্তিত শিখ-ধর্মের অভ্যুত্থানের ইতিহাস, মহারাষ্ট্র-গৌরব শিবাজীর কৃতকার্যতার ব্যাখ্যান নাটকীয় চরিত্রের মুখ দিয়া করাইয়া দাস-মনোভাবের (slave-mentality) আরম্ভ কোথায় এবং কবে হইয়াছিল তাহা রণেন্দ্রের মুখে নিম্নলিখিত কথাদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"স্বার্থপর ব্রাহ্মণের মুখে
অশাস্ত্রীয় শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনি,
অশাস্ত্রীয় হীনবিধি করিয়া আশ্রয়—
ভেদ বুদ্ধি জন্মেছে ভারতে।
সেই হেতু স্বরূপ শাস্ত্রের মর্ম্ম
করিয়ে লঙ্ঘন, স্বতন্ত্রতা-ভাব যত হিন্দুর হৃদয়ে,

ভারতের পতনের কারণ এ সব।
অংশে-অংশে পরাজিত হয়েছে ভারত।"

চরণদাসের চরিত্রে গুরু-ভক্তির আদর্শ, গুপ্তচরগিরির চূড়ান্ত আদর্শ ও দেশসেবার আসলরূপ যুগপৎ প্রদর্শিত হইয়াছে। এরূপ চরিত্র নাট্যসাহিত্যে দুর্লভ।

কি-কি দুর্বলতার জন্য ভারতে স্বাধীনতার জাগরণ টিকিয়া থাকে নাই তাহার বিশ্লেষণে নাটকখানি পরিপূর্ণ। ফকিররামের এই কয়টি কথার মধ্যে সৎনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ কেন পরাজয়ের বীজ বহন করিয়াছিল তাহার ইঙ্গিত আছে:—"দয়া অতি উচ্চগুণ; কিন্তু জেনো, নির্ম্মম মুক্তপুরুষ ব্যতীত দয়ার প্রকৃত অধিকারী কেহ হয় না। সামান্য-হৃদয়ে কামবৃত্তিও কখনো দয়ার আকার ধারণ করে।" রণেন্দ্র ও পরশুরামের পতনের কারণ দয়ার আকারে নারীপ্রেম। এমন কি বর্ষীয়সী মোহিনী চরিত্রেও প্রেমের আকর্ষণ কাজ করিয়াছিল। মাত্র রঘুরাম চরিত্রটি নারীপ্রেম জয় করিতে পারিয়াছে। মনঃ সমীক্ষণ তত্ত্বের আবিষ্কর্তা ফ্রয়েডের কাম সম্বন্ধীয় আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতের বিশ্লেষণ ফকিররামের পূর্বোক্ত কথাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। আজ হইতে ৪৫ বৎসর পূর্বে নাট্যকার নিজ মনীষা-বলে ঐ তথ্যের উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন, ধন্য তাঁহার প্রতিভার শক্তি!

প্রতিহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণবী যে সম্প্রদায়ের দ্বারা বিদ্রোহানল জ্বালিয়াছিলেন তাহার নেতা বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পতন দেখিয়া আশাহতা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলেন। ইতিহাস যাহার পতন দেখাইয়াছে নাট্যকার তাহার বৈপরীত্য-সাধন করিতে পারেন না। যে সব গুণ থাকিলে সম্প্রদায় গঠিত হইতে পারে নাটককার বৈষ্ণবীকে সেই-সেই গুণে ভূষিত করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই, তবে যোগ্যপাত্রে নেতৃত্বের মনোনয়ন বৈষ্ণবী করিতে পারেন নাই। ইহার ইঙ্গিত রণেন্দ্রের মুকুট-ধারণ-কালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ-খানেই সম্প্রদায়ের পতনের বীজ লুক্কায়িত রহিয়া গেল। বৈষ্ণবীর মৃত্যুকালীন দৈববাণীটি তাঁহার পূর্ববর্ণিত চরিত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে নাই, মানবী যেন পরিপার্শ্ব ব্যতিরেকে হঠাৎ দেবীত্বে উন্নীত হইলেন। এটি খ্যাত নাট্যকারের যোগ্য হয় নাই।

গুলসানা-চরিত্রটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। তাহার হৃদয়ের প্রেম ও প্রতিহিংসা সমভাবেই ক্রীড়া করিয়াছে। এরূপ ধরণের চরিত্র নাট্য-সাহিত্যে অধিক নাই। রণেন্দ্রকে মুগ্ধ করিবার জন্য সে যে মায়াজাল বিস্তৃত করিয়াছিল তাহা সে নিজমুখে এইরূপে ব্যক্ত করিল:—

"বিস্তার করেছি মায়াজাল!
দুর্ভেদ্য নারীর মায়া জান না সৈনিক!
* * মুখে হাসি, চোখে জল; বিবশা ব্যথায়,
রুক্ষকেশা দয়া আকাঙ্ক্ষিণী,
জানুপাতি করজোড়ে করিয়ে মিনতি,
মুখ তুলি চাহিব বদন-পানে!
সে মোহিনী ছবি যদি, না স্পর্শে হৃদয়,
মুক্তকণ্ঠে কব আমি সৎনামীর জয়—
দাসী হব প্রতিহিংসা-তৃষা ত্যজি।"

এই কথাগুলি বলিয়া গুলসানা আপনাকে আরও মনোহারিণী করিবার জন্য নিম্নলিখিতরূপে স্বভাবজাত প্রসাধনের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল :—

"বিকশিত কানন-কুসুম,
সৌরভ প্রদান অঙ্গে মম ;
চন্দ্রমা, জ্যোৎস্না কর দান ;
পাপিয়া-বুল্‌বুল্ রবে যার হয় প্রাণাকুল,
ঋণ দেহ সে স্বরলহরী ;
নবীন-নীরদ, ধারা দেহ দু-নয়নে,
হাস ব'স গোলাপ-অধরে ;
এসো স্বর্গ হ'তে হাউরীমণ্ডল,
দেহ দেবদূতে ভুলাবার ছল,
ধর্মাত্মা পিতার মৃত্যু দিব প্রতিশোধ।"

এ নাটকের ভাষা বেশ মধুর ও স্পষ্ট। সংগীতগুলির মধ্যে যে কয়টি সাড়া তুলিয়াছিল সেগুলির প্রথম ছত্র এইরূপ :—(১) 'হয় না লো জ্বালাতে পিরীত আপনি জ্বলে ওঠে' (২) 'অযতনে দিয়াছি বিদায়। গুনিনে যৌবন-মদে মন বাঁধা তারি পায়' (৩) 'দেখিস্ লো কে জানে নারীর মান। যেচে প্রাণ বেচ্‌লে ধারে পদে-পদে অপমান' (৪) 'ফুলের কলি আপনি ফোটে ফুল তা জানে না' (৫) 'ডন ফেলে খুব জোর করি আয় ভাই' (৬) 'কে জানে হায় ভেসেছি কোথায়'।

সৎনাম-নাটকের অভিনয় দেখিতে অসম্ভব জন-সমাগম হইয়াছিল। ঐতিহাসিক পটভূমিকার উপর এই মেলো-ড্রামার সৃষ্টি হইয়াছে।

সিরাজদ্দৌলা

এই বিভাগের ষষ্ঠ নাটক। এখানি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। চতুর্থ সংস্করণের পাঠ এখানে আলোচিত হইল। অধিক স্থানে গদ্য ও অল্প স্থানে অমিত্রাক্ষর গৈরিশ পদ্যে এখানি রচিত। পাঁচটি অঙ্ক ইহার বিস্তৃতি। ইহার প্রত্যেক গানখানি ইঙ্গিতপূর্ণ, এরূপ সার্থক গান খুব কম নাটকেই দেখা যায়।

ইংরাজদিগের সহিত বাঙ্গালীদের কথোপকথনের মধ্যে ইংরাজরা যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহার মধ্যে ইংরাজি ইডিয়মের বাঙ্গালা তর্জমার গন্ধ বেশ পাওয়া যায়। ভাঙ্গা বাঙ্গালা ও অল্প-স্বল্প ফারসী মিশ্রিত হিন্দীর সহিত দু-একটি ইংরাজি শব্দের বুক্‌নি তাহাতে বসিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের অনুরূপ ভাষা তাঁহার পূর্বগামী বা সমসাময়িক নাটকে বড় একটা পাওয়া যায় না।

ইংরাজিতে যাহাকে Patriotism বলে তাহা বাঙ্গালায় ছিল না। খণ্ডিত দেশ-প্রীতি ছিল, তাই দেশাত্মবোধের নমুনা নাটককার প্রথম অঙ্কের মধ্যে সিরাজের মুখ দিয়া এইরূপে ব্যক্ত করিলেন—(১) "* * রাজকার্য্য নহে স্বেচ্ছাচার ; নবাব প্রজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে।" (২) "* * কিন্তু যদি সত্যই শত্রু হই, আমি আপনাদেরই শত্রু, বাঙ্গালার শত্রু নই। * * হিন্দু-মুসলমান এক স্বার্থে বাঙ্গালায় আবদ্ধ, সে স্বার্থের বিঘ্ন হবে না। বঙ্গবাসীর পরিবর্তে বঙ্গবাসীই কার্য্যভার প্রাপ্ত

হবে। * * কিন্তু স্থির জানবেন, ফিরিঙ্গি বাঙ্গালার দুশ্‌মন।" (৩) "* * ইংরাজের অমাত্য ইংরাজ, মন্ত্রণায় স্থান নাহি পায় দেশবাসী। * * বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার।" সিরাজ ফোর্ট উইলিয়মস্থ দরবার-গৃহে কৃষ্ণদাসকে বলিয়াছেন—(৪) "* * বিদেশী আপনার হয়, ইতিহাস-পৃষ্ঠায় এর দৃষ্টান্ত নাই।" (৫) মোহনলাল ও মীরমদন তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে বলিয়াছেন—"* * কার্য্যস্থলে, আমাদের অপরাধী করবেন না; বাঙ্গালার সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হবেন না। * * ভাব্‌বেন না ভয়বশতঃ আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। বাঙ্গলার মঙ্গলের জন্য আত্মত্যাগে প্রস্তুত হয়েছিলেম।"

সিরাজ-চরিত্রের বিরুদ্ধে যে সকল কিংবদন্তী বাঙ্‌লার আকাশ-বাতাসে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, নাটককার অদ্ভুত নাটকীয় কৌশলের দ্বারা মোহনলাল ও দান্‌সা ফকিরের সংলাপের মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার অন্তর্লক্ষ্য হইতেছে সকতজঙ্গ, ঘসেটিবেগম ও জহরার ষড়যন্ত্র।

সিরাজকে কেন্দ্রে রাখিয়া বাঙ্‌লার অমাত্যবর্গের যে ভীষণ ষড়যন্ত্রের ইতিহাস রচিত হইতেছিল নাটককার অতি নিপুণতার সহিত তাহার রূপ নাটকের শুরু হইতে তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে চরমভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। ইতিহাসের এরূপ নাটকীয় রূপদান অভূতপূর্ব। বৃদ্ধ আলিবর্দ্দীর মৃত্যুশয্যায় মীরজাফরের হস্তে সিরাজকে সমর্পিত করা হইলে তিনি সে ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানা ষড়যন্ত্রের কুম্ভীপাকে বিপর্যস্ত সিরাজকে তৃতীয় অঙ্কে পুনরায় ঐ ভূতপূর্ব নবাব-মহিষীই দ্বিতীয়বার সমর্পণ করিতে আসিলে মীরজাফর সেবারও তাঁহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার আশ্বাস দিয়াছিলেন। সিরাজ এই অঙ্কে তাঁহার সৌজন্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন এবং নাটকও অপূর্ব কৌশলে তাহার পরাকাষ্ঠা বহন করিল।

সিরাজের সিংহাসন লাভে নাটকের আরম্ভ এবং তাঁহার সমাধিমন্দিরে ইহার পরিসমাপ্তি। ষড়যন্ত্রের স্তূপের উপর রক্ষিত সিংহাসন ভূমিকম্পের মতো কিরূপ স্পন্দিত হইয়াছিল তাহা নাটককার নিপুণ হস্তে চিত্রিত করিয়াছেন। এই নাটকের জহরা ও করিম চাচা ঐতিহাসিক চরিত্র নহে। ষড়যন্ত্রের পুটপাকে জহরার জন্ম এবং সিরাজের রক্তমোক্ষণে তাহার পরিসমাপ্তি। নাটককার জহরা চরিত্রকে পাশ্চাত্য রোমীয় রণদেবী 'Bellona'র আদর্শে গড়িয়াছেন। প্রাচ্যের রণদেবী কালী, দুর্গা বা রণ-চণ্ডিকা তাঁহার আদর্শের ভিতর আসিল না, কারণ 'প্রতিহিংসা' মন্ত্রে জহরা দীক্ষিতা হইয়াছিল। হিন্দুর দেবাসুর সংগ্রামে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে, তাই নাটককার তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। বাঙ্গালার নারী চরিত্রে কমনীয়তাই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাই অতিশয় মানসিক শক্তি ও তেজ সম্পন্না (a woman of great spirit and vigour) নারীর জন্য নাটককারকে পাশ্চাত্য ইতিহাসের পাতা উন্টাইতে হইয়াছিল।

চতুর্থ অঙ্কটি নাটকীয় বৃক্ষের ফলদানরূপ কার্যের উপসংহার লইয়া ব্যস্ত। নায়কের বিরুদ্ধ শক্তি জহরার এইটি লীলাক্ষেত্র। জহরা চরিত্রটি নাট্যসাহিত্যে অপূর্ব সৃষ্টি। কি রণক্ষেত্রে, কি দরবারে, কি সেনানী শিবিরে সর্বত্রই সে নির্ভয়ে পরিভ্রমণ করিয়াছে। জহরা চরিত্রটিকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে নাটকের দর্শক বা পাঠকের মনে চতুর্থ-অঙ্কস্থিত জহরার ক্রিয়াকলাপে অস্বাভাবিকতার ভাব আর আসিবে না। প্রতিহিংসা কি করিয়া দিব্যচক্ষুলাভ করে তাহার মূর্তিমতী ছবি এই জহরা। পতিনিষ্ঠাই তাহার সহায় এবং ঐ নিষ্ঠা বলেই সে ক্লাইবকে বলিতে পারিয়াছে—"আমার

দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত ; পতিপ্রেম আমার স্বার্থ, আত্মসুখ স্বার্থ নয় ! আমি পতিপুত্রহীনা, আমার দেশের মায়া কি,—জাতীয়তা কি ? আমার একমাত্র হোসেন কুলীর স্মৃতি ! সেই স্মৃতিই আমায় সহস্র দানবীয় বল দিয়েছে। যে দিন নবাব শোণিতে হোসেন কুলীর প্রেতাত্মার তৃপ্তি করবো, সেই দিন থেকে—আমি যে রমণী সেই রমণী—পতিশোকাতুরা রমণী, পতির কবরের পার্শ্বে অনন্তশয্যায় শয়ন কর্‌বো।" বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রই এরূপ চরিত্র সর্বপ্রথম সৃষ্টি করিলেন।

করিম চাচা চিত্রটি কাল্পনিক হইলেও বিদ্রোহীদের মধ্যে সিরাজের প্রতি একমাত্র দরদী চরিত্র। সিরাজের মর্মকথা করিম জহরাকে এইরূপে বলিয়াছে—'বাহাদুরি তো নিলে, কিন্তু যে নবাব, হোসেন কুলীকে কেটেছিল, তার কিছু কর্‌তে পার্‌লে না। সে ছিল মাতাল নবাব—আর এ হচ্ছে প্রজাপালক নিরীহ নবাব। (রায় দুর্লভের প্রতি) রায় দুর্লভ চাচা, আলিবর্দী মর্‌বার সময় নবাবকে মদ ছাড়িয়ে নবাবী রোকটুকু কেড়ে নিয়ে আর তোমাদের মতো সাতশো রাক্ষসীর হাতে পুতো সঁপে দিয়ে বড় কাজ করে গেছেন ! ছোঁড়াটা ভ্যাবাচাকা মেরে গেল কি না ! পলাশীতে যদি দু'পেয়ালা মদ দিতে পার্‌তুম, তা হ'লে তোমাদের বেইমানি খাট্‌তো না, আর ক্লাইবের 'হিপ্ হিপ্ হুররে' চল্‌তো না। নবাব হাতীর উপর শোয়ার হয়ে বল্‌তো—ভাগাও।'

করিম চাচার মতো প্রভুভক্ত serio comic চরিত্র গিরিশচন্দ্র ভিন্ন অপরের আঁকিবার সাধ্য ছিল না।

সিরাজদ্দৌলা নাটকখানি ট্রাজেডি শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার ট্রাজেডি স্বপক্ষ ও বিপক্ষের চেষ্টায় নিয়মানুগভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। এই নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য দেশের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কংগ্রেস সরকার বাহাদুর ইহার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করায় ইহার আলোচনা সম্ভবপর হইয়াছে।

মিরকাশিম

এই বিভাগের সপ্তম নাটক মিরকাশিম ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানির প্রচার ও অভিনয় ব্রিটিশ সরকার বাহাদুর হইতে নিষিদ্ধ থাকায় ইহার চরিত্রগুলি সম্বন্ধে মতামত প্রকাশিত হইল না। বোধ হয় ভারতীয় কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট ইহার উপর হইতেও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু বহু বৎসর ধরিয়া নিষিদ্ধ থাকায় গ্রন্থের প্রচার নাই।

ছত্রপতি শিবাজী

এই বিভাগের অষ্টম নাটক ছত্রপতি শিবাজী ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহার পুতলা ও গঙ্গাজী চরিত্রদ্বয় নাটককারের অপূর্ব সৃষ্টি। ইহার প্রচার ও অভিনয় ব্রিটিশ সরকার বাহাদুর কর্তৃক নিষিদ্ধ বিধায় চরিত্রগত আলোচনা করা হইল না। বর্তমান গভর্ণমেণ্ট প্রচার-আদেশ দিলেও গ্রন্থ পাইবার উপায় নাই।

উপরিউক্ত নাটকত্রয়ের শক্তি ও প্রভাব সম্বন্ধে তদানীন্তন দেশনায়কগণের অভিমত যাহা তাঁহারা পরলোকগত গিরিশবাবুর স্মৃতি সভায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা অনেকটা এইরূপ :—

"রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া তাহার পাদপীঠ হইতে স্বদেশপ্রীতির বহু প্রেরণা আমরা পাইয়াছি। গিরিশচন্দ্র সেই হিসাবে আমাদের সকলেরই নমস্য।" ঐ দেশনায়কগুলির মধ্যে পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রেমিক বিপিনচন্দ্র পাল, প্রসিদ্ধ সমালোচক পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, প্রসিদ্ধ সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অন্যতম ছিলেন।

শঙ্করাচার্য

এই বিভাগের নবম নাটক শঙ্করাচার্য ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি ধর্মমূলক ঐতিহাসিক নাটক, রাজনীতির সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। অবিনাশবাবুর ভাষায় বলিতে গেলে—'নীরস জ্ঞানমার্গকে সরস কাব্যে পরিণত গিরিশচন্দ্র করিলেন।'

নিরীশ্বর-শূন্যবাদের প্রচারক বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর রাজা অশোক কর্তৃক বৌদ্ধমত ভারতের সর্বত্র, তথা এশিয়া ও ইওরোপের কোন-কোন স্থানে প্রচারিত হইয়াছিল। অশোকের মৃত্যুর পর বৌদ্ধধর্মের ক্রম-অবনতির সময়ে কপটাচারী বৌদ্ধ-তান্ত্রিকেরা প্রচ্ছন্ন-বিহার প্রস্তুত করিয়া দেশের মধ্যে নানা অনাচারের সৃষ্টি করিয়াছিল। ঐ অনাচার নিবৃত্তিকল্পে এবং ভারতবর্ষকে বেদ-প্রতিপাদ্য বিশুদ্ধ অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল।

শঙ্করাচার্যকে শঙ্করের অবতার বলা হয়। তিনি কতকগুলি অমানুষিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিংবদন্তি-মূলক সেই ঘটনাবলিও নাট্যকারকে দেখাইতে হইয়াছে। সেগুলি এইরূপ :—(১) ভগীরথের গঙ্গানয়নের মতো শঙ্করের জন্মস্থানের কিঞ্চিৎ দূরাস্থিত পূর্ণা নদীকে জননীর স্নান-সৌকর্যার্থ নিকটবর্তী করিয়া গ্রামের মধ্যে তাহার গতি ফিরাইয়া আনা। (২) সংসার-বাসনাকে কুম্ভীর আকারে নদীগর্ভে বিসর্জন দেওয়া। (৩) গুরুর তপোবিঘ্নকারী কল্লোলিনী নর্মদাকে কমণ্ডলু-মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখা। (৪) গুরুআদেশে হাটিয়া গঙ্গা পার হইবার কালে শঙ্কর-শিষ্য সনন্দন দেখিলেন যে তাঁহার প্রতি পাদক্ষেপে গঙ্গার উপর পদ্ম ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান হইতেছিল। (৫) মন্ত্রশক্তি প্রভাবে বৃক্ষের শীর্ষদেশ অবনত হইয়া আসা। (৬) কামকলা শিখিবার জন্য অমরুক রাজার মৃত শরীরে শঙ্করাচার্যের প্রবেশ ও নির্গমন ব্যাপার।

বেদান্তের নীরস শঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যান কোন দিন যে দৃশ্যকাব্যের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া সরস হইয়া উঠিবে, ইহার পরিকল্পনা গিরিশচন্দ্রই কার্যে পরিণত করিলেন। ঐ নাটকের চরম পরিণতি বা পরাকাষ্ঠা চতুর্থ অঙ্কের ষষ্ঠদৃশ্যে বিদ্যাপ্রভাবে অবিদ্যার পরাভব ঘটনাটির মধ্যে নাটকীয়ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ খানেই নাটক তাহার চরম উৎকর্ষতা লাভ করিল। পঞ্চম অঙ্ক নাটকাকারে গ্রথিত হইলেও উহার ক্রিয়া নাটকীয়ভাবে ঘাত-প্রতিঘাত লাভ করে নাই, বর্ণনাত্মক (Narrative) কাব্যের মতো শঙ্করাচার্যের অবশিষ্ট কার্যগুলি ঐ আবেষ্টনীর মধ্যে দেখাইয়া দিয়া নাট্যকার তাঁহার নাটকখানিকে সম্পূর্ণ করিয়াছেন মাত্র। শঙ্করাচার্য প্রণীত স্তবগুলি নাটকীয় পরিবেশের যথাস্থানে প্রবিষ্ট করাইয়া নাটককার তাঁহার দর্শক বা পাঠক সমাজকে ভাবরাজ্যের উচ্চস্তরে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। জীবাত্মা-সম্বন্ধীয় স্তবটির বঙ্গানুবাদ মূলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াও সমান প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারিয়াছিল।

কতকগুলি অমূল্য উপদেশ এই নাটকের অভ্যন্তরে নাটককার সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পরস্পর-বিরুদ্ধ-মত প্রকাশক ষড়দর্শন সম্বন্ধে ও তর্ক-শাস্ত্র সম্বন্ধে নাট্যকার পাত্রমুখে এইরূপ বলিয়াছেন :—

"বৎস, স্থিরচিত্তে করহ শ্রবণ,
তর্কযুক্তি শক্তিহীন সত্য নিরূপণে—
তর্কে তাহা হয় নিরূপিত ;
তর্ক-বুদ্ধি নাশ হেতু তর্ক প্রয়োজন ;
শুন বৎস, যে কারণ হইয়াছে দর্শন রচনা।
মানব-কল্যাণ হেতু মহাঋষিগণ,
যে সময় মানবের অবস্থা যেমন,
করেছেন উপযোগী দর্শন-রচনা।
বেদমর্ম্ম-বঞ্চিত কুতর্ক রত জন—
নিরাশ কারণ, দর্শনের প্রয়োজন।
নির্ম্মল হৃদয়ে হয় সত্যের উদয়,
সত্যমূর্ত্তি নাহি হয় দর্শনে দর্শন।"

তর্ক ও জ্ঞানের পার্থক্য সম্বন্ধে আর একস্থানে এইরূপ আছে :—

"তর্ক-যুক্তি বুদ্ধিশক্তিবলে,
জ্ঞানমাত্র হৃদয়ের ধন।
জ্ঞান দীপ্ত নহে কদাচন,
বৈরাগ্য না করিলে আশ্রয়।"

বেদান্তের গূঢ় রহস্য-সম্বন্ধে একস্থানে এইরূপ আছে :—

"বৎস! অস্তি, ভাতি, প্রিয়—
এই মহাবাক্যত্রয়ে সমুদয় বেদার্থ স্থাপিত।
বিদ্যমান পরব্রহ্ম, নিত্য স্বপ্রকাশ,
প্রিয় তিনি,—এই সার জ্ঞান।"

দ্বৈতবোধ কিরূপে অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার কথা :—

"আমা হ'তে প্রিয় আর কি আছে আমার ?
পুত্র-পরিবার—প্রিয় বস্তু যা আছে সংসারে,
প্রিয় তাহা আমার বলিয়ে।
ব্রহ্মবস্তু প্রিয় মম আমার সমান,
জন্মিলে এ জ্ঞান—
আমি-তিনি ভেদ নাহি রহে,
প্রিয় জ্ঞানে এক জ্ঞান জন্মে ব্রহ্মসনে।
এই প্রিয়জ্ঞানে ক্ষুদ্র অহম্ বিনাশ,
ক্ষুদ্রত্ব ত্যজিয়া হয় অসীম অহম্।

ব্রহ্ম-জ্ঞানে বিলুপ্ত অহম্,
উদয় সোঽহংভাব অহং বর্জনে।
মনোবুদ্ধি অহঙ্কার লয় সমুদয়,
আত্মজ্ঞানে অবস্থান ক্ষুদ্রাহং ক্ষয়ে।"

বেদান্তের এইরূপ বিস্ময়কর সরল ব্যাখ্যা নাটকের ক্ষুদ্র অবয়বে বাস্তবিকই চমকপ্রদ হইয়াছে!

সংগীতের ভিতর দিয়া নাটককার মহামায়া ও অবিদ্যার প্রকৃত রূপ এইরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন, গীত হইবামাত্র কোন্‌টা কে বুঝিতে বাকী থাকে না; স্থানাভাবে প্রথমছত্র মাত্র উদ্ধৃত হইল:—(১) (অবিদ্যার রূপ) 'হেসে হেসে কাছে বসে মনোমোহিনী মন মজাই। যে রসে যে জন রসে, সে রসে তারে ভোলাই॥' (২) 'চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে, বইছে মলয়-বায়।' (৩) (মহামায়ার রূপ) 'পর্‌লে পরে সাধের বাঁধন, খুল্‌লে খোলে না। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা কথায় চলে না॥' শঙ্করাচার্যের অভিনয় দেখিবার জন্য নানা ধর্মসম্প্রদায়ের লোক রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাগৃহে আসিয়া ভিড় করিতেন। নাটকের শ্রেণী হিসাবে ইহা তত্ত্বপ্রধান Miracle জাতীয়।

অশোক

এই বিভাগের দশম নাটক অশোক ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। সাধক-প্রবর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মমত যেমন তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার অন্যতম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ-দ্বারা দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, বুদ্ধ-জন্মের প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে তেমনি তাঁহার ধর্মমত রাজা অশোকদ্বারা সমগ্র এশিয়া, আফ্রিকা ও ইওরোপের নানা ভূখণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল। ভারত ও তাহার বাহিরে বৌদ্ধস্তূপ ও বিহারগুলি আজও অশোকের এবংবিধ কীর্তির সাক্ষ্য দিতেছে। অশোক সম্বন্ধীয় ঐতিহ্য যাহা কিছু এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সহিত প্রচলিত কিংবদন্তীর মিলন ঘটাইয়া গিরিশচন্দ্র এই অপূর্ব নাট্য-হর্ম্যখানি নির্মিত করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই নাটকখানিকে তাঁহাদের ডিগ্রি ও ডিগ্রি-উত্তর পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত করিয়া পরলোকগত নাটককারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

বৌদ্ধযুগের একচ্ছত্র সম্রাট্ অশোক কিসের তাড়নায় ও প্রেরণায় শান্ত ব্যথাতুর নির্ভীক সত্যনিষ্ঠ মাতাপিতৃভক্ত ও উচ্চাভিলাষী যুবক হইয়া ক্রমে-ক্রমে চণ্ডাশোক ও তৎপরে ধর্মাশোকে পরিবর্তিত হইয়া গেলেন, তাহার বিবর্তন-কাহিনী নাট্যকার ইতিহাসকে বজায় রাখিয়া কল্পনার বুনানি-মধ্যে মনস্তত্ত্বের সাহায্যে দক্ষতার সহিত প্রকাশিত করিয়াছেন। অশোকের চরিত্রে যে সকল ঐতিহাসিক কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে নাটককার সেগুলিকে এমন নাটকীয় প্রতিবেশ-মধ্যে স্থাপিত করিয়াছেন যে, তজ্জন্য অশোককে প্রকৃত প্রস্তাবে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না, ঘটনার অনুক্রমে (sequence) সেগুলি আপনা-হইতে আসিয়া গিয়াছিল। হিন্দু দর্শনের অবিদ্যা বৌদ্ধদর্শনশাস্ত্রে 'মার' পরিভাষা লইয়াছে। হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে তাহাদের অবতার-তালিকাভুক্ত করিয়া লইয়াছিল, তাঁহার তিরোধানের প্রায় আড়াই শত বৎসর পর অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক যুগ বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। সুতরাং নাটকের ক্রিয়া প্রদর্শনার্থ অতি-মানবীয় কার্যাবলির জন্য 'মার' বা

বৌদ্ধ-গুরু উপগুপ্তের দ্বারা আনীত ইন্দ্রজাল ঐ যুগেরই সম্ভাবিত ব্যাপার। যুগ-মাহাত্ম্যে নাটকের মধ্যে ইহার প্রদর্শন অস্বাভাবিক হয় নাই।

আকাল চরিত্রটি নাটককারের অপূর্ব সৃষ্টি। ইহার মনোভাব ভাষার নর্তনে নৃত্য করিয়া উঠে। স্বভাবজাত শ্লেষ ও ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া সত্যকথনশীলতায় সে অদ্বিতীয় ছিল। অশোকের ন্যায় দিগ্‌বিজয়ী বীরের সম্মুখেও সে সত্য বলিতে ভীত হয় নাই। যুবরাজ থাকাকালীন এক বিশিষ্ট উপায়ে অশোক আকালের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার জন্য আকাল আজীবন কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে অশোকের সেবা করিয়া পরিশেষে তাঁহারই জীবনরক্ষার্থ নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল। উদ্ভিদ্ রাজ্যের নিয়ম এই যে, আগে ফুল পরে ফল ধরিয়া থাকে। লাউ-কুমড়ার বেলায় ইহার বৈপরীত্য লক্ষিত হয়, অর্থাৎ আগে ফল, পরে ফুল ধরে। আকাল সাধন-রাজ্যে এই শেষের নিয়মটি কার্যকরী হইতে দেখিয়াছিল, তাই তাহার সংলাপের মধ্যে এই কথার উল্লেখ দেখা গিয়াছে। চণ্ডীর 'সাধন সমর' নামক সংস্করণে ইহার তুল্যার্থ দেখা যায়—"অন্তররাজ্যে কার্যকারণ ভাবের যথাযোগ্য পৌর্ব্বাপর্য ভাব স্থির করা যায় না। জগতে দেখিতে পাই আগে কারণ, তার পর কার্য; কিন্তু এখানে কারণ ও কার্য যেন যুগপৎ একত্র অবস্থিত। * * আমরা দেখি—আগে ফল, তার পর ফুল। বাস্তবিক সূর্য্য ও রশ্মির ন্যায় সিদ্ধি ও সাধনা যেন সহাবস্থিত।" (সাধন-সমর)

ঐতিহাসিক চরিত্রাবলির মধ্যে বীতশোকের ভ্রাতৃপ্রেম ও আত্মত্যাগ দেখিবার জিনিস; বিন্দুসারের স্ত্রৈণত্ব বেশ ফুটিয়াছে। দুশ্চরিত্র সুসীমের লাম্পট্য ও অপঘাত মৃত্যু তাহার কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল। কহ্লাটক ও রাধাগুপ্তের মন্ত্রিত্বে অশোকের কিছুকাল পূর্বে আগত চাণক্যের কূটনীতির প্রভাব কিছু কিছু পাওয়া যায়। স্ত্রী-চরিত্রগুলির মধ্যে পদ্মাবতী, সুভদ্রাঙ্গী ও দেবী চরিত্র নিজ নিজমাহাত্ম্যে পূর্ণ। বুদ্ধে সমর্পিতপ্রাণ ন্যগ্রোধের জন্ম, শিক্ষা ও ব্যবহার হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রার ত্যাগ ও কার্যাবলি দেখিবার ও শিখিবার বস্তু। ঐতিহাসিক তিষ্যরক্ষিতার চরিত্রটি নাটকের ঘাত-প্রতিঘাত আনিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। অশোকের পুত্র কুনালের আত্মত্যাগটি অপূর্ব।

গিরিশচন্দ্রের মামুলী লিখনভঙ্গী অশোক নাটকে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ইহার প্রকাশ-রীতি বা রচনাশৈলী সংযত ভাষায় ও বিশুদ্ধ পদবিন্যাসে পরিপূর্ণ। সংলাপগুলি এতই নিপুণতার সহিত লিখিত যে, গড্ডালিকা-রীতি ইহার মধ্যে নাই। চিন্তাধারাও বেশ উন্নত ও সতেজ। এই নাটকের অঙ্ক-ব্যবধান এমনই সুন্দর প্রণালীতে গ্রথিত হইয়াছে যে, প্রতি অঙ্ক শেষে আনীত ঘটনার মধ্যে এক একটি সংঘাত আসিয়া আপনা হইতেই চমকের সৃষ্টি করিয়াছিল।

সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া যাঁহার চিত্ত-কুসুম বিকশিত হইয়া উঠে, তাঁহাকে আর বাহ্যপ্রকৃতি সৌন্দর্য দিতে পারে না, তাঁহার অন্তরিন্দ্রিয়ের সৌন্দর্যে তিনি বিভোর থাকেন, এবং সান্ত জীব অনন্তের আনন্দ তখনি উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি আবার সান্তের মধ্যেই অনন্তের অনুভূতি পাইয়াছেন, তিনিও সেই একই আনন্দ উপভোগ করেন এই তত্ত্বটি নাটককার কুনাল ও তাঁহার স্ত্রী কাঞ্চনের নিম্নলিখিত কথোপকথনের মধ্যে প্রকটিত করিয়াছেন। নাটকের দর্শক বা পাঠক সমাজ ইহার মধ্যে যথাক্রমে নিরাকার ও সাকার তত্ত্বের আভাস পাইবেন:—

কুনাল— "অন্তরের ফুলরাজি দেখ নাই ধ্যানে,
তাই তব নশ্বর কুসুমে অনুরাগ।

প্রকৃতির শোভা যা নেহার,
অস্ফুট অন্তর-ছবি মাত্র সে সুষমা ;
নয়ন, শ্রবণ, নাসিকা, রসনা কিংবা স্পর্শেন্দ্রিয়—
অংশে অংশে করে মাত্র সুখ অনুভব !
পঞ্চসুখ একত্র মিলিত, বর্দ্ধিত সহস্রগুণে—
সমাধিস্থ পুরুষের হয় উপভোগ।
সে সুখ আশায়, নশ্বর ইন্দ্রিয়-লালসায়,
মুগ্ধ নহে চিত্ত মম।
নশ্বর এ দেহে তব কেন অনুরাগ ?
এসো বসি দোঁহে ধ্যানে,
ধ্যান-সম্মিলনে—উভয়ে অনন্তে যাই মিলি।"

কাঞ্চন— "নিয়ত অনন্তভাবে তুমি মোর হৃদে,
সান্ত নহে—অনন্ত সে ভাব !
অন্তরে বাহিরে সমভাবে সে ভাব বিহরে ;
ধ্যানে বা নয়নে পার্থক্য না হেরি নাথ,
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি হৃদয়-ঈশ্বর।"

অশোকের গানে নাটককার নূতন সাড়া তুলিয়াছেন, যথা—(১) 'নর-দেহে তবে কেন এসেছি ভবে, যদি ভালবাসা নরে বিলাতে নারি', (২) 'মানস-সরে চিত-কমলকলি জ্ঞানারুণ হেরি হাসে', (৩) 'কায়-বাক্য মন নহে তো আমারি, সকলই তোমারই—বারি সনে কবে মিশাইবে বারি।' স্থানাভাবে গানগুলি আংশিক উদ্ধৃত হইল। বহুতত্ত্বপূর্ণ সংঘাতমুখর অশোক নাটকখানি সুধী-দর্শক বা পাঠক সমাজের তৃপ্তিকর হইয়াছিল। কোন কোন ভূমিকার অভিনয় দোষে রঙ্গমঞ্চে বেশিদিন অভিনীত হয় নাই।

গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য-বিভাগের আলোচনা এইখানেই শেষ হইল। পাঠকবর্গ এই বিভাগীয় আলোচনার ভিতর হইতে উহার দোষগুণ দেখিয়া লইবেন।

বিবিধ নাটক বিভাগ

গিরিশচন্দ্র কতকগুলি বিক্ষিপ্ত নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কোন নির্দিষ্ট ধারার মধ্যে উহারা আসে না, তজ্জন্য এই বিভাগের অন্তর্গত করা গেল।

ম্যাক্‌বেথ

ম্যাক্‌বেথ্ নাটকখানি মৌলিক নহে, বিশ্ববিশ্রুত শেক্সপীয়রের ইংরাজী নাটকের বঙ্গানুবাদ মাত্র। এ নাটকখানি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল; উক্ত থিয়েটার এই নাটক লইয়া প্রথম খোলা হইল। শেক্সপীয়রের শব্দ বিন্যাস কৌশল (diction), প্রকাশভঙ্গী (style), অন্তর্গত-ভাব (spirit), এমন কি ছন্দঃ (verse) পর্যন্ত আত্তী করিয়া লইয়া (assimilate) হুবহু ভাষান্তরিত করা কম শক্তির পরিচায়ক নহে! গিরিশচন্দ্র এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ম্যাকবেথের অনুবাদে মুগ্ধ হইয়া বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ ও স্যর গুরুদাস, এক্সসাইস্ ডিপার্টমেন্টের সর্বময়কর্তা সুবিখ্যাত কে, জি, গুপ্ত এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার পি, এস, রায় একযোগে উচ্চ মন্তব্য প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ও সাংবাদিক এন্ ঘোষ, বহুভাষাবিদ্ হরিনাথ দে স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষিগণও একবাক্যে এই অনুবাদের সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। শেক্সপীয়র যে অননুকরণীয় ভাষায় ডাকিনিগণকে কথা বলাইয়াছিলেন সে ভাষা যে ভাষান্তরিত হইতে পারে গিরিশচন্দ্রের পূর্বগামী কাহারও মনে এ ধারণা ছিল না। তদানীন্তন শিক্ষিতসমাজ শ্রদ্ধার চক্ষে ঐ অভিনয় দেখিলেও দর্শক-সাধারণ ঐ নাটকের রৌদ্ররস বুঝিতে পারেন নাই। নাটককারের মনে শেক্সপীয়রের অন্য নাটকের তর্‌জমা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও রঙ্গালয়ে অর্থাগম না হওয়ায় তিনি তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। অনুদিত অংশ ইংরাজীর পাশা-পাশি রাখিয়া সৌন্দর্য দেখাইবার স্থান না থাকায় এই খানেই সে চেষ্টায় বিরত হওয়া গেল। এখানি বিখ্যাত ট্রাজেডি শ্রেণীর নাটক।

মুকুল-মুঞ্জরা

মুকুল-মুঞ্জরা নাটকখানি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি মিলনান্ত নাটক। কপট সংসারে অকপট প্রণয়ের খেলা এই নাটকের উপজীব্য। প্রণয় ব্যাপারে আত্মোৎসর্গ যে কি বস্তু তাহার পরিচয় এই নাটকে আছে। প্রেমের টানে তারা নাম্নী মূক নারীর প্রতি আজীবন মূক থাকিবার সংকল্প লইয়া বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ চন্দ্রধ্বজের প্রেমোৎসর্গ এবং অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন বোধহীন মুকুলের প্রতি মুঞ্জরা নাম্নী কৃতধী রাজকুমারীর অকৃত্রিম প্রণয়-জ্ঞাপন এ নাটকের বর্ণিতব্য বিষয়।

মরজগতে আধ্যাত্মিক প্রেম (Platonic love) সম্ভবপর হইয়া উঠিলে তাহার পরিপার্শ্ব (surroundings) বা বংশ (Parentage) কিরূপ হওয়া উচিত এ সকলের মনোবিজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নাটককার নিপুণহস্তে সম্পন্ন করিয়াছেন। জাতিরূপ গঠনে সিদ্ধহস্ত গিরিশচন্দ্র বরুণচাঁদ ও ভজনরাম চরিত্রদ্বয়ে নূতন এক পরিকল্পনা দিয়াছেন। আধ্যাত্মিক প্রণয়-জ্ঞাপক গীতিপদ্যে (lyrical poems)

নাটকখানি ভরপুর। অভিনয়কালে এই নাটকখানি দর্শক সাধারণের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা উভয়ই আকর্ষণ করিয়াছিল।

ইহার কয়েকটি সংগীত প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, স্থানাভাবে ঐগুলির প্রথম ছত্র মাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল :—(১) 'কেন ফুল ফোটে কে জানে, কেন যায় শুকায়ে ঝরে কি অভিমানে?' (২) 'কে জানে মজাবে নয়নে, না বুঝে অবোধ-আঁখি কি ছবি এঁকেছে প্রাণে', (৩) '(আমায়) বিলিয়ে দিতে চাও কি প্রাণ-সই, বেঁধেছ ভালবাসায় আর তো কারো নই।' (৪) 'ছড়ায় এত ভালবাসা কোথায় পায়? বুঝি ছেঁড়া ফুলের ভালবাসা—কথায় কথায় ছড়িয়ে যায়।' (৫) 'মান কি তোরে শিখাই সাধ করে। যে নারীর মানের আদর জানে, প্রাণ দিতে হয় তার করে।'

নাটকান্তর্গত চরিত্রগুলি যে সকল কবিতায় কথা কহিয়াছে তাহার রচনাভঙ্গী চমৎকার। গিরিশবাবুকে যে মহাকবি বলা হয় তাহার প্রমাণ ঐ সকল অনবদ্য সরল কবিতার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। নাটকখানি প্রকৃতপক্ষে চতুর্থ অঙ্কেই সমাপ্ত। মিলনান্ত নাটকের যেটুকু মিলন তখনও বাকি ছিল তাহা ঐ অঙ্কের আর একটি দৃশ্য বাড়াইয়া দেখাইলেই চলিত। নাটককে পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত করিতে হইবে এরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া অযথা অঙ্কবৃদ্ধি করা গিরিশচন্দ্রের মতো ক্লান্ত নাট্যকারের উপযুক্ত হয় নাই। এই নাটকখানি সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা পণ্ডিত বিহারীলাল সরকার 'জন্মভূমি' পত্রিকায় বাহির করিয়াছিলেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা দেখিয়া লইবেন।

মনের মতন

মনের মতন নাটকখানি ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রেল তারিখে বীডন্ স্ট্রীটস্থ ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহার গল্পাংশ পারস্য-উপন্যাস হইতে সংগৃহীত। এখানি মিলনান্ত কমেডি। নাটিকার হাস্যভাব কিরূপে নাটকের গভীরভাবে উন্নীত হইতে পারে তাহার পরিকল্পনা (designing) নাটককার এই নাটকের মধ্যে করিয়াছেন। পরলোকগত প্রসিদ্ধ সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত অধুনাবিলুপ্ত 'রঙ্গালয়' পত্রিকার স্তম্ভে এই নাটক সম্বন্ধে ধারাবাহিক সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। বহুবর্ষের ব্যবধান-জনিত অনবধানতায় সেই পত্রিকাগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সে সমালোচনার কিছুই আর এখন মনে নাই। এ নাটকখানি যে শক্তিশালী তাহার পরিচয় ইহার ক্রমিক অভিনয়ে ও অগণিত দর্শক সমাগমে বুঝা গিয়াছিল।

ইহার সংলাপগুলি চরিত্র-বিশেষের মধ্যে কখন লঘু কখন গুরু হইয়া বেশ সুপ্রযুক্ত হইয়াছে। এ নাটকের মধ্যে নাটককার অপূর্ব কৌশলে প্রেম ও সংশয়ের সংঘাত আনিয়াছেন। স্থান ও পাত্রভেদে রসিকতা বেশ সরস হইয়াছে। তাহার নমুনা এইরূপ :—"সানি—'কি! রূপের গরবেই যে ফেটে মরছ দেখ্‌তে পাই'। কাউ—'এতক্ষণ ফেটে মরতুম, কেবল তোমার রূপ দেখে প্রাণ রেখেছি। তোমার রূপলি চুলে প্রাণ তিন পাক খেয়েছে। তোমার কোঁকড়া চামড়ায় প্রাণে গামছা-মোড়া দিচ্ছে, তোমার তোব্‌ড়া বদনে মনটা ডুব্‌ড়ে বসে গেছে; আর যেটুকু বাকি ছিল, বিশাল গলার ঝঙ্কারে কোটরে সেঁদিয়েছে।' * * 'সানি—'তুমি কি প্যাঁচা?' কাউ—'প্যাঁচা কেন—বোঁচার বোঁচা, তা' নইলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা কই!"

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেলেরা ও কাউলফের নিম্নলিখিত কথোপকথনের মধ্যে নাটিকার হাল্কাভাব নাটকোচিত প্রথম সংঘাত এইরূপে লাভ করিল :—"দেলে—'* * এস গোলাম, কাছে বসো! (হস্ত ধরিয়া উপবেশন করানো) কাউ—"ও কি কচ্চো—ও কি কচ্চো?" ঐ দৃশ্যেই দ্বিতীয় সংঘাত এইরূপে দেখা দিল :—"কাউ—'গোলাম, এ দিকে আয়: দেলেরার কুশল-কামনা করে এই মদিরা পান কর্।" "দেলে—'আমি গোলেন্দাম আর কাউলফের প্রেমে এই গুল্-সরাপ পান করি। (কাউলফের প্রতি) তুমিও পান কর, যেন গোলেন্দামের প্রতি তোমার যে প্রেম-অভিলাষ আছে, তাহা পূর্ণ হয়।' তৃতীয় সংঘাতটিও ঐ একই দৃশ্যে এইরূপে আসিয়াছে :—"দেলে—'* * কি লো কি—মনিয়া বল্তো, আমার সব মনে পড়ছে না।" "মনি—'হ্যাঁ—হ্যাঁ—সে প্রেমের তুফান চলে।" "কাউ—(উত্থিত হইয়া) আমি তবে এ স্থান হ'তে যাই।" "মির্জা—'কাউলফ্।" "কাউ—জনাব।" এই তৃতীয় সংঘাতের পর নাটিকা হইতে সহসা-পরিবর্তিত নাটকের চতুর্থ সংঘাত এইরূপে আসিল :—"সানি—'কোথায় যাব, এ রাত্রে কোথায় তারে খুঁজবো?" "দেলে—'যেখানে হয়—যেথায় সে আছে। 'কাউলফ্—কাউলফ্। দেলেরা তোমায় খুঁজ্‌চে'—এই বলে চীৎকার কর। গভীর নিস্তব্ধ নিশিথিনী ভেদ করে চীৎকার কর,—দেলেরা তোমায় ডাক্‌ছে—দেলেরা তোমায় ডাক্‌ছে!"

উপরি উক্ত চারিটি সংঘাতে যথাক্রমে কাউলফ্, মির্জান ও দেলেরার মনোমধ্যে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল তাহার প্রশমনই নাটকটির প্রতিপাদ্য বিষয়। দেলেরার একটি পরিহাসের মধ্যে নাট্যবীজ উপ্ত হইয়া কিরূপে বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করিল তাহা বাস্তবিকই চমকপ্রদ ব্যাপার।

চরিত্র হিসাবে কাউলফ্, দেলেরা, গোলেন্দাম ও মির্জান নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। চরিত্রগুলি অপূর্ব। ফকির চরিত্রটি ত্যাগীর আদর্শ। সংসারীর ও ফকিরীর তাৎপর্য্য-নির্ণয়কালে ফকির এক স্থানে এইরূপ বলিয়াছেন :—"ফকিরী নিয়েও আমি তো ভগবানের সংসার ছাড়া নই। তোমায় বলেছি, সন্তাপ দূর করাই ফকিরের সাধন। * * সংসারে সুখ—বিশ্বাস, দুঃখ—সন্দেহ। * * মানবের হিতসাধন ফকির ও সংসারী উভয়েরই কার্য।" আর একস্থানে বাদশাহকে ফকির এইরূপ বলিয়াছেন :—"বাদ্‌শা, বুঝতে পেরেছ—সংসার সুখের করা যায়। হৃদয়ে সন্দেহ না থাক্‌লে, ভগবানের সংসার প্রেমের সংসারস্বরূপ জ্ঞান হ'লে,—কার্যের নিমিত্ত কার্য কল্লে,—পরহিত সাধন কল্লে ফকিরী ও বাদ্‌শাই দুইই সমান!"

মনের মতনের গানগুলি অভিনয়কালে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, স্থানাভাবে ঐগুলির প্রথম ছত্র-মাত্র উদ্ধৃত হইল :—(১) 'খাল কেটে লো লোনা জল এনে, আখেরে কি হয় কে জানে!' (২) 'আমার অগাধ জলে জাল ফেলা।' (৩) 'বল না কিন্‌বে কি দরে, এ হাটে কেনা-বেচা যতন-আদরে।' (৪) 'মনের মতন নয় ত পোড়া মন, যতনে রতন এনে করেছিলো অযতন।' (৫) 'এখনো ত আমায়-আমি রয়েছি! তাহার বিরহে সখি, কি বল সহেছি?' (৬) 'সুখের স্বপন যার ভেঙ্গেছে সে আসে ফকিরের ঘরে।' (৭) 'যে জন যারে চায়, সেই ত তারে পায়। হাওয়া ধরে নইলে কেন ফেরে দুনিয়ায়।' (৮) 'বুঝি ধরা দেছে, নইলে কে ধরে।' পরবর্তী সংগীত দুইটি হিন্দী সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধিকর। উহার প্রথমটি সন্ধ্যাসূচক গীত (১) 'গিয়া দিন চলা, ক্যা সাথ লিয়া কুছ, মালুম হায়?' দ্বিতীয়টি পরমাত্মা বিষয়ক—(২) 'লাগা রহো মেরি মন, পরমধন কি মিলে বিন্ যতন।'

তপোবল

তপোবল নাটকখানি ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। রামায়ণ হইতে ইহার গল্পাংশ গৃহীত, কিন্তু এমনই নূতন ছাঁচে নাটককার ইহাকে ঢালিয়াছেন যে এখানিকে সম্পূর্ণ নূতন নাটক বলা যায়। পৌরাণিক বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র সংবাদকে সামাজিক সাম্যবাদের (democracy) উপর প্রতিষ্ঠিত করাই নাট্যকারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এখানি গিরিশচন্দ্রের সর্বশেষ পৌরাণিক নাটক। ইহার আলোচনা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। এ ত্রুটি মার্জনীয়।

ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষিপদ-লাভার্থ তপস্যার শক্তি-প্রদর্শন ব্যাপারটাই তপোবলের সার্থকতা। লোভ প্রণোদিত ক্ষত্রিয়োচিত বল, বীর্য, দম্ভ ও অভিমানের সহিত ব্রাহ্মণোচিত অভিমানশূন্যতা ও তিতিক্ষার দ্বন্দ্বে ব্রাহ্মণ্যেরই জয় ঘোষিত হইয়াছিল। এ ব্রাহ্মণ্যধর্ম জন্মগত অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তপস্যার অর্জ্জিত শক্তিদ্বারা লব্ধ হইয়াছিল। কালের ব্যবধানে ইহাই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করিয়া জাতির অধঃপতন ঘটাইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র তাই, বর্তমান সামাজিকদিগের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া পৌরাণিক বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতিষ্ঠা যে গুণগত ছিল এবং বংশগত নহে তাহাই দেখাইয়া দিলেন। সর্ববিধ সাধনার মতো আধ্যাত্মিক সাধনারও সংস্কার, প্রতিবেশ ও ক্রম আছে। জন্মার্জ্জিত সংস্কার সাধনার সহায় না হইলে সিদ্ধিলাভ সুদূর-পরাহত হইয়া যায়, অন্যথায় জীব মাত্রেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিত। ঋচীক ঋষি প্রদত্ত ব্রহ্মতেজঃপূর্ণ চরু খাইয়া গাধিরাজ পত্নী বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই দৃশ্যতঃ বিশ্বামিত্রের পূর্বসংস্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া উগ্রতপঃদ্বারা বিশ্বামিত্র প্রথমে রাজর্ষিত্ব, পরে বলিদানার্থ আনীত শুনঃশেফ নামক ব্রাহ্মণ বালকের জীবনের পরিবর্তে নিজ জীবন বলি দিবার সংকল্প করায় মহর্ষিত্ব, এবং পরিশেষে বশিষ্ঠ-মারণ-যজ্ঞে পুরোহিত পদে বৃত স্বয়ং বশিষ্ঠদেবের আত্মদানাদর্শ সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া ঐ বিশ্বামিত্রই আবার ব্রাহ্মণত্বের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অভিমান ত্যাগপূর্বক ক্ষমাভিক্ষা করিবার জন্য বশিষ্ঠের চরণোপান্তে আত্মনিবেদন করিলেন। বশিষ্ঠ তখন ব্রাহ্মণের লক্ষণ বিশ্বামিত্রে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া ব্রহ্মার বরদত্ত ব্রহ্মর্ষিত্ব মানিয়া লইলেন, নাটকও সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইল।

পূর্বাপর বিদূষক চরিত্রে নাটককার অসামান্য সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। এই নাটকের সদানন্দ চরিত্রটিতে বিদূষকের চিরাচরিত ভোজন-প্রিয়তা ও রাজপ্রীতির উপর অদ্ভুত আত্মত্যাগ-পরায়ণতা দেখাইয়া নাট্যকার ঐ চরিত্রটিকে আরও মধুর করিয়াছেন। এই নাটকে দৃশ্যপটের সাহায্যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টির অনেক কৌশল আছে, তন্মধ্যে শকুন্তলাকে ক্রোড়ে লইয়া মেনকা কিরূপে বিশ্বামিত্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছিলেন তাহার ভঙ্গিমা দেখিয়া বহুকাল পূর্বে বোম্বাই প্রদেশের রবিবর্মা-অঙ্কিত চিত্রপটটিকে স্মরণপথে আনিয়া দেয়। সংগীতবিভাগে ব্রহ্মণ্যদেব ও বেদমাতার সংগীতে নূতন সাড়া পাওয়া গিয়াছে, স্থানাভাবে উদ্ধৃত হইল না। রূপ না থাকিলে শুধু লালসায় প্রেরণায় কি করিতে পারে—এই সম্বন্ধীয় অপ্সরাগণের একটি সংগীত বেশ উপাদেয় হইয়াছে। নাটকখানি Mystery ও Miracle নাটকের মিশ্র ভাব লইয়া রচিত।

এইখানেই গিরিশচন্দ্রের সর্ববিধ নাটকবিভাগীয় আলোচনা শেষ হইল।

নাটিকাবিভাগ

গিরিশচন্দ্র নাটিকাবিভাগে কি নূতনত্ব দিয়াছেন, এক্ষণে তাহার সন্ধান করা যাক্।

দোললীলা

দোললীলা নাটিকাখানি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ দোল পূর্ণিমার দিনে ভুবন নিয়োগীর ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহার আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। ইহার নূতনত্ব: এই যে, এখানি রঙ্গমঞ্চের দিক দিয়া হোলি বিষয়ক প্রথম নাট্যগীতি; ইহার পূর্বে নাট্যসাহিত্যে হোলির গান ছিল না। ছন্দোবন্ধে পদাবলির আকারে সংলাপগুলির মধ্যে হোলির গান আত্মবিকাশ করিয়াছে।

মায়াতরু

মায়াতরু নাটিকার উল্লেখযোগ্য নূতনত্ব কিছু নাই। ইহার দুইটি গান খুব নাম কিনিয়াছিল, স্থানাভাবে প্রথম লাইন উদ্ধৃত হইল:—(ক) 'না জানি সাধের প্রাণে কোন্ প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি।' (খ) 'হাস রে যামিনী হাস প্রাণের হাসি রে।' এখানি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি তারিখে প্রতাপ জহুরীর ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

মোহিনী প্রতিমা

মোহিনীপ্রতিমা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রেল তারিখে প্রতাপ জহুরীর ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। সত্যকার সৌন্দর্যের উপাসক সহজেই সত্যবদ্ধ হয়। যদি কেহ ঐ সত্যসন্ধের মধ্যে স্বার্থের বিসর্জন নিবিষ্টমনে বসিয়া দেখে, তাহা হইলে সেই দর্শকেরও স্বার্থসেবার খোলস আপনা-হইতে খসিয়া পড়ে—এই তত্ত্বাভিত্তিটিই নাটিকাখানির নূতন পরিকল্পনা। হেমন্ত ও নীহার পরস্পর সত্যবদ্ধ থাকিয়া নিঃস্বার্থ প্রেমের উপাসনা করিয়াছে। বারবনিতা সাহানা তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া প্রকৃত প্রণয়ের মর্ম বুঝিল। ইহার সংগীতের মধ্যে (ক) 'প্রাণের মত পেলে পরে, প্রাণ কি কার মানে মানা', (খ) 'যতনে কিনব যতন, মনের আগুন কিনব কেন?' (গ) 'জানি নে কেন যে ভালবাসি'—এই তিনখানি গানের মাত্র প্রথম লাইন স্থানাভাবের জন্য উদ্ধৃত হইল। এগুলি দূর পল্লীগ্রামে আজও গীত হইতে শুনা যায়।

আলাদিন

আলাদিন নাটিকাখানি মোহিনীপ্রতিমার সহিত একসঙ্গে একই তারিখে প্রতাপ জহুরীর ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি গিরিশবাবুর নামে কলঙ্কলেপন করিয়াছে। আরব্য উপন্যাসের এই গল্পটি বাঙ্গলা, হিন্দী ও উর্দু মিশ্রিত ছড়ায় এক জগা-খিচুড়িতে পরিণত হইয়াছে।

ব্রজবিহার

ব্রজবিহার নাটিকাটি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে প্রতাপ জহুরীর ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। সংগীতের সুধাবৃষ্টির মধ্যে এ খানি অভিনীত হইয়াছে। নাটকীয় চরিত্রের

উত্তর-প্রত্যুত্তর গানে-গানেই চলিয়াছে। এ নাটিকার ইহাই নূতনত্ব। সংগীতের মধ্যে যেগুলি মধুর, স্থানাভাবে সেগুলির প্রথম ছত্র উদ্ধৃত হইল :—(ক) 'কেন রাই। একলা বসে, বয়ান ভাসে নয়ন নীরে?' (খ) 'ধরম-করম সকলি গেল লো শ্যামাপূজা মম হ'ল না।' (গ) 'যে ব্রতে হ'য়েছ ব্রতী, কর গোপী উদ্‌যাপন', (ঘ) আমার এ সাধের তরী প্রেমিক বিনা নেই নি কারে,' (ঙ) 'শরতে বসন্তানিল, পিকফুল তোল তান, কুমুদিনী সনে হাসি, নলিনী খোল বয়ান।' এই গানগুলির আকর্ষণে রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে পূর্ণ হইয়া যাইত।

মলিন-মালা

মলিনমালা নাটিকাটি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে প্রতাপ জহুরীর ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইওরোপীয় অপেরাবিশেষের অনুকরণে এখানি রচিত, এবং তাহাই ইহার নূতনত্ব। গল্পাংশটি এইরূপ :—লাক্ষারাজ তনয় লহর বিমাতার কুপ্রস্তাবে অসম্মত হইয়া তৎপ্রদত্ত কুসুমমালা কণ্ঠে দোলাইয়া উহা মলিন করিয়াছিলেন। সপত্নী-তনয়ের নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিয়া বিমাতা তখন লহরকে এক ভগ্ন তরীতে চড়াইয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিল। পরিশেষে পিতা লাক্ষাধিপ কর্তৃক ঐ কলঙ্কলেপ ক্ষালিত হইলেও লহর নির্বেদাতিশয্যে নিজ জীবন ঐ মালার সহিত সমুদ্রগর্ভে ডালি দিলেন। নবানুরাগিনী মালদ্বীপ তনয়া বরুণা লহরের অদর্শনে অশ্রুজলেরই মালা পরিলেন।

হীরার ফুল

হীরার ফুল নাটিকাখানি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রেল তারিখে বীডন্ সট্রীটস্থ গুর্মুখ রায়ের স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নূতনত্বের মধ্যে ইহার গানগুলি বড়ই জনপ্রিয় হইয়াছিল। কয়েকখানির প্রথম ছত্র এইরূপ :—(ক) 'মরি কি সাধের উপবন। ফুটেছে মাণিক হীরে চুরি করে মন॥' (খ) 'জান না কেমন ফুল-শর, হৃদয় পরে বাজ্‌লে পরে কাঁপে কলেবর।' (গ) 'দেখ্‌ব উঠে কমল কোথা যায়, এখনি ফেল্‌ব কেটে আয় লো ছুটে আয়।' (ঘ) 'সাগর কূলে বসিয়া বিরলে, হেরিব লহর-মালা।' (ঙ) 'যদি কেউ যত্ন করে, রত্নমালা দিই গো তারে।'

মলিনা-বিকাশ

মলিনা-বিকাশ নাটিকাটি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ সটার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এই নাটিকাখানিতে নাটিকার আসলরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। গিরিশচন্দ্র নাটকের ন্যায় নাটিকা-গঠনেও যে নিপুণ ছিলেন তাহার আদর্শ জন সাধারণকে এই প্রথম দেখাইতে পারিলেন। ইহার সংগীতগুলি বড়ই মধুর। এককালে এগুলি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে গীত হইত; যেগুলি সম্যক্ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল সেগুলির প্রথম ছত্র এখানে উদ্ধৃত হইল :—(ক) 'পাখি তোর পেলে মধুর স্বর.' (খ) 'মরি কে রমণী বিপিনবাসিনী' (গ) 'মনের কথা মন কি জানে সই', (ঘ) 'যদি ঐ মনোমোহিনী পাই,' (ঙ) 'কি জানি পারি কি হারি,' (চ) 'ভালবাসি বিভূতি তোমায়,' (ছ) 'কে তুমি রমণী সেজেছ যোগিনী,' (জ) 'হৃদয়-মাঝারে

প্রতিমা বিহরে,' (ঝ) 'দেখ্‌লে তারে আপন-হারা হই,' (ঞ) 'ওলো সই তুই তো একা নয়,' (ট) 'মন কেড়ে নে দেখ গো পালায়,' (ঠ) 'প্রাণে প্রাণে ফুলের ডোরে বাঁধলে ফুল-শর।' নাটিকার মধ্যে যমল গান (duet) গিরিশচন্দ্র এই নাটিকায় প্রথম সৃষ্টি করিলেন।

মহাপূজা

এখানি উদ্দেশ্যমূলক কাব্য। নাট্যাকারে গ্রথিত হইলেও ইহার মধ্যে নাট্য-বীজ নাই। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্‌টার থিয়েটারে ইহা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন সম্বন্ধীয় রূপক।

আবুহোসেন

আবুহোসেন নাটিকাখানি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ তারিখে বীডন্ স্‌ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। বোগ্‌দাদের খলিফ্‌ হারুণ-উল্‌-রশিদের প্রসিদ্ধ গল্প অবলম্বন করিয়া এই নাটিকাটি রচিত হইয়াছে। ইহার রচনা রীতি বড়ই সুন্দর। গানগুলি যেমন সৌন্দর্যগুণে প্রাণের উৎস খুলিয়া দেয়, সংলাপগুলিও সেইরূপ ঐ গানের ছন্দেই নৃত্য করিতে থাকে। ইহাই এ নাটিকার বৈশিষ্ট্য। কৌতুক-নাট্য বলিয়া ইহার কৌতুকগুলি বড়ই ফুটন্ত। নাটিকাকার সংগীতগুলির ভাষা কোনটা বাঙ্গালা, কোনটা হিন্দী, উর্দু ও ফারসী শব্দে মিশ্রিত করিয়া রচনা করিয়াছেন। এগুলি সুর-তান-লয়ে যখন গীত হইতে থাকে তখন আবুহোসেনের ভাষায় বলিতে যাইলে 'পরী-সাক্তোন' কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এ গানগুলির এমনই প্রভাব যে বাঙ্গালার সর্বত্র এমন কি উত্তর-পশ্চিম ও বিহার প্রদেশের বহুস্থানে আজও তাহারা গীত হইতে শুনা যায়। যমল সংগীতের আরম্ভ 'মলিনা-বিকাশে' দেখা দিলেও এই নাটিকার মধ্যে উহার মূর্ত-প্রকাশ নৃত্যের সহিত স্থানলাভ করিয়াছে। সংগীতের আধিক্য-বশতঃ উদ্ধৃতির উপায় নাই, কারণ ঐগুলি এতই সুন্দর যে বাছাই চলে না।

স্বপ্নের ফুল

স্বপ্নের ফুল নাটিকাখানি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর তারিখে বীডন্ স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি প্রতীক-জাতীয় নাটিকা (symbolic), এ বিভাগেও গিরিশচন্দ্র পথিকৃৎ ছিলেন। যৌন-প্রেমে মানুষের মনের ভিতরে যে সকল অবস্থার উদয় হয় সেগুলিকে ধীর, অধীর, মনহারা, মন-খরা, বেলা, যুঁথি প্রভৃতি নাম দিয়া পৃথক-পৃথক চরিত্রে রূপায়িত করা হইয়াছে। সাধ মিটাইয়া ফেলা প্রেম নহে। প্রেম কি বস্তু তাহা ঐ নাটিকার বেলা চরিত্র এইরূপে বলিয়াছে :—"স্বামীর জন্যে ছেলের আদর, সে ছেলের জন্যে স্বামী পর হয়। তোমার বন্ধুর জন্যে তোমার আদর, তোমার জন্যে তোমার বন্ধু পর। পুরুষ হয়ে কি এ কথা বুঝবে? বুঝ্‌বে না। তোমার সন্তানকে স্তন দিচ্ছে, তোমার কাছে আস্‌তে দেরি হচ্ছে, তোমার সয় না। এ কথা তোমার বোঝ্‌বার নয়!" "প্রেম আত্ম-বিসর্জনে—আত্মপোষণে নহে!" ধীর চরিত্রের সহিত মনহারার সর্বশেষ সংলাপটিতে এই নাটিকার অন্তর্নিহিত রহস্যটি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সেটি এই :—"ধীর—'যে আমায় প্রসব করেছে, সে জগৎ প্রসব করেছে, তার পা আজ আমি প্রেমে ধল্লেম,

দেখিস, পায়ে আর ঠেলিস্ নি।" "মন-হারা—'দেখ্‌লি, কেমন মোহের কাঁটা প্রেমের কাঁটা দে উঠে গেল, এখন দুটোই ফেলে দে। চল্, ভোর হলো, অরুণোদয় হয়েছে, আর ত স্বপ্ন নেই।" জীবন্মুক্তির পূর্বাবস্থা এইরূপেই সংঘটিত হয়। অনধিকারীর ইহা বুঝা কঠিন।

ইহার সংগীতগুলি নাটিকাগত উদ্দেশ্যের পরিপোষক-ভাবে রচিত ও গীত হইয়াছে, মাত্র শেষ সংগীতটি উদ্ধৃত হইল:—'দুটো কাঁটা ফেলে দে দেখ্, সেই সেই সেই রে। দেখ্ খুঁজে পেতে, আর কি পাবি, আমি ত নেই রে॥ থেমেছে ঢেউ, নাইক আর কেউ, জলে মিশাল ঢেউ, কই কই নাই ত কেউ, হেতা আমি নেই, তুমি নেই, সেই সেই সেই এই।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উপদেশ ইহাতে অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। অধ্যাত্ম-তত্ত্বে জানা যায় যে দেহের মধ্যে মানুষের মন নাই—মনের মধ্যে দেহ আছে। মনেরই কতকটা অংশ ঘনীভূত হইয়া এই স্থূল দেহের আকার ধরিয়াছে। দর্শনশাস্ত্রেও বলে মনোময় কোষের মধ্যে প্রাণময় কোষ এবং তাহারই অভ্যন্তরে অন্নময় কোষ বা স্থূল দেহ। ভাব মনেরই ধর্ম।

ফণীর মণি

ফণীর মণি নাটিকাখানি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে বীডন্ স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশের প্রচলিত রূপকথা হইতে ইহার গল্পাংশ গৃহীত। রূপকথার প্রহেলিকা নাটিকাকারের রচনা কৌশলে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়াছে। নাটিকার প্রাণময় সংগীতগুলি এককালে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে-মুখে ফিরিত। স্থানাভাবে ঐগুলির প্রথম ছত্রমাত্র উদ্ধৃত হইল:—(১) 'পুকুর পাড়ে লতা কেনে ফোঁস্-ফোঁসালি' (২) 'তুলে ফুল সোহাগ ক'রে পরবো লো খোঁপায়। বেড়াব হাওয়ার মত ফুর্-ফুরে হাওয়ায়' (৩) 'এনেছি ভাতার-ধরা ফাঁদ, তোরে ধরে দিব সোনার চাঁদ' (৪) 'কেনে বনে এলি, মোর মন ভুলালি' (৫) 'এলো বর দেখ লো দিগম্বর, মুচ্‌কে হেসে তোর পানে চায় কর্‌বে নিয়ে ঘর' (৬) 'ফুরুল রূপকথাটি মুড়ল নোটে।'

হীরক জুবিলী

হীরক জুবিলী নাটিকাখানি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। মহারাণী কুইন্ ভিক্টোরিয়ার ৬০ বর্ষ রাজত্বকাল পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার হীরক জুবিলী বৃটীশ-রাজত্বের সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার নাট্যালয় হইতে মহারাণীর প্রতি ভক্তি-অর্ঘ্য এই নাটিকার মধ্য দিয়া প্রদত্ত হইয়াছিল। তাগিদে সৃষ্ট হওয়ায় ইহার নাটিকাগত মূল্য কিছু ছিল না।

পারস্য-প্রসূন

পারস্য-প্রসূন নাটিকাখানি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাটিকাকার পারস্য উপন্যাসের গল্পকে ভিত্তি করিয়া ইহার নাট্যরূপ দিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক Epicurus এর অনুবর্তীদিগের মত ছিল যে "Happiness or enjoyment is the summum-bonum of life," চার্বাক ঋষি ইহার সমার্থক কথা সংস্কৃতে এইরূপে বলিয়াছেন:—'যাবৎ জীবেদ্ সুখং জীবেদ্, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' নাটিকার নায়ক

নুরুউদ্দীন উপরি-উক্তভাবে তাঁহার বাল্য ও কৈশোর জীবন অতিবাহিত করিয়া পারস্যদেশীয় দাস-বালিকা পারিসানাকে বিবাহ করিবার পর কিরূপে তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল তাহার কাহিনীটি এই নাটিকার উপজীব্য হইয়াছে। বহুল পরিমাণে উপকৃত বন্ধুবর্গের কৃতঘ্নতা নুরুউদ্দীনের জীবনের গতি ফিরাইবার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

বোগ্‌দাদের খলিফ্‌ হারুন্‌-উল্‌-রসিদ ছদ্মবেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া নিজ চক্ষে প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। এই নাটিকার মধ্যে তাঁহার চরিত্রের সেই দিক্‌টা প্রদর্শিত হইয়াছে। এ মিলনান্ত নাটিকার বিশেষত্ব এই যে, জিঘাংসা বা প্রতিহিংসা দ্বারা নায়ক-নায়িকার মিলন আদৌ কলুষিত হয় নাই। নুরুউদ্দীনের চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের তুলিকায় অপূর্ব হইয়াছে। প্রাণহীন দাস-বালিকা পারিসানা আদর্শ প্রেমিকের সংস্পর্শে আসিয়া আদর্শ প্রেমিকায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। নাটিকাকার এমনি কৌশলে ঘটনার সংঘাত আনিয়াছেন যে নাট্যক্রিয়ার গতি কোথাও ব্যাহত হয় নাই।

ইহার সংগীতগুলি বিশেষ ভাবপূর্ণ। স্থানাভাবে কতকগুলির প্রথম ছত্র এখানে উদ্ধৃত হইল :— (ক) 'বিস্তার মেদিনী, মানব-বেদনা তুমি বুঝ কি মা শ্যামাঙ্গিনী' (খ) 'কাল কি হবে, আজকে ভেবে কি হবে' (গ) 'জানি না জীবনে আমি কার' (ঘ) 'সে দিয়েছে নবীন জীবন, প্রভেদ কেবল দেহে, প্রাণে রয়েছে বন্ধন' (ঙ) 'অন্তে তব কিঙ্করে রেখো জ্যোতির্ময় রাজীব চরণে।'

দেলদার

দেলদার নাটিকাখানি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে বীডন্‌ স্ট্রীটস্থ ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক রূপক। নাট্যকবি এই দুনিয়াকে শখের বাজারের পরিকল্পনা দিয়াছেন ; এই বাজারে ঢুকিয়া মানুষের মন চোখের 'নেশায়' পড়িয়া মনে মনে যে 'পিয়াসার' সৃষ্টি করে, তাহা 'গহন' বনের পাকদণ্ডী-পথে ঘুরপাক খাইতে খাইতে কোন প্রাণবন্ত 'দেলদারের' সংস্পর্শে আসিয়া অভিমান-শূন্য সরল মনে ভালবাসিতে শিক্ষা করে এবং তখনই মানুষের প্রাণে প্রেমের প্রবাহ অজস্র ধারায় প্রবাহিত হইয়া যায়। সরল প্রাণে 'রেখা'শূন্য মনে বিশ্বপ্রেমের পসরা লইয়া সেই ব্যষ্টি-মানুষ সমষ্টির প্রেমে মশ্‌গুল্‌ হইয়া উঠে।

গিরিশচন্দ্র এই নাটিকার মধ্যে উপরিউক্ত তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপরি-লিখিত উদ্ধারচিহ্ন-যুক্ত পদগুলি নাটকীয় চরিত্রে রূপায়িত হইয়াছে। 'গিরিশচন্দ্র' প্রণেতা অবিনাশবাবু বলিয়াছেন—"ভাবসঙ্গিনী ও স্বরসঙ্গিনীগণ গিরিশচন্দ্রের এই গীতিনাট্যে নূতন সৃষ্টি। মনের ভাব ও প্রাণের কথা যেন মূর্তিমতী হইয়া ইহাদের সংগীতের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। গ্রীক কোরাসের কাজ কতকটা ইহাদের দ্বারা পূর্ণ হয়।" দেলদারের প্রথম সংগীতের মধ্যে নাটিকার তত্ত্বগত-ব্যাখ্যা (Exposition) আছে, স্থানাভাবে উক্তগানের প্রথম অংশটি লিখিত হইল :—"করেছি সাধের বাগান শখ, ক'রে, হেথা নেশাকাটে, পিয়াস মিটে, আমোদ ছোটে তর্‌তরে। হেথায় পাতায়-পাতায় ফুলে-ফুলে দেখে যে খেলা, তার যায় মনের মলা, হেথা ভালবাসায় ভাসিয়ে নে যায় গুমোর-ছলা।" অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি নাটিকার মধ্যে সম্পূর্ণ সংগীতটি দেখিয়া লইবেন। মনের যে অবস্থা দ্বারা প্রাণের বিস্তৃতি ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় নাটিকাকার দেলদার ও স্বরসঙ্গিনীগণের নিম্নলিখিত গানের মধ্যে তাহা

প্রকাশিত করিয়াছেন। সংগীতটি আংশিক উদ্ধৃত হইল :—"অভিমান তার সাজে যে রাখ্‌তে জানে মান। তাপে নয় যায় শুকিয়ে ফুলধরা বাগান॥ না জানি কেমন মনের কান, নারে ছাড়্‌তে অভিমান। মনের ছলে আগুন জেলে প্রাণ করে শ্মশান॥" এই নাটিকাখানি অভিনয়-কালে বেশ নাম কিনিয়াছিল। এখানি প্রতীক জাতীয় নাটিকা (symbolistic)।✓

মণিহরণ

মণিহরণ নাটিকাখানি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই তারিখে বীডন্ স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। জাম্ববতীর বিবাহ বা স্যমন্তকমণি উদ্ধার—এই পৌরাণিক আখ্যায়িকার উপর ভিত্তি করিয়া নাটিকাখানি রূপ গ্রহণ করিযাছে। কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নাই ; পরবর্তী-কালে এই গল্পাংশ লইয়া দুইখানি আধুনিক দৃশ্যকাব্য রচিত হইয়াছে।

নন্দ-দুলাল

নন্দদুলাল নাটিকাখানি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অগস্ট তারিখে বীডন্ স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলা ইহাতে মূর্ত হইয়াছে। এই নাটিকার বিশেষত্বের মধ্যে ইহার দুইখানি গান আজও কীর্তনীয়াদের মুখে শুনা গিয়া থাকে :—(ক) "পীরিতি জানে না, তারে প্রাণ দিলি, কেমন পীরিতি এ লো? শ্যামের পীরিতে মজেনি স্বজনি, ব্রজে আছে হেন কে লো?" (খ) "পীরিতি নগরে বসতি স্বজনি, পীরিতে গঠিত অঙ্গ। দিবানিশি সই হৃদে প্রবাহিত পীরিতেরই তরঙ্গ॥ পীরিতি নয়নে, পীরিতি বদনে, পীরিতি প্রাণে-মনে, মজিব ভজিব, জ্বলিব স্বজনি, পীরিতি-সুখ-দহনে ; শ্যামের পীরিতি, নাহি জান রীতি, বিমোহিত অনঙ্গ, ওলো রসবতী, শ্যামের পীরিতি, অনঙ্গ মান-ভঙ্গ।" কীর্তন-উপযোগী বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত গিরিশচন্দ্র বিরচিত সংগীতের এইরূপ অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখিবার ও ভাবিবার জিনিস।

অশ্রুধারা

অশ্রুধারা একখানি ক্ষুদ্র রূপক-নাটিকা। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গারোহণে এখানি ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি তারিখে বীডন্ স্ট্রীটস্থ ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহা উদ্দেশ্যাত্মক, নাট্যগুণ বিশেষ কিছু নাই।

অভিশাপ

অভিশাপ নাটিকাখানি পৌরাণিক, ইহার গল্পাংশ অদ্ভুত রামায়ণ হইতে গৃহীত। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে এই নাটিকাখানি বীডনস্ট্রীটস্থ ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। অম্বরীষ রাজার ঋষিশাপ হইতে মুক্তিলাভ এবং 'অদ্ভুত রামায়ণের' নির্দেশানুসারে রামাবতারের কারণ এই নাটিকায় দেখানো হইয়াছে। এই নাটিকার গূঢ়-রহস্য এই যে, ঋষিই হোন্, আর সাধারণ মানুষই হোক্ মহামায়ার সংসারে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় লইয়াই থাকিতে হয়। মহামায়াই অবিদ্যারূপে রমণী এবং জ্ঞানরূপে জননী। এই উভয়রূপে তাঁহার পূজা না করিলে—রমণী-জননী জ্ঞান না হইলে তাঁহার মায়া কেহ অতিক্রম করিতে পারেন না।

অভিশাপের সংগীতগুলি বেশ নাম কিনিয়াছিল। বাহুল্যভয়ে ঐগুলির প্রথম ছত্র উদ্ধৃত হইল :—(ক) 'আমি মজিয়েছি সংসার, তোমার মত কত শত গেছে ছারে খার॥' (খ) 'হেম বসনে, নেহার গগনে, হাসে উষা বিনোদিনী' (গ) 'প্রেমের বাগানে আমি সদাই দি' সাঁতার, এক ডুবে হই এপার আর ওপার।' (ঘ) 'কিবা সুন্দর হৃদিপর বিহরে, মন সতত বিমন কেন শিহরে' (ঙ) 'গঙ্গাফেন জটাজুট-শোভিত, বিভূতি-ছাদিত, ফণিহার ভূষিত, রজত-মধুর হাসি অধরে' (চ) 'মালা শুকাল সইলো সে তো এলো না; ছলে ভুলাতে জানে লো ভাল ললনা।' (ছ) 'নব দূর্ব্বাদল সুবিমল উজ্জ্বল' (জ) 'অভিমানে সৃজন ভুবন অভিমানের এ মেলা' (ঝ) 'আমি সারদা বরদা বাগ্‌বাদিনী।' নাটিকার আসল রূপ নাচ-গানে ইহা নূতন ভাবের বন্যা বহাইয়াছিল।

শান্তি

শান্তি নাটিকাটি বুয়র-সমর সংক্রান্ত রূপক। এখানি ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। বুয়র-সমর-ক্লিষ্ট নরনারী কিরূপে ইংরাজের সহিত সন্ধি স্থাপিত করিয়া দেশে শান্তি ফিরাইয়া আনিল, এ রূপকে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। নাটিকা আকারে গ্রথিত হইলেও নাট্যবীজ ইহার মধ্যে নাই।

হর-গৌরী

হর-গৌরী নাটিকাখানি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহার গল্পাংশ রামেশ্বরের শিবায়ন হইতে সংগৃহীত। ঐ গল্পাংশের ভিতর দিয়া মানব-সভ্যতার অভিব্যক্তির (evolution) ধারা দেখাইয়া নাটিকাকার ইহাতে নূতনত্ব আনিয়াছেন। আদিম যুগ হইতে সভ্যযুগের ক্রমবিকাশ কিরূপে সংঘটিত হইয়াছিল তাহার ইঙ্গিত ইহাতে পাওয়া যায়। সৃষ্টিতত্ত্বের গোড়ার কথা এই, যে নির্গুণ ব্রহ্মে গুণারোপ করিয়া সগুণব্রহ্ম-দ্বারা সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। নাটিকাকার দেখাইয়াছেন যে ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর 'তিনে এক এবং একে তিন' হইয়া জাগতিক লীলা সম্পন্ন করিতেছেন। শিব জগৎগুরু বলিয়া সমুদয় জাগতিক ব্যাপারই প্রকৃতি-পুরুষের খেলা। হর-গৌরী ঐ প্রকৃতি-পুরুষের আদর্শ প্রতীক। শাঁখারী-বেশী শিব তাই নাটিকার মধ্যে ঐ তত্ত্বেরই ব্যাখায় গাহিয়াছেন :—"শাঁখা চাই! তিনটি ভাই একই ধারা, কারো কসুর নাই" ইত্যাদি। সংসার-চিত্র দেখাইতে হইবে বলিয়া ঐ গানের মধ্যে কেবলমাত্র তাঁহাদের প্রাকৃত ভাব দেওয়া হইয়াছে, অপ্রাকৃতের কোন সংবাদ ইহার মধ্যে নাই। যৌন আকর্ষণে সংসার-ক্ষেত্রে নরনারীকে বাঁধিবার জন্য নাটিকার মধ্যে এইরূপ কৌশল (technique) করা হইয়াছে।

নাটিকাকার আরও দেখাইয়াছেন যে, জীবসৃষ্টির আদিযুগে মানুষ বন্যজন্তুর মতো বনে বাস করিত ও বল্কল পরিত। শিকার-লব্ধ পশুমাংস তাহার আহার ছিল। ঐতিহাসিকেরা মৃগয়া ও যাযাবর যুগ (Hunting and nomadic age) নামে ইহার নামকরণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় যুগের নাম কৃষিযুগ (Agricultural age), এ যুগে হর-গৌরীর আদর্শে নরনারী চাষ-বাস করিয়া গৃহী হইতে শিখিল। গৃহবাসীকে গার্হস্থ্যধর্ম শিখাইবার ভার লইলেন হর ও গৌরী। তাই সুবিজ্ঞ নাটিকাকার হর-গৌরীর গার্হস্থ্যভাব এই নাটিকার মধ্যে দেখাইয়াছেন, দেবভাব এ ক্ষেত্রে অবান্তর রহিয়া গেল। তৎপরে আসিল শিল্প-যুগ (Artistic age), ইহার প্রবর্তকও ঐ শাঁখারীরূপী হর।

মানুষ মৃগয়া ছাড়িয়া কৃষিজীবন আরম্ভ করিলে কৃষিলব্ধ শস্য তাহার প্রধান জীবিকা দাঁড়াইল। ঢেঁকী-যন্ত্রই তখন মানুষের প্রধান অবলম্বনীয় হইয়া উঠিল, তজ্জন্য নাটিকাকার—"আজ ঢেঁকী সেজেছ চমৎকার! আ মরি আঁকসলিধারী, ঝিঙের ঝুঁটির কি বাহার!" শীর্ষক গানখানি দ্বারা কৃষক সম্প্রদায়ের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। কৃষিজীবীর পক্ষে ষড়-ঋতুর জ্ঞান থাকা আবশ্যক তাই নাটিকাকার গৌরীর মুখে—"ভোলা ভুলে কোথা রহিল! মাঘে অনুরাগে মেঘ বরষিল, ফাগুন আগুন মলয় বহিল" শীর্ষক গানের মধ্যে ষড়ঋতুর পরিচয় দিলেন। প্রাকৃতিক বর্ণনা হিসাবে দিক-চক্রবালে শস্যপূর্ণক্ষেত্রের সহিত আকাশ ও সমুদ্রের মিলন সম্বন্ধীয় গানটিও বেশ উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে। ইহার প্রথম ছত্রটি এইরূপ :—"নির্ম্মল শ্যামল নীল গগনে মিলে। নীল তরঙ্গিত ধীর অনিলে। রাশি-রাশি নয়নবিলাসী নীলরাজি দুলে-হিলে।" আধুনিককালের ঋতুমঙ্গল সংগীতগুলি সৃষ্ট হইবার বহু পূর্বে গিরিশচন্দ্র এ বিষয়ের পরিকল্পনা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ঋতু-উৎসবেরও তিনি অগ্রদূত ছিলেন।

কন্যা-জামাতার প্রতি প্রীতি ও অনুরাগ গৃহীরাই দেখাইয়া থাকেন, তাই নাটিকাকার নাটিকার মধ্যে নিম্নলিখিত আগমনী-গানগুলি দিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে ঐগুলির প্রথম ছত্র-মাত্র উদ্ধৃত হইল :—(ক) "আমার উমা এলো ব'লে! পাগলিনী গিরিরাণী চলে আকুল কুন্তলে! মা এলো, মা এলো সাড়া পড়িল নগরে।" (খ) "এসেছিস্ মা থাক্ না উমা দিন কত! হয়েছিস্ ডাগোর-ডোগর কিসের এখন ভয় এত!" (গ) "জামাই না কি শ্মশানবাসী শুন্‌তে পাই। আমি ভেবে সারা, বল্ মা তারা, সত্যি কি না শুধাই তাই।" এই গানগুলি আজও ভিখারীর মুখে প্রতি বর্ষে শারদোৎসবের পূর্বে শুনিতে পাওয়া যায়। এখানি গিরিশচন্দ্রের সার্থক নাটিকা।

বাসর

বাসর নাটিকাখানি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে বীডন্ স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধীয় এক উপকথা অবলম্বন করিয়া এখানি রচিত হইয়াছে। নাট্যকার ইহাকে আর্যরাজ-মহিমা-কীর্তিত গীতপ্রধান নাটক বলিয়াছেন, তাই আমরা ইহাকে নাটিকাশ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছি। শক, হূন প্রভৃতি বিদেশীয় রাজগণের দ্বারা প্রপীড়িত ভারতবর্ষ বিক্রমাদিত্যের শাসনাধীনে আসিয়া তাহার চিরন্তন হিন্দু-সংস্কৃতি কিরূপে পুনরুদ্ধৃত করিয়াছিল তাহার চিত্র ইহার বর্ণিতব্য বিষয়। বিষাদে পরিণত এক বিবাহ-বাসর নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া মিলন-বাসরে কিরূপে পরিণত হইল তাহার কৌতুকপ্রদ ঘটনায় এখানি পূর্ণ। ইহার গদ্যভাষায় গিরিশচন্দ্র এক নূতন রূপ দিয়াছেন। গানগুলি নানা বৈচিত্র্যে পূর্ণ ও অপূর্ব। ইহার চরিত্রগুলির মধ্যে নূতন জাতিরূপ (type) প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাই এ নাটিকার বৈশিষ্ট্য। গিরিশচন্দ্রের নাটিকাবিভাগের আলোচনা এইখানে শেষ হইল।

প্রহসন বিভাগ

অতঃপর প্রহসনবিভাগে প্রবেশ করিয়া গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব অনুসন্ধান করা যাক্।

যামিনী চন্দ্রমাহীনা বা গোপন চুম্বন

এই রঙ্গনাট্যখানি গিরিশচন্দ্রের প্রহসনবিভাগের সর্বপ্রথম রচনা। শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৩৫২ সনের চৈত্র-সংখ্যা, বঙ্গশ্রীতে ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া সাধারণের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। কোন স্ত্রীলোকের গুপ্ত ব্যভিচারের কৌতুকপ্রদ চিত্র ইহাতে আছে, ইহার রচনায় কোন নাট্যকৌশল দেখা যায় নাই। ইহার প্রকাশকাল ৬ই জুলাই ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ, এবং উহারই কাছা-কাছি সময়ে ন্যাশানল থিয়েটারে ইহা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ঠিক তারিখ সংগৃহীত হয় নাই।

ভোটমঙ্গল

এ বিভাগের দ্বিতীয় দান—ভোটমঙ্গল ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তারিখে প্রতাপ জহুরী ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। মিউনিসিপ্যাল স্বায়ত্ত-শাসনের প্রথম নমুনা ভোটদ্বারার কমিশনার নির্বাচনব্যাপারে যে অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার ব্যঙ্গ-চিত্র ইহার মধ্যে আছে। ইহার অপর নাম সজীব পুতুল-নাচ। ব্যঙ্গ তীব্র না হওয়ায় ইহাতে নূতনত্ব কিছু পাওয়া গেল না।

বেল্লিক বাজার

বেল্লিকবাজার ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে বীডন্ স্ট্রীটস্থ গুর্মুখ রায়ের স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহা একটি সামাজিক নক্সা। ইওরোপীয় সভ্যতার কুরুচি কলিকাতার সামাজিক জীবনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমে কতকগুলি বেল্লিকের সৃষ্টি করিয়াছিল। বেল্লিকদের সজীব চিত্রগুলি প্রহসনোক্ত ধনীর সন্তান, ডাক্তার, উকিল, দালাল, শ্মশানঘাটের রেজিস্ট্রার, পুরোহিত, ধনীসন্তানের পিসী প্রভৃতি চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়া প্রহসনকারের বেল্লিকবাজার রচনার সার্থকতা করিয়াছিল।

এই প্রহসনের অভিনয়কালে কলিকাতা-সমাজে বিশেষ সাড়া পড়িয়াছিল। মাইকেল ও দীনবন্ধুর পর গিরিশচন্দ্রই প্রথমে সাধারণ রঙ্গালয়ের পক্ষ হইতে এই জাতীয় প্রহসনের আদর্শ স্থাপিত করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের ভাষায় বলিতে হইলে এই বলিলেই চলিবে যে, "ইঙ্গরুচি আমাদিগের মজ্জায়-মজ্জায় প্রবেশ করিয়া নীতি-প্রীতির মুল উল্টাইয়া আমাদিগকে পদে পদে পেষণ করিতেছে, পদে পদে স্বার্থের দায় ভদ্রাচারে জলাঞ্জলি দিতেছে, তাহা ইহাতে একরকম চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখান হইয়াছে।" ইহার ভাষা ও রচনা প্রণালীতে দক্ষতার বিশেষ পরিচয় আছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংগীতের বৈশিষ্ট্য বা কথোপকথনের ধারা এই প্রহসনের মধ্যে বিশিষ্ট রূপ লইয়াছে।

সপ্তমীতে বিসর্জন

সপ্তমীতে বিসর্জন প্রহসনটি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তারিখে বীডনস্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি তৎকালীন সমাজের এক উৎকট ভাব (Extravagance)

লইয়া সৃষ্ট হইয়াছে। শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে বারবনিতার গৃহে বসিয়া তদানীন্তন কালের মাতাল-সামাজিকগণের মাতলামির একটি চিত্র ইহাতে আছে। দেবীপূজা লইয়া এইরূপ কুৎসিত আমোদ-প্রমোদ সমাজের বাহিরে কোন নিভৃত স্থানে অনুষ্ঠিত হইলেও রঙ্গমঞ্চের দর্শক-সাধারণ ইহাতে আমোদের পরিবর্তে ঘৃণা ও নিরানন্দই উপভোগ করিয়াছেন। এটি গিরিশচন্দ্রের সুনাম রক্ষা করিতে পারে নাই।

বড়দিনের বখশিশ্

বড়দিনের বকশিশ্ প্রহসনটি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানিও উৎকটভাবমূলক প্রহসন। অভিনয়কালে রঙ্গমঞ্চের উপর এই সামাজিক দর্পণ-খানি খাড়া হইয়া তথাকথিত সভ্যতার চাঁইদের মুখ ইহাতে প্রতিবিম্বিত করিয়াছিল।

সভ্যতার পাণ্ডা

সভ্যতার পাণ্ডা প্রহসনটি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানিও উৎকট সামাজিক ভাব লইয়া রচিত। কবি যে ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা, তাহার পরিচয় ইহার মধ্যে আছে। নব পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাবী বিকৃত রূপ প্রহসনকার নিপুণ তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন। অতিশয়োক্তি থাকিলেও তাহা বেশ উপভোগের সামগ্রী হইয়াছিল। আধুনিক ঋতু-মঙ্গল গানের অগ্রদূত হইয়া গিরিশচন্দ্র এই প্রহসনের মধ্যে ষড়-ঋতুর গান ও তদনুযায়ী দৃশ্যপটের আয়োজন বহুপূর্বেই করিয়া গিয়াছেন। গানের ভাষা ও ভাব বিষয়ের অনুরূপ হইয়াছিল। প্রহসনের অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গের মধ্যে নব সভ্যতাপ্রিয় নরনারী, গ্রন্থভারাক্রান্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র, হাত-পা-বাঁধা ভীরু ভলান্টিয়ারের চিত্র, লোভী মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের চিত্র, কর্মকাণ্ডের জ্ঞানহীন আধুনিক ভণ্ড পুরোহিত ও ভক্তি-বিশ্বাসহীন যজমানের চিত্র দেওয়া হইয়াছে।

পাঁচ-কনে

পাঁচ-কনে প্রহসনখানি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহার আরম্ভে একটু নূতনত্ব আছে। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি যুগ চতুষ্টয়। তাহাদের দৃশ্যাবলিও পৃথক চারিখানি গানের মধ্যে প্রকটিত হইয়া ঐ-ঐ যুগের ভাব ও ক্রিয়া দেখাইয়াছে। স্বার্থপর সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কারকদের নগ্নরূপ ইহার মধ্যে আছে। অত্যুক্তি লইয়া সৃষ্ট বলিয়া অস্বাভাবিকতার ছায়া স্পষ্ট দেখা যায়। কালাচাঁদের প্রবঞ্চনা-পদ্ধতিটি ধূর্ত জুয়াচোরের বিশিষ্টরূপে রূপায়িত হইয়াছে। ইওরোপীয় মাস্ক (Mask) জাতীয় মুখোস-পরা সামাজিক ও রাজনীতিকদের অনুকরণ ইহার মধ্যে আছে, এবং তাহাই ইহার নূতনত্ব।

আয়না

আয়না নামক সামাজিক নক্সাখানি ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের উপর যে আয়নাখানি স্থাপিত

করিলেন, তাহার মধ্যে যে সকল চিত্র দেখা গিয়াছিল, বিয়ে পাগ্‌লা বুড়োর লাঞ্ছনাই তাহার কেন্দ্রগত চিত্র। ঐ লাঞ্ছনাকে অবলম্বন করিয়া স্রষ্টিধর যেরূপ কৌশলে ব্রজেন্দ্রের সহিত সদাশিব শুঁইয়ের কন্যা কিশোরীর বিবাহ সম্পাদিত করিয়াছিলেন, তাহা সর্বত্র সম্ভবপর না হইলেও, উদার-সামাজিক হিসাবে তাঁহার এ উদ্দেশ্যটি সাধু।

ঐ কৈন্দ্রিক চিত্রের চারিপাশে ইংরাজী বুক্‌নিদার সমাজসংস্কারকদলের, চা-খোরের, অবৈতনিক ড্রামাটিক ক্লাবের ব্যঙ্গ-চিত্রও উঁকি-ঝুঁকি দিয়াছে। এই প্রহসনের অন্তর্গত 'যারা পরাশরের দোহাই দিয়ে দুঃখে কাঁদে বিধবার। কুমারী ঘরে-ঘরে, পার কে করে, ব্যবস্থা কি কর তার॥' শীর্ষক গানখানির মধ্যে বরপণ-প্রথার উপর তীব্র কশাঘাতের বেদনা সকলেই ভোগ করিয়াছিলেন। এই প্রহসনের ব্রজেন্দ্র চরিত্রের সহিত 'বলিদান নাটকের' কিশোর চরিত্রের বিশ্ববিদ্যালয়গত বিদ্যা-গৌরবের সাদৃশ্য থাকিলেও, বিষয়ভেদে চরিত্রগত পার্থক্য যথেষ্ট দেখা গিয়াছে।

য্যায়সা-কা-ত্যায়সা

এই প্রহসনখানি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ফরাসী নাট্যকার মলেয়ারের গ্রন্থ অবলম্বনে এই প্রহসনখানি রচিত। অভিনয়কালে এখানি বেশ নাম কিনিয়াছিল। এরূপ দক্ষতার সহিত প্রহসনকার মলেয়ারের কৌশলকে (technique) আত্মস্থ করিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্যের গন্ধ কোথাও বিকীর্ণ হয় নাই। অর্থসমস্যার দিনে বঙ্গীয় মহিলাদের যৌবনকালোচিত বেদনার তাড়নায় বিবাহের লজ্জাকর পরিণতি এবং কন্যাকে পর করিতে হইবে বলিয়া অর্থপ্রিয় পিতার হাস্যকর প্রতিক্রিয়া দেখাইয়া গিরিশবাবু প্রহসনের হাল্কা আবহাওয়ার মধ্যে বাঙ্গালা দেশের আর একটি সমস্যার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া গেলেন। ইহার কোন কোন সংগীতে ও রসিকতায় নূতন রসের আস্বাদন আছে। এই কয়খানি লইয়া গিরিশচন্দ্রের প্রহসন বিভাগের এবং সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাহিত্যের আলোচনা শেষ হইল।

গিরিশচন্দ্রের কালে নাট্য-সাহিত্যের লাভালাভ

গিরিশচন্দ্রের কালই নাট্য-সাহিত্যের গৌরবময় কাল। তাঁহার দৃশ্যকাব্যের দোষ-গুণ সেই-সেই কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে, সুতরাং এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গিরিশচন্দ্রের সমকালীন যে সকল নাট্যকার নাট্যসাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত ছিলেন, তাঁহাদের দৃশ্যকাব্যের আলোচনাও পৃথক অধ্যায়ে করা হইবে।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার দৃশ্যকাব্যে গদ্য, মিত্রাক্ষর, অমিত্রাক্ষর পদ্য, চলিতকথা, তাঁহার বিশিষ্ট আভিনয়িক গৈরিশ-ছন্দ এবং প্রাদেশিক ভাষা প্রয়োজন মতো ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। ভাষাকে অভিনয়োপযোগী করিবার নিমিত্ত মাইকেলী চৌদ্দ-অক্ষর সমন্বিত অমিত্রাক্ষরকে ভাঙ্গিয়া অভিনেতাদের স্বচ্ছন্দ উচ্চারণ-সৌকর্যার্থ তাহাতে যতি বসাইয়া উচ্চারণ-ভেদে হ্রস্ব-দীর্ঘ ও প্লুত স্বরদ্বারা নাটক লিখিবার যে নূতন ছন্দ রূপায়িত করিয়াছিলেন, তাহাই 'গৈরিশ' ছন্দ নামে পরবর্ত্তীকালে খ্যাত হইয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় কালিপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় ইহার প্রবর্ত্তক ছিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রই ইহার সৌন্দর্যবিধান ও পুষ্টিসাধন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারই নামে এই ছন্দের নামকরণ হইয়াছে।

এই ছন্দের পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটা ইতিহাস আছে। রঙ্গালয়ে প্রথম যুগে অভিনয়োপযোগী ভাল নাটক পাওয়া যাইত না। গিরিশচন্দ্র তখন মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যকে নাটকে পরিবর্তিত করিয়া স্বয়ং এক সঙ্গে রাম ও মেঘনাদের পৃথক ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া এক অভূতপূর্ব অভিনয় করিয়াছিলেন। যাঁহারা সে অভিনয় দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা আজও সে চিত্র ভুলিতে পারেন নাই। অভিনয়কালে যেখানে যতি ও জোরের প্রয়োজন, সেখানে যথাক্রমে যতি ও জোর দিয়া মাইকেলি অমিত্রাক্ষর ভাঙ্গিয়া অভিনেতাদের যেরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইরূপ পরিকল্পনা অনুযায়ী নূতন ছন্দ গড়িয়া তিনি তাঁহার নাটকগুলি রচনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রতি পংক্তিতে অক্ষরের সমতা নাই, যেখানে মিলন হইলে শ্রুতিমধুর হয়, সেখানে মাঝে মাঝে মিলও রাখিয়াছেন।

এইখানেই 'মেঘনাদ বধের' নাট্যীকরণের ইতিহাস দেওয়া গেল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'মেঘনাদ বধ' নাটকের প্রথমাভিনয় রজনী। গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটার উঠিয়া যাইবার পর ঐ রঙ্গমঞ্চে ন্যাশানল থিয়েটার নাম দিয়া গিরিশচন্দ্র ঐ তারিখে 'মেঘনাদ বধ' নাটকের যে অভিনয় করেন, তাহার কুশীলবের তালিকা এইরূপ :—অমৃত মিত্র—রাবণ, কেদার চৌধুরী—লক্ষ্মণ, মতিলাল সুর—বিভীষণ, কাদম্বিনী—মন্দোদরী, বিনোদিনী—প্রমীলা, রাম ও মেঘনাদ স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। অভিনয়রাত্রে মহিলা-আসনের চিক্ খুলিয়া পড়ে। এখনকার মতো মহিলাদের আসন তখন তেতলায় ছিল না, দোতলায় থাকিত। অভিনয়টি এমনি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, চিক্ তুলিয়া ধরিয়া আব্রুরক্ষার কথা কাহারও মনে পড়ে নাই।

নাটকখানি সাতটি অঙ্কে ও চৌদ্দখানি গানে সম্পূর্ণ, কিন্তু ক্লাসিক থিয়েটারে ইহা যখন পুনরভিনীত হইয়াছিল, তখন ঐ মঞ্চাধিকারী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার স্বরচিত—'বীর সাজে আজি সাজে' ও 'এত কেন গরব লো তোর' শীর্ষক গান দুইখানি ঐ নাটকে সংযোজিত করিয়া দিয়াছিলেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে যে মেঘনাদ বধ নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, তাহাতে নাটককার রামের ভূমিকা অল্পই দিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের নাট্টীকরণে রামের ভূমিকা যথেষ্টই ছিল, সুতরাং এই নাট্টীকরণের সার্থকতা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রই যশোলাভ করিয়াছিলেন।

(মেঘনাদ বধ নাটকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

সুপণ্ডিত ডাঃ সুকুমার সেন তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে' গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 'ব্রজমোহন রায় এবং রাজকৃষ্ণ রায় গিরিশচন্দ্রের লেখাকে অল্প-স্বল্প প্রভাবিত করিয়াছেন।' কি প্রমাণে তাঁহার মতো বিচক্ষণ গবেষক এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন, তাহা সাধারণের জানিবার অধিকার আছে। ব্রজমোহন রায় যাত্রা-গানের পালাকার ছিলেন এবং তাঁহার গীতাভিনয়ের পালাগুলি আভিনয়িক সাটে অর্থাৎ হাতের লেখা খাতায় লিখিত হইত এবং তাঁহার দলের লোক ব্যতীত অপরের তাহা দেখিবার সুযোগ থাকিত না। ঐ গীতাভিনয়ের পালাগুলি অভিনীত হইবার অন্ততঃ ১০।১২ বৎসর পরে ছাপা হইয়াছিল, সুতরাং গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার লেখা কিরূপে প্রভাবিত করিল, স্থান-বিশেষের উদ্ধৃতি না হইলে অপরের পক্ষে তাহা জানিবার উপায় নাই। আর রাজকৃষ্ণ রায়ের আভিনয়িক ছন্দে রচিত ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহা গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' নাটকের তিন মাস পূর্বে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইবার সংবাদে এরূপ বুঝায় না যে, গিরিশচন্দ্র রাজকৃষ্ণের ছন্দ নকল করিয়াছেন বা ঐ নাটকের কোন ভাব তাঁহার রাবণবধ নাটকে পরিগৃহীত হইয়াছে। 'Great men think alike' এই মতবাদ গ্রহণ করিলে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভাকে হীন করিবার প্রয়োজন হইবে না।

ভাবা সর্বত্রই প্রতিভার অনুগমন করে; প্রতিভাবান্ ব্যক্তি তাহাতে নূতন গতি ও রূপ দেন। ব্যাকরণের সুষ্ঠু প্রয়োগ তাহাতে সর্বদা থাকে না। শেক্সপীয়রের ভাষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যাকরণ ও অভিধানের প্রয়োজন হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের ভাষা কাটা-ছাঁটা ও সংক্ষিপ্ত (terse)। পূর্বাপর সম্বন্ধ (context) না জানিলে স্থানে স্থানে অর্থবোধের ব্যাঘাত ঘটে, কিন্তু সম্বন্ধ বাহির হইলেই মধুর হইয়া উঠে। সরল গদ্যে যেগুলি রচিত, সেগুলি এত সহজবোধ্য যে, বালকেও বুঝিতে পারে। শৌখীন সামাজিকের ভাষার পরিবর্তে বাঙ্গালীর আবেগময়ী ভাষায় দৃশ্যকাব্য রচনা করিয়া জাতীয় কবির আসন গিরিশচন্দ্রই অধিকার করিয়া গিয়াছেন। জাতীয় ভাষা, জাতীয় ভাব ও জাতীয় শিক্ষা-দীক্ষা তাঁহার দৃশ্যকাব্যে যতটা বেশী পাওয়া যায়, অন্য কাহারও দৃশ্যকাব্যে ততটা পাওয়া যায় না।

গিরিশচন্দ্রের দৃশ্যকাব্যের দোষ

তাঁহার দৃশ্যকাব্যের মধ্যে বক্তৃতার অংশ তাঁহার পূর্বগামী নাট্যকারদের অপেক্ষা কম হইলেও, তাহার অবান্তর অংশ তখনও স্থানে স্থানে থাকিয়া গিয়াছে। পরিণত বয়সে গিরিশচন্দ্র এ দোষ ক্রমশঃ পরিহার করিয়া নাট্যকাব্যের নূতন গঠন দিতেছিলেন, কিন্তু সংহাররূপী কাল তাঁহাকে অপসৃত করিয়া কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়া দিল।

গিরিশচন্দ্রের রামায়ণাবলম্বিত দৃশ্যকাব্যে রামের উক্তির মধ্যে 'ভাইরে লক্ষ্মণ!' কিংবা 'ভাইরে লক্ষ্মণ! আন ধনুর্বাণ' বাক্যাংশের পুনঃপুনঃ প্রয়োগ দেখা গিয়াছে। বীরের অস্ত্র বীরের সঙ্গেই থাকে

এবং আবশ্যকমতো ব্যবহৃত হয়, অনুজ সহোদরের নিকট হইতে বারংবার উহা চাহিয়া লওয়া বীরোচিত রীতি নহে।

কতকগুলি বিশিষ্ট প্রয়োগ-বিধি গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, যেমন :—কাঠিন্যের স্থানে 'কঠিন', প্রচারিত স্থানে 'প্রচার', 'ভ্রান্তে বা অভ্রান্তে ধর্ম করিলে গ্রহণ' (কালাপাহাড়), 'জ্ঞানদীপ নির্বাণ হবে', 'পরমপুলক ত্যজি দিব্যলোক' (কালাপাহাড়), 'দেবমায়া ঢাকিবে তোমায়, অদৃশ্য পশিবে রাজা' (নলদময়ন্তী), 'কাঞ্চন-বিহঙ্গম', 'দুঃসময় স্বর্ণকায় কিবা কাজ' (নলদময়ন্তী)।

কতকগুলি বিশিষ্ট যৌগিক শব্দের প্রয়োগও আছে, যেমন :—'অন্ন-পাণি' 'তৃণ-পানি'। ছন্দের খাতিরে মিল রাখা, যেমন :—'কুরঙ্গ-ময়ূরী আসি ধীরি-ধীরি' (নলদময়ন্তী)। দুরান্বয়, যেমন :—'উর্দ্ধশির,—দেখ গিরিবর' (নলদময়ন্তী)। অশুদ্ধ পদের প্রয়োগ, যেমন :—'কুলাঙ্গনা তুমি নাহি পরদৃষ্ট সহে' (পাণ্ডবগৌরব) ; 'নৈবিদ্দ লইল কাড়ি' (চৈতন্যলীলা) ; 'আপনি ধৈর্য্য হউন' (নিমাইসন্ন্যাস) ; 'কৃষ্ণহারা হয়ে আমি কেমন করে ধৈর্য্য হব?' (নিমাইসন্ন্যাস) ; 'বিপদে লোককে কিরূপ ধৈর্য্য হতে হয়' (হারানিধি) ; 'না বড় নীনতা' (আনন্দরহো) ; 'পরাধীনী', 'প্রেমাধিনী' (কালাপাহাড়, ভ্রান্তি)।

দেশকালপাত্রসূচক জ্ঞানের অভাব, যেমন :—ইন্দ্রত্ব হারাইবার ভয়ে পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুবের সম্মুখে তাহার তপোবিঘ্ন ঘটাইবার নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্র কামদেবের সহায়তায় স্বর্গের বিদ্যাধরীদের আনিয়াছিলেন। পুরাণে এ ঘটনার উল্লেখ থাকিলেও নাট্যকারের পাত্রজ্ঞানের অভাব এ ক্ষেত্রে সূচিত হইতেছে। পরে যদিও নাট্যকার দীর্ঘিকা নাম্নী রাক্ষসীকে আসরে নামাইয়া এই দোষের সংশোধন করিয়াছিলেন, তথাপি গিরিশচন্দ্রের ন্যায় কৃতি নাট্যকারের ইহা যোগ্য হয় নাই।

সামান্য দোষ-ত্রুটি থাকিলেও গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাহিত্য সর্ব দিক দিয়া দেশমধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার গৌরবলাভ করিতে পারিয়াছিল। দৃশ্যকাব্যের সকল বিভাগে তাঁহার হস্ত প্রসারিত ছিল, তজ্জন্য কি নাটক, কি নাটিকা, কি প্রহসন, কি রূপক, কি ঋতুগান সকল দিকেই নূতনত্বের আস্বাদন পাওয়া যায়।

নাট্যসাহিত্যে রসরাজ অমৃতলাল বসুর কাল
(১৮৭৫—১৯২৮ খৃঃ)

গিরিশচন্দ্রের কাল-মধ্যে যে কয়জন নাট্যকার তাঁহাকে কেন্দ্রে রাখিয়া তাঁহারই পার্শ্বচর (satillite) হিসাবে থাকিতেন, এবং নিজ-নিজ নাট্যসাহিত্য লইয়া কাছা-কাছি সময়ে আসরে নামিয়াছিলেন, তাঁহাদের কালকে গিরিশচন্দ্রের কালমধ্যে না রাখিয়া পৃথকভাবে দেখানো হইল।

কলিকাতায় সাধারণ-রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার মূলে যে কয়জন যুবক আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অমৃতলাল বসু অন্যতম। তাঁহার সময়ে স্বর্গত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, ধর্মদাস সুর প্রভৃতি লইয়া যে নাট্য-গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছিল তন্মধ্যে কেহ নাট্যকার হইয়া, কেহ বা নট ও শিক্ষক থাকিয়া, কেহ বা চিত্রকর হইয়া, কোন গুণী বা সংগীতাচার্য হইয়া রঙ্গমঞ্চের সেবা করিয়া গিয়াছিলেন। ঐ নাট্য-গোষ্ঠীর সকলেই একসঙ্গে কার্যক্ষেত্রে নামেন নাই, কেহ-কেহ দুই-এক বৎসর অগ্র পশ্চাতে নাট্য সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। ঐ গোষ্ঠীর মধ্যমণি ছিলেন গিরিশচন্দ্র, তাঁহার প্রতিভা-সূর্যের প্রভায় অপরের প্রতিভা-বহ্নি স্তিমিত ছিল। অমৃতলাল কিন্তু ভিন্ন পথে চলিয়া তাঁহার প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য দেখাইয়াছেন।

অমৃতলাল নাট্য-সাহিত্যের যে পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং যে পথে তিনি পদচিহ্ন স্থাপিত করিয়াছেন তাহা অন্যের অননুকরণীয়। গিরিশচন্দ্রের উৎকট নাট্যরঙ্গের রচনাকাল (১৮৭৪ খৃঃ) ছাড়িয়া দিলে অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের দুই বৎসর পূর্বে নাট্য-সাহিত্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং নানা জাতীয় দৃশ্যকাব্য তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রহসন-বিভাগে তাঁহার কৃতিত্ব সমধিক দেখা যায়। আমরা অভিনয়ের তারিখ ধরিয়া যথাক্রমে আলোচনা-দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিব, কি-কি বিভাগে কি-কি নূতনত্ব তিনি দিয়াছেন। অমৃতলাল মোট ৩৩ খানি দৃশ্যকাব্যের প্রণেতা ছিলেন।

চোরের উপর বাটপাড়ি

এই নামীয় প্রহসনটি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের জুন হইতে সেপ্‌টেম্বর মাসের মধ্যে গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এক লম্পট ইশারায় তাহার ঈপ্সিতার গৃহ দেখাইয়া দিয়া তাহারই দৌত্যকার্যে অপর এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিল, ঐ দূত অবশেষে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অপর বাড়ীতে গিয়া কিরূপে ঐ লম্পটের স্ত্রীকে ভুলাইয়া একসঙ্গে অর্থ ও আমোদ উপভোগ করিল, তাহার কাহিনী এই প্রহসনের উপজীব্য। অঘোর নামীয় এই প্রহসনের প্রধান ব্যক্তি (Protagonist) এরূপ লাঞ্ছিত ও প্রতারিত হইল যে সে বলিয়াছিল—'সকলেতে এসে দিন চুণ-কালি গালে। চোরের উপর বাটপাড়ি হলো মোর ভালে।' ইহার অন্তর্গত 'লেখা-পড়ায় রগড় কি। ইংরাজিতে এল্‌-এ-বি-এ পাশ করেছেন ঠাকুরঝী॥ মুখুজ্জেদের শরৎশশী, কুসুমকামিনী, এরা জজের কেরাণী, মরি হায়'—গানখানি দেশবাসীর খুব প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। মাইকেলের প্রহসন রচনার পর অমৃতলালই প্রথমে সেই পথে পথচিহ্ন (mile stone) স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন। মলিয়ারের 'The school for wives'এর ভাব ইহার মধ্যে কিছু কিছু আছে।

হীরকচূর্ণ নাটক

এই নাটকখানি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ভারতের বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের শাসনকালে বরোদার গাইকোয়ার মলহার-রাও-হোলকার, তাঁহার রাজত্বের তদানীন্তন বৃটীশ রেসিডেণ্ট সাহেবকে পানীয়ের মধ্যে হীরকচূর্ণ-মিশ্রিত বিষদ্বারা হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র-ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন এবং এইরূপ অভিযোগেই বিচারাধীন থাকিয়া সিংহাসন-চ্যুত হইয়াছিলেন। ঐ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া নাট্যকার এই নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন। ঘটনাটি রাজনীতি-সংক্রান্ত বলিয়া দেশ-বিদেশে বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কমিশনার-রূপী তিনজন দেশীয় সামন্ত নৃপতি, দেশ-বিদেশের সংবাদ-পত্র ও বরোদার প্রজাবৃন্দ মহারাজের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়াও তাঁহাকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই।

'হীরকচূর্ণ' নাটক নামে অভিহিত হইলেও ইহার রচনাপ্রণালী নাটকোচিত হয় নাই। ঘটনার সংঘাতে মূলক্রিয়ার পুষ্টি ইহাতে নাই, কতকগুলি অবান্তর প্রসঙ্গ স্থান লইয়াছে মাত্র। নাটকের সংলাপের ভিতর এমন কতকগুলি লোকের নাম পাওয়া গিয়াছে, যাহাদের পরিচয় নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীর পরিচয়পত্রে পাওয়া যায় না, এ প্রথা নাটকোচিত নহে। শোকাবহ নাটকের মধ্যে এমন কতকগুলি প্রকাশভঙ্গী আছে যাহা প্রহসন-জাতীয় দৃশ্যকাব্যেরই যোগ্য, গম্ভীর নাটকের উহা উপযোগী হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ :—সিপাহীর ভয়ে পলায়ন-তৎপর শ্বশুর নামক কোন বঙ্গদেশীয় মহাজন তাহার কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে নিম্নলিখিতরূপে কথোপকথন করিয়াছে :—"মদ—'ও আমাদের আয়ান, চিন্‌তে পাচ্ছ না?' শ্বশু—'আয়ান চোন্দর, সত্য তো। কৈ দাঁত দেখি? (মদন ও আয়ানের হাস্য) না, না ববোচনা করো, আমি ভয় পেয়েছি।" প্রকৃত ভীত ব্যক্তির মুখ দিয়া এরূপ ধরণের কথা ভীতিকালীন বাহির হয় না, উহার মধ্যে ব্যঙ্গের আভাস আসিয়া গিয়াছে।

নাটকের মধ্যে গাইকোয়ারের গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মূল ক্রিয়ার সহায়ক না হইয়া ঐগুলি অবান্তর হইয়া গিয়াছে। অঙ্ক ও দৃশ্যগুলি এমনভাবে সাজানো যে ঐগুলি বিবৃতিজ্ঞাপক (narrative) হইয়াছে, মোটেই নাট্যাত্মক (dramatic) হয় নাই।

উদ্দেশ্যাত্মক নাটক সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ মহারাজের প্রতি সমবেদনা প্রকাশের যে ভাব লইয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছিল তাহা সার্থক হইয়াছে। কলাহিসাবে ইহার গৌরব নাই, নবীন নাট্যকারের কাছে অধিক আশা শোভনীয়ও নহে। নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাইকোয়ার নাটকখানি ইহার কিছু পূর্বে অভিনীত হইয়া নাম কিনিয়াছিল।

তিলতর্পণ

এই প্রহসনখানি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে প্রতাপ জহুরীর ন্যাশানল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নট, নটী, রঙ্গাধ্যক্ষ, নাট্যকার, রঙ্গমঞ্চের বিজ্ঞাপন, মাতাপিতৃহীন নাটকীয় ভাষা, ঐতিহাসিক নাটক প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের উপর বিদ্রূপাত্মক শ্লেষ ইহার মধ্যে আছে। প্রহসনকার একস্থানে নাটকের এইরূপ ব্যঙ্গাত্মক ব্যাখ্যাও দিয়াছেন :—"নাটকের অর্থ হচ্ছে দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ যে কাব্য দেখা যায়। বিভ্রম-উৎপাদন হচ্চে এর জীবন; অঘটন ঘটন, অসম্ভবকে সম্ভব করা,

অর্থাৎ এক কথায়, যা নয় তাই করানো, এই হচ্চে নাটক, আর ব্যাকরণেই এর বিশেষ প্রমাণ রয়েছে। * * নাটকের ব্যুৎপত্তি হচ্চে যে, ন+আটক=নাটক, অর্থাৎ যাতে কিছু আটক নাই।" অমৃতলাল পরবর্তীকালে জন-সমাজ হইতে 'রসরাজ' উপাধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই রস-শক্তির প্রথম উন্মেষ তিল-তর্পণে এইরূপে পাওয়া গেল।

ব্রজলীলা

এখানি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এটি শ্রব্যকাব্য বলিয়া অভিনীত হইবার কথা আসে না। শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় ব্রজলীলা সপ্তচত্বারিংশৎ পদাবলি-দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে। ছন্দগুলি সাবলীল, কষ্টকল্পনা নাই। এই কবিতাগুলি গীতিকাব্যেরই অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য।

ডিস্‌মিস্

এই প্রহসনখানি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে বীডন্ স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। স্ত্রীর প্রগল্‌ভতায় সন্দেহ করিয়া এক স্বামী কিরূপ বিব্রত হইয়াছিল তাহার কাহিনী ইহার বিষয়। স্ত্রী চরিত্রে সন্দিহান্ লোকদের চক্ষু ফুটাইয়া দিবার পক্ষে এখানি বেশ উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে। স্বামীর সন্দেহবাতিক কিরূপে ডিস্‌মিস্-প্রাপ্ত হইল, প্রহসনটির অভিনয় না দেখিলে বা গ্রন্থখানি না পড়িলে বুঝা কঠিন।

চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে

এখানি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে বীডন্ স্ট্রীটস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি অমৃতলালের সুনাম রক্ষা করিতে পারে নাই। নিজ মেলের ভিতর পাত্র না পাওয়ায় কুলীনের ঘরের এক ধেড়ে কুমারী মেয়ে প্রৌঢ়া অবস্থায় উপনীতা হইয়াছিলেন। অবশেষে বাঁড়ুজ্যে ও চাটুজ্যে নামীয় দুইটি পাত্রের সহিত যথাক্রমে তিনি বাগ্‌দত্তা হইলেন। পাত্রের প্রথমটি জলে ডুবিয়া মরিবার জনরব তুলিয়া পলাতক হইল। কলিকাতার কোন মেসে ঘটনাচক্রে দ্বিতীয়টির সহিত প্রথমটির এক অভাবনীয় উপায়ে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ কুলীন কন্যাটি চাটুজ্যে অপেক্ষা বত্রিশ বৎসর তিন মাসের বড় প্রমাণ হওয়ায় অন্য পাত্রে তিনি বিবাহিতা হইলেন। উক্ত কামিনীর সম্পত্তির লোভেই চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে এতদিন নানা ফিকিরে ঘুরিতেছিল। আজ তাহারা সে লোভ হারাইয়া পরস্পরে বন্ধু হইয়া গেল। এই আখ্যানভাগটির বুনানী বেলেল্লামীতে নাট্যরূপ পায় নাই, একটা হট্টগোলের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজী সাহিত্যে 'Cox and Box' ও 'Box and Cox' নামে দুইখানি প্রহসন আছে। সম্ভবতঃ রসরাজ তাহা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন।

বিবাহ বিভ্রাট

এই প্রহসনখানি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ গুর্মুখ রায়ের স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি বেশ শক্তিশালী প্রহসন, ইহার লিখন-ভঙ্গী চমৎকার। শ্লেষ, ব্যঙ্গ, রসিকতা ও হাস্যরস (wit & humour) ইহার প্রতি সংলাপের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিয়াছে।

কতকগুলি প্রকাশভঙ্গী অপূর্ব, যেমন—অর্থগৃধ্নু বরের পিতা ও ঘটকের কথাবার্তার মধ্যে একস্থানে আছে :—"গোপী—'কেন এতে আর দোষ কি ?' চন্দ্র—'আপনার কিছু না, বিধাতার কতক বটে—চোখের চামড়াটা কম দিয়েছেন।' ঘট—'হ্যা-হ্যা, মহাজনো যত্র গতঃ স পন্থা', তা' সোণার বেনেরাই তো হ'ল জাত-মহাজন।" আর এক স্থানে ঐ অর্থপিশাচ বরের পিতা বলিয়াছে :—"গিন্নীর মনস্কামনা সিদ্ধি হয়, নন্দর বি-এ পাশ হ'তে হ'তে এই বৌটির ভাল-মন্দ হয়, তা হ'লে দশ হাজারের একটি পয়সা কম নয়।" " * * গিন্নীরও অন্যায়, একটি বেটা বিইয়ে বসে রইলেন—দেব না তো সব গহনা খালাস ক'রে, ফের বেটা বিউক্, বে দিক্, গহনা খালাস করুক্।" বিলাত ফের্‌তা মিষ্টার সিংয়ের সহিত বিলাসিনী কার্‌ফর্‌মার কথোপকথনের একাংশে এরূপ আছে :—"মি-সিং—'বাঙ্গালা একপ্রকার ভুলে গেছি, এই যে আপনার সঙ্গে কথা বল্‌ছি, সে অনেক কষ্টে মনে মনে ইংরাজী থেকে তর্‌জমা ক'রে।" ঐ কথোপকথনের অপর অংশে হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে এম্-এ ক্লাশের ছাত্রী বিলাসিনী কার্‌ফর্‌মা এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—" * * হয় তো কোন অপবিত্র সেকেলে বে-আইনি মতে বিবাহ হবে।" বিলাত-সম্বন্ধীয় কথাবার্তার মধ্যে মিসেস্ কার্‌ফর্‌মা মিষ্টার সিংকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—"বিলাতে বোধ হয়, অনেক স্ত্রীলোক বিজ্ঞান শিখেছেন ?' সিং—'বিস্তর। অণ্ডার গ্রাউণ্ড রেলওয়ের এঞ্জিন-ড্রাইভার, ফায়ারম্যান পর্য্যন্ত লেডী। বিজ্ঞান স্ত্রীলোকের হাতে প'ড়ে এমনি কোমল দাঁড়িয়েছে যে, সে সব গাড়ীতে চড়লেই ঘুম আসে।" হিন্দুমতে বিবাহিত পতি-পত্নীর ভালবাসা সম্বন্ধে মিসেস্ কার্‌ফর্‌মা বলিয়াছেন—"সে প্রণয়ের কি জানে ? সে হয়তো পতিকে গুরুর মত ভক্তি কত্তে শিখ্‌বে, দাসী হ'য়ে সেবা করবে, কিন্তু ভালবাসা ত যে সে ভালবাসা না—যে ভালবাসাকে 'লভ' বলে—সে ভালবাসা কখন শিখ্‌বে না।"

যে-যে সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রহসনকার অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পাশকরা ছেলের বিবাহ দিয়া কন্যার পিতার কাছ থেকে অতিরিক্ত বরপণ-গ্রহণ ও তথাকথিত কলেজী-শিক্ষার মোহ, বিলাত-গমন ও বিলাতী ধরণের স্ত্রী-স্বাধীনতার কুফলগুলি অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালিসমাজ কিরূপ বিভ্রান্ত হইতেছিল, তাহার চিত্র-প্রদর্শনই এই প্রহসনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে বাঙ্গালীর শহুরে গৃহস্থালির মধ্যে কিরূপ দজ্জাল দাসী দেখা গিয়াছিল, তাহার একটি নিখুঁত ছবি প্রহসনকার কৃতিত্বের সহিত ইহার 'ঝি' চরিত্রে আঁকিয়াছেন। ইতঃপূর্বে নাট্যসাহিত্যে এরূপ চরিত্র দেখা যায় নাই। প্রহসনকারের এ চেষ্টা নূতন এবং মৌলিক।

ইহার সংগীতবিভাগে "ওমা কেমন যোগী ছিঃ ছিঃ লাজে মরি" শীর্ষক গানখানি খুব প্রচলিত হইয়াছিল। এই প্রহসনের মধ্যে নাটকীয় ভাব কিছু কিছু দেখা গিয়াছিল, কিন্তু শেষ-দৃশ্যে তাহা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া পাকা প্রহসনে দাঁড়াইয়া গেল ; অবশ্য নাট্যকারের উদ্দেশ্য তাহাই ছিল।

তাজ্জব ব্যাপার

এই প্রহসনটি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। যে সকল পুরুষ স্ত্রী-স্বাধীনতার (female emancipation) পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ঐ কার্যের একটা উৎকটভাব লইয়া এই প্রহসনখানি রচিত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে বাঙ্গালি-পুরুষরা যে সকল কাজ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, মহিলারা তাঁহাদের

বিশেষ অধিকার বলে (franchise) সেই সব কাজ নিজেরা অধিকার করিয়া লইলেন। এমন কি, আসরে বা সভায় পরিচয় দিবার পদ্ধতিও স্ত্রীলোকের দিক দিয়া পরিবর্তিত করিয়া লইলেন। পুরুষেরাও ব্যুৎক্রমে (inversion) মহিলাদের কাজ গ্রহণ করিলেন। তজ্জন্য এখানিকে উৎকটভাবমূলক প্রহসন (Extravaganza) বলা চলে। ইহার পরিকল্পনায় (conception) প্রহসনকারের বড়ই গুণপনা রহিয়াছে। শ্লেষ বা ব্যঙ্গ পরিহাসের মধ্য দিয়া যথাযথভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রহসনকারের অন্তর্দৃষ্টি প্রখর ছিল। যে সব দ্রব্য স্ত্রীলোকের অবশ্য প্রয়োজনীয় সেই সব দ্রব্যের ফেরি তাঁহাদের কাছেই করানো হইয়াছিল। জনসভার মধ্যে মহিলার স্বচ্ছন্দ বিচরণের যে কয়টি বাধা ইতঃপূর্বে ছিল তাহার প্রতিকার-চেষ্টাও ইহার মধ্যে আছে।

রসিকতার একটি নমুনা এইরূপ :—"বিদ্যাসাগর স্ত্রী কি পুরুষ ছিলেন, সে সম্বন্ধে মত-ভেদ আছে ; এশিয়াটিক সোসাইটিতে তাঁর যে ছবি আছে, তা দেখ্‌লে বোধ হয় যে যদিও তিনি অনেকটা পুরুষের মতন কাপড় পরতেন বটে, তবুও তিনি স্ত্রীলোক ছিলেন, তাঁর গোঁফ্‌-দাড়ী কিছুই নাই।"

সংগীতবিভাগে ইহার একটু নূতনত্ব আছে। অন্দর-মহলের কাজগুলি যাহা এই প্রহসনের পুরুষেরা সম্পন্ন করিতেছে গানের বিষয়গুলি তাহাই। এই গানগুলি অভিনয়-কালে খুব সাড়া তুলিয়াছিল, স্থানাভাবে প্রথম ছত্রগুলি উদ্ধৃত হইল :—(১) 'ফাটকে আটক রব না', (২) 'বাঁটের মুখের খাঁটি দুধ কে নিবি তা বল', (৩) 'আমার শুধু কি দুধে চলে', (৪) 'রাঁধা-বাড়া হাঁড়ি-কাড়া ঘুচেছে বালাই', (৫) 'কে পোয়াতি রসবতী খোলা লিবি আয় রে', (৬) 'আমরা বেরিয়েছি সেই ভোরে। মিন্‌সেরা ঘর নিকুচ্ছে ঘরে', (৭) 'আমরা কি ডরি অরি! নয়ন-বাণে ভুবন জয় করি।'

তরুবালা

তরুবালা নাটকখানি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি মিলনান্ত সামাজিক নাটক। ইহার তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত লিখনভঙ্গী চমৎকার, মাঝে মাঝে মুন্‌শীয়ানাও যথেষ্ট। নাট্যদেহের সৌষ্ঠব-স্বরূপ নাট্য চরিত্রগুলি ও ঐগুলির মধ্য দিয়া রসের অভিব্যক্তি নাটককার বেশ দক্ষতার সহিত করিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়, তরুবালা, শান্ত ও আমোদিনী নাটকের মধ্যে মল্লিকা ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিয়া তাহাদের চরিত্রের অমল-ধবল শোভা বিকীর্ণ করিয়াছে। চরিত্রগুলি পরস্পর ভিন্ন ; এগুলির মধ্যে পূর্বগামী নাট্যকার সৃষ্ট চরিত্রের কোন ছায়াপাত নাই, ইহারা সম্পূর্ণ মৌলিক। কেতাবী প্রণয়ের নেশায় পড়িয়া অখিলের পদস্খলন ঘটিয়াছিল, কিন্তু উপরিউক্ত চরিত্রাবলির চেষ্টায় তাহা পরে সংশোধিত হইয়া গিয়াছিল। বেণীচরিত্রের গার্হস্থ্য ভাবের দিকটায় নূতনত্ব আছে, তাহার লাম্পট্যটা মামুলী। শান্ত-চরিত্রের নূতনত্ব তাহার হৃদয়বলে ও সংযত ব্যবহারের মধ্যে পাওয়া যায়। বিহারীলাল পাণ্ডিত্যে না হউক মদ খাইবার নেশায় দীনবন্ধুর নিমচাঁদের দ্বিতীয়-সংস্করণ।

নাটকীয় সংলাপগুলি যদিও গতানুগতিকভাবে লিখিত হয় নাই, কিন্তু স্থানে-স্থানে পূর্বগামী নাট্যকার দীনবন্ধুর প্রভাব ঐগুলির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ব্যঙ্গ, পরিহাস ও হাস্যরস নাটককারের সহজাত বলিয়া নাটকীয় সংলাপের মধ্যে উহাদের সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখা গিয়াছে। সংলাপের মান (standard) বেশ উন্নত। নিম্নলিখিত সংলাপগুলির মধ্যে ন্যায়-যুক্তির প্রভাব দেখা যায়। মাতাপিতা

কর্তৃক মনোনীত কনের সহিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বরের প্রণয় যে হইতেই পারে না, অখিলের এবংবিধ ধারণা দূর করিবার জন্য মৃত্যুঞ্জয় একস্থানে বলিয়াছেন :—"কেন হবে না ভায়া? বাপ-মা ত আপনি কেউ পছন্দ করে নেয় না, তবু তো শ্রদ্ধা-ভক্তি হয়, ভাই-বোনেও তো ভালবাসা হয়, তারাও তো ফরমাশে আসে না, স্ত্রীও তেমনি, বুঝেছ; একসঙ্গে থাক্‌তে থাক্‌তেই ভালবাসা হয়, বুঝেছ?" আমোদিনী ও মৃত্যুঞ্জয়ের সংলাপ-মধ্যে বিধবার পুনর্বিবাহ সম্বন্ধীয় কথাবার্তার একস্থানে এইরূপ আছে :—"দিদি, বে' তো কেনা-বেচার জিনিস নয়, স্ত্রী-পুরুষের যে ইহকাল-পরকালের সম্বন্ধ; পৃথিবী তো দু'দিন, আমার যদি আবার বে হয়, পরকালে আমি কোন্ স্বামীর কাছে থাক্‌বো।" আর এক স্থানে বিধবা-বিবাহ যে শাস্ত্র-সম্মত বেণী তাহা শান্তকে বুঝাইয়া দিয়া দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পুরাণোক্ত মন্দোদরী ও তারার নাম করিয়াছিল। শান্ত তদুত্তরে উপহাসচ্ছলে বলিল :—"হা-হা-হা! বেণীদা খুব দৃষ্টান্তই দিয়েছ। একজন রাক্ষসী, আর একজন বাঁদরী! আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশে দেখেছি, দুলে-কাওরার মেয়েরা ছেলে কোলে ক'রে বে করে, ভদ্রলোকের ঘরে কি হয়? * * আর যে কষ্ট বল—সে শরীরের,—মলেই ফুরিয়ে গেল, পুড়ে ছাই হবে। মনের সুখ-দুঃখ?—সে নিজের হাতে, ঐ সব ভাব্‌লেই মনও খারাপ হয়—দুঃখও হয়; মলেই তো আবার সেই স্বামীকে পাব, তখন তো আর বিধবা হবার ভয় থাকবে না। আমার স্বামী স্বর্গে গেছেন—দেবতা হয়েছেন, এখন যে আমি দেবতার স্ত্রী! * * পতি মেয়ে-মানুষের প্রাণের জিনিস, চ'খের আড়ালে গেছে বটে, কিন্তু প্রাণের আড়ালে যায়নি।" শান্তের যুক্তির পশ্চাতে জাতীয় সংস্কার কাজ করিয়াছে। সংস্কারমুক্ত কে? যে, যে দেশে যাহাই করুক না, সংস্কারবশেই করিয়া থাকে। ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না হইলে সংস্কারের হাত এড়ানো যায় না।

ভিখারীকে ভিক্ষাদান ব্যাপারে নাট্যকার একটি নূতন আলোকপাত করিয়াছেন :—"ভিখারী সেজেছে বই তো নয়, হাতে তুলে দেবে, তবে পাবে; জমাদার সেজে সেলামী লুট্‌তও আসে না; জামাই সেজে দুধের বাটি মার্‌তেও আসে না; ভিখারীর চেয়ে আর অমানী কে? তাও স্বীকার পেয়ে যদি তোমার কাছে হাত পাতে—যথাসাধ্য দিলেই বা।"

স্বামী অসৎপথের পথিক হইলে স্ত্রী তাহা বুঝিতে পারে, তাই তরু একস্থানে অখিলকে এইরূপ বলিয়াছে :—"স্বামীর প্রাণের কথা স্ত্রী আগে টের পায়, তুমি যে আমার প্রাণের ভিতর আছ! তোমার প্রাণে কখন কি ভাব হয়, আমি বুঝ্‌তে পারি না?" বেশ্যাতে পুরুষ কেন আসক্ত হয়, সে সম্বন্ধে তরু স্বামীকে এইরূপ বলিয়াছে :—"সময়ে সময়ে যে শাস্তির কথা বল্‌ছো, সে নেশার ঝোঁক, আর কিছু নয়; মাতাল যেমন মদের নেশায় রাজা হয়, দাতা হয়, বন্ধুর জন্যে প্রাণ দেয়, কুহকিনীরাও তেমনি এমনি চোখের নেশা করাতে পারে যে, পুরুষ সেই নেশার ঝোঁকে মনে করে যে, আমি বড় সুখে আছি।" তরুবালা স্বামীর অধোগতি দেখিয়া পারুলকে উদ্দেশ করিয়া কটু কথা বলিলে পর, অখিল ক্রুদ্ধ হইয়া তরুকে পদাঘাত করিয়াছিল; সাধ্বী তরু ঐ লাথি খাইয়াই স্বামীকে এইরূপ বলিয়াছিল :—"তোমার আমাকে লাথি মার্‌বার ক্ষমতা আছে স্বীকার করেছ, তবে আমি তোমার স্ত্রী; অন্য স্ত্রীলোক হ'লে তো তুমি তাকে লাথি মার্‌তে পার্‌তে না, লাথি মেরেছ, এখন বুকে নাও; পতি স্ত্রীকে হেনস্থাও করে—আদরও করে।"

শান্তকে পাইবার লোভ বেণীর প্রবল হইল। সে সন্ন্যাসী সাজিয়া বেলগাছিয়ার বাগানে সহচরীর দ্বারা শান্তকে ছলে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল। নানা চেষ্টা করিয়াও বেণী শান্তকে বিবাহের

প্রস্তাবে রাজী করিতে পারিল না, তখন সে অনন্যোপায় হইয়া ঐ আশা একেবারে ত্যাগ করিল। ঐ ত্যাগের মূলে শান্তের যুক্তি কাজ করিয়াছিল। শান্ত বেণীকে যে যুক্তি দেখাইল, তাহা এইরূপ :—"তার পর আমি এক সংসার থেকে আর এক সংসারে এসেছি, এক গোত্র থেকে আর এক গোত্রে এসেছি, সাহেবদের মত আমাদের মাগ্‌টি-ভাতারটি নয়; শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাশুর, দেওর, জা, ননদ,—আমিও তাদের মাঝে একজন বৌ; যে দিয়ে এনে হাতের ভাত খেয়ে জাতে নিয়েছে, সে ঘর ক'বার বদ্‌লাব!" বেণীর মুখে পত্নীকে দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইতে হয় এরূপ কথা শুনিয়া শান্ত বলিল :—"দুঃখে দুঃখী পাওয়ার চেয়ে পৃথিবীতে আর সুখ নাই, ভগবান দুঃখীর দুঃখে দুঃখী, তাই স্বর্গে অত সুখ।" শান্তের চরিত্রে অবিচলিত দার্ঢ্য দেখিয়া বেণী স্তম্ভিত হইয়া বলিয়াছিল :—"সাক্ষাৎ স্বর্গের প্রতিমাকে রক্তমাংস-জড়িত মানুষ ভেবেছিলেম। ভয়ে চীৎকার করলে না, ক্রোধে কর্কশ বল্লে না, অমানুষিক হৃদয়-বল! * * শান্ত-গুণে শান্ত আমার জীবন-প্রবাহ আজ পরিবর্তন ক'রে গেল!"

অখিলকে কি করিয়া ঘরে ফিরিয়া আনা যায় সে সম্বন্ধে আমোদিনী এক চক্রান্ত করিলেন। আমোদিনীর পরামর্শ কার্যকরী বিবেচনা করিয়া মৃত্যুঞ্জয় বলিতেছেন :—"ঠাওরেছ ঠিক, ঐ ছোঁড়া-শালাদের দু-পাত ইংরিজী প'ড়ে মাথা ঘুরে গেছে; শালারা কাণে খায়, চোখে রূপ দেখে না, মনে গুণ বোঝে না, প্রাণে রস নাই, যত্ন-আদরের কদর জানে না, যেখানে ভালবাসা সত্যি পায়, সেখানে তাচ্ছল্য করে, আর পাথরের তলায় গে মাথা খোঁড়ে।"

পূর্বোক্ত সংলাপগুলির মধ্যে যে সকল যুক্তি-তর্কের সমাবেশ আছে, তাহা ঠিক মামুলী ধরণের নহে, একটু নূতনত্ব ঐগুলির মধ্যে আছে, তাই উদ্ধৃতির প্রয়োজন হইল।

নাটকীয় সংলাপের মধ্যে হাস্য-পরিহাস ও ব্যঙ্গের (wit and humour) অভিব্যক্তি কিরূপ সুন্দর তাহার নমুনা দেখুন :—সহচরী নাম্নী এক কুরূপা বর্ষীয়সী গোয়ালিনীর প্রতি নিজ শ্যালকের অসঙ্গত আসঙ্গ-লিপ্সা দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় রহস্য-সহকারে এইরূপ বলিয়াছিলেন :—"প্রণয় কি হে? সে যে মহাপ্রলয়ের সহচরী! সে একটা মহামারী!" আমোদিনী-কনে দিদির সহিত অখিলের কথোপকথনের মধ্যে অখিল বলিল :—"প্রকৃত প্রণয় তো বইয়েই আছে।" আমোদিনী এ কথা শুনিয়া বলিলেন :—"তবে আজ থেকে ছাপাখানায় গিয়ে শুয়ে থেকো।" দামিনী ও বেণীর দাম্পত্য-কলহের মধ্যে বেণী একস্থানে পরিহাসের সহিত বলিয়াছে :—"কোঁদল কি প্রিয়ে! সে তো ছার মানুষের কাজ, দামিনী নল্‌কালে বজ্রাঘাত হয়। তুমি হ'লে প্রিয়ে স্বর্গের জিনিস।" পারুলের কাব্যিক প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসিতে পারে এইরূপ একটা কথা অখিল হীরালালকে বুঝাইয়া দিলে হীরালাল উহার মর্ম না বুঝিয়া বলিয়াছিল :—"না বাবু, খুনোখুনি করবেন না, ও পুলিশ-হাঙ্গামাওয়ালা প্রণয় কিছু নয়।" অখিল তাহাতে এই কথা বলিয়াছিল :—"হীরু তুমি দেখ্‌ছি প্রণয়ের কিছুই জান না; সত্যই কি মরবো? এ সব প্রণয়ের অঙ্ক-গর্ভাঙ্ক, শেষ তো মিলন আছেই!" হীরালাল না বুঝিয়া বোকার মতোই উত্তর করিল :—"মিলনের আগেই গর্ভ?" নাত্‌-বৌ ও ঠান্‌দিদির রসিকতার নমুনা এইরূপ :—"তরু—'দুপুর বেলা কেন, আমি আজ রাত্তিরেই আস্‌বো।' আমো—'আহা তা আসিস্‌ আসিস্‌, এই বয়সে এক দিনও আঁব খেতে পাস্‌ নি, একটু আঁবসত্ব দেব এখন।' তরু—'তোমার যে নোলা, আগে আপ্‌নারি কুলুগ্‌।"

অখিল ও তরুর সংলাপের মধ্যে প্রচলিত হিন্দু বিবাহের তথাকথিত প্রণয় সম্বন্ধে আলোচনা-ব্যপদেশে তরু অখিলকে এইরূপ বলিল :—"থাকি না একটু ; ভয় নাই—প্রণয় হবে না।" অখিল—"বিশুদ্ধ প্রণয় হবে না, তা জানি, কিন্তু সর্বদা কাছে থাক্‌লে, কথাবার্তা কইলে একটা মিছা-মিছি প্রণয় জন্মে যেতে পারে—তোমাদের বাঙ্গালীর প্রণয় !" এই কথা বলিয়া পাছে নিজ-স্ত্রীর কাছে তাহার মস্তক বিক্রীত হইয়া যায়, তাই অখিল আরও বলিতেছে :—"আমি জাঁক ক'রে বল্‌তে পারি ; আমি তাই সাম্‌লে গেছি, অন্য পুরুষ হ'লে আজ নিশ্চয়ই মায়ায় ভুলে যেত।"

পারুল সম্বন্ধে অখিল-বিহারীর সংলাপের একস্থানে অখিল বিহারীকে বলিল :—"আমার কোন কুভাব নাই, পারুলকে আমি পবিত্রভাবে—ভগ্নীভাবে দেখি।" বিহারী—"তা তো দেখ্‌বেই, সভ্য হ'লেই আজকাল তা দেখে, 'ভগ্নী' শব্দে দুই অর্থ অভিধানে দেখ ধনী।" শান্তর প্রতি বেণীর লালসাকে বিদ্রূপ করিয়া হারু একস্থানে বলিয়াছে :—'আমরা ঐ দাসীটে-বাঁদীটে দাদা—আমার উঁচু নজর নাই।" বিহারী মাতাল অবস্থায় পাহারাওয়ালা কর্তৃক ধৃত হইলে পাহারাওয়ালা বিহারীকে বলিয়াছিল :—"শালা, হাম্‌কো জান্‌তা নেই ?" বিহারী তদুত্তরে—"না ! কই, তা তো জান্‌তেম না, এত নিকট সম্বন্ধ !"

দামিনীর দাম্পত্য-কলহের হাত থেকে হঠাৎ রেহাই পাইয়া বেণী বলিয়াছিল :—"মধুরভাষিণী ! হাতা-বেড়ী, হাঁড়ি-কুঁড়ি, দরজা-জানালা, স্থাবর-অস্থাবর—সব রইল, এদের নিয়ে মিষ্টালাপ কর, গালাগাল-কল্পদ্রুম ঝাড় ; অধম বেণীর প্রতি মা আপাততঃ মুখ তুলে চেয়েছেন।" স্বামী পরস্ত্রীতে আসক্ত হইলে সে বিষয়ে নারীর দোষ থাকুক্ বা না থাকুক্, সে বিচার স্ত্রী তখন করে না। কেমন একটা স্বভাব-সুলভ আক্রোশের বশে দামিনী শান্তকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া লইয়া এইরূপ বলিয়াছিল :—"নেকী-বেটীর আবার নেকামো দেখ, ধর্ম-ধর্ম করেন ! ধর্মতলায় বেটীর গোর হবে ! এইবার আর কোন কথা কানে এলে হয়, আমিই ধর্মের ঢাক বাজিয়ে দেব।" পারুলের গৃহে বসিয়া তাহার সখিদ্বয়—কিস্‌মিস্ ও হেনা সংগীত আরম্ভ করিলে বিহারী তাহার স্বভাব-জাত রসিকতা-সহকারে বলিয়াছিল :—"খুব গেয়েছ, রাগিণী বাগ্ তাড়ানি বুঝি ? কিস্‌মিস্ বিবির গলা যেমন মিষ্টি, হেনা বিবির গলার খোস্‌বোও তেম্‌নি " গীতান্তে উহারা বাড়ী যাইতে চাহিলে বিহারী কিস্‌মিসকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিল :—"কিস্‌মিসের বক্‌বে কে—মনাক্কা মাসী ?"—কারণ ইতঃপূর্বে হেনা আপত্তি করিয়াছিল যে দেরী হ'লে তাহার মা বক্‌বে।

পারুলের মোহে অখিল এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, সে নিজ বিবাহিতা স্ত্রী সম্বন্ধে পারুলকে এইরূপ বলিল :—"পারুল ! আমার চ'খে সে স্ত্রী আমার পর-স্ত্রী, আমি আবার বল্‌ছি, তোমার গা-ছুঁয়ে বল্‌ছি, আমি লম্পট নই, ব্যভিচারী নই ; তোমায় ত্যাগ ক'রে যদি সে স্ত্রীরও সংসর্গে যাই, সে আমার ব্যভিচার করা হ'বে।" এই কথায় বিহারী তাহার সহজাত রসিকতার সাহায্যে বলিল :—"স্ত্রী-সংসর্গের মত ব্যভিচার আর নাই ! * * পারুলকে ঘরে নিয়ে যাও, তোমার মার হবিষ্যি রেঁধে দেবে।" রন্ধনের কথা শুনিয়া অখিল শিহরিয়া উঠিয়া বলিল :—"পারুল রাঁধ্‌বে ?" বিহারী শুধ্‌রাইয়া লইয়া বলিল :—"ভুল হয়েছে, ভুল হয়েছে ! হেঁসেলে গেলে প্রণয়ভঙ্গ হয়, প্রণয় কাঁচের জিনিস, আগুন-তাতে চিড়্ খায় !"

উপরি-উক্ত সংলাপগুলির মধ্যে ব্যঙ্গ ও পরিহাস এতই স্পষ্ট যে মিলনান্ত কমেডির লঘু-ভাব ফুটিবার পক্ষে ঐগুলি বিশেষ সহায় হইয়াছিল।

পঞ্চম অঙ্কে নাট্যকার নাটকীয় পরাকাষ্ঠা (climax) যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা মোটেই নাটকোচিত হয় নাই। অখিলের অনুপস্থিতকালে পারুলের সঙ্গে মথুরার চোবেজিকে আমোদ করিতে দেখিয়া পারুলের গৃহাগত অখিল ঐ নবাগন্তুককে এইরূপ বলিল:—"কে তুমি? আমার প্রণয়ে তুমি কি ওসমান?" এই কথা শুনিয়া তরুবালার নাট্যকার যে প্রহসনকার তাহা বুঝিতে কাহারও আর বাকী থাকিল না। হইতে পারে কাব্যময় জীবনই অখিলের সংস্কার! কিন্তু সে তো প্রাণহীন নহে? আঘাত প্রাণে আসিয়া পৌঁছিলে কবি বা অকবি উভয়েই বিচলিত হইয়া উঠে। প্রাণের জ্বালায় তখন সে সম-সাময়িক নাটক বা উপন্যাস ঘাঁটিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম নির্বাচন করে না, উহাতে নির্বেদ না আসিয়া ব্যঙ্গেরই উৎপত্তি হয়। আরও দুঃখের বিষয় এই, যে অখিল ঐরূপ নাটকীয় আঘাত পাইবার পরও পারুলের দুইটা মিষ্ট কথার প্রত্যাশায় ঐ স্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিল, এবং পারুল কর্তৃক পুনরায় অবমানিত হইবার পর একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া তবে সে পারুলের গৃহত্যাগ করিয়াছিল। পাকা শিল্পী হইয়া অমৃতবাবু কেন এরূপ করিলেন, আজ তাহা কে বলিয়া দিবে।

নাটকের ভাষাটি বেশ স্পষ্ট ও ঋজু। গানগুলির মধ্যে যেগুলি প্রেমসংগীত সেগুলির ভিতর ভাব (emotion) অপেক্ষা বস্তুতান্ত্রিকতা (realism) বেশী; যেমন, কিসমিস ও হেনার গানে:—"সুধাফল ফলবে ব'লে প্রেমের তরু পুতি হায়! আদর ঘিরে রাখি বেড়ে, বিচ্ছেদ গোরু পাছে খায়॥ যতন নিড়েনে খুলে, আঁখিজল ঢেলে মূলে, সারের সার প্রাণ আমার, সার দিলাম গো তায়॥ হেনকালে বুনোলতা, রাতারাতি এলো সেথা, সাধের গাছে বেড়ে পেঁচে, লতা আমার মাথা খায়।" অধ্যাত্ম বিষয়ক একটি সংগীতে রামপ্রসাদী গানের নকল নাট্যকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণের সে তীব্র বেদনা তিনি উহার মধ্যে দেখাইতে পারেন নাই। যেমন, '(তোর) যদি মাতাল হ'তে হয় বাসনা। মন রে, তারা নামসুরা প্রাণপুরে পান কর্‌না' ইত্যাদি।

সম্মতি-সঙ্কট

এই প্রহসনখানি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল এখানি তৎকালীন হিন্দু সমাজের প্রয়োজনমূলক প্রহসন। অর্থনৈতিক কারণে কালক্রমে বর-কনের বিবাহোপযোগী বয়স আপনা-হইতে বাড়িয়া গিয়াছে, কাজেই এখন এ জাতীয় প্রহসন অপ্রচলিত (obsolete) হইয়াছে। সমাজ নিত্য পরিবর্তনশীল, আজ যাহার চাহিদা আছে, কাল তাহার নাই। যে আইন নাকচ করিবার জন্য প্রহসনকারকে 'সম্মতি-সঙ্কট' লিখিতে হইয়াছিল, আজ যদি তিনি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে বর্তমানে সমাজের বিগত-যৌবনা কুমারী-কন্যা ও প্রায়-প্রৌঢ়াবস্থাগত অবিবাহিত বরের বিবাহ সমস্যা লইয়া তাঁহাকে হয়তো বা কোন নূতন প্রহসনের সৃষ্টি করিতে হইত।

রজোবতী হইবার পূর্বে স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ করিয়া যে আইন ভারত সরকার বিধিবদ্ধ করিলেন, তাহাতে স্ত্রীর বয়স ১২ বৎসর ধরা হইয়াছিল। এই সংবাদে তৎকালীন হিন্দুসমাজে যে আলোড়ন আসিয়াছিল, প্রহসনকার তাহাই দেখাইয়াছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই যুগত্রয়ের ক্রিয়া-সম্পাদনার্থ মর্ত্যলোকের সাহায্যার্থে দেবগণের মর্ত্যে আগমনের কথা শুনা গিয়াছে; কলিকালে উহা আর শুনা যায় না, সম্মতি-সঙ্কটের রচয়িতা কিন্তু তাহাও শুনাইয়া দিলেন।

প্রহসনকারের লোক-চরিত্র-জ্ঞান খুব তীক্ষ্ণ ছিল। চতুষ্পাঠীর তথাকথিত উপাধিধারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন, তাহা বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। তাঁহারা টোলে যে সকল শব্দ প্রায়ই প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সেগুলির এককালীন সমাবেশ প্রহসনকার একটি দৃশ্যের মধ্যে করিয়াছেন :—যথা, 'স্থিরো ভব', 'হাম্য', 'কটু-কাটব্য', 'অর্বাচীন', 'অনড্‌বান', 'যদ্যপি স্যাৎ', 'অনুধাবন করি', 'আগচ্ছ', 'রজতখণ্ডলোভ।' সংস্কৃতবচনের প্রমাণ-প্রয়োগ ব্যাপার লইয়া 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' দিয়া স্মৃতিশাস্ত্রের দোহাই কাব্য বা নীতিশাস্ত্রের বচনোদ্ধারে চালাইয়া লইয়া কিরূপে তাঁহারা গোঁজামিলের সৃষ্টি করেন, তাহা প্রহসনকার দক্ষহস্তে চিত্রিত করিয়াছেন। এরূপ ধরণের চিত্র ইতঃপূর্বে কোন প্রহসনকার চিত্রিত করেন নাই, ইহাতে অমৃতলালের মৌলিকত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

হাস্য-পরিহাসের দুই চারিটি নমুনা এইরূপ :—(১) "তুই তাকে বুঝিয়ে দিস, বিয়েই খারাপ, চিরকাল একজনের কাছে থাকৃতে নাই ; মাগ ভাড়াটে বাড়ী, মেয়াদ ফুরুলে, আর একজনের কাছে ভাড়া খাটবে।" (২) "সকল কথাতেই 'বোধ হয়' বলা উচিত, তা হলে সত্যি-মিথ্যা কেটে গেল।" অধ্যাত্ম সম্বন্ধীয় নুতন কথাও একস্থানে বলা হইয়াছে :—"যেমন দেহের পোষক অন্ন, তেম্‌নি আত্মার পোষক ধর্ম।"

'বিলাপ' বা (বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন)

এই বিষাদপূর্ণ কাব্যখানি নাট্যাকারে গ্রথিত হইলেও, ইহা শ্রব্যকাব্যেরই উপযুক্ত। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগস্ট তারিখে স্টার থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া ইহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ এখানি দয়ার-সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু উপলক্ষ্যে শোকোচ্ছ্বাস মাত্র। বিদ্যাসাগরের যাবতীয় কার্যই দয়া-প্রণোদিত ঘটনা,—কি বিদ্যাদানে, কি বিধবাবিবাহ প্রচারে, কি দরিদ্রপালনে—সর্বত্রই তিনি দয়ারূপী দেবতা। অমৃতলাল এই নাটিকার মধ্যে সামান্য ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা ইহাকেই দৃশ্যকাব্যের পর্যায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কাব্যগুণে ইহার নাট্যগুণ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল।

রাজা বাহাদুর

এই প্রহসনখানি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাট্যকার এখানিকে 'সং-রং' বলিয়াছেন। পূর্ববঙ্গীয় কোন জমিদার 'রাজা' খেতাবের লোভে পড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া এক চতুর লোকের চক্রান্তে ভুলিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিল, অবশেষে শূন্যহস্তে গৃহে ফিরিয়া গেল। বেশ্যা-সঙ্গ ও অসৎপ্রসঙ্গ ঐ লোকটির চিন্তনীয় ও করণীয় ছিল। ইহার 'আজ বাগানে ফুল তুলেছি দুজনে' গানখানি বেশ সাড়া তুলিয়াছিল। ব্রকম্যান ফিস্‌ চরিত্রে প্রহসনকার ইংরাজি-ভাষা জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

কালাপানি

কালাপানি বা (হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা) প্রহসনখানি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি উৎকটভাবমূলক দৃশ্যকাব্য।

হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রার একটা ঢেউ কিছুকাল পূর্বে দেশে দেখা দিয়াছিল। ঐ হুজুকে মাতিয়া বাঙ্গালী কি করিয়াছিল তাহার একটি রসচিত্র প্রহসনকার ইহার মধ্যে দিয়াছেন। মাইকেলের সময়ে ইয়ংবেঙ্গল নামক দল মাথা তুলিয়াছিল এবং ভণ্ড কপটাচারী হিন্দুর দলেরও সে সময়ে অভাব ছিল না, তাই মধুসূদন ঐ দুই দলের বিরুদ্ধে প্রহসন রচনা করিয়া গিয়াছেন। রসরাজ অমৃতলাল ঐরূপ কপটাচারী হিন্দুর হিন্দুমতে বিলাত-যাত্রার ধুয়া লইয়া যে রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা অনেকের উপভোগের সামগ্রী হইয়াছিল।

রঙ্গরসের দুই চারিটি বুকনি এখানে উদ্ধৃত হইল; ঐগুলি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন :—(১) "ইচ্ছা করলে যদি রেয়েত্‌কে উদ্বাস্ত করতে পারা যায়, তবে আর রাজা-প্রজা সম্পর্কটা রইল কি?" (২) "খাটি হিন্দুমতে বোক্‌নোয় ক'রে গঙ্গাজলে ফাউল-কারি তৈয়ের করবে।" (৩) "কি 'আপ্‌রাইট্‌মেণ্ট', কি 'স্‌ট্রেট্‌ফর্‌ওয়ার্ডিটি!' এরি নাম 'মরাল-ক্লাশ-বুক্‌ করেজ!' এরেই বলে 'স্পিরিট'। এরেই বলে 'অ্যাল্‌কোহল্‌'!" (৪) "হিন্দুমতে সাহেব হওয়া যায়, আর বোষ্টুমী-মতে পাঁঠা খাওয়া যায় না? আমি দিব্বি মোটা তুলসীগাছ কেটে হাড়িকাঠ তৈয়ের করবো, বলিদানের বদলে অজরাজকে বানিয়ে নেব।" (৫) "যদি ঠিক হিন্দুমতে বিলাত যাওয়া যায়, তাতে দোষ কি?" "কি রকম, নামাবলির পেণ্ট্‌লেন পরে?" (৬) "বিলাত কেন বাবা, তুমি মনে কল্লে উচ্ছন্ন পর্যন্ত যেতে পার!" (৭) "এই যে দেশশুদ্ধ লোকের খোরাকির ভার কার উপর দিয়ে রাখা হয়েছে? চালে খড়, বাড়ে মাটি নাই, পরণে কপ্‌নি, মাথায় জট, পেটে পিলে জনকতক চাষার উপর।" (৮) "লোকে বিলাত থেকে এলে, আমরা তাদের এক-ঘরে করি, না তারা আপনারা এক-ঘরে হয়?" (৯) "আমরা হিঁদুর জাহাজে যাব, দেবতা-বামুনের আশীর্বাদে ঢেউ লাগ্‌বে না, জাহাজ ডুলবে না।" (১০) "লণ্ডন হচ্ছে (Thames) টেমস্‌ নদীর তীরে,—আর বাল্মীকির তপোবন তো জানই তমসা নদীর তীরে ছিল। তখনকার তমসাকে এখন টেম্‌স বলে।" (১১) "যদি কোন ফিকিরে জগন্নাথকে নিয়ে বিলাত যাওয়া যায়, তা হ'লে আর কারুর কোন কথাটা কবার যো থাকবে না, যেখানে জগন্নাথ, সেইখানেই শ্রীক্ষেত্র।"

এ-জাতীয় প্রহসনের আয়ু দীর্ঘ হয় না, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ইহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব নির্ভর করিয়া থাকে। আজ আর ইহার প্রয়োজন নাই, তবে ইহার মধ্যে যে সব মানুষের জাতিরূপ (type) দেওয়া হইয়াছে, তাহারা সব কালেই আছে ও থাকিবে। হুজুক লইয়া নাচা যাহাদের স্বভাব, বিষয় বদল হইলেও নাচের কামাই তাহাদের হয় না। ইহার গানগুলি খুব সাড়া তুলিয়াছিল, ঐগুলির প্রথম ছত্র এইরূপ :—(১) "ভক্ত নাই আমাদের কর্তাদের মতন", (২) "বিবি হতে চল্লি নাকি ধন্নি মেয়ে তোরা। বারমহলে শুনে এল আমাদের ওরা॥" (৩) ইহার "টুকটুকে তোর পা দুখানি আলতা পরাই আয়" গানখানি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হিতে বিপরীত নাটিকাতেও পাওয়া গিয়াছে ইহার প্রকৃত রচয়িতা কে বুঝা গেল না। সম্ভবতঃ এখানি প্রচলিত গান। (৪) "আর আমাদের সাহেব হবার বাকী কি?"

বিমাতা বা বিজয়-বসন্ত

এই নাটকখানি ১৮৯০ খৃস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানির গল্পাংশ বহুকাল প্রচলিত এক কিংবদন্তীর উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ঐতিহাসিক হইয়াও সামাজিক আখ্যা পাইয়াছে, কারণ ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত নহে।

জয়ন্তাধিপ বৃদ্ধ জয়সেন দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করিয়া কিসের নেশায় ও কি কুহকে পড়িয়া প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত বিজয় ও বসন্ত নামক পুত্রদ্বয়কে হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, এবং কিরূপেই বা তাহাদের জীবন অপ্রত্যাশিত ভাবে রক্ষা পাইয়াছিল, নাটকের বিষয়বস্তু তাহাই। এই নাটকের উপন্যস্ত-বিষয়টি (theme) পৃথিবীর সমুদয় সাহিত্যেই কিছু অদল-বদল করিয়া বর্তমান থাকিতে দেখা গিয়াছে। নাটকের রচনা-প্রণালী কিন্তু সুবিন্যস্ত হয় নাই। সংঘাতের অনুপাতে দৃশ্যগুলি দীর্ঘ, সংলাপগুলি তজ্জন্য প্রাণহীন হইয়াছে; হৃদয়ভাবগুলি (feelings) অতিরিক্ত কথার চাপে যথাস্থানে বাহির হইতে না পারিয়া রস-সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কথার গোলকধাঁধার মধ্যে শোক-পরিবেশটি কৃত্রিম আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। সংলাপগুলিকে ফেনাইয়া বড় করা হইয়াছে, বস্তু অপেক্ষা আড়ম্বর (paraphernalia) ইহার বেশী, এটি নাটকীয় প্রভাবের ক্ষতিকর। তৃতীয় অঙ্কের মশান দৃশ্যে নাটকের চরম-পরিণতি কালে ঘটনার সংঘাত অতি দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে কেবলই ঘুরপাক্ খাইয়াছে। করুণরস (pathos) যাহা কিছু অনুভূত হইয়াছিল তাহা ঐ করুণ দৃশ্যজনিত সাময়িক। অভিনয়ের পর দৃশ্য-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভাব আর দর্শক বা পাঠকের মনে রেখাপাত করিতে পারে নাই—এমনই হাল্কা ইহার প্রকাশভঙ্গী। তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যটির প্রকাশভঙ্গী স্থানে-স্থানে চমৎকার হইয়াছে। যদিও ইহার মধ্যে লেডী ম্যাক্‌বেথের অনুতাপ-বহ্নির স্ফুলিঙ্গ দেখা গিয়াছিল, তথাপি বলবন্ত কর্তৃক বিজয়-বসন্ত হত্যার বিবরণ রাজা-রাণীকে জানাইবার কৌশলের মধ্যে নাটকীয় ভাবেই সম্পাদিত হইয়াছিল। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজার কাছে রাণীর বিজয়-ঘটিত গুপ্ত কাহিনীর রহস্যোদ্‌ঘাটন কার্যটি মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ঠিক হইলেও, হিন্দুর চিরাচরিত সংস্কারে কেমন যেন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইয়াছে। উহার ভাষা এমনই আড়ষ্ট যে ভাবের প্রকাশ তাহাতে বিলম্বিত হইয়া গিয়াছে।

ইহার কয়েকটি গান লোকের মুখে-মুখে ফিরিতে শুনা গিয়াছিল। ঐগুলির প্রথম ছত্র এইরূপ :—(১) 'হাওয়ার তালে দুলে-দুলে নাচ রে ফোটা ফুল', ২) 'আমার আহ্লাদে প্রাণ আটখানা', (৩) 'আমাদের মা নাই—মা নাই। ভাইরে ভাইরে এত দুঃখ পাই॥" (৪) 'জুড়াই ভাই আয় মরণে।'

বাবু

'বাবু' প্রহসনখানি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। তথাকথিত ইংরাজী-নবিস খবর-কাগজওয়ালার চিত্র, বক্তৃতা-পাগল দেশ-হিতৈষীর ছবি, সমাজ ও ধর্ম সংস্কারকের চিত্র, ধর্ম-ধ্বজীর চিত্র, ভারত উদ্ধারকারী ভণ্ডদলের চিত্র, বিজ্ঞানবাতিক উৎকট বৈজ্ঞানিকের (ultra scientist) চিত্র, কোন সম্প্রদায়-বিশেষের ন্যাকামির চিত্র প্রভৃতি উৎকট ভাবের চিত্রগুলি বিশেষ দক্ষতার সহিত নাট্যকবি এখানির মধ্যে চিত্রিত করিয়াছেন।

প্রহসনকার ইহার নামকরণ করিয়াছেন সামাজিক নক্সা। ইহা এরূপ সুচিত্রিত যে উচ্চাবনত সামাজিক স্তরের কেহই ইহাতে বাদ যান নাই। তথাকথিত ইংরাজি-সভ্যতার নকল-নবিসেরা ইহার নায়ক-নায়িকা। লিখনভঙ্গীটি চমকার। এমন কোন প্রসঙ্গ নাই, যাহা না হাসিয়া উপভোগ করা গিয়াছে! ব্যঙ্গগুলি এমনি তীব্র ও সুপ্রযুক্ত যে তুলনা রহিত। সংস্কৃত সাহিত্যে কবি কালিদাস

উপমার রাজা ছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে সে পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ; প্রহসন-সাহিত্যে ব্যঙ্গোক্তির মধ্য দিয়া উপমান-উপমেয়ের সাহায্যে ব্যঙ্গপ্রকাশের ধ্বনি সৃষ্টি করিয়া আজ রাজা না হন রাজকুমার হইলেন আমাদের রসরাজ অমৃতলাল। ব্যঙ্গ বা হাস্য-পরিহাসপূর্ণ স্থানগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া দেখাইতে যাইলে সমুদয় প্রহসনখানিই উদ্ধৃত করিতে হয়, সুতরাং সে চেষ্টা না করিয়া মাত্র উপমাপূর্ণ স্থানটি উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। অশ্লীলতাবাতিক বাঞ্ছারামকে তিনকড়ি মামা যখন তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তখন বাঞ্ছারাম এইরূপ বলিল:—"ওঃ। সেই পিতার কথা, যাকে আমি সাকার ব'লে ত্যাগ করেছি? তার নাম আমি আপনাদের সমক্ষে বল্‌তে পারি না।" তিনকড়ি—"কেন, মনে নাই কি?" বাঞ্ছা—"না, নামটা বড় অশ্লীল।" সকলের পীড়াপীড়িতে বাঞ্ছারাম ইঙ্গিতে এইরূপ বলিল:—"কি বেরিয়ে গেলে মানুষ মরে যায়?" তিনকড়ি—"* * প্রাণ? তোমার বাপের নাম প্রাণকৃষ্ণ না কি?" বাঞ্ছা—"না, না,—তার চেয়েও অশ্লীল, ঐ কথাকে ইতরলোক যা বলে।" তিনকড়ি—"কি পরাণ—তুমি পরাণে কলুর ছেলে?" বাঞ্ছা—"(সরোদনে) ওঃ! ওঃ! আজ আমায় অশ্লীল কথা শুন্‌তে হ'ল, সাকার পিতার কথা শুন্‌তে হ'ল, কি অত্যাচার!—তা' অত্যাচার বিনা অনুতাপ নাই, অনুতাপ বিনা আত্মার উপায় নাই; আসুক অত্যাচার, সাঁড়াসাঁড়ির বানের ন্যায় অত্যাচার আসুক, আশ্বিনে ঝড়ের ন্যায় অত্যাচার আসুক, আসুক অত্যাচার ত্রিশ সালের বন্যার ন্যায়, পাহারাওয়ালার হুল্লার ন্যায় অত্যাচার আসুক, বস্তাফাটা সর্ষের ন্যায় বর্ষণ হউক! অত্যাচারের ঘানি যেন দেহকে পেষণ করিয়া খইল করিয়া ফেলে, আত্মা তথাপি তৈলের ন্যায় হৃদয়ভাণ্ডে চোয়াইতে থাকিবে!"

বাবুর ব্যঙ্গগুলি বড়ই তীব্র। দুই-চারিটি না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না। ইংরাজি-বাতিক ষষ্ঠীকে ভজহরি প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইলে ষষ্ঠী তাহার শ্যালক ফটিককে ঐ কথার উত্তরে কি বলিতে হয় তাহা জিজ্ঞাসা করিলে পর ফটিক বলিয়াছিল:—"জয়োস্তু, তা' পোড়ার মুখ দে বেরুবে না, ডান পা' তুলে বৈদ্যিনাথের গোরুর মতন আশীর্ব্বাদ কর।" নকল ভারত প্রেমিকের উক্তি প্রহসনকার এইরূপে দেখাইয়াছেন!—"ভারত উদ্ধার যদি আমাদের দ্বারা হয় ত হবে, না হয় ভারত উৎসন্ন যাক্।" উৎকট বৈজ্ঞানিকের উক্তি:—"দেখে নেবেন, আমি যদি বেঁচে থাকি—আর তা থাকব, কেন না আমি রোজ দুবেলা খানিকটা ক'রে ইলেক্‌ট্রিসিটি খাই।" দামোদর নামীয় উৎকট ব্রাহ্মের উক্তি এইরূপ:—"যে ভাই হয়ে আমার নিজের স্ত্রীকে আমার ভগিনী হ'তে দিলে না, তার আর মুখদর্শন কত্তে আছে।" ধর্ম্মধ্বজীদের বিরুদ্ধে তিনকড়ি মামা এইরূপ বলিতেছে:—"তোমরা ত ধরাকে সরাখানা মাত্র দেখ বই ত নয়, তারা গেরুয়া পরে, ইংরেজি কথা কয়, পৃথিবীকে একেবারে মধুপর্কের বাটি দেখ্‌ছে।" আলোক-প্রাপ্তদের পরিচয়-কালীন সম্বন্ধঘটিত কথা এইরূপ:—"এটি আমার স্বামিনীর প্রথমপক্ষের স্বামীর সময়ে জন্মেছিল, তাই আমাকে ছোটবাবা ব'লে ডাকে।" আর এক স্থানে—"এক্ষণে ভগ্নী আমার ভার্য্যা" বাঞ্ছারাম এইরূপ কথা বলিলে তিনকড়ি মামা উত্তরে জানাইয়া দিল:—"পুত্ররূপ ভাগ্নে প্রসব করলেই সব গোল চুকে যায়।" ভণ্ড ভারত উদ্ধারকারী ষষ্ঠীর মাতা পুত্রের কাছে টাকা চাহিতে আসিয়া শুনিলেন যে, সে এখন ভারতমাতাকে সেবা করিতেছে। সরল বিশ্বাসিনী পল্লিরমণী পুত্রের এই কথার এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন:—"সে ভারত কে, তোমার শাশুড়ী ত—বৌমার মা? আমি বেটা পেটে ধরে যা না পেলুম, সে মেয়ে বিইয়ে তা পেলে!"

প্রহসনকার এই নক্সাটির নাম 'বাবু' দিয়াছেন; অনেক বাবুমূর্তি ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। ধন্য তাঁহার পরিকল্পনা—এখানি অমৃতলালের বিশেষ শক্তিশালী প্রহসন। গানগুলিও খুব সাড়া তুলিয়াছিল, স্থানাভাবে প্রথম ছত্র লিখিত হইল :—(১) 'আহা বেঁচে থাক্ বেঁচে থাক্ নবপুরুষ-রতন। শ্রীমতী শ্রীপদ স্মরি যারা ভাবে অচেতন।' (২) 'পতি মলে হাতের বালা খুল্‌ব না লো খুল্‌ব না।' (৩) 'ঠান্‌দি তোমায় সাজাব লো কনে, অতি যতনে যত এয়োগণে।'

একাকার

একাকার প্রহসনটি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। সাম্যের নামে বাঙ্গালা দেশে তথা ভারতবর্ষে যে একাকার আসিয়াছিল তাহারই একটি উৎকট চিত্র ইহাতে আছে। স্ত্রী-পুরুষের কাজকর্মের যেমন ভেদাভেদ রহিল না, জাতি-নির্বিশেষে জীবিকারও তেমনি আর কোন তারতম্য রহিল না—এমনই একাকার! ইতর ভদ্র নির্বিশেষে 'ভদ্রলোক' সাজিবার যে মোহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মর্মান্তিক পরিণতি দেখিয়া প্রহসনকার রাধানাথ-চরিত্রের মুখ দিয়া একস্থানে এইরূপ বলাইয়াছেন :—"গ্রামার ছেড়ে হামার ধরেই ভাই আমার সাম্যভাব গিয়ে গ্রাম্যভাব এসেছে, দেশোদ্ধার ছেড়ে কার্যোদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়েছি। * * এখন ছোটলোক হয়ে এইটুকু লাভ হয়েছে যে, নিজেও দু-পাঁচজন দরওয়ান-চাপরাসী রেখেছি। * * আমার ত ভাই বেশ বিশ্বাস হয়েছে যে, আমাদের এই দুর্দশার প্রধান কারণ, যে যার জাত-ব্যবসা ছেড়ে দেওয়া। * * ওর (জাত-ব্যবসার) ভিতর যে সুখটুকু, যে মানটুকু, যে গর্বটুকু লুকান আছে, সেটির উপর দৃষ্টি পড়ে, তাই চাষা সন্ধ্যাবেলা মাটি মেখে ধানের বোঝা মাথায় ক'রে, গান গাইতে-গাইতে বাড়ী যায়, আর তোমার হেডক্লার্ক বাবু চাপকান প'রে ট্রাম-চড়ে একেবারে দুনিয়ার উপর চটে যমকে নিমন্ত্রণ দিতে দিতে ঘরে ফেরেন। * * ক্লেশ-আরাম, সহ্য-অসহ্য, মান-অপমান—এ সকলের বোধাবোধ কেবল অভ্যাস ও সংশ্রবগুণে।" জাত-ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ঐ রাধানাথ আর এক স্থানে বলিয়াছেন :—"এক এক জাত এক-একটা স্কুল। কৃষি প্রধান দেশ ব'লে চাষের কাজ শেখ্‌বার জন্য চার-পাঁচটা স্পেশ্যাল জাত আছে, আর প্রায় সব জাতেরই নিজের কাজ ছাড়া, চাষ কর্‌বার জন্য যেন একটা নিজ কর্ম-ব্যতিরিক্ত (Ex-officio) সুবিধা (privilege) আছে। * * তারপর হেরেডিটি—বাপেরগুণ ছেলেতে বর্তায়। * * বাপ ছেলেকে কাজ শেখাবে, অত বড় ইণ্টারেস্‌টেড্‌ গুরুমশাই আর কোথায় খুঁজে পাবে?"

কিরূপ জনশিক্ষা (mass-education) প্রয়োজনীয় সে সম্বন্ধে ঐ রাধানাথ আর একস্থানে বলিয়াছেন :—"ইতর লোকের অবস্থা হ'তে দেশের যথার্থ অবস্থা বুঝা যায়, আমাদের দেশের সামান্য সাধারণ লোক যতটুকু উন্নত, এমন আর কোন দেশে নাই। * * ইংলণ্ডের ইতর লোককে দেখ্‌লেই বুঝতে পার্‌বে যে বিলেত হাড়ে টক।" পাশ্চাত্ত্য আদর্শের অপকারিতা সম্বন্ধে নাট্যকবি ঐ চরিত্রের মুখ দিয়াই বলাইয়াছেন :—"সাহেবী ধরণের আদর্শ রেখে হিন্দু উন্নতি কর্তে যতই চেষ্টা কর্‌বে, ততই অধঃপাতে যাবে।" সাম্যভাব সম্বন্ধে আসল খাঁটি কথাটি এইরূপে বলিয়াছেন :—"* এই জাতিভেদই সাম্য। সাম্য মানে তোমারও ঘটী আছে, আমারও ঘটী আছে, নয়,—তোমার না হয় ঘটি আছে, আমার না হয় বাটি আছে। * * যেমন পরকালে তর্‌বার জন্য তাঁতিকে ব্রাহ্মণের কাছে যোড়হাত

ক'রে দাঁড়াতে হবে, তেমনি ব্রাহ্মণকেও ইহকালের লজ্জা-নিবারণের জন্য তাঁতির দ্বারস্থ হতে হবে। প্রত্যেক জাতিরই নিজের নিজের সম্মান আছে, জোর আছে।"

ভুল ধারণার (Mis-conception) বশে বংশপরম্পরাগত সামাজিক কৃষ্টিকে জলাঞ্জলি দিয়া একাকারের যে সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে প্রহসনকার সব্যসাচীর মতো ভাঙা-গড়া দুই কাজ লইয়া এই প্রহসনখানি রচনা করিয়া বাহাদুরি লইয়াছেন, ইহা রচনার এক নূতন প্রণালী। উৎকটভাব লইয়া নাড়া-চাড়া করিলেই অত্যুক্তির গন্ধ বাহির হইবে, কিন্তু আসলে সেগুলি অত্যুক্তি নহে, ক্রিয়া-বিশেষের ধর্মই তাহা!

যে গানগুলি জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহাদের প্রথম ছত্র এইরূপ:—(১) 'জবাব দেও, জবাব দেও, জবাব দেও আবি,' (২) 'হো-হো-হো সিলাওয়ে জুতি ইয়াঃ বাবু বুরুস্', (৩) 'ঝাড়্‌বো না কো ঝাড়া আর (আমরা) ভাসিয়ে দেব কুলো,' (৪) "ভেক্ নিয়ে এক বাধিয়েছে ভাই গোল। (এখন) ঘরে ঘরে চল্‌ছে মেকি, খিচুড়িতে মাছের ঝোল।" নিজ-নিজ ঘর ঠিক করিতে হইলে মহিলাগণকেই তাহা করিতে হইবে, তজ্জন্য মহিলাগণ সর্বশেষে যে গানটি গাহিয়াছিলেন, তাহার প্রথম ছত্র এইরূপ:—(৫) "দেখ্‌বো এবার আঁখিঠেরে আছে কি না আছে ধার।" ধন্য প্রহসনকারের অন্তর্দৃষ্টি!

বৌমা

বৌমা প্রহসনখানি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। কলেজ-আউট্ যুবকেরা এক-একটা মানসিক বিকারবশে (ideosyncrasy) কিরূপে সুখের সংসারকে জলাঞ্জলি দেয়, তাহারই একটা উৎকট চিত্র প্রহসনকার বৌমাতে আঁকিয়াছেন। বৌমার ভিতরে আর একটি নূতন পদ্ধতি এই, যে, নাট্যকবির অন্য দৃশ্যকাব্যের কোন চরিত্রবিশেষের নামোল্লেখ এই দৃশ্যকাব্যের কোন চরিত্রমুখে করা হইয়াছে। এ প্রথা ঠিক নহে, প্রত্যেক দৃশ্যকাব্য আপেক্ষিক না হইয়া স্বাধীন হওয়া উচিত, তাহা না হইলে দর্শক বা পাঠকের বুঝিবার অসুবিধা হয়। এই প্রহসনের সংলাপমধ্যে সম্বন্ধবিরুদ্ধ আহ্বান বা কথা মাঝে-মাঝে প্রযুক্ত হইয়াছে; এগুলি নিম্নশ্রেণীর রসিকতা। বৌমা ও বাবুরামের চরিত্র-চিত্রণ ব্যাপারে অত্যুক্তিদোষ এবং তজ্জনিত কৃত্রিমতা আছে, কিন্তু এই দোষটি উৎকট-প্রহসনের কৃত্রিমতাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। কৃতি প্রহসনকারের উহা গৌরব হানিকর হইয়াছে।

বৌমার ভাষায় বহুস্থানে দক্ষ হস্ত-পরিচালিত অলংকারবহুল উপমার প্রয়োগ আছে। ইহার প্রথম নমুনা 'বাবু'তে ছিল, তাহারই পরিণতি ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পাঠোদ্ধার করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় নহে, অনুসন্ধিৎসু পাঠক পুস্তক লইয়া একান্তে উহা উপভোগ করিয়া দেখিবেন। তথাকথিত স্ত্রী-স্বাধীনতার গতিপথে শাশুড়ীরূপী অন্তরায়ের কথা এই প্রহসনেই প্রথম শুনা গেল। 'কোন্ পোড়া বিধি গড়িল গো এ পোড়া শাশুড়ী। প্রণয়-ট্রেনে যত কলিসন্ করে ঐ বুড়ী'—শীর্ষক গানখানির মধ্যে ঐ বাধা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে অন্ধ-মক্ষিকা (blind man's buff) খেলার মধ্যে দৃশ্যকাব্যোচিত পরাকাষ্ঠা হইতে-হইতে বামাদাসের ন্যাকামির ফোড়নে উহা গাঢ় না হইয়া তরল হইয়া গিয়াছে। প্রহসনগত উৎকেন্দ্রিক (Eccentric) চিত্রগুলি দণ্ডভেদে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে, ইহাদের পারস্পরিক

সম্বন্ধের প্রয়োজনীয়তা তজ্জন্য শিথিল হইয়াছে। দৃশ্যকাব্য ঠিক এরূপভাবে চলে না; দীর্ঘ বক্তৃতার চাপে ইহার নাট্যাংশও চাপা পড়িয়াছে।

'পরের চাকুরি করিব না'—এই ভাব লইয়া কলেজ হইতে নিষ্ক্রান্ত বাবুরাম সংসার-পালন বিষয়ে পাড়ার মতিলাল-মামাকে বলিয়াছিল যে, সে ভিক্ষান্নের দ্বারা অন্নসংস্থান করিবে তথাপি চাকুরি করিবে না। মতিলাল এই কথার উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে বাঙ্গালী চরিত্রের আরামপ্রিয়তাই প্রকাশিত হইয়াছে, কথাগুলি এইরূপ :—"এক মুষ্টি চালের জন্য লোকের দোরে-দোরে দাঁড়াবে, তবু গতর খাটিয়ে চাকুরি করবে না। উঃ। বুকের জোর বটে। হ্যাঁ বাবুরাম, যদি তেজই দেখালে বাবা, নিদেন মোট বয়ে খাব, কি কোদাল পেড়ে খাব, এর একটা মুখ দিয়ে বেরুল না কেন?" তথাকথিত স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে উৎকট প্রণয়নেশা (romance) কিরূপে বাঙ্গালীর সুখের সংসারকে অধঃপতনের পথে লইয়া যাইতেছিল তাহার চিত্র এই প্রহসনের কৈন্দ্রিক বিষয়। অবান্তর বিষয়গুলি কম-বেশী মূলের সম্পর্কহীন হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রাম্য বিভ্রাট

এই সামাজিক প্রহসনখানি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নূতন মিউনিসিপ্যাল স্বায়ত্ত-শাসন প্রাপ্ত কোন এক গ্রামের চিত্র ইহাতে আছে। শান্তিপূর্ণ নিরুপদ্রব গ্রামখানির ইতর ও ভদ্র অধিবাসীরা প্রতিবাসীর সুখ-দুঃখে সহানুভূতি বা সমবেদনা লইয়া বাস করিত, স্বায়ত্ত-শাসনের ফলে কমিশনার মনোনয়ন ব্যাপার লইয়া কিরূপে উহা আত্মীয়বিচ্ছেদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিবাদ-বিসংবাদের ক্ষেত্রে পর্যবসিত হইয়া গেল, তাহার চিত্র ইহার উপন্যস্ত বিষয়। প্রহসনকার নিরাশাবাদীর (pessimistic) দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ঐ নব-প্রবর্ত নাটিকে দেখিয়াছিলেন, তাই আশাবাদীর (optimistic) কোন দৃষ্টিভঙ্গী উহাতে ছিল না।

স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে 'সেকেলে-একেলের' ছবি, যাহা খিড়কীর পুকুরঘাটে, গ্রাম্যপথে এবং গৃহস্থের উদ্যান-বাটিকায় নিত্য দেখা যাইত, তাহার চিত্রও প্রহসনকার দক্ষ হস্তে ইহার মধ্যে আঁকিয়াছেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ধারাবাহিক বিবরণটি একটি গানের মধ্যে চড়কের সঙয়ের গানের মতো প্রহসনকার চুম্বকে দিয়াছেন, স্থানাভাবে ইহার প্রথম ছত্রটি উদ্ধৃত হইল :—"সাতানই হই অই পায়ে নমস্কার।"

হরিশ্চন্দ্র

হরিশ্চন্দ্র নাটকখানি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহার রচয়িতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে; জনরব বলে অমৃতলাল ইহার প্রকৃত প্রণেতা নহেন, প্রকাশক মাত্র। যাহা হউক অন্য রচয়িতার নাম যখন অজ্ঞাত রহিয়াছে তখন অমৃতলালকেই ইহার প্রণেতা ধরিয়া আমরা আলোচনা করিতেছি। বিশেষতঃ নাটকের বিদূষক ও কামন্দকের লঘুভাব জ্ঞাপক সংলাপের ভঙ্গীটি প্রহসনে সিদ্ধহস্ত অমৃতলালের লিপি-কৌশলটিকে প্রকাশিত করিয়াছে, সুতরাং অমৃতলালই যে ইহার প্রকৃত লেখক তাহা একরূপ নিঃসন্দেহ।

এখানি পৌরাণিক নাটক, ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' নাটকের অনুসরণে লিখিত হইয়াছে। অমৃতলালের পূর্ববর্তী নাটককার মনোমোহন বসু এই নামে আর একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন, তাহাতে মূলক্রিয়া কতকগুলি অবান্তর ক্রিয়ার চাপে গতিহীন হইয়া গিয়াছিল; ঐ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা তাঁহার কালমধ্যে প্রাপ্তব্য।

বিশ্বামিত্র তপোপ্রভাবে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিবার পর হরিশ্চন্দ্র-সম্পর্কিত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের যথাক্রমে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বিদ্যা তপোপ্রভাবে আয়ত্ত করিবার লোভে বিশ্বামিত্র ত্রিবিদ্যাসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বিধাতা মহারাজ হরিশ্চন্দ্র দ্বারা বিশ্বামিত্রেব এ মহাতপে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন, কিরূপে তাহা ঘটিয়াছিল নাটকে তাহাব বর্ণনা আছে। ধর্ম ও পুরুষকারের দ্বন্দ্বে কে বিজয়ীর মুকুট পরিয়াছিল—বক্ষ্যমান নাটক তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছে।

তপোবনের প্রভাব, পবিত্রতা ও মাধুর্য দেখাইবার প্রলোভনে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটক হইতে তাহার বর্ণনার ভঙ্গী, মুনিকন্যাগণের তরুলতার আলবালে জলসেচন ব্যবস্থা, পুষ্পমধুপের প্রণয়গীতি প্রভৃতি ঘটনাবলি নাটককার নিজস্ব করিয়া লইয়া এই নাটকের মধ্যে ঢুকাইয়াছেন। পূর্বগামী উপন্যাসকার বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত কপালকুণ্ডলার কাপালিক ও নবকুমারের কথোপকথনেব ভঙ্গীতে নাটককার হরিশ্চন্দ্র ও বিশ্বামিত্রের কথোপকথনে সংস্কৃত ও বাঙ্গালাব সংমিশ্রণদ্বারা নাটকের প্রধান চরিত্রের সংলাপের মান (standard) উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তপোবনের পবিত্রতা ও শোভা দেখাইবার জন্য মুনিকুমারগণের মুখে সংস্কৃত-গীতি-ছন্দে প্রকৃতির বর্ণনা কৌশলে নূতনত্ব আনিয়াছেন।

ইহার বিদূষক চরিত্রে কোন নূতনত্ব নাই। নায়ক-নায়িকা চরিত্রদ্বয় প্রতি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে উত্তরোত্তর মধুর হইতে মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বামিত্র-শিষ্য কাগন্দক মনোমোহনের পুণ্ডরীক চরিত্রের ছায়াপাতে সৃষ্ট হইলেও গুরু-বিশ্বামিত্রের চরিত্র বিকাশে তাহার মতো বাধা-সৃষ্টি করে নাই। নাটকোচিত সংঘাত নাট্যকার স্থানে-স্থানে সুকৌশলে আনিয়াছেন। ভবিষ্যচ্ছায়া পূর্বগামিনী হয় বলিয়া হরিশ্চন্দ্রের দান-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের সংলাপে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে।

যে কথাগুলি চরিত্র বিকাশেব সহায়ক হইয়াছিল, সেগুলির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। প্রসঙ্গ ও ভাব কেমন উন্নত দেখুন। বিশ্বামিত্রের চরণে সমুদয় পৃথিবী সমর্পণ করিয়া হরিশ্চন্দ্র গৃহ হইতে স্ত্রী-পুত্রকে অপসারিত করিতে আসিলে শৈব্যা ঐ অপ্রত্যাশিত দানের কথায় এইরূপ বলিয়াছিলেন:—"যে রমণী বিশ্বজয়ী পুত্র প্রসব করতে পারে, সে পৃথিবীদানে কাতর হয় না। আমি জানি যে, ধরণী ক্ষত্রিয় সন্তানের ক্রীড়ার বস্তু, সে ইহা হেলায় দান, হেলায় গ্রহণ করতে পারে।" ঐ সংলাপের অপর স্থানে শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রকে বলিয়াছেন:—"মহারাজ! জানবেন, আমারও সেই মহাশক্তির অংশে জন্ম! পৃথ্বিনাথ! পুরুষের বল তাঁর সর্বশরীরে বিভক্ত, কিন্তু রমণীব সমস্ত বল তাঁর হৃদয়ে।" এই কথা শুনিয়া পত্নী-গরিমায় উৎফুল্ল হইয়া হরিশ্চন্দ্র বলিয়াছিলেন:—"কোথা বিশ্বামিত্র! এস, দেখ, দেখ তুমি কি সামান্য ঐশ্বর্য্য নিয়েছ, * * কি অসীম প্রেমের রাজ্য সঙ্গে লয়ে সে তোমায় ছার মৃত্তিকার পৃথিবী ত্যাগ করে যাচ্ছে,—একবার দেখে যাও!" শৈব্যাকে অঙ্গ হইতে রত্নালঙ্কার উন্মোচন করিতে দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র কাতর হইয়া পড়িলে শৈব্যা নিম্নলিখিত কথায় তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিলেন:—"একগাছি অমূল্য রত্নহার আজ থেকে আমি নিশিদিন পরে থাকবো, এস মহারাজ,

পরিয়ে দাও (রাজার হস্ত লইয়া নিজ গলদেশে বেষ্টন)।" ধার্মিক হরিশ্চন্দ্র ভাবাবেশে ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া তখন এইরূপ বলিয়াছিলেন :—"জগদীশ্বর! স্নেহের পারিজাত দেখ্‌বার জন্য সহানুভূতির অমৃত পান করাবার জন্যই কি তুমি দুঃখের সৃজন করেছ? * * বিশ্বামিত্র! অযোধ্যা রহিল, রাজলক্ষ্মী হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে চল্‌লো" বলিয়া স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে গৃহত্যাগ করিলেন।

গোপনে আত্মবিক্রয় করিয়া পণলব্ধ অর্ধ সহস্র সুবর্ণমুদ্রাদ্বারা বিশ্বামিত্রের কাছে স্বামীর ঋণের অর্ধাংশ পরিশোধ করিয়া শৈব্যা প্রকৃত অর্ধাঙ্গিনী ও সহধর্মিণীর কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনায় দাসীরূপে পরগৃহে যাইবার কালে স্বামী-উদ্দেশে শৈব্যার বিদায়-বাণীটি এইরূপ :—"অধীনী তাঁর চিরদাসী, তাঁর কার্যেই পর-পরিচর্যায় দেহ নিয়োজিত কল্লেম,—এখন প্রাণ অবিচ্ছিন্নভাবে সেই চরণেই পড়ে রইল। আমার ধর্ম, পুণ্য, দেবতা, স্বর্গ সবই তিনি, তাঁর চরণে অপরাধী হয়েছি, তিনিই মার্জনা করবেন। * * শৈব্যার বিশ্বনাথ! বিদায় হই! ধর্ম যদি কর্মফল খণ্ডন করেন, তবে জগতে আবার চরণে স্থান পাব, নচেৎ দু'দিনের এই অভিনয়ান্তে সেই অনন্তধামে অবিচ্ছেদ পতিসুখ ভোগ করবার আশায় রইলেম।" শৈব্যার চরিত্রোন্মেষের সহায়তার জন্য নাটককার তাঁহাকে ক্রীতদাসী করিয়া এমনি একটি পরিবার মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন, যেখানে নানাবিধ অত্যাচারের ভিতর দিয়া তাঁহার চরিত্রের সদ্‌গুণরাজি আপনা-হইতে বিকশিত হইতে লাগিল। শৈব্যার দাসিত্ব গ্রহণ সংবাদ বিশ্বামিত্রের মুখে শুনিয়া হরিশ্চন্দ্রের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি বেদনার পীড়নে সহসা বলিয়া উঠিলেন :—"সহস্র কিঙ্করীর অধিকারিণী শৈব্যা দাসী!!"

প্রতিজ্ঞা পূরণের শেষ দিনে—এমন কি শেষ মুহূর্তে বিশ্বামিত্র কর্তৃক উদ্বুদ্ধ হরিশ্চন্দ্র সত্যনাশ ভয়ে বলিয়া উঠিলেন :—"আর ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার নাই, যাঁরে ইচ্ছা বিক্রয় করুন, আপনার ঋণ আপনি পরিশোধ ক'রে নিন। * * মুকুটবাহী শির আজ আচণ্ডালের সেবা করতে প্রস্তুত।" বিধাতৃবিধানে চণ্ডাল ক্রেতা সে স্থানে উপস্থিত হইল; মুখে বলিলেও হরিশ্চন্দ্র কার্যতঃ চণ্ডাল গৃহে যাইতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ঐ অবসরে সূর্যবংশের নিদানভূত সূর্যদেবের অস্তগামী কিরণ-ছটা হরিশ্চন্দ্রকে দেখাইয়া সত্যভঙ্গের কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি সংস্কৃতশ্লোক দ্বারা সবিতার স্তব করিয়া চণ্ডালের দাসত্ব গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মর্ষির নিকট পৃথিবীদান জনিত সহস্র স্বর্ণমুদ্রা-দক্ষিণাব্রত আজ হরিশ্চন্দ্র কর্তৃক উদ্‌যাপিত হইল। নাট্যকার এখানেও সৌন্দর্য বৃদ্ধি কল্পে সংস্কৃতের লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই।

নাট্যকার শৈব্যাকে যেরূপ নিষ্ঠুরতাপূর্ণ সংসারে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন, হরিশ্চন্দ্রকে কিন্তু তদ্বৈপরীত্যে সমাজে ঘৃণ্য হইলেও স্নেহশীল এক চণ্ডাল পরিবার মধ্যে রাখিয়া কাজকর্মের দিক-দিয়া না হোক্ প্রভু-ভৃত্যের দিক্ দিয়া তাঁহাকে সুখী করিয়াছিলেন। তাই হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালপ্রভুর গুণ-গরিমায় উৎফুল্ল হইয়া একস্থানে এইরূপ বলিয়াছিলেন :—"আহা, কে জান্‌তো যে, শববাহক চণ্ডালের কর্কশ অস্থি-চর্মে এমন কোমল হৃদয় থাকে? আহা এমন কত যোজনগন্ধা সুরভি কুসুম তমসাবৃত ঘন বনমধ্যে আপনি প্রস্ফুটিত হ'য়ে আপনিই শুকায়ে যায়। কে জানে লোক-লোচনের সুদূর অন্তরে কত কৌস্তুভ-লাঞ্ছিত রত্ন খনির গভীর কালিমার গর্ভে অনাদরে গড়াগড়ি যায়।" এই কথাগুলি শুনিয়া নাটকের দর্শক বা পাঠকের মনে গ্রে (Grey) সাহেব লিখিত বহু বিখ্যাত "Elegy written in country churchyard" শীর্ষক কবিতাটির কথা যুগপৎ স্মরণ করাইয়া দেয়।

রোহিতাশ্ব চরিত্রটি ক্ষুদ্র হইলেও গুণ-মাহাত্ম্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সাহচর্যে মানুষের দোষ-গুণ বর্তাইয়া যায়। হরিশ্চন্দ্রের দান-মাহাত্ম্য তাঁহার মন্ত্রী চরিত্রকেও প্রভাবিত করিয়াছিল, ইহাই মন্ত্রীচরিত্রের নূতনত্ব। সেনাপতি চরিত্রের নির্ভীকতাও ঐ সাহচর্য্যগুণের ফল। মনোমোহন বসু সৃষ্ট বিশ্বামিত্র অপেক্ষা অমৃতলালের বিশ্বামিত্র চরিত্রটি এ নাটকে বেশী ফুটিয়াছে। দু-একটি স্থানে বিশ্বামিত্রকে দুর্জ্ঞেয় বোধ হইয়াছে, যেমন,—রোহিতাশ্বের অলংকার অযোধ্যায় প্রেরণ-ব্যাপারে তাঁহার শিষ্য কামন্দকের সহিত বিশ্বামিত্রের সংলাপটি এবং গুরু লইয়া কামন্দকের শ্লেষব্যঙ্গ কার্যটি তাঁহার ন্যায় ব্রহ্মর্ষি চরিত্রের অপহ্নবকারী হইয়াছে। পরিশেষে ঐ দৃশ্যের শেষের দিকে:— 'এই কর্ম করায় কে, তারে পেলেম না। কে এ কর্মের কর্ত্তা?'—বলিয়া বিশ্বামিত্রের ন্যায় মুনি, যিনি তপস্যার দ্বারা যথাক্রমে রাজর্ষিত্ব হইতে মহর্ষিত্ব লাভ করিয়া ক্ষণপরেই ব্রহ্মর্ষিত্ব পর্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার মুখে এরূপ অনিশ্চয়াত্মক বাণীর প্রয়োগ অশোভন হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের দান-মহিমা বিচার করিয়া স্বগতোক্তির মধ্যে বিশ্বামিত্র একস্থানে এইরূপ বলিয়াছিলেন:—"জিত্‌লে কে! আমি না হরিশ্চন্দ্র?"—এই কথা কয়টির মধ্যে নাটকীয় সমস্যা পূর্বাপর কার্যাবলি-দ্বারা আপনা-হইতেই সমাধান-প্রাপ্ত হইয়াছিল। ধর্মদর্পী হরিশ্চন্দ্রের ধার্মিকতার অভিমান ছিল, তাই ধর্ম তাঁহাকে পরীক্ষানন্তর পৌরাণিক চরিত্র নিচয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর আসনে উপবিষ্ট করাইলেন। রাজ সিংহাসন সেখানে তুচ্ছ, তাই ধর্ম বলিয়াছেন:—"অপরকে জয় করা তো অতি তুচ্ছ কথা; সিংহ, ব্যাঘ্রাদি বলবান পশুতে তো তা' নিত্য ক'রে থাকে। কিন্তু সকল জয়ের শ্রেষ্ঠ জয়—আত্মজয়।" এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। ঐ ধর্ম আর এক স্থানে এইরূপ বলিয়াছেন:—"একে উত্তেজনা-অবসাদের দাস পঞ্চেন্দ্রিয়সম্পন্ন পঞ্চভূতের দেহ, তার উপর একটি ষড়রিপুজড়িত মন—লীলাস্থল এই মায়াকানন; পরমায়ু অতি অল্প। * * মানবের যে পদে পদে পদস্খলন হবে, তাতে বিচিত্রতা কি!"

নাটককার এই নাটকের ভাষায় মাঝে-মাঝে উপমালংকার দিয়াছেন। ঐ অলংকারগুলিকে চরিত্র ও পরিবেশের সম্পূর্ণ উপযোগী করা হইয়াছিল। নিম্নে একটির উদাহরণ দেওয়া হইল; শ্মশানে দুর্যোগ দেখিয়া এক চণ্ডাল এইরূপ বলিয়াছিল:—"ঠিক সর্দ্দার দাদা, ঠিক বলচুস্—যেন লাখে মশানের কয়লা নিয়ে সারা আকাশে বসিয়ে দিয়েছে, আকাশ ভ'রে কালা ঢালিয়ে দিয়েছে। * * এক একদিকে বিজলী চমকুছে যেন নয়া চুল্লি জ্বালিয়ে দিচ্ছে।"

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে উপসংহার সন্ধিকালে নাটককার নাটকের চরম পরিণতি যাহা বিষাদান্ত হইতে-হইতে নাটকীয়ভাবে মিলনান্তে পরিণত করিয়া দিলেন, তাহা দেখিবার ও বুঝিবার জিনিস করিয়াছেন। করুণ রস (pathos) সংলাপের মধ্যে উত্তরোত্তর কেমন করিয়া পরাকাষ্ঠাকে টানিয়া আনিয়াছে, তাহা নাটককার কৃতিহস্তে সম্পন্ন করিয়াছেন। নমুনা স্বরূপ একটি প্রকাশভঙ্গী উদ্ধৃত করিতেছি। শ্মশানের ঘোর ঘন-ঘটার মধ্যে বিদ্যুদালোকে রোহিতাশ্বের অনাবৃত মুখমণ্ডল দেখিয়া ও রোরুদ্যমানা রুদ্ধকণ্ঠা শৈব্যার অস্ফুট কণ্ঠস্বর শুনিয়া সন্দেহদোলায় দোলায়িত চিত্ত হরিশ্চন্দ্র এইরূপ বলিলেন:—"তার রোদনের স্বর তো কখনও শুনি নি, সে রব আমার কানে নাই, (প্রকাশ্যে) তুমি বল, স্পষ্ট ক'রে বল—বল তোমার নাম শৈব্যা তো নয়?" শৈব্যা তখন চণ্ডালরূপী হরিশ্চন্দ্রকে চিনিলেন, এবং এইরূপে তাঁহার প্রথম বাক্যস্ফূর্তি হইয়াছিল:—"ভগবান্, তবু তোমায় দয়াময় বল্‌তে হবে না? কেমন নিমিষে পুত্রশোক ভুলিয়ে দিলে! খুব দেখালে! খাঁড়ার ঘায়ে প্রাণের কাঁটা তুল্লে!"

ঐ নাটকীয় মুহূর্তেই বিশ্বামিত্র সেখানে আবির্ভূত হইয়া নিম্নলিখিত কথাকয়টিদ্বারা নাটকটি শেষ করিয়া দিলেন :—"সংসারের ঘোর ঘনঘটাবৃত অমাবস্যা দেখ্‌লে, কৌমুদী-হাসিরাশি-ভাসিত পূর্ণিমা দেখ্‌বে না? তোমার পুত্রের মুখচুম্বন করবে না? রোহিতাশ্বকে রাজসিংহাসনে বস্‌তে দেখ্‌বে না?"

নাটক প্রকৃত পক্ষে এই খানেই শেষ হইল; জাল গুটাইবার জন্য যে টুকু অবশিষ্ট রহিল তাহা দর্শক বা পাঠকের পক্ষে বুঝিতে আর বাকী রহিল না। নাটকটি সংগীতবহুল নহে; মাত্র দুইখানি গান বেশ সাড়া তুলিয়াছিল, ঐ দুইটির প্রথম ছত্র এইরূপ :—(১) "ফুলবাণ! আমাদের মেরো না কো ফুলবাণ। তোমায় কর্‌বো পূজা ধনুকধারী, দিও না ধনুকে টান॥" (২) "নাইরে নাইরে আহা হা-হা নাই। এই যে ছিল-ছিল-ছিল আর সে নাই॥" এখানি Tragi-comedy শ্রেণীর নাটক।

সাবাস আটাশ

এই প্রহসনখানি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। বড়লাট লর্ড কার্জনের শাসনকালে বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর স্যর্ জন্ উড্‌বরণের সময়ে নূতন মিউনিসিপ্যাল আইনের প্রতিবাদস্বরূপ কলিকাতা শহর ও শহরতলীর আটাশ জন কমিশনার একযোগে পদত্যাগ করিয়াছিলেন; ঐ বিষয় লইয়া এই প্রহসনখানি রচিত হইযাছিল। তদানীন্তন ২৯টি ওয়ার্ডের একজন ব্যতীত সকলেই পদত্যাগ করায় দেশের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এই প্রাহসনিক অবয়বে যে সকল অতিশয়োক্তি (exaggeration) আছে, তাহা প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য আনীত হইয়াছিল, এটি দোষাবহ নহে। গুণ বা দোষের যথাক্রমে আদর্শ বা অনাদর্শ খাড়া না করিতে পারিলে উভয়ের পার্থক্য বুঝা যায় না।

অমৃতলাল তাঁহার সম-সাময়িক সমাজের ভিতর যে সকল অনাচার লক্ষ্য করিয়াছিলেন ইহার মধ্যে সেগুলির প্রতি কটাক্ষপাত করিতে ছাড়েন নাই। তাই, সংবাদপত্রের স্তম্ভে অদ্ভুত ও অশ্লীল বিজ্ঞাপনের প্রতি এবং তৎকালোচিত এক জাতীয় অনুপ্রাসবহুল (alliterated) ও শব্দাড়ম্বরপূর্ণ (bombastic) ইংরাজিভাষার উপর ব্যঙ্গ করিতেও পরাঙ্মুখ হন নাই। প্রহসনকার একদিকে যেমন পেটেন্ট বিজ্ঞাপনদাতার বিরুদ্ধে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তেমনি আবার অন্য পেটেন্টওয়ালার পোষকতা করায় তাঁহার ঐ বিদ্রূপ যুক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, এবং প্রহসনের পাঠক বা দর্শকের বুঝিতে বাকী থাকে নাই যে এখানি তাঁহাদের বিজ্ঞাপনের জন্যই লিখিত হইয়াছিল। দৃশ্যকাব্য-রচয়িতার কাছে নাট্যক্রিয়ার গতি এইরূপে পথহারা হইলে দুঃখ হয়। উদ্দেশ্যমূলক প্রহসনগুলি উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গেই মরিয়া যায়, এই প্রহসনখানিরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। পণ্ডিতাভিমানী কোন মূর্খ পণ্ডিতের সংস্কৃত জ্ঞানের উপর পরিহাস করিয়া নাট্যকবি তাঁহার স্বভাব সুলভ ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা একস্থানে বলিয়াছেন :—"ঠাকুর দেখ্‌ছি, সংস্কৃতটা কাবুলের টোলে পড়ে এসেছ!"

সংগীত বিভাগে—'আহা গুণময় সে যে রসময়। গুণে ঘুণ ধরে না, মুন ক্ষয়ে না কত দেব পরিচয়' এবং 'মা আয় মা, আয় মা আয়! আশ্বিন এসেছে ফিরে কবে তোরে পাব হায়!'—শীর্ষক গান দুইখানি জনপ্রিয় হইয়াছিল।

এখানির সংক্ষিপ্ত আকারের পূর্ব নাম ছিল 'ধীবর ও দৈত্য', 'যাদুকরী' তাহারই বর্ধিত সংস্করণ। আরব্য উপন্যাসের গল্পকে কল্পনার জাদুবলে সাজাইয়া-গুজাইয়া নাট্যকার ইহার যাদুকরী নাম সার্থক করিয়াছেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটারে 'ধীবর ও দৈত্যের' প্রথম অভিনয় সম্পাদিত হইয়াছিল, তারিখ সংগৃহীত হয় নাই। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে যাদুকরী প্রথম অভিনীত হইল।

এখানি কোন্ জাতীয় দৃশ্যকাব্য? দৃশ্যকাব্য প্রণেতা ইহার নাম দিয়াছেন—পঞ্চরং। পাঁচরকম মুখচার ইহাতে আছে বটে, কিন্তু একটা কেন্দ্রগত গল্পাংশ অবলাসিংহ ও তড়িতা-সুন্দরীকে আশ্রয় করিয়া গজাইয়া উঠিয়াছিল। সোনালীর কৌশলে পাহাড়দ্বীপের সোনার সংসার বিষাদান্ত হইতে-হইতে জাদুপ্রভাবে মিলনান্তে পর্যবসিত হইয়া গেল, তজ্জন্য ইহাকে নাটিকাশ্রেণীর অন্তর্গত করা যায়। স্বামীর লালসা-বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইতে-যোগাইতে কোমল হৃদয়া স্ত্রী কিরূপে পাষাণী হইয়া যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিয়াছিল তাহারই চিত্র যাদুকরীতে আছে। সংযমের সীমা অতিক্রম করিলেই ভুগিতে হয়। নাটিকাকার নানা ব্যঙ্গ-পরিহাসের ভিতর দিয়া স্ত্রী-পুরুষের এই দুর্বলতা দেখাইয়া দিয়াছেন। ব্যঙ্গবিদ্রূপ কোন কোন স্থানে দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী হয় নাই। সোনালীর কয়েকখানি গান দর্শকবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, বাহুল্য-ভয়ে ঐগুলির প্রথম ছত্র মাত্র উদ্ধৃত হইল:—(১) 'পীরিতে বিপরীতে মজে ওগো মন। কামিনী কুরূপে ভজে থাকৃতে পতি মদনমোহন॥' (২) 'সন্ত ফোটা পদ্ম দেখি বদনখানির ছাঁদ। কি নীল আকাশে ভাস্‌ছে যেন চতুর্দশীর চাঁদ॥' (৩) 'মজালে মুস্কিল হলো ওরে মাছ মিলে না মূলে। মর্‌বে জানে খানা বিনে আজকে ছেলে-পুলে॥' (৪) 'আমি নারী হয়ে বুঝ্‌লেম নাকো নারীর কেমন মন। ফুলের মত কুলের বালা পাষাণ এমন॥' (৫) 'এই কাঁচা বয়েস দেখে ওগো নজর দেয় ভূতে।' (৬) 'মুখখানি তো বেশ। আধখানি চাঁদ কপালখানি কাদম্বিনী কেশ।'

অমৃতলালের রসের বুক্‌নি সারা নাটিকাখানির মধ্যেই পাওয়া যায়; বাহুল্য ভয়ে মাত্র মৎস্যকুমারী ও দৈত্যের সংলাপ-মধ্যস্থিত নিম্নলিখিত অংশটির উদ্ধৃতি দেখানো হইল। দৈত্য মৎস্যকুমারীকে বলিতেছে—'আর কথায় কাজ কি—ভাব্‌ছি আপনাদের যারা বে করে, তাদের ভারি মজা।' মৎস্য-কু—'কি রকম?' দৈত্য—'মুড়োয় অধরসুধা, ল্যাজে মাছ ভাজা; প্রেমপিয়াসা পেটের ক্ষুধা একাধারেই মিটে যায়।'

আদর্শ-বন্ধু

এই নাটকখানি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রেল তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি মিলনান্ত নাটক হইয়াও মিলন ঘটাইবার পূর্বে নাটকের সর্বশেষ মিলন-সংগীতের একটি ছত্রে যেরূপ ইঙ্গিত আছে, সেই মতো বহু অনর্থপাত ইহার ভিতর ঘটিয়াছিল। সেই ছত্রটি এইরূপ:—'বিষাদ-পাথার মথি তুলিল সুধার ধারা।'

নাটকের নাম দেখিয়া ইহার উদ্দেশ্য কি সহজেই বুঝা যায়। বন্ধুর জন্য স্বার্থত্যাগ গিরিশচন্দ্র 'ভ্রান্তি' নাটকে দেখাইয়াছেন, কিন্তু প্রাণোৎসর্গ অমৃতলাল এই নাটকেই প্রথম দেখাইলেন। * উপন্যস্ত-বিষয়টি ভাল হইয়াও পরিচর্যার (delineation) দোষে নাটকখানি জমিল না। ভাবের সহিত ভাষার সংগতিরক্ষা নাটকের মধ্যে নাই। ভাষা স্থানে-স্থানে বেশ কবিত্বপূর্ণ, কিন্তু এমন একটা খাপ্ছাড়া আড়ষ্টভাব উহার মধ্যে আছে যে ভাবার সাবলীল গতি তজ্জন্য সংহত হইয়াছে ও নাটকীয় সংঘাত মাত্রাচ্যুত হইয়া গিয়াছে। ক্রিয়া-সংঘাত ঘটিয়া যাইবার পরও নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর বক্তব্য শেষ হয় না—এমনি দীর্ঘ তাহাদের সংলাপ। নাট্যকারের সহজাত ব্যঙ্গোক্তিপ্রসূত হাস্য-পরিহাস অস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে, এমন কি কোন-কোন স্থানে ঐগুলি মূল ক্রিয়ার প্রাধান্য নষ্ট করিতেও পরাঙ্মুখ হয় নাই। শ্লীলতা সর্বস্থানে সুরক্ষিত ছিল না। হিরণ্ময়ী বা আশাবতী স্ত্রীচরিত্রদ্বয় বেশ ফুটিয়াছে, কিন্তু অবশিষ্ট ক্ষীণাঙ্গ স্ত্রীচরিত্রগুলিদ্বারা জাতি রূপ (type) সৃষ্টি করিবার প্রয়াসে নাট্যকার ব্যর্থকাম হইয়াছেন।

এই নাটকের মধ্যে এক বিষয়ে নাট্যকারের চেষ্টা সম্পূর্ণ মৌলিক। কুম্ভসিংহের ন্যায় ভীমরথি প্রাপ্ত (dotant) কোন নাটকীয় চরিত্র নাটকের রঙ্গভূমিতে ইতঃপূর্বে দেখা যায় নাই, অমৃতলাল এ বিষয়ে কেবল অগ্রদূত নহেন, পারদর্শিতাও দেখাইয়াছেন।

রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় প্রজাতন্ত্রের আদর্শ প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে গিরিশচন্দ্রের 'শ্রীবৎস-চিন্তায়' এবং তাহারই কিছুকাল পরে অমৃতলাল এই নাটকে প্রথম দেখাইতে চেষ্টা করিলেন। কিসের অভাবে তাহা টিকিল না, সেই-সেই নাটকের অভ্যন্তরে তাহার সন্ধান আছে। কবিরা যে ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা ইহা তাহারই একটা নিদর্শন। চটসাঁই চরিত্রে নাট্যকার যে নূতনত্বের আভাস দিতে গিয়াছেন, তাহা গিরিশচন্দ্রের ঐ জাতীয় চরিত্রের কাছে হীনপ্রভ হইয়াছে। উদরায়ণের নিরর্থক শব্দাড়ম্বর-প্রিয়তার মধ্যে নাট্যকারের কিছুদিন পূর্বে রচিত 'সম্মতি সঙ্কট' প্রহসনের টোলো পণ্ডিতগণের কিছু-কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। পৃথ্বিধর সম্বন্ধীয় একটা বড়রকমের বিপদের সম্ভাবনায় তাঁহার পরিজনবর্গ যখন ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন তখন উদরায়ণের ঐরূপ ন্যাকামি বিসদৃশ ঠেকিয়াছে।

সংগীতবিভাগে মাত্র 'ওরে ওরে দেহখান দর্পণে দেখে বয়ান, ছল করে বলরে মন আমি বড় রূপবান, কিন্তু সব মাটি-সব মাটি' শীর্ষক গানখানি কিছু উপভোগ্য হইয়াছিল, বাকিগুলি বক্তৃতার মতই দীর্ঘ ও নীরস।

কৃপণের ধন

কৃপণের ধন ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৬ মে তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। দৃশ্যকাব্য প্রণেতা ইহাকে প্রমোদ-প্রহসন বলিয়াছেন। যদিও প্রহসনের ভিত্তির উপর ইহার জন্ম তথাপি নাট্যক্রিয়াগুণে ইহা নাটিকার রূপ ধারণ করিয়াছে। নাটককার গিরিশচন্দ্র যেরূপ তাঁহার 'মনেরমতন' নাটকটিকে নাটিকার ভিত্তির উপর গড়িতে গিয়া নাটকের রূপ দিয়াছিলেন, অমৃতলালও ঠিক সেইরূপে 'কৃপণের ধন'টিকে প্রহসনের ভিত্তির উপর নাটিকার রূপে রূপবতী করিয়াছেন। মোলেয়ারের 'The Miser' নামক দৃশ্যকাব্যের প্রভাব ইহার মধ্যে আছে।

---

* "ইহা 'দেমন ও পাইসিয়স' নামক গ্রীসদেশীয় দুই আদর্শ বন্ধুর আখ্যান অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল।" পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী' হইতে এই অংশটি সংগৃহীত ১০৫ পৃঃ।

মাত্র দুইটি দৃশ্যের মধ্যে কুন্তলা-মন্মথের প্রণয়কাহিনীটি সুন্দরভাবে পুষ্পের মতো বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। চরিত্র-চিত্রণ-ব্যাপারে নাটিকাকারের দক্ষ হস্তের ছাপ ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। হলধরের 'পাউণ্ড-শিলিং-পেন্সের' অস্বাভাবিক মমতার মধ্যে মানুষ হইয়া কুন্তলা কিরূপে তাহার মাতৃপ্রদত্ত দশহাজার টাকার সদ্ব্যবহার করিতে শিখিল, এবং ঐ কার্যের মধ্যে তাহার প্রকৃতিদত্ত মহত্বের স্ফুরণ দেখিয়া নাটিকার দর্শক বা পাঠকসমাজ বংশানুক্রমের প্রভাবে বিস্মিত না হইয়া যান না।

মধুখুড়োর চরিত্রটি অপূর্ব। জগতে অবজ্ঞাত ব্যক্তিরাই মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়া থাকেন, মধুখুড়ো তাহারই একটি আদর্শ। নেশার অভ্যাস থাকিলেও নেশা সর্বতোভাবে ঐ প্রকৃতির লোককে গ্রাস করিয়া তাঁহার মনুষ্যত্ব হরণ করে না। বহু কর্মের মধ্যে প্রাণকে হাল্কা রাখিবার জন্য রঙ্গ-পরিহাস করা মধুখুড়োর চিত্ত-বিনোদনের উপায় ছিল। পরোপকারে অভ্যস্ত বলিয়া স্বার্থের দিকে নজর তাঁহার মোটেই ছিল না, তাই তাঁহাকে ভবঘুরে করিয়াছিল। কপটতা অসহ্য বলিয়া তিনি মুখ-ফোঁড়্ ছিলেন। নাট্যসাহিত্যে এই জাতীয় চরিত্র অন্য নাট্যকার অপেক্ষা গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালই বেশী চিত্রিত করিয়াছেন।

অভিজ্ঞতা ও প্রতিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বয়স-ভেদে মনুষ্যশরীরে নেশার সামগ্রী কিরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায় পরিহাসসূচক ভাষাদ্বারা এই কথা কয়টির মধ্যে মধুখুড়ো কেমন তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন দেখুন:—"পাঠশালে তামাক খাও, ইস্কুলে চরস, কালেজে হুইস্কি, বিষয়-কর্মে গাঁজা, ইন্‌সল্‌ভেণ্টে গুলি, তার পর চণ্ডু টেনে সমাধিতে গিয়ে বসো।"

নাটিকাকারের কতকগুলি প্রকাশ-ভঙ্গী চমৎকার, যেমন:—'তীর্থের টেক্কা বেনারস ধাম', 'তবে তো মাথায় গ্যাস লাইট জ্বল্‌বে, বুদ্ধি আস্‌বে', 'হুইস্কির দর কিছু চড়েছে, আচ্ছা, গাঁজার পাষাণ ভেঙ্গে নেব এখন, দাও', 'সে কি বাবা, আমার সব ডানাকাটা পয়সা, তুমি উড়িয়ে দেবে কি?,' 'ওকে ভস্ম ক'রে দিতে পার বাবা? তা হ'লে পোড়াবার খরচ পর্যন্ত লাগে না নেই।'

নাটিকাকে ঔষধ বা কেশতৈলের বিজ্ঞাপনের বাহন হিসাবে একাধিকবার ব্যবহার করা খ্যাত্যাপন্ন নাট্যকারের উপযুক্ত হয় নাই। হলধরের চরিত্রে কৃপণের আদর্শ তাহার ভাবে, ভাষায়, আহারে, চিন্তায়, বেশে এবং ক্রিয়াকলাপে মূর্তিমান্ করিয়া অমৃতলাল লোকচরিত্র জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া কলসী উৎসর্গের শেষ পর্বে পুরোহিতের সহিত উক্ত কৃপণের কেন যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করাইলেন তাহার তাৎপর্য আজ বুঝা কঠিন হইয়াছে, বরং ঐ কায ঐরূপ চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই। নাট্যসাহিত্যে কৃপণের চিত্র অমৃতলালই সর্ব প্রথমে উদ্‌ঘাটিত করিলেন।

সংগীতবিভাগে এই গানগুলি নাম কিনিয়াছিল, স্থানাভাবে প্রথম ছত্র উদ্ধৃত হইল:— (১) 'সোনার টোপর মাথায় দিয়ে লুকিয়ে ছিলে কোন্ বনে। আজকে হঠাৎ হ'লে উদয় দাসীর হৃদয়-গগনে', (২) 'সেই নৈহাটির ঘাটে—বসে পৈটের পাটে, খেলা ক'রেছি ফুল ভাসিয়ে জলে', (৩) '(আমার) শুকিয়ে গেল ফুলের হাসি, ঠোঁটের হাসি হ'লো বাসী, হৃদে বাঁশী আর বাজে না।' 'কৃপণের ধনের' প্রাচীন নাম ছিল 'বাঞ্ছারাম'। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপটেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে 'বাঞ্ছারাম' প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। কৃপণের ধন তাহারই পরিবর্ধিত রূপ।

অবতার

এই প্রহসনটি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। উত্তর কলিকাতার কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এখানি-দ্বারা বিদ্রূপ করা হইয়াছিল। বৈয়াকরণিকেরা প্রধানতঃ কুড়িটি উপসর্গের কথা বলিয়াছেন, প্রহসনকার তাহার মধ্য হইতে চারিটি উপসর্গের নাম লইয়া তৎসঙ্গে হসন্ শব্দ যোগ করিয়া অবতারকে প্রহসন নামে কীর্তিত করিয়াছেন। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের অবতারে কোন উপসর্গের বালাই ছিল না, কলির অবতারে প্রহসনকার ভয়ে-ভয়ে মাত্র চারিটি উপসর্গের নাম গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে বসাইয়াছেন, বাকিগুলি দর্শক বা পাঠক সম্প্রদায় নেপথ্যে থাকিয়া নিজের রুচিমত বসাইয়া লইতে পারেন, প্রহসনের ক্রিয়ামধ্যে এরূপ যেন কোন ইঙ্গিত তিনি করিতেছেন।

'তৃ' ধাতুর পূর্বে 'অব' উপসর্গ বসাইয়া প্রহসনকার যে অবতারের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন, তিনিই আবার উহার পাশাপাশি আর এক চিত্র আঁকিয়া উপসর্গের অন্তর্গত 'উপ'-টিকে তৎপূর্বে বসাইয়া উপতার-রূপী দ্বিতীয় শঙ্করাচার্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রহসনটি উৎকট পাগ্‌লামির একটি ক্ষেত্র, বিদ্রূপ ভিন্ন ইহার অপর কোন লক্ষ্য নাই।

প্রমথ-হিল্লোলার প্রেম-সংলাপে গতানুগতিকতা ছিল না বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃষ্ট রূপটি প্রথম অঙ্কের আবেষ্টনীর মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট রূপটি ঐ পাগ্‌লামিরই অনুগুণ। বেয়াদপির মাত্রায় 'বয়' চরিত্রটি অসহনীয় হইয়াছে। এ জাতীয় প্রহসন অল্পায়ু হইয়া থাকে, জমার চেয়ে খরচ ইহাতে এত বেশী থাকে যে, কৈফিয়তে ফাজিল হইয়া যায়।

গানগুলির মধ্যে (১) 'বাবু জাগো জাগো যামিনী যে যায়', (২) 'আমি নতুন ঘরে নতুন গিন্নী নতুন গিন্নীপনা' শীর্ষক গান দুইখানি কিছু নূতন আলোক দিয়াছে।

বৈজয়ন্ত-বাস

এই নাটিকা খানি ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার প্রথম-অভিনয় তারিখ সংগৃহীত না হইলেও আনুমানিক ঐ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারেই তাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মহারাণী কুইন্ ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুপলক্ষ্যে রচিত ইহা একখানি শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ কাব্য। উক্তি-প্রত্যুক্তিতে কথা-কহা ছাড়া দৃশ্যকাব্যোচিত কোনগুণ ইহার মধ্যে নাই। স্টার থিয়েটারের তরফ্ হইতে মহারাণীর মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশ করায় তাগিদে এখানি লিখিত হইয়াছিল।

নবজীবন

নবজীবন ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ভারতমাতার সেবকদের দোষ-গুণ লইয়া রসরাজ অমৃতলালের এখানি মজাদার টিপ্পনীপূর্ণ প্রহসন। ইহাতে কুসীদজীবী, উকীল, ডাক্তার, পুরোহিত, দেশসেবক প্রভৃতি লইয়া রসের চূড়ান্ত বুকনি আছে। নকল ও আসল দেশসেবার কথাও আছে।

বাহবা বাতিক

এই প্রহসনখানি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। উনবিংশ শতকের শেষ পাদে কতকগুলি বাঙ্গালী প্রতীচ্য সভ্যতার আওতায় বর্ধিত হইয়া ঐ দেশীয় রাষ্ট্রনীতির কতকগুলি পরিভাষা (technical terms) কপ্‌চাইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিবার প্রলোভনে সহজাত দাস-মনোভাবের (Slave mentality) প্রভাবে কিরূপে অসহায় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারই একটা উৎকট কাল্পনিক চিত্র ইহার মধ্যে আছে।

বাঙ্গালীর উত্তেজক বাগ্মী-প্রিয়তা, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা, ব্যবহার শাস্ত্রজ্ঞান, বিতর্কবিদ্যা, বিজ্ঞান-প্রিয়তা, পার্লামেণ্টারি আলোচনা-পদ্ধতি, স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি লইয়া কতকগুলি বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তির জাতিরূপ ইহার মধ্যে আছে।

সাবাস বাঙ্গালী

এখানি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বঙ্গদেশে বিলাতী দ্রব্য-বর্জন ও স্বদেশী শিল্প-প্রচলনের যে প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছিল এবং তজ্জনিত বাঙ্গালীর বাহির ও অন্দর-মহলের জীবন-প্রবাহে যে তরঙ্গ দেখা দিল তাহার চিত্র নিপুণ হস্তে নক্সাকার আঁকিয়াছেন। "মা আমায় হাঁটুতে শেখাও হাত ধরে। ঐ ঝি মাগী মা করুলে খোঁড়া আগা-গোড়া কোলে করে"—এই বেদনাসিক্ত গানখানির মধ্যে নিজ পায়ের উপর দাঁড়াবার ইঙ্গিত আছে। দৃশ্যকাব্য বিভাগে এটি একটি নূতন সাড়া দিয়াছে। রসিকতার পাকা বুলি দিয়া এই সামাজিক নক্সাখানিকে সজ্জিত রাখা হইয়াছে। আধুনিক 'চোরা বাজারের' (black market) সূচনা সেই স্বদেশী যুগেও দেখা গিয়াছিল। নক্সাকার তাহার উপরও কটাক্ষপাত করিয়াছেন।

খাসদখল

এখানি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাট্যকার ইহাকে নাট্যলীলা বলিয়াছেন। প্রহসন রচনায় সিদ্ধ হস্ত রসরাজ অমৃতলাল দেশের সনাতন সংস্কৃতি ভাঙ্গিবার জন্য যাহারা কৃতনিশ্চয় তাহাদের ক্রিয়াকলাপ তথাকথিত এক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া প্রহসনের হাস্যকর ভিত্তির উপর যে ক্ষুদ্র নাটকখানি গড়িয়া তুলিলেন, তাহার অপূর্বতায় সকলে মুগ্ধ হইয়াছেন। Nicholl সাহেব এই জাতীয় কমেডিকে Comedy of Romance বলিয়াছেন। তৃতীয় অঙ্কই এ নাটকের পরাকাষ্ঠা বহন করিয়াছে। গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'মনের-মতন' নাটকে যাহা করিয়াছেন, অমৃতলাল 'খাসদখলে' সেইরূপ যাহার যাহাতে অধিকার ছিল তাঁহাকে তাহারি অধিকারী করিলেন। বিলাতী সভ্যতার মোহে পড়িয়া দেশের মতিগতি সহসা কিরূপ পরিবর্তিত হইয়া গেল, তাহার চিত্র নাট্যকার তাঁহার স্বভাবজাত শ্লেষ-ব্যঙ্গাত্মক শৈলীদ্বারা রূপায়িত করিয়াছেন। যাঁহারা ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চান তাঁহাদের চিত্র নাট্যশিল্পের ভিতর দিয়া যেন ছায়াচিত্রের মতো প্রদর্শিত হইয়াছে। জাতিরূপ সৃষ্টির দিক থেকে নাট্যকার ইহাতে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। নিতাই, মোহিত, ঠাকুরদা, আহ্লাদী,

গিরিবালা, বিধু পরস্পর-বিরুদ্ধ এক একটি জাতিরূপ, নাট্যকার নিপুণ হস্তে তাহাদের গড়িয়াছেন। এই ক্ষুদ্র নাট্যাবয়বে তিনি যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও লোকচরিত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। ইহার 'ওগো! কেও বল না গো ভাতার কেমন মিষ্টি' গানখানি অভিনয়কালে বিশেষ সাড়া তুলিয়াছিল।

নব-যৌবন

এখানি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাটিকাকার গ্রন্থের 'নিবেদনে' বলিয়াছেন ইহার অনেক কথা নাটিকার পাঠকালে বা অভিনয়দর্শনকালে পাঠক বা দর্শকের কাছে বাহুল্য দোষে দুষ্ট বলিয়া মনে হইতে পারে, তজ্জন্য ইহার কোন-কোন উক্তি ও গীত ক্রমিক অভিনয়-কালে শুনিতে পাইবেন না। বাস্তবিকই নাটিকাখানির সংলাপ এত দীর্ঘ ও অত্যুক্তি দোষে পূর্ণ যে নাটিকার ঘাত উঠিয়া প্রতিঘাত পাইতে সময় লইয়া থাকে। এখানি নাটিকাকারে না লিখিয়া উপন্যাসের আকারে লিখিলে ভাল হইত। লেখার মধ্যে মুন্সীয়ানা, রস, বাক্যাড়ম্বর সব সত্ত্বেও পূর্বোক্ত দোষে নাটিকাখানি জনপ্রিয় হইল না। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যের মধ্যগত নায়ক-নায়িকার নর্মসখীসহ বিশ্রম্ভালাপ বাস্তবিকই উপভোগের বস্তু হইয়াছে, কিন্তু উপভোগ করিবার মতো ধৈর্য পাঠক বা দর্শকের থাকে কৈ? নাটিকাকার পরিণত বয়সে এই নাটিকার মধ্যে যে দুইটি প্রণয়কাহিনী আঁকিলেন, তাহা যদিও চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে সার্থকতা লাভ করিল, কিন্তু তাহা ঠিক দৃশ্যকাব্যোচিত গুণে নিষ্পন্ন হয় নাই। প্রতিযোগিতার দৌড়বাজীতে তাহাদের মাত্রা কম-বেশী হইয়া গিয়াছে। সংগীতবিভাগে 'চোখ গেল', 'বউ কথা কও' পাখীর গানে নূতনত্ব থাকিলেও অন্য গানগুলি শ্রুতিমধুর হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য নাট্যসমালোচক Moulton প্রদর্শিত 'Similar Motion' কমেডির মধ্যে থাকিলেও তাহা নাটকীয় হইবার অবসর পায় নাই।

ব্যাপিকা বিদায়

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাট্যকার ইহাকে প্রমোদ-প্রহসন (farcical comedy) বলিয়াছেন। হাস্যকর আব্‌হাওয়ার মধ্যে অমৃতলাল এই গীতিনাট্যখানি রচনা করিলেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষোন্নত সামাজিকদের লইয়া ইহার পরিবেশ, তাই ইহার মধ্যগত সংলাপের মান উচ্চতর হইয়াছে। সূর্যের তাপ অপেক্ষা তাহা হইতে ধার-করা বালুর তাপ কিরূপ প্রখর হয় তাহা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানিনী মিসেস্ পাকড়াশী চরিত্রে নাটিকাকার দেখাইয়াছেন। শিক্ষাভিমান ও প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য মিনা ও তাঁহার মাতার চরিত্রে পরিস্ফুট। ছোট-ছোট জাতিরূপ হিসাবে ঘনশ্যাম, চমৎকার, ভাদুড়ী, চৌধুরী বেশ রূপায়িত। ব্যাপিকা শাশুড়ীর আবির্ভাবে মিঃ রায়ের সংসারের অশান্তি, তাঁহার বিদায়ে কিরূপে চলিয়া গিয়াছিল নাটিকার দর্শক বা পাঠক তাহা অবগত হইয়াছেন। গানগুলির ভাষা স্থানে-স্থানে শ্রুতিকটু হইলেও সুরের সঙ্গে যখন ঐগুলি গীত হয় তখন মধুর হইয়া উঠে। শাশুড়ীর বিদায়কে নাটিকাকার গানের এক কলির মধ্যে—"বৈঁচু যায় খোস পালায়" বলিয়া ইঙ্গিত করায় মিঃ রায়ের পারিবারিক জ্বালা-যন্ত্রণার তীব্রতা ভাল করিয়াই অনুভূত হইয়াছে। প্রহসনকারের ধন্য এই অব্যর্থ সন্ধান।

দন্দে মাতনম্

এখানি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর বুধবার তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার রঙ্গমঞ্চে আর্ট থিয়েটার কোম্পানী দ্বারা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। কাউন্সিল্ ইলেকশন্ ব্যাপারে কিরূপ দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয় প্রহসনকার তাহা নিপুণ হস্তে চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি ইহাকে হাস্যোৎসব বলিয়াছেন, কিন্তু হাস্যকর বিষয়ের ভিতর দিয়া নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতার কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায় তাহাই ইহার লক্ষ্যস্থল। প্রহসনকার আধুনিককালের বর্ণঘটিত বিবাদ, শুচিবাই প্রভৃতির উপর এবং ভাষা বিজ্ঞানবিদের ও ঐতিহাসিকের অদ্ভুত খেয়ালের (idiosyncrasy) উপরও কটাক্ষপাত করিয়াছেন। গানের মধ্যে ভালুক-নাচের গানটি মন্দ হয় নাই। সুবিধাবাদী নকল স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ যথেষ্টই আছে, তাই তাঁহাদের অন্তসারশূন্য মৌখিক 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির সহিত খাপ খাওয়াইয়া 'দ্বন্দেমাতনম্' নামকরণ করিয়াছেন।

যাজ্ঞসেনী

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে বীডন্ স্ট্রীটস্থ মিনার্ভা থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এ পৌরাণিক নাটকখানি নাট্যকার নূতনভাবে মিশ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দে ও গদ্যে লিখিয়াছেন। পরিণত বয়সের নূতন পরিকল্পনা প্রতি দৃশ্যে নূতন সুরের প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। সংগীতগুলির মধ্যেও নূতন সুর ধ্বনিত হইয়াছে। সংলাপের মধ্যে ন্যাকামি নাই, শান্ত সংযতভাব সর্বত্র পরিস্ফুট। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী সম্বন্ধে নাট্যকার এক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। এ নাটকে যজ্ঞসেন-তনয়া যাজ্ঞসেনীর স্বয়ংবর, বিবাহ, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ ও ইন্দ্রপ্রস্থবাস, কৌরবসভায় পাশাখেলা, যুধিষ্ঠিরের সর্বস্বপণ, পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রহরণ পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে। অপ্রচলিত শব্দবিন্যাস ও ভাষার শুদ্ধির দিকে নজর রাখায় ছন্দের সাবলীল গতি ব্যাহত হইয়াছে, তজ্জন্য নাটকখানি জনপ্রিয় হয় নাই। কালাতিক্রম (Anachronism) দোষও নাটকের মধ্যে আছে।

নাট্য-সাহিত্যে অমৃত বসুর কালালোচনা এইখানেই পরিসমাপ্ত হইল। এই কালের লাভালাভের কথা তাঁহার দৃশ্যকাব্যগুলির আলোচনাপ্রসঙ্গে পৃথকভাবে বলা হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এক কথায় ইহাই বলা চলে যে প্রহসন জাতীয় সাহিত্যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পকার ছিলেন। প্রাচীন পাঁচালিকারদের ধারাও তিনি বজায় রাখিয়া গিয়াছেন এবং চৈত্রমাসের সংক্রান্তির দিন কলিকাতা শহরে পূর্বে যে জেলে-পাড়ার সং বাহির হইত তাহাতে তিনি বাঁধনদারের কাজ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। অমৃতলালের তিরোধানে নাট্যসাহিত্যের একটি বিভাগে অপূরণীয় ক্ষতি সাহিত্যসেবী মাত্রেই অনুভব করিতেছেন।

নাট্যসাহিত্যে রাজকৃষ্ণ রায়ের কাল (১৮৭৫—১৮৯৩ খৃঃ)

রাজকৃষ্ণ রায় মহাকবি ছিলেন। তিনি শ্রব্যকাব্যবিভাগে বাল্মীকির রামায়ণ ও বেদব্যাসের মহাভারত মূল সংস্কৃত হইতে সরল বাঙ্গালা পদ্যে কৃতিত্বের সহিত অনুবাদ করিয়া এবং বহুবিধ কাব্যগ্রন্থ, খণ্ড কবিতা, গল্প, নিবন্ধ ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ঐ অদ্ভুতকর্মা পুরুষটি যখন নাট্যসাহিত্যে হস্তক্ষেপ করিলেন তখন প্রকাশ্য রঙ্গালয়ের মধ্যে যেগুলি সেকালে প্রতিষ্ঠিত ছিল সেগুলির মধ্যে বেঙ্গল থিয়েটার ব্যতীত অপর থিয়েটারে তাঁহার নাটকগুলি অভিনীত হয় নাই, তজ্জন্য তাঁহাকে তদানীন্তন মেছুয়াবাজার স্ট্রীটস্থ ঠনঠনিয়া অঞ্চলে নবনির্মিত বীণা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল। অধুনা ঐ পথ কেশবসেন স্ট্রীট নামে অভিহিত হইতেছে তাঁহার শেষের দিকের কতকগুলি নাট্যগ্রন্থ হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। দৃশ্যকাব্যক্ষেত্রে তিনি কি পদচিহ্ন রাখিয়া গেলেন তাহার অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে অন্যূন ৫১ খানি দৃশ্যকাব্য রাজকৃষ্ণ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে যুগ-প্রবর্তক (epoch making) দুই-চারিখানি মাত্র। বাকিগুলি ক্রমশঃ বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইতে যাইতেছে।

দৃশ্যকাব্যগুলির প্রকাশ-কাল বা অভিনয়-কাল ধরিয়া অনুসরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহাদের অধিকাংশ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বীণা থিয়েটারে অভিনীত, কতকগুলি অনভিনীত, কতকগুলি আবার বেঙ্গল ও স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। আমরা যথাক্রমে অগ্রসর হইতেছি ইহার প্রকাশকালের তারিখগুলি শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। অভিনয় তারিখগুলি নানা উপায়ে সংগৃহীত।

পতিব্রতা নাটিকা

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে ইহা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে কি রাজকৃষ্ণ, কি তাঁহার পরবর্তী নাটককার অতুলকৃষ্ণ কেহই তাঁহাদের কৃত নাটিকায় সাবিত্রী-সত্যবানের গভীর শোকপূর্ণ অথচ মিলনাত্মক পৌরাণিক কাহিনীটির প্রাণস্পর্শী নাট্যরূপ (Tragi-comedy) দিতে পারেন নাই। অতি প্রাচুর্য (over-doing) ইহার সৌন্দর্য নষ্ট করিয়াছে। কথোপকথন থেকে শুরু করিয়া গানের উপর গান চড়াইয়া সর্বত্র সুরকে প্রাধান্য দিয়া পাঠকের কর্ণে সুরের আতিশয্যে যেন একটা বেসুরা ধ্বনি তুলিয়া আমোদের বদলে নিরানন্দ আনিয়া দিয়াছেন। নাটিকার ক্রিয়া-সংঘাতও সুরের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। গানের সুরগুলি উচ্চাঙ্গের হইয়াও ভাবের দৈন্যে জনসমাজে ঐগুলি সাড়া তুলিতে পারে নাই, তাই নাটিকাকারকে অন্যের প্ররোচনায় ঐ কবিতা-সংগীতময়ী নাটিকার 'মৃতসঞ্জীবনী' নাম দিয়া একখানি গদ্য-রূপ দেখাইতে হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাও জমিল না। ইহার অভিনয় তারিখ ও স্থান সংগৃহীত নাই।

নাট্যসম্ভব

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইহা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় দেবী সরস্বতীর অনুমোদিত আদর্শে ভরতমুনি কর্তৃক নাটকাভিনয়ের আয়োজন-ব্যাপার ইহার উপজীব্য, সুতরাং সম্ভাবিত নাট্যের পরিবেশনের কথাই ইহাতে আছে, নাট্যরস নাই। সংস্কৃত

নাটকের উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় বর্তমান গবেষণার সহিত ইহার ঐক্য নাই। ইহা অভিনীত হইয়াছিল কি না জানা যায় নাই। বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য ইহা রচিত হইয়াছিল। এখানি উপরূপক জাতীয় দৃশ্যকাব্য।

অনলে বিজলী

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রেল তারিখে ইহা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। লঙ্কাপুরীতে সীতার অগ্নি-পরীক্ষা ব্যাপার লইয়া এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে। দীর্ঘ উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলি ছন্দোবৈচিত্র্যে শ্রব্যকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে, দৃশ্যকাব্যোচিত ঘাত-প্রতিঘাত তাহাদের মধ্যে নাই। নাট্যোল্লিখিত চরিত্র মাত্রকেই ফেনাইয়া বড় করিতে যাওয়ায় কোন চরিত্র স্বভাবসঙ্গত হয় নাই। 'মুখ সর্বস্ব' সৃষ্ট হাস্যরস বীভৎস রসেই পর্যবসিত হইয়াছে। রাজকৃষ্ণের দৃশ্যকাব্যে হাস্যরসের সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখা যায় না। সীতার অগ্নিপরীক্ষা বিষয়ক প্রাণস্পর্শী প্রসঙ্গকে কেন্দ্রীভূত করিয়া নাটক লিখিতে যাইয়া রাজকৃষ্ণের এরূপ শোচনীয় পরাজয় তাঁহার আর কোন নাটকে দেখা যায় নাই। নায়ক-নায়িকার চরিত্রকে চাপা দিয়া অবান্তর প্রসঙ্গ রূপায়িত হইবার চেষ্টা পাইয়াছে। এই নাটকের নামকরণ ব্যাপার লইয়া রসরাজ অমৃতলাল বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী' গ্রন্থ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এখানি বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল, অভিনয়-তারিখ সংগৃহীত নাই।

দ্বাদশ গোপাল

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই তারিখে ইহা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রায় ৭২ বৎসর পূর্বে দ্বাদশ গোপালের মেলা উপলক্ষ্যে নিকটবর্তী রবিবারে হুগলী জেলার মাহেশ-বল্লভপুরের গঙ্গাবক্ষে নৌকার উপর মদ ও বেশ্যার যে কুৎসিত-দৃশ্য প্রদর্শিত হইত তাহারই একটি চিত্র ইহাতে আছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে এ জাতীয় আমোদ-প্রমোদ সমাজ হইতে ততই দূরীভূত হইতেছে। বীভৎস রস ব্যতীত অন্য কোন রসের আস্বাদন ইহাতে নাই। অভিনয়-তারিখ সংগৃহীত নাই, তবে বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য ইহা লিখিত হইয়াছিল।

ভারত-সান্ত্বনা

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এখানি রচিত ও প্রকাশিত। পৃথুরাজের পরাজয়ের পরবর্তী শতাব্দীকালের ভারতেতিহাস লইয়া এই কাব্যখানি রচিত। এখানি উক্তি-প্রত্যুক্তি পদ্ধতিক্রমে নাট্যাকারে গঠিত থাকিলেও নাট্যরস তাহার মধ্যে নাই। অভিনয়-তারিখ ও স্থান জানা যায় নাই।

লৌহ-কারাগার

এই নাটকখানি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। আসল ক্রিয়া অপেক্ষা বাহ্যাড়ম্বর ইহার মধ্যে বেশী। ক্রিয়া-সংঘাত যথাস্থানে উত্থিত না হওয়ায় ইহার নাট্যপ্রভাব নষ্ট হইয়াছে। নাটক নামে অভিহিত হইলেও ইহার মধ্যে নাট্যরস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সমস্ত সরঞ্জাম সত্ত্বেও সুপকারের দোষে যেমন ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, সেইরূপ গল্পাংশ, ঘটনা-সংঘাত

সব সত্ত্বেও বিন্যাসদোষে নাটকখানি বিবাদ রহিয়া গেল। কোথায় আঘাত করিলে কি ফল উৎপন্ন হইবে, সেই মাত্রাজ্ঞানের অভাবে এই রাজপুত কাহিনীটি মাঠে মারা গেল। মাইকেলী ছন্দে লিখিত হইয়াও নাটকের ভাষা হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। অভিনয় তারিখ সংগৃহীত নাই। বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য ইহা লিখিত হইয়াছিল।

তারক সংহার

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই তারিখে এখানি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। দেবতাগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্যে আধিপত্য গ্রহণ এবং অবশেষে কুমার কার্তিকেয় দ্বারা তারকাসুরের পরাজয় ও মৃত্যু-কাহিনী ইহার আখ্যানভাগ। বীর্য, সাহস, ষড়যন্ত্র, প্রণয়কাহিনী, আত্মত্যাগ কোন কিছুরই অভাব নাটকের মধ্যে নাই, অভাব কেবল যথাস্থানে ঐগুলির প্রয়োগজনিত ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি কার্য। পরিবেশনের দোষে ও ঔচিত্য-অনৌচিত্য জ্ঞানের অভাবে উপন্যস্ত-বিষয়টির অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। এত বড় একটা নাটক পর্যুষিত পূতিগন্ধে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। সংগীতবিভাগে মাত্র একটি গান নাম কিনিতে পারে, তাহার প্রথম ছত্রটি এইরূপ :—'কে জানে তোমার চক্র, চক্রিকুল-বিভূষণ। কাহারে হাসাও তুমি, করাও কারে রোদন।' ভাষা হিসাবে মাইকেলী অমিত্রাক্ষর ছাড়িয়া সরল গদ্য গ্রহণ করিয়াও নাট্যকার নাটক জমাইতে পারিলেন না। প্রথম অভিনয়-তারিখ ও স্থান সংগৃহীত নাই।

চমৎকার নাটক

১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। নাটক নামে অভিহিত হইলেও নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত ইহার মধ্যে নাই, বরং বহুস্থানে উক্ত সংঘাত নষ্ট করিবার সংলাপ দেখা গিয়াছে। অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা সরলাকে মাত্র জল হইতে বাঁচাইয়াছিল বলিয়া যাদবেন্দ্রের তাহার জন্য অদ্ভুত প্রণয়-ব্যাকুলতা এক ফ্রয়েডের আধুনিক যৌন-বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যত্র সমর্থনের বড় একটা আশা নাই। বিশেষতঃ যখন উভয়ের মধ্যে মেলা-মেশার কোন সন্ধানই নাটকের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। নাটকের মন্ত্রগুপ্তি যাহা পঞ্চম অঙ্কে গুপ্তচর রহস্যের (detective fallacy) মতো উদ্ঘাটিত হইয়া চমকের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই কেবল নাটকের তথাকথিত পরাকাষ্ঠা। সংগীতবিভাগে (১) 'আশাময়ী ওমা তারা, মুছে দেমা মনের আশা। আশায় পোড়ে আর পারিনে কত্তে ভবে যাওয়া-আসা॥' এবং (২) 'বৌ কথা ক'না মুখ তুলে। বৌ দেখ্‌না চেয়ে চোক খুলে॥ এনেচি বকুলমালা কর্‌বে আলা তেল-চোয়ানো তোর চুলে॥' এই গান দুইখানিতে রসিকমহলে সাড়া পড়িলেও পড়িতে পারে। চরিত্র হিসাবে রত্নেশ্বর ও ধনেশ্বরের চরিত্র দুইটি স্ফুটনোম্মুখ হইয়াও নাটকের বুনানী-দোষে পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিল না। নাট্যকার কর্তৃক লিখিত এক উপন্যাসের এখানি নাট্যরূপ। অভিনয় তারিখ ১৮৮১, ২৯শে নভেম্বর এবং বীণায় অভিনীত।

হরধনুর্ভঙ্গ

পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক এই নাটকখানি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ঐ বর্ষেই বেঙ্গল থিয়েটারে ইহা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল, অভিনয় তারিখ জানা নাই।

এখানি বিবিধ ছন্দে রচিত হইয়াছে। নাটকের মধ্যে ভাব-বৈষম্য দেখা যায়। বিশ্বামিত্র গুরু-রূপেই রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার যজ্ঞভূমিতে আসিয়া সহসা তিনি রামকে ইষ্টজ্ঞানে পূজা করিলেন, এ ভাববৈষম্য দেবলোকে সম্ভবপর হইলেও নর ও দেবতার মিশ্রিত কর্মক্ষেত্র পৃথিবীতে বিসদৃশ বোধ হইয়াছে, বিশেষতঃ যখন তিনি আবার ঐ কার্যের সাক্ষী রাখিয়া উহা করিলেন। 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটক দ্বারা বিবৃতি-লিপির কাজ করাইতে যাওয়ায় নাট্যকার ইহার কেন্দ্রগত শক্তি হ্রাস করিয়া ফেলিলেন। তাড়কা ও সুবাহু বধ, মারীচ প্রত্যাখ্যান, গঙ্গাদেবী কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণকে পরপারে আনয়ন, সুমতিরাজার গৃহে রামের আতিথ্য গ্রহণ, পাষাণময়ী অহল্যা উদ্ধার প্রভৃতি নাট্যোল্লিখিত প্রত্যেক ঘটনাকে বড় করিতে যাওয়ায় মূল ঘটনাটি গৌরবহীন হইয়া গিয়াছে। নাট্যকবি গিরিশচন্দ্র কিন্তু তাঁহার 'সীতার বিবাহ' নাটকে ঐ একই বিষয়বস্তু লইয়া অপূর্ব নাট্য-হর্ম্য নির্মিত করিয়াছিলেন।

মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ভাঙ্গিয়া অভিনয়োপযোগী নাটকের মধ্যে ব্যবহার করিবার চেষ্টায় রাজকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের ৩ মাস পূর্বগামী ছিলেন, কারণ বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত এই নাটকখানি তাঁহার উক্ত কার্যের সাক্ষ্য দিতেছে। ঐ ছন্দে আগাগোড়া লেখা 'রাবণ বধ' নাটকে গিরিশচন্দ্র যে ভাবলহরী তুলিয়াছিলেন তাহা অপূর্ব; ছন্দের বাহনদ্বারা উচ্চভাব প্রকাশে রাজকৃষ্ণ অপেক্ষা গিরিশচন্দ্র অধিক পারদর্শী হইয়াছিলেন।

রামের বনবাস

এই পৌরাণিক নাটকখানি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। বেঙ্গল থিয়েটারে ইহা প্রথম অভিনীত হইয়া থাকিবে, তারিখ সংগৃহীত নাই। জগতের মর্যাদাবোধক সাহিত্যের (classical literature) মধ্যে বাল্মীকি-রামায়ণের স্থান বহু উচ্চে, তন্মধ্যস্থিত রামের বনবাস অধ্যায়টি আবার বিষাদপূর্ণ ঘটনার অন্যতম। নাট্যশিল্পের দিক দিয়া রাজকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের রামায়ণ-সম্বন্ধীয় নাটক অপেক্ষা পারদর্শিতা দেখাইতে না পারিলেও বাল্মীকিবর্ণিত ঘটনাবলিদ্বারা ইহার নূতনত্ব আনিয়াছেন, কারণ গিরিশচন্দ্রের ঘটনাবলি কৃত্তিবাস হইতে গৃহীত। বাল্মীকি রামায়ণ বাঙ্গালা পদ্যে আগাগোড়া অনুদিত করিয়া রাজকৃষ্ণ যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার তুলনায় নাটক গড়িবার শক্তি তাঁহার ন্যূনতর ছিল।

তরণীসেন বধ

এই পৌরাণিক নাটকখানি বীডন্ স্ট্রীটস্থ প্রতাপ জহুরীর ন্যাশানল থিয়েটারে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল, তারিখ জানা নাই। বাল্মীকি রামায়ণে তরণীসেনের উল্লেখ নাই, ইহা কৃত্তিবাসের স্বকপোল-কল্পিত ঘটনা। রাজকৃষ্ণ এই নাটকে মূল ক্রিয়ার প্রাধান্য রাখিয়াছেন, কিন্তু নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবরাজির গভীরতা দেখাইতে পারেন নাই; ঐগুলি হঠাৎ আসিয়া, হঠাৎ চলিয়া গিয়াছে, ঐগুলি যেন রোগীর স্নায়বিক বিক্ষেপজনিত (spasmodic) চেষ্টা দ্বারা উৎপন্ন মনে হইয়াছে। তরণীর রামপদে নির্বাণলাভরূপ নাটকীয় পরিণতিটি মোটেই নাটকোচিত (dramatic) হয় নাই। দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে রাম ও তরণীর কথাগুলি যেন কৃত্রিম, প্রাণের বেদনা সম্পৃক্ত নহে

এরূপ মনে হয়। নাটককার কাটামুণ্ডকে কথা কহাইয়া ও রামের উদ্দেশে সীতা কর্তৃক ফুলের মালা শূন্যে চালনা করিয়া ইন্দ্রজালের (Magic) সৃষ্টি করিয়াছেন বটেন, কিন্তু ভাবাবেশে নাটকের দর্শক বা পাঠকের মর্মস্থল স্পর্শ করিতে পারেন নাই। ইহার এক বৎসর পূর্বে অভিনীত গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' নাটকের রামের বাণীর দুই-চারিটি লাইন 'তরণীসেন বধে'র রামের মুখে অবিকল উচ্চারিত হইতে শুনা গিয়াছে। এইটি বিস্মিত হইবার কথা বটে। যাত্রার পালারূপে বহুস্থানে এই নাটকখানি অভিনীত হইয়াছে। এখানি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

যদুবংশ ধ্বংস

পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক এই নাটকখানি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য এখানি রচিত, কিন্তু অভিনয়-তারিখ সংগৃহীত নাই। গ্রন্থখানির নামকরণ হইতে বুঝা যায় যে যদুবংশের ধ্বংস ও যদুপতির লীলা-সংবরণ ইহার বর্ণিতব্য বিষয়। অংশাবতার না হইয়া স্বয়ং পূর্ণব্রহ্মের নরলীলা সংবরণ বিষয়ে যেরূপ সংযম ও গাম্ভীর্য থাকা উচিত নাটকখানির প্রকাশভঙ্গীতে তাহার অভাব দেখা গিয়াছে। ইহার মধ্যে নাই কি? যদুকুলের ধ্বংসজনিত শোক-পরম্পরা আছে, যাদবগণের আত্মঘাতী কলহের রৌদ্ররস আছে, ঋষিশাপ আছে, লীলা সংবরণের নিমিত্ত কালপুরুষের আগমন আছে, এবং ঐগুলি যথাস্থানে প্রকাশিত করিবার ভাষাও আছে, নাই কেবল ভাবের ব্যঞ্জনাদ্বারা নাটকীয় সঙ্গতি রক্ষা করিয়া প্রাণে সাড়া তুলিবার প্রচেষ্টা। যুগাবতার রামচন্দ্রের লীলাবসান-ব্যাপারটি 'লক্ষ্মণবর্জ্জন' নাটকে গিরিশচন্দ্র প্রাণস্পর্শী করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, দ্বিতীয় যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণের লীলাবসানে এ নাট্যকার সে সাড়া তুলিতে পারেন নাই। উপাদানের দোষ কারণ নহে, পরিবেশনের দোষে এইরূপ ঘটিয়াছে।

উৎকট বিরহ—বিকট মিলন

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রেল তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এখানি অনুকৃতিপূর্ণ প্রহসন (parodical farce), মাতাল ও লম্পটের চিত্র ইহাতে আছে। মদের ঝোঁকে যে উৎকট বিরহের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারই একটা বিকট পরিণাম ইহার বর্ণিতব্য বিষয়। অসংলগ্ন প্রলাপোক্তি দ্বারা এই ব্যঙ্গকাব্যখানি পূর্ণ করা হইয়াছে। রসের মধ্যে বীভৎসই উপজীব্য, কিন্তু তাহাও দৃশ্য-কাব্যোচিত গুণে ব্যক্ত হয় নাই, বেলেল্লামীর আতিশয্যে পূর্ণ। প্রকাশ-কালের পূর্বেই অভিনীত হইয়া থাকিবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তারিখ ও স্থান সংগৃহীত নাই।

রাজা বিক্রমাদিত্য

এখানি ঐতিহাসিক ও কিংবদন্তীমূলক নাটক, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে আগস্ট শনিবার তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য এখানিও লিখিত, কিন্তু অভিনয়-তারিখ যোগাড় হয় নাই। নাট্যকার স্বকপোল পরিকল্পনায় নাটকখানি গড়িয়াছেন। ইতিহাস অপেক্ষা কিংবদন্তীর দিকে বেশি নজর দিয়াছেন। ইহাতে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যপ্রাপ্তির কথা ও তাঁহার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রের ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। সার্বভৌম নৃপতি বিক্রমাদিত্যের রাজ্যশাসন ও

মবরত্ন সভার কথা নাই। স্থানে-স্থানে, বিশেষতঃ ষড়যন্ত্রের দ্বারা কার্যসাধন উদ্দেশ্যে জড়িত ব্যক্তিদের উক্তি-প্রত্যুক্তি ও স্বগতোক্তিগুলি এত দীর্ঘ ও ফেনায়িত করিয়াছেন যে পাঠক বা দর্শকের ধৈর্যচ্যুতির সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। নুতনত্বের মধ্যে ভোজন-বিলাসী রাজার নর্মসখা ও সরলবিশ্বাসী বিদূষক চরিত্রকে নাট্যকার নাটকীয় কৌশল (technique) বর্জিত প্রতিহিংসা পরায়ণ এক জলন্ত প্রতিমূর্তিরূপে গড়িয়াছেন। এ কাজটি নাটকীয় প্রথাবহির্ভূত ব্যাপার; অন্য কোন চরিত্রের দ্বারা ঐ কাজটি করাইলে দূষণীয় হইত না।

প্রহ্লাদ চরিত্র

এই নাটকখানি সর্বপ্রথমে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তারিখ হইতে বীডনস্ট্রীটস্থ বেঙ্গল থিয়েটারে ক্রমান্বয়ে প্রায় লক্ষাধিক দর্শকসমক্ষে বহু রজনী ধরিয়া অভিনীত হইয়াছিল, এবং পরে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে বীণা থিয়েটারে ইহা পুনরভিনীত হইয়াছিল। এখনি বহু প্রশংসিত পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া এ নাটকখানির কৃতিত্ব নাই। ঘটনার অনুপাতলব্ধ সাজ-সজ্জা ও দৃশ্যের শোভায় ইহা দর্শক-সাধারণের মনোহরণ করিয়াছিল। রঙ্গমঞ্চের উপর মধুর হরি-সংকীর্তন ইহার অন্যতম আকর্ষণী শক্তি। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া গিরিশচন্দ্রের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটকের মূল্য আছে, কিন্তু জনসাধারণ তাহাব আদর করে নাই। সংগীতবিভাগে 'রতন আসনে রতন ভূষণে যুগল রতন রাজে' গানখানি বেশ নাম কিনিয়াছিল, যদিও রাজকৃষ্ণ ইহার রচক ছিলেন না। রাজকৃষ্ণের নিজ রচনা 'তোর নাম রেখেছি হরিবোলা, মনের সাধে ও আমার মন খেল না হরিনামের খেলা' গানখানির বহু সুখ্যাতি হইয়াছিল।

গঙ্গা-মহিমা

এখানি পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল; নাটকখানি চারি অঙ্কে পূর্ণ। বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য এখানি লিখিত, কিন্তু প্রথম অভিনয় তারিখ সংগৃহীত নাই। ভগীরথের সাধনায় পরিতুষ্টা গঙ্গাদেবী মর্ত্যে আসিয়া কিরূপে অভিশাপগ্রস্ত ও ভস্মীভূত ষাট হাজার সাগর-তনয়ের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন তাহার পৌরাণিক বিবরণ নব পরিকল্পনায় নাট্যকার এই নাটকের অবয়বে দিয়াছেন। প্রশ্নোত্তরে লিখিত হইলেও নাটকীয় সংঘাত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে অভিনীত গিরিশচন্দ্রের 'সীতাহরণ' নাটকের মধ্যগত সীতার খেদোক্তির কিছু ভাব দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে ভগীরথের মাতা কনিষ্ঠা রাজ্ঞীর ভগীরথ-অদর্শনজনিত খেদোক্তির ভিতরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গঙ্গার যাবতীয় মহিমা নাটকের ক্ষুদ্র আধারে প্রবিষ্ট করাইয়া নাট্যকার জাহ্নবীর প্রধান মহিমাকে চরমোৎকর্ষতা দিতে পারেন নাই। দু-একখানা গান বেশ ভাবপূর্ণ।

বামন-ভিক্ষা

এই পৌরাণিক নাটকখানি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত, কিন্তু তৎপূর্বে বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য এখানি রচিত হইয়াছিল, অভিনয়-তারিখ সংগৃহীত নাই। রাজকৃষ্ণ হরিভক্ত ছিলেন, তাঁহার বহু

দৃশ্যকাব্য এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে। গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণের ধর্মমত তাঁহার বহু নাটকে প্রাসঙ্গিক ক্রমে প্রচার করিয়াছেন, তজ্জন্য তত্তৎ নাটকের নাট্যধর্মগত মূল্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই, রাজকৃষ্ণ কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তাহা করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহার কোন কোন নাটকে হরিনাম মাহাত্ম্য সুপ্রযুক্ত না হইয়া কেবল প্রচার ধর্মমূলক হইয়া উঠিয়াছে। বামন-ভিক্ষা তাহার অন্যতম। বলিরাজার নিকট হইতে ত্রিবিক্রমের ত্রিপাদ ভূমিলাভ ইহার গল্পাংশ।

দুর্বাসার পারণ

এই পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটকখানি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর তারিখে বীডন্ স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। বনবাসকালীন পঞ্চপাণ্ডবের দ্বৈতবনে অবস্থিতি, চিত্ররথ গন্ধর্ব কর্তৃক কৌরবদের পরাজয়, পাণ্ডবদের দ্বারা কারাগার হইতে দুর্যোধন ও ভানুমতীর উদ্ধারসাধন এবং দুর্বাসার পারণ প্রভৃতি ঘটনানিচয় লইয়া ইহা গ্রথিত হইয়াছে। রাজকৃষ্ণ এ দৃশ্যকাব্যে পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই। ঘটনাগুলিকে ফেনাইয়া বড় (Overdoing) করা হইয়াছে, তজ্জন্য শেক্সপীয়রের ভাষায় বলিতে যাইলে স্বভাবের স্বতঃস্ফূরণ-লঙ্ঘিত হইয়াছে (overstepped the modesty of Nature) এইরূপ বলিতে হয়। মাত্রা ও ঔচিত্যজ্ঞান (propriety) এ নাটককারের প্রখর ছিল না; পাণ্ডবচরিত্রে কোন নূতন আলোকপাত তিনি করিতে পারেন নাই। দুর্বাসাকে শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত ঋষিচরিত্রে প্রতিফলিত না করিয়া ভাঁড়চরিত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। বিদূষক ও শকুনি চরিত্রদ্বয়ে মামা-ভাগিনেয় সম্বন্ধজনিত গুরুলঘু ভেদ লোপ পাইয়া ভাঁড়ামি রূপ লইয়াছিল। বিদূষকের ভাষায় নূতনত্বের মধ্যে মাঝে-মাঝে শব্দের মূলধাতু লইয়া ক্রীড়া (Pun) আছে। নাট্যক্রিয়ার গতিপথ অনির্দিষ্ট থাকায় ইহাতে নাট্যনীতি লঙ্ঘিত হইয়াছে। গানের মধ্যে 'পরের তরে আপনভুলে পরের প্রাণে প্রাণ মিশাও' শীর্ষক গানখানি জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই নাটক যাত্রা-গানের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই, স্থানে-স্থানে কীর্তনের সুরে কথাবলার ভঙ্গী ইহার মধ্যে আছে। ইহা ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভীষ্মের শরশয্যা

পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক এই নাটকখানি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে বীডন্ স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ভীষ্ম পিতামহের শরশয্যাই নাটকের উপন্যস্ত বিষয় (theme), কিন্তু এত অবান্তর প্রসঙ্গ ইহার মধ্যে আসিয়াছে যে মূল-ক্রিয়াটি উদ্দেশ্যহীন হইয়া গিয়াছে। কুরুক্ষেত্র সমর সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনাবলি নাটককার বর্ণনাত্মক মহাকাব্যের (Epic poem) মতো নাটকের সংকীর্ণক্ষেত্রে গ্রথিত করিয়া প্রতি ঘটনাকেই প্রাধান্য দিতে চেষ্টা করায় মূলক্রিয়া আবৃত হইয়া গিয়াছে। 'দুর্বাসার পারণের' ন্যায় অতিশয়োক্তি দোষ এ নাটকেও আসিয়াছে। গানের মধ্যে 'মানুষ তো আর কিছুই নয়, জলের তিলক বালির বুকে; এই আছে, এই নেই তো আবার, শুকিয়ে যায় এক পলকে' শীর্ষক গানখানি দর্শক সমাজে বেশ সাড়া তুলিয়াছিল। নাটকীয় সংঘাত কোথায় আরম্ভ করিয়া কোথায় শেষ করিতে হইবে সে তথ্যে নাট্যকার বিশেষ নিপুণ ছিলেন না। ইহার প্রকাশ-কাল ইংরাজি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ।

দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধুবধ

নাট্যকার এই নাটকখানি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে বেঙ্গল থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছে। ইহার অবয়ব ক্ষুদ্র, তিন অঙ্কে সমাপ্ত। নাটকের আরম্ভটি চিত্তাকর্ষক। ইহার "প্রেম যদি, সই, শিখ্‌তে হয়, মানুষের কাছে নয়। সাঁঝের রবি, প্রেমের ছবি, প্রেমের আলো আকাশময়" শীর্ষক সখীদের গানখানি ও দুর্যোগপূর্ণ রজনীর বর্ণনাসূচক "ধর হে বারিদ মিনতি মোর, ডেকো না গভীরে গরজি ঘোর * * ভুলে যা চপলা চমক চাহনি, চোখে চেপে রাখ ভীষণ বাজ,—তুই ঘুমাইলে বাজো ঘুমাবে, ভয়ও ঘুমাবে আমারো গো—" অন্ধমুনি-তনয় বালক সিন্ধুর মুখে এই গানখানি রঙ্গমঞ্চে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শেষোক্ত গানখানি শুনিলে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে অভিনীত গিরিশচন্দ্রের 'সীতার বনবাস' নাটকের বনবাসকালীন সীতার মুখে 'চমকে চপলা চমকে প্রাণ চাহ মা চপলা-হাসিনী' শীর্ষক গান-খানির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। নাটকের উপসংহারটি দীর্ঘ উক্তি-প্রত্যুক্তিপূর্ণ শোক তরঙ্গে তলাইয়া গিয়াছে। ঐ উক্তিগুলি কিছু সংক্ষিপ্ত হইলে পাঠক বা দর্শকের মন হইতে শোকরেখাটিকে এত সহজে মুছিয়া দিতে পারিত না।

চন্দ্রহাস

এখানি কিংবদন্তীমূলক ঐতিহাসিক নাটক। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে নাটককার কর্তৃক নূতন প্রতিষ্ঠিত বীণা থিয়েটারে ইহা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ধ্রুব-প্রহ্লাদের মতো চন্দ্রহাসও শিশুকাল হইতে হরিভক্ত ছিলেন, কিন্তু ইঁহার প্রাণনাশের পরীক্ষাগুলি ভক্তির দিক্ দিয়া করা হয় নাই, যেমন ধ্রুব-প্রহ্লাদের বেলা হইয়াছিল। ঐ পরীক্ষাগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইয়াছিল। প্রাণে বাঁচিয়া যাওয়া ব্যাপারটা অবশ্য দৈবাধীন ছিল, ভগবদ্ভক্তি তজ্জন্য গৌণ ভাবে কাজ করিলেও মুখ্যভাবে করে নাই। চন্দ্রহাসের সহিত প্রাগুক্ত পৌরাণিক মহাপুরুষ দুইটির তুলনা করিলে এই সূক্ষ্ম প্রভেদটুকু দেখিতে পাওয়া যায়। নাটকের উপজীব্য গল্পাংশটি সুন্দর হইলেও রচনা প্রণালীর দোষে নাটকখানি বেশী দিন চলে নাই। মাত্রাজ্ঞানের অভাবই নাটকের সুন্দর প্রতিবেশটিকে নষ্ট করিয়াছে; নতুবা ইহা বহু রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে পারিত। সংগীতবিভাগে 'তালে তালে পা ফেলে, হরি বোলে নাচি, ভাই' এবং 'নগর চেয়ে কানন ভাল, নাইকো হেথায় কোলাহল'—শীর্ষক গান দুইখানি জনপ্রিয় হইয়াছিল। নাট্যকার তাঁহার 'দুর্বাসার পারণে' দ্রৌপদীর মুখে—'পরের তরে আপন ভুলে পরের প্রাণে প্রাণ মিশাও' শীর্ষক গান-খানি গাওয়াইয়া ছিলেন, এ নাটকে পুনরায় চন্দ্রহাসের মুখে সেই একই গান গাহিতে দেওয়া ভাল হয় নাই। মহাজনী পদাবলীর গান সর্বত্র গীত হইতে পারে, কারণ তাহার একটা সর্বজনীনতা আছে; কিন্তু কোন চরিত্রবিশেষের বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে যাহা গীত হইয়াছিল ভিন্ন আব্‌হাওয়ার মধ্যে তাহারই পুনরাবৃত্তি ভাল শুনায় না।

পাঠশালার বিদ্যাশিক্ষা-ব্যাপারে প্রহ্লাদের প্রেম-ভক্তির যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, চন্দ্রহাসের বেলায় তাহার নকল থাকিলেও প্রেমের সম্পর্ক উহার মধ্যে ছিল না। চন্দ্রহাসের নিম্ন-লিখিত কথোপকথনে উপদেষ্টার বক্তৃতা আছে, প্রেমিকের প্রেম নাই; কথাগুলি এইরূপ :—

"গুরুমহাশয় কি শেখান, আমার তা ভাল লাগে না। বাল্যকালে যদি ধর্মশিক্ষা না হয়, তবে আর কখনই হবে না। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে মনোমধ্যে নানারূপ কুপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়, তখন ধর্মশিক্ষা বড় কঠিন। সুতরাং বাল্যকালেই ধর্মশিক্ষা চাই। আমাদের গুরুমহাশয় তা শেখান না, তিনি শেখান কেবল অর্থকরী বৈষয়িকী বিদ্যা। এ বয়সে ও বিদ্যা শিখ্‌লে ভবিষ্যতে আর মঙ্গল আশা নাই।" এইরূপ আরও পরিবেশ আছে যাহাতে নায়ক তাঁহার চরিত্রের সামঞ্জস্য সম্যক রক্ষা করিতে পারেন নাই। দুইটি স্ত্রী ও রাজ্যলাভ যাঁহার জীবনের লক্ষ্য তাঁহাকে চণ্ডিকা দেবীর দর্শন ও কৃপালাভের পাত্র করাইয়া তাঁহারই হস্তস্পর্শ দ্বারা দুই মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করানো কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকে। পাকা শিল্পী এরূপ চিত্র অঙ্কিত করেন না, কিংবদন্তীমূলক ইতিহাসে ঐরূপ থাকিলেও তাহা বিচারপূর্বক লওয়া উচিত ছিল। এখানি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে।

চতুরালি

এখানি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কৌতুকপূর্ণ নাটিকা। আয়ান, জটিলা ও কুটিলাকে এক চতুরালির মধ্যে ফেলিয়া রাধার কৃষ্ণঘটিত কলঙ্ক শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কিরূপে দূর করিয়াছিলেন তাহার চিত্র ইহাতে আছে। নাট্যরস ধামাচাপা দিয়া রঙ্গরস মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। সংলাপের মধ্যে আয়ানের স্ন্যাকামি উক্ত চরিত্রের পৌরাণিক সামঞ্জস্য রক্ষা করে নাই। এই নাটিকাখানি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে বীণা থিয়েটারে কৃতিত্বের সহিত প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত গানের ভিতর দিয়া অভিনয়টি বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল :—'হায়, হায়, একি শুনি ভাই! আটক পড়েছে আমার বিনোদিনী রাই!' ছড়া ও গানের মধ্যে নাটিকার রূপগ্রহণ ইতঃপূর্বে দেখা গিয়াছে, সুতরাং সে দিক দিয়াও নাটিকার নূতনত্ব নাই। ইহার প্রকাশ-কাল ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই তারিখ।

চন্দ্রাবলী

এই নাটিকাখানি কৃষ্ণের সখী চন্দ্রাবলি-সম্বন্ধীয় হাস্য-কৌতুকে পূর্ণ। চন্দ্রাবলী রাধিকার ন্যায় বৃন্দাবন-বিহারীকেই আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। উভয়েরই কিন্তু সাংসারিক স্বামী বিদ্যমান ছিল। স্বামিরা অভিসারিকাদের আভিসার বন্ধ করিতে আসিয়া কিরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছিল তাহার চিত্র ইহাতে আছে। হাস্য-কৌতুক, 'মার-ধোর' এমন কি নীচ জনোচিত আধুনিক অশ্লীলতা পর্যন্ত ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। চন্দ্রাবলীর 'তুমি যে কত ভাল, চিকন কালো, বল্‌বো কত একটি মুখে? রূপের ঝলায় ভুবন আলো, চাঁদের ছবি পায়ে নখে'—গানখানি উল্লেখযোগ্য! এখানির প্রথম অভিনয় বীণা থিয়েটারে চতুরালির সঙ্গে-সঙ্গেই সম্পাদিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ-কাল ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই তারিখ।

হরিদাস ঠাকুর

এখানি বৈষ্ণব ধর্মমূলক নাটক। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন তারিখে বীণা থিয়েটারে ইহা পুনরভিনীত হইয়াছিল। কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহার বিজ্ঞপ্তিতে বলিয়াছেন যে এখানি ঢাকায় লিখিত ও এপ্রেল মাসে সর্বপ্রথম সেখানেই অভিনীত হইয়াছিল। নবাব ও কাজীর সহিত হরিদাস ঠাকুরের সংঘর্ষ-দৃশ্য ব্যতীত অন্য কোন নাটকীয় সংঘাত ইহার মধ্যে নাই। বাকী দৃশ্যগুলি নাট্যাকারে গ্রথিত

থাকিলেও বর্ণনাত্মকভাবে বর্ণিত হইয়াছিল এবং এখানি বহুবার অভিনীত না হইবার কারণ তাহাই। ইহার প্রকাশ-কাল ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই তারিখ।

কানাকড়ি

এখানি বিদ্রূপাত্মক প্রহসন, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত। অর্থগৃধ্নু, এটর্নি, ডাক্তার, এডিটর, অফিসের বড়বাবু, সাহিত্য-সমালোচকেরাই এই সকল বিদ্রূপের লক্ষীভূত জীব। ইহা নামে মাত্র প্রহসন, কারণ নেড়া বিদ্রূপ ছাড়া কোন নাট্যরস ইহার মধ্যে নাই। অভিনয়ের খবরও আসে নাই।

হরি-হর লীলা

এখানি নাট্যরাসক। গিরিরাজের শ্মশানবাসী জামাতা সম্বন্ধীয় ভুল ধারণা দূর করিবার জন্য নারদ বিষ্ণুর পরামর্শে কাশীধামে যাইয়া শিব-সমন্বয় ব্যাপার নামে এক বাহ্য অনুষ্ঠান-দ্বারা শিব-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার নাট্যমূল্য কিছু নাই। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের কোন তারিখে এখানি বীণা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। গ্রন্থাবলির মধ্যে ইহার প্রকাশ-কাল (১৮৮৯)।

কলির প্রহ্লাদ

ইহার প্রকাশ-কাল ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্‌টেম্বর তারিখ। মদ, বেশ্যা ও বেশ্যাসেবিত রঙ্গমঞ্চের বিরুদ্ধে অভিযান প্রস্তুত করা এই ব্যঙ্গ-নাট্যখানির উদ্দেশ্য। মফস্বলের জমিদারকুল অভিনেত্রীর লোভে নাট্য-সম্প্রদায়কে কিরূপ বিব্রত করিয়া তুলিতেন তাহার চিত্র ইহার বর্ণিতব্য বিষয়। এরূপ উদ্দেশ্যমূলক দৃশ্যকাব্যে নাট্যকলা অপেক্ষা বেল্লিকপনা বেশী থাকে, অভিনয়ের খবর জানা যায় নাই।

জন্মাষ্টমী

এই চিত্ররঙ্গটিতে (Tableaux-Vivant) একদিকে যেমন (১) শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, (২) বসুদেবের নন্দালয়ে গমন ও নন্দ-যশোদাকে কৃষ্ণার্পণ ও (৩) তৎবিনিময়ে যোগমায়াকে লইয়া পলায়ন, (৪) কংসহস্তচ্যুত যোগমায়ার শূন্যে অবস্থান—পৌরাণিক এই চারিটি জীবন্ত চিত্রের মূক অভিনয় (Dumb-show) আছে, অপর দিকে তেমনি (১) ভণ্ড পুরোহিত, ভণ্ড বৈষ্ণব, (২) মাতাল, গুলিখোর ও (৩) শনি বাসরীয় বাবুদের কীর্তি-কলাপ এবং (৪) পরিশেষে নন্দোৎসবের মাত্‌লামি প্রভৃতি সাংসারিক চারিটি পৃথক রঙ্গচিত্র-দ্বারা ইহার বিপরীত দিক পূর্ণ রাখা হইয়াছিল। ইহাতে কেবল চিত্র আছে—নাট্যরস নাই। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের কোন তারিখে বীণা থিয়াটারে এখানি প্রথম প্রদর্শিত হইয়াছিল।

প্রমদ্বরা

এই নাটিকাখানি পৌরাণিক ঘটনাবলম্বনে রচিত এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের কোন তারিখে বীণা থিয়েটারে ইহার প্রথমাভিনয় সম্পাদিত হইয়াছিল। সাবিত্রী যেমন তাঁহার মৃত পতি সত্যবানের

আয়ুঃ যমরাজের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া পতিকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, রুরুও তেমনি তদ্বিপরীতে কালসর্পের দংশনে মৃতা পত্নী প্রমদ্বরাকে যমরাজের কথামতো নিজের আয়ুর অর্ধেক দান করিয়া পুনর্জীবিতা করিলেন। হিন্দুপুরাণ এতই গভীর ও বৈচিত্র্যময় যে ইহার ভাণ্ডারে কোন রত্নেরই অভাব হয় না। সতীর পতিনিষ্ঠা যেমন দেখিবার জিনিস, পতির পত্নীনিষ্ঠা তদপেক্ষা কম গৌরবকর ব্যাপার নহে। এই তত্ত্বটি প্রকাশিত করিবার জন্য নাটিকাকার পুরাণ হইতে উপরি-উক্ত আখ্যান-বস্তুটির নাট্যরূপ-দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ চেষ্টার নবীনত্ব ও মৌলিকত্ব আছে, কিন্তু নাটিকার চরম-পরিণতি দৃশ্যকাব্যোচিত উপায়ে সম্পন্ন হয় নাই। নাটিকাখানিকে গীতবহুল ও কবিত্বপূর্ণ করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত নাটকের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল না।

মীরাবাঈ

এই নাটিকাখানি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বীণা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। মীরাবাঈয়ের পার্থিব প্রেম হরিভক্তিদ্বারা কিরূপে অপার্থিব প্রেম-ভক্তি লাভ করিল তাহার অভিব্যক্তি ঠিক দৃশ্যকাব্যোচিত ভাবে প্রদর্শিত হয় নাই। নাটিকার মধ্যে মূর্তিমতী হরিভক্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব আকস্মিকভাবেই আনা-গোনা করিয়াছে। মীরার কবিতায় আকর্ষণী-শক্তি ছিল না। এখানি ধর্মমূলক ঐতিহাসিক নাটিকা। প্রাচীন কিংবদন্তী ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তি, আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণামূলক সিদ্ধান্ত ইহার ঐতিহাসিক চরিত্রকে প্রভাবিত করে নাই। দেশ-কাল-পাত্র বিষয়ক জ্ঞান নাটিকাকারের প্রখর ছিল না। আকবর বাদশাহের সভায় নাটিকাকার তানসেনকে গান গাওয়াইলেন, কিন্তু কি গান সেখানে গীত হইল তাহা তিনি লিখিলেন না। ভুবনবিখ্যাত সংগীতবিশারদের গান শুনিবার ও তাহার তাৎপর্য বুঝিবার জন্য উৎকর্ণ দর্শক বা পাঠক সমাজ নাটিকাকারের এ নীরবতায় ক্ষুব্ধ হইলেন। এ বঞ্চনার কারণ কি? মীরার চরিত্রের উপর চঞ্চলমতি মহারাণা কুম্ভের সন্দেহ নাটিকার মধ্যে হঠাৎ আসিয়াছে, তজ্জন্য মীরার প্রতি তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদানব্যাপারও সেইরূপ অকস্মাৎ করা হইয়াছিল। মীরা কিন্তু দৈবযোগে পুনর্জীবন লাভ করিলেন। রসকুম্ভের দ্বারা ঐ সন্দেহটি আনীত হইয়াছিল বলিয়া তাহার প্রতিও মহারাণার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা সেইরূপ সহসা প্রদত্ত হইয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে মীরার অনুরোধেই উহা পরিত্যক্ত হইল। এই ঘটনাবলি এমনি যন্ত্রচালিতের মতো পরিচালিত হইয়াছিল যে তাহাতে ঘাত-প্রতিঘাত আনিবার অবসর আসিল না।

মীরার বহুপ্রচলিত সংগীতগুলি যদি নাটিকাকার নিজরচিত গানের পরিবর্তে বসাইয়া দিতেন তাহা হইলে ভাল করিতেন। যাহা হউক সর্বশেষে মীরার একখানি স্ব-রচিত গান দর্শকদিগকে শুনাইয়া তাঁহাদের মানসিক ক্ষুধা তিনি কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। নাটিকাকারের নিজরচিত গানের মধ্যে 'খেলার ছলে হরি ঠাকুর গড়েছেন এই জগৎখানা। চাদ্দিকে তাই খেলার মেলা, খেলার খালি আনা-গোনা' শীর্ষক গানখানি জনপ্রিয় হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা

এই পৌরাণিক নাটিকাখানি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে বীণা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের নিধনকল্পে কংসের আদেশে ঋষিদিগের দ্বারা আঙ্গিরস-যজ্ঞ

অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অম্বিকায় এই অভিনয়-আয়োজন করিয়াছিলেন। নাটিকার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যাহা প্রয়োজনীয় তাহার কোন অভাব ছিল না। ইহার সরল গানগুলি ক্রিয়াস্বরূপ ভাবব্যঞ্জক; অবান্তর প্রসঙ্গ-হিসাবে ঐগুলি আসিলেও বাঙ্গালার 'ছেলে ভুলানো ছড়া' ইংরাজীতে যাহাকে 'Nursery rhyme' বলা হয় তাহারই উৎকর্ষ সাধক হইয়াছে, যথা:—"যশোদা—' (আমার) গোপাল দোলে দোলার কোলে, সোনার দোলা আলো ক'রে। (যেন) সুধার সরে বিহার করে, সুনীল-কমল ঘুমের ঘোরে॥ আয় রে প্রভাত বায়, হাত বুলা রে গায়,—(বাছার) ঘাম হয়েছে, দে রে মুছে, ঘুম না ভেঙে যায়;—(ওরে) দোল্ রে দোলা, ডাক্ রে পাখী ঘুম-পাড়ানো মধুর সুরে॥"—এই সংগীতখানি অপূর্ব। নাট্যসাহিত্যে রাজকৃষ্ণই এই প্রকার সংগীত প্রথম রচনা করিলেন, তিনি ইহার পথিকৃৎ, সংগীতের সরলতা ব্যতীত নাটিকার অন্য কোন নূতনত্ব নাই। ইহার প্রকাশ-কাল ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ।

খোকাবাবু, বেলুনে-বাঙ্গালী বিবি, জুজু

এই তিনখানি প্রহসনে কোন স্ত্রৈণ ধনীর লাঞ্ছনা, কোন আদুরে আব্দারে ছেলের খেয়াল ও কাণ্ডজ্ঞানহীনা আধিক্যেতাপূর্ণা বাৎসল্যপরায়ণা কোন গৃহিণীর ন্যাকামি চিত্রিত হইয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে গান ইহাতে নাই। খোকাবাবুর প্রকাশকাল ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ। বেলুনে বাঙ্গালী বিবির প্রকাশকাল ১৮৯০, ২রা মার্চ। জুজুর প্রকাশ-কাল ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর তারিখ।

ডাক্তার বাবু

ইহার রচনা ও প্রকাশকাল ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ তারিখ। ইহাতে চরিত্রহীন ডাক্তারের লাঞ্ছনার কথা আছে ও চিকিৎসা বিদ্যার বর্ণজ্ঞানহীন কবিরাজের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বর্ণনাত্মক কাব্যের মতো পর-পর ঘটনাবলি উল্লিখিত হইয়াছে, এবং তাহাও দৃশ্যকাব্যোচিত ভাবে সম্পন্ন করা হয় নাই। অভিনয়ের স্থান ও তারিখ সংগৃহীত নাই।

সত্যমঙ্গল নাটক

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই তারিখে এখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ দেবের পূজা ও নাম-মাহাত্ম্য প্রচারকল্পে ইহা রচিত। এখানি কিংবদন্তী ও পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক-শ্রেণীর অন্তর্গত। ঘটনা-বিবৃতির দিকে দৃষ্টি দেওয়ায় সদানন্দের মতো সত্যনারায়ণের কৃপাপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারীর চরিত্রসৃষ্টিতে ব্যাঘাত উৎপাদিত হইয়াছে। ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণ নিজ পত্নীকে সহসা অলংকারে বিভূষিতা দেখিয়া তাঁহার সতীত্বের উপর সন্দিহান্ হইয়াছিলেন। এই ঘটনাটির প্রকাশ-ভঙ্গী সদানন্দের মতো সাধনা লইয়া সিদ্ধপ্রাপ্ত ধার্মিকের পক্ষে অশোভন হইয়াছে। আখ্যানভাগে থাকিলেও তাহা নাটকোচিতভাবে প্রতিপন্ন করা নাট্যকারের উচিত ছিল।

টাটুকা-টোটকা

ইহার প্রকাশকাল ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর। লম্পট ছাত্রের লাম্পট্য দূর করিবার জন্য ইহা একখানি অভিসন্ধিমূলক প্রহসন। এখানি কৌশলে পূর্ণ হইলেও বাজে সংলাপের মধ্যে

দৃশ্যকাব্যোচিত সংঘাত পূর্ণমাত্রায় ইহাতে আসিতে পারে নাই। ক্রিয়ার ঘাত-প্রতিঘাত অগ্রপশ্চাৎ লাভ করিয়াছে। অভিনয়ের কথাও জানা যায় নাই।

জগা পাগলা

ইহার রচনা ও প্রকাশকাল ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্‌টেম্বর তারিখ। ভাবরাজ্যে বিচরণশীল এক পাগলের চিত্র ইহার মধ্যে আছে। এই চরিত্রের অভিনবত্ব এই যে, জাগতিক ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া জগা এক ঐন্দ্রজালিক কুহক বলে জগৎকে যে শিক্ষা দিয়াছিল তাহাতে লোকে আমোদের ভিতর দিয়া জগতের আসল রূপ দেখিয়া লইল। এখানি প্রহসন জাতীয় দৃশ্যকাব্য হইলেও ইহার মধ্যে চিন্তার খোরাক বেশ আছে, তাই প্রহসনকার ইহার নামকরণ করিয়াছেন 'প্রাহসনিক নাটিকা'। অভিনয়-তারিখ সংগৃহীত নাই।

লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র

এই ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক প্রহসনখানির নাট্যরস অত্যুক্তিদোষে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। বেশী কেনাইতে যাইয়া যে-কোন-উপায়ে টাকা করার ফিকিরে লোভী ব্যক্তির অদ্ভুত পরিণতি প্রহসনকার দেখাইয়াছেন বটেন, কিন্তু তাহাতে ঘটনাটি অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। উৎকটতা সকল ব্যাপারেই থাকিতে পারে, কিন্তু স্বভাবের সীমা লঙ্ঘিত হইলে ক্ষোভ জন্মে। অভিনয়-কাল সংগৃহীত নাই। প্রকাশ-কাল ১৮৯০, ৪ঠা অক্টোবর।

রাজা বংশধ্বজ

সত্যনারায়ণ দেবকে তাচ্ছিল্য করিয়া কি বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহার কাহিনী এই খানির উপজীব্য। সত্যনারায়ণের অলৌকিক কৃপায় তিনি তাঁহার মৃত পুত্রকে সঞ্জীবিত করিতে পারিয়াছিলেন। সংলাপের মধ্যে নাট্যক্রিয়ার অব্যাহত গতি বাধা পাইয়া ঘাত-প্রতিঘাত যথাস্থানে সৃষ্টি করিতে দেয় নাই। ইহা সত্যমঙ্গল নাটকের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট। অভিনয়-তারিখ জানা যায় নাই। ইহার প্রকাশ-কাল ১৫ই জানুয়ারী, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ।

প্রহ্লাদ মহিমা নাটক

এই নাটকের বর্ণিতব্য বিষয় এই যে, হিরণ্যকশিপু বধের পর প্রহ্লাদ এক অভাবনীয় উপায়ে হরিনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন। নাটকখানি সুন্দরতর হইতে পারিত যদি ইহার প্রকাশভঙ্গী (delineation) স্থানে-স্থানে বিলম্বিত না হইয়া নাট্যক্রিয়ানুমোদিত ভাবে সংঘাতের সৃষ্টি করিতে পারিত। তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে যদিও ইহার চরম পরিণতি ঘটিয়াছে, তাহা প্রাগুক্ত ভাবে ত্রুটিশূন্য করিতে পারিলে আরও মনোহর হইত। সংগীতের পৃথক অস্তিত্ব না থাকিলেও ভাবপূর্ণ কথাগুলি সুর করিয়া বলাইয়া নাটককার এক প্রকার সংগীতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; ইহাই রাজকৃষ্ণের এই নাটিকার নূতনত্ব। ইহার প্রকাশকাল ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী। অভিনয়-কাল জানা যায় নাই

নরমেধ যজ্ঞ (ভক্তি ও করুণ রসাশ্রিত পৌরাণিক নাটক)

এই নাটকখানি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহার প্রকাশ-কাল ১লা অগস্ট, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ। ইহাতে লেখার মুন্সীয়ানা আছে, রসিকতা স্থানে-স্থানে বেশ ফুটিয়াছে। নহুষের প্রেতাত্মা, যযাতি, নারদ, রত্নদত্ত, কুশধ্বজ, মণিদত্ত প্রভৃতি চরিত্রগুলির মধ্যে রত্নদত্ত, কুশধ্বজ, মণিদত্ত বেশ ফুটিয়াছে। নরমেধ যজ্ঞের নায়ক যযাতি কেন্দ্রবর্তী চরিত্র হইয়াও উপনায়কের মধ্যে (side-issue) পড়িয়া গেলেন। ১৫ খানি গান লইয়া নাটকখানি পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত, তন্মধ্যে (১) "নধর অধরে আধ সুধাধারা ঢালি শশধর লুকাল সই, ইত্যাদি," (২) 'ক্ষুধানলে বড়ই জ্বলে, ভেসেছিলেম নয়ন-জলে, কাতর হ'য়ে কাঁকর ভুঁয়ে ছিলেম শুয়ে ঘুমের কোলে,' ইত্যাদি, (৩) "বাপ ভিখারী, মা ভিখারী, নয়ন-বারি ঢালে দুখে। বাপ-মায়ের দুঃখ দেখে আমরা কাঁদি অধোমুখে" গানগুলি বহুকাল ধরিয়া লোকের মুখে মুখে ফিরিত। হৃদয়হীন কুশীদজীবী রত্নদত্তের নাম প্রবাদ বচনে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে এমনি নাট্যকারের অদ্ভুত সৃষ্টিকৌশল। এ নাটকখানি বহুদিন ধরিয়া স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল।

লয়লামজনু

এই নাটিকাখানি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহার প্রকাশ কাল ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ। রাজকৃষ্ণ ইহাকে করুণ রসাত্মিকা গীতি নাটিকা (a tragic opera) বলিয়াছেন। ফারসী ভাষার গল্পটি নাটিকাকার মোহিনী ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। ছড়া ও কবিতার ছন্দে এবং গীতবাহুল্যে এখানি অপূর্ব। ব্যথাতুর লয়লা মৃত্যুর পূর্বে বলিয়াছে—"দূরেইতো পতির সঙ্গে সতীর অটুট প্রেম হয়। এই দেখ না, কুমুদিনী জলে, চাঁদ ঐ অনেক দূর আকাশে, কিন্তু দুজনে কেমন প্রেম—কেমন ভালবাসা।" গুপ্তপ্রেমের ইহাপেক্ষা সুন্দর উপমা পাওয়া কঠিন। এ নাটিকাখানি বহুবার অভিনীত হইয়াছে। সংগীতবিভাগে (১) "লয়লা কি খেলা খেলে, এ যে নূতন খেলা," (২) "তোমাকে প্রেম-গোয়ালে রাজার হালে রেখে দেবো" গান দুইখানি খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল।

লক্ষপতি

নাটকখানি 'সত্যমঙ্গল' নাটকের প্রথম পরিশিষ্ট। সত্যনারায়ণের পূজা করিয়া কি হইয়াছিল এবং তাঁহাকে অবহেলা করিয়াই বা কি ঘটিল, তাহা দেখাইবার জন্য ইহা রচিত হইয়াছিল। লক্ষপতির কন্যা কলাবতী সত্যনারায়ণ দেবকে ভুলিয়া দুর্দশার চরম সীমায় উপনীতা হইয়াছিলেন; অবশেষে ভিক্ষার্থ বহির্গতা কন্যাকে গৃহের বাহিরে নিশাযাপন করিতে দেখিয়াই তাঁহার মাতা, কলাবতীকে হঠাৎ অসতী সাব্যস্ত করিয়া লওয়ায় গল্পের ঘটনাটি বাদ দিলে চরিত্রসৃষ্টি বিষয়ে নাটকখানি দোষযুক্ত হইয়া যায়। অভিনয়ের কথা জানা যায় নাই। গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইহার প্রকাশ-কাল ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ।

গিরি গোবর্দ্ধন

এই পৌরাণিক নাটিকাখানির মধ্যে নূতন কিছু নাই। ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ ইহার পৌরাণিক ভিত্তি। শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গুলিদ্বারা গোবর্দ্ধন গিরিকে কেন ধারণ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ ইহার উপজীব্য। ইহার প্রকাশকাল ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ, অভিনয়-কাল জানা যায় নাই।

দুটি মন-চোরা

গানে-গানে উক্তি-প্রত্যুক্তি করিয়া রাধাকৃষ্ণের সংকেত স্থানে মিলন কি ভাবে সম্পাদিত হইত, তাহাই এই ক্ষুদ্র নাট্যরাসকখানির বিষয়বস্তু। ইহার নাট্যগত মূল্য কিছু নাই, কারণ অন্যান্য নাট্যকারগণ ইতঃপূর্ব্বে এই জাতীয় রাসক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার প্রকাশকাল ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ, অভিনয়-কাল সংগৃহীত নাই।

লক্ষহীরা

এই নাটিকাখানি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বীণা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহার প্রকাশ-কাল ২৫শে জানুয়ারি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ। পৌরাণিক ঘটনা ও কিংবদন্তীমূলক দৃশ্যকাব্যখানি সংলাপের ঘাত-প্রতিঘাতে অগ্র-পশ্চাৎ নিবন্ধন এক কিম্ভূতকিমাকার কাব্য রচিত হইয়াছে। বর্ণনাত্মকভাবে কাহিনীর গৌরব রাখিতে যাইয়া এখানি মোটেই নাটকোচিত হয় নাই।

বনবীর

এই নাটকখানি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহার প্রকাশ-কাল ৩রা ডিসেম্বর, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ। নাট্যকার ইহাকে ষড়রসের মধ্যে পঞ্চ রসাধিকার নাটক বলিয়াছেন। নাটকটির গল্পাংশ ঐতিহাসিক পাঠক মাত্রেই জানেন। তৃতীয় অঙ্কের পান্না-বনবীরের সংলাপ মধ্যে নাটকীয় চরমোৎকর্ষ পান্নার স্বগতোক্তির চাপে ধূমায়িত রহিয়াছে, উহার জলন্ত মূর্ত্তি পরে প্রকাশিত হইলেও অগ্র-পশ্চাৎ নিবন্ধন স্থানে-স্থানে স্তিমিত দেখাইয়াছে। মৃতপুত্র ক্রোড়ে লইয়া পান্না-উদয় সংবাদটি সুন্দর হইয়াছে। চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত নাটকের গতি অব্যাহত রাখিয়া পঞ্চম অঙ্কে বনবীর-উদয়-সর্দ্দারগণের মিলন কার্যটিকে নাট্যকার নাট্যকৌশলে সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। ষড়যন্ত্র-হত্যা-আত্মহত্যা ও আত্মগ্লানিতে ঐগুলি পূর্ণ হইলেও উহাদের অভিব্যক্তি নাটকোচিত হয় নাই।

ঋষ্যশৃঙ্গ

এখানি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহার প্রকাশ-কাল ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ। নাট্যকার ইহাকে আদি-করুণ-হাস্যরসাশ্রিত গীতিনাট্য বলিয়াছেন। পৌরাণিক গীতি-নাট্য বলিয়া গল্পাংশের পরিচয় অনাবশ্যক। এখানি মন্দ হয় নাই, গানগুলির মধ্যে কবিতার গন্ধ সুরের সৌগন্ধ অপেক্ষা বেশী পরিস্ফুট। নর্মসখা বিদূষকের রসিকতায় হাস্যরসের পরিবর্তে বীভৎস রস উদ্গীর্ণ হইয়াছে, তবে তাহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের মধ্যে মাত্র একটি স্থানে—"সমস্ত ভারতবর্ষটা একেবারে মরুভূমি হয়ে যাক্। ইন্দির ঠাকুরও ভিত্তিগিরি

থেকে ছুটী পান" বাক্যটি লক্ষ্য করিবার, বাকিগুলি মামুলি। খৃষ্যশৃঙ্গ ও বেশ্যাদের কথোপকথনের মধ্যে যৌন-জ্ঞানহীন খৃষ্যশৃঙ্গের 'ওলো আর্য্য,' 'ওলো ওলো পূজ্যপাদ পিতামহ' বলিয়া লম্বোদরী নাম্নী বৃদ্ধা বেশ্যাকে সম্বোধনের মধ্যে নূতনত্বের আস্বাদন আছে।

বেগেজির বদ্‌রেমণি

এখানি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয়ের ৪ দিন পূর্বে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার ইহাকে গীতি-নাটিকা বলিয়াছেন। এই নাটিকাখানি গানে, কবিতায়, আভিনায়িক গদ্যছন্দে ও মধ্যে মধ্যে উর্দু-জবানে রচিত হইয়া পরীস্থান, মনুষ্যস্থান এবং প্রেতস্থানের প্রেম ও ঈর্ষার ক্রীড়াভূমি হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি গানে কবিত্ব ও সুরের লহর উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে। উর্দু ভাষার 'মস্‌নবি' কাব্যের ছায়াবলম্বনে এখানি লিখিত হইয়াছে।

হীরে মালিনী (কৌতুক নাট্যগীতি)

কাঞ্চীপুরের রাজা গুণসিন্ধুর পুত্র সুন্দরের বিদ্যালাভার্থ হীরেমালিনীর গৃহে অবস্থান বিষয়ক এই কৌতুক নাট্যগীতিটি পাঁচটি দৃশ্যে পূর্ণ। সুন্দরকে দর্শন করিয়া ভারতচন্দ্র কর্তৃক রচিত পল্লীরমণীর কবিতা ছন্দটিকে নাট্যকার ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া সুর-তান-লয়যুক্ত গীতিছন্দে রচনা করিয়াছিলেন। এখানি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল, অভিনীত হয় নাই।

রাজকৃষ্ণ রায়ের কালে বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্য কি-কি বিষয়ে লাভবান হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপসংহার-কালে লিখিত হইল। সংগীতের সরলতা ও কবিত্ব রাজকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য। নাট্যসাহিত্যের গড্ডালিকা-স্রোত তিনি রোধ করিতে পারেন নাই। উপন্যস্ত বিষয়ের বৈচিত্র্যের মধ্যে 'প্রমদ্বরার' আখ্যানবস্তু প্রশংসার্হ। নাট্যসাহিত্যে 'ছেলে ভুলানো ছড়ার' তিনি প্রবর্তক। ছন্দ ও গদ্য-বৈচিত্র্য তিনিই দেখাইয়াছেন। দৃশ্যকাব্যের প্রকৃত রূপগঠনের দিকে তাঁহার কোন কৃতিত্ব ছিল না। নাটকের ভাষা বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা থাকিলেও উহা কিন্তু সকল স্থানে ভাবের দ্যোতক হয় নাই।

নাট্যসাহিত্যে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের দান
(১৮৭৬—১৯১৬ খৃঃ)

অতুলকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের অন্যতম পার্শ্বচর ছিলেন। তিনি স্বভাবকবি এবং রঙ্গমঞ্চের মধ্যেই তাঁহার জীবনের বেশিভাগ অতিবাহিত হইয়াছিল। নাটক অপেক্ষা নাটিকা-বিভাগে তাঁহার কৃতিত্ব সমধিক ছিল। ৩৯ খানা নাট্যগ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে, এখানে তাহাই আলোচিত হইবে। বাকিগুলি অচিরে না হোক, নিকট ভবিষ্যতের কালগর্ভে লুপ্ত হইয়া যাইবে, সুতরাং ঐগুলির একটি তালিকা প্রথম অভিনয়ের তারিখ সহ এই অধ্যায়-শেষে দেওয়া হইবে। অতুলকৃষ্ণ এককালে এমারেল্ড ও সিটি থিয়েটারের একমাত্র নাট্যকার ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের মৃত্যু ঘটে, তজ্জন্য কতকগুলি নাটিকা ও ব্যঙ্গ-নাট্য তাঁহার মৃত্যুর পর অভিনীত হইয়াছিল।

অতুলকৃষ্ণ মিত্রের জীবনচরিত-রচয়িতা বলেন 'পাগলিনী' নাটক তাঁহার সর্ব প্রথম রচনা। কোন্নগরের কোন শখের থিয়েটারের জন্য উহা লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা উহার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাই নাই।

আদর্শ সতী

এখানি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বীডন্‌স্ট্রীটস্থ স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। সাবিত্রী-সত্যবানের গল্পাংশ লইয়া ইহা রচিত, কিন্তু মোটেই দৃশ্যকাব্যোচিত হয় নাই; ঘাত-প্রতিঘাত কোথাও নাই। অজস্র প্রাণহীন গান ও নীরস কবিতায় মণ্ডিত হইয়া এবং নাটিকাকারে গঠিত থাকিয়া ইহা শ্রব্যকাব্যেরই উপযুক্ত হইয়াছে। অতুলবাবুর পরবর্তীকালের যশঃ ইহাকে স্পর্শ করে নাই। ইহা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ প্রকাশিত হইয়াছিল।

পিশাচিনী (বা যাতনাযন্ত্র)

এই নাটকখানি অতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্তৃক ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রচিত, ও ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার অধিকাংশ গদ্যে, সামান্যাংশ পদ্যে লিখিত হইয়াছে। দীর্ঘ সংলাপ ও স্বগতোক্তিগুলি নাটককে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়াছে। চন্দ্রশেখর নামক বৃদ্ধ জয়ন্তীরাজ অন্নপূর্ণা নাম্নী গুণবতী প্রথমা মহিষী ও তাঁহারই গর্ভজাত কুমারকৃষ্ণ নামে একমাত্র রাজপুত্র থাকা সত্ত্বেও সুরঞ্জনা নাম্নী এক কন্যাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া তাহারি প্ররোচনায় কিরূপে ঐ রাজ-পরিবার মধ্যে ষড়যন্ত্র, হত্যা, আত্মহত্যা, ব্যভিচার প্রভৃতি প্রবেশ লাভ করিয়া ঐ পরিবারকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিল তাহার কাহিনী ইহার গল্পাংশ। ইহাই অতুলকৃষ্ণের প্রথম রচনা, ইহাতে ঘটনা আছে, কিন্তু কিরূপ সংঘাতে প্রতিঘাতের সৃষ্টি করিতে হয় সে নাট্য-কৌশল নাই। কুমারকৃষ্ণ নিজ ব্যভিচারিণী পত্নী মহামায়াকে তাহার জারের সহিত ঘৃতপূর্ণ তপ্তকটাহে কিরূপে হত্যা করিলেন এবং তাহারা প্রেত হইয়া কিরূপে তাঁহাকে নির্যাতিত করিতে লাগিল, অবশেষে কিরূপেই বা তিনি তাঁহার স্বহস্তে নিহত জননীর দেবীমূর্তিদ্বারা রক্ষিত হইলেন—এই সকল অলৌকিক ব্যাপারে নাটকখানি পূর্ণ। আখ্যা-পত্র নাটকখানির অভিনীত হইবার কথা বলে না, নতুবা দর্শক সাধারণ ইহার মধ্যে চমকপ্রদ

দৃশ্যাবলি দেখিতে পাইতেন। নাটিকাকারের সহজাত শক্তি লইয়া যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার হস্তে গ্রন্থমধ্যগত পাত্র-পাত্রীর অপমৃত্যুর সহিত লেখার দোষে এ নাটকখানিরও অপমৃত্যু ঘটিল। অন্নপূর্ণার পতিপূজার স্তবটি সংস্কৃত ও বাঙ্গালার সংমিশ্রণে বড়ই মধুর শুনাইয়াছে। পরবর্তীকালে 'সপত্নী' নাম দিয়া এখানি গীতিনাট্যে রূপান্তরিত হইয়াছিল। অতুলকৃষ্ণই তাহা করিয়াছিলেন।

ধর্মবীর মহম্মদ (দৃশ্যকাব্য)

অতুলকৃষ্ণ এ নাটকখানিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহার প্রথমভাগে মহম্মদের সাধনা, বিবাহ, ধর্মপ্রচার এবং অবশেষে মেদিনায় পলায়ন পর্যন্ত ঘটনাবলির উল্লেখ আছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে এখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। গৈরিশ ছন্দ ইহার মাধ্যম। নাটকের প্রধান গুণ সংঘাত অপেক্ষা বর্ণনার ভঙ্গী ইহার লক্ষণীয় বিষয়, তাই এখানি পাঠকের মনোহরণ করিতে পারে নাই। চারি অঙ্কে ইহা পূর্ণ। ইহার দ্বিতীয় ভাগে হিজিরা হইতে স্বর্গারোহণ পর্যন্ত মহম্মদের যাবতীয় ঘটনাবলি আছে। এখানি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ৫ম অঙ্ক হইতে ইহার আরম্ভ এবং ৮ম অঙ্কে তাহার পরিসমাপ্তি। নাটকোক্ত নানা ঘটনাবলির চাপে নাট্যরস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এখানি ঢাকায় প্রকাশ্যভাবে অভিনীত হইবার কালে মুসলমান ধর্মের অনুশাসন-বলে ইহার অভিনয় বন্ধ করা হয় এবং গ্রন্থগুলি পুড়াইয়া ফেলা হয়।

নন্দবিদায়

এই নাটিকাখানি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই তারিখে এমারেল্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাটিকার পরিচয়-পত্রে নাটিকাকার স্বীকার করিয়াছেন যে, এখানি সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে লিখিত হইয়াছিল। কংসের ধনুর্যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সহ সমুদয় ব্রজবাসীর নিমন্ত্রণ, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ, মথুরায় গমন, কংস বধ, কারাগার হইতে বসুদেব ও দেবকীর উদ্ধারসাধন প্রভৃতি ঘটনাবলি লইয়া নাটিকার গল্পাংশ গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমঘন-মূর্তি ও তাঁহার ব্রজলীলা ভাবরাজ্যের খেলা, ভাবুক ভিন্ন অন্যে তাহা দেখিতে জানেন না, বা বুঝিতে পারেন না, তাই প্রায়ই কদর্থ প্রকাশিত হয়। এ নাটিকার সংগীতই প্রাণ। ইহার কথাগুলি ছন্দোবন্ধে নৃত্যশীল, গানগুলি সুরতানলয়ে প্রাণে আলোড়নের সৃষ্টি করে।

প্রায় বষ্টিতম বর্ষ অতীত হইতে যায় ইহার প্রাণমাতানো সংগীতগুলি আজও শ্রোতার কর্ণে অমৃতবর্ষণ করিয়া থাকে, স্থানাভাবে উহাদের প্রথম ছত্রগুলি উদ্ধৃত হইল:—(১) 'নাচত মোহন নন্দদুলাল। রঞ্জিম চরণে মঞ্জীর ঘন বাজত, কিঙ্কিণি তাহে রসাল।' (২) 'আ মরি কি পায়-পায়, কানাই-বলাই যায়, আগে পাছে ধায় শিশুগণ', (৩) 'আমি কালারে পাইতে সকলি ত্যজিনু, কত লোকে কত কয়। কলঙ্ক-পশরা শিরে যার তরে, সে ধনে অপরে লয়।' (৪) 'মালঞ্চে ফুল আপনি ফুটে বাস বিলাতে চায়।' (৫) 'আর তো ব্রজে যাব না ভাই, যেতে এ প্রাণ নাহি চায়।' (৬) 'বঁধুয়া আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া মিলিবে তোমার পাশ।' এই গানগুলির রচয়িতা অতুলকৃষ্ণ মিত্র, কিন্তু মহাজন-পদাবলি হইতে আরও দুইখানি গান ইহার মধ্যে সংগৃহীত আছে।

বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রস লইয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা; নাটিকার অবয়বে ঐ রসগুলি ওতপ্রোত ভাবে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইয়াছে।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না

এই সামাজিক প্রহসনখানি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে এমারেল্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। বেশ্যা, বেশ্যাপুত্র, বিধবার জারজপুত্র, ব্রাহ্মসমাজ, মেয়ে ও পুরুষ মাতাল প্রভৃতি লইয়া কুশিক্ষাপ্রসূত তদানীন্তন সমাজে যে বিশৃঙ্খলার ঢেউ আসিয়াছিল তাহার চিত্র ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। বেশ্যা ও মদ লইয়া ব্যস্ত পুত্রগণের মাতার ভরণপোষণ করিবার অর্থ ও অবসর কোথায়? রংলাল-খুড়ার কৌশলে পুত্রগণ অবশেষে কিরূপে বঞ্চিত হইয়াছিল তাহার চিত্রই উপভোগের বস্তু হইয়াছে।

মা

এই নাটকখানি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে এমারেল্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। পুস্তকখানি কবে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল আখ্যা পত্রে তাহার তারিখ নাই। কালকেতু-চণ্ডীর ধর্মমূলক উপাখ্যান ইহার গল্পাংশ। অতুলকৃষ্ণ এই নাটকখানিতে আধ্যাত্মিক রহস্যের নূতন পরিকল্পনা দিতে গিয়াছেন, কিন্তু ষড়যন্ত্রের গোলকধাঁধায় পড়িয়া তাঁহার সে চেষ্টা পথহারা হইয়া গিয়াছে। নাটককার চণ্ডীদেবীর দ্বারা ব্যাধ কালকেতুকে রাজত্ব, পশুরাজ্যে আত্ম-শাসন প্রভৃতি বিভাগ করিয়া দিয়া ভাঁড়ু দত্তের স্বার্থপোষিত চক্রান্তের মধ্যে ঐ রাজ্য ধ্বংস করিতে যাইয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্বের যে তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিতে গিয়াছিলেন, তাহা আর সম্পূর্ণরূপে মীমাংসিত হইল না। চরিত্র হিসাবে কালকেতু, ফুল্লরা, সাধনা, সিদ্ধিনাথ, শিবা, বুলান, বিমলার মা, রোস্তম, দুর্মুখা ও দুঃশীলা মন্দ হয় নাই। উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে নাটকের তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত বেশ কার্যকরী হইয়াছে, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কের মধ্যে মথিত রসটি আধ্যাত্মিক ও পার্থিব ষড়যন্ত্রের চাপে পড়িয়া কোনটাই পরিস্ফুট হইল না। মানুষের দেব ও মানুষ ভাবের দ্বন্দ্বে মানুষভাব পরাজিত হইল। মূর্তিমতী সাধনা ও সিদ্ধি তখন প্রয়োজনহীন হওয়ায় পাষাণস্তূপে পরিণত হইয়া গেল। মোটের উপর নাটকখানি নাটিকাকারের হাতে মর্যাদা হারায় নি। গানগুলি প্রসঙ্গের অনুরূপ হইয়াছে। এখানি 'ফুল্লরা' নাম লইয়া ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিল।

হিরণ্ময়ী (যুগলাঙ্গুরীয় নাট্যরূপ)

এই নাটিকাখানি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর তারিখে ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি মৌলিক নাটিকা নহে, বঙ্কিম বাবুর 'যুগলাঙ্গুরীয়ক' গল্পটিকে নাট্যরূপ দান করিয়া নাটিকাকার ইহার 'হিরণ্ময়ী' নামকরণ করিয়াছিলেন। নাটিকার অবয়বে বহু গান সন্নিবিষ্ট আছে।

বাপ্পারাও (অপরূপ গীতিনাট্য)

অতুলকৃষ্ণ মিত্র ইহার প্রণেতা। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই, শনিবার তারিখে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক ৯১নং হ্যারিসন রোডে প্রতিষ্ঠিত গ্রাণ্ড থিয়েটার দ্বারা এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

নাটিকাখানির সংগীতগুলি বিষয়ের অনুগামী। সুর-তান-লয়ে সেগুলি দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোহারী হইয়াছিল। রাজপুত গৌরব সূর্যবংশীয় বাপ্পারাও কিরূপে কিংবদন্তীমূলক আব্‌হাওয়ার মধ্যে নিজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাহার কাহিনী ইহার উপজীব্য বিষয়। নাটিকাকার তাঁহার প্রকৃতিসুলভ নাটিকার ছাঁচে এই দৃশ্যকাব্যখানি গঠিত করিয়া ভূয়োজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, নতুবা ইহাকে নাটকে রূপান্তরিত করিলে তাহার গুরুগম্ভীর গতিবেগ তিনি সামলাইতে পারিতেন না। চৌদ্দঅক্ষরযুক্ত মাইকেলি অমিত্রাক্ষর ছন্দ তাঁহার হাতে সাবলীল গতিলাভ করে নাই।

শিরী-ফরহাদ (গীতিনাট্য)

এই নাটিকাখানি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্‌টেম্বর রবিবারে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাটিকা রচনায় সিদ্ধহস্ত অতুলকৃষ্ণ বহুল নৃত্যগীত ও রস-রসিকতার ভিতর দিয়া ইহার মনোরম রূপ পাঠক বা দর্শক সমাজকে দেখাইয়াছেন। দেহের ও মনের মিলনের পার্থক্য ইহার নায়ক-নায়িকা ব্যক্ত করিয়াছে। ঐ সমস্যা-সমাধানের জন্যই নাটিকাখানি রচিত হইয়াছিল। সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত প্রণয়ীদের শিক্ষালাভ ব্যাপারটি এক কৌতুককর আব্‌হাওয়ার মধ্যে পার্শ্বচর চরিত্রের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। নাটিকাখানির মধ্যে যমল নৃত্য-গীতও দেওয়া হইয়াছে। এই নাটিকা-খানির অভিনয় দেখিবার জন্য বহু দর্শকের সমাগম হইত।

লুলিয়া (গীতিনাট্য)

এখানি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে শনিবার তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। নাটিকাকার এই নাটিকাখানিতে যথেষ্ট যমল-সংগীত (duet) আমদানি করিয়াছেন, এই বিষয়ে তিনি একরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। লুলিয়া চরিত্রের মসীলিপ্ত পটভূমিকার উপর সরমা-দিব্যকান্তের অনবদ্য প্রেম স্বর্গীয় বিভায় বিচ্ছুরিত হইয়াছে। নানা অবাঞ্ছিত ঘটনা-পরম্পরার মধ্য থেকে নাটিকার মন্ত্রগুপ্তি উপযুক্ত অবসরে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কালাশোকের দিব্যকান্তির ছদ্মবেশ গ্রহণ ব্যাপারে অস্বাভাবিকতার ছায়া থাকিলেও মোটের উপর নাটিকাখানি উপভোগ্য হইয়াছে।

তুফানী

এই নাটিকাখানি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয়ে বেশ দর্শক সমাগম হইত। মাঝে মাঝে নাটিকাকারের পাকা হাতের ছাপ ইহার মধ্যে আছে। ফরাসী নাট্যকার মোলেয়ারের গ্রন্থ অবলম্বনে এখানি রচিত।

আয়েষা (গীতিনাট্য)

অতুলকৃষ্ণের এ নাটিকাখানি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন শনিবারে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়া গিয়াছে। এখানির ভাষা বেশ মার্জিত। রিজিয়া নাম্নী পাঠানী ও মোগলদুহিতা আয়েষা ঔরঙ্গজেব পুত্র মহম্মদকে যুগপৎ ভালবাসিয়াছিল, তাই পিতৃকোপে পড়িয়া মহম্মদ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া উক্ত নায়িকাদ্বয় সহ কিরূপে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন তাহার কাহিনী ইহার গল্পাংশ। গীতবাহুল্য এবং এক বিবাহবাতিক বৃদ্ধের রঙ্গরস ইহার হাল্কাভাব হইলেও নূতনত্বের জন্য

রিজিয়া ও আয়েষার প্রণয়লীলার মধ্যে নাটকের গম্ভীরভাব আনিতে যাইয়া নাটিকাকার নাটিকার প্রকৃত উদ্দেশ্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন। কারাগার মধ্যে মিলন সম্পাদিত হইবার পর যথাক্রমে নায়ক ও নায়িকাদ্বয়ের পর-পর তিনটি মৃত্যু সংঘটিত হওয়ায় বিষাদান্ত পরিণতি আসিয়াছে বটে, কিন্তু ঐ পরিণতি দৃশ্যকাব্যোচিত সংঘাতশিল্পের গৌরবে গৌরবান্বিত না হইয়া ইতিহাসের গৌরব রাখিয়াছে মাত্র। নাটিকাখানি তজ্জন্য জনপ্রিয় হয় নাই। গানগুলি প্রথমে মধুর হইলেও উত্তরোত্তর মধুরতর হইল না।

প্রাণের টান (নাট্যরঙ্গ)

অতুলকৃষ্ণ ফরাসী নাট্যকার মোলেয়ারের গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে এখানি গড়িয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে কোহিনুর থিয়েটারে ইহা প্রথম অভিনীত হইয়াছে। ৫টি দৃশ্যে নাটিকাখানি সম্পূর্ণ। ইহার উপসংহার গীতটি এইরূপ :—"মানে মানে আজ রইল সবার মান * * বাহবা প্রেমের আলোক, বাহব: প্রাণের টান।" প্রণয়ের মাঝে অকারণ সন্দেহ আসিয়া যে ভুলের প্রাচীর তুলিয়াছিল, তাহা উপযুক্ত সময়ে ভাঙ্গিয়া গিয়া সকল প্রেমিককেই সন্তুষ্ট ও বিমুগ্ধ করিয়া দিল—ইহাই পাশ্চাত্ত্য অনুকরণের নূতনত্ব।

অতুলকৃষ্ণ মিত্রের কালে নাট্য-সাহিত্য কতদূর লাভবান হইয়াছিল তাহার বিচার করিলে দেখা যায় যে, নাটিকার লঘু-ভাব চিত্রণে ও সংগীতের প্রাণ-মাতানো শক্তিতে তিনি দক্ষ শিল্পী ছিলেন। তাঁহার নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নূতন কৌশল কিছু পাওয়া যায় নাই, অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা তাঁহার দৃশ্যকাব্যের পৃথক আলোচনা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। অতুলকৃষ্ণের অন্যান্য দৃশ্যকাব্যের অভিনয় বা প্রকাশকালীন তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। কোন কোন দৃশ্যকাব্য সম্বন্ধে সামান্য আলোচনাও তৎসঙ্গে করা হইয়াছে :—

প্রণয়-কানন বা প্রভাস—এই নাটিকাখানিতে প্রভাসযজ্ঞের কথা আছে, ইহার অভিনয় কথা শুনা যায় নাই। গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রভাসযজ্ঞে যে ছবি দেখাইয়াছেন এখানি তাহার পাশে দাঁড়াইবার যোগ্য নহে। রাখালগণের 'ওরে আয়রে আয় প্রাণের গোপাল দ্বারে কাঁদে নন্দরাণী। ভূপাল হয়ে গেলিভুলে, কল্লি মোদের নানাস্থানি' শীর্ষক গানখানি আজও কাহারও কাহারও চক্ষুতে বারি বহাইয়া দেয়। এখানি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিজয়া (গীতিনাট্য)—গানে-গানে এখানির পরিচয়। দুর্গাদেবীর গিরিরাজভবনে তিনদিন বাস ও বিজয়া দশমীর দিন পতিভবনে প্রত্যাবর্তনের কথা ইহাতে আছে। এখানি ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল, তারিখ নাই। প্রকাশকাল ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর তারিখ।

রত্নবেদী (বা অপ্সর কানন)—নর ও অপ্সরার এক অভূতপূর্ব মিলনকাহিনী ইহার গল্পাংশ। প্রণয়ের মামুলিরূপ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা ইহা গঠিত। এরূপ নাটিকা অতুলকৃষ্ণের পূর্বেও লিখিত হইয়াছে। সংগীতে পূর্ণ কিন্তু মনোহারিত্ব নাই। অভিনীত হইবার সংবাদ নাই. প্রকাশকাল ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রেল।

ভীষ্মের শরশয্যা—এই পৌরাণিক দৃশ্যকাব্যখানি এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল, তারিখ সংগৃহীত নাই। কুরুক্ষেত্র সমরের খণ্ড চিত্রাবলি, যেমন শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ,

অভিমন্যু-উত্তরা সংবাদ, ভীষ্মের সংগ্রাম ও শরশয্যা গ্রহণ সব কিছুই প্রদর্শিত হইয়াছে। চিত্রগুলির পরম্পরাপেক্ষ সম্বন্ধ যতটা থাকা দরকার তাহা না থাকিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিত্র বলিয়া ভ্রম উৎপাদন করে। নাটকখানি রস-সঞ্চারে গতিহীন, তাই অন্যত্র অভিনীত হয় নাই। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

গাধা ও তুমি—১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে এমারেল্ডে অভিনীত। এখানি উপেন্দ্রনাথ দাসের 'দাদা ও আমির' প্রতিবাদে লিখিত ব্যঙ্গনাট্য। ভাক্ত সমাজসংস্কারকের ক্যারিকেচার।

বঙ্কেশ্বর (বা সামাজিক নক্সা)—ফ্রি-লভ্, ফিমেল ইমান্‌সিপেশন্ ও সোশ্যাল রিফরমেশনের চাঁইদের ঘরে-পরে যে লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইয়াছিল তাহার একটা কুৎসিত চিত্র ইহার মধ্যে আছে। ভদ্রসমাজে ইহার যবনিকা উত্তোলিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইহার একখানি গান—'তোমার ভাল তোমারি থাক্, আমায় তো তার ভাগ দেবে না। যে আগুনে জ্বল্‌ছি যাদু তুমি তো তার ভাগ নেবে না॥ ইশারেতে বল্‌ছি যত, বুঝেও তুমি বুঝ্‌চো না তো; কাঁদ্‌ছি যত হাস্‌ছে তত, ভাব্‌ছো কেন বাক্ সরে না। জান নাকি ডব্‌কা ছুঁড়ীর বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না॥' বাঙ্গালী সমাজে বহু প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে। গীত রচয়িতার এ যশ গৌরবের বস্তু। এখানি অভিনীত হইবার সংবাদ নাই, প্রকাশকাল ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই।

গোপী-গোষ্ঠ (বা রাধাকৃষ্ণের দিবা মিলন)—এই নাটিকাখানি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে এমারেল্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে রাধা-রূপিণী সুবলকে আয়ানের গৃহে রাখিয়া কিরূপে সুবল-রূপিণী রাধিকা দিবাভাগে যমুনাতীরে গোপী-গোষ্ঠের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় ইহার মধ্যে আছে। ইহার নাট্যরস বহুস্থানে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, কিন্তু আজও নিম্নলিখিত গান দুইখানি জীবিত রহিয়াছে, বাহুল্যভয়ে প্রথম ছত্র মাত্র উদ্ধৃত হইল—(ক) 'কি আশে কার আদেশে প্রভাতে কুঞ্জে এসেছ' (খ) 'কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান। অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।'

আনন্দকুমার—নাটিকাখানি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি তারিখে এমারেল্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

গোবর গণেশ—এই নক্সাখানি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রেল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত।

নিত্যলীলা (বা উদ্ধবসংবাদ)—এই নাটকখানি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে এমারেল্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা প্রদর্শন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও অন্তপ্রসঙ্গের চাপে উহা গৌণ হইয়া গিয়াছে। চৌদ্দঅক্ষর সমন্বিত মাইকেলি ছন্দে ও গদ্যে এখানি লিখিত, কিন্তু ছন্দের সে মনোহারিত্ব নাই। সংলাপগুলি এত দীর্ঘ ও কৃত্রিম ভাবাপন্ন যে তাহাতে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। কৃষ্ণহারা ব্রজের বেদনা পরোক্ষে না বলাইয়া প্রত্যক্ষে বলাইতে পারিলে ঘাতে প্রতিঘাত উঠিত। প্রতি দৃশ্যে প্রতি প্রসঙ্গ ঝিমাইয়া গিয়া নাটককে উদ্দেশ্যহীন করিয়াছে। গোপিনীদের 'বৃন্দাবন ধন গোপিনীজীবন, কাঁহা গেও মোহনমুরারী' শীর্ষক গানখানি আজও বহুলোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। নাট্যকার হিসাবে এ দৃশ্যকাব্যখানিতে অতুলকৃষ্ণের পরাভব ঘোষিত হইয়াছে।

বিধবা কলেজ চাবুক—১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি তারিখে এমারেল্ডে অভিনীত।

আমোদ-প্রমোদ নাটিকাখানি প্রথমে এমারেল্ডে অভিনীত হইয়াছিল, কিন্তু তারিখ সংগৃহীত নাই, পরে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ তারিখে হাতিবাগানস্থ স্টার থিয়েটারে পুনরভিনীত হইয়াছিল। নাটিকাকার এখানির পরিকল্পনায় নূতন আলোকপাত করিয়াছেন, কিন্তু বিন্যাস দোষে তাহা সাড়া তুলিল না। এই নাটিকার মধ্যগত নর-নারী স্তুতিটি যাহা প্রমোদলাল ও লীলা গাহিয়াছিল তাহার মধ্যে উভয়ের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

কলির হাট (পঞ্চরং)–এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত, ইহার প্রকাশকাল ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর।

বুড়ো বাঁদর (প্রহসন)—এখানির অভিনয় সংবাদও সংগৃহীত নাই। একটি বৃদ্ধ বৃদ্ধা স্ত্রী সত্বেও তরুণীর লোভে বিবাহ করিয়া কি লাঞ্ছনা পাইয়াছিল তাহার চিত্র ইহার উপজীব্য। নূতনত্বের মধ্যে প্রহসনকার পতনোন্মুখা নারীটির সতীত্ব এক অপূর্ব উপায়ে রক্ষা করিয়া তাহাকে গৃহবাসিনী করিলেন, বৃদ্ধটিও যথেষ্ট শিক্ষা পাইল। প্রহসনখানি সংগীতহীন, ইহার প্রকাশকাল ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ।

হিন্দা হাফেজ—১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই মিনার্ভায় অভিনীত।

দমবাজ—১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি মিনার্ভায় অভিনীত।

শাহাজাদী—১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন মিনার্ভায় অভিনীত।

রংরাজ (ব্যঙ্গনাট্য)—১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই শনিবার মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

পাষাণে প্রেম—এই গীতিনাট্যখানি ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর মিনার্ভায় অভিনীত।

ঠিকে ভুল (ব্যঙ্গনাট্য)—১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে মিনার্ভায় অভিনীত।

রকমফের—১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন তারিখে নূতন ন্যাশানল বা কহিনুর থিয়েটারে অভিনীত।

জেনোবিয়া—১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর কোহিনুর থিয়েটারে অভিনীত।

মোহিনীমায়া—১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ তারিখে কোহিনুরে প্রথম অভিনীত।

আসল ও নকল (কৌতুক নাটিকা)—এখানি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। শেরিডন্ অবলম্বনে এখানি লিখিত হইয়াছিল।

মণিকাঞ্চন—১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর মিনার্ভায় অভিনীত।

নাট্যসাহিত্যে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের কাল (১৮৮১—১৮৯৭ খৃঃ)

গিরিশচন্দ্রের প্রায় সমসাময়িক যে সকল নাট্যকার প্রাদুর্ভূত ছিলেন, তন্মধ্যে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট তারিখে বীডন্ স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় উহার অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন; তাঁহার পরে বিহারীলাল ঐ পদে আসীন থাকিয়া আমৃত্যু পদের গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। নট অপেক্ষা নাট্যকারের খ্যাতি তাঁহার অধিক ছিল। নাট্যসাহিত্যে তাঁহার অবদানের সন্ধান লওয়া যাক্। আনুমানিক ২৩খানি দৃশ্যকাব্য বিহারীলাল রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধগুলির আলোচনা এখানে করা হইল, অপ্রসিদ্ধগুলির নাম ও প্রকাশ বা অভিনয়-তারিখ অধ্যায়-শেষে উল্লিখিত হইবে।

রাবণবধ

এই পৌরাণিক দৃশ্যকাব্যখানি বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের কোন এক তারিখে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। রাবণবধে ছন্দ-বৈচিত্র্য আছে; দ্বাদশাক্ষর মিলনান্ত পদ, চৌদ্দ অক্ষর সমন্বিত অমিত্রাক্ষর পদ, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, পয়ার প্রভৃতি বিবিধ ছন্দ এ নাটকের ভাষার মাধ্যম, উচ্চ-নীচ পাত্রভেদে ভাষা বা ভাব-বৈচিত্র্য বিহারীলালের কোন দৃশ্যকাব্যেই নাই। গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' নাটকে ভাব যেমন ভাষার সঙ্গে নৃত্য করিয়াছে, এ নাটকে সেরূপ কিছু নাই। বিহারীলালের রাম রাবণবধের পর সীতা উদ্ধারপূর্বক তাঁহাকে প্রত্যাখ্যাতার মতো যে ভাবে অগ্নিতে বিসর্জন করিলেন তাহাতে রামচরিত্রের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। পৌরাণিক আদর্শ চরিত্রকে উন্নত করিবার অধিকার নাট্যকারের থাকে, তাহাকে অবনত করা কোন ক্রমেই উচিত হয় না। রামভক্ত হনুমান চরিত্রের সামঞ্জস্য বিহারীলাল রাখিতে পারেন নাই, এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্র তাঁহার রাবণবধ নাটকে যে পরিবেশটির সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা অপূর্ব। ইহার প্রকাশকাল ২রা মার্চ, ১৮৮২।

পাণ্ডব-নির্বাসন

এই পৌরাণিক নাটকখানি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি তারিখে বীডন্ স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহার রচনা-প্রণালী এইরূপ যে, দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত কাব্যাংশের ভিতর হইতে নাট্যাংশ বাহির করিয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। দেবন-ক্রীড়ায় পরাজিত হইবার পর পণলব্ধ পাণ্ডবদের দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছিল, ইহাই নাটকের গল্পাংশ, কিন্তু বিহারীলাল চৌদ্দ অক্ষর সমন্বিত মাইকেলী ছন্দে নাটকখানি রচনা করিতে যাইয়া ইহার নাটকাংশ মোটেই ফুটাইতে পারেন নাই। দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে ঘাত আসিয়া প্রতিঘাত তুলিতে সময় লইয়াছে, কাজেই নাটকাংশ ফুটিবার সুযোগ হয় নাই। গানগুলি নাট্যাবয়বের মধ্যে ছড়াইয়া রাখা হয় নাই, যখনই কোন গীতের প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই উপর্যুপরি তিন-চারখানি গান একসঙ্গে গীত হইয়াছে, এ পদ্ধতি যাত্রাভিনয়ের পালায় শোভনীয় হইলেও রঙ্গমঞ্চের নাটকাভিনয়ে নিন্দনীয়। নাটকের বা গানের ভাষা বেশ মার্জিত, কিন্তু সেটি ভাববাহী নহে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রন্থাবলির মধ্যে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রভাস মিলন

এই নাটিকাখানি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর তারিখে বীডন্ স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। বৃন্দাবন ত্যাগের শতবর্ষ পরে ব্রজবাসিদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পুনর্মিলন-ব্যাপার লইয়া এখানি রচিত। ইহাতে বিরহ এবং তজ্জনিত হা-হুতাশ, নারদমুনির তাহাতে উস্কানি ও প্রভাসযজ্ঞে যাইবার প্ররোচনা সবই আছে, কিন্তু গিরিশচন্দ্র বিরচিত প্রভাস-যজ্ঞ নাটকের মতো অন্তর্বেদনা ইহার মধ্যে নাই। যে মধুময় আকর্ষণে পড়িয়া যশোদা, রাধিকা প্রভৃতির সহিত কৃষ্ণের পুনর্মিলন সংসাধিত হইয়াছিল, সে অন্তর্মুখী গার্হস্থ্য ভাবের একান্ত অভাব ইহার মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছে। গানগুলি জনপ্রিয় হয় নাই। মাত্র রাধিকার—'কি কর, কি কর, শ্যাম নটবর, ক্ষমা কর সর ধরো না পায়। আমি দীনহীনা গোপেরি ললনা, ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ঠেকিবে দায়—শীর্ষক গানখানি বেশ সাড়া তুলিয়াছিল, ইহার সর্বশেষ গানটি—'চাঁদে চাঁদে আজি মিলিল ভাল, যুগল চাঁদের রূপে ভুবন আলো'—আজও বহু কীর্তনওয়ালার বিরহের পর মিলন গাহিবার কালে গীত হইতে শুনা যায়। নাটিকাখানি গদ্যে-পদ্যে রচিত ও ছয় অঙ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত।

নন্দ বিদায়

এই নাটিকাটি বীডন্ স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের কোন এক তারিখে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনত্যাগ, কংসের ধনুর্যজ্ঞ ও কংসবধ প্রভৃতি বিষয়াবলি ইহার উপজীব্য। নাটিকাখানি গদ্যে লিখিত ও সংগীতবহুল, কিন্তু বাহুল্যসত্ত্বেও কেমন প্রাণহীন হইয়া গিয়াছে। অতুলকৃষ্ণের নন্দবিদায়ে যে প্রেমময় সংগীত তরঙ্গ উঠিয়াছিল, ইহার সংগীতে সে টান ছিল না। বিহারীলাল ইহাতে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রন্থাবলির মধ্যে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)

বিহারীলাল এই গ্রন্থের প্রণেতা। গ্রন্থের অন্তর্গত উৎসর্গপত্রের তারিখ .লা ডিসেম্বর, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ, সুতরাং ঐ তারিখে বা উহারই কাছা-কাছি কোন সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাটকখানি চারি অঙ্কে সমাপ্ত। ইহা গদ্যে লিখিত কিন্তু মধ্যে মধ্যে ভাবের কথা প্রকাশিত হইবার কালে পাঁচালী-সুরের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। রাজকৃষ্ণ রায় ঐ পদ্ধতির আবিষ্কারক ছিলেন। গানগুলি শ্রুতিমধুর হয় নাই। প্রকাশকাল ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর।

বাণযুদ্ধ

এ নাটকখানি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। পার্বতীর বরে উষা-অনিরুদ্ধের স্বপ্নাবস্থায় যে মিলন ঘটিয়াছিল, তাহা লইয়া কৃষ্ণবিরোধী বাণের সহিত প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধের সংগ্রাম শুরু হয়, পরিশেষে ঐ সংগ্রাম জটিল অবস্থায় উপনীত হইলে অনিরুদ্ধকে রক্ষা করিবার জন্য যদুপতি কৃষ্ণের সহিত ভক্তবাণের রক্ষক শিবের সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল,

ব্রহ্মা তখন ত্রিভুবন রক্ষাকল্পে ঐ যুদ্ধ নিবারণ করিতে বাধ্য হইলেন। কৃষ্ণের আদেশে উষার সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ নিষ্পন্ন হইল—এই আখ্যানভাগ উক্ত নাটকখানির উপজীব্য।

প্রেম ও বীর্যের কথা থাকিলেও নাটকখানি সংঘাতহীন। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে চিত্রলেখা স্বপ্নদৃষ্ট নায়ক-নায়িকার মিলন সুকৌশলে সম্পাদিত করিয়াছিল। তৃতীয় অঙ্কে উষার গুপ্ত প্রণয়-কাহিনীটি রাজ-মহিষী কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত হইলে অস্ত্রহীন অনিরুদ্ধের বীর্যবত্তায় বাণ পর্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। নাটকের স্তবগুলি চণ্ডী ও শঙ্করাচার্য বিরচিত স্তবের ছায়াপাতে সৃষ্ট। এত করিয়াও নাটকখানি জমিল না।

মিলন (সামাজিক নাটক)

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বিহারীলাল এখানি রচনা করিয়াছিলেন এবং তৎপূর্বে বেঙ্গল থিয়েটারে ইহা অভিনীত হইয়াছিল, তারিখ সংগৃহীত নাই। ইহাই তাঁহার প্রথম সামাজিক নাটক। ইহার ঘটনাগুলিকে রোমাঞ্চকর করিবার উদ্দেশ্যে নাট্যকার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, কারণ ইহার মধ্যগত নীলকর সাহেবের অত্যাচার হইতে আরম্ভ করিয়া লাম্পট্য, ব্যভিচার, উইল-জাল, বিষয় লোভে ষড়যন্ত্র, চুরি, ডাকাতি, জ্যোতিষ বিদ্যার বাহাদুরি প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ সত্ত্বেও কোথাও নাটকীয় সংঘাত সৃষ্ট হয় নাই। দৃশ্যকাব্যের মামুলি আঙ্গিকে এগুলি আছে মাত্র। পাত্র-পাত্রীর সংলাপ ও মন্তব্য এত দীর্ঘ ও অনাবশ্যক কথায় মণ্ডিত যে ইহাকে উপন্যাস বলিয়া মনে হইয়াছে। ইহার মিলন নাম সার্থক করিবার জন্য শরদিন্দু ও ইন্দুপ্রভার সম্ভাবিত মিলন এবং বিচ্ছেদের পর হরপ্রসাদ ও বিমলার অপ্রত্যাশিত মিলন সংসাধিত হইয়াছিল মাত্র। এখানি গদ্যে রচিত ও পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। গানগুলি প্রাণহীন, এইরূপ নানাকারণে পঙ্গু হওয়ায় দৃশ্যকাব্যের আসরে এখানি গতিশীল হয় নাই। ইহার প্রকাশকাল ২২শে জুলাই, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ।

হরি অন্বেষণ (নামা পৌরাণিক নাট্যগীতি)

বিহারীলাল এখানি তিন অঙ্কে শেষ করিয়াছেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই তারিখে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তৎপূর্বে কোন সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারে এখানি অভিনীত হইয়া গিয়াছে। কাল্‌কা ব্যাধের হরি পাদপদ্মলাভ ও শাণ্ডিল্যপুত্র শমীকের পিতৃ উপদেশে 'মধুসূদন' দাদা নাম লইয়া হরি অন্বেষণ প্রভৃতি ঘটনা ইহার গল্পাংশ। নাটকীয় শিল্পকৌশলের অভাবে এখানি জনপ্রিয় হয় নাই।

নবরাহা (বা যুগমাহাত্ম্য)

এখানি বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত পঞ্চরং। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে এটি প্রকাশিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্যের ব্যক্তি-স্বাধীনতার (franchise) ঢেউ বাঙ্গালায় প্রবেশলাভ করিলে পর বাঙ্গালী নর-নারী মহলে যে আলোড়ন আসিয়াছিল তাহার একটা চিত্র ইহাতে আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, লক্ষ্মী ও ভগবতী প্রমুখ হিন্দু দেব-দেবীকে লইয়া বেলেল্লামী করানো প্রহসনকারের উচিত হয় নি। সনাতন পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া যাহারা নব রাহার (পথের) অনুসরণ করে তাহাদের উপর

আঘাত ঠিক নাট্যানুমোদিত ভাবে অর্থাৎ ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া সম্পাদিত হয় নাই। ইহার ইংরাজী গানগুলি বিশেষতঃ যেটি স্ত্রীলোকের মুখে গীত হইল সেইটিই ইহার নূতনত্ব। কতকগুলি পৃথক দৃশ্যে পঞ্চরংটি সমাপ্ত হইয়াছে।

নরোত্তম ঠাকুর (ধর্মমূলক দৃশ্যকাব্য)

বিহারীলাল ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি তারিখে এখানি রচনা করিয়াছিলেন এবং ঐ তারিখে বা উহারই নিকটবর্তী কোন সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারে ইহা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নরোত্তম ঠাকুর চৈতন্যের পরবর্তী বৈষ্ণব গোষ্ঠীর অন্যতম সাধক, রাজপুত্র হইয়া উপযাচিকা বাল্যসখীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া কিরূপে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের পথে গিয়াছিলেন তাহার কাহিনী এই দৃশ্যকাব্যের গল্পাংশ। ঘটনার সমাবেশ ইহাতে আছে, নাই কেবল নাটকীয় কৌশল। নরোত্তমপ্রিয়া রমণীর বৈরাগ্য এতই সহসা আসিয়াছে যে মানুষের মনে আঘাত সৃষ্টি করিতে তাহা পারে নাই। ভাষা আছে কিন্তু তাহার মধ্যে অন্তর্বেদনা নাই। গান আছে কিন্তু তাহাতে ভাবের প্রকাশ নাই।

দুর্যোধনবধ

এই পৌরাণিক দৃশ্যকাব্যখানি বীডন্‌স্ট্রীটস্থ বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল, অভিনয়-তারিখ সংগৃহীত নাই। এখানির লিখনভঙ্গী পাণ্ডব-নির্বাসনের মতো শ্রব্যকাব্যেরই উপযুক্ত, দৃশ্যগুলি যেন তাহার পরিচ্ছেদ। ক্রিয়াপেক্ষা বাক্যের আড়ম্বর এত বেশী যে অতি দীর্ঘ সংলাপের মধ্য হইতে নাটকীয় পাত্র-পাত্রীরা কখন কি বলিতেছে তাহা, অবান্তর বিষয়গুলি বাদ দিয়া বুঝা কঠিন। দ্বৈপায়ন হ্রদে দুর্যোধনের আশ্রয়লাভ ও উরুভঙ্গ, অশ্বত্থামা কর্তৃক পাণ্ডবভ্রমে পঞ্চপাণ্ডব-শিশুর শিরশ্ছেদ, ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক লৌহভীম চূর্ণ ও গান্ধারীর অভিশাপ—মহাভারতীয় এই কয়টি ঘটনা নাটকের আখ্যানভাগ। রচনার দোষে অভিনয়ান্তে বা পাঠান্তে দর্শক কিংবা পাঠকের মানসপটে কোন ছবিই হাজির হয় না। গ্রন্থাবলির মধ্যে ইহার প্রকাশকাল ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ।

বৃন্দাবন-দৃশ্যাবলি

এ নাটিকাখানি গানে-গানে রচিত। সংগীতগুলির আকর্ষণী শক্তি না থাকায় জনপ্রিয় হয় নাই। ইহার অভিনয়-সংবাদও পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থাবলির মধ্যে ইহার প্রকাশকাল ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি।

জন্মাষ্টমী

এই দৃশ্যকাব্যখানির আখ্যাপত্রে যদিও বিহারীলালের নাম নাই, তথাপি এখানি তাঁহার তারক চাটার্জি লেনস্থ বাস ভবন হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই যে ইহার রচয়িতা তাহা একরূপ নিঃসন্দেহ। জন্মাষ্টমীর দিন রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, জনসাধারণকে ঐ দিনের মানসিক খোরাক দিবার জন্য নাট্যকার এখানি রচনা করিয়াছিলেন, তাই ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলা প্রদর্শিত হইয়াছে। নাট্যমূল্য কিছু নাই। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর ইহার প্রকাশকাল।

অপ্রসিদ্ধ দৃশ্যকাব্যগুলির নামোল্লেখ ও তাহাদের প্রকাশ-কাল বা অভিনয়-তারিখ এখানে দেওয়া হইল :—**অহল্যা-হরণ** (পৌরাণিক নাট্য-গীতি) ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। **দ্রৌপদীর স্বয়ংবর** (নাটক)—১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে প্রকাশিত। **রাজসূয় যজ্ঞ** (পৌরাণিক নাটক)— ৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর প্রকাশিত। **শ্রীবৎসচিন্তা** (১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রেল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত। **রুক্মিণীরজ**—(১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে বেঙ্গলে অভিনীত)। **সীতা-স্বয়ংবর** (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)—১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত। **মোহশেল** (চম্পূনাট্য)—৫ই মার্চ ১৮৯২ ইহার প্রকাশ-কাল। **দুইহ্যাঙ্গু** (পঞ্চরং)—১৩ই জানুয়ারি, ১৮৯৪ ইহার প্রকাশকাল। **যমের ভুল** (পঞ্চরং)—ইহার প্রকাশ-কাল ২৫শে ডিসেম্বর ১৮৯৪। **ধ্রুব** (পৌরাণিক নাটক)—ইহার প্রকাশকাল ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ।

বিহারীলালের কালে দৃশ্যকাব্যের নূতনত্ব দূরে থাক্, তাহার গতানুগতিকতাও বন্ধ হয় নাই।

নাট্যসাহিত্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাল

(১৮৮১—১৯৩৯)

বিশ্ববিশ্রুতকীর্তি রবীন্দ্রনাথ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ লিরিক কবি। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিন্ন-ভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি পদরেখা রাখিয়া গিয়াছেন, নাট্যসাহিত্যের উপর তাঁহার প্রভাব কতদূর বিস্তৃত, তাহাই এখানে আলোচিত হইবে।

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ-কালে পাশ্চাত্ত্য ক্লাসিকবিমিশ্র রোমান্টিক আদর্শে যে সকল বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্য জন্মলাভ করিয়াছিল রবীন্দ্রনাথও সেই ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত করিয়া তাঁহার কতকগুলি দৃশ্যকাব্যকে রূপায়িত করিয়াছেন। কোন্‌গুলি সেই শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা পাশ্চাদোল্লিখিত কালানুক্রমের তালিকায় দৃষ্ট হইবে। আত্মমুখ লিরিক কবি স্বভাবতঃ গতিশীল (dynamic), নাট্য-সাহিত্য কিন্তু বিষয়মুখ (objective), পাত্র-পাত্রীর সমস্যা ও তৎসাধনে তাহাদের যাবতীয় চেষ্টা বহির্মুখীনতার উপর নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথের গতিশীল প্রকৃতি তাঁহার দৃশ্যকাব্যের কোন একটি নির্দিষ্ট রূপ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই, তিনি তাহাকে প্রতিবারই ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নিজের মনোমত করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার দৃশ্যকাব্যের শতকরা ৯৫টি নাটক-নাটিকা-প্রহসনই পরিবর্তিত আকারে দেখা দিয়াছে। এই সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকার গিরিশচন্দ্র কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। তিনি বলিতেন প্রত্যেক নাটকই নিজ বৈশিষ্ট্য লইয়া পূর্ণ, তাহার রদ্-বদল করিতে হইলে নূতন নাটকের জন্ম হইবে।

জন বা গণ-নাটক কোনটাই রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেন নাই। যে ঔপনিষদিক আব্-হাওয়ায় তিনি মানুষ হইয়াছিলেন তাহারি সংস্কৃতি দৃশ্যকাব্যের ভিতর দিয়া যেখানে প্রয়োজনবোধ করিয়াছেন, সেখানেই প্রকাশিত ক'রয়াছেন। ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের পরিমণ্ডল হইতে তিনি নাটকীয় পাত্র-পাত্রী প্রধানতঃ নির্বাচন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-সমস্যাই তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়। তাঁহার যাত্রাপথে যে কয়টি সামাজিক সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছিল তাহার প্রতিও তিনি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাটকীয় প্রকাশভঙ্গীগুলি দেশের নাট্যসাহিত্যের গতানুগতিক প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। কোথায় কি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাহা তাঁহার প্রত্যেক দৃশ্যকাব্যের বিশ্লেষণ-কালে প্রদর্শিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাট্যসাহিত্যের বিষয়নির্বাচন-ব্যাপারে দেশের অভিজ্ঞ বৈদ্য চিকিৎসকের মতো নাড়ীজ্ঞানের পরিচয় দেন নাই। মঙ্গলগান, কবি, পাঁচালি, রামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ ও বৈষ্ণবসাহিত্যের ভিতর হইতে যে জাতির আধ্যাত্মিক কৃষ্টি আহৃত ও সঞ্চিত রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যে তাহার পরিপোষক বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। দেশের বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি হাজার-করা ৫ জন বা তাহা অপেক্ষাও কম, সুতরাং বাকী ৯৯৫ জন বা তাহারও অধিক অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত রহিয়া গিয়াছে। এবং তাহাদের অধিকাংশই পল্লীগ্রামবাসী, তাহারা রবীন্দ্রনাথের ভাব-গম্ভীর নাট্যসাহিত্যের রস গ্রহণ করিতে জানে না বা পারে না। কতকগুলি সামাজিক সমস্যা সম্বলিত দৃশ্যকাব্য ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ ঠিক বর্তমানকালের প্রতীক রূপে নাট্যসাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন নাই, অনাগত ভবিষ্যকালের প্রতীকতা তিনি সৃষ্টি ক'রয়াছেন। ইহা একপ্রকার কাল-ব্যতিক্রম (Anachronism), কালই প্রকৃত

সমালোচক। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর হইতে আজ পর্যন্ত তাঁহার নাট্যসাহিত্যের যে সব সমালোচনা বাহির হইয়াছে তাহাই যে একমাত্র জ্ঞাতব্য তাহা নহে, প্রকৃত সমালোচনার জন্য ভাবীকালের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে।

নাট্যসাহিত্যে উপমা (Simile) ও রূপক (Metaphor) অলংকার রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার প্রয়োগ-কৌশলে technique) নাটকীয় সংলাপগুলি কেমন শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার নাট্যসাহিত্যই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা তত্তৎ দৃশ্যকাব্যের বিশ্লেষণ-কালে করা হইয়াছে।

বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্যে নৃত্যনাট্যের প্রচলন রবীন্দ্রনাথেরই কীর্তি। নাচগানের ভিতর দিয়া ঘাত-প্রতিঘাতের ভাবাভিনয় দেখানো তিনিই প্রবর্তিত করিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে থিয়েটারে ব্যালে (Ballet) নৃত্যের প্রচলন ছিল, কিন্তু মূক অভিনয় দ্বারা ভাবাভিনয় তাঁহার নৃত্যনাট্যে প্রথম প্রদর্শিত হইয়াছে। নৃত্যনাট্যের গানগুলিকে নাচের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ এমন কতকগুলি নাট্যকাব্য রচনা করিয়াছেন যেগুলির মধ্যে দুই-এক স্থানে নাট্যাংশ থাকিলেও কাব্যাংশ সেগুলির মুখ্য প্রকাশভঙ্গীতে পূর্ণ। তাহাদের মধ্যগত সংঘাত অত্যন্ত মৃদু। আগাগোড়া প্রশ্নোত্তরে লেখা ইহার নাট্যরূপ মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ আবার কতকগুলি ব্যঙ্গকৌতুক নাট্যের আবিষ্কর্তা। তাহার রস পড়িবার কালেই আস্বাদিত হয়, অভিনয়ে সে রস ফুটাইতে যাইলে কিছু রদবদলের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

কৌতুকপূর্ণ হেঁয়ালি-নাট্যের আবিষ্কর্তার সম্মান একমাত্র রবীন্দ্রনাথই পাইবার অধিকারী। ইওরোপীয় শারাড্ (Charade) জাতীয় নাট্যখেলার প্রভাবে এগুলি রচিত হইলেও সেগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া সম্পূর্ণ মৌলিক আকারে জনসাধারণকে পরিবেশন করিয়াছেন। অবসর-বিনোদনের পক্ষে এগুলি উপাদেয়।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বা চৈতন্যভাগবতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ঋতুভেদে কোন কোন সংকীর্তনের পাঠ বা স্বর পাল্‌টাইয়া যাইত এবং তাহাতেই চৈতন্য-পরিকর ও ভক্তমণ্ডলী বিশেষ আনন্দ পাইতেন। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত নাটকে বা কাব্যে ঋতু উৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায়। কালিদাসের 'ঋতুসংহার' বা 'মেঘদূত' তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। 'রত্নাবলী' প্রভৃতি নাটিকায় ' বসন্তোৎসব' লইয়া ঐ ঋতুরই সেবা দেখা যায়। বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে ঋতু উৎসবগুলি রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় নূতন মূর্তি লাভ করিয়াছে এবং তাহার বৈশিষ্ট্য পশ্চাল্লিখিত তালিকার নাটকীয় বিশ্লেষণের মধ্যে পাওয়া যাইবে।

রূপক বা প্রতীক নাটক রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি। তাঁহার পূর্বে গিরিশচন্দ্রের কালে ইহার চেষ্টা সামান্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথেই তাহার চরম বিকাশ ঘটিয়াছে। কোন ভাব বা তত্ত্ব প্রকাশিত করাই রূপকের কাজ, কিন্তু উহা যখন নাটক পদবাচ্য তখন অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকিলে চলিবে কেন? কোন ব্যক্তি লইয়া হোক, কোন তত্ত্ব বা ভাব লইয়া হোক, ধনিক-শ্রমিক সমস্যা লইয়া হোক রূপক রূপায়িত হইবে কাহাকে ধরিয়া। জন বা গণের সুখ-দুঃখই ত' তাহার প্রতীক হইবে। রূপক বা প্রতীক নাটকের ভাব রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে আত্মসাৎ করিয়াছেন, এবং অন্যান্য

নাটককার অপেক্ষা মেটারলিঙ্কের আদর্শ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নিজস্ব পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়া প্রকৃত নাটকের আকারেই তাহা গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহাই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষের দিকের নাট্যসাহিত্যে নাট্যশাস্ত্রের কোন বিধি-নিষেধ মানিয়া চলেন নাই। এমন কি তিনি তাঁহার কতকগুলি রূপকনাট্যে অঙ্ক ও দৃশ্যের ব্যবধানও ত্যাগ করিয়াছেন।

বিশ্বনাথের বিশ্বসৃষ্টিতে যেমন ভাঙ্গা-গড়া কাজ অবিরত চলিয়াছে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথে সেইরূপ তাঁহার রচনার ভাঙ্গা-গড়া কাজও নিত্যই চলিয়াছিল। প্রভেদ এই বিশ্বসৃষ্টিতে প্রত্যেক সৃষ্টি বৈচিত্র্যপূর্ণ ও কাহারো সহিত কাহারো মিল নাই রবীন্দ্রনাথে তাহা অনেকক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি দোষ-দুষ্ট হইয়াছে। লিরিক কবি প্রাকৃতিক প্রতি কার্যে ছন্দের অনুবর্তন দেখিয়াছেন, তাই নৃত্য, গীত ও কবিতার প্রাধান্য তিনি দিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে বাঙ্গালা সাহিত্যে অতি-আধুনিকতার ঢেউ উঠিয়াছিল, গতিশীল রবীন্দ্রনাথ তাহাও পাশ কাটাইয়া যান নাই, তবে তাহার অশ্লীলতায় ডুব না দিয়া, নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া ঐ কৃত্রিম সমাজের একটি ছবি 'বাঁশরি' নামক নাটকে অস্পষ্টতার আবরণের ভিতর দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

ভাষার জাদুকর রবীন্দ্রনাথ যে নাটকে যেরূপ ভাষার প্রয়োজন তাহা তিনি দিয়াছেন। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্তমান রূপ।

আধুনিক সাহিত্যে আমেরিকার কবি হুইটম্যান (Whitman) তাঁহার কবিতার মধ্যে নারীর সর্বোত্তম গৌরব "And I say there is nothing greater than the mother of men" বলিয়া যে বাণী দিয়াছেন, তাহা বহু পূর্ব থেকেই হিন্দু রমণীর আদর্শ হইয়া আছে। আধুনিক কালে পুরুষের সহিত নারীর যে সমানাধিকারের রেওয়াজ উঠিয়াছে তাহাও হিন্দুর কাছে নূতন কথা নহে। সুভদ্রা চরিত্রে দাসিত্ব অপেক্ষা অর্জুনের জীবনসঙ্গিনী হইবার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, দ্রৌপদীতে একাধারে রাজ্ঞিত্ব ও সখিত্ব যুগপৎ ক্রীড়া করিয়াছে। বিদ্যাবত্তায় মৈত্রেয়ী, গার্গী, লীলাবতী পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। সমাজ যুগে যুগে যেমন বদ্‌লাইয়াছে তাহার পুরুষ ও নারী চরিত্রও তাহার অনুরূপ হইয়াছে। তবে নারীজাতির কতকগুলি সনাতন ধর্ম আছে যাহা বৈষ্ণব শাস্ত্রে পঞ্চভাব নামে অভিহিত, তন্মধ্যে আবার দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর নারীদিগের অনেকটা একচেটিয়া ভাব।

রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি প্রখ্যাত নারী চরিত্রে Ibsenএর প্রভাব লক্ষিত হয়।

রবীন্দ্র রচনাবলির কালক্রমিক তালিকা ও তাহাদের বিশ্লেষণ

বাল্মীকি-প্রতিভা

কালীর উপাসক দস্যু রত্নাকর কিরূপে কবি বাল্মীকি হইলেন, রামায়ণের সেই পুরাতন ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে একটির বধকথা লইয়া বাল্মীকির মুখে যে শ্লোকময় শোকগাথা প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল তাহাই জগতের প্রথম কবিতা, সেটি এই—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃসমাঃ,
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।"

'বাল্মীকি প্রতিভার' ইহাই উপজীব্য, কিন্তু তৎপূর্বে বালিকার মূর্তিতে সরস্বতী দেখা দিয়া বাল্মীকির মনে ভাবান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। ধনদেবী লক্ষ্মী কবিকে প্রলুব্ধ করিতে পারেন নাই, ইহাই রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা, তাই কবি লক্ষ্মীর উদ্দেশে এইরূপ বলিয়াছেন—

"যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এসো না এসো না,
এসো না এ দীনজন-কুটিরে!
যে বীণা শুনেছি কানে, মন প্রাণ আছে ভোর,
আর কিছু চাহি না চাহি না।"

ছয়টি দৃশ্যে গীতিছন্দোময় নাটিকাটি সম্পূর্ণ। বনদেবী, বাল্মীকি ও তাঁহার সহচর দস্যুগণ, বালিকারূপিণী সরস্বতী ও লক্ষ্মী ইহার পাত্র-পাত্রিনিচয়। এখানি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'কালমৃগয়া' নামক গীতিনাট্য হইতে অনেকগুলি গান সংযোজিত হইয়া ইহার দ্বিতীয় রূপ গঠিত হয়, এবং সেখানি ঐ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতার স্টার রঙ্গমঞ্চে আদি ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যার্থে প্রথমে প্রকাশ্যভাবে অভিনীত হইয়াছিল। ইহার দুইদিন পরে ২৬শে ফেব্রুয়ারি শনিবার সন্ধ্যার পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে বিদ্বজ্জন সমাগম নামে এক সাহিত্যিক সম্মিলনে এই সুরনাটিকাখানি অভিনীত হইয়াছিল। ইহাতে কবি স্বয়ং বাল্মীকি ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবী সরস্বতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বাল্মীকি-প্রতিভা এই দ্ব্যর্থবোধক নামটির মধ্যে একদিকে শ্লোককর্তা বাল্মীকির প্রতিভার কথা, অপরদিকে কবির ভ্রাতুষ্পুত্রীর সরস্বতীর ভূমিকায় অভিনয়ের-কথা সূচিত করিতেছে। সুর বাদ দিলে নাটিকাখানির বাৎসল্য রস ব্যতীত আর কোন গুণ নাই। সুরের মোহই নাটিকাখানির একমাত্র আকর্ষণী শক্তি। ইহা আনন্দপ্রদ গীতিবহুল কমেডি বিশেষ।

রুদ্রচণ্ড

এখানি রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক। গ্রন্থ-পরিচয়ে কবি এখানিকে নাটিকা না বলিয়া নাটক বলিয়াছেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন তারিখে এটি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। কবিতার কাঠামোর উপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, চতুর্দশটি দৃশ্য লইয়া নাটকখানি সম্পূর্ণ। বাল্যকালেই উদীয়মান কবি তাঁহার নাট্যশক্তির নমুনা দ্বিতীয় দৃশ্যের এই কবিতাটির মধ্যেই প্রকাশিত করিয়াছেন—

"নরকের অধিষ্ঠাতৃ দেব, শুন তুমি,
এই বাহু যদি নাহি হয় গো অসাড়,
রক্তহীন যদি নাহি হয় এ ধমনী,
তবে এই ছুরিকাটি এই হস্তে ধরি
উরসে খোদিব তার মরণের পথ।"

ঐ দৃশ্যের আর এক স্থানে অমিয়া পিতা রুদ্রচণ্ডের মুখে হাসি দেখিয়া যখন বলিল—

"হেসো না অমন করি, পায়ে পড়ি তব,
ওর চেয়ে রোষদীপ্ত ভ্রূকুটি-কুটিল
রুদ্র মুখ পানে তব পারি নেহারিতে !'

কবি যে নাট্যকার হইতে পারিবেন তাহার আভাষ ইহাতে পাওয়া গেল। পৃথ্বীরাজের প্রতি জিঘাংসা-সাধনে কৃতসংকল্প রুদ্রচণ্ড নিজ কন্যাকে কঠোর শাসনে রাখিয়া দিয়াছিল যাহাতে সে পৃথ্বীরাজের পারিষদ্ চাঁদকবির সাহচর্য না পায়। ঘটনাচক্রে পৃথ্বীরাজ মহম্মদঘোরী কর্তৃক পরাজিত, বন্দীকৃত ও নিহত হইলে রুদ্রচণ্ডের জিঘাংসা ব্যর্থ হইয়া গেল। রুদ্রচণ্ড তখন স্নেহাভিমানে কন্যাকে বক্ষে লইয়া আত্মহত্যা করিল। চাঁদকবি চারণরূপে বীণাহস্তে পৃথ্বীরাজের যশোগান করিতে করিতে অমিয়াকে মৃত রুদ্রচণ্ডের বক্ষে মুমূর্ষু দেখিতে পাইল, তখন আবেগভরে বলিয়া উঠিল—

"ভাল বোন, দেখা হবে আর এক দিন,
সে দিন দুজনে মিলি করিব রে শেষ
দুজনের হৃদয়ের অসম্পূর্ণ কথা—"

বলিয়া নাটকখানি শেষ করিলেন। দুইখানি গান ইহার সম্পদ। তাহার প্রথম গানটিতে অমিয়াকে প্রকৃতিদেবীর ফুলের প্রতীকরূপে তাহার জন্ম ও বৃদ্ধির ইতিহাস দেওয়া আছে, দ্বিতীয়টিতে ঐ ফুলটি প্রকৃতির অনাদরে কিরূপে ঝরিয়া পড়িল, তাহার কাহিনীতে পূর্ণ রাখা হইয়াছে। কাব্যগুণ ও গানের মধ্য দিয়া এই অর্ধস্ফুটোন্মুখ বিষাদান্ত নাটকখানি আংশিকভাবে রূপায়িত হইয়াছে।

কাল-মৃগয়া

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে এই দৃশ্যকাব্যখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। এখানি গীতিনাট্য, ঐ সালের ২৩শে ডিসেম্বর শনিবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকো-ভবনে 'বিদ্বজ্জন সমাগম' সম্মিলন উপলক্ষ্যে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। পরে ঐ গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। গানে-গানে ছয়টি দৃশ্যে কালমৃগয়া নাটিকাখানি সমাপ্ত হইয়াছে। দশরথের সিন্ধুবধ এখানির বিষয়। দৃশ্যে-দৃশ্যে, গানে-গানে উত্তর প্রত্যুত্তরের ভিতর দিয়া ইহা অগ্রসর হইয়াছে। এ জাতীয় নাটিকার পথিকৃৎ ছিলেন গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'দোললীলায়' (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ) পার্থক্য এই 'দোললীলা' আনন্দময় আর এখানি বিষাদময়।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

কবি এখানিকে নাট্যকাব্য বলিয়াছেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রেল তারিখে এটি প্রথম প্রকাশিত। বস্তুত এটি প্রতীক জাতীয় দৃশ্যকাব্য নহে। প্রকৃতির স্বভাবদত্ত হাত এড়াইয়া ব্রহ্মত্বে লীন হইবার আশায় মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিজাত স্নেহ, দয়া, প্রেম, মমতা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিনিচয়ের বহিঃপ্রকাশকে নিরুদ্ধ করিবার জন্য কোন এক সন্ন্যাসী বহিঃপ্রকৃতি হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কশূন্য করিতে না পারিয়া অবশেষে লোকালয়ের বাহিরে এক নির্জন পর্বতগুহায় ব্রহ্মসাধনায় নিযুক্ত হইলেন। সংসারে নিত্য অনুষ্ঠিত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহের অন্তর্দ্বন্দ্ব তিনি জয় করিতে পারিয়াছেন

কি না গুহার বাহিরে মাঝে মাঝে আসিয়া পরীক্ষা করিয়া যাইতেন। ঘটনাচক্রে একদিন নিরাশ্রয় সর্বঘৃণ্য এক অনাথ বালিকাকে আশ্রয় দিয়া তাহারি মায়ায় নিজের অজ্ঞাতসারে ক্রমশ আবদ্ধ হইতে লাগিলেন। এই স্নেহের গণ্ডিকে অতিক্রম করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতেন। একদিন বিরক্তিবশে বালিকাকে ফেলিয়া যাইবার কালে সে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী মায়ার আকর্ষণে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে মৃত দেখিয়া খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে এটি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। নাটকীয় প্রয়োগ-নৈপুণ্যের অভাবে ইহার অন্তর্দ্বন্দ্বের দৃশ্যগুলি পরস্পর সম্পর্কহীন হইয়া পৃথক চিত্ররূপে প্রতিভাত হইয়াছে। সন্ন্যাসীর স্বগত চিন্তা নাট্যগুণসম্পন্ন না হইয়া কাব্যগুণের দ্যোতক হইয়াছে, সুতরাং দৃশ্যকাব্যের সার্থকতা হারাইয়াছে।

নলিনী

এই নাট্যকাব্যটি ১০ই মে ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। কবির 'ভগ্নহৃদয়' নামক গীতিকাব্য হইতে ইহার ঘটনাটি আংশিক গৃহীত হইয়াছে। গদ্যের মাধ্যমে এখানি লিখিত হইলেও লেখার ভিতর দিয়া নাটক অপেক্ষা উপন্যাসের ভাব অধিক পরিস্ফুট। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের ভাষায় বলিতে গেলে—'দিশেহারা প্রেমের আত্ম নিপীড়ন এবং চরম দুঃখের মধ্য দিয়া মিলন ইহার মর্ম কথা।' ছয়টি দৃশ্যে ইহা সম্পূর্ণ। নাটকের অপরোক্ষ (direct) ঘাত-প্রতিঘাত অপেক্ষা পরোক্ষ (indirect) সংঘাত বেশি দেখা গিয়াছে, সুতরাং নাটক পর্যায়ে থাকিলেও হীনপ্রভ।

মায়ার খেলা

সখীসমিতির মহিলা শিল্প মেলায় অভিনীত হইবার উপলক্ষ্যে এই গ্রন্থ উক্ত সমিতি-কর্তৃক মুদ্রিত ও অভিনীত হইয়াছিল। ইহার প্রকাশকাল ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর তারিখ। ইহাতে সমস্তই গান, পাঠোপযোগী কবিতা অতি অল্প। মায়াকুমারীদের এই গানটি—

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে।
গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।"

খুব বিখ্যাত হইয়াছে। আর একখানি গানও প্রসিদ্ধ, যেমন—

"নিমেষের তরে সরমে বাধিল,
মরমের কথা হল না!
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরম বেদনা।"

প্রমদার সখীগণের গানখানিও অতি সুন্দর—

"অলি বার বার ফিরে যায়,
অলি বার বার ফিরে আসে।
তবে তো ফুল বিকাশে।" ইত্যাদি।

মায়াকুমারীদের আরও একখানি গান চমৎকার—

"বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে" ইত্যাদি।

প্রেমের খেলায় নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে কাহারও হার কাহারো জিত, ইহাই মায়ার খেলা। গানে-গানে এখানি রচিত। কবি বলিয়াছেন—"গদ্য নাটিকা নলিনীর সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, পাঠকেরা ইহাকে তাহারি সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।" গানে-গানে রচনার আদর্শ গিরিশবাবু তাঁহার 'ব্রজবিহারে' (১৮৮২ খৃষ্টাব্দে) পূর্বেই স্থাপিত করিয়াছিলেন। 'মায়ার খেলায়' নাটকীয় সার্থকতা অপেক্ষা গানের সার্থকতা অধিক পরিস্ফুট। এখানি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অগস্ট তারিখে এম্পায়ারের প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। এখানি এক জাতীয় কমেডি।

রাজা ও রাণী, তপতী

রাজা ও রাণী নাটকখানি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই অগস্ট তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে তদানীন্তন এমারেল্ডের প্রকাশ্য রঙ্গশালায় ইহার প্রথম অভিনয় ঘটিয়াছিল। ইহাতে সাতখানি গান আছে। একদিকে রাজা বিক্রমদেব ও সুমিত্রার, অন্যদিকে কুমার সেন ও ইলার প্রেম কাহিনীতে নাটকখানি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া নাটকের দর্শক বা পাঠকের চিত্তকে অনাবিল নাট্যরস গ্রহণে বাধা দিয়াছিল। এ ত্রুটি নাট্যকারের অলক্ষিত থাকে নাই, তাই তিনি অতিরিক্ত কাব্যভাবাপন্ন 'রাজা ও রাণী'কে আধুনিক পাশ্চাত্য প্রণালীর নাটক পর্যায়ের অন্তর্গত করিবার অভিপ্রায়ে 'তপতী' নাম করণে পরিবর্তিত করিতে যাইয়া উহার রোমান্টিক কাব্যসৌন্দর্যকে তো নষ্ট করিলেনই, অধিকন্তু তপতীর ছোট-ছোট তীক্ষ্ণ তীব্র গদ্যসংলাপের ভিতর দিয়া নাটকীয় নূতন সংঘাত সম্যক পরিস্ফুট করিতে না পারায় ইহার নাটকত্বও লঘু করিয়া দিলেন। প্রেমিকা কর্তব্যপরায়ণা মানবী সুমিত্রা স্বামীর চরিত্র সংশোধনে অপারগ হইয়া সহসা অভিমানক্লিষ্টা তপতী-দেবীতে পরিণত হইয়া গেলেন। বিবাহকালীন পিতৃগৃহের অপরকৃত দৈবত্রুটি মোচন করিবার অভিপ্রায়ে স্ত্রীর প্রতি অন্ধ প্রেমমুগ্ধ ও অন্য বিষয়ে কর্তব্যবিমুখ স্বামীর রাজ্য হইতে গোপনে পলায়ন করিয়া কাশ্মীরের মার্তণ্ড বিগ্রহের উপাসিকা হিসাবে তাহারি আদর্শের জন্য জীবনপাত করিতে যাওয়ায় অলৌকিক ট্রাজেডির সৃষ্টি হইতে পারে, তবে পূর্ব পরিগৃহীত অধুনাত্যক্ত মহারাণী আদর্শের যূপকাষ্ঠের উপর ঐ দৈবত্রুটির নূতন আদর্শগ্রহণ্ ব্যাপারটি সমীচীন হইয়াছে কি না বিচার্যের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নায়ক বিক্রমদেব 'রাজা ও রাণী'তে প্রেমিক ও মানুষ ছিলেন, তপতীতে তিনি মানব হইতে দানবে পরিবর্তিত হইয়া গেলেন। খণ্ড চরিত্রের মধ্যে শঙ্কর চরিত্রটিও পূর্ব মাধুর্য হারাইয়াছে। দশখানি নূতন গান ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব বাড়াইয়াছে। 'রাজা ও রাণী' মাইকেলী অমিত্রাক্ষরে লেখা, তপতীর বাহন গদ্য। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কবি 'তপতী' নামে 'রাজা ও রাণীর' গল্পাংশকে পরিবর্তিত আকারে নূতন করিয়া নাট্যীকৃত করেন এবং তাহাতে কুমারসেনের ঔজ্জ্বল্যও ম্লান হইয়া গিয়াছে।

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য, নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার নাটকের দোষ-ত্রুটি দেখাইয়া তাহার পরিবর্তন করিতে বলিলে তিনি বলিতেন—"যে গিরিশঘোষ ঐ নাটক লিখিয়াছিল সে

এখন মৃত, সুতরাং উহাতে হাত দিলে নূতন নাটক হইয়া পড়িবে, তাহা আমি পারিব না"—এ কথা কয়টির যাথার্থ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ নাটকখানি ট্রাজেডির অন্তর্গত।

বিসর্জন

রাজর্ষি উপন্যাসের প্রথমাংশ লইয়া বিসর্জন নাটক লিখিত। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে তারিখে এখানি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। জোড়াসাঁকো রাজবাড়ী ছাড়া ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন তারিখে কর্ণওয়ালিসের নাট্যমন্দিরে ইহার প্রকাশ্য অভিনয় হইয়া গিয়াছে। মাইকেলী অমিত্রাক্ষর ছন্দে এখানি লিখিত। স্থানে-স্থানে প্রকাশভঙ্গী নূতনতর, যেমন রাজাদেশ সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে (১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্যে)—

"থামো সেনাপতি
দীপশিখা থাকে এক ঠাঁই, দীপালোক
যায় বহুদূরে। রাজ-ইচ্ছা যেথা যাবে
সেথা যাব মোরা।"

মহাকালীর রক্তলোলুপতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বলা হ'য়েছে—

"রয়েছেন—
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোল জিহ্বা মেলি,'—
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চিররক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হ'তে
রসের মতন অনন্ত খর্পরে তাঁর—।"

ঐ দৃশ্যে গুরুনিষ্ঠা সম্বন্ধে নূতন প্রকাশভঙ্গীতে জয়সিংহ বলিতেছে—

"গুরুদেব; তুমি
জানো ভালোমন্দ। সরল ভক্তির বিধি
শাস্ত্রবিধি নহে। আপন আলোকে আঁখি
দেখিতে না পায়, আলোক আকাশ হ'তে
আসে।"

অলংকারের সুন্দর ছটা তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের এই কয়টি কথার মধ্যে বিকশিত হয়েছে, যথা,—

"আকাশেতে অর্ধচন্দ্র পাণ্ডু মুখচ্ছবি
শ্রান্তিক্ষীণ—বহু রাত্রি জাগরণে যেন
পড়েছে চাঁদের চোখে আধেক পল্লব
ঘুমভারে।"

রঘুপতির রাজপ্রাসাদ হইতে চির বিদায় গ্রহণের প্রকাশভঙ্গীটি চমৎকার।—

"হে পুণ্য প্রাসাদ,
আমার পৈতৃক ক্রোড়, নির্বাসিত পুত্র
তোমারে প্রণাম ক'রে লইল বিদায়।"

নাটকখানিতে অতি অল্প স্থানে গল্পের সমাবেশ আছে। এখানি ক্লাসিকবিমিশ্র রোমান্টিক ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত ট্র্যাজেডি। একটি ভিখারিণী বালিকার পালিত ছাগশিশুকে দেবীমন্দিরে বলিদান দেওয়ায় ঐ দেশের রাজার মনে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে চিরাচরিত বলিদান-প্রথা রাজ্য থেকে বিদায় দিবার বিরুদ্ধে রাজ্যমধ্যে যে আলোড়ন উঠিয়াছিল তাহাই নাটকের সংঘাত। ঐ ঘাতের প্রতিঘাতে যে তরঙ্গ বহিয়াছিল তাহাই নাটকের ট্র্যাজেডি। গোবিন্দমাণিক্য-অপর্ণা আনীত সংঘাতে প্রতিঘাত তুলিয়াছিল রঘুপতি ও গুণবতী। ঐতিহাসিক ত্রিপুরারাজ্যের কথা থাকিলেও এখানি কাল্পনিক ঘটনায় পূর্ণ। ষড়যন্ত্রের বিবিধ জটিলপথে দেবীর বেদীমূলে রাজরক্তের বিনিময়ে জয়সিংহ নিজ প্রাণ বলি দিয়া সমস্যার সমাধান করিয়াছিল। অনবদ্য নাটকীয় কৌশলের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ অতুল মহিমায় নাটকখানি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। মন্দিরে ও তাহার সন্নিকটে ষড়যন্ত্রকারীদের সতর্ক চক্ষুর ফাঁকে ফাঁকে জয়সিংহ-অপর্ণার ফল্গুর মতো অন্তঃসলিলশীল প্রেম প্রবাহ নাটকের একমাত্র যৌন আকর্ষণ। নাট্যকার প্রেমিক ভ্রাতৃবৎসল গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র ধাপে ধাপে নানা দিক দিয়া অপূর্ব কৌশলে গড়িয়া তুলিয়াছেন। রঘুপতি অহংকারদৃপ্ত মোহান্ধ পুরোহিতের যেন একখানি সংগৃহীত ফটোগ্রাফ। সন্তানলোলুপা অভিমানিনী প্রতিজ্ঞাবদ্ধা রাজ্ঞী গুণবতীর চরিত্রও সুচিত্রিতা। পালকপিতার প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ কৃতজ্ঞ সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রেমিক জয়সিংহের চিত্রটি উপভোগ্য। অপর্ণার প্রেম-বুভুক্ষু-চিত্ত সংযম ও কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হয় নাই। এখানি রবীন্দ্রনাথের শক্তিশালী নাটকের অন্যতম। প্রসিদ্ধ গীতকার রবীন্দ্রনাথ এ নাটকে মাত্র তিনখানি ছোট বড় গীত দিয়াছেন, তাহাতে দর্শক বা পাঠকের আশা মিটে নাই।

গোড়ায় গলদ্

এই প্রহসনটি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রহসনের নূতন আব্-হাওয়ার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। গতানুগতিকতা ত্যাগ করিয়া শিক্ষিত সামাজিক পরিবেশের মধ্যে নির্মল হাস্য-কৌতুক জিনিসটার আরম্ভ তিনিই করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই সম্পূরক।

এটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রহসন। সংলাপের মান উন্নততর। চলিতকথার মধ্যে রাবীন্দ্রিক অলংকারের বৈশিষ্ট্য সুচারুরূপে বসানো হইয়াছে। কালহিসাবে বিচার করিলে এ বিষয়ে তিনি রসরাজ অমৃতলাল বসুর এক বৎসর তিনমাস পূর্বগামী ছিলেন। পার্থক্য এই, রবিবাবুর উপমাগুলি নাট্য-সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া সংলাপের গতিকে বেশ সহজবোধ্য ও জোরালো করিয়াছে, আর অমৃতলালের উপমাগুলি প্রহসনোচিত ব্যঙ্গোক্তিতে পূর্ণ। কতকগুলির নমুনা দেওয়া হইল:—(১) (১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)—"ব'সে ব'সে খোপের মধ্যে দুপুর বেলাকার পায়রার মতো সমস্তক্ষণ কেবল বক্‌বক্ কর্‌চি, তা'র না আছে অর্থ, না আছে তাৎপর্য।" (২) "বিনু যখন বলে জগৎটা শূন্য—তখন দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখের সাম্‌নে সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা ঘসা পয়সার মতো চেহারা বের করে।" (৩) "ওষুধের শিশির মতো নিদেন হপ্তার মধ্যে একটা দিন নিজেকে খানিকটা ঝাঁকানি দিয়ে নেওয়া আবশ্যক—নইলে শরীরে যা কিছু পদার্থ ছিল সমস্তই তলায় থিতিয়ে গেলো।" (৪) "স্ত্রী হবে কেমন,—রোজ এক এক পাতা ওল্টাবো আর এক একটা নতুন চ্যাপ্টার বেরোবে।" (৫) "যেন বিদ্যুতের মতো

একটি মাত্র আলোর রেখা—কিন্তু তার ভেতরে কতো চাঞ্চল্য, কতো হাসি, কতো বজ্রতেজ।" (৬) "তুমি চাও পত্তর মতো চোদ্দটি অক্ষরে বাঁধা-সাঁধা, ছিপ্ ছিপে; অমনি চল্‌তে ফির্‌তে ছন্দটি রেখে চলে, কিন্তু এদিকে মল্লিনাথ, ভরত শিরোমণি, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি বড়ো বড়ো পণ্ডিত তাঁর টীকে ভাষ্য ক'রে থই পায় না।" (৭) "তোমার কাপড়টি যেমন বেশ নির্বিবাদে গায়ে লেগে রয়েচে, স্ত্রীটি ঠিক তেম্‌নি হওয়া চাই।" (৮) "একটি স্ত্রী সহস্র দুশ্চিন্তার জায়গা জুড়ে ব'সে থাকেন—বেদনার উপরে যেমন বেলেস্তারা, অন্যান্য ভবযন্ত্রণার উপরে স্ত্রীর প্রয়োগটাও তেমনি।" (দ্বিতীয় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)—(৯) "সেজের বাতি নিবিয়ে দেবার ঠোঙাগুলোরও ঐ রকম (টোপরটার) চেহারা * * যে সকল উঁচু উঁচু ভাবের পল্‌তে মগজের ঘি খেয়ে খুব উজ্জ্বল হ'য়ে জলে উঠেছিলো, সেগুলিকে ঐ টোপরটা চাপা দিয়ে এক দমে নিবিয়ে সমস্ত ঠাণ্ডা হ'য়ে বস্‌তে হবে—" (১০) "ঘড়িতে ঐ যে ছুঁচোলো মিনিটের কাঁটা দেখ্‌চো উনি যে কেবল কানের কাছে টিক্ টিক্ ক'রে সময় নির্দেশ করেন তা নয়, অনেক সময় প্যাঁচ্ প্যাঁচ্ ক'রে বেঁধেন—মনমাতঙ্গকে অঙ্কুশের মতো গৃহাভিমুখে তাড়না করেন।" (তৃতীয় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)—(১১) "আহা এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমার মনটুকুকে যেন শুষে নিচ্চে—ব্লটিং যেমন কাগজ থেকে কালি শুষে নেয়!" (১২) "খাঁচার পাখীর দিকে বেড়াল যেমন তাকিয়ে থাকে তেম্‌নি ক'রে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে।" (১৩) (তৃতীয় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)—"যেমন বোঁটার সঙ্গে ফুল তেমনি ধনের সঙ্গে স্ত্রী। অর্থাৎ ধন থাক্‌লে স্ত্রীকে গ্রহণ কর্‌বার সুবিধা হয়—নইলে তাকে বেশ সুচারুরূপে ধ'রে রাখ্‌বার সুযোগ হয় না। অনেক সময় বোঁটা নেই ব'লে ফুল হাত থেকে পড়ে যায়, কিন্তু এতো বড়ো অরসিক মূর্খ কে আছে যে ফুল ফেলে দিয়ে বোঁটাটি রেখে দেয়!" (১৪) "বোধ হয় শূন্য অহংকার ফুলে উঠে স্রোতের ফেনার মতো মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেবল ভেসে ভেসে বেড়াতুম।" উপরিউক্ত উপমাগুলি এমন সহজ সুন্দরভাবে সংলাপের সাহত বিজড়িত হ'য়েছে যে তাহাতে ঐগুলিকে সুপ্রযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। নাট্যসাহিত্যে যাহা একান্ত প্রয়োজনীয় এমন কতকগুলি রূপক অলংকারও রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমন:—(প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে) (১) "পূর্বকালে সে ছিলো ভালো, বাপমায়ে ছেলেবেলায় বিয়ে দিয়ে দিতো—একেবারে শিশুকালেই প্রেমরোগের টীকে দিয়ে রাখা হ'তো।" (তৃতীয় অঙ্কের ২য় দৃশ্য)—(২) "তুমি ঠিক ব'লেছিলে নিমাই, আজকাল সবাই যাকে ভালবাসা ব'লে সেটা একটা স্নায়ুর ব্যামো—হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে ধরে, আবার হঠাৎ ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়!" (৩) "এখন নড়্‌তে চড়্‌তে কেবল মনে হয় আমার এই ভাঙাঘর ছেঁড়া বিছানাটুকুও বেদখল হ'য়ে গেছে—আমাকে আর কোথাও ভাল ক'রে ধরে না। নিমাই, তুমি শুনে রাগ কর্‌চো, কিন্তু একটু বুঝে দেখো, একটা জুতোর মধ্যে দুটো পা ঢোকে না, তা দুই পায়ে যতোই প্রণয় থাক্!" (চতুর্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য) (৪) "তাঁর এমন একটি মহিমা আছে যে, তাঁর পায়ের নীচে পৃথিবী নিজের ধূলামাটির জন্যে ভারি অপ্রতিভ হ'য়ে পড়ে আছে। কী ক'র্‌বে, বেচারার নড়ে বস্‌বার জায়গা নেই।"

গোড়ায় গলদের দৃশ্যকাব্যোচিত পরাকাষ্ঠা যাহা ইন্দু-নিমাইয়ের মিলনকে পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে রূপায়িত করিয়াছে তাহা ত্রুটিশূন্য হয় নাই, কেমন একটা কৃত্রিমতা উঁকি-ঝুঁকি দিয়াছে, কিন্তু উহারই তৃতীয় দৃশ্যে কমল-বিনোদের পুনর্মিলনটি ত্রুটিশূন্য হইয়া দর্শক বা পাঠকের চিত্তে রস-সঞ্চার

করিয়াছে। এক নামের ভুলে জগতের অন্যান্য সাহিত্যের মতো এই নাট্যসাহিত্যেও বিভ্রাট উপস্থিত করিয়াছিল।

এখানি কমেডির সংকীর্ণ রূপ লইয়া প্রহসনে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

শেষ রক্ষা

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে গ্রন্থাকারে এখানি প্রকাশিত। এটি 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনটির পুনর্লিখিত অভিনয় যোগ্য সংস্করণ। ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে মাসিক বসুমতীতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। গোড়ায় গলদের অতি অল্পস্থানে কিছু রদ্‌বদল করিয়া শেষরক্ষা লেখা হইয়াছে, মোটামুটি বেশ মিল আছে। ইহার দৃশ্যকাব্যোচিত গুণাগুণের বিশ্লেষণ গোড়ায় গলদে করা হইয়াছে। সামান্য ত্রুটির সংশোধন থাকিলেও প্রধান ত্রুটিগুলি অক্ষালিত রহিয়াছে। যাহা হোক্ সকলেরই শেষরক্ষা হওয়ায় গ্রন্থখানির নামের সার্থকতা রক্ষা হইয়াছে।

চিত্রাঙ্গদা (নাট্যকাব্য)

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। মহাভারতীয় এক আখ্যায়িকার উপর কল্পনার মোহন বেশ পরাইয়া কবি এই নাট্যকাব্যখানিকে সাজাইয়াছেন। ইহাতে নাট্যের নির্ঘাত সংঘাত না ফুটিলেও কাব্যের সুষমা ঝরিয়া পড়িয়াছে। বসন্তের বরে অস্থায়ী অপরূপ রূপলাবণ্যবতী ও ছলনাময়ী চিত্রাঙ্গদার প্রতি রিরংসু অর্জুনের আত্মনিবেদন কাব্যামোদীর পরম উপভোগের বস্তু হইয়াছে, কিন্তু পৌরাণিক ঐতিহ্যবিশিষ্ট অর্জুনচরিত্রের তাহা গ্লানিকর দাঁড়াইয়াছে। পুরুষভাবে পালিতা স্বাবলম্বী রাজেন্দ্রনন্দিনী নায়িকা চরিত্রটি বাঙ্গালার কাব্যেতিহাসে অনাস্বাদিতপূর্ব রূপবৈশিষ্ট্য পাইয়াছে, কিন্তু তাহা নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর মাপকাঠিতে দোষশূন্য নহে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে এখানি লিখিত। প্রকৃত নাটক হিসাবে রচিত না হওয়ায় নাটকোচিত সার্থকতা বিচারের মধ্যে আসে না।

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

কাব্যের অন্তর্গত চিত্রাঙ্গদার রূপ লইয়া কবি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাই ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১১, ১২ ও ১৩ই মার্চ তারিখে কলিকাতার নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে অভিনয় উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ পুস্তিকা আকারে এই নাটিকাটি প্রথম প্রকাশিত করেন। এখানি নৃত্য জাতীয় নাটিকা। এই গ্রন্থের অধিকাংশই কবিতা ও গানে রচিত এবং সে গানগুলি নাচের উপযোগী করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাকে নৃত্যাভিনয় বলা চলে। নাচ গানের ভিতর দিয়া ঘাত-প্রতিঘাতের ভাবাভিনয় ইহাতে অভিব্যক্ত। বাংলা নাট্যসাহিত্যে এ জাতীয় নাটিকার রবীন্দ্রনাথই প্রথম প্রবর্তক।

বৈকুণ্ঠের খাতা

এই প্রহসনটি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের (মার্চ-এপ্রেল) মাসে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। রাবীন্দ্রিক উপমার হাত থেকে এখানিও বঞ্চিত হয় নাই। দ্বিতীয় দৃশ্যে :—"তোমার নাম করবামাত্র তার

গাল—ওর নাম কি—বিলিতি বেগুনের মতো টক্ টক্ ক'রে উঠে।" তৃতীয় দৃশ্যে :—"মুখখানি যেন ফুলের মতো শুকিয়ে যায়।" 'বৈকুণ্ঠেরখাতাকে' প্রহসনের মধ্যে ফেলিলেও ইহার হাসির সুর একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে। ইহার অন্তর্নিহিত অশ্রু বিদায়ের বেলা সহসা মিলনাশ্রুতে পরিণত হইয়া ভ্রাতা ও ভগিনী স্নেহের পরাকাষ্ঠা আনিয়া কমেডির সৃষ্টি করিয়া দিল। খণ্ড চরিত্র হিসাবে বৈকুণ্ঠ, অবিনাশ, ঈশান, কেদার ও তিনকড়ি এক একটি পৃথক জাতিরূপ (type)। পুরুষ চরিত্র লইয়া প্রকাশ্যে ইহার খেলা, স্ত্রী চরিত্র দুইটি নেপথ্যে থাকিয়া অভিনয় করিয়াছে। মাত্র তিনটি দৃশ্যে ইহার গঠন প্রণালীটি অপূর্ব।

গান্ধারীর আবেদন

এই নাট্যকাব্যখানি মাত্র প্রশ্নোত্তরে লেখা, এবং ঐ টুকুই ইহার নাট্য-গন্ধ, বাকি সবটাই কাব্যগন্ধে ভরপুর। মিত্র পয়ারের সহিত অমিত্রাক্ষরের মিশ্রণ ইহার ছন্দঃ-বৈচিত্র্য। কপট পাশাক্রীড়ার ফলে পঞ্চপাণ্ডবের বনগমনে গান্ধারী শোকার্তা হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাপী দুর্যোধনকে ত্যাগ করিবার জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহাই এ কাব্যের বিষয়। কোন গান নাই। আনুমানিক ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর তারিখে এখানি বিরচিত হইয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

সতী

মারাঠা গাথা হইতে সংগৃহীত ঘটনা লইয়া এই নাট্যকাব্যখানি রচিত। বিবাহরাত্রিতে ব্রাহ্মণকন্যা অমাবাঈ বাক্‌দত্ত জীবাজী নামক বরকে না বরিয়া ঘটনাচক্রে তাঁহারই বরসজ্জায় সজ্জিত এক যবনকে পাণিদান করিয়া পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। পিতা বিনায়ক রাও ও মাতা রমাবাঈ জীবাজীর সহিত মিলিয়া বিবাহের জন্য প্রজ্বালিত হোমাগ্নির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঐ যবনের বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করিলে জীবাজী রণক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং অমাবাঈ যবন ধর্মে দীক্ষিতা হইয়া যবন অন্তঃপুরে প্রেরিতা হইলেন। ক্রমে যথাকালে পুত্রবতী হইয়া এক পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এদিকে তাঁহার হিন্দু মাতা রমাবাঈ যবন কর্তৃক অপহৃতা কন্যার কলঙ্ক নিজ সমাজ হইতে ক্ষালণের অভিপ্রায়ে কন্যাকে বলপূর্বক জীবন্ত দগ্ধ করিয়া তাঁহার সেই বাক্‌দত্ত স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহার সতী নাম উজ্জ্বল করিলেন। এই ঘটনাটি লইয়া প্রশ্নোত্তরে কাব্য-কথা সাজানো হইয়াছে। নাট্যরস বা গান কিছুই নাই। এখানি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর তারিখে রচিত হইয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল।

নরকবাস

ইহার আখ্যায়িকা এইরূপ :—মহাভারতীয় বিদেহরাজ সোমক পুরোহিতের প্ররোচনায় একমাত্র শিশু পুত্রকে যজ্ঞে বলি প্রদান করিয়া তাহার ফলস্বরূপ নিজের স্বর্গগমন ও ঋত্বিকের নরকগমন ব্যবস্থা পাইলেন। পথে কিন্তু ঋত্বিকের আহ্বানে সোমক যাবৎকাল না ঋত্বিকের পাপক্ষয় হয় তাবৎকাল তাঁহার সহিত নরকবাসের কামনা করিলেন। এই ব্যাপারটি নাট্যকাব্যের বিষয়। নাট্যকৌশল কিছু

নাই, মাত্র প্রশ্নোত্তরে ইহা লিখিত। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বরে রচিত ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ প্রকাশিত।

লক্ষ্মীর পরীক্ষা

এই নাট্যকাব্যখানি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে রচিত। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। রাণী কল্যাণীর দান ও সদাব্রতে ঈর্ষান্বিতা হইয়া তাঁহার দাসী ক্ষীরো লক্ষ্মীদেবীর কাছে ধন প্রার্থনা করিল। পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে লক্ষ্মীদেবী সত্য সত্যই তাহাকে রাণী করিয়া দিলেন। স্বাভাবিক ব্যয়কুণ্ঠ ক্ষীরো নানাবিধ অত্যাচারে তাহার আশ্রিতগণকে পীড়া দিতে লাগিল। অবশেষে লক্ষ্মী ক্ষীরোর আশ্রয় ছাড়িয়া কল্যাণীর আশ্রয়ে পুনঃ প্রবিষ্ট হইলেন। আবুহোসেনের নবাবীর মতো ক্ষীরোর রাণীগিরি ঘুচিয়া গেল। চলিত কথা ছন্দে গাঁথিয়া এই নাট্য-কাব্যখানি রচিত, নাট্যগন্ধ অপেক্ষা কাব্যগন্ধ বেশি পাওয়া যায়। কেবল স্ত্রী চরিত্র লইয়া এখানি লিখিত।

কর্ণ-কুন্তী সংবাদ

এখানি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে রচিত ও প্রকাশিত। মহাভারতীয় কথা ইহার প্রসঙ্গ। চৌদ্দ অক্ষর সমন্বিত মিত্র ছন্দে কাব্যালোক প্রতিফলিত করিয়াছে, নামে মাত্র নাট্যকাব্য।

বিনি পয়সায় ভোজ

'ব্যঙ্গকৌতুক' নাট্যের মধ্যে এখানি অন্যতম। নূতনত্বের মধ্যে এই প্রকাশভঙ্গীটি চমৎকার— 'এদিকে আমার পেট এমনি জ্ব'লে উঠেচে যে, মনে হ'চ্ছে যেন এখনি কোঁচায় আগুন ধ'রে যাবে!' এ ব্যঙ্গনাট্যটি পঠিতব্য, অভিনেতব্য নহে। কেন নহে তাহা ইহার রচনার ভণিতায় বুঝা যায়। প্রতারকের বিবিধ প্রতারণাভঙ্গী রূপ লইয়াছে। তারিখের জন্য 'বশীকরণের' মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

নূতন অবতার

এই ব্যঙ্গকৌতুকে প্রতারণার নূতনভঙ্গী প্রকটিত হ'য়েছে। তিনটি অঙ্কে এটি সমাপ্ত। অভিনয় করাইতে হইলে কিছু অদল-বদলের প্রয়োজন। পাঠের পক্ষে কোন বাধাই নাই, ধরণটি নূতনতর। রচনার তারিখ 'বশীকরণের' মন্তব্যে আছে।

অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি

মর্ত্যের অভ্যাস ও শিক্ষা স্বর্গরাজ্যে প্রবর্তিত করিবার বিফল চেষ্টায় ব্যথিত হইয়া জনৈক স্বর্গবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিল। এই 'ব্যঙ্গকৌতুক-নাট্যে'র ভাব তাহাই। এটিও পাঠোপযোগী। রচনার তারিখ 'বশীকরণে' দ্রষ্টব্য।

স্বর্গীয় প্রহসন

মনসা, শীতলা, ঘেঁটু প্রভৃতির ইন্দ্রলোকে স্থান-লাভ ঘটায় স্বর্গে যে উৎপাতের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার একটি অনবদ্য রূপদান ইহার বৈশিষ্ট্য। এ প্রহসনখানি অভিনীত হইবার উপযোগী করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। হাসি ও ব্যঙ্গকৌতুকে এখানি পূর্ণ। সম্বোধনগুলি দেবভাষায় রচিত হওয়ায় ঔচিত্যজ্ঞান হইতে এখানি বঞ্চিত হয় নাই। রচনার তারিখ বশীকরণের আলোচনার মধ্যে আছে।

বশীকরণ

স্ত্রী-ত্যাগী এক ব্রাহ্ম যুবক কিরূপে সেই নিরুদ্দিষ্টা স্ত্রীর বশীকরণ-প্রভাবে স্ত্রীলাভ করিলেন ও সঙ্গের বন্ধুটিকেও তাহার স্ত্রীলাভ করাইলেন তাহার কাহিনী এই কৌতুকপূর্ণ নাট্যের মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে। নাট্যটি পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। ইহার—

"(আমি) কি ব'লে করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণ মন ?
চিত্তে এসে দয়া করি'
নিজে লহো অপসরি'
করো তা'রে আপনার ধন—
আমার হৃদয় প্রাণ মন॥"

ইত্যাদি গানখানি বেশ উপভোগ্য। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে 'ব্যঙ্গকৌতুক' নাট্য-গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তৎপূর্বে ১৮৮৫—১৯০১ খৃষ্টাব্দের বিভিন্ন সময়ের মধ্যে পূর্বোক্ত 'ব্যঙ্গ-কৌতুকগুলি' রচিত হইয়াছে, প্রকাশের সুযোগ পায় নাই। 'বশীকরণ' ব্যঙ্গকৌতুক নাট্যখানি ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে মিনার্ভার প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়া গিয়াছে।

হাস্য-কৌতুক

কৌতুক-নাট্যচ্ছলে বালক-বালিকাদের আবৃত্তির জন্য এই ক্ষুদ্র কথোপকথনগুলি রচিত হইয়াছে; প্রত্যেকটির নামরূপ হেঁয়ালির উপর ইহার বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ ১৫টি হেঁয়ালি এই গ্রন্থে একসঙ্গে গ্রথিত আছে। ইওরোপে শারাড (Charade) নামীয় নাট্যখেলার অনুকরণে এগুলির আবির্ভাব। বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে ইহার অস্তিত্ব ছিল না, রবীন্দ্রনাথই প্রাবিকর্তা। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের অন্তর্গত কতকগুলি কথোপকথনের রচনাকাল ১৮৮৫—১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। বিষয়ের গুরুত্বভেদে কতকগুলি হেঁয়ালি বয়স্ক নর-নারীরও উপভোগ্য।

চিরকুমার সভা

এখানি উপন্যাস আকারে 'ভারতী' নামক মাসিক পত্রিকায় ১৯০০—১৯০১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইয়াছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইহা 'চিরকুমার সভা' নামে পুস্তকাকারে সন্নিবিষ্ট হয়। পরে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' এই পরিবর্তিত নাম লইয়া এখানি বাহির হইয়াছিল। উপন্যাস হইতে প্রথম নাটকাকারে 'চিরকুমার সভা' লিখিত হয় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী ছাড়া ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই তারিখে স্টারের প্রকাশ্য নাট্যশালায় চিরকুমার সভা অভিনীত হইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ উপন্যাসকেই নাট্টীকৃত করা হইয়াছিল, কারণ কবিপ্রণীত নাটকের প্রকাশকাল উহার ছয়-সাত মাস পরে ঘটিয়াছিল।

উপমায় সিদ্ধ-হস্ত রবীন্দ্রনাথ এই নাট্যসাহিত্যের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে উপমার এই নমুনাটি দিয়াছেন :—"সরাচাপা হাঁড়ির মধ্যে মাংস যেমন গুমে গুমে সিদ্ধ হ'তে থাকে—প্রতিজ্ঞার মধ্যে চাপা থেকে চিরকুমার সভার সভ্যদের সভ্যগুলিও একেবারে হাড়ের কাছ পর্যন্ত নরম হ'য়ে উঠেছেন—দিব্যি বিবাহ-যোগ্য হ'য়ে এসেছেন—এখন পাতে দিলেই হয়।" ঐ দৃশ্যে স্বামী-স্ত্রীর রসালাপের মধ্যে হিন্দুপুরাণে অনভ্যস্ত নাট্যকার অক্ষয়ের মুখ দিয়া চৌষট্টি যোগিনীর স্থানে চৌষট্টি হাজার যোগিনী বলিয়া ফেলিয়াছেন, নাটকান্তর্গত রসের প্রগাঢ়তায় এ ত্রুটি সামান্যই। আর একটি উপমার নমুনা ঐ দৃশ্যেই আছে :—"ইলিষ মাছ অম্‌নি দিব্যি থাকে, ধর্‌লেই মারা যায়—প্রতিজ্ঞাও ঠিক তাই, তাকে বাঁধ্‌লেই তার সর্বনাশ।" ঐ দৃশ্যে পুনরায় একটি নমুনা দেখুন :—"তার না কাটলে কি শ্যাম্পেনের ছিপি খোলে? দেশে আপনার মতো লোকের বিদ্যাবুদ্ধি চাপা থাকে, বাঁধন কাটলেই একেবারে নাকে-মুখে-চোখে উছলে উঠ্‌বে।" আরও কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। (৩য় অঙ্কের, ১ম দৃশ্যে) :—"নিকষের উপর সোনার রেখার মতো চকিত চোখের চাহনি দৃষ্টিপথের উপরে যেন আঁকা রয়ে গেলো।" "মাষ্টার মশায়কে দেখ্‌বামাত্র ছেলেগুলো যেমন বেঞ্চে নিজ নিজ স্থানে সার বেঁধে বসে—তেমনি অক্ষয় দাদার সাড়া পাবামাত্র কথাগুলো দৌড়ে এসে জুড়ে দাঁড়ায়।" (৩য় অঙ্কের, ২য় দৃশ্যে) :—"তোমার লাগে ভালো কিন্তু বলো অন্য রকম—আমার সেই শোবার ঘরের ঘড়িটার মতো—সে চলে ঠিক কিন্তু বাজে ভুল।" "আমাদের মতো ব্রত যাদের, তা'রা কি হৃদয়টিকে তুলো দিয়ে মুড়ে রাখ্‌তে পারে? তা'কে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার মতো ছেড়ে দাও, যে তা'কে বাঁধ্‌বে তা'র সঙ্গে লড়াই করো।" "যে ইট পাঁজায় পুড়েছে তা' দিয়ে ঘর তৈরি কর্‌লে আর পোড়্‌বার ভয় থাকে না হে!" "বিশে ডাকাত যেমন খবর দিয়ে ডাকাতী ক'র্‌তো, আমার অজানা অভিসারিকা তেমনি পূর্বে হ'তেই আমাকে অভিসারের খবর পাঠিয়েছে।" "আপনার লজ্জা তিনি ভাগ ক'রে নিলেন, যেমন অরুণের লজ্জায় উষা রক্তিম।" "দুঃখের বিষয় হৃদয়টি দেখ্‌তে পান্‌নি—সে যেন ফুলের ভিতরকার লুকানো মধুটুকুর মতো মধুর, শিশির-টুকুর মতো করুণ।" (চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য) :—"সজীব গাছ যে সূর্যের তাপে প্রফুল্ল হ'য়ে উঠে, মরাকাঠ তা'তেই ফেটে যায়, যৌবনের উত্তাপ বুড়ো মানুষের পক্ষে ঠিক উপযোগী বোধ হয় না।"

এই সকল উপমা অলংকার নাট্যসাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া তাহার সংলাপকে বেশ শক্তিশালী করিয়াছে, এ অবদানে রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। সংলাপের বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের দুই-চারিটির নমুনাও এখানে দেওয়া হইল :—(প্রথম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য) "নতুন মুগ্ধবোধে তাই লেখে। আমি লিখে প'ড়ে দিতে পারি, চিরকুমার সভার মুগ্ধদের কাছে শৈল যেমন প্রত্যয় করাবে তাঁরা তেম্‌নি প্রত্যয় যাবেন। কুমারদের ধাতু আমি জানি কি না।" (দ্বিতীয় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) "মাথাটা চিন্তা করে করুক; উদরটা পরিপাক ক'র্‌তে থাক্—পাকযন্ত্রটি মাথার মধ্যে এবং মস্তিষ্কটি পেটের মধ্যে প্রবেশ চেষ্টা না করলেই বস্! কিন্তু তাই ব'লে মাথাটা ছিন্ন ক'রে এক জায়গায় এবং পাকযন্ত্রটাকে আর এক জায়গায় রাখ্‌লে ও কাজের সুবিধা হয় না।" "পৃথিবী যত বেশি পঙ্কিল পৃথিবীর সংশোধন কার্য ততো বেশি পবিত্র।" (চতুর্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)—"শরীরের মধ্যে মিল যদি কোথাও প্রত্যক্ষ বাস করে সে ঐ চোখের উপরে।" শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এরূপ বাক্‌পটুতা না থাকিলে তাঁহাদের সংলাপ নীরস হইয়া উঠে। হাসি-ঠাট্টা-তামাশার ভিতর দিয়া এই কমেডিটি নাট্যকার রূপায়িত করিয়াছেন। লিরিক কবি

পাত্র-পাত্রীর মধ্য দিয়া লিরিকের আব্‌হাওয়া বেশ নাটকোচিত ভাবেই বজায় রাখিয়াছেন। পুংচরিত্রের মধ্যে অক্ষয়, চন্দ্র, শ্রীশ, বিপিন, পূর্ণ ও রসিকের চিত্ররূপ, এবং স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে জগত্তারিণী, পুর, শৈল, নৃপ, নীর ও নির্মলার চিত্ররূপ বেশ উপভোগ্য। চিরকুমার সভার সভ্যদের অভাবনীয় উপায়ে কৌমার্য-ব্রতভঙ্গের ঘটনাটি ইহার প্লট। দোষের মধ্যে অতিশয়োক্তির ভারে কোনো-কোনো স্থানে সংলাপ একটু ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

প্রায়শ্চিত্ত

'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে এই নাটকখানি গদ্যে রচনা করেন। এখানির সংগীতবিভাগে বসন্তরায়ের "বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ? সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস" শীর্ষক গানখানি বহু প্রচলিত হইয়াছিল। আর একখানিও উল্লেখযোগ্য—"মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আয়—তারে এগিয়ে নিয়ে আয়। চোখের জলে মিশিয়ে হাসি ঢেলে দে তার পায়—ওরে ঢেলে দে তার পায়" ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের মুখে একখানি 'আগমনী' গানও দিয়াছেন সেখানি অপূর্ব ও সর্বজনবিদিত—"সারা বরষ দেখিনে মা, মা তুই আমার কেমন ধারা, নয়নতারা হারিয়ে আমার—অন্ধ হ'ল নয়ন তারা" ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত নটীর গানখানিও উপভোগ্য, যথা,—"ও যে মানে না মানা! আঁখি ফিরাইলে বলে—না! না! না। যত বলি নাই রাতি, মলিন হয়েছে বাতি, মুখপানে চেয়ে বলে না! না! না।" ইত্যাদি। সংলাপের মধ্যগত কথার গুরুত্ব চতুর্থ অঙ্কের ৭ম দৃশ্যে প্রতাপ ও ধনঞ্জয়ের কথোপকথনের মধ্যে পাওয়া যায়, যথা,—"মহারাজ! রাজ্যটাও ত রাস্তা। চল্‌তে পার্‌লেই হ'ল! ওটাকে যে পথ বলে জানে সেই ত পথিক।"

পরিত্রাণ

'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক, পরে তাহা পুনর্লিখিত অবস্থায় 'পরিত্রাণ' নামে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মে-জুন মাসে প্রকাশিত করেন। 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' কেদারনাথ চৌধুরী দ্বারা নাটকে নীত হইয়া রাজা বসন্ত রায় নামে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই তারিখে ন্যাশানলের প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। পরে স্টার রঙ্গমঞ্চে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে নাটককার পরিকল্পিত নূতন রূপায়ণে 'পরিত্রাণ' নাম লইয়া এইখানি অভিনীত হইয়া গিয়াছে। প্রতাপাদিত্য-বসন্ত রায় ঘটিত ব্যাপার নাটকখানির উপজীব্য। সংলাপের উচ্চমান নাটকখানির মধ্যে দেখা যায়, একটির নমুনা:—(প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে) "ওটা ভাই মিথ্যে অভিমানের কথা বল্‌লি, মহাদেব বুকের মধ্যে রেখেচেন অন্নপূর্ণাকে, আর মাথার উপরে রেখেচেন গঙ্গাকে—কাউকেই তাঁর ছাড়্‌লে একদণ্ড চলে না—তাঁর প্রাণের অন্ন-জল দুইই সমান চাই।"

ঐতিহাসিক পটভূমিকার উপর কাল্পনিক ঘটনার সমাবেশে ইহার রচনা। নাটকীয় পাত্রে চরিত্র-সৃষ্টি না হইয়া জাতিরূপ (type) খাড়া হইয়াছে। তাহাতে প্রতাপকন্যা বিভার প্রায়শ্চিত্ত এবং উদয়াদিত্য ও তাঁহার স্ত্রী সুরমার মধ্যে প্রথমটির পরিত্রাণ, দ্বিতীয়টিরও মরণদ্বারা পরিত্রাণ দেখানো হইয়াছে। ধনঞ্জয় বৈরাগী টাইপটির বৈশিষ্ট্য গীতে। এই ধরণের চরিত্র নাট্যকার মনোমোহন

বসু সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন, তাঁহার পরে ঐ টাইপে প্রাধান্য দেখান গিরিশচন্দ্র ঘোষ, তবে গীতকার রবীন্দ্রনাথ ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখে যখন-তখন গান জুড়িয়া দিয়া একটু নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। ইহার বসন্ত রায় টাইপের মুখে—'আজ তোমারে দেখ্‌তে এলেম অনেক দিনের পরে। ভয় কিছু নেই, সুখে থাকো, অধিকক্ষণ থাক্‌বো নাকো—এসেচি এক নিমেষের তরে' ইত্যাদি গানখানি বহু পরিচিত হইয়া আছে। এখানি নিধুবাবুর পুরাতন টপ্পাগানকে স্মরণ করাইয়া দেয়। গদ্যের মাধ্যমে না কখানি লিখিত। ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপের সৃষ্টি ব্যতীত সংলাপের অন্তর্গত সর্ববিধ প্রস্তাবের সমাধান না থাকায় নাটকখানিকে অসম্পূর্ণ বলা চলে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শারদীয়া 'বসুমতী' পত্রিকায় ইহা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

শারদোৎসব

এখানি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে, এবং শান্তি নিকেতনে ঐ সময়ে ইহার প্রথম অভিনয়-ক্রিয়াও সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহাতে স্ত্রীচরিত্র নাই। মানুষের হৃদয়ে কি অনির্বচনীয় রস-ভাণ্ডারই না সঞ্চিত থাকে! যে ইহার যথাযথ পরিবেশন করিতে পারে সে-ই পরমানন্দের প্রকৃত অধিকারী হইয়া উঠে। বর্ষার ঘন ঝঞ্ঝার পর বিশ্বপ্রকৃতি যখন তাহারি দানে পুষ্ট হইয়া শরতের হাল্‌কা আব্‌হাওয়ার মধ্যে আপনার রূপ বিকশিত করিয়া তুলে, এবং নিজ গর্ভজাত হেমন্তের শস্যসম্ভারকে লুক্কায়িত রাখিয়া বাহিরের হেলা দোলায় যোগ দেয়, এ নাটকের মধ্যে তেমনি একজন রাজা তাঁহার সহচর লইয়া ভবিষ্যের বংশধর মানব শিশুদের অন্তঃকরণে আনন্দের বীজ ছুটির আনন্দের মতো খেলার ভিতর দিয়াই প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। তাই নাটকটির প্রারম্ভেই রাজা বলিয়াছেন—"ওজন যার কিছু নেই তার আবার মূল্য কিসের? হেমন্তের পাকা ধানেরই মূল্য আছে, ভাদ্রের কাঁচাক্ষেতের আবার মূল্য কি? একটুখানি হাসি, একটুখানি খুসি, এই হলেই দেনা-পাওনা চুকে যাবে।" এই রূপকটি হইল নাটকের কীলক। নাটকের মধ্যে তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শরতের আনন্দে বালকদের প্রথম গানখানি কি সুন্দর!

"মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।" ইত্যাদি।

এই নাটকের মন্থিত ভাব-সাগরে যে টুক্‌রো চরিত্রগুলি মাথা তুলিয়াছে তন্মধ্যে বিষয়লোভী সন্দিগ্ধ লক্ষেশ্বর, সরল আমোদ-প্রিয় অথচ বিশ্বস্ত ঠাকুরদাদা, কৃতজ্ঞ কর্তব্যপরায়ণ শিশু উপনন্দ, ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর রূপধারী অনাসক্ত রাজা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছেন। শারদলক্ষ্মীর আবাহন গানটি, যথা:—

"আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালি মালা
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।

এসো গো শারদলক্ষী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে
এসো নির্মল নীলপথে,
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল
বনগিরি পর্বতে।"

ইত্যাদি, এবং তাঁহারি আগমনী সংগীতটি—

"লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নাই, কভু দেখি নাই এমন তরণী-বাওয়া।"

ইত্যাদি বহু বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

আরব্য উপন্যাসে বাদ্‌শাহ হারুণ-উল-রসীদের ছদ্মবেশে রাজ্য ভ্রমণের কথা শুনা গেছে। সে ভ্রমণে কোনো কোনো পাত্রের পার্থিব সুখসম্পদের বৃদ্ধি হইয়াছিল বটে, কিন্তু এ ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী রাজার ভ্রমণে লোকের আত্মোন্নতি ঘটিয়াছে এবং তাহাই নাটকটির বৈশিষ্ট্য। হাল্‌কা আমোদের ভিতর দিয়া এ জাতীয় সার্থক রূপক খুব কম দেখা যায়। কবি ইহার আর একটি অভিনয়-যোগ্য সংস্করণ "ঋণশোধ" নামে করিয়াছেন।

ঋণ-শোধ

এই নাটিকাখানি শারদোৎসবের অভিনয়যোগ্য সংস্করণ, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে শারদোৎসবের একটু বৈচিত্র্য দেখা যায়, যেমন—"যে মানুষ সব দেশেই দেশকে খুঁজতে চায় তাকে পরদেশী সাজ্‌তে হয়। এই আমাদের ঠাকুরদা বুড়ো হয়ে বসে আছেন, ওটাও ওঁর সাজ-মাত্র—উনি যে বালক সেটা উনি বার্ধক্যের ভিতর দিয়ে খুব ভালো ক'রে চিনে নিচ্চেন" ঋণশোধে "লেগেছে অমল ধবল পালে" গানটিকে আগমনী গীতি না বলিয়া শরতের ধ্যান বলা হয়েছে। গদ্যের মাধ্যমে ও গানে নাটিকাটি বেশ জমিয়াছে।

মুকুট

এখানি মুকুট নামক ক্ষুদ্র উপন্যাসের নাট্যরূপ, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত। ত্রিপুরারাজকে ভিত্তি করিয়া একটি কাল্পনিক ঘটনা ইহার নাট্যক্রিয়া। যুবরাজ, ইন্দ্রকুমার ও রাজধর জ্যেষ্ঠানুক্রমে এই তিন রাজকুমারের একটি ঘটনা ইহার উপজীব্য। যুবরাজ প্রকৃত বীর ও ভ্রাতৃবৎসল, মধ্যম ইন্দ্রকুমার সরল ও জ্যেষ্ঠানুগামী, কনিষ্ঠ রাজধর ইন্দ্রকুমারের প্রতি ঈর্ষান্বিত ও শঠ। ত্রিপুরার চিরশত্রু আরাকানাধিপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রায় কোন্ ভ্রাতা কি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই নাট্যের প্রতিপাদ্য। রাজধরের বিশ্বাসঘাতকতায় যুবরাজ যুদ্ধে মুমূর্ষু হন, জ্যেষ্ঠাভিমানী ইন্দ্রকুমার ভ্রাতৃশোকে মোহ্যমান। কনিষ্ঠ রাজধর নিজ বিশ্বাসঘাতকতার এই অদ্ভুত পরিণাম দেখিয়া সর্বশেষ দৃশ্যে আপনার জন্য আনীত আরাকান রাজমুকুট যুবরাজকে পরাইতে যাইলে মৃত্যুপথের পথিক যুবরাজ ইন্দ্রকুমারকে উহা পরাইতে বলিলেন। ন্যায়পরায়ণ ইন্দ্রকুমার উহা নিজে না পরিয়া রাজধরকে পরাইয়া দিলেন, এবং ভ্রাতৃশোকে যুবরাজকে 'দাদা' বলিয়া শেষ সম্বোধন করার

সঙ্গে সঙ্গে নাটকখানিও শেষ হইয়া গেল। ইন্দ্রকুমারের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ রাজধর অবশেষে ঈর্ষার পরিবর্তে ঐ 'জয়মুকুট' ইন্দ্রকুমারকেই পরাইলেন। একস্থানের প্রকাশভঙ্গী উল্লেখযোগ্য—(প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে) "সেনাপতি সাহেবের সরল ভৎসনা ওঁর সাদা দাড়ির মতো সমস্তই কেবল ওঁর মুখে।" এখানি গদ্যের মাধ্যমে তিন অঙ্কে সমাপ্ত, কোন গান নাই। সৎ দৃষ্টান্তে অসৎ আপনিই শুধরাইয়া যায়, ইহাই এই ক্ষুদ্র নাটকখানির নীতি।

রাজা

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বরের মধ্যে এখানি প্রকাশিত হইয়াছে। সুদর্শনা অন্ধকারের মধ্যে অরূপ রাজার সাড়া পাইয়া ক্রমশঃ আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। এখানি রূপকের পর্যায়ভুক্ত ভাবপ্রধান নাটক। কল্পনাকে ভাবের সহায় না করিলে সবটা বুঝা যায় না। গদ্যের মাধ্যমে গানের ভিতর দিয়া ইহার রূপ বিকশিত হইয়াছে। বৌদ্ধ 'কুশজাতকের' গল্পের মধ্যে ইহার সূত্র ধরিতে পারা যায়।

অরূপরতন

এই নাট্যরূপকটি রাজা নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এখানি প্রতীক জাতীয় নাটকের অন্যতম। অন্তরিন্দ্রিয়ের নিভৃত নিকেতনে যে জাগরণ প্রথম দেখা দেয়, তাহাকে ভাল করিয়া উপলব্ধি না করিয়া বহির্জগতের মধ্যে জোর করিয়া টানিয়া আনিতে যাইলে আলোর পরিবর্তে অন্ধকারই আগাইয়া আসে। নাটকের নায়িকা সুদর্শনার তাহাই হইয়াছিল। অহমিকা-প্রসূত মায়ার ঘোরে সে যে অন্তর্যামী রাজাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, দুঃখের পুনঃ পুনঃ আঘাতে তাহার সে অভিমান চূর্ণীকৃত হইলে তবে সে অরূপরতন লাভ করিতে পারিয়াছিল। তাই মানুষের মন—

'ধনের বাটে মানের বাটে রূপের হাটে দলে দলে গো।
দেখবে ব'লে করেছে পণ,
দেখবে কারে জানে না মন',

কিন্তু যেই বিভাবরী অতিক্রান্ত হয় অমনি মন বলিয়া উঠে—

'ভোর হোলো বিভাবরী, পথ হোলো অবসান।
শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরি গান॥'

এবং সঙ্গে সঙ্গে—

'অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে,
সে বীণা আজি উঠিল বাজি' হৃদয় মাঝে
ভুবন আমার ভরিল সুরে,
ভেদ ঘুচে যায়, নিকটে দূরে।'

পৃথিবীকে তখন আনন্দরসে আপ্লুত দেখা যায়। চলিতকথা, গান ও সুরের ভিতর দিয়া এখানি রূপায়িত হইয়াছে। এখানি সার্থক রূপক।

ডাকঘর

এই নাটকখানি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত হয়। এটিও প্রতীকী নাটক। বদ্ধ জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার ডাক পৌঁছিলে তাহার সকল বন্ধন খুলিয়া যায়। বালক অমল জীবাত্মার প্রতীক। মাধব, কবিরাজ, মোড়ল নিজ নিজ সংস্কাররূপী বাধার প্রতীক। ঠাকুরদা, দইওয়ালা, প্রহরী, ডাকহরকরা, সুধা, ক্রীড়াশীল ছেলের দল—প্রকৃতির সরল বিশ্বাসী সন্তানদের প্রতীক। ডাকঘর পরমাত্মার নির্দেশ দিবার স্থানের প্রতীক। কবি-নাট্যকারের মনে যে আধ্যাত্মিক ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছিল ডাকঘর নাটকখানি তাহারি একটি লহরী। শিশুহৃদয়ের ক্ষীণ প্রতিঘাত দূরাগত বংশীধ্বনির মতো ইহার নাটকত্ব বজায় রাখিয়াছে। এ জাতীয় নাটক বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে আর নাই। গদ্যের মাধ্যমে সরল সংলাপের ভিতর দিয়া ইহার যাবতীয় ইঙ্গিতগুলি গানের বদলে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছে। বিধি-নিষেধের বদ্ধ ঘরে বসিয়া অমল অন্যের স্বাধীনতা দেখিয়া স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল।

মালিনী

সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকর দুইবন্ধু কর্তব্যের ডাকে কিছুদিন পৃথক বাস করিয়া মালিনীর সম্মুখেই একদিন ক্ষেমংকর বন্দীকৃত অবস্থায় তাহার বন্ধহস্তের শৃঙ্খলদ্বারা সুপ্রিয়ের মস্তকে এমনি সাংঘাতিক-ভাবে আঘাত করিল যে তাহার ফলে সে ভূপাতিত ও বধপ্রাপ্ত হইল। অনুতপ্ত ক্ষেমংকর তখন বন্ধুর সহযাত্রী হইবার ইচ্ছায় নিজ-বধার্থ ঘাতককে আহ্বান করিল। মালিনী সে আহ্বান শুনিয়া পিতাকে বলিলেন—'মহারাজ ক্ষম ক্ষেমংকরে' বলিয়াই মূর্ছিত অবস্থায় ভূতলশায়িনী হইলেন। চারখানি দৃশ্যে চৌদ্দ অক্ষর মিত্রাক্ষরে নাটকখানি সম্পূর্ণ। রাজেন্দ্রলালের সংগৃহীত বৌদ্ধ মহাবস্তাবদান গ্রন্থের একটি কাহিনী ইহার উপজীব্য। কবিকল্পনায় উহা বহু রূপান্তরিত হইয়াছে। তদানীন্তন লৌকিক শাস্ত্রীয় ধর্ম মানব-ধর্ম অপেক্ষা অপকৃষ্টতর, ইহাই নাটকটির প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থখানিতে কাব্যাংশ ও নাটকাংশ পাশে-পাশে আছে। এখানি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ প্রকাশিত হইয়াছে। ভাব ও চরিত্রের দিক দিয়া বরং ক্ষেমংকর ফুটিয়াছে, কিন্তু সুপ্রিয় মুকুলিত রহিয়া গেল।

বিদায় অভিশাপ

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগস্ট তারিখে এখানি রচিত ও ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। বহুবর্ষ ধরিয়া কচের সাহচর্যে থাকিয়া শুক্রতনয়া দেবযানীর তাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, অবশেষে সঞ্জীবনী মন্ত্রের শিক্ষা সমাপনান্তে কচ যখন স্বর্গধামে প্রয়াণের জন্য দেবযানীর কাছে বিদায় চাহিলেন, তখন অভিশাপ-বাণী দিয়া দেবযানী সেই বিদায়কে অভিশপ্ত করিয়া দিলেন। ইহার ঘাত-প্রতিঘাত ঠিক নাটকীয় ভাবে উত্থিত হয় নাই। চৌদ্দ অক্ষর মিত্রাক্ষরে এখানি রচিত। পুরুষের কর্তব্যনিষ্ঠার এটি প্রকাশক্ষেত্র। কাব্যাংশ মুখ্যভাবে ও নাট্যাংশ গৌণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগস্ট তারিখে মিনার্ভার প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে এখানি অভিনীত হইয়াছে।

অচলায়তন

এখানি ১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেপ্‌টেম্বর-অক্টোবর মাসের প্রবাসী পত্রিকার পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। দেশের প্রাচীন আচার ও বিধিনিষেধের বেষ্টনীর মধ্যে 'অচলায়তনে'র ছাত্রগণ শুধু শুষ্ক নিয়মপালন ও নিয়মভঙ্গের জন্য অবোধ্য প্রায়শ্চিত্তবিধান লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। ছাত্রসমাজে বিদ্রোহ শুরু হইল। তাই কবি বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন—"তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে, কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্মবিধি তো চিরকালের।"

শোণপাংশুদলের একটা গান এইরূপ :—

"আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলাকাটে সকাল হতে সন্ধ্যে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা, রেখায় রেখায় দেয়রে দেখা,
মাতেরে কোন্ তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শীষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রানেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারি চন্দ্রে।"

এই গানখানি বহু বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। গ্রাম্যজীবনের নিখুঁত ছবি ইহার মধ্যে পাওয়া যায়।

আচার্য অদীনপুণ্য ও ছাত্র পঞ্চক প্রথম বিদ্রোহী হইল। রাজা মন্থরগুপ্ত কঠোর নীতি অবলম্বন করিলেন। শোণপাংশুদলের গুরু দাদাঠাকুরের অনুপ্রাণনা অচলায়তন-দলের জড়তা দূরীভূত করিল। বৈষ্ণব শাস্ত্রের পঞ্চ ভাবের মধ্যগত শান্তদাস্য সখ্য বাৎসল্য এই চারিভাবের প্রতীকরূপে দাদাঠাকুর নাটকের মধ্যে বলিয়াছেন—"যে জান্‌তে চায় না যে আমি তাকে চালাচ্চি আমি তার দাদাঠাকুর।" "আর যে আমার আদেশ নিয়ে চল্‌তে চায় আমি তার গুরু।" এই শেষের উক্তিটি ঐশ্বর্য ভাবের ভক্ত অষ্টসিদ্ধিকামী সাধকের জন্য প্রস্তাবিত হইয়াছে। এই সূক্ষ্মতত্ত্ব দুইটি লক্ষ্য করিবার জিনিস।

দর্শকদের নাম-গানের নাদ-ধ্বনিতে ও প্রাণের স্পন্দনে অচলায়তনের উচ্চ প্রাচীর ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইল। সহস্র-সহস্র বৎসরের বদ্ধ ও জীর্ণ সংস্কার নূতন হাওয়ায় প্রাণ পাইল। এখানিও রূপকজাতীয় নাটক। অচলায়তন বদ্ধ ও জীর্ণ সংস্কারের প্রতীক। দাদাঠাকুর ও তাঁহার কার্য মুক্ত হাওয়ার প্রতীক। অচলায়তন নাটকখানি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২রা আগস্ট তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

অচলায়তন নাটকটির ইহা একখানি অভিনয়-যোগ্য সংস্করণ। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এখানি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার—"আমরা চাষ করি আনন্দে" শীর্ষক গানখানি বহু বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে। মন্ত্র-তন্ত্র, শুচি-অশুচি প্রভৃতি লৌকিক অনুশাসন সমাজের ভিতর যে অচলায়তনের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা দাদাঠাকুরের কৃপায় চূর্ণীকৃত হইল। এখানি অচলায়তনের কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ও লঘুতর আকার, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সেপ্‌টেম্বর-অক্টোবর মাসে শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইয়াছে।

ফাল্গুনী

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রন্থাকারে এখানি প্রকাশিত, ইহার আর একটি নাম বৈরাগ্যসাধন। এই নাটকখানি প্রথমে শান্তিনিকেতনে, পরে বাঁকুড়ার নিরন্নদের অন্নভিক্ষাকল্পে সাহায্যের জন্য ১৯১৬ খৃষ্টাব্দেরই প্রথমদিকে কলিকাতায় অভিনীত হইয়াছিল। এখানি বসন্তের জয় গান। কি রূপ লইয়া গঠিত হইয়াছে, তদুত্তরে কবি-নাট্যকার স্বয়ং বলিতেছেন—"আমার এ সব জিনিস বাঁশির মতো, বোঝ্‌বার জন্যে নয়, বাজ্‌বার জন্যে।" * * "আমার রচনার মধ্যে প্রাণ ব'লে উঠেচে—সুখে দুঃখে, কাজে বিশ্রামে, জন্মে মৃত্যুতে, জয়ে পরাজয়ে, লোক লোকান্তরে—'জয়, এই আমি-আছির জয়', জয়, এই আনন্দময় 'আমি-আছির জয়।' এমন কি এ নাটকে চিত্রপটরূপ দৃশ্যেরও প্রয়োজন নাই, কবি বলিয়াছেন—"আমাদের দরকার চিত্তপট—সেইখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাবো।" * * "গানের চাবি দিয়েই এর এক একটি অঙ্কের দরজা খোলা হ'বে।" কবি বলেছেন অভিনেয় পালাটির নাম—'শীতের বস্ত্রহরণ!' ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তা'র বসন্তরূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন।" * * "বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চল্‌চে, আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা! বিশ্বকবির সেই গীতিকাব্য থেকেই তো ভাব চুরি ক'রেচি।"

শাস্ত্রের অনুশাসনে চলা প্রাণধর্মের খেলা নয়। সদ্‌চিদানন্দময়ের অনুভূতিতে বয়োধর্ম নাই, শিশু-বৃদ্ধ ভেদ নাই, কালধর্ম নাই, তাই নাটকের মধ্যে কবি একস্থানে বলেছেন—"পৃথিবীর বয়স অন্তত তোমার চেয়ে কম নয়, কিন্তু নবীন হ'তে ওর লজ্জা নেই।" কবি বলেছেন—"সৃষ্টির গোধূলি লগ্নে 'পাবো'র সঙ্গে 'ছাড়্‌বো'র বিয়ে হয়ে গেছে রে—তাদের মিল ভাঙ্‌লেই সব ভেঙে যাবে।" এ নাটকের প্রকাশভঙ্গীতে নূতন কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

প্রকৃতিরাজ্যে শীতের নীরস নিষ্পত্র বৃক্ষে বসন্তের হাওয়া লেগে তাতে নব কিশলয় সঞ্চারিত হ'তে হ'তে যেমন সেটি নবীন হ'য়ে উঠে। জীবরাজ্যেও তেমনি মানুষ বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর যৌবন পার হ'য়ে বার্ধক্যে উপনীত হ'লেই তা'র বাহ্য ছদ্মবেশের অন্তরালে মনোরাজ্যে যে আনন্দময় সত্তার নিত্য কৈশোর-লীলা চল্‌ছে তা'তে মেতে থাকতে পারাই জীবলীলার সার্থকতা। নাট্যকবি এই তত্ত্বটি ফাল্গুনীর প্রতীকের ভিতর দিয়া ফুটাইবার চেষ্টা করেছেন। নাটকের ভূমিকায় তাই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে এটি মস্তিষ্কের সাহায্যে বুদ্ধি দিয়া বুঝিবার জিনিস নহে, চিদানন্দের প্রাণের দ্বারে বাঁশির মতো বাজিবার জিনিস। জীবাত্মা 'সৎ' বলিয়া 'আমি-আছি', 'চিৎ' বলিয়া প্রাণের দ্বারে তাহারই সাড়া পাওয়া যায়, এবং 'আনন্দে'ই তাহার অভিব্যক্তি বলিয়া একাধারে সদ্‌চিদানন্দময় পুরুষের সাক্ষাৎকার-লাভ ঘটে। আত্মমুখ (subjective) কবি বিষয়মুখ (objective) প্রকৃতি ও জীবজগতের সাহায্যে এই তত্ত্বটি বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রাণস্পর্শী গান দিয়াই ইহার কার-কারবার। নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথমে এই তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিলেন। ইহাই তাঁহার প্রতীক নাটকের সার্থকতা। মেটারলিঙ্কের প্রভাবান্বিত হইলেও নিজের স্বতন্ত্র পথ তিনি আবিষ্কার করিয়া লইয়াছিলেন, তজ্জন্য ইহা মৌলিকতা-ভিন্ন অনুকরণে বা অনুসরণে প্রসূত হয় নাই।

মুক্তধারা

নাটকখানি ১৯২২ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল-মে মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। শিবতরাইয়ের জলধারা বন্ধ করিবার জন্য উত্তরকুট পার্বত্য প্রদেশে যন্ত্রবাঁধ তৈয়ার করা হইয়াছে, কারণ তাহারা ভিন্নজাতি। অভিজিৎ ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রজাতান্ত্রিক শিক্ষার গুণে তাহা যথাকালে ভাঙিয়া দিল। এই বৈরাগী চরিত্রটি 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের একটি পাত্র-বিশেষ, এ নাটকেও তিনি দেখা দিয়াছেন সেই এক ব্যক্তি হিসাবে নহে তবে সেই আদর্শ প্রচারের কাজ লইয়া। মহাত্মা গান্ধীর মতো 'অহিংসা-বিদ্রোহ' সৃষ্টি তাঁহার কাজ। জাতিগত বিভিন্নতার রাষ্ট্রগত সমস্যা ধনঞ্জয় বৈরাগী রাখিতে চান না। রাষ্ট্রের সকলেই স্বভাবজাত দানের পূর্ণ অধিকারী, তাই 'মুক্তধারা'র বাঁধ যথাকালে চূর্ণীকৃত হইয়াছিল। গানের ভিতর দিয়া গল্পের মাধ্যমে নাটকখানি রূপায়িত হইয়াছে। ইহার ভিতর যে সমস্যা সমাধান-প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা জন ও গণ-সাধারণের অনুভূতিযোগ্য নহে। শিক্ষিত ও নাটকীয় নূতন কৌশলে অভিজ্ঞ এবং রাজনীতিজ্ঞ পাঠক বা দর্শকের বোধগম্য।

বসন্ত (গীতিনাট্য)

এখানি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে প্রকাশিত হইয়া কলিকাতার ম্যাডান থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে, পরে ঋতুউৎসব গ্রন্থ-মধ্যে ইহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বসন্তকালের জয়গানে এখানি পূর্ণ। বসন্তকালে শুষ্ক ঝরাপাতার স্থান কচি কিশলয়ে ভরিয়া উঠে, তাই কবি এই গ্রন্থমধ্যে বলেছেন—'যে দান সত্য, তা'র দ্বারা বাইরের ধন বিনাশ পায়, অন্তরের ধন বিকাশ পেতে থাকে।' ঋতুরাজ প্রকৃতির মাঝে যে গায়ের কাপড়খানা গায়ে দিয়ে আসেন, তার এক পিঠে নূতন, এক পিঠে পুরাতন। যখন উল্টে পরেন তখন দেখি শুক্নো পাতা, ঝরাফুল, আবার যখন পাল্টে নেন তখন সকাল বেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী,—তখন ফাল্গুনের আম্র-মঞ্জরী, চৈত্রের কনক চাঁপা। উনি একই মানুষ নূতন পুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্চেন।" গানে-গানে নাটিকাখানি ভরা, তাহারি একটি অংশের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল :—

> "সহসা ডাল পালা তোর উতলা যে।
> (ও চাঁপা, ও করবী) কারে তুই দেখ্‌তে পেলি
> আকাশ মাঝে
> জানিনা যে।" ইত্যাদি।

গৃহপ্রবেশ

'গল্পসপ্তক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'শেষের রাত্রি' গল্পের নাট্যরূপ। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্‌টেম্বর-অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ঐ বর্ষের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে স্টারের প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছে। এখানি মধ্যবিত্ত সমাজের পারিবারিক কোন এক ঘটনাকে ঘিরিয়া রূপায়িত হইয়াছে। কঠিন রোগে মৃত্যু শয্যায় শায়িত নব পরিণীত যতীন রোগের জন্য তাহার যৌন সম্পর্কীয় দুর্বলতাকে ঢাকিয়া দিবার আশায় ভার্যার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত কোন চেষ্টারই ত্রুটি সে করিল না। বাল্যে মাতৃহীন যতীন মাসীর গৃহে থাকিয়া তাঁহারি অর্থানুকূল্যে লালিত-পালিত ও বর্ধিত হইয়া

তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ অধিকার করিয়া বসিল। ডাক্তারের উপদেশে পাছে মনোভঙ্গজনিত আঘাতে যতীনের মৃত্যু ঘটে, তাই মাসী যতীনের মনোভিলাষ সর্বপ্রযত্নে পূর্ণ করিতে লাগিলেন। সঞ্চিত অর্থ শেষ হইলে বাড়ীবন্ধক রাখিয়া অর্থের যোগাড় করিয়া 'মণি-সৌধ' অর্ধনির্মিত হইল। যতীনের খেয়াল পূর্ণ করিবার জন্য কেবল মণি প্রকোষ্ঠটি সম্পূর্ণ করা হইল। কল্পলোকে রাখিয়া মণির মনে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া যতীনের অন্য কোন কাজ তখন আর রহিল না। যতীনের ভাবাদর্শের সহিত বস্তুতান্ত্রিক আব্‌হাওয়ায় প্রতিপালিত তাঁহার স্ত্রী মণি নিজেকে এই সংসারের সহিত খাপ খাওয়াইতে পারিল না—ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হইল। গল্পের মাধ্যমে দুই অঙ্কের পরিধির মধ্যে ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যতীনের ভগিনী হিমির গানে ইহার বেদনাগুলি মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। মাসীর চরিত্রটি অপূর্ব, অন্তরের অতি গুহ্যতম প্রদেশ হইতে তাঁহার স্নেহের উৎস উৎসারিত হইয়াছে।

স্থানে স্থানে প্রকাশভঙ্গী বেশ উপভোগ্য হইয়াছে, নমুনা এইরূপ:—(১) 'ঐ দেখো, ঐ দেখো, অনাদি অন্ধকারের সমস্ত চোখের জলের ফোঁটা তারা হ'য়ে রইলো।' (২) "কিন্তু সুখ জিনিসটি ঐ তারাগুলির মতো, অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয়। জীবনের ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জ্বলেনি?" (৩) 'বাঁধনের মধ্যে কিছু একটু শক্ত জিনিস না থাক্‌লে সেটা বাঁধনই হয় না, তা কী পুরুষের কী মেয়ের। ভালবাসার মালায় ফুল থাকে পারিজাতের, কিন্তু তা'র সুতোটি থাকে বজ্রের।' (৪) 'পেয়াদাগুলোকে সাজাতে হবে বাজনদার ক'রে, হাতে দিতে হবে বাঁশি। ল-কলেজের লয়-তত্ত্বের সব অধ্যায় শিখেছি,—কেবল তানলয়ের পালাটা প্র্যাক্টিস হয় নি। এটা হয় তো বা তোমার কাছ থেকেই—'

শোধবোধ

নাটকখানি কবির 'কর্মফল' গল্পের নাট্যরূপ, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক বসুমতীতে প্রথম প্রকাশিত হইয়া ঐ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুন তারিখে পৃথক পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। পার্টি, ডিনার ও জন্মদিন নির্বাহে অভ্যস্ত বাঙ্গালী সিভিলিয়ানের ঘরে কন্যারা কিরূপে স্বামী-নির্বাচিত করিয়া লয়েন এরূপ একটি সামাজিক চিত্রের ছবি এই নাটকে প্রদর্শিত হইয়াছে। বড়লোকের সহিত পাল্লা দিতে যাইয়া কিরূপে একটি মধ্যবিত্ত ঘরের পুত্র সতীশ নিঃসন্তান মাসীর আদরে অবশেষে চুরির দায়ে পড়িল এবং ঐ মাসীর অধিক বয়সে পুত্রসন্তান লাভ হওয়ায় তাঁহার অর্থ সাহায্য ও আদর হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার ঐ ঋণ কি উপায়েই বা শোধ দিতে গিয়াছিল এবং কিরূপেই বা নিজ প্রণয়িনীর অলংকারের টাকায় বিপন্মুক্ত হইয়াছিল তাহার কাহিনী লইয়া নাটকখানি গঠিত। নলিনী সিভিলিয়ান-ঘরের কন্যা হইয়াও নির্ধন সতীশকে ভালবাসিয়াছিল। নাট্যকার এই নাটকের ভিতর দিয়া যে সমাজচিত্র আঁকিয়াছেন তাহা সাধারণ বাঙ্গালী-সমাজ-জীবনে খুব কমই দেখা যায়। সতীশ ও নলিনীর জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত আসিয়া নাটকখানিকে উপভোগ্য করিয়াছে। গল্পের মাধ্যমে সংলাপের ভিতর দিয়া ইহার পরিণতি আসিয়াছে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই তারিখে আর্ট থিয়েটারের প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ স্টার থিয়েটারে এখানি অভিনীত হইয়া গিয়াছে।

নটীর পূজা

নাটিকাখানি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে 'পূজারিণী' কবিতার নাট্যীকৃত রূপ লইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এম্পায়ারে এখানি প্রকাশ্যভাবে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। এটি মগধরাজ অজাতশত্রুর সময়ে বৌদ্ধ কাহিনীর কাল্পনিক রূপায়ণ। রাজবাড়ীর নটীর অদ্ভুত উপায়ে বৌদ্ধকৃপালাভ ও মৃত্যু, বিম্বিসার পত্নীর হৃদয় দ্বন্দ্বের পরিণাম, হিংসা ও অহিংসার সংগ্রামে অহিংসার জয়লাভ। চারি অঙ্কের মধ্যে সংলাপের ভিতর দিয়া ইহার সংঘাত উঠিয়াছে ও নামিয়াছে, কিন্তু বড়ই ঢিমে চালে। নটীর অন্য গানের মধ্যে—

'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমোহে নমঃ
তোমায় স্মরি, হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম
উছল হ'য়ে বাজে'—ইত্যাদি

গান বহু বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। পুরুষ চরিত্রের ভূমিকা নাটকখানির মধ্যে নাই। ইহা সাংকেতিকতা বর্জিত মানসিকদ্বন্দ্বপূর্ণ নাটক।

ঋতু উৎসব

নামক নাট্যগ্রন্থখানি :৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঋতুর কার্যকে কি করিয়া অভিনয় উপযোগী করা যায় কবি প্রথমে 'শেষবর্ষণে' তাহা রূপায়িত করিয়াছেন। এখানি গীতোৎসব নাট্যে রূপায়িত হইয়াছে মাত্র। নামটি যদিও শেষবর্ষণ, বর্ষার প্রথম হইতে শেষ সকল বর্ষণের কথাই ইহাতে আছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের আগস্ট-সেপ্‌টেম্বর মাসে 'বিচিত্রা' গৃহে এই পালা প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, পরে ঐ সালের ১৯শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এখানি গীতিনাট্যাকারে অভিনীত হইয়াছে। ঋতুর মধ্যে বর্ষাকে প্রথমস্থান কেন দিয়াছেন তাহার কৈফিয়ৎ কবি নটরাজের মুখে এইরূপ দিয়াছেন—'বর্ষাকে না জান্‌লে শরৎকে চেনা যায় না। আগে আবরণ তারপরে আলো। 'বর্ষার আবাহন গানটি সুন্দর—

"এসো নীপবনে ছায়া বীথিতলে,
এসো করো স্নান নবধারা জলে ॥
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পরো দেহ ঘেরি মেঘ নীল বেশ,"—ইত্যাদি

গানের সুরে, প্রকৃতির সজ্জায় মানুষের বাহ্যান্তরের ব্যবহারে সর্বত্রই বর্ষার মুখর ঝংকার। বাঙালা নাট্যসা হত্যে ঋতুগানে রবীন্দ্রনাথ বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র ইহারও অগ্রদূত ছিলেন। দিক-চক্রবালে ধরণীর মিলনগান এবং কৃষকদের ব্যবহৃত যন্ত্রগানের ইঙ্গিত তাঁহার 'হরগৌরী' নাটকে বহুপূর্বে পাওয়া গিয়াছে।

সুন্দর

২৪টি পুষ্পে এই নামীয় মালাছড়াটি গ্রথিত হইয়াছে। ইহার কতকগুলি এক স্তবকে রচিত হইয়া ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ তারিখে প্রথমে শান্তিনিকেতনে এক গীতোৎসবে গীত হইয়াছিল।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত আসরে যে 'সুন্দর' পালাটি গীত হইয়াছিল তাহা মুদ্রিত সুন্দর হইতে অনেকাংশে পৃথক। ইহা গানের পালা, সংলাপ নাই।

রক্তকরবী

রূপকজাতীয় দৃশ্যকাব্য। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে এখানি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত, কিন্তু তাহার দুই বৎসর পূর্বে প্রবাসীর আশ্বিনের অতিরিক্ত সংখ্যায় এই নাটকখানি সমগ্র ছাপা হইয়াছিল। ইহার কাব্যত্ব গদ্যের মাধ্যমে প্রকাশমান সংলাপের কোন কোন স্থানে পাওয়া যায়, যেমন,— ১) 'সরোবর কি ফেনার-নূপুর-পরা ঝরণার মতো নাচ্‌তে পারে?' (২) 'সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়। অসুন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চায়, বীণার তার বাজে না, ছিঁড়ে যায়।' (৩) 'তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়, মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়।' (৪) 'তাকে কি রকম ভালবাসো?'—আমি ব'ললুম, 'জলের ভিতরকার হাল যেমন আকাশের উপরকার পালকে ভালবাসে—পালে লাগে বাতাসের গান, আর হালে জাগে ঢেউয়ের নাচ।' (৫) রূপক অলংকারের (metaphor) একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত এইরূপ:—'সাম্‌নে তোমার মুখে-চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালোচুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝর্‌না।' (৬) প্রকাশভঙ্গীর চমৎকারিত্বের একটি নমুনা—'বিধাতা আসল জিনিস সৃষ্টি ক'রেছেন বাজে জিনিসকে লালন কর্‌বার জন্য। তিনি সম্মান দেন ফলের আঁঠিকে, ভালবাসা দেন ফলের শাঁসকে।'

শস্যশালিনী মেদিনীর শ্যাম শোভা প্রকৃতির অনবদ্য সৌন্দর্য বিকশিত করিয়া তুলে এবং কৃষিজীবীর তাহাই সরল আনন্দ উপভোগের পথ। উষর ও বন্ধুর দেশ সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত তাই সে দেশের অধিবাসীরা পৃথিবীর পর্বতময় বক্ষ-পঞ্জর ভাঙ্গিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি আহরণের নিমিত্ত যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপ্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছে এবং তাহার ফলে যে ধনিক ও শ্রমিক সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই এ নাটকে প্রতীকে রূপায়িত হইয়াছে। শ্রমভারে নিষ্পেষিত শ্রমিক আনন্দ চাহে, কর্মক্লান্ত ধনিকও আনন্দ চাহে। লোভের মাত্রা চরমে উঠিলেই একদিন না একদিন এ প্রাণহীন যান্ত্রিক সভ্যতার অবসান অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে তাহাই ভবিষ্যৎ বাণীর মতো কবি নাটকের অবয়বে দেখাইয়াছেন। নন্দিনী ও বিশুর গান নাটকখানির অন্যতম আকর্ষণ, নতুবা সংলাপগুলির ভিতর হইতে রস উপভোগ করা শিক্ষিত দার্শনিক দর্শক বা পাঠক ব্যতীত অপরের সাধ্যাতীত। ঘাত-প্রতিঘাত এত মৃদু চালে সঞ্চালিত যে ধৈর্যচ্যুতির সম্ভাবনা দেখা যায়।

নবীন

গীতি নাটিকাটি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ তারিখে রচিত ও প্রকাশিত। ঐ সালের এপ্রেল মাসে কলিকাতার নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে উহা মঞ্চস্থ হইবার উপলক্ষ্যে ঐরূপ আকারে গঠিত হইয়াছিল। বসন্তের গান কবি নানা ছাঁচে রচিয়াছেন। ইহার প্রথম রূপটি কবিতা ও গানে, দ্বিতীয় রূপটি গানে ও তাহার টিপ্পনীতে রূপায়িত হইয়াছে। এগুলি ঠিক নাটিকা নহে, কবিতা ও তাহার ব্যাখ্যায় পূর্ণ, অভিনয়ের জন্য ইহাকে নাটিকার অন্তর্গত করা হইয়াছে, কাব্যগুণ ব্যতীত নাট্যগুণ স্ফুটীকৃত হয় নাই।

নটরাজ (ঋতুরঙ্গশালা)

দোল পূর্ণিমার রাত্রে শান্তি নিকেতনে নটরাজ নৃত্য, গীত ও কবিতার আবৃত্তিযোগে অভিনীত হইয়াছিল। পরে ইহা নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা নামে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কবি নটরাজ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয় 'নটরাজ' পালা গানের এই মর্ম।" কবি ইহারই কয়েকটি গান, কবিতা ও অন্য গান একত্র করিয়া 'ঋতুরঙ্গ' নামে প্রকাশিত করেন এবং তাহাই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে ক্রমান্বয়ে কয়দিন অভিনীত হইয়াছিল। এই দুইটি পালাগানের প্রায় সমস্ত কবিতা ও গান 'বনবাণীর' অন্তর্ভুক্ত নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায় স্থান পাইয়াছে। 'বনবাণীর' অন্তর্ভুক্ত বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ উৎসব ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগস্ট তারিখে শান্তি-নিকেতনে অভিনীত হইয়াছিল। এই সব ঋতুনাট্যের ভিতর ঋতুর আবাহন, ধ্যান, আবির্ভাব ও বিদায়ের বর্ণনাগুলি গান ও কবিতার মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়াছে। ঐগুলির কাব্যোচিত গুণাধিক্যে এক নৃত্য ও গান ছাড়া ইহার নাট্যগুণ আর বেশি বিকশিত হয় নাই।

শাপমোচন

যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন ক'রে 'রাজা' নাটক রচিত হয়েছে তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচিত হইল। এর গানগুলি পূর্বরচিত নানা গীতিনাটিকা হ'তে সংকলিত। গন্ধর্ব সৌরসেন সুর সভায় গীতনায়কদের অগ্রণী ছিল, অনবধানে মৃদঙ্গের তাল কেটে গেল। অভিশাপে তাহার জন্ম হ'ল গান্ধার রাজগৃহে অরুণেশ্বর নামে। কমলিকা নামে মদ্ররাজ কুলে মধুশ্রী স্বামিবিরহে কাতর হইয়া জন্ম লইল। অরুণেশ্বরের বীণার সহিত মদ্ররাজ কন্যার মালাবদল ঘটনাচক্রে ঘটিয়া গেল। বধূ স্বামিগৃহে আসিল। স্বামীকে দেখিতে চাহিলে স্বামী অন্ধকার থেকে বলিল—'আমার গানেই আমাকে দেখো। আগে দেখে নাও অন্তরে, বাইরে দেখবার দিন আসবে পরে। নইলে ভুল হবে, ছন্দ যাবে ভেঙে।' ক্রমে নানা বাধার ভিতর দিয়া উভয়ের মিলন সংসাধিত হইয়াছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর ও ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখের রাত্রিকালে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নৃত্যগীত ও পাঠ সহযোগে ইহা প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ও ৩০শে মার্চ তারিখে ইহা পরিবর্তিত আকারে পুনরভিনীত হইয়া গিয়াছে। কবির স্বভাবসিদ্ধ লিরিক অংশই প্রস্ফুটিত হইয়াছে, নাট্যাংশ চাপা পড়িয়াছে। সংগীতের দিক্ দিয়া বিচার করিলে তাঁহার কাব্যের নানাস্থান হইতে সংকলিত গানগুলি উপযুক্ত স্থানে প্রকাশিত হইয়া নাটিকার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

কালের যাত্রা (নাট্য)

(১) রথের রশি। মহাকালের রথের রশি জীর্ণ ও গ্রন্থিযুক্ত হইয়া কালের সাক্ষীরূপে ময়াল সাপের মতো পড়ে আছে, রথ অচল। পাত্র পাত্রীদের মধ্যে সৈনিকদের প্রকাশভঙ্গীতে একটু নূতনত্ব দেখা যায়, যথা—

'আংটির হীরে থেকে আলোর উচ্চিংড়ে গুলো
লাফিয়ে লাফিয়ে পড়্‌ছে চোখে।'

রাজা, মন্ত্রী, ধনী, ধনপতি, স্ত্রীলোক, পুরোহিত, সৈনিক কেহই রথের রশিতে টান দিতে পারিল না। শূদ্ররা টান দিতেই রথ চলিল। কবি আসিয়া মীমাংসা করিলেন—

"এই বেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেল না।
* * যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে,
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে তারা
দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।"

এইটিই রথের রশির ভিতরকার কথা।

(২) কবির দীক্ষা। ইহার নুতন শিক্ষা এইরূপ :—

'গাছের ত্যাগ ফল দিয়ে।
ফল ফলে না রস না হলে।
প্রাণের ধনই হলো আনন্দ, যাকে বলি রস ;
যেখানে রসের দৈন্য ভরে না সেখানে প্রাণের কমণ্ডলু।'

কবির দীক্ষার ইহাই মর্মকথা।

(৩) রথযাত্রা (প্রমথনাথ বিশীর কোন রচনা হইতে এই নাট্যদৃশ্যের ভাবটি কবি রবীন্দ্রনাথের মনে আসিয়াছিল)। কালের যাত্রা নাট্যখানি ১৯৩২ সালের ১৬ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রবাসীতে রথযাত্রা নামে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটিকা প্রকাশিত হয়। 'রথের রশি' তাহারই পরিবর্তিত ও আগাগোড়া পুনর্লিখিত রূপ। বর্তমান সংস্করণে কালের যাত্রার পরিশিষ্টরূপে রথযাত্রা নাটিকাটি প্রবাসী হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। কবির দীক্ষার পূর্বপাঠ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মাসিক বসুমতীতে শিবের ভিক্ষা নামে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল।

এই নাটিকাগুলি প্রাচীন জীর্ণ সংস্কারের প্রতীক। এই অনুষ্ঠানগুলি যখন প্রথম আরম্ভ হয় তখন রাজা, মন্ত্রী, পুরোহিত, ধনী, নাগরিক, নাগরিকা ও সৈনিক সকলের মনেই ধর্মের আসল টান ছিল যাহার জন্য রথ চলিত, কিন্তু পরবর্তীকালে কালের অতিক্রমে যখন ঐগুলি জীর্ণ কুসংস্কারে পরিণত হইল তখন এদের টানে রথ আর চলিল না, যারা এতকাল উপেক্ষিত ছিল তাদের টানে রথ চলিল। যুগধর্মই জাতির অগ্রগতি সূচনা করে, তাহাকে অবলম্বন না করিলে মৃত্যু অনিবার্য—এই শিক্ষা এই নাটকাগুলির অভ্যন্তরে দেওয়া হইয়াছে। গান ও গদ্যের মাধ্যমে অভিনীত হইয়াছিল।

চণ্ডালিকা

সম্বন্ধে কবি নিজে বলিয়াছেন যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দুলকর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাই থেকে এই নাটিকার গল্পটি গৃহীত। এখানি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের অগস্ট-সেপ্‌টেম্বর মাসে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়,

এবং ঐ সময়ে কলিকাতার এম্পায়ার থিয়েটারে কবি নিজে ইহার আভিনয়িক পাঠ দিয়াছিলেন। ইহার ৪ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে কবি ইহাকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেন। প্রকৃতি জাতিতে চণ্ডালিনী হইয়াও বুদ্ধশিষ্য আনন্দকে ঘটনাচক্রে তৃষ্ণার জল দিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিল। এবং সেই প্রথম দর্শনেই আনন্দকে লাভ করিবার আশায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাহার মাতাকে মন্ত্রশক্তি দ্বারা আনন্দকে তাহাদের গৃহে আকর্ষণ করিবার বন্দোবস্ত করিল। কন্যার নির্বন্ধাতিশয্যে জননী বহুকষ্টে তাঁহাকে গৃহে আনিলে প্রকৃতির প্রকৃত আনন্দলাভ ঘটিল বটে, কিন্তু জননী মৃত্যু বরণ করিলেন। মধ্যযুগীয় মন্ত্রশক্তি ও দ্রব্যগুণের অলৌকিকত্ব থাকিলেও কবি এ নাটিকাকে গান ও বাচনভঙ্গীর ভিতর দিয়া মনোহারিণী করিয়াছেন।

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ সালের ১৮, ১৯ ও ২০শে মার্চ তারিখে কলিকাতায় ছায়া রঙ্গমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে উহা সর্বপ্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে ৯ই ও ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কলিকাতার শ্রীরঙ্গমঞ্চে পুনরভিনীত হইয়াছে। কবিতায় ও নাচগানে এই নৃত্য নাট্যখানি গঠিত। চণ্ডালিকার আনন্দ দর্শনে মুক্তিলাভ ইহার মূল সুর। এখানি দৃশ্য ও শ্রাব্য, পাঠ্য নহে।

তাসের দেশ

নাটিকাখানি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। কবির এক পুরাতন ছোট আষাঢ়ে গল্প অবলম্বনে ইহা রচিত। বিদ্রোহী কবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সব ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আমাদের স্থবির সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। এ নাটিকাখানিও তাহারি অন্যতম ছিল। বিদেশীর আগমনে আমাদের মধ্যে যে জাগরণের আলোড়ন আসিল তাহা তাসের ছবির রূপকের ভিতর দিয়া কবি দেখাইয়াছেন। সে দেশের লোকেরা প্রাচীন চাল ও নিয়ম কানুন লইয়াই ব্যস্ত। 'বেড়ার নিয়ম ভাঙলেই পথের নিয়ম বেরিয়ে পড়ে'—এই নূতন শিক্ষা সে দেশ শুনে নাই, তাই বিদেশীরা তাস-দেশের অন্তঃপুরে সাড়া দিতেই জাগরণ পাকা হ'তে লাগলো। তাসের রাজা 'বাধ্যতামূলক' আইন চালাতেই নারীমহলে 'অবাধ্যতামূলক বে-আইন' আরম্ভ হইল। উৎপাত আরম্ভ হইতেই ক্রমে তাসের দেশে অশান্তি দেখা দিল। নূতন শিক্ষায় বলিল—

'শান্ত যেই জন
যম তারে ঠেলে ঠেলে
নেড়ে চেড়ে যায় কেবল,
বলে তোর নাহি প্রয়োজন।'

অবশেষে তাসের দেশের লোকেরা ইচ্ছামন্ত্রে নড়া-চড়া আরম্ভ করিল। দুইখানি দৃশ্যে গান ও কথার মধ্য দিয়া কবি এই নাটিকাখানি মূর্তিমতী করিয়াছেন।

বাঁশরি

নাটকখানি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তৎপূর্বে ঐ সালের ভারতবর্ষ পত্রিকার কার্তিক হইতে পৌষ মাসের ভিতর দিয়া ইহা ধারাবাহিক মুদ্রিত হইয়াছিল। তিন অঙ্কে নাটকখানি সমাপ্ত গানে আধুনিকতার নমুনা—

'বলেছিল ধরা দেব না, শুনেছিল সেই বড়াই।
বীরপুরুষের সয়নি গুমোর, বাধিয়ে দিয়েছে লড়াই' ইত্যাদি।

লেখায় আধুনিক প্রকাশভঙ্গীর একটা নমুনা—'আয়ু পশ্চিমের দিকে এক ডিগ্রি হেলেছে'। বিলাত ফেরৃতা আধুনিক সিভিলিয়ান সমাজের টি-পার্টি, এনগেজমেণ্ট, স্ত্রীপুরুষের অবাধ মেলা-মেশা, প্রেসেনটেশন, সাহিত্যচর্চা, সংলাপ, ভোজ ইত্যাদি লইয়া বাঁশরি, ক্ষিতীশ, পুরন্দর, সোমশংকর প্রভৃতির একটা অস্পষ্ট জটলা।

শ্রাবণগাথা

কবিতায় ও গানে বিরচিত একখানি বাদল-গান। কবি বলিতেছেন বসন্তের পাখি গান করে, বর্ষায় পাখি উড়ে চলে। 'বর্ষার সবটাইতো কান্না নয়, ওতে আছে ঐরাবতের গর্জন, আছে উচ্চৈঃশ্রবার দৌড়।' শ্রাবণগাথা ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হইয়া ১১ই ও ১২ই অগস্ট তারিখে শান্তিনিকেতনে নৃত্যগীত সংযোগে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

পরিশোধ

নাট্যগীতিখানি 'কথা ও কাহিনী'র পরিশোধ নামক পদ্যকাহিনীটিকে নৃত্যাভিনয় উপলক্ষ্যে নাট্যীকৃত করা হয়েছে। সমস্তই সুরে, ইহার তারিখ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস। শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছাত্রীদের ও অন্যান্য শিল্পীদের সহায়তায় ১০ই ও ১১ই অক্টোবর তারিখে ইহা ভবানীপুরের আশুতোষ কলেজ হলে মঞ্চস্থ হয়। ঐ সালের কার্তিকের প্রবাসীতে 'পরিশোধ' নাট্যগীতি আগাগোড়া মুদ্রিত হইয়াছিল। বস্তুত উক্ত নাট্যগীতিতেই 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের আদি সূচনা। এখানির আখ্যান-অংশ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থের মহাবস্তুবদান-অংশে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে গৃহীত।

বজ্রসেন বণিক অনেক সন্ধানে ইন্দ্রমণির হার সংগ্রহ করেছে এবং যাকে সে পরাতে চায়, তাকেই খুঁজে বের করবে। বন্ধু বলিল এই হারের প্রতি রাজার চরের লক্ষ্য আছে। কোটালের চর তাকে ধরতে এলে সে ছুটে পালাল। শ্যামা রাজনটী বিখ্যাত সুন্দরী, তার প্রেমে পাগল বালক উত্তীয়। শ্যামা বজ্রসেনের দেবকান্তি মূর্তি দেখে মুগ্ধ। উত্তীয় শ্যামার আদেশে বলিল, ন্যায়-অন্যায় বুঝি না ঐ বিদেশীর নামের অভিযোগ আমি নিজে স্বীকার করে প্রাণ দেব—সেই মৃত্যুর বন্ধনেই তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে। প্রহরীর দ্বারা কারাগারে তার মৃত্যু হ'ল। বজ্রসেন ও শ্যামার মিলন সম্ভাবিত হইল। বজ্রসেন কিন্তু কি উপায়ে তাহাকে প্রহরীর কাছ থেকে উদ্ধার করিল, এই প্রশ্নের উত্তরে জানিল যে তার জন্য উত্তীয় প্রাণ দিয়েছে, তখন বজ্রসেন শ্যামাকে সাংঘাতিক আঘাত করে চলে গেল। কিন্তু শ্যামার প্রতি প্রেম সে ভুলতে পারলে না। শ্যামাকে ডাকতে লাগল মৃত্যুলোক থেকে। সেই আহ্বানে শ্যামা হঠাৎ আবির্ভূত হ'য়ে বললে—'তোমার নিষ্ঠুর আঘাতের

মধ্যেও করুণা ছিল, আমি মরণের দ্বার থেকে তোমার কাছে ফিরে এসেছি।' বজ্রসেনের মনে ধিকার জাগ্‌ল। বল্‌লে 'চলে যাও'। শ্যামা প্রণাম করে চলে গেল।

শ্যামা

নৃত্যনাট্যখানি ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের অগস্ট-সেপ্‌টেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বেই ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ ও ৮ তারিখে নাটিকাটি কলিকাতার শ্রীরঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল।

মুক্তির উপায়

রবীন্দ্র রচনাবলীতে বলা হয়েছে যে এই প্রহসনটি 'অলকা' মাসিক পত্রের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতে (১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্‌টেম্বর-অক্টোবর মাসে) মুদ্রিত হইয়াছিল। গল্পগুচ্ছের 'মুক্তির উপায়' গল্পটি অবলম্বনে প্রহসনটি রচিত, ইহার অভিনয়-সংবাদ নাই। কবির লেখার মুন্‌সীয়ানা থেকে এখানি বঞ্চিত হয় নি, দৃষ্টান্ত—দ্বিতীয় গুরুধাম দৃশ্যে ফকিরের সঙ্গে পুষ্পর প্রবেশ এবং গুরুর প্রশ্নের উত্তরে পুষ্প বলিলেন—"ভুল বুঝছেন। আমি ছাই ফেলবার ভাঙা কুলো হয়েই এসেছি। এই আমার সঙ্গে যাকে দেখছেন, এত বড়ো বিশুদ্ধ ছাইয়ের গাদা কোম্পানি মুল্লুকে আর পাবেন না। কোনোদিন ওঁর মধ্যে পৈত্রিক সোনার আভাস হয়তো কিছু ছিল—গুরুর আশীর্বাদে চিহ্ন মাত্রই নেই।" তৃতীয় দৃশ্যে ষষ্ঠীচরণ পুষ্পর কথাবার্তায় পুষ্প বল্‌ছে—"খবর নিয়েছি পাড়ায়, তোমার নাতি মাখন পলাতক সাত বছর থেকে—সংসারের দুনলা বন্দুক লেগেছে তার বুকে, দুঃখ এখনো ভুলতে পারে নি। একটা বিয়ে করলে পুরুষের পা পড়ে না মাটিতে, তোলা থাকে স্ত্রীর মাথার উপরে; আর দুটো বিয়ে করলেই দুজোড়া মল বাজ্‌তে থাকে ওদের পিঠে, শিরদাড়া যায় বেঁকে।" চারটি দৃশ্যে 'মুক্তির উপায়' সম্পূর্ণ। সন্ন্যাসী গুরুকরণের নেশায় সংসারে যে অনর্থ ঘটে তাহার চিত্র ইহার মধ্যে হাসির তরঙ্গ তুলিয়াছে। ফকির ও মাখন মুক্তির উপায় অন্বেষণে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিল শেষ দৃশ্যে পুষ্পর কৃপায় তাহাদের ছাড়া ঘরে যথার্থ মুক্তির উপায় মিলিয়া গেল। কি করিয়া তাহা ঘটিল প্রহসনের পাঠকরা বলিয়া দিবেন। দুইখানি গান যথাস্থানে স্থান পাইয়াছে। কি বাক্যবিন্যাসে, কি সংলাপের কৌশলে প্রহসনকার এখানির মধ্যে নূতন পথের যথেষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন।

নাট্যসাহিত্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের কাল (১৮৯৪—১৯২৬ খৃষ্টাব্দ)

ক্ষীরোদপ্রসাদ গৈরিশযুগের একজন প্রভাবশালী নাট্যকার ছিলেন। গিরিশ-ব্যতিরিক্ত রঙ্গমঞ্চে ইঁহার নাটকগুলি অভিনীত হইয়াছে। নাটকের তৎকাল প্রচলিত গড্ডালিকা স্রোতে গা' ভাসাইলেও নাটককার বৈশিষ্ট্যবিহীন নহেন, পরবর্তী নাটকীয় বিশ্লেষণে তাহা কথিত হইয়াছে।

কাহিনীর চমৎকারিতা ও রহস্যাবৃত বিষয়বৈচিত্র্য ক্ষীরোদপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য। সকল স্থলে ঐগুলি যে ত্রুটিশূন্য হয় নাই, বিশ্লেষণের মধ্যে তাহার উল্লেখ আছে। দেশাত্মবোধ-প্রধান নাটকগুলির মধ্যে যুগাবেদন যথেষ্ট আছে, কিন্তু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সর্বত্র পাওয়া যায় না। ভাবের অগভীরতা

তাঁহার অনেকগুলি নাটকে দেখা গিয়াছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব খুব কম নাটকেই আছে। ভাষার রমণীয়তা প্রায়ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে এবং সর্বত্রই উহা ভাবের দ্যোতক, আড়ষ্টতা নাই বলিলে চলে।

নাটক, নাটিকা, প্রহসন সকল বিভাগেই ক্ষীরোদপ্রসাদ হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং যেখানে যাহা কিছু নূতন পাওয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ পশ্চাৎ লিখিত তালিকার মধ্যে পাইবেন।

অন্তর্দ্বন্দ্ব পূর্ণ সংলাপ যে নাটকের প্রাণ তাহা শেষজীবনে ক্ষীরোদপ্রসাদ নাট্যচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সংস্পর্শে আসিয়া ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাঁহার লিখিত সংলাপে কাজের কথা ছাড়া বাজে কথার ফোড়ন নাই বলিলেই চলে।

ফুলশয্যা

নাট্যকারের প্রথম নাটক, অধিকস্থানে অমিত্রাক্ষর ছন্দে ও অল্প স্থানে গদ্যের মাধ্যমে লিখিত হইয়াছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২রা যে তারিখে প্রকাশিত এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অগস্ট তারিখে এমারেল্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ছন্দের সাবলীল গতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। নাট্যকবি তখনও ভাষার উপরে ছন্দের মোহজাল সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। নূতন প্রকাশভঙ্গীর নমুনা এইরূপ :—(তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য)

"জীবন ফুলের তোড়া—স্তবকে স্তবকে
আশা ফুল ফুটে তার শিরে—শুকাইয়া
যায়, কিন্তু পড়ে নাত ঝরে।"
"এ হৃদয় মন্দারের শীত-
ছায়াতলে ক্ষুদ্র বালিকায় দিয়াছ যে
মহাবাহু পাশে বেড়ি, বিপুল উরস—
বর্ম্মে দিয়ে আচ্ছাদন, ক্ষুদ্র বালিকার
রেখ' প্রাণ।"

এই দুইটি মাত্র দৃষ্টান্তে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহাতে বুঝা যায় যে এই নবীন নাট্যকার ক্রমশ ক্ষমতাশালী নাট্যকার হইবেন।

পৃথ্বীরাজ ও সঙ্গরাজের ভ্রাতৃবিরোধিতাকে কেন্দ্র করিয়া এ নাটকের নাট্যক্রিয়া এক কুহেলিকা জালের ভিতর দিয়া কিরূপে তাহাদের মিলনে পর্যবসিত করিল তাহারই ছবি অস্পষ্টতায় পাঠক বা দর্শকের চিত্তকে নিপীড়িত করিয়াছে। তারা, বীণা, কমলার জাতিরূপ (type) উপভোগ্য। নাটকের গানগুলি কৃত্রিমতাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। নাটকের ফুলশয্যা নামকরণের সার্থকতাও স্পষ্টীকৃত হয় নাই।

প্রেমাঞ্জলি

নাটিকাখানি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই তারিখে প্রকাশিত, কিন্তু অভিনীত হইবার সংবাদ নাই। মহাভারতীয় শান্তিপর্ব হইতে ইহার আখ্যানভাগ সংগৃহীত। প্রাচীন বাঙ্গালা নাটকের অঙ্ক-দৃশ্য ভেদ প্রথা এ নাটিকায় অনুসৃত হইয়াছে। গদ্যের মাধ্যমে এখানি বিরচিত। নূতনতর প্রকাশভঙ্গী স্থানে-স্থানে আছে, তাহাদের দুই-একটি নমুনা এইরূপ :—(১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য) 'মর্ত্ত্য-

ভোগের প্রধান ফল হচ্চে নারী। তবে এমন ফল পাছে পচে যায়, এইজন্য ভগবান তার ভিতরে একটু প্রাণ দিয়ে রেখেছেন।' (১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)—'জীবনীশক্তি নিয়ে বয়স নির্ণয়। যার জীবনী-শক্তিতে সহস্র সহস্র প্রাণ অনুপ্রাণিত সে যুবা, না যে নিজের প্রাণ নিজে রক্ষা করতে পারে না সে যুবা।' নাট্যকার এই নাটকের উৎসর্গপত্রে বলিয়াছেন—'শান্তিপর্ব্বের একস্থানে নারদের দুর্দ্দশার কথা লেখা আছে। সেই মূল সূত্র ধরিয়া মনের সাধে যথেচ্ছ লিখিয়া নারদকে বানর নাচাইয়াছি। কাজটা গর্হিত হইয়াছে, কিন্তু কি করি বাঙ্গালা নাটকে নাচ না থাকিলে নাটকত্ব হয় না।' নাট্যকার অরসিক পর্বত মুনিকে ও প্রেমিক নারদমুনিকে ঘটনাচক্রের আবর্তনে মর্ত্ত্যের নারীমূর্ত্তিরই পদতলে প্রেমাঞ্জলি অর্পণ করাইলেন। ইহার আভ্যন্তরিক রঙ্গরস অত্যুক্তিদোষে কটুত্বে পরিণত হইয়াছে। প্রেমনিবেদনটি জটিলতার মধ্যদিয়া রস পরিবেশনে বাধা পাইয়াছে। ইহার সুকুমারী, রমা, জনার্দন, ললিতা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য লইয়া মূর্ত্ত। গানগুলি মহাজন পদাবলীর ভিতর দিয়া মধুর। নাটিকাকার এই নাটিকাতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে 'বিধাতার বিধানে যে দিন কঠোরতা ঘুচিয়া প্রাণে রস প্রবিষ্ট হইল, সেই দিন থেকেই নারীর সৃষ্টি ও সংসার আনন্দময় হইয়াছে, প্রকৃতি তাই বিশ্ব-বিজয়িনী।'

আলিবাবা

ইহাকে দৃশ্যকাব্য প্রণেতা রঙ্গনাট্য বলিয়াছেন, কিন্তু এটি নাটিকা জাতীয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর তারিখে ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে ইহা প্রথম অভিনীত হইয়াছে। আরব্য উপন্যাস হইতে ইহার গল্পাংশ গৃহীত হইলেও কল্পনার উপঢৌকনে নূতন সাজে ইহা দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। নাচ-গান ও হাল্কা রস-রসিকতার ভিতর দিয়া রূপায়িত হইয়া এই নাটিকা পাঠক অপেক্ষা দর্শক সমাজের মধ্যে এককালে বিশেষ সাড়া তুলিয়াছিল। ইহার সংগীত বিভাগে নাট্যকার ব্যতিরিক্ত গিরিশচন্দ্র, অতুলকৃষ্ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গীতরচয়িতাদের অবাধ হস্তক্ষেপ ছিল। নাটিকার গীতবাহুল্য নৃত্যছন্দে দোলায়িত হইয়া তখনকার নাটকপ্রধান রঙ্গমঞ্চে এক নূতন আব্‌হাওয়ার সৃষ্টি করিয়া দর্শকসংখ্যা দিন-দিন বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। গানগুলির বাণী ফারসী, উর্দু, হিন্দী ও বাংলা মিশ্রিত হইয়া নূতন ভাবলোক গড়িয়া তুলিয়াছিল, যদিও আবুহোসেনে গিরিশচন্দ্র ইহার পথিকৃৎ ছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ এ নাটিকায় তাহার উৎকর্ষতা আনিয়াছেন। আলিবাবা ও ফতিমা পরস্পরের মধ্যে সম্বোধনে নিচুদরের রস-রসিকতার একঘেয়েমি দেখা যায়, কোন কোন দর্শক বা পাঠক উহা বিরক্তিকর মনে করেন। সংলাপ ও স্বগতোক্তির বাণীগুলি যেন ওজন করিয়া বসানো হইয়াছে, কতকগুলি আন্তরিকতাপূর্ণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মর্জিনা ও হুসেনের সংলাপটি এই জাতীয়।

"হুসেন—দেখ মর্জিনা, আজ আমার যে আনন্দ—
মর্—তবে এস, তোমায় একটু সরবৎ খাইয়ে দিই।
হুসেন—দেখ মর্জিনা—
মর্—তা হলে সিরাজি
হুসেন—আল্লার কিরে, আমি আহ্লাদে চোখে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না।
মর্—ওঃ, তা হ'লে দেখছি—কাঁজি।"

কাশিম মোহর লইয়া বাড়ীতে না ফেরায় উদ্বেগ-আশঙ্কার মধ্যে সাকিনা, আলি ও মর্জিনার যৌথ সংগীতটির হট্টগোল অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করিয়াছে। এখানে গানটি না দিলেই ভাল হইত, তবে ঐটি সাকিনা বিবির ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত হইলে অন্য কথা। মোট ৩৬ খানি গান আলিবাবার প্রাণ। সুরে বাজিয়া উঠিয়া নৃত্যে যখন দুলিতে থাকে তখনই তাহার প্রকৃত সাড়া পাওয়া যায়।

প্রমোদরঞ্জন

নাটিকাখানি রঙ্গরসের মধ্যে রূপায়িত হইলেও কেন্দ্রগত গাম্ভীর্য হারায় নাই। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে বেঙ্গল থিয়েটারে ইহা অভিনীত হইয়াছিল। নাট্যকার ইহাকে রঙ্গনাট্য বলিয়াছেন। প্রথমেই অদৃষ্ট বালিকাদের প্রস্তাবনা সংগীত আছে, এটি মন্দ নহে। ফুলশয্যা নাটকের অমিত্রাক্ষরে অকৃতকার্য হইয়া নাট্যকার এখানিকে গদ্যের মাধ্যমে প্রকাশিত করিয়াছেন। নূতন প্রকাশভঙ্গী দুইটির নমুনা এইরূপ:—(১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) (বুড়ী জয়ন্তীকে দেখিয়া) 'সে কথা শুনতে তোর পেরুমাইয়ে কুলুলে হয়।' (৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) "হ্যাঁ ভাই, সর্বব্যাপী ঠাকুর, চৌদ্দভুবনে যার বিরাট অঙ্গ কুলিয়ে ওঠে না, সে কোথায় পালিয়ে যাবে বল্‌তে পারিস্‌। পৃথিবীর নদী সাগরে যায়, সাগর কোথায় যায়? আমার ঠাকুরের কি পালাবার যো আছে, সে আপনার জালে আপনি বাঁধা।"

প্রমোদ অকৃতজ্ঞ সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া প্রাণের বন্ধু রঞ্জনের সহিত নিজ রাজ্য অবন্তীপুর হইতে হিমালয় প্রদেশে প্রস্থিত হইল। ঘটনাচক্রে বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটিলেও উভয়ের প্রাণের টান রহিয়া গেল। নরদ্বেষী বন্ধুদ্বয়কে শিক্ষা দিবার জন্য হিমালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জয়ন্তী এক মায়াজালের সৃষ্টি করিলেন। কিরূপে ঐ মায়াজাল ছিন্ন করিয়া প্রমোদ শান্তি ও রঞ্জন মুক্তি লাভ করিয়াছিল নাটকের পাঠক বা দর্শক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। সংগীত বিভাগে নাটিকাকার পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। কতকগুলি সংগীত বিখ্যাত হইয়াছিল। তিন অঙ্কে নাটিকাখানি সমাপ্ত।

কুমারী

নাট্যকাব্যখানি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ও তৎপূর্বে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল, অভিনয় তারিখ সংগৃহীত নাই। নাট্যকার প্রাচীন পদ্ধতির বাঙ্গালা নাটক রচনার পক্ষপাতী, তাই তাঁহার অধিকাংশ নাটকে প্রস্তাবনার হিড়িক্‌ দেখা যায়। প্রকাশভঙ্গীর নূতনত্ব ইহাতেও আছে, যেমন (দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে) প্রাণ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া দীনদাস লক্ষ্মীকে বলিয়াছে—'প্রাণ বড় নটখটী বউ, বড় নটখটী—বড় ঝঞ্ঝাট আমি তোরে বোঝালুম, তুই আমাকে বোঝালি, সে ত বুঝ্‌বে না—সে পরের ছেলে, কিছুতেই প্রবোধ মানে না। তারে রাখ্‌তে হ'লে ত খোরাক চাই।' লক্ষ্মী তদুত্তরে বলিল—'তা হ'লে কি কর্‌বি?' দীন বলিল—'যেখান থেকে এসেছে সেইখানে পাঠিয়ে দেব।' (দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে) দেবকন্যার মর্ত্যে আসা সম্বন্ধে সংলাপের একস্থানে আছে—'ভুলে গিয়েছ কমলের অবস্থান পঙ্কে, গোলাপের অবস্থান কণ্টকে। দেবনন্দিনী কক্ষচ্যুত তারকার মত সমীরে সাঁতার দিয়ে এই মহা আকাশ-সাগরের এ কূলে উপস্থিত হয় না, তার আগমন অন্য পথে। সেই মহাপথ ব্যতীত দেবতার মর্ত্যে আস্‌বার অন্য উপায় নেই। সে মহাপথ মাতৃগর্ভ।'

নাট্যকার ব্রাহ্মণ ও গুরুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলি ক্রমশ কুসংস্কারে পরিণত হইয়া হিন্দুসমাজের কিরূপ অনিষ্টসাধন করিয়াছে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র ভেদে বর্ণগত

জাত্যাভিমান সমাজের মধ্যে অস্পৃশ্যতা দোষ আনিয়া দিয়া প্রায়শ্চিত্তবিধান প্রভৃতি দ্বারা কিরূপে জাতিকে অধঃপাতে লইয়া যাইতেছে 'কুমারী' দৃশ্যকাব্যখানি যোগশাস্ত্রকার নাস্তিক চূড়ামণি পতঞ্জলির মতবাদ লইয়া ঐ সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু সফলতা লাভ করে নাই, কারণ সংঘাতগুলি প্রত্যক্ষ না আসিয়া পরোক্ষভাবে আসিয়াছে। দৃশ্যকাব্যখানি নাটক হিসাবে তাই দাঁড়ায় নাই।

জুলিয়া

নাটকখানি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত কিন্তু তৎপূর্বে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে ইহার প্রথম অভিনয় হইয়া গিয়াছিল। বোগ্‌দাদের কালিফ হারুন-আল্‌-রশীদ অপত্য নির্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন এই কিংবদন্তী এই নাটকে সার্থক হইয়াছে। 'ঈশ্বর' যা করেন মঙ্গলের জন্য আজির নির্দেশিত এই মহাবাক্য জুলিয়া, গানেম, বাহার, আবদুল প্রভৃতি প্রত্যেকের জটিলতাপূর্ণ সংকট-বহুল জীবনপথকে কিরূপে জয়যুক্ত করিয়াছিল তাহা এই নাটকের আভ্যন্তরীণ রূপ। নাটকের ঘাত-প্রতিঘাতগুলি নির্ঘাতভাবে সম্পাদিত হয় নাই, কেমন একটা অতিশয়োক্তি ও মন্থরতার ভিতর দিয়া ইহা পরিচালিত হইয়াছে যে তাহাতে দর্শক বা পাঠক নিরঙ্কুশ আনন্দলাভ করিতে পারেন নাই। এটি নাট্যকারের বিন্যাস দোষেই ঘটিয়াছে। গদ্যের মাধ্যমে ইহা প্রকাশিত। বাঙ্গালার সহিত ফার্‌সী ও উর্দু শব্দ কি সংলাপে কি সংগীতে সর্বত্র দেখা গিয়াছে। চরিত্র হিসাবে জুলিয়া মানবী, গানেম আদর্শবাদী, বাহার খেয়ালী ও কৃতজ্ঞ, আবদুল দুর্জ্ঞেয় মায়াবী।

বভ্রুবাহন

নাট্যকাব্যখানি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তৎপূর্বে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে অগস্ট তারিখে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। নাট্যকার ইহার অন্তর্গত নাগরাজ অনন্ত ও নাগ কন্যা উলূপীর কথাবার্তার মধ্যে বিচিত্র প্রকাশভঙ্গী প্রবেশ করাইয়া একটা বিজাতীয় অনার্যগন্ধ প্রবাহিত রাখিয়াছেন, এবং তাহাই নাটকটার একটা বৈশিষ্ট্য হইয়াছে। নাটকের একটি প্রকাশভঙ্গী এখানে উদ্ধৃত হইতেছে, সেটি কি চমৎকার! বভ্রুবাহন ও চিত্রাঙ্গদার সংলাপের মধ্যে অর্জুন কেন চিত্রাঙ্গদাকে মণিপুর রাজ্যে একবার দেখিতে আসিবেন না সেই আশা সম্বন্ধে বভ্রুবাহনের প্রশ্নের উত্তরে চিত্রাঙ্গদা বলিতেছেন—(প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে) "বালক! জীবনের বহুদিন অতিবাহিত করে দিয়েছি, আশার প্রবল প্রবাহে পলকে পলকে উত্থিত নিপতিত হয়েছি। এখন নিরাশার অবসাদ। সুখী আছি। জননীত্বে অধিকারিণী নই, এতকাল তোমাকে পালনও তো করেছি, তার এ পুরস্কার কেন? এ বিষম শত্রুতা কেন?" নাটকখানি তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত, নাট্যকার সমান চালে শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ইলাবন্ত ও বভ্রুবাহনের সংলাপে ভ্রাতৃস্নেহ, পিতৃভক্তি, ক্ষাত্রধর্ম, মাতৃআজ্ঞা যুগপৎ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া শিশু মস্তিষ্কে প্রৌঢ়ের বিচারণা আনিয়া দিয়াছে। নাট্যকারের মাত্রাজ্ঞান ভাব বন্যায় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। অস্পষ্টতার ভিতর দিয়া নাটকের উপসংহার করা হয়েছে। অর্জুনের নিধন ও পুনর্জীবন লাভ, মৃত ইলাবন্তের বালকরূপী কৃষ্ণসহ পুনরাবির্ভাব কুহেলিকার আবরণে ঢাকা পড়িয়াছে।

১৪ খানি গানের মধ্যে—"পাখি! এই যে গাইলি গাছে। কেন চুপ দিলি, ঝোপে ডুবে গেলি, এসেছি যেমন কাছে। এখনো ফোটেনি তারা, এখনো সুধার ধারা ঝরেনিক পাখী ধরণীর গায় আকাশেই ভরা আছে।"—এই গানখানি আজও যেন রঙ্গভূমির প্রেক্ষাগৃহ হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে শুনা গিয়া থাকে, এমনি তাহার প্রভাব! বাকিগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। একটা স্থান ছাড়া সবটাই গদ্যের মাধ্যমে লেখা।

সপ্তম প্রতিমা

নাটকখানি ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাটকের মধ্যে প্রস্তাবনা (prologue) রাখিবার ঝোঁক ক্ষীরোদপ্রসাদ ত্যাগ করিতে পারেন নাই, এ নাটকখানি তাহারই একটি নিদর্শন। একটা অলৌকিক স্বপ্নবৃত্তান্ত ইহার ক্রিয়াকলাপ। দৈবীশক্তি সম্পন্ন পদ্মনাভ নামীয় ব্রাহ্মণ ইহার অধিনায়ক এবং কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠীপুত্র মিহির ও মন্দুরার শ্রেষ্ঠীকন্যা ছায়া যথাক্রমে ইহার নায়ক-নায়িকা।

পুরুষোত্তমের শেষ উক্তির মধ্যে নাটকের সমস্যা-পূরণের চেষ্টা হ'য়েছে, তাহা এইরূপ:—"—বুঝলুম এ সংসারে ঋণ পরিশোধ হয় না। জননী সত্যবতী, আমি এখনও আপনার নিকট ঋণী; জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রত্যুপকারের প্রয়াস পেলেও স্বর্গীয় গোকুলচাঁদের প্রথম উপকার বলবান থাকবে।" পদ্মনাভ এই কথার উত্তরে বলিলেন—'বিষম সমস্যা! যখন ঋণই স্বীকার কচ্চ না তখন আর পরিশোধের কথা কি করে তুলি? প্রকৃতি চিরদিনই কৌশলময়ী—প্রকৃতি সর্বত্রই বিজয়িনী।' কেমন একটা প্রহেলিকার আবরণের ভিতর দিয়া নাটকখানির গতি পরিচালিত হইয়াছে, তাই বিজ্ঞানের অধ্যাপক নাট্যকার হইয়াও শেক্সপীয়রের মতো মধ্যযুগীয় কিমিয়া শক্তির খেলা দেখাইয়া লইলেন ও সপ্তম প্রতিমার অলৌকিক রহস্যও যথাস্থানে উদ্‌ঘাটিত করিলেন। গদ্যের মাধ্যমে এই মিলনাত্মক নাটকখানি লিখিত। স্রোতোবেগ স্থানে-স্থানে মন্থর হইলেও অনুপভোগ্য হয় নাই।

নূতন প্রকাশভঙ্গীর দুই-চারিটি নমুনা—(২য় অঙ্কের ১ম দৃশ্য) মাতার সহিত সংলাপের একাংশ—'তুমি আমার মা'তো বোন, আর আমি তোমার বাবা'তো ভাই।' 'বন্ধু—বন্ধু কি? হাঁ হাঁ বন্ধু বলা যেতে পারে বটে। জগৎপতি হরিকেও ত লোকে দীনবন্ধু বলে। গোকুলচাঁদ আমার সেইরূপ বন্ধু ছিলেন।' (৪র্থ অঙ্কের ১ম দৃশ্য)—'পুত্রের কর্তব্যপালন কত্তে গিয়ে আমি পুরুষের কর্তব্যে উপেক্ষা করেছিলুম।' (৫ম অঙ্কের ৪র্থ দৃশ্যে)—'আপনি অনেকক্ষণ ধরে বাতাসের সঙ্গে কথা কচ্চেন কি না তাই বল্‌ছিলেম। বাতাসটা মুটে মজুর বৈত নয়—আপনার কথা বয়ে এনে আমার কাণে পৌঁছে দিতে পারে আর আমার কথা ঘাড়ে করে নিয়ে গিয়ে আপনার কাণে তুলে দিতে পারে—ওর সাধ্য কি যে আপনার মহা নিগূঢ় প্রশ্নের উত্তর দেয়। তার ওপর আপনি বড় বড় সমাস সন্ধির বোঝায় বেচারীকে এমন ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন যে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গিয়ে সে আমার ছোট্ট কাণটির ভেতর লুকিয়ে পড়্‌ল।' 'আমি ত মন লোহায় বেঁধেছিলুম—বেঁধে পালিয়েছিলুম। কিন্তু চোখের চুম্বকে টান্‌লে, রূপের বিদ্যুতে গলালে।' এই প্রকাশভঙ্গীগুলির নূতনত্ব ইতঃপূর্বের নাট্যসাহিত্যে দেখা যায় নাই! ইহাতে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও কবিত্ব একসঙ্গে পরিবেশিত হইয়াছে।

ইহার খাণ্ডারী, ঢুণ্ঢিরাম, হরজনদাস তিনটি চরিত্রই নাট্যসাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। নাট্যকারের এ নিপুণতা উল্লেখযোগ্য। গজুয়া চরিত্রটিও লক্ষণীয়। (তৃতীয় অঙ্কের ২য় দৃশ্যে) মায়া ও গজুয়ার

সংলাপের মধ্যে গজুয়ার—'দেখ খাওয়া ছাড়া আমার আর কোনও কথা মনে থাকে না,—এই শুনি এই ভুলে যাই, সদাই অন্যমনস্ক। একদিন শুনবে তবে? এই গরুর গামলায় জাব্‌না দিতে গিয়ে ভুলে নিজের গালেই পুরতেছিলুম, পাঁচ সাত গরাস মুখে পোর্‌বার পর যখন আর মুখে ধরে না, তখন হঁস্ হ'ল যে তাইতো কর্‌চি কি? এ যে সড়্ সড়্ করে ওলেনা গলায় বাদে।' সংলাপের এই সামান্য অংশেই গজুয়াকে স্পষ্ট চেনা যায়। নাটককারের ইহাই বাহাদুরি।

সংগীত বিভাগে নাট্যকার নাটকীয় চরিত্রের মনোভাব অনুযায়ী গান রচনা করিয়াছেন। বৈশিষ্ট্য এই পাত্র ভিন্ন অন্যের মুখে উহা গাওয়াইলে মানাইবে না, এমনি গানের নিপুণতা।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ছায়ার সহিত পুরুষোত্তম ও রঙ্কিণীর পুনর্মিলনটি নাটকীয় ভাবে সম্পন্ন হয় নাই।

সাবিত্রী

পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত নাটক। এই পৌরাণিক দৃশ্যকাব্যখানি ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাট্যকার এই গাম্ভীর্যপূর্ণ নাটকখানিকে তুম্বুরু, মালিনীর লঘু রসালাপপূর্ণ সংলাপের দ্বারা রস বৈচিত্র্য দেখাইতে যাইয়া প্রাচীন নাটকের গতানুগতিকতায় গা ঢালিয়া দিয়াছেন। তাপসকুমারগণের সংলাপে মাত্রাজ্ঞানের অভাব দেখা গিয়াছে। মহাভারতীয় যুগের সাবিত্রী-সত্যবানের কথার মধ্যে উনবিংশ শতকের বিদ্যাসাগরীয় উপক্রমণিকার কথা পাড়িয়া ভূয়োদর্শনের পরিচয় দেন নাই। নাট্যকারের ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণের বহু নিদর্শন নাটকখানির মধ্যে পাওয়া যায়। গদ্যের মাধ্যমে লিখিত হইলেও ভাষার শুদ্ধি ও কাব্যশাস্ত্র মন্থন করিয়া সংস্কৃত শ্লোকের প্রাবল্য নাটকখানিতে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে।

লিরিক্ কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোন কোন দৃশ্যকাব্যে সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাপারে ক্ষীরোদপ্রসাদের মতো কার্য করিয়াছেন, তবে সময়ের তারতম্যে ও উপযোগিতার তাগিদে সেগুলি রবীন্দ্রনাথের হাতে অনবদ্য রূপ ধারণ করিয়াছিল। সাবিত্রী নাটকের গানগুলি মধুর না হইলেও দর্শক বা পাঠকের অতৃপ্তি আনে নাই।

বেদৌরা (অপেরা)

নাটিকাখানি ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। আরব্য উপন্যাসের এক কাহিনীকে নাটিকায় রূপান্তরিত করা হইয়াছে, এখানি মিলনাত্মক কমেডি। বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক খালেদান রাজকুমার কমরলজমান ও সৌন্দর্যের গর্বে স্ফীতা বলিয়া বিবাহে অসম্মতা চীনদেশীয় রাজকুমারী বেদৌরা যথাক্রমে দানহাস অপ্সর ও মৈমুনী অপ্সরা কর্তৃক জাদুবলে কিরূপে পরস্পর সম্মিলিত হইয়াছিল নাটিকা তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে। গদ্যের মাধ্যমে ২০খানি গানে ইহা রূপায়িত। নাট্যসংঘাত অপেক্ষা বর্ণনার কৌশল নাটিকাকার বেশি দেখাইয়াছেন। গানগুলির বাণীতে কিছু নূতনত্বের আস্বাদন আছে, সুরে সেগুলি কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল জানা যায় নাই। পাঁচ অঙ্ক পর্যন্ত এখানি বিস্তৃত। নাটিকাকার পথিক ও উদ্যানপালক চরিত্রদ্বয়ে নূতন জাতিরূপের সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রতাপ-আদিত্য

এই ঐতিহাসিক নাটকখানি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অগস্ট তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। ১৮৯৫ সালে প্রবর্তিত শিবাজী উৎসব ব্যপদেশে বাঙ্গালার স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্রে রাখিয়া বাঙ্গালা রাজনীতি ক্ষেত্রে তখন দেশের মধ্যে যে আলোড়ন আসিয়াছিল রঙ্গমঞ্চের দিক থেকে দেশমাতৃকার পূজায় ক্ষীরোদপ্রসাদের এই প্রথম নৈবেদ্যটি সাধারণে বিতরিত হইয়াছিল। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থখানি ত্রয়োদশ সংস্করণের পাঠ। ইহাতে মূলগ্রন্থের যথেষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আছে। নব পর্যায়ের প্রথম অভিনয় কর্ণওয়ালিস্ থিয়েটারে হইয়াছিল। দেশের শাসক সম্প্রদায়ের অনুশাসনক্রমে সময়ে সময়ে যেরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে, নাট্যকার সেইরূপ পরিবর্তন-সাধন করিয়াছেন।

উপর্যুপরি ঘটনার প্রাবল্যে নাটকখানি ঘটনাবহুল হইয়াছে, অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিবার অবকাশ পায় নাই, তাই নাটকের আসল প্রাণ সংঘাত মুখ্য না হইয়া গৌণ রহিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলনে বঙ্গবীরের কাহিনী সত্য-সত্যই বাঙ্গালীর প্রাণে প্রেরণা জাগাইয়াছিল। প্রাচীন যুগের হিন্দু মেলার প্রেরণায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পর ঐতিহাসিক ব্যাপার লইয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ক্ষীরোদপ্রসাদই প্রথম পথিকৃৎ। নাটকের অভ্যন্তরে দৈবীপ্রভাব প্রবেশ করাইয়া ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালীর মন-প্রাণকে মধুর রসের আস্বাদনের দিক থেকে মুখ ঘুরাইয়া বীররসাত্মক আস্বাদনের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে, এবং ঐ ঘটনাটি চণ্ডীবর ও বিজয়ার দৃশ্যমধ্যে বেশ নাটকীয়ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।

নাটকীয় পরাকাষ্ঠা তৃতীয় অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে চাকৃসিরি পরগণা লইয়া প্রতাপ-আদিত্য ও তাঁহার খুল্লতাত বসন্ত রায়ের বিবাদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। নাটকের বিষাদান্ত পরিণতির বীজ সুকৌশলে এখানেই উপ্ত রহিল। দৈবীশক্তি প্রকাশের আর একটি স্থান পোর্টুগীস্ দস্যু রডার সম্মুখে বিজয়ার সহসা 'মেরী'মূর্তি ধারণ ব্যাপারটায় সংঘটিত। ষোড়শ শতকের ঘটনা লইয়া নাটকের বুনানী কার্যের মধ্যে এরূপ অলৌকিক ঘটনা কি বাঙ্গালার কি ইংলণ্ডের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিরল নহে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এলিজাবেথীয় যুগের শেক্সপীয়রে বা ভিক্টোরিয়া যুগের গিরিশচন্দ্রে ও ক্ষীরোদপ্রসাদে তাহা দেখিতে পাইবেন। নাট্যকার তাঁহার এই গ্রন্থে প্রথম সংস্করণের অনেক দোষ-ত্রুটি পরিশোধিত করিয়াছেন। নাটকখানি আগাগোড়া গদ্যের মাধ্যমে লেখা। ইহাতে প্রাণমাতানো ৮ খানি গান আছে। এককালে এখানি জনপ্রিয় নাটক ছিল এবং শখের থিয়েটারে ইহা বহুবার অভিনীত হইয়াছে।

রঘুবীর

নাটকখানি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। চৌদ্দ অক্ষর অমিত্রাক্ষর ছন্দে ও গদ্যের মাধ্যমে নাটকখানি বিরচিত। উচ্ছ্বসিত ভাষার সংগীতময় ঝংকার যাহা ক্ষীরোদপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য তাহা এ নাটকে উঁকি-ঝুঁকি দিয়াছে। সংগীত বিভাগে চাষার গানে একটু নূতনত্ব আছে, তাহার নমুনা—'বৃন্দে দূতি গো। তোদের কালায় নাকি পেঁচোয় পেয়েছে'—শীর্ষক গানখানি দর্শক বা পাঠক সমাজে বেশ সাড়া তুলিয়াছিল। নাট্যকার কিংবদন্তীকে কল্পনার সৌধে পরিণত করিয়াছেন। গুর্জরের সিংহাসনকে কেন্দ্র করিয়া যে ঝড় উঠিয়াছিল তাহাতে ভীল ডাকাত রঘুয়া দেওয়ান অনন্তরাওয়ের দ্বারা প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে অহিংস

ব্রাহ্মণ্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পাপীকে ক্ষমা করিতে করিতে রঘুবীরে পরিণত হইয়াছিল। অত্যাচার ক্ষমার প্রশান্ত মূর্তির দ্বারা প্রশমিত হইল না, ক্রমশ সর্বগ্রাসী মূর্তি ধরিয়া আরও প্রজ্বলিত হইলে রঘুবীর তখন বাধ্য হইয়া তাহার ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিয়া প্রকৃতিগত ভীল বেশে অত্যাচার-দমন শুরু করিয়া দিল। এই মত-ঘটিত পরিবর্তন এত বিলম্বে আসিল যে তৎপূর্বেই রঘুপতির আশ্রিত অনন্তরাও, বলদেব, সখারাম, পরীবাণু, শ্যামলী ঐ অত্যাচার বহ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছিল।

চরিত্র হিসাবে শ্যামলী ও দুলিয়া বেশ ফুটিয়াছে। রঘুবীর আদর্শবাদে দোলায়িত চিত্ত, তাহার মনোভাব সর্বস্থানে ভাষায় সুব্যক্ত হয় নাই। পরবর্তীকালে সুপণ্ডিত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁহার অভূতপূর্ব অভিনয় দ্বারা রঘুবীরের নাট্যাংশগত ত্রুটি তাহার রক্তমাংসল মূর্তিতে ক্ষালিত করিয়াছেন। ইহা চোখে দেখিবার জিনিস, ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে। পরীবাণু কুসুমের মতোই প্রস্ফুটিত হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। ইহার চারিখানি গানের মধ্যে দুইখানি প্রসিদ্ধ।

এই ট্রাজেডিখানি নাটকোচিত গুণে নহে, অভিনয়গুণে দর্শককে আনন্দ দিয়াছে।

বৃন্দাবন-বিলাস

নাটিকাখানি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের গোপন বৃন্দাবন বিলাস ইহার উপজীব্য। নৃতনত্বের মধ্যে গান ও মহাজন পদাবলীর সাহায্যে ঘটনাবলিকে নাটিকায় রূপায়িত করা হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের মিলনের বাধা বৃন্দার সহায়তায় কখনো কৃষ্ণের দেয়াশিনীর ছদ্মবেশে কখনো বা কালীমূর্তির অন্তরালে ঢাকা পড়িয়াছে। কুটিলা, আয়ান ও জটিলার পুরাতন রূপের কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। চারি অঙ্কে নাটিকাখানি সম্পূর্ণ।

রঙ্গাবতী

নাটকখানি কিংবদন্তী-মূলক সামাজিক, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে ইহা প্রথম অভিনীত হইয়াছে। সুন্দরী যুবতী রঙ্গাবতী বৃদ্ধ নয়নসেনকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্যের সমর্থন হিসাবে দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে স্বামী-স্ত্রীর সংলাপের মধ্যে স্ত্রী বৃদ্ধ স্বামী সম্বন্ধে এইরূপ নূতন প্রকাশভঙ্গী দিয়াছেন :—"প্রজার সুখ যার একমাত্র কামনা, অনন্তকীর্তি স্বামীর মঙ্গলময় মূর্তিই সে রমণীর চির আকাঙ্ক্ষিত যৌবনরূপ। মহারাজ! আমি আজ সে ভাগ্যে ভাগ্যবতী। * * কিন্তু মহারাজ। রঙ্গাবতীর ক্ষণভঙ্গুর দেহ মৃত্তিকাসাৎ হ'লেও অনন্ত কালের মধ্যে একটি মাত্র দিনের জন্যও তাকে স্বামি-বিয়োগ-যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না। কেন না তার স্বামী অনন্ত জীবন—যোগেশ্বরের ন্যায় অব্যয়। অম্বিকাপতির নাম কখনই বিনষ্ট হবার নয়।"

এই নাটকখানি বিষ্ণুপুররাজ বীরমল্ল ও তাঁহার দেব-প্রতিষ্ঠানের দেবতা মদনমোহনকে এবং অম্বিকারাজ নয়নসেন ও তাঁহার রঙ্গিনী দেবীর আয়তনকে ঘিরিয়া যে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল তাহার কাহিনী লইয়া জন্মলাভ করিয়াছে। চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত ইহার স্বচ্ছন্দগতি বেশ চিত্তাকর্ষকভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল। পঞ্চম অঙ্কে পড়িয়া ইহার মানুষ চরিত্র সহসা দেব চরিত্রে উন্নীত হইল, প্রেতাত্মার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিল, এবং দেব মাহাত্ম্যে মরা মানুষ বাঁচিল। ইহার ধর্মমূর্তি ধর্মানন্দ

বিদ্ধবক্ষ মদনমোহনকে দেখাইয়া তাঁহার পার্ষদ মৃত দলু, বলাইকে বসাইয়া গীতার—'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ, নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥'—এই মহাবাক্যের সার্থকতা সাধন করিলেন। ঐ ধর্মানন্দই চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আজন্ম বীরধর্মী বর্ষীয়ান্ বীরমল্লকে 'স্বধর্মে নিধনশ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ'—গীতার বাক্য শুনাইয়া অস্ত্র ধরাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রাজা-রাণী-নাটকের সুমিত্রার মতো এই নাটকে দলু-স্ত্রী থালার উপরে দলু ও বলাইয়ের মুণ্ডদ্বয় লইয়া প্রভু-পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। এই সব অলৌকিকতা না থাকিলে এই সামাজিক নাটকখানি জনশ্রুতিকে সামাজিক ইতিহাসে পরিণত করিতে পারিত। সর্বত্র গদ্যের মাধ্যমে মাত্র একটি স্থানে অমিত্রাক্ষর পদ্যে ইহা রূপায়িত হইয়াছে। তিনখানি গান ইহার সম্পদ।

পদ্মিনী

এই ঐতিহাসিক নাটকখানি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে। ইহার স্থানে স্থানে নাট্যকৌশলের দোষ এই, যে দুইটি অপরিচিত ব্যক্তিকে একই দৃশ্যে দাঁড় করাইয়া পরস্পরের দীর্ঘ স্বগত-চিন্তা দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করানো হইয়াছে; গোরা ও নসীবনের মধ্যে প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে ছাপার অক্ষরে সাড়ে চারি পৃষ্ঠা এইরূপ উক্তিতে পূর্ণ। এ পদ্ধতি কৃত্রিমতার পরিচায়ক। ঘটনার বিবৃতি সংলাপের ভিতর দিয়া প্রকাশিত করাই নাটকীয় রীতি। এ নাটকে তাহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। নাটকের সংলাপগুলিকেও খিনাইয়া অনর্থক দীর্ঘ করা হইয়াছে। দর্পণের উপর পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব প্রদর্শন ব্যাপারটি আলাউদ্দীনের ঐতিহাসিক ঘটনা হইলেও উহা পূর্বাপর সম্বন্ধহীন করিয়া খুব আকস্মিকভাবে এক দৃশ্যের মধ্যে আনীত হইয়াছে। ভীমসিংহের শুদ্ধান্তঃপুরে এইরূপ ঘটনা কিরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিতে পারে তাহার কোন আভাসই নাটকের মধ্যে নাই। হইতে পারে আলাউদ্দীনকে অতিথিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল, তবু এরূপ অভাবনীয় ব্যাপারে অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাব হইবে কেন? ১১খানি গান লইয়া পাঁচ অঙ্কে নাটকখানি সমাপ্ত, সরল গদ্য ইহার বাহন। বিখ্যাত অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে পাঁচ ফুলে সাজির মতো করিয়া পদ্মিনী রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাটকের গুরুত্ব না থাকিলেও তিনি এ সম্বন্ধীয় নাটকের অগ্রদূত ছিলেন।

উলুপী

নাটকখানি পৌরাণিক এবং ইহা স্টার থিয়েটারে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। ইহার একটি (Metaphor) রূপক অলংকার চমৎকার—(প্রথম অঙ্ক, চতুর্থদৃশ্য) 'উন্মাদিনী মা আমার কেশ এলো করে ওই সব পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে যখন ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়, তখন মনে হয় যেন দেবতারা পাহাড়ে বসে মেঘে জড়ান চাঁদ লোফালুফি করছে।' আগাগোড়া গদ্যের মাধ্যমে সামান্য একটি স্থানে অমিত্রাক্ষরে এ নাটকখানি লিখিত। নানা অবান্তর প্রসঙ্গের মধ্য দিয়া মহাভারতীয় উলুপী চরিত্রটি মৃদুমন্থর গতিভঙ্গে অগ্রসর হইয়াছে। নাটকের সর্বস্থানে ঘাতের প্রতিঘাত যথাসময়ে উঠে নাই। বিধিলিপি খণ্ডনের অভিপ্রায়ে উলুপীর আত্মহত্যার

চেষ্টা সফল হয় নাই। অর্জুনের প্রতি জাহ্নবীর রৌরব নরকভোগ অভিশাপটি রোধ করিবার জন্য উলুপীর দ্বিতীয় চেষ্টা আরম্ভ হইল। পুত্রের বক্ষ হইতে সঞ্জীবন মণি সরাইয়া লইয়া উহা দ্বারা বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জুনকে জীবিত করিয়া উলুপী নিজপুত্রের বিনাশ-সাধন করিলেন এবং স্বামীর মরণান্তে রৌরব নরকভোগ ব্যাপারটি নিবারণ করিলেন। পৌরাণিক ঘটনার সামান্য রদ্-বদল করিয়া নাট্যকার নাটকখানিকে দাঁড় করাইয়াছেন। অতি অল্পসংখ্যক গান লইয়া পাঁচ অঙ্কে এখানি সম্পূর্ণ। নাটকখানির তেমন আকর্ষণী শক্তি ছিল না।

পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত

ঐতিহাসিক নাটক, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। নাটককারের প্রকাশভঙ্গীর একটু নূতনত্ব ইহার মধ্যে আছে, যেমন—(দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে) ফকির ও মিরকাশিমের সংলাপে—"আত্মশক্তিতে যে নির্ভর কর্‌তে পারে না, তার দ্বারা সকল কার্যই অসম্ভব। যখন সপ্তদশ অশ্বারোহী বাঙ্‌লা জয় কর্‌লে, লোকে দেখ্‌লে সতেরো কিন্তু যারা বাঙ্‌লা হারালে তারা দেখলে অসংখ্য। যারা পলাশী-যুদ্ধে জয়লাভ কর্‌লে, লোকে দেখলে তারা মুষ্টিমেয়, যারা হার্‌লে তারা দেখ্‌লে অসংখ্য।" "মনের বলের অভাবে কোটি কোটি লোকের বাসভূমি হয়েও বাঙ্‌লা ভূমি আজ জনশূন্য।" (দ্বিতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে) মতিবিবি ও লাহোরী বেগের সংলাপের মধ্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বাঙ্‌লা দেশকে দেখার নমুনা পাওয়া গেল। লুৎফ্‌উন্নিসা জিন্নতকে জগদীশ্বরের করুণা সম্বন্ধে তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে এইরূপ বলিয়াছেন—"ছি! দুনিয়ার এমন নিন্দে কর্‌তে আছে! যে জীব মাটিতে পা দিতে ভয় পায়, এমন পাখীটিকে তিনি তরুরূপ হাত বাড়িয়ে স্থান দিয়েছেন। মৎস্যকে স্নেহসলিলে ভাসিয়ে রেখেছেন।"

এই সব প্রকাশভঙ্গী বাদ দিলে নাটকখানির নাটকীয় সংঘাত অতিশয় মৃদু। ঘাতে প্রতিঘাত উঠিবার সময় পর্যন্ত তাহা দাড়াইতে পারে না, অন্যবিধ জটিলতায় তাহা আবৃত হইয়া যায়। মীরজাফর তাঁহার পুত্র মীরণের সাহায্যে সিরাজউদ্দৌলাকে বাহিরের ষড়যন্ত্রের চাপে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করিয়া স্বয়ং ক্লাইবের গাধা সাজিয়া বাঙ্গালার নবাবী গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহারই ইতিকথায় নাটকখানি পূর্ণ।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদের প্রাপ্য টাকা মীরজাফরের নিকট হইতে পাইলেন না, তখন কাউন্‌সিলের সদস্যগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া মীরকাশিমকে নবাব মনোনীত করিলেন, এবং মীরজাফর তাঁহার পলাশী-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিলেন। মীরকাশিমও স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য বহুদূর অগ্রসর হইয়া লড়াইয়ে হারিয়া গেলেন। ইতিহাসকে শেষ দৃশ্যে রোমাঞ্চকর করিবার অভিপ্রায়ে নাট্যকার কাশিমের গুরু ফকিরের দ্বারা বঙ্গনারীপূজিত বঙ্গমাতার আবির্ভাব আনাইয়া চমকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু এত আয়াস সত্ত্বেও নাটকখানি জনপ্রিয় হয় নাই। ৬ খানি গান লইয়া পাঁচটি অঙ্কে নাটকটি সম্পূর্ণ ও গদ্যের মাধ্যমে লেখা হইয়াছে।

রক্ষঃরমণী

নাটিকাটি Monster and the maid গল্পের কাহিনী লইয়া গঠিত এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়া গিয়াছে। রূপকথাকে তিন অঙ্ক নাটিকায়

রূপায়িত করিতে যাহা প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিতে নাটিকাকার কার্পণ্য করেন নাই। অভাবের মধ্যে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বসিয়া থাকে, সুযোগ দেখা দিলেই জাগিয়া উঠে। নাটিকার কেশবদাস তাহারি কুহকে পড়িয়া সর্বাণী কন্যাকে লইয়া কিরূপ বিব্রত হইয়াছিল তাহার বিষয় নাটিকার উপজীব্য। ঋষি-অভিশাপ, শাপমুক্তি, ঐশ্বর্যলাভ—সবই নাটিকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ইহার রূপায়ণে ১৫ খানি গান কাজ করিয়াছে।

চাঁদবিবি

ঐতিহাসিক নাটকখানি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই অগস্ট তারিখে কোহিনুর থিয়েটারে মহা-সমারোহের সহিত প্রথম অভিনীত হইয়াছে। গদ্যের মাধ্যমে এখানি লিখিত। পরস্পর কুটুম্বস্থানীয় বিজাপুর ও আমেদাবাদের মধ্যে এক বিজাতীয় অভিমান আসিয়া উভয় রাষ্ট্রের সংহতি বিশেষ করিয়া আমেদনগরের রাজনীতি ক্ষেত্রে যে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই নাটকটির বর্ণিতব্য বিষয়।

বিজ্ঞ নাটককার মুসলমানের মুখ দিয়া দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে—'সমস্যার মীমাংসা করতে না পেরে হতগজ ক'রে কাজ সেরে এসেছি'—এই হিন্দু পৌরাণিক উদাহরণের উল্লেখ করিলেন কেন? এটা সমীচীনতার অভাব সূচিত করে। দীর্ঘ সংলাপের মধ্যগত ঘাত-প্রতিঘাত এত ধীরভাবে কোন কোন অঙ্কে সঞ্চারিত হয়েছে যে তাহাতে কৌতূহল সংহত হয়েছে। সংলাপের অন্তর্গত স্বগতোক্তি-গুলিকে পূব-পূব ঘটনা বর্ণনায় নিযুক্ত রাখা হয়েছে, এ প্রথা নাটকখানিকে কৃত্রিম করিয়া তুলিয়াছে। বিজাপুর সুলতানার অপূর্ব আত্মত্যাগের ইতিহাস নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও রঘুজী, মল্লজী, যশোদার প্রভুভক্তি ও বীরত্ব যেন উজ্জ্বলতর হইয়াই দেখা দিয়াছে। আত্মত্যাগের সময়ে আমেদনগরের নরনারী ও শিশু কেহই পশ্চাৎপদ রহিল না, এটা যেন অতিশয়োক্তির মতোই ফুটিয়াছে। ৮।১০ খানি গানের ভাষা কোনটা ব্রজবুলির আকারে, কোনটা ফারসী ও বাঙ্গালা মিশ্রিত হইয়া প্রেক্ষাগৃহে ঝংকৃত হইয়াছিল। ঘটনা বাহুল্যে নাটকখানির কেন্দ্রীয় আকর্ষণ ব্যাহত হইয়াছে। তাই কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পর দর্শক সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছিল।

দাদা ও দিদি

এই রঙ্গনাট্যখানি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে কোহিনুর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। নাট্যকার এই রঙ্গনাট্যের দশটি দৃশ্যের ভিতর দিয়া এক রূপকের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে যারা কল্পনার কল্পলোকে বিরাজ করিয়া স্বদেশজাত চাষ-আবাদ-শিল্পাদি ছাড়িয়া দিয়া বিজাতীয় সভ্যতার আলস্যে গা ঢালিয়া দেয়, তারা আপন আবাসে পর হইয়া সব খোয়াইয়া ফেলে। কমলা ও কর্মানন্দের প্রসাদে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে বাঁচিবার উপায় হয়। ১৭ খানি গান লইয়া গদ্যের ভিতর দিয়া ইহা রূপায়িত হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত—

'চল যাই হট্টমালার দেশে।
তারা গাইবলদে চষে
তারা হীরেয় দাঁত ঘসে
রুইমাছ পটোল তাদের ভারে ভারে আসে।

ভারা চোখ বুজে সই চুপ ক'রে ওই রয়েছে বসে
দিচ্ছে তুলে অন্নমেরু গরাসে গরাসে'

নামক গানখানি দিয়া নাট্যকার যেন রূপকথার ছোঁয়াচ লাগাইয়া দিয়াছেন। এ জাতীয় রূপক প্রণয়নে ক্ষীরোদপ্রসাদই প্রথম হস্তক্ষেপ করিলেন।

নন্দকুমার

ঐতিহাসিক নাটকখানি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগস্ট তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। ১৯০৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাল দস্তকে ঐ কোম্পানীর বার-আনা লোক চোরাই ব্যবসায় ক'রে কোম্পানীকে কিরূপে ফাঁকি দিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য অকাট্য দলিলাদি সংগ্রহ করিতেছিলেন বলিয়া নন্দকুমারের সত্যনিষ্ঠা ছিল। নাট্যকার এ নাটকে প্রতাপাদিত্যের বিজয়ার মতো রাধিকার দৈবী-শক্তির আশ্রয় লইয়া চণ্ডীমন্ত্রের প্রভাব দেখাইয়াছেন। ঐতিহাসিক ঘটনাকে নাটকীয় পরিকল্পনায় তাই প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে সংঘাত-মুখর করিতে পারিয়াছেন। কিংবদন্তী ও ঐতিহাসিক প্রক্ষেপে নন্দকুমার নাটকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে রাধিকার—'কি মধুর স্বরে বাঁশী উঠ্‌লো বেজে শ্যাম' ও 'শ্যাম আবার নাচ নাচ শ্যামা রূপ ধরে' গান দুইখানি আজও যেন স্টার থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে প্রতিধ্বনিত হইতে শুনা যায়, এমনি তাহাদের প্রভাব ছিল। নাট্যকার তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে বাঙালী সমাজকে নূতন ইঙ্গিত দিয়াছেন—'এক পক্ষে ভর দিয়ে পক্ষী উড়্‌তে পারে না। শুধু পুরুষের সাহায্যে জাতি উঠে না, উন্নতির মুখে তাকে তোল্‌বার জন্য পুরুষ-প্রকৃতির মিলন চাই। পশ্চাতে, গতি স্থির রাখ্‌বার জন্য পক্ষীর পুচ্ছরূপী ধর্ম। নন্দকুমার, এই ত্রিশক্তির মিলনে বাধ্য হোয়ে মা পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেছেন। মোগল আর রাজ্যরক্ষা কর্‌তে পার্‌ছে না। তুমি মন্ত্রগ্রহণ কোরে রাজা হোয়ে বাংলায় আবার হিন্দুরাজ্য স্থাপন কর।' দেশোদ্ধার ব্রতে স্ত্রীপুরুষ উভয়ে না মিলিলে কার্যোদ্ধার হয় না, তাই গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'সৎনাম' নাটকে এই চেষ্টার পথিকৃৎ হইয়াছিলেন।

এই তৃতীয় অঙ্কেই নাটককার নন্দকুমারের পরাজয়ের বীজ উপ্ত করিলেন, এবং তাহা রাধিকার এই কথাটির মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে—'রাজা, আমি আপনাকে একা দেখ্‌ছিনি, দেখ্‌ছি আপনি হিন্দুজাতির শক্তিশালী প্রতিনিধি। অন্ধ জাত্যাভিমানে আপনি শুদ্ধ নিজের দাসত্ব আন্‌ছেন না; সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাতির দাসত্ব এনে দিচ্ছেন।'

দোষেগুণে নন্দকুমার কি ছিলেন নাটককার শেষ দৃশ্যে শেরিফ্‌ ও নন্দকুমারের সংলাপের মধ্যে তাঁহার চরিত্রের এইরূপ ইঙ্গিত দিয়াছেন। বাঙালীর সাহস সম্বন্ধে নন্দকুমার শেরিফ্‌কে বলিতেছেন—'হয়তো আপনারা যাকে সাহস বলেন আমাদের তা বেশী নেই, কেউ সাহস ভরে মানুষ মার্‌তে মার্‌তে মরে, আর কেউ বা নির্ভীক প্রাণে মানুষের সেবা কর্‌তে কর্‌তে মর্‌তে প্রস্তুত। কেউ বা কালরূপী কামানের গোলাকে বুক পেতে নেয়, কেউ বা যমদ্বারে পতিত বসন্তরোগীকে কোল পেতে দেয়।'

এখানি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ছিল। কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট আজ এ নাটকের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত করিয়াছেন। গদ্যের মাধ্যমে পাঁচ অঙ্কে এখানি সমাপ্ত।

অশোক

নাটকখানি ঐতিহাসিক। এখানি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। প্রাঞ্জল গদ্য ইহার ভাষা, তবে শেষের কিছু অংশ চৌদ্দ অক্ষর সমন্বিত অমিত্রাক্ষরে রচিত। ইতিহাস ও কিংবদন্তীর উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ণনাকে যতটা প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, সংঘাত কৌশলের ভিতর দিয়া ঐগুলিকে নাটকীয় করিবার উদ্যম ততোই হ্রাস পাইয়াছে। অশোক চরিত্রের চণ্ডাশোক-ভাব আংশিক ফুটিলেও তাঁহার ধর্মাশোকত্বের ইঙ্গিত করা হইয়াছে, কার্য বা প্রণালী দেখানো হয় নাই। কেন্দ্রবর্তী চরিত্র অপেক্ষা পার্শ্ববর্তী চরিত্রের রূপায়ণে বেশি শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে। নাটকের অন্তর্গত কৌতূহল সংলাপ গঠনের দোষে বাধা পাইয়াছে। এখানি ক্ষীরোদপ্রসাদের সুনাম রক্ষা করে নাই। ঐ একই বিষয় লইয়া গিরিশচন্দ্র একখানি অনবদ্য নাটক রচনা করিয়াছিলেন, যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইয়াছে। নাটককার অশোকে মোট ৮ খানি গান দিয়াছেন কিন্তু আকর্ষণের দিক্ দিয়া তাহাদের গৌরব নাই। নাটকের পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য হইতে বাকি দৃশ্যগুলি অভিনয়-কালে পরিত্যক্ত হইয়াছে নাটককার এরূপ আভাষ দিয়াছেন, তাহাতে কতকগুলি চরিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

বরুণা

নাটিকাখান ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই তারিখে কোহিনুর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। পঞ্চসন্ধির অন্যতম 'উপসংহার' সন্ধিকালে রহস্যোদ্‌ঘাটন এই নাটিকার মূলসূত্র এবং তাহারি বলে কিরাত প্রতিপালিতা কেরল রাজকুমারী বরুণার, মানবেন্দ্র ছদ্মনামী কেরলরাজের, অভিরাম-ছদ্মনামী মানবেন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রের এককালীন রহস্যোদ্ভেদ এই নাটিকার চমৎকারিত্ব। পুণ্ডরীকের কর্ণরূপ বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিগৃহীত সংগীত তাহার মনরূপ অন্তরিন্দ্রিয়কে যে বরুণাপ্রেম উপঢৌকন দিয়াছিল তাহাতেই ইহার পরিসমাপ্তি। তিন অঙ্কে ২১ খানি গানের ভিতর দিয়া গদ্যের মাধ্যমে এখানি রূপায়িত।

দৌলতে দুনিয়া

কোহিনুর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল, তারিখ সংগৃহীত নাই। পরে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে। এখানি নাট্যকারের পূর্ববর্তীকালে লিখিত 'সপ্তম প্রতিমা' নাটকের পরিবর্তিত আকারে পুনর্লিখিত রূপ। প্রকাশভঙ্গীর নূতনত্বের মধ্যে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে—"উহুঁ! ঠোঁট দুখানা কিছু থেমটা নাচ নেচে উঠল কি না!" এবং তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে—'পথে পথে মণি কুড়িয়ে বেড়ানই আমার কাজ। সুতরাং আপনার চরণতলে নিক্ষিপ্ত এ মণি আমার! ফকির সাহেব। এ মণি আমি নিলুম, নিয়ে আপনাকে দিলুম—আপনি এর বিনিময়ে ঈশ্বর-প্রেরিত আমার এই ভগিনীটিকে প্রদান করুন।' এই কথার উত্তরে ফকির ঐ দৃশ্যে বলিলেন—'বেশ, দাও। তা' হ'লে কোহিনুর ফকিরের কাছে কেন, তুমি কোহিনুরের কাছে যাও। (মেহেরার হস্তে, পরাইয়া) মা। আজ থেকে তোমার মুক্তি—'কথাগুলি উল্লেখযোগ্য। নাটকের নাম 'দৌলতে দুনিয়া' কেন রাখা হইয়াছে তাহার উত্তর শেষ দৃশ্যে মুরাদের কথায় ব্যক্ত হইয়াছে—'এত

অল্প মূল্যে তাকে কেন বেচেছিলে মোবারক পাশা? ভেবেছিলে, তার বিনিময়ে মূল্য হবে না। আমি তার বিনিময়ে 'দৌলতে দুনিয়া' লাভ করেছি।'

রোমান্স ও বাস্তব চরিত্রের সংমিশ্রণে নাটকের কাহিনী সংগঠিত। শেক্সপীয়রীয় যুগের প্রেতাত্মার আবির্ভাব-তিরোভাব এবং ছদ্মবেশ সত্ত্বেও এই পরিবর্তিত সংস্করণে ছয়টি প্রতিমার উদ্দেশ্যমূলক জটিলতা দূরীভূত হয় নাই, বা মেহেরোর ঝম্পপ্রদান পূর্বক আত্মত্যাগ ও প্রতিমারূপে পুনরাবির্ভাবের মধ্যে ইন্দ্রজালের অভাবও হয় নাই। ইহার প্রথমটিতে প্রেতাত্মার জাদুদণ্ড এবং শেষটিতে ফকিরের আধ্যাত্মিক স্পর্শ কাজ করিয়াছে। এই জাতীয় নাটকে চমৎকারিত্ব থাকিলেও নাটকত্ব থাকে না।

ভূতের বেগার

ইহাকে নাট্যকার রঙ্গনাট্য বলিয়াছেন। এখানি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে কোহিনুর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গবাসী এক বাঙ্গালী সাহেবিয়ানা ও বড় চাকরির লোভে পড়িয়া দেশের মায়া কাটাইয়া কলিকাতা শহরবাসী হইয়া কিরূপ ভূতের বেগার খাটিয়াছিল তাহার একখানি সজীব চিত্র নাট্যকার শিক্ষাপ্রদ এই প্রহসন মারফৎ প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রহসনের রঙ্গরস ও হাসি-তামাসা নাট্যকারের হাতে অন্তর্বেদনার করুণ সুরও কেমন টানিয়া আনিয়াছে তাহার নিদর্শন নিতাইয়ের এই কয়টি কথার মধ্যে পাওয়া যায় :—(দ্বিতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে) 'এখনও চিন্‌তে পারনি বাবু! এখানে থাকলে পারবে না। সেই কর্দমাক্ত কোমল মৃত্তিকার স্পর্শ না পেলে এ কুহকময় শহরে জ্ঞান ফিরবে না—সেই কেদার-বাহিনী নদীর স্নিগ্ধ জল চোখে না দিলে দৃষ্টি ফিরবে না।' ৮খানি গানের মধ্যে সর্বশেষ গানটি ঐ একই সুরে গাঁথা, তাহার প্রথম চারি ছত্র এইরূপ :—

'শিরে লয়ে ডালা এস মা কমলা—
আশিস্ ঢালিয়ে দাও মা!
অনাহারে সারা শিশু দিশে হারা
করুণা নয়নে চাও মা।'

ক্ষীরোদপ্রসাদ নক্‌শা জাতীয় দৃশ্যকাব্য খুব কমই রচনা করিয়াছেন, এখানি তাহারই একটা রূপায়ণ।

বাসন্তী

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে। এ নাটিকা-খানির প্রকাশভঙ্গীর কিছু নূতনত্ব আছে, যথা (প্রস্তাবনা) "* * নীলাম্বরে নব বিকশিত কৌমুদীর পাড় দিয়ে, কুন্তলে অঞ্চলে তারকা গেঁথে নব কাদম্বিনীর বেণী দুলিয়ে—সন্ধ্যারাগরঞ্জিত অধর-সমীরণে ভর দিয়ে—আমাকে ফেলে কোথায় চলেছ সই।" ঐ দৃশ্যে আর একস্থানে এইরূপ আছে—'তা নয় পুষ্পরথ, পুরুষের প্রবঞ্চনা দেখে নারীর কোমল হৃদয় গলে গিয়েছে, তাই তোমার ছোঁড়া বাণ বেঁধবার্ বস্তু পাচ্ছে না।'

এক মধুবসন্তে বসন্তরাণীর অদ্ভুত খেয়াল মিটাইবার জন্য ইহার জন্ম এবং সেই খেয়ালের চরিতার্থতায় ইহার পরিসমাপ্তি। মানুষ ও অপ্সর-অপ্সরা ইহার ক্রীড়নক। বাসন্তীর খেয়ালটি

এইরূপ :—'চিরদিনই মানুষ কামনার অপূরণে কষ্ট পায়—এক রাত্রির জন্য তাদের সুখের স্বপনে ঢেকে দিতে পারিস?' আট খানি-দৃশ্য সম্বলিত একটি অঙ্কে গান ও হাস্যকৌতুকের মধ্য দিয়া ইহা রূপায়িত হইয়াছে।

বাঙ্গালার মসনদ

ঐতিহাসিক নাটকটি ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। নাট্যকার প্রথম সংস্করণের দোষ-ত্রুটি দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধিত করিয়াছিলেন। আমাদের আলোচ্যগ্রন্থখানি দ্বিতীয় সংস্করণের। সরফরাজ ও আলিবর্দীর সময়ে বাঙ্গালার মসনদকে ঘিরিয়া যে ক্রূর রাজনীতি ক্রীড়া করিয়াছিল এ নাটকে নাটকীয় সংঘাতের স্পর্শে না হোক সরস বর্ণনাভঙ্গী দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তথাকথিত বিলাসী লম্পট সরফরাজের চারিত্রিক দোষ ক্ষালনের জন্য নাট্যকার ঐতিহাসিক তথ্যসংগ্রহের ত্রুটি করেন নাই, জনপ্রিয় আলিবর্দীর বিশ্বাস-ঘাতকতার তথ্যবহুল চিত্রও যথেষ্ট সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু সব সত্ত্বেও নাটকীয় আকর্ষণী শক্তি হারাইয়া নাটকখানি জনপ্রিয় হইতে পারিল না। পাঁচ খানি গানের মধ্যে কোনটা গ্রাম্যভাব লইয়া, কোনটা ভজনের গুরুত্বে, কোনটা বা বৈঠকী কায়দায় গঠিত হইয়াছে। ভাষা সর্বত্রই সরল গদ্য।

পলিন

নাটকখানি ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে কোহিনুর থিয়েটারে ন্যাশানল নামক সম্প্রদায় কর্তৃক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এখানি অস্পষ্টতা ও কৃত্রিমতা লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। পলিন বা আমাদের পুরুষের ছদ্মবেশ নিত্যসহচর ওমারকেও যে শেষদৃশ্যের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বিভ্রান্ত করিয়াছিল এইটিই নাটকের কৃত্রিমতা। পুরুষের ছদ্মবেশী নায়িকারা যে বিভ্রম উৎপাদন করিতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত শেক্সপীয়র বা গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের নাটকে সপ্রমাণিত করিয়াছেন। তাঁহাদের অবলম্বিত ক্রিয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখা যায় নাই। দাম্ভিক আল্‌মামুনের প্রথম পত্নীর অদর্শনজনিত পত্নীপ্রেমের প্রগাঢ়তা ও তাহারই গর্ভজাত সন্তানের জন্য উৎকণ্ঠার মধ্যে স্বভাবের আতিশয্য লক্ষিত হয়। স্বামী-স্ত্রী বা কন্যাদ্বয়ের সহিত তাহাদের অভিলষিত পাত্রদ্বয়ের মিলনটি কেমন একটা প্রহেলিকার আবরণের মধ্যে সম্পাদিত হইয়া গেল যে পাঠক বা দর্শকেরা তৃপ্তি পাইলেন না।

ক্ষীরোদপ্রসাদ এ নাটকে কৃতকার্যতা লাভ করেন নাই। তিনটি অঙ্কে গদ্যের মাধ্যমে ইহা লিখিত হইয়াছে।

খাঁজাহান

নাটকখানি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন তারিখে কোহিনুর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ এখানে আলোচিত হইল। অধিক স্থানে গদ্য ও অল্পস্থানে অমিত্রাক্ষর পদ্য এই নাটিকাখানিকে রূপায়িত করিয়াছে। গ্রন্থকার ইহাকে নাটিকা বলিয়াছেন। ইহার ঘটনাবহুল ঘাতপ্রতিঘাত ফেনাইয়া বড় করা হইয়াছে এবং তাহারই ফাঁকে ফাঁকে সোফিয়া-নারায়ণের অন্তর্মুখী প্রেম সব ঘটনাকে চাপা দিয়া প্রকাশলাভ করিয়াছে, এইটুকুই ইহার নাটিকাত্ব, বাকিটুকু নাটকের

অস্পষ্টতার আবরণে ধূমায়িত হইয়াছে। অস্পষ্ট নাটকীয় সংঘাতের ভিতর দিয়া প্রচ্ছন্নভাবে নাটিকাখানি সোফিয়ার আত্মত্যাগে পরিণতিলাভ করিল। একদিকে অভিমানী ও দাম্ভিক খাঁজাহান, অপর দিকে মহাবৎ খাঁ নন্দিনী সোফিয়ার রূপদম্ভ, ভিন্নদিকে জাতিগর্বে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ নারায়ণের জাত্যভিমান এই নাটকের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে খাঁজাহান সপরিবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। নারায়ণ ও সোফিয়া শেষ মুহূর্তে প্রাণ দিল। প্রস্তাবনা সংগীত লইয়া মাত্র তিনখানি গানে ইহা পূর্ণ।

মিডিয়া

নাটকটি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। বিজ্ঞানের অধ্যাপক এই নাটকের অবয়বে অনেক অজানিত শক্তিরহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন এবং সর্বশেষে জড় ও চৈতন্য শক্তির পার্থক্য নিপুণ হস্তে দেখাইয়াছেন। গ্রীক পুরাণের এক কাহিনী ইহার উপজীব্য। কয়েকটি সুন্দর প্রকাশভঙ্গী নাটকের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিয়াছে যেমন, (প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে) "চাতকের তৃষ্ণা। দারুণ পিপাসায় মলেও সে দুনিয়ার নদনদীর কাছে জল ভিক্ষা করে না—এক ফোঁটা মেঘের উপহারের জন্য আকাশ পানে চেয়ে থাকে। আয় মেঘ আয়, আমি দুনিয়ার মালিক—এই প্রাণ নিয়ে দুনিয়াকে পদানত করেছি। তা হ'লে দে কাদম্বিনী—উল্লাসধ্বনি পূর্ণ অম্বর থেকে আমাকে তোর এক ফোঁটা আনন্দাশ্রু উপহার দে।" বিজলীপ্রভাকে উদ্দেশ করিয়া জিবার ঐ দৃশ্যের আর এক স্থানে বলিয়াছেন—"আয় আয় দুনিয়ার গর্ভে আবদ্ধশক্তি আকাশে উঠেছিস্—তাই কি তোর এত হাসি?" ঐ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে মমতাকে লক্ষ্য ক'রে বলা হয়েছে—"মা বাঘে প্রাণিহত্যা করে, কিন্তু মা তার বাচ্ছার প্রতি মমতাতে তো প্রাণিহত্যা করে না।" অন্ধকারের বর্ণনায় নূতনত্ব—(দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে) "জটার মতন গেঁটে ও গরিলার মতন বেঁটে, ওই ঘুটঘুটে চিটচিটে অন্ধকার।" মানুষের সম্বন্ধে নূতন কথা ঐ দৃশ্যে এইরূপে ব্যক্ত হ'য়েছে—"এখন বুঝেছি, যে মানুষ, সে তুর্কীও নয়, গ্রীকও নয়, মানবত্বই তার ধর্ম্ম, মনুষ্যত্বই তার জাতীয়ত্ব।" (তৃতীয় অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যে) এক স্থানে বলা হ'য়েছে—"আগে বুঝ্‌তে পারি নি, এখন বুঝ্‌তে পেরেছি, দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি—জড়া প্রকৃতির প্রতি পরমাণুর অন্তরালে চৈতন্যময়ীর লীলা। সেই মা কৌমুদীরূপে জগতে মধুবর্ষণ করেন। প্রেম বিহ্বলা দামিনীরূপে কাদম্বিনীর অলকে লীলা করেন। মাতৃরূপে সর্ব্বজীবের অভ্যন্তরে অবস্থিত হ'য়ে জগতে শান্তি বিতরণ করেন।"

নাট্যকার এই নাটকের মধ্যে পাশ্চাত্ত্যের জড়শক্তির উপর প্রাচ্যের চৈতন্যশক্তির জয় দেখাইয়াছেন। নাটকখানি তিনটি অঙ্কে সমাপ্ত। তত্ত্বের বাহুল্যে নাটকের আকর্ষণী শক্তি ঢাকা পড়িয়াছে। গানেরমধ্যে

'চাচী ছিল হেঁসেলে গালে পূরে পান।
চাচা ছিল গোয়ালে ঠোঁটে ভরা পান'—

শীর্ষক গানটি এবং

'আমরা শহুরে হয়েছি রাতারাতি।
সোনার খড়ে ছাইব কুঁড়ে, আগোড়ে বাঁধ্‌বো হাতী।'

গান দুইখানি বেশ হাসির হিল্লোল তুলিয়াছিল।

ভীষ্ম

এই পৌরাণিক নাটকখানি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। মাইকেলি চৌদ্দ অক্ষর অমিত্রাক্ষর ছন্দে ও ভাঙ্গা গৈরিশছন্দে নাটকখানি রচিত। মহাভারতের কেন্দ্রবর্তী ভীষ্মচরিত্র লইয়া ক্ষীরোদপ্রসাদের পূর্বে আর কোন নাট্যকারই তাঁহার সমগ্র চিত্র নাটকের মধ্যে চিত্রিত করেন নাই। ভীষ্মের খণ্ডিত রূপই নাট্যক্রিয়ার মধ্যে কোন কোন নাট্যকার আঁকিয়াছিলেন। এ নাটকের প্রকাশভঙ্গীর নূতনত্ব এইরূপ:—(তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে) অপ্রস্তুতভাবে যুদ্ধার্থ আগত জামদগ্ন্যকে দেখিয়া ভীষ্মের প্রশ্নের উত্তরে ভার্গব বলিলেন—"(সহাস্যে) ভীষ্ম! মেদিনী আমার রথ, চারি বেদ আমার অশ্ব, বায়ু আমার সারথি, বেদমাতা গায়ত্রী আমার বর্ম।" ঐ দৃশ্যে আর একস্থানে এইরূপ আছে—

"এবে ধর্মবাক্য প্রভু, শুনাব তোমারে,
অদ্যাবধি পবিত্র শরীরে
ব্রহ্মবিদ্যা, সুমহৎ তপস্যাচরণ,
ব্রহ্মতেজ, বেদ সনাতন—
যাহা কিছু করেছ অর্জন, ঋষিরাজ,
তাহে না হানিব আমি শর।
অস্ত্র ধ'রে ক্ষত্রিয়ত্ব করিয়া গ্রহণ
ক্ষত্রতেজ যাহা কিছু করিলে ধারণ,
শুদ্ধমাত্র তারে,
বিক্ষত করিব আমি বাণের প্রহারে।"

তৃতীয় অঙ্কে ভার্গবের পরাজয় ও অম্বার শিব অনুগ্রহলাভে নাটকীয় সংঘাত ফুটিয়া উঠে নাই। পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে বলদেব ও সাত্যকির সংলাপে কিছু নূতন ভাবের কথা আছে, যথা,—'আমি সঙ্কর্ষণ—আমি আছি—তাই তোদের কেশব আছে। কেশবের দেহ কি মাটিতে গড়া রে হতভাগা। তার পায়ের নখটি থেকে আরম্ভ ক'রে মাথার চুড়ার শিখিপুচ্ছটি পর্যন্ত সমস্তই চিন্ময়। চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম। আমি হলধর। চিন্ময় বাসুদেবের চিত্তক্ষেত্রে দিবারাত্র নিদ্রাশূন্য হ'য়ে হলচালনা করছি। সেইজন্যই না তোদের কেশব লীলা করছে! নইলে তোদের লীলা কে দেখাত রে? আমি সঙ্কর্ষণ, প্রাণের সমস্ত তন্ত্রী দিয়ে সেই বিরাট পুরুষকে আকর্ষণ করেছি, তার চিন্ময় দেহকে মৃন্ময়ের আভাস দিয়েছি।'

এই সকল ভাবের বাহন ব্যতীত নাটকখানি অস্পষ্টতা ও অসংলগ্নতা বহন করিয়া নাটকের প্রকৃত সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। ভীষ্মের রাজনীতিজ্ঞান ও ধর্মজ্ঞান, যাহার নিদর্শন মহাভারতের শান্তিপর্বে ভূরি-ভূরি পাওয়া যায় তাহার কোন আলোচনা নাটকখানির মধ্যে না থাকায় পাঠক বা দর্শকের পিপাসা মিটে নাই।

রূপের ডালি

নাট্যকার এখানিকে রঙ্গনাট্য বলিয়াছেন এবং ইহা ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহাকে রূপকজাতীয়া নাটিকা বলা চলে। নাটিকাকারের

ঔচিত্যবোধের অভাব প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে বোখারার বণিক পুত্র ওস্‌মানের—'বোধ হয়, আমার অত্যাচারে জ্বালাতন হ'য়ে মা এই ভোজপুরী বেটাকে চাকর রেখেছে'—এই প্রকাশভঙ্গীটির ভিতর দিয়া প্রকাশিত হ'য়েছে। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে গফুর আস্‌গর আলিকে উহার গূঢ় রহস্যের কথা এইরূপে বলিতেছে :—"এই জন্ম একটা শোঁ—একটি নিশ্বেস টানা, আর মরণ একটা ফোঁস্—একটু লম্বা রকমের নিশ্বেস ফেলা—বস্, সকল জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে গেল। শুরু হচ্ছে সেই শোঁ আর ফোঁসের ভিতরে একটা আপ্। কথা নেই, ফোঁস্-ফোঁস্ নেই,—একেবারে নিরেট চুপ—(তরোয়ার ঘুরাইয়া) এই তামাচা, ইজেম চা, খোঁচা—এই দিয়ে বুঝেছ, এই দিয়ে কল্‌জের কবাটে ঘা মার্‌তে হবে, তবেই শুরুকে ধর্‌তে পার্‌বে বস্। * * শির কুচ্, কড়াক, অন্তর—বুঝেছ মির্জা আলি—এর নাম জ্ঞান-অসি। এ যত ঘোরাচ্ছি, ততই আমার মনের সংশয় কুচ্ কুচ্ করে কেটে যাচ্ছে।"

বোখারা ও সমরকন্দের নবাব-বাদশাহ্ লইয়া ইহার কাহিনী। এখানি দার্শনিক তত্ত্বমূলক রূপক। নাটিকা আকারে রঙ্গরসের ভিতর দিয়া ইহার পরিক্রমণ। নানা বিপর্যয়ের পর সেলিমা ও ওস্‌মানের এবং গফুর ও মনিয়ার মিলনটি পাকাভাবে সংঘটিত হইল। কিরূপে তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল নাটিকার দর্শক বা পাঠক তাহা দেখিয়া লইয়াছেন। এখানিতে নাটিকাকার মুসলমান ধর্মতত্ত্বের নূতন আভাস দিয়াছেন। এমন কি গানগুলি পর্যন্ত নূতন ইঙ্গিত লইয়া রচিত। তিন অঙ্কে এখানি সমাপ্ত।

নিয়তি

নাট্যকার ইহাকে নাটিকা বলিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এটি নাটক। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে ইহার অভিনয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে। নিয়তি মানুষকে নানা ষড়যন্ত্রের ভিতর দিয়া মৃত্যুর হাত হইতে কিরূপে রক্ষা করে তাহাই এ নাটকখানির প্রতিপাদ্য বিষয়। এলিজাবেথীয় যুগের নাটকীয় সৌন্দর্য যাহা কিছু আছে তাহা লইয়া নাট্যকার নাটকখানি গড়িয়াছেন। একটুখানি আতিশয্যের (over-doing) দোষে সংঘাতগুলি দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে যথাযথ রূপ লইতে পারে নাই, কম-বেশি ও অগ্র-পশ্চাৎ হইয়া গিয়াছে। বায়স্কোপিক লিটারেচারের মতো এই নাটকের সংকটগুলি আসিয়াছে এবং অদ্ভুত উপায়ে তাহা হইতে রক্ষার উপায়-সাধন করা হইয়াছে—এইগুলিই নাটকের অতিশয়তা। প্রকাশভঙ্গীর নূতনত্বের মধ্যে তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে—"আমার একশো ক্রোর মোহরের সম্পত্তি।.. সোনার পাহাড়, জহরের গাছ, গজমুক্তার লতা, চুণীর ফুল, হীরের ফল—ভানুমতি। আমার জ্বালা-যন্ত্রণা ঘরে চাঁদ-সূর্যি গড়াগড়ি খাচ্ছে।" কৃপণের আসল মূর্তি আর কোন নাটককারই এমন মূর্তিমান করিয়া চিত্রিত করেন নাই। এই এক চরিত্রেই তিনি বিশ্বজয়ী হইয়া রহিলেন। 'কৃপণের ধনে', রসরাজ অমৃতলাল ক্ষীরোদপ্রসাদের অগ্রদূত হইলেও তাহা প্রাহসনিক চিত্র, কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ এটিকে নাটকীয় রূপে রূপায়িত করিলেন। মাত্র দুইটি সংগীত এই মিলনাত্মক নাটকের সম্বল, তাহার প্রথমটি সুন্দর।

আহেরিয়া

নাটকখানি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত। ভট্টি ও বারাহী রাজপুতদের আত্মকলহের নিদর্শনস্বরূপ কোন এক ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া

এখানি লিখিত হইয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ এই নাটকেই প্রথমে প্রতি অঙ্কে স্থান-নির্দেশক স্থানের পাশাপাশি কাল-নির্দেশের সূচনা করিলেন, যেমন প্রথম অঙ্কে—সময় উষা, দ্বিতীয় অঙ্কে—সময় দিবা, প্রথম প্রহর ইত্যাদি। প্রকাশভঙ্গীর নূতনত্ব এইরূপ :—(প্রথম অঙ্ক-৪র্থ দৃশ্য) "যে আত্মরক্ষা কর্‌তে জানে, আত্মরক্ষার ইচ্ছাই তা'র বর্ম—উদ্যত করের একটা অঙ্গুলিই তার অস্ত্র।" ক্ষত্রিয়নন্দিনী কমলা রেবাকে সহোদরা ভগিনী বলিয়া চিনিয়াছিল, তবে তাহাকে—'যদি অনার্যনন্দিনী হও, তা'হলে তোমার কর-সংলগ্ন ওই পবিত্র করের রেণু ধুয়ে ফেলে ঘরে ফিরে যাও। যদি ক্ষত্রিয়নন্দিনী হও, তা'হলে আমি জানি, তোমার ওই পিতৃশত্রু-স্পর্শজাত তড়িৎ চিরজীবনের জন্য তোমার হৃদয়ে আবদ্ধ হ'য়ে গেছে। ওর চরণাশ্রয় ভিন্ন তোমার অন্য গতি আর আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না—'এইরূপ সন্দেহাকুল কথা বলিল কেন? নাট্যকার জীবিত নাই, কে ইহার উত্তর দিবে? (দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে) সুরজ—"রাজাত বটেনই। কিন্তু ওঁর আদেশও রাজাদেশ। সে ত আর মিথ্যা হ'তে পারে না।" দেবরায়—"* * রাজা তার হুকুমের উপরেও বাস করে। আমি কি কিছু জানি না মনে করেছ?" ভট্টিদের দুর্গ তনোট ধ্বংসের বিংশ বর্ষীয় আহেরিয়া উৎসবকে কেন্দ্রে রাখিয়া যে জটিল ঘটনাজাল দেখা দিয়াছিল তাহাই নাটকের বর্ণিতব্য বিষয়। 'বীরভোগ্যা নারী'—এই তত্ত্বভিত্তির উপর নাটকটির প্রতিষ্ঠা।

নাটকের কেতু চরিত্রটি বড়ই মধুর। এ নায়িকায় চাঞ্চল্য নাই, দৃঢ় সত্যনিষ্ঠা ইহাকে মহিমময়ী করিয়া তুলিয়াছে। বৃথা আভিজাত্য-গৌরবে রাজপুত জাতির অনিবার্য পতনকে নিবারণ করিবার জন্য নাট্যকার নাটকের শেষে বারাহা, লাঙ্গাই ও ভট্টির যে অপূর্ব মিলনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা দেখিবার সামগ্রী হইলেও ভারতের ইতিহাসবৃক্ষে সে ফল ফলে নাই। গদ্য ও অমিত্রাক্ষর পদ্যের বাহনে নাটকখানি লেখা। ৭ খানি গান নাটকটির সম্পদ।

বাদ্‌শাজাদী

নাটকখানি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে মনোমোহন থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। এই নাটকের তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের মধ্যে আজিজ ও আমীরণের সংলাপে এক স্থানে রূপ সম্বন্ধে প্রকাশভঙ্গীর নূতনত্ব এইরূপ :—'এ আলোক-প্রহার যে আমার আঁখি সহ্য কর্‌তে পারছে না। আমি যে মস্তিষ্ক স্থির রাখ্‌তে পারছি না।' 'আমীরণ। প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, দৃষ্টি ভূমিলগ্ন করব। গোলামের যে ব্যবহার তার প্রভুর সর্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ হয়, সারা পথ তোমার সঙ্গে সেই ব্যবহার করব।' আজিজ ও লিরিয়ানের প্রেম রহস্যের সমাধান চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে আজিজ এইরূপে করিয়াছে—"এক দিকে দেখে, অন্য দিকে পেয়ে—আমি ধন্য! তুমি অজ্ঞাতসারে তোমার প্রিয় পেয়েছ। আমিও অজ্ঞাতসারে আমার প্রিয়া পেয়েছি। নির্ভর হও রাজনন্দিনী, আমি তোমার প্রিয়ের সখা।"

এক বিস্ময়কর মন্ত্রগুপ্তির আবরণের ভিতর দিয়া ঐ নাটকের গল্পাংশ পরিচালিত হইয়াছে। ঐ মন্ত্রগুপ্তি একটা নাটকীয় কৌশল। নাটকীয় পরাকাষ্ঠা ঐ গুপ্তি প্রকাশেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। মাত্র আমীরণের ভাগ্য পরিবর্তন তখন বাকি ছিল, তাই পঞ্চম অঙ্কের প্রয়োজন হইয়াছে। সাতখানি সুললিত গান ইহার সংগীত সম্পদ, গদ্যের মাধ্যমে এখানি রচিত।

রামানুজ

নাটকখানি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই প্রকাশিত হইয়াছে, অভিনয় তারিখ সংগৃহীত নাই। ভাঙা অমিত্রাক্ষর পদ্য ও গদ্যের মাধ্যমে এখানি লিখিত, অমিত্রাক্ষরে কিন্তু সাবলীল গতি নাই। ভাষার আড়ষ্টতায় ভাবের দৈন্য প্রকাশিত হইয়াছে। ঘটনাবহুল কাহিনীটি কোন কোন স্থলে দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে সংঘাতের অগ্র-পশ্চাৎ নিবন্ধন নাটকীয় হইয়া উঠে নাই। ধর্মদাস-হেমাঘাঘটিত নাটকীয় সংঘাত উঠিবার স্থানে অবান্তর কথার দীর্ঘ আড়ম্বরের মধ্যে শিক্ষক যেমন ছাত্রকে পাঠ ব্যাখ্যা করেন সেই মতো ব্যাখ্যান দ্বারা সংঘাতটি তরলীকৃত হইয়া ভাসিয়া গিয়াছে, দর্শক বা পাঠকের মনে কোন রেখাপাত করিতে পারে নাই। ঐ একই প্রকারের ঘটনা লইয়া গিরিশচন্দ্র বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণির মনে যে নাটকীয় সংঘাত আনিয়াছিলেন তাহার তুলনায় এটি গৌরবহীন।

নাটকের প্রকাশভঙ্গীও এক স্থানে সুন্দররূপ ধারণ করিয়াছে, যথা (পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে) অবিশ্রান্ত ঝড়বৃষ্টি ও দুর্যোগের বর্ণনা—"মুহুর্মুহু প্রচণ্ড গর্জনে অনন্ত আকাশ ভাণ্ডারের প্রাচীর চিরে, পথ ক'রে এক একটা অট্টহাসে যেন পর্বত প্রমাণ অন্ধকারের স্তর পৃথিবীতে ভেঙ্গে পড়্‌তে লাগ্‌লো।" দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবাচার্য রামানুজ চরিত এই ধর্মমূলক নাটকের অবলম্বন। বৈষ্ণবধর্মের কতকগুলি সমস্যার সমাধান থাকিলেও কেমন একটা জটিলতা নাটকখানিকে ধরিয়া রাখিয়াছে। দেবদাসীর গানে ও বৈষ্ণব পদাবলীর কীর্তনে ইহাকে মধুর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বঙ্গে রাঠোর

ঐতিহাসিক নাটক। এখানি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে। ইতিহাসের পটভূমিকার উপর কল্পনার সৌধপূর্ণ এই নাটকখানি দোষেগুণে মন্দ হয় নাই। মাতৃরূপিণী বন্ধ্যা ভ্রাতৃজায়ার স্নেহের নিদর্শন একটিমাত্র প্রকাশভঙ্গীতে প্রকাশিত হইয়াছে—(প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে) "আমি তোমাকে কোল পর্যন্ত তুল্‌তে পেরেছিলুম। নীরস স্তন্য তোমার মুখে দিয়ে শিশুকে প্রতারণা করেছিলুম, কিন্তু তিনি (জ্যেষ্ঠভ্রাতা) তাঁর বক্ষের উষ্ণতার আবরণে তোমার জীবন রক্ষা করেছেন।" ঘটনার আবর্তনে সংলাপের ভিতর দিয়া প্রথম অঙ্কের শেষ দিক্‌টা বেশ নাটকীয় হইয়া উঠিয়াছে। রাঠোর ও শিশোদয়কুলের রাজপুত্‌গণ সপ্তদশ শতকে পশ্চিম বঙ্গে বস-বাস করিয়া বাঙ্গালী হইয়া চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ভাব বন্যায় হিন্দু ও মুসলমানের সামাজিক জীবনের মধ্যে যে আলোড়ন আনিয়াছিল এ নাটকখানি তাহারই একটা মূর্ত প্রতীক। বাহ্য অপেক্ষা আন্তররাজ্যের যোগ নাটকখানির সম্পদ। ভুবনেশ্বরীর চরিত্রে ঐ সংঘাত মূর্তিমতী হইয়া দেখা দিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী হইতে সংগৃহীত কয়েকখানি গান উপযুক্ত স্থানে ঝংকার তুলিয়াছে।

কিন্নরী

এই ত্র্যঙ্ক নাটিকাখানি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অগস্‌ট তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। ইহার চতুর্থ সংস্করণের গ্রন্থখানি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এবং তাহার পাঠই আলোচিত হইয়াছে। কিন্নরলোক ও মর্ত্যলোক এই নাটিকার পটভূমিকা। এখানি রূপক জাতীয় নাটিকা। মর্ত্যলোকের করুণার আকর্ষণে স্বর্গের দেবী আকৃষ্টা হইলেন। নাটিকাকার করুণাময়

সুধনকে ভবিষ্যাবতার শাক্যসিংহ ও স্বর্গকন্যা কিন্নরীকে তাঁর প্রিয়তমা মহিষী গোপার প্রতীকরূপে পূর্বাভাস দিলেন। ইহার নাটকোচিত সংঘাত তৃতীয় অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যে ও দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের মধ্যে নাটকার দর্শক বা পাঠক খুঁজিয়া দেখিলে পাইবেন। গদ্যের মাধ্যমে তিন অঙ্কে সমাপ্ত ২১ খানি গান, স্বর্গ-মর্ত্যের দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা, অভিনয়োপযোগী আলোক-ছটা ইহার আকর্ষণীশক্তি, তজ্জন্য ইহার সাত্বিক ও আঙ্গিক অভিনয়ের আকর্ষণে রঙ্গমঞ্চ আজও দর্শকে পূর্ণ থাকে।

মন্দাকিনী

এই পৌরাণিক নাটকখানি ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রেল তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়া গিয়াছে। আপব বশিষ্ঠ তাঁহার নন্দিনী নাম্নী গাভী অপহরণকারী এক বসুকে অভিসম্পাত দিয়া শতবর্ষব্যাপী অনশনব্রত দ্বারা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। প্রায়শ্চিত্তান্তে পারণ করিবার উদ্দেশ্যে হস্তিনাপতি শান্তনু রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজা সস্ত্রীক অতিথি-সেবা না করিলে তথায় পারণ করিবেন না, এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা। অবিবাহিত শান্তনু এই পারণ উদ্দেশ্যে কিরূপে বিবাহিত হইলেন তাহার বর্ণনায় নাটকখানি পূর্ণ। ইহা নাটকাত্মক না হইয়া বর্ণনাত্মক হইয়া দর্শক বা পাঠকের কৌতূহলে আঘাত দিয়াছে। অবান্তর হাস্য ও রস-রসিকতার দৃশ্য আনিয়া ইহার মূল ঘটনার চিত্রকে আবৃত করা হইয়াছে। এ নাটকখানি ক্ষীরোদবাবুর যশোহানিকর। স্বর্গজা মন্দাকিনীর সহিত শান্তনুর বিবাহ ইহার পরিণতি। গদ্য ও অমিত্রাক্ষর পদ্যে ইহা রূপায়িত। প্রস্তাবনা সংগীত ধরিয়া ১৩ খানি গান ইহার মধ্যে আছে।

আলমগীর

নাটকখানি ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে কর্ণওয়ালিস্ থিয়েটারে বেঙ্গলি-থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি দ্বারা প্রথম অভিনীত হইয়াছে। এ নাটকখানি খাটি ঐতিহাসিক নহে, ইতিহাসের পটভূমিকার উপর কল্পনার সৌধ গঠিত হইয়াছে। কূটবুদ্ধি বিশারদ আলমগীরের অবিশ্বাসী মনের সহিত বুদ্ধিমতী উদিপুরী বেগমের বুদ্ধির প্রতিযোগিতা ও প্রভাব এবং তজ্জনিত অন্তর্দ্বন্দ্বে আলমগীরের পরাজয় ইহার মূল সুর। আলমগীর ও উদিপুরীর মধ্যে সংলাপগুলি প্রকাশ্য হইলেও তাহা অন্তর্মুখীন ও বহু ইঙ্গিতপূর্ণ। এ জাতীয় সংলাপ রচনায় নাট্যকার বিলক্ষণ পটুতা দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের সংলাপ এই মন্তব্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। নানা পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি বিভিন্ন চরিত্রের আলোকপাত করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের কেন্দ্রানুগ দৃষ্টিভঙ্গী যেন ব্যাহত হইয়াছে এরূপভাবে ঘটনাবলি উহাতে সমাবিষ্ট। কতকগুলি ঘটনা নাটকীয় নানা জটিল পরিস্থিতির ভিতর দিয়া জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। আলমগীর তাঁহার জিজিয়া করের যে ব্যাখ্যান (দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে) দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার উদাসীন বৈরাগী চরিত্রের অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করা হইয়াছে, এটা তাঁর কূটনীতির সমার্থক।

ভীমসিংহের বিমাতা বীরাবাঈ মাতৃমূর্তির মোড়কে সে সব ঘটনার সৃষ্টি করিয়া নাটকের পাঠক ও দর্শক সমাজকে চমৎকৃত করিয়াছেন, তাহার কেমন একটা অস্বাভাবিকতা ঐ রসকে দানা বাঁধিবার সুযোগ দেয় নাই। ঐ চমৎকৃতি চমকের গুণে আসিয়াছে, ভাবের গুণে নহে। যেখানে আলমগীরের

অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশের সুযোগ ঘটিয়াছে সেখানে সেই বিষয়ক কথাগুলির মধ্যে শেক্সপীয়রের নাটকের অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রতিবন্দ্বিতায় উদিপুরী বেগমের কথাগুলি ঐ একই সুরে বাঁধা। নাটকের উপসংহারে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলনের সুর জাগিয়া উঠিয়া নাটকীয় প্রধান চরিত্র দুইটির চারিত্রিক সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। পিপাসায় বারিদান ব্যাপারটি ইহার যাবতীয় সংকটপূর্ণ মুহূর্তগুলিকে একাধিকবার পরিচালিত করিয়াছে।

গদ্যের মাধ্যমে নাটকখানি লিখিত। ভাষায় তেজ, তীক্ষ্ণতা, লালিত্য, ব্যঙ্গ ও কবিত্ব যেখানে যাহা প্রয়োজনীয় তাহা যথাযথ প্রকাশিত হইয়াছে। সংগীত বিভাগেও ইহা বৈশিষ্ট্যহীন নহে, সাত আট খানি গান বেশ সুপ্রযুক্ত হইয়াছে। নাটকখানির সুর অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া আলমগীরের পরাজয়ধ্বনি সূচিত করিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সুর জাগিয়া উঠিলেও উহাকে পরবর্তী ইতিহাস মিলনাত্মক করিতে পারে নাই, তাই নাটকখানিকে বিষাদান্তই বলিতে হইবে। এখানি ট্রাজেডি শ্রেণীর অন্তর্গত।

নাটকখানি নূতনতর প্রকাশভঙ্গীর প্রকাশক, নমুনা :—(দ্বিতীয় অঙ্কের ১ম দৃশ্যে) "কি শুষ্ক, কি কঠোর, কি উত্তপ্ত শিলা প্রান্তর। আকাশ সেখানে কখন মেঘের অবগুণ্ঠন মুখে দেয় না। পাহাড় সেখানে কাঁদ্‌তে জানে না। বায়ু সেখানে অগ্নিকণায় নিজের তৃষ্ণা নিবারণ করে।" (ঐ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে —"যে দিন সে বিশাল জলাশয় আমাকে তার অঙ্গ স্পর্শ কর্‌তে দেখে অগণ্য হিল্লোলে আমার গায়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিল। হ্রদের তীরে আমার সম্বর্দ্ধনা কর্‌তে দেবতাপ্রেরিত দূতের মত সারি সারি দেবদারু। তাদের কাঁধে ভর দিয়ে পত্রাবগুণ্ঠনে অসংখ্য পরীর জয় গান।" অলংকারপূর্ণ প্রকাশভঙ্গীর একটা নমুনা :—(দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে) "প্রভাতের অরুণ আমাকে অঙ্গারবর্ণা প্রেতিনী কর্‌বার জন্য উদয়-অচলের অন্তরালে ব'সে এখন থেকেই আমার বুকের রক্ত দিয়ে তার ক্রুদ্ধ চক্ষু রঞ্জিত কর্‌ছে।" (পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে) আরাবল্লীর বর্ণনাভঙ্গীটি চমৎকার —"না মহীয়ান্, না—তোমার আরাবল্লী—চির অচল, চির অকম্প—আকাশের মহত্ত্বের মুকুট-পরা শৈলরাজ ভাঙ্‌বে কেন ? তার মাথার উপরে তারার ফোয়ারা, পদতলে অগণ্য তৃষিতের তৃপ্তিধারা।" (তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে)—"যে খাঁটি রাজপুত্‌নী, মর্য্যাদা ত আর চরণরেণুতে প্রতি পাদক্ষেপে সৃষ্টি হয়। তার আবার মর্য্যাদানাশের ভয়।"

রত্নেশ্বরের মন্দিরে

নাটকখানি ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে কর্ণওয়ালিস্ থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। রত্নেশ্বর মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া বীরনগর ও তন্নিকটবর্তী স্থানের ভূম্যধিকারীদের যে আত্মকলহ ঘটিয়াছিল তাহারি কাহিনী এই নাটকের উপজীব্য। কিংবদন্তীকে আশ্রয় করিয়া এই সামাজিক নাটকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যান্য দৃশ্যকাব্যের তুলনায় ইহার লিখন-পদ্ধতির পার্থক্য আছে। এ নাটকের দোষ এই, যে কোন একটা নূতন ঘটনা ঘটিবার কালে তৎসংলগ্ন সংলাপগুলি কেমন একটা অস্পষ্টতার রূপ ধারণ করে। ইহার নাটকীয় সংঘাতগুলি ঘাতের উপর যথাযোগ্য প্রতিঘাত তুলিতে পারে নাই, যেমন, (প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে) বৃদ্ধা ও রত্নেশ্বরের সংলাপ দ্রষ্টব্য। (প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে) জটাধারী সিং, তাঁহার স্ত্রী ও ভৃত্যগণ

লাঠি হস্তে রত্নেশ্বরকে শাসন করিতে আসিয়া কার্যকারণ ব্যতিরেকে তাহারা হঠাৎ রত্নেশ্বরের ক্ষমা ভিক্ষা করিল। এ ব্যাপারটি একেবারেই নাটকীয় সংঘাতশূন্য। (প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে) রত্নেশ্বর বেগে প্রবেশ করিয়া সুরমার হস্ত হইতে অতর্কিতভাবে বন্দুক কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল। এ ঘটনায় মুখ্যভাবে সুরমার জীবনরক্ষা ঘটে নাই বা সে আক্রান্তও হয় নাই। এরূপস্থলে মথুরমোহনের—"ওই কে, কোথা থেকে উড়ে এসে তোমার জীবন রক্ষা ক'রে উড়ে গেল"—বলার নাটকীয় সার্থকতা নাই। (প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে) মাধব, সুরমা ও রত্নেশ্বরের সংলাপের নাটকীয় সংঘাতটি স্বল্প, স্পষ্ট ও নাটকীয় হইয়াছে।

নাটকের মধ্যে এক এক স্থানে বেশ প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন—(দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে) 'মামী আর তার ভাই হ'ল' 'তিনি' আর আমি হলুম 'তুমি'।

সুরমা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নাটকের মধ্যে বেশ ফুটিয়াছে, এবং এ ধরণের চরিত্র নাট্যসাহিত্যে কমই পাওয়া যায়। ইহার সংগীতগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে নাটকের প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্যত্র গাওয়া যায় না, কারণ খেই হারাইবার ভয় আছে। সংগীতের এরূপ নাটকীয়তা খুব কম নাটকে দেখা যায়। মোট আঠারখানি গানের মধ্যে ২।৩ খানি নাট্যকার রচনা করেন নাই। গল্পের মাধ্যমে মৃদুমন্দগতিতে নাটকখানি অগ্রসর হইয়াছে।

বিদূরথ

নাটকখানি আল্‌ফ্রেড থিয়েটারে বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি দ্বারা ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ তারিখে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। পালি ভাষায় বুদ্ধদেবের উপাখ্যানের মধ্যে বিদূরথের কাহিনী পাওয়া যায়। সেই ঐতিহাসিক অংশের উপর নির্ভর করিয়া নাট্যকার কল্পনার কুহকজাল রচনা করিয়াছেন। রূপ বর্ণনার একটি নূতন প্রকাশভঙ্গী সুন্দর (দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে)—"অন্ধ যদি তোমার চিবুকে হাত দেয়, অমনি বলে উঠ্‌বে সুন্দর। তোমার রূপ পরশ দিয়ে কথা কয়।"

শতজন্মের অজ্ঞানান্ধকার কিরূপে মানুষের মন হইতে দূরীভূত হয়, তাহারি একটি প্রকাশভঙ্গী (তৃতীয় অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যে)—"বৎস! হাজার বৎসরের অন্ধকার-ভরা ঘর দীপালোকে যখন উজ্জ্বল হয়, তখন কি একটু একটু ক'রে হয়, না একেবারে হয়?"

নাটকখানির অগ্রগতি কেমন একটা অস্পষ্টতার আবরণের ভিতর দিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য নাটকের দর্শক বা পাঠকের অনুসন্ধিৎসা ব্যাহত হইয়াছে। নাটকের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সংঘাত আছে, এবং সেগুলি আসিবার পূর্বেই কোন আকস্মিক ঘটনা দেখা দেয়, এইটিই নাট্যকারের কৌশল।

চিত্রা, অম্বা ও বিদূরথকে লইয়া তৃতীয় অঙ্কে নাটকের পরাকাষ্ঠা দেখানো হইয়াছে। চিত্রা নাগরাজ কন্যা, অম্বা অযোনিসম্ভবা, বুদ্ধদেব কর্তৃক অনুগৃহীতা এক নারী। অম্বা চিত্রাকে ছবি বলে। নাগরাজ মানুষের প্রতি আসক্ত স্বীয় কন্যা চিত্রাকে কাটিতে আসিয়া অম্বাকে দেখিয়া যে ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন তাহার ফলে উভয়ে পরিত্যক্ত হইল ও বিদূরথ নবজীবন ও নাগাস্ত্র লাভ করিল। সংঘাত হিসাবে এই দৃশ্যটি এত মৃদু যে চতুর্থ অঙ্কে নূতন কাহিনী লইয়া বিদূরথের নূতন জীবনলাভের মোড় ফিরাইতে তাহা কার্যকরী হওয়ার যোগ্য হয় নাই। কাজেই নাট্যকারের এ নাটকে পরাজয় ঘটিয়াছে।

নাট্যকার বুদ্ধের মুখ দিয়া বর্ণভেদের এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—(চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে) "একমাত্র ধর্মই হচ্ছে বর্ণের মাপকাঠি। ধর্মে যে যত উচ্চ, বর্ণেও সে সেই মত উচ্চ। শ্রেষ্ঠ ধার্মিক যে সেই ব্রাহ্মণ। নিকৃষ্ট ধর্মাবলম্বী হচ্ছে শূদ্র।" অহিংসা সম্বন্ধে ঐ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে অম্বা বিদুরথের নিকট হইতে নাগাস্ত্র ভিক্ষা চাহিয়া লইয়া এইরূপ বলিল—"অহিংসা সত্যের রূপ, সত্য অহিংসার প্রাণ।" "এই নাও জলপতি—সত্যকে যারা বরণ করে, তাদের বিবাহের যৌতুক হিংসাস্ত্র নয়! (অস্ত্র নিক্ষেপ। সর্পাকারে জলমধ্যে বুদ্ধের প্রবেশ ও অস্ত্রের অন্তর্ধান)" মোট তের খানি গান লইয়া গদ্যের মাধ্যমে নাটকখানি লেখা হইয়াছে।

নর-নারায়ণ

পৌরাণিক নাটকখানি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে নাট্যমন্দিরে নাট্যমন্দির লিমিটেড্ কর্তৃক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল এবং ঐ সালের নভেম্বর মাসে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ এই নাটকখানি পরিণত বয়সে লিখিয়াছিলেন, ইহার ভাষা গাম্ভীর্যপূর্ণ. সংলাপগুলির মধ্যে অনাবশ্যক কথা নাই। এগুলি পূর্বাপর সম্বন্ধযুক্ত (contextual), জনসাধারণ অপেক্ষা শিক্ষিত সমাজ ইহা বেশি উপভোগ করিয়াছেন। অতি অল্প নাটককারই এই ধরণের সংলাপ লিখিতে পারেন। সংলাপকারীর মুখের কথা যেন কাড়িয়া লইয়া কথা বলা এ সংলাপের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

স্থানে-স্থানে প্রকাশভঙ্গীর নূতনত্ব আছে, যেমন (প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে) কর্ণ ভীষ্মকে বলিয়াছেন—

"* * আজিও পর্যন্ত করেছি কি কোন দিন
মনেরও অক্ষর দিয়া অনিষ্ট তোমার?"

(দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে) কৃষ্ণ তাঁহার বিভুত্ব প্রকাশসূচক কথায় কৌরবকে বলিতেছেন—

"আমি একা, চিরস্থিতি আপনারে ঘেরে,—
আমি বহু-মুক্তিরূপ—
জগতের বন্ধন ভিতরে।
আমি অনু—
বন্ধন আমারে কভু খুঁজিয়া না পায়,
আমি মহৎ—বসে আছি এ বন্ধন সীমায়।"

কর্ণগৃহে শ্রীকৃষ্ণের মিলন দৃশ্যটি কর্ণজীবনের পরাকাষ্ঠা বহন করিয়াছে, বড়ই ধীর ও সংযতভাবে এ ঘটনাটি ঘটিয়াছে। ভাবসমৃদ্ধি বশতঃ উদ্দামগতি ইহার মধ্যে নাই। নাট্যকার গতানুগতিকা ত্যাগ করিয়া নূতন ধরণের নাটকীয় পরাকাষ্ঠা আনিলেন। কুরুক্ষেত্র-সমরে পাণ্ডবদের জয় কেন হইয়াছিল, তাহার মূলভিত্তি দ্রৌপদী তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে এই কথাটির মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছেন—

"যেখানে কৃষ্ণের স্থিতি, সেখানে ধর্মের স্থিতি।
যেখানে ধর্মের স্থিতি জয় সেই স্থানে।"

মহাভারতের ঘটনাকে কল্পনার রংয়ে চড়াইয়া নাট্যকার কর্ণের বীরত্ব-ব্যঞ্জক ভাষা অনুধাবনীয় ও তাহার ব্যঙ্গ অন্তের উপভোগের বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে কর্ণপ্রয়াণ

ব্যাপারটির গূঢ় রহস্য নাট্যকার নিপুণ হস্তে দর্শক বা পাঠক সাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন। বাক্যরচনা এতই চাতুর্যপূর্ণ যে সংক্ষিপ্ত বাক্যের পেষণে চারিধারে স্ফুলিঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে। রাধেয়ের কৌন্তেয় জ্ঞান তত্ত্বহিসাবে কতটা কার্যকরী হইয়াছে ভবিষ্য সুধীজন তাহার মীমাংসা করিবেন।

নাট্যকার কর্ণ ও পদ্মাবতী চরিত্রে নূতন আলোক দান করিয়াছেন, তাহার মূলভিত্তি যদিও মহাভারতীয় ব্যাখ্যা নাটকীয় গুণে নিষ্পন্ন হইয়াছে। পৌরাণিক নাটকে তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন ব্যাপারটি গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবনের 'তপোবল' নাটক ছাড়া আর প্রায় দেখা যায় না। পাঁচ ছয় খানি গান লইয়া চারিটি অঙ্কে নাটকখানি অমিত্রাক্ষর ও গদ্যে সম্পূর্ণ।

রাধাকৃষ্ণ

গীতিনাট্যটি পূর্বরচিত বৃন্দাবনবিলাস নামক নাটিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে। এখানি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগস্ট সোমবার জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে নাট্যমন্দিরে অভিনীত হইয়াছিল এবং ঐ সালেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। জটিলা, কুটিলা ও আয়ানের চিরাচরিত কাহিনী ইহার উপজীব্য, নূতনত্বের মধ্যে নাটিকাকার মহাজন পদাবলীর সুষ্ঠু প্রয়োগ করিয়া প্রতি ঘটনার অনুকূলে বা প্রতিকূলে তাহাদের ব্যবহার রাখিয়াছেন। কালীভক্ত আয়ানের মুখে কথার মাত্রা হিসাবে 'কালীব'লে' কথাটি রাখিয়াছেন। কৃষ্ণের দেয়াশিনী ও কৃষ্ণকালী মূর্তিধারণ ইহার পরাকাষ্ঠা। তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত এখানি বিস্তৃত।

নাট্যসাহিত্যে হাস্যরসিক কবি ও নাটককার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাল এবং স্থান (১৮৯৫—১৯১৬ খৃঃ)

নাট্যসাহিত্য-ক্ষেত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদের অবদান শেষ হইতে না হইতে হাস্যরসিক কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাহাতে নাটককাররূপে অবতীর্ণ হইলেন। নূতনত্বের মধ্যে নাটকের অবয়বে যেগুলি বন্ধনীর আবেষ্টনের মধ্যে অপরকে বুঝাইবার জন্য অন্য নাট্যকার রাখিতেন সেগুলিকে দ্বিজেন্দ্রলাল বন্ধনমুক্ত করিয়া উপন্যাসকারের টিপ্পনীর মতো প্রকাশ করিয়া দিলেন। আর দ্বিজেন্দ্র-পূর্ব নাট্যকারদের দীর্ঘ স্বগতোক্তিকে (soliloquy) অপেক্ষাকৃত ছোট আকারে প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। কোন কোন দৃশ্যকাব্যে তাহা বর্জন করিয়া নূতন প্রকারের স্বগতোক্তি দেখাইয়াছেন। নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীর পরিচয়ের জন্য যে প্রথা দ্বিজেন্দ্রের পূর্ববর্তী নাট্যসাহিত্যে প্রচলিত ছিল, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার কোন কোন নাটকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্রতি দৃশ্যের অব্যবহিত পূর্বে পাঠক বা দর্শকের সহিত তাহাদের পরিচিত করাইয়াছেন। অভিনেতা-অভিনেত্রী ও পট-সজ্জাকারের করণীয় কার্যের নির্দেশ ও প্রয়োগকর্তারূপে নাট্যকার স্বয়ং দিতে শুরু করিলেন। এই কয়টি লইয়া নাটকের একটি নূতন ধারার তিনি প্রবর্তক হইলেন। বিলাতী নাটকের কায়দায় কাহারও কাছ থেকে কোন কিছু কথা জোরের সহিত আদায় করিতে হইলে দ্বিজেন্দ্রলাল সপদদাপে জিজ্ঞাসা

করিতেন। এ পদ্ধতিটি তাঁহারই নূতন সৃষ্টি। দ্বিজেন্দ্রপূর্ব নাট্যসাহিত্যে ইহার উল্লেখ অত্যন্ত বিরল ছিল। ইহার ঘন-ঘন উল্লেখ তিনিই করিয়াছেন। কতকগুলি দৃশ্যকাব্যে নাটককার পাত্র-পাত্রীর পরিচয় পত্রে 'কুশীলবগণ' এই নূতন নামে তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন, যদিও ঐ নামটি নট-নটীর উপরই প্রযোজ্য পাত্র-পাত্রীর উপর নহে।

দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা সংক্ষিপ্ত (terse) এবং সংলাপগুলি তীক্ষ্ণ, তবে পাত্র-পাত্রী ভেদজনিত কোন তারতম্য নাই, সর্বত্র সমান ও অলংকারমণ্ডিত। তাই বৈচিত্র্যহীন, ইহা কি কথোপকথনে, কি সংগীতে সর্বত্র এক। হাস্যরসিক কবি গম্ভীর নাটকের মধ্যে হাস্যরসকে চাতুর্যের সহিত পরিবেশন করিতে পারেন নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাট্যসাহিত্যে স্বাদেশিকতা, সংলাপের তীব্রতা, ভাব প্রসারণের ভাষা ও অলংকার বৃদ্ধি করিয়া নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। নাটকের আসল রূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁহার নাটকে নিপুণতরভাবে দেখা যায়। কোন্ নাটকে কি করিয়াছেন পশ্চাদোল্লিখিত তালিকার মধ্যে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

নাটকের মধ্যে ভাবদ্বন্দ্ব ও সূক্ষ্ম সংঘাত আনিবার চেষ্টা দ্বিজেন্দ্রলাল করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্বত্র কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

সমাজ বিভ্রাট ও কল্কি অবতার

নাট্যকার এখানিকে প্রহসন বলিয়াছেন এবং নূতন পদ্ধতিতে লেখা প্রস্তাবনার ভিতর তজ্জন্য নানা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সম-সাময়িক সমাজ বিভ্রাটের চিত্র ইহাতে নাচ-গান-হাসি ও রঙ্গরসের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়াছে। ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই। পণ্ডিত, গোঁড়া, নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, বিলাত-ফেরত প্রভৃতি লইয়া যে যে সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল তাহাদের নগ্ন চিত্রই প্রদর্শিত হইয়াছে। পদ্যরূপী গদ্যে এখানি লিখিত। নানা ঘটনার সংঘাতে বিচিত্র কৌশলে হাস্যরসকে প্রহসনকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, এ কৌশলে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। বাক্যচ্ছটাকে কি করিয়া হাস্যরোলে ধ্বনিত করা যায়, তাহা তিনি ভালই জানিতেন। গোঁড়া হিন্দুকে তিনি 'প্রথম অভিনয়ের প্রথম দৃশ্যে' ব্যাখ্যাত করিতেছেন—

'দেখ, আসল পাপ সব বাদ দিয়ে,
সমাজটা করেছি খাড়া ভ্রমণ এবং খাদ্যে ;—
আর সেটাও একরকম ম্লেচ্ছের উপর ক্রোধে ;
যেন মুসলমানী অত্যাচারের প্রতিশোধ এ।'

নব্যহিন্দুগিরি হোক্, গোঁড়ামি হোক্ প্রহসনকার নাট্যশেষে কলির বিচার দৃশ্যে দেখাইতেছেন যে

'ধর্ম হক, সত্য হক—যে টুকু তার মধ্যে
হাস্যকর আছে—সেটা গদ্যে কি পদ্যে
হাসা কিছু মন্দ নয়—ধর্ম তার কি ক্ষয়ে যায় ?
তার যেটা সত্য সেটা চিরকালই রয়ে যায়
হাসি মানেই গাল নয়—এরূপ হাস্য মন্দ কি।'

কবি আরও বলিয়াছেন—

'সমাজটাও কতক বিলাতি কতক দেশী
দাঁড়িয়েছে একটুখানি হাস্যকর বেশী—
তার বিষয় বল্‌তে গেলে প্রহসনই হয়ে যায়।'

কয়েকটি সমবেত সংগীত এ প্রহসনের প্রাণকে স্পন্দিত রাখিয়াছে, সেগুলির আরম্ভ এইরূপ :—(১) 'যদি জান্‌তে চাও আমরা কে আমরা reformed Hindoos,' (২) 'আমরা পাঁচটি এয়ার—' (৩) 'হো বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নব রত্ন ন ভাই।' এগুলিকে প্রহসনকার প্রথম দ্বিতীয় অভিনয় নামে অভিহিত করিয়াছেন। এটি প্রহসনকারের মৌলিক আবিষ্কার নহে, পূর্ববর্তীদের মধ্যে কেহ ঐরূপ করিয়াছিলেন। এখানি প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে অভিনীত হয় নাই, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিরহ

বিরহকে নাট্যকার নাটিকা বলিয়াছেন। প্রৌঢ়ের তৃতীয় পক্ষের শ্যামবর্ণা স্ত্রীর সহিত রহস্যময় ও হাস্যকর বিরহ ব্যাপার ইহার স্নায়ুকেন্দ্র এবং তাহাই পাঠক বা দর্শককে হাসাইয়াছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে প্রৌঢ় স্বামী নবীনা স্ত্রীকে এইরূপ প্রকাশভঙ্গি দ্বারা সম্ভাষণ করিতেছেন—"বিশেষতঃ আমার এই বৃদ্ধ (জিব কাটিয়া) প্রৌঢ় অবস্থায়। পথের মাঝখানে ঝড়-ঝাপ্‌টায় গোয়ালঘরও প্রাসাদ।" বিরহটা যাহাতে পাকা বিরহে পরিণত না হয় তজ্জন্য স্বামী স্ত্রীকে ঐ দৃশ্যেই বলিতেছেন—'এই ধর তুমি যখন বল,—আমি গলায় দড়ি দিয়ে মর্ব, আমি কি অমনি ছুটে গিয়ে তোমাকে খুব মজবুত এক গাছা দড়ি এনে দেব?' স্ত্রীলোকের চরিত্র সম্বন্ধে নাটিকাকার একটি নূতন উপমা প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দিয়াছেন—'তা হবে না-ই বা কেন? মেয়ে মানুষ ত পাহাড়ের ওপরের ঢেঁটা। রইল ত রইল! কিন্তু যদি একবার গড়ালো ত একেবারে নীচে পর্যন্ত না গড়িয়ে আর থামে না।' ঐ দৃশ্যে নদী-ঘাটে মেয়ে মহলের রসিকতার একটা তরঙ্গ এইরূপ—'তখন আমার হাসিতে কি মুক্তো গড়াত? না লাথি মাল্লে অশোক ফুল ফুটত?' প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে গোবিন্দ, ইন্দুভূষণ, রমাকান্ত ও ছবিওয়ালার সংলাপ-মধ্যে বর্ণনার খুঁটি-নাটি ও আতিশয্য নাট্যকলার ক্ষতিকর হইয়া উহা হাস্যকর বর্ণনাত্মক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এটি উদ্দেশ্যমূলক কারণ ঐ ছবিতোলাকে উপলক্ষ্য করিয়া রস-রসিকতার মধ্য দিয়া হাস্যরস এতটা প্রকট হইয়াছে যে গোবিন্দ ছবিওয়ালাকে যখন বলিল—'মশায়, কথাগুলো ফটোতে উঠ্‌বে না ত? তাঁর কাছেই ছবি যাবে।' তখন প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে হাসির রোল কেহ আটকাইতে পারিল না।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটিকায় এক ঢিলে দুই পাখি মারিয়াছেন। ক্ষণ-বিরহী গোবিন্দচরণ ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য রামকান্ত ওরফে বেচারাম ঘোষের দীর্ঘ বিরহ একই দৃশ্যে অভূতপূর্ব উপায়ে ঘুচাইয়া দিলেন। যে সংগীতগুলি এই বিরহ নাটিকায় মিলনের হাস্যরস ছিটাইয়াছে সেগুলির প্রথম ছত্র এখানে উদ্ধৃত হইল—(১) 'আমার প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে। তা রং হোক্ মিশমিশে বা ফিটফিটে।' (২) 'হেসে নেও—এ দুদিন বৈ ত নয়; কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়।' (৩) 'তোমারি বিরহে সইরে দিবানিশি কত সই। এখন, ক্ষুধা পেলেই খাই শুধু (আর) ঘুম পেলেই

ঘুমোই।' (৪) 'দেখ্ সখি দেখ্ চেয়ে দেখ্ বুঝি শিশির হইল অন্ত, বুঝি বা এবার টে'কা হবে ভার— সখিরে এল বসন্ত।' (৫) 'ছিল একটি শেয়াল—তার বাঁপ দিচ্ছিল দেয়াল—।'

গান ও গল্পের মাধ্যমে এখানি রচিত হইয়াছে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে এখানি অভিনীত হইয়াছে।

পাষাণী

নাটিকাকার ইহাকে গীতি-নাটিকা বলিয়াছেন। গ্রন্থখানি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয় সংস্করণের পাঠ ইহাতে আলোচিত হইল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে শিশির কুমার ভাদুড়ীর নাট্যসম্প্রদায় কর্তৃক নাট্যমন্দিরে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। পৌরাণিক গল্প ইহার ভিত্তি। অমিত্রাক্ষর পদ্য ও গদ্যে লিখিত হইয়া পাঁচ অঙ্ক পর্যন্ত

নাটিকার দুই এক স্থানে নূতন প্রকাশ ভঙ্গিমা আছে, যেমন প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে অহল্যার রূপবর্ণনা তাঁহার সখী মাধুরী এইরূপে করিয়াছেন—'পদ্মপত্রে কোন্ মূঢ় রঞ্জে বর্ণতুলিকায়? বিদ্যুৎ আলোকে কে দেখায় বাতি দিয়া?' শক্তিমান ও শক্তিহীনের মধ্যে প্রভেদ দেখাইতে গিয়া গৌতম মুনি চিরঞ্জীবকে প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে এইরূপ বলিয়াছিলেন—'আবর্জনা অগ্নির গায়ে লাগে না, কিন্তু তাতে জল পঙ্কিল হয়।' প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে অতৃপ্ত ভোগ স্পৃহা লইয়া অহল্যা তপস্যায় গমনোন্মুখ গৌতমকে এই বলিয়া বিদায় দিলেন—

> 'তোমার জীবনের ব্রত পুণ্যসঞ্চয়, আমার কার্য ব্যয়।
> ভিন্নরূপ গতি দুজনার ভিন্নদিকে।
> এ জীবনে হইব না মোরা কভু সম্মিলিত।
> যাও। বাড়িবে না তাহে আমাদের জীবনের গভীর বিচ্ছেদ।'

একদিকে ভোগ ও অপরদিকে ত্যাগের প্রতীকরূপে নাট্যকার গৌতম ও অহল্যাকে গড়িয়াছেন।

হাস্যরসিক কবি নাটিকার মধ্যে যেখানে সুযোগ-সুবিধা পাইয়াছেন সেখানেই তাঁহার অন্তর্নিহিত হাস্যরস উদ্গার করিয়াছেন, অবশ্য সেগুলি হাল্কা ধাতের। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় রূপক অলংকার (Metaphor) না দিয়া উপমা অলংকারের (simile) প্রয়োগ যেখানে-সেখানে করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত দেখাইবার প্রয়োজন নাই। দর্শক বা পাঠকমাত্রেই অল্প চেষ্টায় তাহার পরিচয় পাইবেন।

নাট্যকবি হিন্দুপুরাণের নিত্যস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার অন্যতমা অহল্যাকে কামলিপ্সু সাধারণ মানবীরূপে সৃষ্টি করিয়া পুরাণের অবমাননা করিয়াছেন। ঘটনার সাহায্যে পুরাণের চরিত্রকে উন্নত করিবার অধিকার দৃশ্যকাব্য প্রণেতার থাকে, যেমন গৌতম চরিত্রকে তিনি করিয়াছেন। কিন্তু অহল্যার চরিত্রকে স্বেচ্ছাকৃত ব্যভিচারে লিপ্ত ও নিজ শিশু পুত্রের হত্যাকারিণী করিয়া অবনমিত করিবার অধিকার তাঁহার নাই, বিশেষতঃ তিনি যখন বহুলোকের নিত্য স্মরণীয়া দেবী। কাল ব্যতিক্রমও (Anachronism) এই নাটিকার মধ্যে দেখা গিয়াছে। সত্যযুগের অভিশপ্ত পাষাণী অহল্যা ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তাহার ব্যতিক্রম আছে।

তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে ইন্দ্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া অহল্যা যখন প্রতিহিংসা পরবশে ইন্দ্রের স্কন্ধদেশ ছুরিকা দ্বারা বিদ্ধ করিলেন তখন সেই ভয়াবহ ও গম্ভীর দৃশ্যের মধ্যে মদন ও রতির 'য পলায়তি স জীবতি' বলিয়া পলায়ন ব্যাপারটি ঐ দৃশ্যকে লঘু করিয়া দিয়াছে। কৃতি নাট্যকারের এ ত্রুটি লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

গৌতমশিষ্য চিরঞ্জীব ও তাঁহার স্ত্রী মাধুরী মৌলিক চরিত্রদ্বয় নাটিকাখানিকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, প্রথমটি তাঁহার হাল্‌কা আব্‌হাওয়া দ্বারা এবং দ্বিতীয়টি তাঁহার একান্ত আত্মসমর্পণের দ্বারা। ইহাতে ২২ খানি গান আছে, তন্মধ্যে (১) 'আপন মনে কি বলে, আপন মনে কি যে গায়' ও (২) 'বুড়ো বুড়ী দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকৃত। বুড়ী ছিল পরম বৈষ্ণব বুড়ো ছিল ভারি শাক্ত' শীর্ষক গান দুইখানি বহু বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

এ নাটিকায় অহল্যা পাষাণে রূপান্তরিত না হইয়া আপনাকে স্বরূপতঃ পাষাণী বলিয়াছেন এবং গৌতমের শাপপ্রভাবে তাঁহাকে ঐ দশা পাইতে হয় নাই, স্বামী ও পুত্রের প্রতি হৃদয়হীন ব্যবহার করিয়া তাহা লাভ করিলেন। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে তিনি উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এ কথার সামঞ্জস্য-রক্ষার্থ তিনি মিথিলায় আগত রামচন্দ্রের পদধূলিও লইয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক নাটক কমই রচনা করিয়াছেন। ইহাতে পৌরাণিকী দেবীকে মানবীতে পরিণত করিয়াও পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই। হিন্দুর পরম্পরাগত সংস্কার ও বিশ্বাসকে বজায় রাখিয়া মহাকবি গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকের মধ্যে যে পৌরাণিক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা পারেন নাই।

ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার

এই প্রহসনখানির তৃতীয় সংস্করণের পাঠ আমাদের আলোচ্যের বিষয় হইয়াছে। এখানি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। স্টার থিয়েটারে এটিকে অভিনীত হইতে দেখা গিয়াছিল, অভিনয়-তারিখ সংগৃহীত নাই। হাস্যরসিক নাট্যকবি এই প্রহসন-খানির অন্তর্গত সংগীত ও বক্রোক্তির ভিতর দিয়া বহুদার-পরায়ণ রাজোপাধিক বিবাহবাতিক এক বৃদ্ধ ব্যক্তি, তাহার পুত্র ও পৌত্র—এই তিন পুরুষকে ত্র্যহস্পর্শ নাম দিয়া হাস্যরসের যে স্রোত বহাইয়া দিয়াছেন তাহাই উপভোগের বস্তু হইয়াছে। ঘটনাবলি এমনভাবে সাজানো যে হাস্যরসকে ডাকিয়া আনিতে হয় না, স্বতঃ উৎসারিত হইয়া উঠে। উহাদের সহিত এক হাতুড়ে ডাক্তার, দেশ উদ্ধারকারী বালকের দল ও রাজার মোসাহেবগুলি ঐ রসের পরিপাকে ইন্ধন যোগাইয়াছে।

যাঁহারা ইহার মধ্যে প্লটের বাহাদুরি বা তাহার বিন্যাসের কৌশল বা যুক্তি খুঁজিতে যাইবেন তাঁহারা ঐগুলি তো পাইবেন না, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাস্যরসকে হারাইবেন। যে কয়টি গান ও সমবেত সংগীত হাস্যরসকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে তাহাদের প্রথম ছত্র এইরূপ :—

(১) 'পারত, জন্মোনা কেউ, বিষ্যুৎবারের বারবেলা,
জন্মাও ত সাম্‌লাতে পারবে না'ক তার ঠেলা।'

(২) 'দেখ, হ'তে পার্‌ত্তাম আমি মস্ত একটা বীর,
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয়না স্থির।'

(৩) 'আমরা খাসা আছি;
হাস্য পেলেই হাস্য করি নৃত্য পেলেই নাচি।'

(৪) 'কীর্ত্তিচন্দ্র কর্ত্ত বড় বীরত্বের বড়াই।'

(৫) 'খাও, দাও, নৃত্য কর, মনের সুখে।
কে কবে যাবিরে ভাই, শিঙে ফুঁকে।'

(৬) 'এ জীবনে ভাই,
একটুকু যদি বিমল আমোদ চাও গো,
মাঝে মাঝে মাঝে, মনরে আমার, চুকু চুকু চুকু খাও'

(৭) 'যদি জান্তে চাও আমি ঠিক্ কি রকম স্ত্রী চাই,
ফর্শা কি কাল কি মাঝারি রং
লম্বা কি বেঁটে, কি ক্ষীণা কি পীনা' ইত্যাদি।

(৮) 'এরেই বলে প্রেম।
যখন থাকে না future এর চিন্তা থাকে না ক shame.'

(৯) 'প্রেমটা ভারি মজার ব্যাপার
প্রেমিক মজার জিনিস।
ও সে জানোয়ারটা হাতায় পেলে
আমি ত একটা কিনি, বোধ হয় তুইও একটা কিনিস্।'

যে দুইখানি গান বহু বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে তাহার প্রথম ছত্র এইরূপ :—(১) 'বসিয়া বিজন বনে, বসন আঁচল পাতি, পরাতে আপন গলে, নিজ মনে মালা গাঁথি।' (২) 'ভালবাসি যারে সে বাসিলে মোরে আমি চিরদিন তারি।' তিন অঙ্কে প্রহসনখানি বিস্তৃত, ভাষাটা কথ্য গদ্য।

প্রায়শ্চিত্ত

নামক প্রহসনখানি ক্লাসিক থিয়েটারে প্রহসনের সর্বশেষ কথাটি ধরিয়া 'বহুৎ আচ্ছা' নামে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি তারিখে প্রথম অভিনীত হইয়াছে এবং তাহার পরেরদিন গ্রন্থাবয়বে প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ আলোচিত হইল। প্রহসনকার এখানিকে নাটিকা বলিয়াছেন। নব্য হিন্দু দল ও বিলাত ফেরৃতা সমাজের মধ্যে যে দোষগুলি ঢুকিয়া তাহাকে পঙ্কিল করিতেছিল এখানিতে তাহাই দেখানো হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের পাঠ যাহা অভিনয়কালে পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহা প্রহসনকার তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে বাদ দিয়াছেন। পাত্র-পাত্রীর পরিচয়-পত্রে প্রহসনকার 'কুশীলব'গণ না বলিয়া চিরাচরিত প্রথায় নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন।

এই প্রহসনের মধ্যে হাস্যরসিক কবি দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস বেশ ফুটিয়াছে। সংগীতগুলিও সে কাজে রসান দিয়াছে। ইহার লিখন পদ্ধতি ও রচনা বিন্যাস হাস্যরসকে জোর করিয়া ডাকিয়া আনে। বাঙালীর সাহেবিয়ানার নেশা আজ কাটিয়া গিয়াছে, তাই এ জাতীয় প্রহসন সমাজে অচল। প্রহসনের মধ্যে মোট ১২ খানি গান আছে, তন্মধ্যস্থিত বাঙালা ও ইংরাজি মিশ্রিত যমল গানগুলি দর্শক ও পাঠক সমাজকে হাসির তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া যায়।

তারাবাঈ

নাটিকাখানি ঐতিহাসিক। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ লইয়া আলোচনা করিয়াছি। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে এখানি ইউনিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। টডের রাজস্থান এই নাটিকার ভিত্তিভূমি হইলেও অপ্রধান ঘটনাগুলিতে নাটিকাকারের পরিকল্পনা স্বাধীনভাবে ক্রীড়া করিয়াছে। এখানি চৌদ্দ-অক্ষর-মণ্ডিত অমিত্রাক্ষর পদ্যে রচিত।

শূরতান রাণী রাজাকে অদৃষ্টের বিরুদ্ধে অধ্যবসায়ের নূতন বাণী প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে এইরূপে শুনাইয়াছেন :—

> 'প্রেরিত হয় না নর, বিশ্বে তৃণসম
> ভাসিয়া যাইতে, যে দিকে লইয়া যায়
> তরঙ্গ, তরীর মত যাইতে হইবে
> বাহিয়া বিপক্ষে তার, প্রয়োজন যদি।'

ঐ অধ্যবসায় সম্বন্ধে শূরতানরাণীর আর এক বাণী দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে এইরূপ :—

> 'হায় ধিক! নিরুদ্যম বসিয়া রহিবে
> সচল বিশ্বের মাঝে জড়জীব সম?'

দ্বিজেন্দ্রলাল নাটিকার মধ্যে দৃঢ়সংকল্পা তারাকে দিয়া প্রেম সম্বন্ধে যে নূতন মন্তব্য করাইয়াছেন তাহার নমুনা দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে এইরূপ :—

> 'প্রেম বিলাসীর স্বপ্ন, সাধকের নহে।
> জাগে না বেণুর স্বরে নিদ্রিত যে জন;
> তূরীধ্বনি চাই।'

দেশ হিতৈষণার খাতিরে মাতৃভূমির উদ্ধারকারীকে জয়চাঁদের কাছে দেহদান ও সতীত্ব বিক্রয়ের যে যুক্তি তারা দেখাইল এবং বিবাহের যে প্রতিজ্ঞা করিল তাহা সর্বৈব টিকে না, কারণ এখানে 'ক্ষুধাতুর' তারা নিজে নহে—জয়চাঁদই। নাটিকাকার ভাবাবেশে এ ত্রুটি দেখিতে পান নাই।

'কালোহি বলবত্তরো', তাই ভবিষ্যদ্দৃষ্টিসম্পন্ন নাট্যকবি দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার 'তারাবাঈ' দৃশ্যকাব্যের যে দুইটি দৃশ্য অঙ্গ অজুহাতে পাঠক বা অভিনয়কারীদের বর্জন করিতে উপদেশ দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই নাটকাংশে অত্যন্ত হীন, এবং নাটিকাকার তাঁহার এ ত্রুটি দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্বেই ধরিতে পারিয়াছেন তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় ও চতুর্থ দৃশ্য তাই বর্জনীয় হইয়া গিয়াছে এবং তাহার আলোচনাও আলোচনাকারীর কাছে অবান্তর দাঁড়াইয়া গেল।

নবোঢ় প্রেমিকের চক্ষুতে জগৎ ও তাহার প্রণয়িনী নূতন রংয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। দ্বিজেন্দ্রলাল তৃতীয় অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে পৃথ্বীরাওয়ের মুখে সেই নূতন আভাষ দিয়াছেন যাহা পূর্ববর্তী নাট্যকারদের নাট্যসাহিত্যে পাওয়া যায় নাই :—

> 'প্রাণেশ্বরী!
> নাহি জানিতাম ছিল কঠিন ভূতলে

এ স্থির চপলা স্নিগ্ধ, এ জ্যোৎস্না জমা
সজীব সৌরভ এই, শরীরী সংগীত।'

এই প্রকাশভঙ্গিমাটি সম্পূর্ণ নুতনতর।

নাটিকার অভ্যন্তরে বহুস্থানে নাটকীয় সংঘাত আসিয়াছে এবং সেগুলি কার্যকরীও হইয়াছে, কিন্তু উহার অগ্রসর পথে শেষের সংঘাতগুলি মন্থরগতি দ্বারা দর্শক বা পাঠককে উচ্চ স্তরে উঠাইয়া তাহাদের বর্তমান অবস্থা ভুলাইয়া দিতে পারে নাই, তাই ট্রাজেডির আসল কাজ নাটকের শেষে বিষাদান্তের অনুরণন ক্রিয়া পৃথ্বী ও তারার মৃত্যুর পরও কোন স্পন্দন আনিতে পারিল না। ১১ খানি গান লইয়া পাঁচটি অঙ্কে সমাপ্ত। গানগুলির কোন আকর্ষণীশক্তি ছিল না।

রাণাপ্রতাপ সিংহ

এই ঐতিহাসিক নাটকখানি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। গ্রন্থের দশম সংস্করণের পাঠ আলোচিত হইল। নাটকখানি গদ্যের মাধ্যমে লেখা ও পাঁচ অঙ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত।

মধ্যে মধ্যে নাটককার চমৎকার প্রকাশভঙ্গী দিয়াছেন। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সুখ-দুঃখের কথায় ইরা মাতাকে বলিতেছেন—'দুঃখ শিকড়ের মত মাটি থেকে রস আহরণ করে, সুখ পত্র-পুষ্পে বিকশিত হ'য়ে সেই রস ব্যয় করে। দুঃখ বর্ষার মত নিদাঘতপ্ত ধরণীকে শীতল করে, সুখ শরতের পূর্ণচন্দ্রের মত তার উপরে এসে হাসে।' ভ্রাতৃস্নেহ সম্বন্ধে তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে মেহের উন্নিসা ও সেলিমের কথোপকথনের মধ্যে নুতন ভাব ব্যক্ত হইয়াছে—'ভাইয়ের সম্বন্ধ জন্মাবধি। আমরণ তার বিচ্ছেদ হয় না। শক্ত যখন প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্বেষবশে প্রতিহিংসা নেবার জন্য মোগলের দাসত্ব নিয়েছিল, তখন তোমাদের বোঝা উচিত ছিল যে এ বিদ্বেষ ভ্রাতৃস্নেহের রূপান্তর মাত্র; সে রূপান্তর বিরূপ বিকট কুৎসিত বটে তবু সে ছদ্মবেশী ভ্রাতৃস্নেহ। প্রতিহিংসায় ভালবাসা লোপ পায় না সেলিম! চিরদিনের স্নিগ্ধমধুর বায়ু হিল্লোল ক্ষণিকের ভীষণ ঝঞ্ঝারূপ ধারণ করে মাত্র।'

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষের দিকে প্রথম নাটকীয় সংঘাত দেখা দিল এবং তাহা শক্ত ও প্রতাপ সিংহের পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় উক্ত অঙ্কের সর্বশেষ কথা 'ভাই ভাই' ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। একের প্রতিহিংসা উভয়ের মিলনের কারণ হইল, যদিও ইরা ও শক্তসিংহের সাক্ষাৎকার এই সংঘাতটি আনিবার অনুকূলে পূর্বেই কাজ করিয়াছিল।

চতুর্থ অঙ্কে নাট্যকার পর পর ঘটনার বিবৃতি দিয়াছেন। সংঘাত নাই বলিলেই চলে। ষষ্ঠ দৃশ্যে রাণা প্রতাপ কন্যার মৃত্যু প্রভৃতি পারিবারিক দুর্ঘটনায় দোলায়মান চিত্ত লইয়া আকবরকে আত্মসমর্পণের চেষ্টা করিলে মন্ত্রীর অর্থানুকূল্যে প্রতাপের মত পরিবর্তিত হইয়া অতি মন্থর গতিতে ঘাতে প্রতিঘাত উঠিল। পঞ্চম অঙ্কই এ নাটকের শেষ অধ্যায়। এ নাটকখানি নাট্যকারের যশোলাভের সহায় হইল না। ইহাতে প্রেম, দেশাত্মবোধ, বংশগৌরব, ত্যাগ, হিন্দুমুসলমানের বৈবাহিক সম্বন্ধ সবই আছে, কিন্তু সব সত্ত্বেও লক্ষ্যের কেন্দ্রীকরণ চেষ্টা নাই। পৃথক চিত্র হিসাবে সেগুলি বড় হইয়া গিয়াছে, নাটকীয় ক্রিয়ার ঐক্য সাধিত হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসের মর্যাদা রাখিলেও উহাকে কাটিয়া-ছাটিয়া নাটকের গৌরব দিতে পারেন নাই।

ইহার ৯ খানি গানের মধ্যে মেহেরউন্নিসার 'বসিয়া বিজন বনে, বসন আঁচল পাতি' শীর্ষক গানখানি ও পৃথ্বীরাজের চারণ গীতিটির কথা দর্শক বা পাঠকের মনে লাগে। বাকিগুলি তেমন রেখাপাত করে না। দ্বিজেন্দ্রলাল অবসর বিনোদনের জন্য সংগীত রচনা করিতেন এবং প্রয়োজন অনুসারে তাহা তাঁহার নাটকের অবয়বে প্রবেশলাভ করিত। কিন্তু এক গান দুইটি দৃশ্যকাব্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার গৌরব নষ্ট করিয়াছে, যেমন 'বসিয়া বিজন বনে' গানখানি প্রথমে 'ব্রাহ্মস্পর্শে' পরে 'রাণা প্রতাপসিংহে' দেখা দিয়াছে।

দুর্গাদাস

নাটকখানি ঐতিহাসিক। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে দৃশ্য সম্বন্ধীয় স্থান, কাল ও পাত্র নির্দেশের নূতন কৌশল (technique) দৃষ্ট হইয়াছে, যাহা রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষীরোদপ্রসাদের পূর্বতন নাট্যসাহিত্যে পাওয়া যায় নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের অন্তর্গত সংক্ষিপ্ত প্রয়োগ 'প্রবেশ' বা 'নিষ্ক্রান্ত' পদের পরিবর্তে যথাক্রমে এইরূপ পদের ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন,—(১) 'এই সময়ে ঔরংজীব সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন', (২) 'এই বলিয়া সম্রাট ধীরে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।' এ যেন নাট্যকারকে ছাড়াইয়া ঔপন্যাসিকের নিবেদন! স্বগত চিন্তার ব্যাপার যাহা দ্বিজেন্দ্রপূর্ব নাট্যকাররা ব্যবহার করিতেন তাহার বদলে দ্বিজেন্দ্রলাল এই পদ্ধতিতে ঐ কাজ করিলেন, যেমন—'তাহ্‌বর চলিয়া গেলে দিলীর নিজ মনে কহিলেন—'অসম সাহসিক এই রাজপুত জাতি' ইত্যাদি। ইহাতে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, পরিবর্তন কেবল কৌশলের।

এই নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল নূতন প্রকাশভঙ্গী প্রয়োগ করেছেন, যেমন,—(প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে) 'নির্মেঘ উষার চেয়ে নির্মল, বীণার ঝঙ্কারের চেয়ে সংগীতময়, ঈশ্বরের নামের চেয়ে পবিত্র—সেই মাতৃমূর্তি!—আমি বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়িয়ে রৈলাম'। এগুলি যুক্তির দিক্ দিয়ে সর্বত্র ঠিক না হইলেও বেশ উচ্ছ্বাসময়ী ভাষা দিয়া গঠিত। পুত্রের রূপবর্ণনার বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে এইরূপ— 'টুকটুকে ছাওয়াল! হেঁটে য্যা তো, যেন আঁদারির মদ্দে দিয়ে একটা পিরদিম চলে যাচ্ছে।'

দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের 'স্বগতচিন্তা' প্রকাশ্যত তুলিয়া দিলেও কার্যত তুলিতে পারেন নাই। দৃষ্টান্ত :—দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের শেষে জয়সিংহ চলিয়া গেলে রাজসিংহ কহিলেন—'ভীম! ভীম! আর আমায় তুমি ভালবাসো না। জন্মভূমির কথা বল্‌তে বল্‌তে তোমার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এলো। আর আমার প্রাপ্য এক শুষ্ক প্রণাম!—নিজদোষে কি পুত্রই হারিইছি'—এই কথাগুলি কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন? নিজ মনকে নিশ্চয়ই। তাহা হইলে 'স্বগত' বলিলে দোষ কি ছিল? তাহা ছাড়া ছোট খাটো স্বগতোক্তি নাটকের বহুস্থানে ছড়াইয়া আছে।

নাটকখানির তৃতীয় অঙ্ক কয়েকটি ক্ষীণ অপ্রত্যাশিত দৃশ্যের ভিতর দিয়া পরাকাষ্ঠার বীজ বহন করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পরাকাষ্ঠা চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে আসিয়াছে। নাটককারের কল্পনা জয়ী হইল, না ঐতিহ্য জয়ী হইল এ কথার উত্তর ঐতিহাসিকই দিবেন। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকাশভঙ্গীর নূতনত্ব বহুস্থানে উপমামূলক কথার মধ্যে পাওয়া যায়, যেমন পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে দিলীর খাঁ দুর্গাদাসের চরিত্র বর্ণনার ব্যপদেশে বলিতেছে—"তার মাথা যেন শৈলশিখরের মতো সোজা হোল, তার বক্ষ

আকাশের ন্যায় প্রশস্ত হোল।" "তার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করুন, সে পুষ্পের মতো কোমল, তাকে ভয় দেখাতে চান, সে লৌহবৎ দৃঢ়।" ঐ অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে আত্মহত্যার সংকল্প লইয়া গুল্‌নেয়ার এই সুন্দর কথাটি বলিয়াছিল—"কামবক্স! সূর্য যে গরিমায় উঠে, সেই গরিমায় অস্ত যায়।" গুল্‌নেয়ার চরিত্রে নাট্যকার কল্পনার যে রেখা টানিয়াছেন তাহা শেষ পর্যন্ত বজায় রাখিয়াছেন। আর একটি সুন্দর প্রকাশভঙ্গী ঐ দৃশ্যে ঔরংজীব গুল্‌নেয়ারের সহিত কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন তাহা নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখিবার সামগ্রী, কথা কয়টি এই :—'নীচ শ্রেণীর লোকে কুলটা স্ত্রীর পৃষ্ঠে কুঠার মারে। সাধারণ শিক্ষিত লোক তাকে পরিত্যাগ করে। মহৎ ব্যক্তি ক্ষমা করে।' গুল্‌নেয়ার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই একটিমাত্র কথায় নাট্যকার ব্যক্ত ক'রে গেছেন—"ঔরংজীব! পড়েছি বলে' কোন দুঃখ নাই। উঠেছিলাম- পড়েছি। যারা মাটি কামড়ে পড়ে থাকে, তারা পড়ে না। ক্ষমতাদৃপ্তা অভিমানিনীর উপযুক্ত বাণীই সে বলিয়াছে। ভালবাসা সম্বন্ধে গুল্‌নেয়ারের আর একটি কথার মূল্য আছে, তাহা এই—"যদি ভালবেসেছিলাম—ভালবাসা দান করেছিলাম! ভিক্ষা করিনি।" ইতিহাস সাক্ষ্য না দিলেও নাটকীয় চরিত্র হিসাবে সার্থক হইয়াছে। ইতিহাস কি বলে জানি না, কিন্তু ইতিহাসের ভিত্তি লইয়া এই কাল্পনিক নাটক যথার্থ সাক্ষ্যই দিয়াছে।

সংগীতপ্রিয় হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের অবয়বে সংগীত ফুটাইয়াছেন, কিন্তু নাটকের গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে রাজিয়ার হাল্‌কা হাস্যরস ফুটাইবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছেন। তাহার গানগুলির ভিতর ভাবের নূতন সাড়া পাওয়া গিয়াছে। নাটকখানি গদ্যের মাধ্যমে পাঁচ অঙ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। মোট ১৩ খানি গান তাহাতে আছে।

নুরজাহান

নাটকখানি ঐতিহাসিক। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ তারিখে মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত হইয়াছে। এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের পাঠ আমাদের আলোচ্য-বিষয়। নাটকের প্রথম অঙ্কে পর-পর ঘটনার বিবৃতি আছে। অষ্টম দৃশ্যে মেহেরুন্নিসার কাছে শের খাঁর বিদায় দৃশ্যে একটা ঘাত আছে, কিন্তু প্রতিঘাত তখনও উঠে নাই। এ নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকীয় নূতন আঙ্গিক ব্যবহার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে আসফ মেহেরুন্নিসাকে জাহাঙ্গীরের প্রস্তাবে সম্মত করার জন্য যে নূতন বাক্যটি ব্যবহার করিয়াছিল তাহা এই—'আজ এই খানে এই দণ্ডে স্থির হ'য়ে যাবে, যে তুমি বাহিরে পরিত্যক্ত পাদুকাখণ্ড হ'য়ে থাকবে, না প্রাসাদকক্ষের কেন্দ্রে উর্ধ্বে রক্ষিত ঝাড়ের মত আলো দেবে।'

দ্বিতীয় অঙ্কে মেহেরের অন্তর্দ্বন্দ্ব সর্বশেষে যে সংঘাতে পরাভূত হইল তাহা প্রতিঘাত তুলিবার পক্ষে ক্ষীণ, কিন্তু ঐ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে নুরজাহান-উপাধিমণ্ডিত মেহের তাঁহার পূর্বস্বামীর কন্যা লেলেখার হাতে যে প্রতিঘাত তুলিবার সংকল্প লইলেন তাহা শক্তি হিসাবে বলবত্তর ছিল। কারণ শয়তানী বুদ্ধি পরিচালনা করিতে মাতা-পুত্রী তখন নিজেদের আসল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া দুই ভগিনীর প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিল।

তৃতীয় অঙ্কে নুরজাহান-লয়লা মাতা-পুত্রীর মধ্যে শয়তানী বুদ্ধি লইয়া অগ্রসর হইবার পথে বিচ্ছেদ ঘটিল। দরবার দৃশ্যেই নুরজাহানের সম্রাজ্ঞীগিরির পতনারম্ভ, এবং তাহার মধ্যেও ঐ

মাতা-পুত্রীর কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিরাজিত ছিল। নুরজাহানের পতনের বীজ এই অঙ্কে পরাকাষ্ঠা লাভ করিল।

নাট্যকার এই নাটকের পাত্র-পাত্রীর মধ্য দিয়া শেক্সপীয়রের Macbeth, Richard the third, Hamlet, Antony and Cleopetra প্রভৃতি নাটকের ভাব প্রয়োজনানুসারে গ্রহণ করিয়াছেন।

চতুর্থ অঙ্কে জাহাঙ্গীরের নুরজাহানের হস্তে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। নুরজাহান তাঁহার পতনের পূর্বে সম্রাজ্ঞী-ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগ করিয়া আপনার পরাজয়কে ঘনীভূত করিলেন। নুরজাহানের শয়তানী শক্তির নিকট জাহাঙ্গীরের পুনঃ আত্মসমর্পণ।

নাট্যকার হিন্দুজাতির অধঃপতনের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন জাতীয় কুসংস্কার, তাই চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে কর্ণসিংহ এইরূপ বলিয়াছেন—"যেখানে জীবন, সেখানে সে বাহিরের জিনিস টেনে নিজের করে' নেয়। আর যেখানে মরণ, সেখানে সে শতধা হ'য়ে নিজেই গলে' খসে' পড়ে।"

পঞ্চম অঙ্কে নুরজাহান সাম্রাজ্যশাসন ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং তাহার ফলে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা, হত্যা ও বিদ্রোহ দেখা দিল। জাহাঙ্গীর মরিলেন, ক্ষমতাগর্বিতা নুরজাহান উন্মাদিনী হইলেন। এ অঙ্কের ছোট খাটো ঘাত-প্রতিঘাত থাকিলেও নাটকের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার মতো কোনটার শক্তি ছিল না, তাই নাটকখানি জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। গদ্যের মাধ্যমে আটখানি গান লইয়া নাটকখানি সম্পূর্ণ।

সোরাব-রুস্তাম

এখানিকে গ্রন্থকার নাট্যরঙ্গ বলিয়াছেন, এখানি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ফার্সী 'শাহনামা' নামক পুস্তক হইতে ইহার গল্পাংশ গৃহীত। গান, গদ্য, মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই নাটিকাখানি তিনটি অঙ্কের মধ্যে সমাপ্ত হইয়াছে। এই নাটিকার কাব্যমাধুর্য বেশ ফুটিয়াছে। একটি স্থানের নমুনা— দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সোরাব সন্ধ্যাবর্ণনা ব্যপদেশে বলিতেছে—

'পরে ছেয়ে আসে
পশ্চিম আকাশে ছায়া; সন্ধ্যা তারা উঠে,
পরে ধীরে ধীরে ধীরে আকাশ শিহরি'
অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জে রোমাঞ্চিত হয়।'

নাটিকাখানি প্রকাশ্যভাবে বিষাদান্ত হইলেও ভাবালেখ্যে মিলনাত্মক হইয়াছে। সোরাবের বীরত্বে মুগ্ধময়ী আফ্‌রিদ সত্যই সোরাবকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে সোরাব তাঁহার পিতৃমৃত্যুর কারণ ও জন্মভূমির শত্রু বলিয়া জীবিত অবস্থায় তাহাকে পতিত্বে গ্রহণ করিবে না, এই প্রতিজ্ঞা আফ্‌রিদের সহিত সোরাবের মিলনের অন্তরায় হইয়াছিল; কিন্তু যে মুহূর্তে রুস্তাম সোরাবকে নিহত করিল অপলকে আফ্‌রিদ নিজবক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া সোরাবের পদতলে নিপতিত হইল. জীবনসঙ্গিনী হইতে না পারিলেও মরণসঙ্গিনী হইল। সোরাব-আফ্‌রিদের মিলন ভাবালেখ্যে চির অঙ্কিত থাকিল।

অন্যায় সময়ে নিজ পুত্রকে বধ না করিয়া হত্যা করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া মনঃক্ষোভে রুস্তাম যেন বজ্রাহতের মতো প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তামিনা, কৈকায়ুস কেহই তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিল না। তাই নাটিকাখানি বাহ্যিক বিষাদান্ত হইলেও দর্শক বা পাঠকের অন্তরস্থিত ভাবরাজ্যে চির মিলনাত্মক হইয়া রহিল। শেষ দৃশ্যের ঘাত-প্রতিঘাতগুলি নিপুণ তুলিকায় যেন চিত্রিত।

২২ খানি গানের মধ্যে 'ওগো, আমরা ভুবন ভুলাতে আসি' শীর্ষক গানখানি ও

'প্রথম যখন বিয়ে হ'লো, ভাব্‌লাম বাহা বাহারে।
কি রকম যে হ'য়ে গেলাম, বল্‌বো তাহা কাহারে'

শীর্ষক গানখানিও বহু প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। এ নাটিকার কয়েকখানি যমলগানে কিছু নূতনত্ব আছে, যাহা দ্বিজেন্দ্র পূর্ব নাট্যসাহিত্যে দেখা যায় নাই। ঋতু সংগীতের মধ্যে বৃষ্টিধারার প্রবেশ ও নৃত্যগীতে রবীন্দ্রযুগ স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। সংগীতে ভাষার অন্তরায় নাট্যকার রাখেন নাই, হিন্দু-মুসলমান একই ভাষায় গান গাহিয়াছে।

সীতা

গ্রন্থকার ইহাকে নাট্যকাব্য বলিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ আলোচিত হইল। এখানি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। কোন প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে অভিনীত হয় নাই। অন্তমিলনাত্মক বিচিত্র ছন্দে এই নাট্যকাব্যখানি রচিত। কবি মূলতঃ বাল্মীকির অনুসরণ করিলেও সীতার বনবাস ব্যাপারে ভবভূতির পদানুসরণ করিয়াছেন। কাব্যের লক্ষণগুলি যেমন, ভাষা, ছন্দ, ভাব, বর্ণনা, ব্যঞ্জনা, অলংকার সবই এই নাট্যকাব্যে দেখা গিয়াছে। নাট্যের লক্ষণের মধ্যে সংঘাত, তৌর্যত্রিক যথাযথ স্ফুরিত হয় নাই, অন্তর্দ্বন্দ্ব বেশ ফুটিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে একটি যথার্থ নাটকীয় প্রতিঘাত উঠিয়াছে এবং সীতা তাহারি ঘাত তুলিয়াছিলেন দৃঢ় সংযত চিত্তে স্বয়ং। দ্বিজেন্দ্রলাল বনবাসবার্তা বিষয়ে সীতাকে আগাইয়া আনিয়া রাম চরিত্রের বাল্মীকি পরিকল্পিত তপোবন দেখাইবার ছলনা হইতে রাম ও লক্ষ্মণ চরিত্র দুইটিকে তাঁহাদের অপযশ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। এই ঘটনায় রামের মহত্ত্ব সীতাদেবীই বর্ধিত করিয়া গেলেন। এই দৃশ্যে সীতা রামকে এই কথাকয়টি বলিয়াছেন :—

"শুনিয়াছি সব।
উঠ প্রাণেশ্বর। জীবন বল্লভ।
সর্বস্ব আমার। সম্ভব কি তাও?
সীতার কারণে তুমি ব্যথা পাও,
প্রাণাধিক? উঠ, তব যশ পুণ্য
রহিবে অটুট, রহিবে অক্ষুণ্ণ;
পিতৃসত্য তুমি রেখেছিলে প্রভু;
আমিও রাখিব পতিসত্য। কভু
মলিন না হবে তব পুণ্যরশ্মি
সীতার কারণে।"

এই অংশটি কি সংঘাত কৌশলে, কি নায়কের দোষক্ষালনে, কি নায়িকা চরিত্রের মাধুর্য বিকাশে বিশেষ কার্যকর হইয়া উঠিয়াছে। তৌর্যত্রিকের মধ্যে নৃত্য নাই, তৃতীয় অঙ্কের বাল্মীকির তপোবন দৃশ্যে তাপস বালক-বালিকাদের গান ও বাদ্য আছে। গানখানির ভিতর দিয়া তপোবনের গুরুগম্ভীর গাম্ভীর্য রক্ষিত হইয়াছে। এখানি অভিনীত হয় নাই, তাই সুরের কথা বলা গেল না।

কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের শিক্ষা ও পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করিয়া বাল্মীকির কাছে বশিষ্ঠের পরাজয়-ঘোষণা এবং সীতারাম চরিত্রে তাঁহাদের ঐশ্বর্যভাব লোপ করাইয়া মাধুর্যভাবের বৃদ্ধি দেখাইতে দ্বিজেন্দ্রলাল যে মানবীয় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের ইষ্টাবমাননা ঘটিয়াছে। কলার খাতিরে ভারতবর্ষে 'সৌর গাণপত্য শাক্ত শৈব বৈষ্ণব' রীতি প্রচলিত ধর্মমতের অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হইলে বিক্ষোভেরই সৃষ্টি হয়, তাই কলার ক্ষেত্রকে সামাজিক, ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক ক্ষেত্রে নিবদ্ধ রাখাই বাঞ্ছনীয়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র সুদূর পল্লীর নিভৃত নিবাসে না পৌঁছানো পর্যন্ত এইরূপ কলাবিদ্যার নূতন অভিযান সফল হইবার নহে, কারণ উচ্চ শিক্ষার দাবী আমরা দেশের শতকরা ১৩ জনের অধিক লোকসংখ্যাতে পৌঁছিতে দেখি না। ঋষি শাসিত বর্ণাশ্রম ধর্মই ভারতের সনাতন ধর্ম। ২৫০০ বর্ষ পূর্বে বুদ্ধের ত্যাগমাহাত্ম্য ও অহিংস মতবাদ প্রচারের ফলে তাহা বিপর্যস্ত হইলে আচার্য শঙ্করাচার্যের বৈদান্তিক জ্ঞানবাদ দ্বারা আংশিক খণ্ডিত হইয়াছিল, সুতরাং সমুদয় দেশ হইতে বর্ণাশ্রম ধর্ম তিরোহিত হয় নাই। আরও পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আচণ্ডালে নাম মাহাত্ম্য কীর্তন দ্বারাও ঐ বর্ণাশ্রম ধর্ম লুপ্ত হয় নাই। বশিষ্ঠ প্রবর্তিত যোগবাশিষ্ঠের উপদেশ পরম্পরা, যাহা রামচন্দ্রের জন্যই উচ্চারিত হইয়াছিল তাহা ঐ সনাতন ধারারই প্রতীক। বাল্মীকি রামায়ণে বা ঐ রামায়ণের আদর্শে রচিত অন্যান্য ভাষা গ্রন্থে ঐ আদর্শই পরিগৃহীত হইয়াছে। কবি ভবভূতি উত্তররাম চরিতে নূতন ভাব আনিলেও তাহা কাব্যানুশীলনকারী পণ্ডিতদের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। জনসাধারণের ধর্মমত তাহাতে আঘাত-প্রাপ্ত হয় নাই। আধুনিক বাঙ্গালা নাটকের ক্ষেত্র বহু প্রসারিত, তাহার অবয়বে ঐ আদর্শের অন্যথাচরণ করা উচিত হয় না। মাত্র দুইখানি গান লইয়া পাঁচ অঙ্ক পর্যন্ত নাট্যকাব্যখানি বিস্তৃত।

মেবার-পতন

ঐতিহাসিক নাটকখানি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। রাজপুতানার শেষ স্বাধীন নৃপতি রাণা অমর সিংহের পতনের ইতিহাস বহন করিয়া এখানি রচিত। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে মোগলের সহিত সন্ধি করিতে কৃতসংকল্প রাণা সত্যবতী নাম্নী চারণীর সামান্য একটা কথায় কিরূপে বিনা বাক্যব্যয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন ঘাত-প্রতিঘাত রূপ নাটকীয় নিয়মের মধ্যে তাহার নীতি ঠিক মিলে না।

নূতন প্রকাশভঙ্গীর নিদর্শন দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে এইরূপ। অজয় মানসীর দেহ-মনের সৌন্দর্য এইরূপ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে :—'ঈশ্বর তোমার আত্মার প্রভায় সমুজ্জ্বল তোমার দেহখানিকে তোমার আত্মার আবরণ করে' গড়েছিলেন, পাছে সেই আত্মার অনাবৃত জ্যোতিঃ জগতের পক্ষে অসহ্য হয়। আকাশ যদি একটা রঙ্গমঞ্চ হোত; প্রত্যেক নক্ষত্র যদি এক একটি পবিত্র চরিত্র হোত; জ্যোৎস্না যদি একটা অনাবিল সঙ্গীত হোত, ত সে মহানাটকের নায়িকা হ'তে—তুমি।'

বীররসের আর একটি উক্তি চারণী সত্যবতীর মুখে ঐ দৃশ্যেই ব্যক্ত হ'য়েছে, তাহাতে একটু নূতনত্ব আছে, সেটি এই :—'বীরের রক্তই জাতিকে উর্বর করে। দুঃখ সে দেশের নয় রাণা, যে দেশের বীর মরে ; দুঃখ সেই দেশের যে দেশের বীর মরে না।' ঐ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে কল্যাণী ও মানসীর সংলাপের মধ্যে ধর্মসম্বন্ধে মানসী একটি নূতন কথা বলিয়াছেন, সেটি এই—'ধর্ম কল্যাণী! যেমন সব মানুষ এক ঈশ্বরের সন্তান,—সেই রকম সব ধর্ম সেই ধর্মের সন্তান।' 'ভালবাসায় পাপ! যে যত কুৎসিত, তাকে ভালবাসায় তত পুণ্য। যে যত ঘৃণিত, সে তত অনুকম্পার পাত্র।' ধর্মত্যাগী স্বামীকে স্ত্রী ভালবাসিতে পারে কি না তাহার মনোধর্মিক বিশ্লেষণঃ—'তিনি যদি ঈশ্বরকে ব্রহ্ম না বলে' আল্লা বলেন, তাতে কি তিনি এই ভাষার ভোজবাজিতে পাপী হ'য়ে গেলেন?' দ্বিতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে কল্যাণীর স্বামিভক্তি-নিদর্শক কতকগুলি অদৃষ্টপূর্ব প্রকাশভঙ্গী আছে, যেমন—'প্রকৃত সাধ্বী সেই,—স্বামী যে পায়ে পদাঘাত করে, সেই পা-দুখানি যে স্ত্রী পূজা করে;—যার পতিভক্তির বিচ্ছেদে ক্ষয় নাই, অবজ্ঞায় সঙ্কোচ নাই, নিষ্ঠুরতায় হ্রাস নাই, নিরাশায় ক্ষোভ নাই, যার পতিভক্তি অন্ধকারে চন্দ্রের মত শান্ত, ঝটিকায় পর্বতের মত দৃঢ়, বিবর্তনে ধ্রুবতারার মত স্থির; যার পতিভক্তি সর্বকালে, সর্ব অবস্থায় বিশ্বাসের মত স্বচ্ছ, করুণার মত অযাচিত, মাতৃস্নেহের মত নিরপেক্ষ,—সেই সাধ্বী স্ত্রী।'

ভাবাবেগের প্লাবন ও তাহার সম্প্রসারণ নাটকখানির প্রাণ, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাতে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—এই তত্ত্বভিত্তির উপর মানুষের স্বার্থ, ত্যাগ, ধর্ম, বিধর্ম যখন যাহার প্রয়োজন হইয়াছে তাহা অবিচলিত চিত্তে পরিগৃহীত হইয়াছে। গদ্যের মাধ্যমে লিখিত হওয়া সত্ত্বেও ভাষা সর্বত্র ভাবের বাহক তাহা কি কবিত্বে, কি অলংকারে, কি ব্যঞ্জনায়, কি ভাব-সম্প্রসারণে সর্বত্রই সাবলীল।

মানসী ও সত্যবতী চরিত্র দুইটি কবি তাঁহার কল্পনার কল্পলোক থেকে সৃষ্টি করিয়াছেন। দেশাত্মবোধ, ভ্রাতৃত্ব, জাতীয়তা, সর্বোপরি মনুষ্যত্বলাভের যে ইঙ্গিত নাট্যকবি তাঁহার দৃশ্যকাব্যের মধ্যে রাখিয়া গেলেন তাহা ভাবী নাট্যকারদের চিন্তার খোরাক যোগাইবে। পাঁচটি অঙ্কে এখানি সমাপ্ত। ইহার দশখানি গানের তিনখানি চারণ-সংগীত, বাকিগুলি একক গান। সংগীতে নূতন আবেদনের সাড়া পাওয়া গিয়াছে। এই বিষাদান্ত মেলোড্রামা খানি বড়ই জনপ্রিয় হইয়াছিল।

সাজাহান

নাটকখানি ঐতিহাসিক, ইহার পঞ্চম সংস্করণের পাঠ এখানে আলোচিত হইল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছে। মাঝে মাঝে নাটকটির অভ্যন্তরে সুন্দর প্রকাশভঙ্গী দেখা গিয়াছে তাহার দুই-চারিটির নমুনা এইরূপ—প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে। সাজাহানের নিজ পুত্র ঔরংজীবের আদেশে পৌত্র মোহম্মদ দ্বারা বন্দীকৃত সাজাহান তাঁহার কন্যা জাহানারার শিক্ষায় বলিয়া উঠিলেন—"উত্তম। তবে তাই হোক্। আয় মা, তুইও আমার সহায় হ'। আমি অগ্নির মত জ্বলে উঠি, তুই বায়ুর মত ধেয়ে আয়। আমি ভূমিকম্পের মত সাম্রাজ্যখানি ভেঙ্গে চুরে দিয়ে যাই, তুই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত তাকে এসে গ্রাস কর্। * * ধূপের মত একটা বিরাট জ্বালার উর্দ্ধে উঠে—বিরাট হাহাকারে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ি।" কারারুদ্ধ বৃদ্ধ স্থবির সাজাহানের উপযুক্ত মনোভাব ঐ কথা কয়টির মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয় অঙ্কের

পঞ্চম দৃশ্যে ঔরংজীব ও তাঁহার পুত্র মোহম্মদের সংলাপের মধ্যে মোহম্মদের এই কথাগুলি চমৎকার!—"পৃথিবীতে সাম্রাজ্য কি এতই মহার্ঘ? আর বিবেক কি এতই সুলভ? সাম্রাজ্যের জন্য বিবেক খোয়াবো? পিতা! আপনি যে বিবেক বর্জন করে' সাম্রাজ্য লাভ করেছেন, সে সাম্রাজ্য কি পরকালে নিয়ে যেতে পার্বেন?—কিন্তু এই বিবেকটুকু বর্জন না কর্লে সঙ্গে যেত।" মোহম্মদের এই কথায় ঔরংজীব প্রশ্ন করিলেন—'এর অর্থ কি?' মোহম্মদ উত্তরে বলিলেন—"এর অর্থ এই যে, আমি যে আপনার জন্য সব হারিয়ে বসে আছি, সেই আপনাকেও আজ আর হৃদয়ের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না—বুঝি তাও হারালাম। আজ আমার মত দরিদ্র কে?" নাটকখানির মূল্য এই কথা কয়টির দ্বারা বহুগুণে বর্ধিত হইয়া গেল। চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে সাজাহান ও জাহানারার কথোপকথনের মধ্যে আরও কতকগুলি অনবদ্য প্রকাশভঙ্গী পাওয়া গিয়াছে। দারার প্রতি ঔরংজীবের নিষ্ঠুর ব্যবহারে কাতর হইয়া সাজাহান যখন জাহানারাকে জিজ্ঞাসা করিল—'তারা কি পাষাণ!' তদুত্তরে জাহানারা বলিল—'না বাবা। পাষাণও উত্তপ্ত হয়। তারা পাঁক।' ঐ দৃশ্যে দারাকে হত্যা করিবার আশঙ্কাসূচক কথাবার্তায় সন্ত্রস্ত হইয়া সাজাহান যখন বলিলেন—'ঔরংজীব ত এখানে নাই কে শুনেছে?' তদুত্তরে জাহানারা বলিয়াছিল—'সে নেই, কিন্তু এই দেওয়াল ত আছে, বাতাস ত আছে, এই প্রদীপ ত আছে। আজ সব যে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আপনি ভাব্ছেন যে এ আপনার প্রাসাদ?—না, ঔরংজীবের পাষাণ হৃদয়। ভাব্ছেন এ বাতাস? তা নয়, এ ঔরংজীবের বিষাক্ত নিশ্বাস। এ প্রদীপ নয়—এ তার চক্ষের জল্লাদ দৃষ্টি।'

এ নাটকখানি ঔরংজীবের ভ্রাতাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও হত্যার কাহিনী লইয়া পূর্ণ। ঔরংজীব বৃদ্ধ স্থবির সাজাহানকে প্রাসাদকক্ষে বন্দী রাখিয়া উপর্যুপরি পুত্রশোকে তাঁহাকে অর্ধোন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল। এ নাটকের ঘটনাবলি পৃথক পৃথক চিত্ররূপে শোভা পাইয়াছে। তাহাদের একত্রীকৃতরূপে যে কেন্দ্রগত চিত্র ফুটিয়া উঠে তাহাতে নাটকীয় অসংলগ্নতা ঢাকা পড়ে না।

নাটকখানিতে মোট ৯ খানি গান আছে, তাহার কতকগুলি মহাজন পদাবলি, বাকি চারণগীতি ও ব্যক্তিগত গান। ব্যক্তিগত গানের মধ্যে 'আজি এসেছি—আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে, নিয়ে এই হাসি, রূপ গান' শীর্ষক গানখানি ও চারণগীতির মধ্যে—'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' শীর্ষক গানখানি বহু প্রচারিত হইয়াছে। মহাজন পদাবলি নিত্য নূতন, সুতরাং উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গদ্যের মাধ্যমে পাঁচ অঙ্কে নাটকখানি সম্পূর্ণ।

নাটকের সাজাহান নামকরণ সার্থক হয় নাই, কারণ ইহাতে তাঁহার রাজত্বলাভ, বিবাহ, পত্নী-প্রেম, মুমতাজের মৃত্যুতে তাজমহলের সৃষ্টি প্রভৃতি কোন ঘটনার উল্লেখ নাই, মাত্র সাজাহান-পুত্রদের পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ও ঔরংজীবের ভ্রাতৃহত্যা ও সাজাহানকে তাঁহার প্রাসাদকক্ষে বন্দীকৃত অবস্থায় রাখার কথা বর্ণিত হইয়াছে। অত্যাচার কাহিনী রূপ লইয়াছে বটে, এবং তাহার লক্ষ্যস্থল ঔরংজীবের সিংহাসন লাভ। সুতরাং এই নামকরণে সাজাহান চরিত্রের মাত্র একটা দিকই চিত্রিত দেখা যাইতেছে।

নাটকখানি অনেকটা শেক্সপীয়রের 'কিংলিয়ার' জাতীয় ট্রাজেডি। ভাষার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল উপমা-উৎপ্রেক্ষাকে রবীন্দ্রনাথের অলংকারের মত খাপ খাওয়াইতে পারেন নাই, এবং ভাষাকে চরিত্র বিশেষের উপযোগী সর্বত্র করিতে পারেন নাই, তবে এখানি নাটককারের শক্তিশালী নাটকের অন্যতম।

চন্দ্রগুপ্ত

নামক ঐতিহাসিক নাটকখানি ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। গ্রন্থের দ্বাবিংশ সংস্করণের পাঠ আমরা আলোচনা করিতেছি। ৮ খানি গান লইয়া পাঁচ অঙ্ক পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। গদ্যের মাধ্যমে এখানি লিখিত, মধ্যে মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের নিজ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপমামণ্ডিত শব্দবিন্যাস দেখা গিয়াছে, যেমন (প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে)—(১) 'এর মরুভূমি বিরাট স্বেচ্ছাচারের মত', (২) 'মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গম পর্বত সম মন্থর গমনে চলেছে', (৩) 'মহাভুজঙ্গম অলস হিংসার মত বক্ররেখায় পড়ে আছে', (৪) 'মহাশৃঙ্গ কুরঙ্গম মুগ্ধ বিস্ময়ের মত নির্জন বনমধ্যে শূন্য-প্রেক্ষণে চেয়ে আছে' (৫) 'নিয়তির মত দুর্বার, হত্যার মত করাল, দুর্ভিক্ষের মত নিষ্ঠুর আমি' ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্কে অপমানিত ও হৃতসর্বস্ব চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের সাহায্যে মগধরাজ নন্দকে সিংহাসনচ্যুত করিবার এবং তাঁহার ও জননীর অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। এ অঙ্কে সংঘাত যথাযথ পদ্ধতিতে কাজ করিয়াছে।

ভারতবাসী ও গ্রীকদের মিশ্র চরিত্রের সমাবেশ লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল চন্দ্রগুপ্ত নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। মাতৃহারা সেলুকস্-তনয়া হেলেনের সহিত পিতা-পুত্রীজনিত বাৎসল্যভাবের দৃশ্যটি মধুর হইলেও সংঘাতসৃষ্টির দিক দিয়া ঐ একই দৃশ্যে 'হাঁটু গাড়িলেই' পিতার বার বার পরাজয় চিত্রটিতে কেমন একটা হাল্‌কা ভাব আনিয়া দেয়। খৃষ্টীয় পাশ্চাত্য সভ্যতায় 'হাঁটুগাড়া' ক্ষমাপ্রার্থনা বা অনুশোচনার চরম নিদর্শন বটে, কিন্তু নাটকীয় খাড়া সংঘাত তাহাতে যেন একটু নমনীয় হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ সেলুকসের—'আমার বুড়ো বয়সের মা হ'য়ে খুব হুকুমটা চালিয়ে নিলি যা হোক্' প্রভৃতি পিতৃস্নেহের আবেগ তাহার অন্যতম কারণ দেখানো হইয়াছে। এ দৃশ্যটি অবান্তর দৃশ্যের (side-issue) কাজ করিয়াছে তাই রক্ষা পাইয়াছে, নতুবা দূষণীয় হইয়া উঠিত। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের শেষের দিকে হেলেন পিতৃভক্তির আবেগে আন্টিগোনাস্ সম্বন্ধে যে ভাবশাঠ্যের পরিচয় দিলেন, তাহা দর্শক বা পাঠককে বাস্তবিকই পীড়িত করিয়াছে।

চাণক্য দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে স্বগতোক্তির মধ্যে স্বভাবের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, যেমন—'তফাৎ এই যে, ব্যাঘ্র-ভল্লুক উদরের জন্য অনন্যোপায় হ'য়ে মানুষের রক্ত শোষণ করে।' ভল্লুক মাংসাশী জীব নহে, আত্মরক্ষা বা প্রতিহিংসা সাধনার্থ মানুষ বধ করিলেও তদ্দারা উদরপূরণ সে করে না।

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে চন্দ্রগুপ্তকে নন্দের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে মুরা ও চাণক্য যে ঘাতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাতে চন্দ্রগুপ্তের দিক দিয়া প্রতিঘাত অতিশয় মৃদুভাবেই উঠিয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের সংকল্প বিকল্পে উপনীত হইতে বিলম্ব হয় নাই এবং বিকল্প পুনরায় সংকল্পে পরিণতও হইয়াছিল। এইরূপ দ্বিধায় এ অঙ্কটি শেষ হইয়াছে, নাট্যকার কৃতিত্বের সহিত এ সংঘাত সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে একটি নূতন প্রকাশভঙ্গী নাট্যকার এইরূপে দেখাইয়াছেন—'ও স্পর্শে আমার অঙ্গে তড়িৎপ্রবাহ বহে যায়, আমার মস্তিষ্ক পাষাণে পতিত কাংস্যপাত্রের মত ঝন্ ঝন্ ক'রে ওঠে।'—ছায়া এই কথাটি চন্দ্রগুপ্তকে বলিয়াছিল। ঐ অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে চাণক্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ভেদ দেখাইতে যাইয়া এইরূপ বলিয়াছেন—'দেখছো যে ব্রাহ্মণের প্রতাপ যায় নাই? ঈশ্বর মূর্খ নহেন—তাই বাহুর উপর মস্তিষ্ক।'

তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে চাণক্য দ্বারা আনীত ঘটনায় নাটকের পরাকাষ্ঠা আসিয়াছে এবং তাহা যথাযথ সংঘাত সৃষ্টি করিতেও সমর্থ হইয়াছে। চতুর্থ অঙ্কে চাণক্য ও চন্দ্রকেতুর চন্দ্রগুপ্তের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ দৃশ্যটি ও চন্দ্রগুপ্তের বিপদের দিনে উভয়ের পুনর্মিলন দৃশ্যটি সমান গৌরবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শেষ দৃশ্যে মুরা কর্তৃক ছায়ার সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ দিবার ব্যবস্থা চাণক্যের নূতন প্রস্তাবে ছায়া ও মুরার মনে নাটকীয় অপূর্ব কৌশলের ভিতর দিয়া নৈরাশ্যের সঞ্চার করিয়া দিল।

পঞ্চম অঙ্কে নাটকের সমাপ্তির ভিতর ভিক্ষুকের নিকট হইতে নিজ কন্যা আত্রেয়ীর প্রাপ্তিবিষয়ে চাণক্যের মনের উভয় সংকটের (dilemma) চিত্রটি পর্যায়ক্রমে বেশ ফুটিয়াছে। চাপা অভিমানের ভিতর দিয়া ছায়ার আত্মোৎসর্গের ছবিটি বড়ই মধুর। চতুর্থ দৃশ্যের সেলুকস ও আন্টিগোনাসের পিতা-পুত্র সম্বন্ধ জ্ঞাপন চিত্রটি অদৃষ্টপূর্ব মাধুর্য-মণ্ডিত, যদিও এটি ঐতিহাসিক ঘটনা নহে, নাট্যকারের পরিকল্পনা। পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে সেলুকস্ ও আন্টিগোনাসের সংলাপ মধ্যে একটি সুন্দর প্রকাশভঙ্গী পাওয়া গিয়াছে, সেটি এই—'আমার উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জলোচ্ছ্বাস চলে গিয়েছে, আমার মাটি যা, তা ধুয়ে মুছে নিয়ে গিয়েছে, যা রেখে গিয়েছে—তা ভগ্ন শিলাস্তূপ, কিন্তু তার প্রত্যেক শিলাখণ্ড অভ্রের চেয়ে নির্মল, বজ্রাদপি কঠোর।'

নাট্যকার এই নাটকের ভিতর দিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুই মহাজাতির সাংস্কৃতিক ও বৈবাহিক মিলনের যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা ইহাতে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ প্রচেষ্টায় তিনি অগ্রদূত সন্দেহ নাই, কিন্তু এ ঐতিহাসিক মিলন মৌর্যবংশের সূত্রপাত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিল। সম্প্রসারিত বটবৃক্ষের ন্যায় বংশের ঝুরি নামায় নাই।

চরিত্র হিসাবে হেলেনের চরিত্র সৃষ্টিটি অপূর্ব। শৈশবে মাতৃহারা হেলেন মাতাপিতার যুগ্ম স্নেহাভিমান পিতার নিকট হইতে বেশ জোরের সহিতই ষোল আনা আদায় করিয়া লইয়াছিল। এ ধরণের চরিত্র দ্বিজেন্দ্রপূর্ব নাট্যসাহিত্যে দেখা যায় নাই।

সংগীতের প্রতিষ্ঠা এ নাটকখানিতে নিম্নলিখিত গান কয়খানির দ্বারা বেশ জোরের সহিতই দর্শক বা পাঠকের হৃদয়ে করিয়া লইয়াছে। বাহুল্যভয়ে প্রথম ছত্র উদ্ধৃত হইতেছে—(১) 'সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, তুমি হও সব সুখের ভাগী। তুমি হাস আপন মনে, আমি কাঁদি তোমার লাগি॥' (২) 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সংগীত ভেসে আসে। কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে 'আয় চলে আয়'॥' (৩) 'ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী। গর্জে সিন্ধু, চলিছে তরণী।' (৪) 'আর কেন মিছে আশা, মিছে ভালবাসা, মিছে কেন তার ভাবনা' (৫) 'যখন সঘন গগন গরজে, বরিষে করকাধারা, সভয়ে অবনী আবরে নয়ন, লুপ্ত চন্দ্রতারা।' (৬) 'আয় রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে।' রণসংগীতের অভাব বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে আছে বটে। দ্বিজেন্দ্রলাল পঞ্চম সংখ্যক গানের দ্বারা বিজয়োল্লাসে সৈন্যগণের গৃহপ্রত্যাবর্তনের চিত্রটি বেশ ফুটাইয়াছেন এবং এ বিষয়ে তিনিই অগ্রণী হইয়া রহিলেন। অভিনয়গুণে নাটকের দোষ ঢাকা পড়িয়া তাহা যে গুণমণ্ডিত হইয়া দেখা দেয় চন্দ্রগুপ্ত নাটকই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইহার চাণক্যের ভূমিকাটি নটশ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) সর্বপ্রথম গ্রহণ করিয়া অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেন, পরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা আচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁহার অপরাজেয় অভিনয়দ্বারা নাটকখানিকে চিরস্মরণীয় করিয়া দিলেন।

পুনর্জন্ম

এই প্রহসনখানি ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। দশম সংস্করণের পাঠ আলোচিত হইল। ডীন সুইফট্‌এর এক আখ্যানকে বাঙালী সমাজের উপযোগী করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল এই প্রহসনে রূপায়িত করিয়াছেন। একাঙ্ক পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। পারিবারিক সম্বন্ধকে ভগিনীপতি, শালা, শালাজের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া যে হাস্যরসের পরিবেশন প্রহসনকার করিয়াছেন তাহা বিরুদ্ধ সীমার মধ্যে প্রবেশলাভ করে নাই, ইহাই প্রহসনকারের বাহাদুরি। কৃপণের চিত্র দ্বিজেন্দ্রপূর্ব নাট্যকার রসরাজ অমৃতলাল বেশ কৃতিত্বের সহিত আঁকিয়াছেন। পরে ক্ষীরোদপ্রসাদও ঐ চরিত্রের এক অনবদ্য রূপ দিয়া গিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের অঙ্কনও জ্যোতিষীর গণনায় দৃঢ় বিশ্বাসী দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহকারী বৃদ্ধ যাদব চক্রবর্তীর রূপকে অনবদ্য করিয়াছে। সৌদামিনী চরিত্রটি সকল দিক দিয়া আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে। প্রহসনের মধ্যে শুচিতা রক্ষা বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন।

ইহার গানগুলি বিশেষত (১) 'বঁধু হে—আর কোরো না রাত। শুকিয়ে যাচ্ছে, তোমার বাড়া ভাত', (২) 'ওহে প্রাণনাথ পতি তুমি কোথায় গেলে গো', (৩) 'প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত', (৪) 'ওরে সিন্দুক ভরা টাকা—মিছে বন্ধ করে রাখা' শীর্ষক গান কয়খানি দর্শক সমাজের মধ্যে বেশ হাসির লহর তুলিয়াছিল। ভাষা সরল গদ্য। গ্রন্থের পুনর্জন্ম নামটাও সার্থক হইয়াছে।

পরপারে

নাটকের একাদশ সংস্করণের পাঠ আমাদের আলোচ্য-বিষয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট তারিখে স্টার থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছে। নাটকখানি ভাবপ্রধান ও সামাজিক। দ্বিজেন্দ্রলালের ইহাই প্রথম সামাজিক নাটক। সমাজের কোন সমস্যা ইহাতে মীমাংসিত হয় নাই, তাহার তাৎকালিক নগ্নরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র। নাটকের নামটি 'পরপারে', দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে মাতা করুণাময়ীর পরলোকগমনে নাটকটির মধ্যে পরলোকের দ্বার প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল। পরে যথাক্রমে দাদামহাশয় ও সরযূ ঐ পথের যাত্রী হইলেন। ঐকান্তিক স্নেহ ইহার কেন্দ্র-শক্তি, সেই কীলককে আশ্রয় করিয়া অলাতচক্রের মতো ইহার ঘটনাবলি আবর্তিত হইয়াছে। মানুষের অকৃতজ্ঞতায় অতিষ্ঠ দাদামহাশয়ের আত্মহত্যা যেন কেমন কেমন ঠেকে। আজীবন কর্তব্যপরায়ণ ন্যায়নিষ্ঠ ত্যাগশীল সরল পথে জীবনযাপনে পক্ষপাতীর ইহা উপযুক্ত পরিণাম কিনা মনস্তাত্ত্বিকেরা তাহার বিচার করিবেন। সরযূর অন্ত-লীলা স্বাভাবিকই হইয়াছে। দাদামহাশয়ের স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের উত্তরাধিকারিণীর এরূপ হৃদয়বিদারক দৃশ্যে ইহাপেক্ষা স্বাভাবিক মৃত্যু আর কি হইতে পারে? নাটকের মূল কাহিনীকে বেষ্টন করিয়া যে সকল অবান্তর কাহিনী তাহাদের গতিপথ সৃষ্টি করিয়াছিল সেগুলি যথাযথ পরিণতি লাভ করিয়াছে।

পাঁচটি অঙ্কে গদ্যের মাধ্যমে নাটকখানি সম্পূর্ণ। নাতিনী-দাদামহাশয় ঘটিত ট্রাজেডিখানি আলংকারিক 'গো-পুচ্ছাগ্র' বিন্যাসের মতো পরিণতি লাভ করিয়াছে। আধুনিক নাটকের মতো প্রতি

অঙ্কের শেষে রোমাঞ্চকর ঘটনা প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহার সংগীতগুলি ঘটনা ঘটিবার পরও কিছুক্ষণের জন্য ঘটনার সুরটি দর্শকের হৃদয়তন্ত্রীকে বাজাইয়া রাখে, মোট দশখানি গান আছে। Pathosকে কি কৌশলে খেলাইলে উহা pathetic হইয়া উঠে নাটককার তাহা ভালরূপে অধিগত করিয়াছিলেন।

কালীচরণ চরিত্রটিতে 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ চরিত্রের ছাপ দেখা যায়। মদের মাত্লামিতে খোঁয়ারি ভাঙার মতো ইংরাজী কাব্যশাস্ত্রের মন্থন না করিলেও কালীচরণ অপরের কথোপকথনের মধ্যবর্তী ভাবের পরিপোষক কথা ধরিয়া নিমচাঁদের মতো ইংরাজী কাব্যের উদ্গিরণ করিয়াছেন।

স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে সরযূ ব্যতীত হিরণ্ময়ী ও শান্তা নাট্যসাহিত্যক্ষেত্রে বিশিষ্ট পদরেখা রাখিয়া গেল। পার্বতী দুর্বৃত্তজাতীয় (villain) চরিত্রের অন্যতম।

ইহার কতকগুলি প্রকাশভঙ্গী চমৎকার। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে দাদামহাশয় ও মাতাপিতা-হীন নাতনীর ভালবাসা সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে। শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেলে দাদামহাশয়ের কষ্ট হবে কিনা নাতিনী জিজ্ঞাসা করিলে দাদামহাশয় জবাবে বলিলেন—'কষ্ট! চক্ষু দুটি অন্ধ হ'লে মানুষের কি হয় সরযূ?' তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আর একটি প্রকাশভঙ্গী দেখুন। সরযূর রূপ-বর্ণনা ব্যপদেশে দাদামহাশয় বলিলেন—'রাঙ্গা ঠোঁট দুখানি যেন দুগ্ধশুভ্র দন্তপাঁতির সঙ্গে সই পাতিয়েছে। * * তার চেয়ে কোমল করপুট? মল্লিকা আর জবা সেখানে প্রভুত্বের জন্য যুদ্ধ কর্চ্ছে।' ঐ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে দাদামহাশয় সরযুর বর্তমান দেহের বর্ণনায় একটি সুন্দর উপমা ব্যবহার করিয়াছেন—'তার মাখনের মত শরীর বাঁকারির মত শুকিয়ে গিয়েছে'। ঐ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে সতী স্ত্রীর মাথার কাপড় সম্বন্ধে শান্তা সরযুকে দেখিয়া বলিয়াছে—'এই সতী! ঐ ভূমিশয্যা মনে হচ্ছে যেন স্বর্ণসিংহাসন, ঐ মাথার কাপড়খানি জ্বল্ছে যেন হীরার মুকুট—এই সতী।' ঐ দৃশ্যেই আর একটি প্রকাশভঙ্গীর নমুনা দেখুন। সরযূ ও মহিমের সংলাপ মধ্যে এক স্থানে অপবিত্র স্বামীকে কি করিয়া পবিত্র করিয়া লইতে হয় তাহার উত্তরে সরযু বলিল—'তা হ'লে আমার অশ্রুজলে তাকে পবিত্র করে নেবো। সতীর অশ্রুজলের চেয়ে গঙ্গার বারি অধিক পবিত্র নয় জেনো।' চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে স্বামী-স্ত্রীর সংলাপের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের কথার উত্তরে সরযু এইরূপ বলিয়াছে—'অত ভয় করে বলেই ত মৃত্যুর জয়। আর যদি ভয় না করি! তা হ'লেই ত আমি মৃত্যুঞ্জয়ী।'

আনন্দ-বিদায়

কয়েকখানি দৃশ্যময় এক ব্যঙ্গ ও শ্লেষাত্মক রঙ্গচিত্র। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতা ও গান যাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সেগুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া এখানি লেখা হইয়াছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নাট্যকার ইহাকে 'প্যারডি' (ব্যঙ্গ ও শ্লেষময় রঙ্গচিত্র) বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা (idea) ও পৌরাণিক কাহিনীর সংস্কারমূলক আলোকপাতের উপর এই ব্যঙ্গ চিত্র দ্বারা কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। ইহার শ্লেষ ও ব্যঙ্গ স্থানে স্থানে উপভোগের সামগ্রী হইলেও নাট্যকারের এক ভ্রান্তির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত ছিল, নাট্যকার অবশ্য পরে তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং এইটিই ইহার আনন্দ-বিদায়।

ভীষ্ম

নাটকখানি পৌরাণিক ; ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি তারিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে অভিনীত হয় নাই। নানা অবান্তর প্রসঙ্গের (side-issues) ভিতর দিয়া নাটকখানিকে চালনা করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে ভীষ্ম চরিত্রের নাটকীয় আসল সংঘাত আনিয়াছেন প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মৃদুসংঘাতগুলি অত্যন্ত ক্ষীণ, তাই সেগুলি নাটকীয় পদবীতে উন্নীত হইতে পারে নাই। তৃতীয় অঙ্কের সংঘাতটি প্রবৃত্তির সহিত নিবৃত্তির সংগ্রাম। একদিকে ভীষণ প্রতিজ্ঞাকারী ভীষ্ম, অপরদিকে ঐ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে কৃতসংকল্পা অম্বার পাল্‌টা প্রতিজ্ঞা, কিন্তু পরিণামে ভীষ্মই জয়যুক্ত হইলেন। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে গুরু-শিষ্য সংবাদের মধ্যে ঐ সংঘাতটি আরও একটু জটিল হইয়া উঠিয়াছে। পরশুরামের অম্বা সম্বন্ধীয় 'ভালবাসাবাসি' প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বলিয়াছেন—

'এত ভালোবাসি—
তাহারে করিতে স্পর্শ ভয় হয় মনে,
পাছে কলুষিত করি অসতর্ক ক্ষণে
সৌন্দর্যের সেই তপোধন।'

ঐ অঙ্কে যুদ্ধরত গুরুশিষ্যের মধ্যে এই জটিলতা গঙ্গা ও মহাদেবের আগমন-দ্বারা এক অলৌকিক উপায়ে তরলতা প্রাপ্ত হইল। এ নাটকে দৃশ্যসজ্জাকরের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের সহায়তা থাকিলেও নাটকীয় রস পরশুরামের কৃত্রিম পরাজয়ে গাঢ়তা হারাইয়া ফেলিল। এই পরাজয়টি নাটকীয়ভাবে সম্পাদিত হইলে নির্দোষ হইত।

উদাসীন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল কতকগুলি নিঃসঙ্গ সংগীত রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি প্রয়োজন-বোধে তাঁহার প্রণীত কোন কোন দৃশ্যকাব্যের মধ্যে আশ্রয়লাভ করিয়াছে। ভীষ্ম নাটকের অন্তর্গত ১৪ খানি গানের মধ্যে দুইখানি এই শ্রেণীর গান আছে, স্থানাভাবে তাহাদের প্রথম ছত্র মাত্র উদ্ধৃত হইল :—(১) 'নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো,' (২) 'পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে ! শ্যাম বিটপিঘন তট বিপ্লাবিনী, ধূসরতরঙ্গভঙ্গে।' নাটকখানির পরিসর পাঁচ অঙ্ক পর্যন্ত।

নাট্যকারের পরিকল্পনায় পৌরাণিক সত্যবতী ও অম্বা চরিত্র দুইটি বৈশিষ্ট্যলাভ করিয়াছে। দাশরাজ ও দাশরাজ্ঞী বা তাহাদের মন্ত্রী এই তিনটি চরিত্রে নাট্যকারের যশোবৃদ্ধি হয় নাই। মাধব মন্দ নহে। ভীষ্ম নাটকে নূতন অঙ্গরাগ থাকিলেও অনভিনীত থাকায় সাফল্য যাচাই হইল না। অমিত্রাক্ষর পদ্য ও গদ্যের মাধ্যমে এখানি রচিত।

সিংহলবিজয়

নাটকখানি ঐতিহাসিক। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ আলোচিত হইল। এখানি নাটককারের শেষ ঐতিহাসিক নাটক। নাটককারের পুত্র দিলীপকুমার বলিয়াছেন যে এখানির সংশোধনকার্য চার অঙ্ক পর্যন্ত নাট্যকার স্বয়ং সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, পঞ্চম অঙ্কটি অসংশোধিত।

প্রথম অঙ্কে নাটকীয় দ্বন্দ্ব—তাহা কি বাহিরের, কি অন্তরের—প্রকাশিত হইয়াছে। জন্মভূমি সম্বন্ধে এক নূতন প্রকাশভঙ্গী এ নাটকে পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বিজয় তাহাদের পুরাতন ভৃত্য ভৈরবকে বলিতেছে—'ভাব্‌তাম দেশ শুদ্ধ মাটি আর আকাশ। কিন্তু এখন বুঝেছি যে জন্মভূমি মানুষ, সে কথা কয়, হাসে-কাঁদে, বুকে জড়িয়ে ধরে। তার চেয়েও বেশী, জন্মভূমি সাক্ষাৎ মা, গর্ভে ধরে, স্তন্য দেয়, বুকে জড়িয়ে ধরে।' বিজিত বিজয়কে ঐ দৃশ্যে বলিয়াছে—'যুবরাজ! যুক্তকর স্নেহভিক্ষার আকার ধারণ করে।' দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে বিজিতের কাছে পিতা সম্বন্ধে সন্তানের উক্তি বিজয় এইরূপে করিয়াছে—'সন্তান পিতা বেছে নিতে পারে না বিজিত।' সাংসারিক জীব সম্বন্ধে ঐ দৃশ্যে বিজয় আরও বলিল—'সংসারে সব চোর। সব পর্বতের মত স্বার্থময়, সমুদ্রের মত স্বেচ্ছাচারী, আকাশের মত উদাসীন, ঈশ্বরের মত কঠিন।'

ইতিহাসের পটভূমিকার উপর কল্পনার সৌধ এই নাটকে নাট্যকার গড়িয়াছেন। পত্নীবিজিত বঙ্গাধিপ সিংহবাহুর পুত্র নির্বাসিত বিজয়সিংহ দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে সমুদ্রপথে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিলেন। এ নাটকের ভাষা গদ্য ও অমিত্রাক্ষর পদ্যে বিচিত্র ভঙ্গিমায় রূপ লইয়াছে। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সমুদ্রগর্ভ হইতে সবে মাত্র উদ্ধারপ্রাপ্তা কুবেণীর জলসিক্ত রূপ দেখিয়া বালকরূপী লীলা এইরূপ বলিয়াছে—'* * গৌরতনুখানি, কুঞ্চিতসিক্ত বসনের তলে জলদজড়িত প্রত্যূষের মত শুয়ে আছে—'।

বালকের ছদ্মবেশে লীলা তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থদৃশ্যে বিজয়ের সঙ্গে এমন সব কথা বলিয়াছে যাহাতে তাহার বালকত্বে সন্দিহান হইবার সুযোগ ঘটে। নাট্যকার এখানে অসতর্ক ছিলেন। আরও আশ্চর্যের কথা যে তাহার স্বামী বিজয় এত কথার মধ্যেও তাহার স্ত্রীত্ব ধরিতে পারিতেছেন না।

বিজয়সিংহ কর্তৃক লঙ্কার সিংহাসন অধিকৃত হইলে বিরূপাক্ষ সেনাপতি বিশালাক্ষকে এই কথা বলিল—'জ্যোৎস্নার বিলয়ে নির্লজ্জ কলঙ্কী চাঁদের মত, আকাশে ভয়ে পাংশু হ'য়ে, দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে থাক্‌ব না।' এই প্রকাশভঙ্গীটি চমৎকার। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে বালকরূপিণী লীলা ও কুবেণীর মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যৎ লইয়া কথোপকথনের মধ্যে এই প্রকাশভঙ্গীটি সুন্দর:—'অতীত বিজ্ঞান। কিন্তু ভবিষ্যৎ কবি। অতীত মাতা, ভবিষ্যৎ পত্নী। অতীত করুণার মত স্নেহের সরল বেষ্টনে গলাটি জড়িয়ে ধরে কাঁদে, শীর্ষে আশীর্বাদ বর্ষণ ক'রে কাঁদে, আর ভবিষ্যৎ শুধু চায়, শুদ্ধ দাবী করে।'

নাটকখানির যাবতীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাত প্রথম হইতে চতুর্থ অঙ্কের মধ্যে পাওয়া যায়। পঞ্চম অঙ্ক শ্লথগতিপথে অগ্রসর হইয়াছে। ইহাতে লঙ্কাবিজয়ী বিজয়সিংহ ধর্মপ্রচারক বিজয়সিংহে পরিণত হইয়া গেল। নাট্যকার এই নাটকের জন্য দুইখানি গান রচনা করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য গানের সহিত গীত হইবে এই কথা পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত বিবিধ সংগীত-ভাণ্ডার হইতে গানগুলি পূর্ণ করা হইয়াছে।

বঙ্গনারী

এই সামাজিক নাটকখানি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল পরলোক গমন করিলে এখানির অভিনয় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

অসময়ে মৃত্যু হওয়ায় নাটকখানির সংশোধন কার্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। নাটককার 'ঘোরো ঘোরো আমার ঘানি' শীর্ষক গানখানি লিখিয়া রাখিয়া ও 'চিরজীব সুখিনী বঙ্গরমণী রমণীকুল-প্রবরা রে' এবং 'এবার হয়েছি হিন্দু করুণাসিন্ধু গোবিন্দজীকে ভজি হে' শীর্ষক গান দুইখানি এই নাটকের জন্য মনোনীত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অপর গানগুলি নাট্যকারের নির্দেশপ্রাপ্ত নহে। গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণের পাঠ আলোচিত হইল।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই সামাজিক নাটকের সংলাপে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অলংকারপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে সুশীলা-বিনয়ের কথাবার্তায় বিনয় বলিয়াছে—'বাক্য উন্মত্ত কয়েদীর মত বন্ধন শৃঙ্খল ভেঙ্গে বেরিয়ে আস্‌তে চেয়েছে, তবু বলি নি।' প্রকাশভঙ্গীও স্থানে স্থানে চমৎকার। যেমন ঐ দৃশ্যে বিনয় সুশীলাকে বলিয়াছে—'তোমায় এত ভালবাসি যে, তোমায় স্পর্শ কর্ত্তেও আমার ভয় হয়, পাছে আমার হাতের ধূলা সেখানে লাগে।' ঐ দৃশ্যে বিনোদিনী ও সুশীলার সংলাপে আর একটি প্রকাশভঙ্গীও নতুনতর, যেমন—'এক দিন—যে দিন ত্যাগের সৈন্য এসে এই দুর্গ থেকে,—স্বার্থকে তাড়িয়ে দেবে, আর অহঙ্কারের কুজ্ঝটিকা ঝরে পড়ে যাবে—সেই দিন বুঝবে।'

বঙ্গনারী নাটকটি নারীদের বিবাহ সংকট, মানরক্ষায় বিঘ্ন, নিগ্রহ প্রভৃতি লইয়া রচিত, এবং পুরুষের প্রতারণা, জাল-জুয়াচুরি কি করিয়া বাঙ্গালীর সংসারকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে তাহারও চিত্র দেখাইয়াছে। চরিত্র হিসাবে কেদার অপূর্ব, তাহার আত্মত্যাগ, ভাষা ও ক্রিয়াকলাপ লোকের প্রাণে সাড়া জাগাইয়া তুলে। নাটকের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব-সংঘাত সম্বন্ধে তৃতীয় অঙ্কের সর্বশেষ সংঘাতটি অসাধারণ সূক্ষ্ম সংঘাতে পূর্ণ। মানুষের পৈশাচিক দুষ্প্রবৃত্তির সহিত তাহারই মনুষ্যরূপ সুপ্রবৃত্তির সংঘাত। বাঙ্গালা নাটকে এরূপ সংঘাত দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম আনিলেন, তাই এ জাতীয় সংঘাত দর্শক সমাজের বোধগম্য না হওয়ায় নাটকটি জমিল না। নাটকের সংঘাতগুলি নিজে খাড়া থাকে নাই, শুয়ে-গড়িয়ে মন্থর গতিতে দাঁড়াইয়াছে, তাই জনপ্রিয় হইতে পারিল না। ট্র্যাজিক কাহিনী লইয়া ইহার আরম্ভ হইলেও, পরিণতি পাইয়াছে কমেডিতে। বৃদ্ধ বরে কন্যা সম্প্রদান দৃশ্যটিতে গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটকের সাদৃশ্য আছে। গদ্যের মাধ্যমে পাঁচ অঙ্কে নাটকখানি সমাপ্ত।

নাট্যসাহিত্যে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের কাল
(১৮৯৩—১৯১৫ খৃষ্টাব্দ)

ধনীর সন্তান অমরেন্দ্রনাথ দত্ত নট ও নাট্যমঞ্চের সত্বাধিকারী হইয়া নাট্যসাহিত্যের আসরে দেখা দিলেন, ক্রমশ তিনি নাট্যকার রূপেও আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে নাট্যশালা ও তাহার প্রচার কার্যে কতকগুলি নূতন জিনিসের আমদানি তিনি করিয়াছিলেন। অভিনয়ের প্রচার পত্রে (handbill) ও প্রাচীর-পত্রে (Poster) নূতন বাক্যবিন্যাস ও রঙ্গিন চিত্র দিয়া দর্শক আকর্ষণের চেষ্টা তিনিই সর্বপ্রথম করিয়াছিলেন। তাঁহার পুর্বে ঐ প্রচার-পত্রগুলি মামুলি ঘুড়ির কাগজে ছাপা হইত। দৃশ্যকাব্যের পরিচয়-পত্রে (Programme) নূতন-নূতন কায়দা লক্ষিত হইতেছিল তাঁহারি চেষ্টায়। দর্শকমণ্ডলীকে উপহার বিতরণেও তিনি অগ্রদূত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সরকার কর্তৃক পরিচালিত মিনার্ভার সহিত প্রতিযোগিতায় অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার ক্লাসিকে ভাল-ভাল গ্রন্থ দর্শক সমাজকে উপহার দিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের পুর্বে এমারেল্ডের ভগ্নদশায় কাণের ফুল, রুমাল প্রভৃতি উপহার সর্বপ্রথম বিতরিত হইয়াছিল। দৃশ্যপটে স্বভাবানুকরণ অমরেন্দ্রনাথ নানা উপায়ে করিয়াছিলেন। এক কথায় নাট্যশালার আঙ্গিকে তিনি অনেক নূতন অঙ্গরাগ দিয়াছিলেন। নট হিসাবেও তিনি একজন উচ্চ দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন। পদমর্যাদাপুর্ণ অভিনেতা-অভিনেত্রীর চলন তিনিই করিয়াছিলেন। রঙ্গাধ্যক্ষ, অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মধ্যে এককালীন টাকা দিবার প্রথা (Bonus) তিনিই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহার পুর্বে গুর্মুখ রায় ও গোপাললাল শীল এই কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা নট-নটী ক্ষেত্রে এরূপ ব্যাপক ছিল না। নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহার নাটক-নাটিকা ও প্রহসনে নূতনত্বের ইঙ্গিত বিশেষ কিছু ছিল না।

থিয়েটার চালাইবার জন্য তিনি রঙ্গালয়ের খোরাক যোগাইতেন, তাই তাঁহার নাট্যসাহিত্য উচ্চাঙ্গের ছিল না। যেগুলি অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল তাহাদের অল্প-স্বল্প আলোচনা করা গেল, বাকিগুলি অধ্যায়-শেষে এক তালিকায় লিপিবদ্ধ হইল। পরিণত বয়সের দুই-একখানি নাটিকায় অমরেন্দ্রনাথ নূতন রসের আস্বাদন দিয়াছেন, আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহা বলা হইয়াছে।

শ্রীরাধা

এই নামীয় গীতিনাট্যখানি প্রথমে 'মানকুঞ্জ' নামে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে ক্লাসিক থিয়েটারে ইহা শ্রীরাধা নাম লইয়া অভিনীত হইয়াছে। এখানি দুই অঙ্কে গান, ছড়া ও গদ্যের মাধ্যমে রূপায়িত। মান ও বিরহ ইহার উপাদান। রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে নারীমূর্তির এক ছায়া দেখিয়া যে মান করিয়াছিলেন তাহারি উপশান্তি ইহার বিষয়বস্তু। মামুলি পৌরাণিকী আকৃতি ইহার বাইশখানি গীতিছন্দে পাওয়া যায়, নূতনত্ব কিছু নাই।

কাজের খতম্

বড়দিন উপলক্ষে এই পঞ্চরংখানি লিখিত ও ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। কপটী (hypocrite) গোঁড়া হিন্দু, বিলাত ফেরতা ব্যারিস্টার

ও ডাক্তার এবং তাঁদের স্ত্রীগণ 'ভিতরে একরূপ বাহিরে অন্যরূপ' ব্যবহার দ্বারা সমাজকে যেরূপে ঠকাইতেছিল তাহাদের নগ্নরূপ এই প্রহসনের ভিতর দেখানো হইয়াছে। ঘটনা এ পর্যন্ত গতানুগতিক কিন্তু মতিলাল নামক এক থিয়েটারের অভিনেতা দ্বারা এক অভিনব কৌশলে সেই কপটতা সাধারণে ধরাইয়া দেওয়া হইল ঐ টুকুই নূতনত্ব। নাচে-গানে পাঁচ ফুলে সাজি করিয়া এই পঞ্চরংখানি খাড়া হইয়াছে।

শিবরাত্রি

শিবচতুর্দশী উপলক্ষ্যে রাত্রি জাগরণের খোরাক লইয়া এই নাট্যরাসকখানি রচিত। ইহাতে শিবরাত্রি-ব্রতকথার মামুলি ইতিহাস বর্ণিত ও তৎসম্পাদনে ব্রতধারীর ঐশ্বর্য ও অপবর্গলাভের ইঙ্গিত আছে। ৬ খানি গানের ভিতর দিয়া গল্পের মাধ্যমে ইহা রূপায়িত। ইহার প্রয়োগ-নৈপুণ্যটি বেশ গাম্ভীর্যপূর্ণ। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে শিবরাত্রির দিন ইহা ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত ও ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে।

নির্মলা

এখানি নাটিকা, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে ক্লাসিক থিয়েটার প্রথম অভিনীত। অমরেন্দ্রনাথ ইহাকে গীতিকাব্য বলিয়াছেন। প্রাচীন কিংবদন্তীমূলক জটিলের উপাখ্যান ও তাহারি পাশা-পাশি নির্মলা-কিশোরের প্রণয়কাহিনী ইহার প্লট। গল্পের উভয় ধারার মিলনসেতু হইল জটিল-বাঁশরীর বিবাহ। নাটিকার অগ্রগতি পথে জটিল ও নির্মলার পরস্পরাপেক্ষ কোন সম্বন্ধ নাই। নাটিকাকার নামকরণদ্বারা নির্মলা চরিত্রটিকে কেন্দ্রিক করিয়াছেন, কিন্তু নাটকীয় কোন ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা নির্মলা চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটিত হয় নাই। বেশ্যা জানিতে পারিয়া কিশোর নির্মলার প্রতি তাহার প্রণয়-লীলা পরিত্যাগ করিল, এই টুকু মাত্র ঘাত, কিন্তু নির্মলা তাহাতে প্রতিঘাত তুলিতে পারে নাই, তাই নাটিকার উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করে নাই। অপর দিকে বর্ণনাত্মক ভঙ্গীর ভিতর দিয়া জটিলের উপাখ্যানটি সার্থক হইয়া উঠিল। এইরূপে দ্বিধাবিভক্ত ঘটনার মধ্যে নাটিকাটি নিরর্থক হইয়া আকর্ষণী শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। ৩০ খানি গান লইয়া তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত নাটিকা-খানি বিস্তৃত। গদ্য, ছড়া ও সামান্য গৈরিশছন্দ ইহার বাহন। নাটিকাখানি বেশি দিন দর্শক আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

শ্রীকৃষ্ণ

এই নাটিকাখানি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে অগস্ট তারিখে ক্লাসিকে প্রথম অভিনীত। ষোলখানি গান লইয়া দুই অঙ্কে এখানি সমাপ্ত। নাচ-গান ও রঙ্গরসের মধ্য দিয়া নাটিকাখানি শ্রীকৃষ্ণের গোটাকতক লীলা লইয়া রূপায়িত হইয়াছে। তৎকালীন কমেডির যুগে এখানি বেশ সাড়া তুলিয়াছিল। তত্ত্বদৃষ্টিতে অসামঞ্জস্য থাকিলেও নাচ-গানের জোরে এখানি দর্শক টানিয়া আনিত। গ্রন্থকারের গান ব্যতীত পদাবলীর গান ইহার দ্বিতীয় আকর্ষণী শক্তি। দুই চারিখানি গান বেশ ভাবব্যঞ্জক। ফলওয়ালার সমুদয় ফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ ব্যাপারটি নাটকীয় সংঘাতহীন হইলেও উহার

'তোমারি কৃপায় প্রভু তোমারে চিনেছি' শীর্ষক গানখানি খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। রাধিকার পদাবলী সংগীতগুলি চমৎকার।

মজা

এই সামাজিক নক্সাখানি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত ও ঐ সালে ৩রা মার্চ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। বিংশ শতকের প্রারম্ভে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে নানাবিধ আপাতমধুর মজা দেখা দিয়াছিল, নক্সাকার তাহারি গোটাকতক নাচে-গানে লোকচক্ষুর গোচরে আনিয়াছেন।

এক উৎকটভাবাপন্ন ব্রাহ্মণদম্পতী অর্থের লোভে তাঁহাদের একমাত্র তনয়া কুলকুমারীকে নদের চাঁদ নামক এক ধনী কলু সন্তানের সহিত বিবাহের চুক্তি করিয়া তাঁহার ভাইপোর কৌশলে কিরূপ নাস্তানাবুদ হইয়াছিলেন তাহাই ইহার কেন্দ্রগত চিত্র। স্ত্রী-স্বাধীনতার খাতিরে free-loveএর মোহ কুলকুমারীকে পাইয়া বসিয়াছিল, কিন্তু কাকা হরিহরের কৌশলে পুরুষের ছদ্মবেশী এক অভিনেত্রী তাহার মান ও ইজ্জত উভয়ই রক্ষা করিয়াছিল। তখন মজাটি হইতে-হইতে কাঁচিয়া গিয়া এক নূতন মজার সৃষ্টি করিল। এই প্রহসনখানি নয়টি দৃশ্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা মিশ্রিত ১৩ খানি গান লইয়া সম্পূর্ণ।

থিয়েটার

এই প্রহসনখানি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অগস্ট তারিখে ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। তৎকালীন কোন প্রতিপক্ষ নাট্যসম্প্রদায়কে অপদস্থ করিবার জন্য এখানি রচিত হইয়াছিল। বিরুদ্ধ পক্ষের থিয়েটারের ভিতরকার ত্রুটি-বিচ্যুতি হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপের দ্বারা রূপায়িত হইয়াছে এবং প্রহসনকারের উদ্দেশ্য তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। উদ্দেশ্যমূলক প্রহসন এইরূপই হইয়া থাকে। ৯ খানি গান ইহার সম্বল এবং একাঙ্ক ইহার আয়তন।

চাবুক

এই পঞ্চরংখানি ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে ক্লাসিকে প্রথম অভিনীত। এখানি বাঙ্গালী জাতির এক শ্রেণী সমাজের কুৎসিৎ চিত্র। জজ হবার বাতিক, মেম সাজিবার খেয়াল, সহোদরের প্রতারণা ও শত্রুতা, শুচিবাই, আল্‌ট্রা সায়ান্‌টিসটের খেয়াল-খুসি প্রভৃতির উপর শ্লেষরূপ চাবুক মারা হইয়াছে। আটটি দৃশ্য ও এগারখানি গান ইহার প্রত্যঙ্গ। গানগুলির মধ্যে 'গিন্নি খেয়ে এগিয়ে কেন কোৎকা দেখে পেছোও প্রাণ' ও 'ফুলের চেয়ে নরম নারীর মন' শীর্ষক গান দুইখানি বেশ নাম কিনিয়াছিল।

গুপ্তকথা

এই প্রহসনখানি একদিকে যেমন গোপন রহস্যের প্রকাশক অপর দিকে তেমনি ঐ পদবীবিশিষ্ট কোন লোকের গ্লানি উদ্‌গারক হইয়াছে। যবনিকা সম্পূর্ণ উত্তোলিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অগস্ট তারিখে ক্লাসিকে অভিনীত।

এই নাটিকাখানি ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রেল তারিখে ক্লাসিকে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় সন্তান ও ভীলরমণীর প্রণয়-লীলা ইহার কাহিনী। উভয়ের পাতানো নাম 'কটিকজল'। তৃষ্ণার্ত চাতক যেমন মেঘের বারি ভিন্ন অন্য বারি পান করে না, রাজকুমার প্রভাতও সেইরূপ মেষাকৃতি পর্বতে প্রান্তপালিতা জুমেলির প্রেমবারি ভিন্ন অন্য রমণীর হাতে তৃষ্ণার জল পান করে নাই। এখানি ট্রাজি-কমেডি শ্রেণীর অন্তর্গত নাটিকা। নাটকের ভাব থাকিলেও হাল্কাভাব ও গীত বাহুল্যে নাটিকাশ্রেণীর অন্তর্গত হইয়াছে। ১৪ খানি গান লইয়া দুইটি অঙ্কে গদ্য ও সামান্য গৈরিশ ছন্দের মাধ্যমে এখানি রচিত। গড্ডালিকা স্রোত প্রবিষ্ট হইয়াছে, নূতনত্বের আস্বাদন নাই।

যুযু (নক্সা)

এখানি বিদ্রূপাত্মক প্রহসন, যবানকা না তোলা বাঞ্ছনীয়, কারণ নগ্ন বিদ্রূপ দর্শক বা পাঠক সাধারণকে পীড়া দিবে। এ জাতীয় প্রহসন উদ্দেশ্যসিদ্ধির পর জীবিত থাকে না, এখানির সেই দশা হইয়াছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখে হারিসন রোডের গ্রাণ্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ (বা Partition of Bengal)

এই নাট্যরূপকখানি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই অগস্ট বুধবার তারিখে গ্রাণ্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। লর্ড কার্জনের ভাঙ্গা বাংলা যদিও পরবর্তীকালে ভিন্ন মূর্তিতে জোড়া লাগিয়াছিল, তবুও এ জাতীয় উদ্দেশ্যমূলক রূপকের কাজ ফুরাইয়া যাইলে আর কোন মূল্য থাকে না, তাই আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

প্রণয় না বিষ ?

এই নাটকখানি প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রণয়-পরিণাম' নামীয় উপন্যাসের নাট্যরূপ। এখানি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। গল্পাংশের জন্য উপন্যাস দ্রষ্টব্য।

এস যুবরাজ

এই রূপকটি ইংলণ্ডেশ্বরের পুত্র যুবরাজের ভারতে আগমন উপলক্ষ্যে ক্লাসিক থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অভ্যর্থনার আয়োজনে পূর্ণ। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে ক্লাসিকে অভিনীত হইয়াছে।

দলিতা-ফণিনী

এই নাটিকাখানি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে মহা সমারোহের সহিত প্রথম অভিনীত হইয়াছে, এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্বর্গত ঔপন্যাসিক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে এক গল্প শুনিয়া নাটিকাকার এখানির রূপদান করিয়াছেন। উপন্যাসকে প্রশ্নোত্তরে লিখিলে যেমন হয় এ নাটিকাখানি সেইরূপ। কাহিনীর গৌরব আছে, রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ আছে, নাচ-গান আছে, নৈতিক শিক্ষা আছে, কিন্তু সব সত্ত্বেও নাটকীয় কৌশলের অভাবে এখানি পরিত্যক্ত নাটকশ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। উপযাচিকা রমণী প্রত্যাখ্যাতা হইলে কিরূপে দলিতা ফণিনী হইয়া উঠে তাহার ক্রিয়া ইহাতে আছে। নাটিকার শেষ দিকে যে শান্তরসের চমৎকারিতা দেখা দিয়াছে তাহার প্রভাবে পড়িয়া ঐ দলিতা ফণিনীও নির্বিষ ভুজঙ্গে পরিণত হইয়া ভিন্ন পথের পথিক হইয়া গেল। গল্পের বাহনে মোট ১৮ খানি গান লইয়া তিন অঙ্ক পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি।

কেয়া মজাদার

এই প্রমোদ-রঙ্গ-নাট্যখানি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু তৎপূর্বে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে এখানি অভিনীত হইয়া গিয়াছে। মানুষ ও পরী লইয়া এই কমেডিটি গঠিত। বিবাহ না করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নায়ক-নায়িকা কিরূপে বিবাহিত হইয়া গেল তাহাই ইহার প্লট। গানে কবিতায় ও গল্পের মাধ্যমে ইহা রূপায়িত, সংঘাত অপেক্ষা বর্ণনার ভঙ্গী ইহার প্রকাশক।

আশা-কুহকিনী

এই ঐতিহাসিক নাটিকাখানি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। এখানিকে দুই অঙ্কে সমাপ্ত করিবার কারণ উল্লেখ করিয়া নাটিকাকার বলিয়াছেন যে রসরাজ অমৃতলাল বসুর ইচ্ছানুসারে এরূপ করা হইল। ইহার অভিনয়দ্বারা দর্শক আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে কি না তাহার পরীক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইহার অন্তর্গত romance টি অদৃষ্টপূর্ব রূপ লইয়া বিকশিত হইয়াছে পত্রগুচ্ছের আড়ালে কুসুমকলিকা লুক্কায়িত থাকিয়া তাহার অনবদ্য রূপ ও গন্ধ যেমন বাত-সঞ্চালনে বাহির হইয়া আসে, এ নাটিকায় সেইরূপ মোমতাজের রূপ ও গুণরাশি ঐ ভাবেই বাহিরে আসিয়াছে। বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের চেনা পথে ইহার সন্ধান মিলিবে না, তাই অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে অমরেন্দ্রনাথ এ চিত্র আঁকিতে পারিয়াছেন ল্যাণ্ডি-কোটালের বন্ধুর পার্বত্য পথে। প্রণয়-ব্যাপারেও আফ্রিদী রমণী তাহার পার্থক্য বজায় রাখিয়া মৃত্যু বরণ করিল। ইহার ১৩ খানি গান বিভিন্ন ভাষার বিচিত্র পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া নাটিকার জীবনীশক্তি ক্রমাগত সঞ্চালিত করিয়াছে।

জীবনে-মরণে

নাটিকাখানি ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন তারিখে গ্রেট ন্যাশানল থিয়েটারে অভিনীত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' গল্পের নাট্যরূপ নাটিকাকার ইহাতে দিয়াছেন। এটি যথাক্রমে ভাগ্য-বিপর্যয় ও ভাগ্যের পুনর্গঠনের একটি romance। জুলিয়ার প্রতিহিংসা অবশেষে আমিনার শান্ত-স্নিগ্ধ প্রণয়রসের সাহচর্যে জারিত হইয়া মুখরোচক খাদ্যে পরিণত হইয়া গেল। নাটিকাকার সংযত

ও সংহত ভাবে ইহার রস পরিবেশন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্লটের মাধুর্যে নাটিকাখানি গন্তের ভিতর দিয়া ১৬ খানি গান লইয়া গড্ডালিকাস্রোতকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল, ঐটুকু ইহার নূতনত্ব।

প্রেমের-জেপ্‌লিন

এই রঙ্গনাট্যখানি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত ও ১৩ই তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। প্লটটি মন্দ নহে। একটি নায়িকার জন্ম পিতা একটি পাত্র এবং মাতা অন্য পাত্র স্থির করিয়া কি করিয়া মাতার পাত্রটিকে কন্যা সম্প্রদান করা হইল তাহা এই রঙ্গনাট্য বা প্রহসনখানি বলিয়া দিয়াছে। আয়োজন আছে, কিন্তু লেখার মুন্সিয়ানা নাই, তাই স্থানে স্থানে রস-রসিকতা চাপা পড়িয়া হট্টগোল মাথা চাড়া দিয়াছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জার্মানির আকাশে জেপ লিন উড়িয়া যেমন রণজয় করিয়াছিল, এই নবদম্পতীর হৃদয়-আকাশে সেইরূপ এই অদ্ভুত প্রেমের জেপ্‌লিনখানি প্রেমের জয় ঘোষণা করিয়াছে। নয়খানি গান লইয়া নয়টি দৃশ্যে গদ্য ও পদ্যের মাধ্যমে এখানি পূর্ণ।

ছুটিপ্রাণ

নাটিকাখানি চিরপ্রচলিত বিদ্যাসুন্দরের নূতন রূপ। প্রথম অঙ্কটি চমৎকার, দ্বিতীয় অঙ্ক থেকেই ভাষা ও ভাবের কৃত্রিমতা দেখা দিয়াছে, বাজে কথার ফেনানিতে আসল প্রসঙ্গ বিলম্বিত হইয়াছে। নাটিকার নাটিকাত্ব সংঘাত সৃষ্টির দোষে ডুবিয়া গিয়াছে। তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। গানগুলি সুর বাদ দিলে কথার হেঁয়ালিতে পূর্ণ। এখানি ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে, তারিখ সংগৃহীত নাই।

অপ্রসিদ্ধ দৃশ্যকাব্যগুলির কালানুক্রমিক তালিকা—

ঊষা (গীতিনাট্য) ১লা মার্চ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে ইহার একখণ্ড আছে, কিন্তু দেখিবার সুযোগ হয় নাই।

লাট গৌরাঙ্গ নামক প্রহসনখানিতে উত্তর কলিকাতার কোন গৌরাঙ্গ ভক্তকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে, এখানি ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে ক্লাসিকে অভিনীত। বিদ্রূপ এত তীব্র যে এটির বিবরণ না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

হোলো কি ? নামক প্রহসনটি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে ক্লাসিকে অভিনীত। গ্রন্থখানি দেখিতে পাই নাই।

কিস্‌মিস্‌ রঙ্গনাট্যখানি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে স্টার থিয়েটারে অভিনীত। গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর এখানি প্রকাশিত হইয়াছে, গ্রন্থ দেখিতে পাই নাই।

রোকশোধ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে স্টারে অভিনীত, কিন্তু গ্রন্থ দেখিতে পাই নাই।

বড় ভালবাসি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে স্টারে অভিনীত, গ্রন্থ দেখি নাই।

নাট্যসাহিত্যে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাল
(১৯১৪—১৯৩১ খৃঃ)

গিরিশচন্দ্রের জীবিতকালে অপরেশচন্দ্র অভিনেতারূপে রঙ্গালয়ে প্রবিষ্ট হন, পরে নাট্যকার ও রঙ্গভূমির পরিচালক হইয়াছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁহাকে রামকৃষ্ণমিশন ও বিবেকানন্দসমিতির অন্তরঙ্গরূপে দেখা গিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের ভাবধারার উত্তর সাধক ছিলেন অপরেশচন্দ্র, যদিও সর্বতোভাবে গিরিশচন্দ্রের জ্ঞানবর্তিকা ধারণের যোগ্যতা তাঁহার দেখা যায় নাই, তথাপি অপরেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর গৈরিশ ভাবধারা ক্রমশ উপক্ষীয়মান হইতেছে। দৃশ্যকাব্যের সকল বিভাগেই তিনি বিচরণ করিয়াছিলেন এবং যুগাবেদনে সাড়া দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাটক আজও অভিনীত হইতে দেখা যায়। কোন্ বিভাগে তাঁহার কৃতিত্ব কতটা তাহা তাঁহার নাটকগুলির বিশ্লেষণের মধ্যে পাওয়া যাইবে।

রঙ্গিলা

নাট্যকার ইহাকে কৌতুক গীতিনাট্য বলিয়াছেন। Sheridan এর 'Duecona' নামক গ্রন্থাবলম্বনে ইহার গল্পাংশ পরিগৃহীত, কিন্তু নাটিকাকার দেশী ছাঁচে তাহাকে ঢালিয়াছেন। এখানি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর শনিবার তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। এই কর্মেডিখানিতে ভুলের পশ্চাতে ঘুরিয়া আসল পাওয়ার রহস্য আছে। যদিও স্থানে স্থানে কথার অতিশয়োক্তি পাওয়া যায়, তাহা নূতন নাটিকাকারের কাঁচা হাতের কাজ এরূপ ধরা যাইতে পারে। কৌতুক মধ্যে মধ্যে উপভোগ্য হইয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের জুহেলী ও কুহেলীর সংলাপে একস্থানে রসরাজ অমৃতলালের 'তরুবালা' নাটকের অন্তর্গত আমোদিনী ও তরুবালার ঠাট্টা-তামাশার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৬ খানি গান লইয়া দুইটি অঙ্কে এখানি সম্পূর্ণ।

আহুতি

এ নাটকখানি 'Sign of the Cross' গল্পের ভাব লইয়া লিখিত ও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ শনিবার তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। ৫ই মার্চ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। নাট্যকার ইহাকে প্রেম ও ধর্মমূলক নাটক বলিয়াছেন। এই নবীন নাট্যকার যে পরবর্তীকালে ক্ষমতাশালী নাট্যকার হইতে পারিবেন তাহার দু-একটা প্রকাশভঙ্গীর নমুনা—'বীরের তরবারিকে আমি ভয় করি না, ভয় করি ঘাতকের গুপ্ত ছুরি।' 'শোন চন্দ্রপীঠ, রমণীর প্রেম আর প্রতিহিংসা দুই বোন্—একই বুকে তারা পাশা-পাশি শুয়ে থাকে', 'তোমার আরক্তিম গণ্ডে প্রস্ফুটিত গোলাপ, তোমার ইন্দীবর নয়নের পাশে কেমন সুন্দর ফুটে ওঠে দেখব বলে'—নাটকের অভ্যন্তরে রাখিয়া গিয়াছেন। নূতন নাট্যকার দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব বেশ নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন। অপরেশ চন্দ্র তাঁহার পূর্বগামী নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের মতো তাঁহার নাটকের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকের মোহ ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাই দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ সংঘাতের জন্য সংস্কৃত শ্লোকের অবতারণা তিনি করিলেন। উপজীব্য গ্রন্থের ঘটনা-সংঘাত গ্রহণ করিয়া নাট্যকার এই নাটকের অবয়বে রোমীয়যুগের Gladiator দৃশ্য, ধর্মসম্বন্ধীয় কু-সংস্কার ও অমানুষিক অত্যাচারের

ইতিহাসকে হিন্দু আকারে রূপান্তরিত করিয়াছেন বটেন, তবে প্রাণের অন্তস্তলে সাড়া দিতে পারেন নাই। ইহার আধ্যাত্মিক তত্ত্বে অনায়ত্ত গৈরিশ প্রভাব উঁকি-ঝুঁকি দিয়াছে। গদ্যের মাধ্যমে সাতখানি গান লইয়া তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। নাট্যকারের নাটক রচনার নবীন উদ্যম জয়যুক্ত হইয়াছে।

এই সামাজিক নাটকখানি লর্ড লিটনের 'Lady of Lyons' নাটিকার ছায়া ও কায়া লইয়া গঠিত। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে এখানি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত ও ৫ই তারিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এর দু-একটি প্রকাশভঙ্গী চমৎকার—(প্রথম অঙ্কের ৫ম দৃশ্যে বৃদ্ধ মাতার বুদ্ধি সম্বন্ধে বলা হয়েছে)—'ও থিতোনা বুদ্ধির কাছে আমাদের মতলব টেঁকবে না'। (তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সারদা ডোরাকে তাঁর স্বামি-ঘটিত দুঃখের কথা যে বলিতেছেন তার অন্তর্গত একটি বাক্য)—'চোখ মেলে দেখেছি—সূর্য উঠেছে—আকাশভরা হাসি—গাছের পাতায় হাসি—মাঠে ধানের ক্ষেতের উপর হাসির ঢেউ ব'য়ে চলেছে—কেবল আমার চোখের পাতায় আষাঢ়ের মেঘ'। বিশ্বনাথ প্রতারকের ন্যায় ডোরার প্রতি যে ব্যবহার করেছে তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মাতৃ উদ্দেশে এইরূপ অনুতাপ করিল—"তোমার স্মৃতি আমি আমরণ বুকে করে রাখ্‌ব। যদি বেঁচে থাকি—পুণ্যকার্য্যে এমন নাম রেখে যাব—যে নাম শুনলে তুমি আর জোচ্চোর বলে শিউরবে না! যদি মরি—সমীরণ আমার শেষ নিশ্বাস-বায়ু তোমার পদপ্রান্তে বহন ক'রে আনবে।"

এই নাটকখানির মধ্যগত দামোদরের কথায় পূর্ববর্তী নাটককার ও প্রহসনকার গিরিশচন্দ্র ও রসরাজ অমৃতলালের অনেক কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। অপরেশচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য নাট্যসাহিত্যের কাহিনী-গৌরবকে নূতন ভঙ্গিমায় প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের সৌষ্ঠব বাড়াইয়াছেন। তবে সব সত্ত্বেও কেমন একটা কাঁচা হাতের ছাপ পড়িয়া ভাবগুলি স্থানে স্থানে সংকুচিত হইয়া গিয়াছে। ছয়খানি গানের ভিতর দিয়া তিনটি অঙ্কে নাটকখানি সম্পূর্ণ। বেশিটা গদ্যের মাধ্যমে এবং অতি অল্প স্থানে গৈরিশ ছন্দে এখানি রচিত।

রামানুজ

না:কখানি ধর্মমূলক ঐতিহাসিক। তৃতীয় সংস্করণের পাঠ আমরা আলোচনা করিয়াছি। এখানি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত ও ১৭ই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের লক্ষ্মণ নামা রামানুজাচার্যের জীবনের ঘটনাবলি লইয়া এখানি রচিত। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর এ জাতীয় ধর্মবিষয়ক নাটক লিখিবার অধিকার গুরুশিষ্য-পরম্পরায় যেন অপরেশচন্দ্রই লাভ করিয়াছেন। বরদরাজকে কেন্দ্রে রাখিয়া যে বৈষ্ণব-নির্যাতন শুরু হইয়াছিল অনন্তের অবতার রামানুজই তাহার প্রাণ-কেন্দ্র। উচ্চস্তরীয় নাটক বিন্যাসের যে পন্থা গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাটকনিচয়ে দেখাইয়াছেন অপরেশচন্দ্র তাহার সবটাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের 'নারী পাপ সহচরী' 'বিধাতার অপূর্ব গঠন' প্রভৃতি বাক্য, পরমহংসদেবের 'আম খাওয়ার গল্প', 'বিল্বমঙ্গল নাটকের' অহল্যা ও বণিকের ভাব, 'লক্ষ্মণবর্জ্জন' নাটকে রাম যেরূপে

অবতারতত্ত্ব বুঝাইয়াছিলেন অপরেশচন্দ্র এ নাটকে রামানুজের মুখ দিয়া লক্ষণের ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে অবান্তর অবতারতত্ত্ব যায় গিরিশচন্দ্রের কথার প্রতিধ্বনি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে, যেমন—

'কার্যে আগমন—কার্যে পুনঃ লয়—
কার্যে পুনঃ আসিব সংসারে' ইত্যাদি

বুঝাইয়া দিলেন।

নাটকে এই এক বিষয় লইয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অপরেশচন্দ্রের মধ্যে বিভিন্ন রঙ্গালয়ে যে প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল তাহাতে অপরেশচন্দ্রই জয়ী হইয়াছিলেন। কিন্তু সব সত্বেও নাটকের মধ্যে কেমন একটা শ্লথ গতি ভঙ্গী ছিল যাহা নাটকখানিকে বিল্বমঙ্গলের ন্যায় সার্থক করিতে পারে নাই। গদ্য ও গৈরিশ ছন্দে ১৮ খানি গানের ভিতর দিয়া নাটকখানি রূপায়িত। ক্ষীরোদপ্রসাদের ন্যায় সংস্কৃতগানের লোভ অপরেশচন্দ্র পরিত্যাগ করেন নাই।

উর্বশী

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখে স্টার থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত এবং তাহার দশদিন পরে গ্রন্থাকারে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের ছায়াবলম্বনে এখানি রচিত। নাট্যকার এখানিকে গীতিনাট্য বলিয়াছেন তাঁহার গ্রন্থগুলির বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে। পৌরাণিকী উর্বশী-পুরুরবা কাহিনী ইহার প্লট। নাটিকাখানিতে বাইশখানা গান আছে, এবং তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত নাটিকার বিস্তৃতি; ভাষা গদ্য ও গৈরিশ ছন্দে গঠিত। রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ মাঝে মাঝে আছে। নাটকীয় দ্বন্দ্ব প্রায় নাই, তবে যাহা কিছু আছে তাহা অতিশয় মৃদু। ইহার 'তব শ্রীকর কমল আশে' গান খানির রচয়িতা স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ বসু, এবং তাঁহার অনুমতিক্রমেই ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

রাখী-বন্ধন

এই ঐতিহাসিক নাটকখানি ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত ও ঐ তারিখেই গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ এখানে আলোচিত হইল। গ্রন্থের নিবেদনে নাট্যকার বলিয়াছেন যে ইব্‌সেনের নাটকাদর্শে এখানি রচিত এবং ইহার প্রস্তাবনা সংগীতটি প্রবীণ সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। আধুনিক আঙ্গিকে নাটকটির স্থান গুর্জর এবং কাল ৩৬ ঘণ্টার বিবরণ। নরওয়ের বিখ্যাত নাটককার ইব্‌সেনের সংক্ষিপ্ত অথচ সংহত ভাবপূর্ণ নাটকের আদর্শে এই রাজপুত কাহিনীটিকে অপরেশচন্দ্র রূপায়িত করিয়াছেন।

নায়কের প্রথম আলিঙ্গনের স্পর্শসুখ ও বন্ধুত্ব এ নাটকের ক্রিয়াকে গতিমুখর করিয়াছে। ইহার রাখী-বন্ধনের ভিতর নাটকের গূঢ় রহস্যটি লুকায়িত। রমাবতী ও ধারাবতী নায়িকাদ্বয় যথাক্রমে বীরমল ও তেজসিংহের পত্নীত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। রমা চন্দ্রাবতের ঔরসজাতা কন্যা, সে স্বভাব কোমল ও শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্টা, ধারা, কিন্তু ঠিক তার বিপরীত, অর্থাৎ উদ্ধতা, প্রতিহিংসা-পরায়ণা ও বীর্যবতী। সে অগ্নি সিংহের কন্যা কিন্তু চন্দ্রাবতের কাছে প্রতিপালিতা। হোলি উৎসবের সর্বশেষ দিনে ধারা ও রমার সহিত একবার তাহাদের পিতৃভবনে বীরমল ও তেজসিংহের

পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত অধিক সুন্দরী ও লাবণ্যবতী বলিয়া ধারাই উভয়ের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ধারা এক সিংহীকে তার শয়নগৃহের দ্বারদেশে বাঁধিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে বীর এই সিংহীকে হত্যা করিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইবে তাহাকেই সে পতিত্বে বরণ করিবে। বীরমল ও তেজসিংহ উভয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে তেজসিংহ বন্ধুত্বের দোহাই দিয়া বলিয়াছিল যে তাহার জীবন সুখহীন হইবে যদি সে ধারাবতীকে পত্নীরূপে না পায়। বীরমল তখন তেজসিংহের ছদ্মবেশে সিংহীবধ করিয়া ধারার অন্ধকারময় কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিল। ধারা বীরমলের হাতে তাহার প্রণয়বন্ধনের চিহ্নস্বরূপ রাখী বাঁধিয়া দিল। এই সমস্ত ঘটনাটি রাত্রির অন্ধকারে ও হোলির জন্য ভাঙের নেশার ঘোরে সম্পন্ন হইয়াছিল। বীরমল অন্ধকারে গা-ঢাকা দিলে তেজসিংহ স্বরূপে বীরমলের স্থান অধিকার করিয়া ধারার স্বামী হইয়া রহিল।

বন্ধুর জন্য আত্মোৎসর্গকারী বীরমল অগত্যা শান্তা স্নিগ্ধা রমাকে বিবাহ করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিল। এইরূপে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। ধারা তেজসিংহকে লইয়া সুখী হইল না। কালক্রমে রমা কর্তৃক রাখী-বন্ধনের রহস্যটি উদ্‌ঘাটিত হইলে পর ধারা বীরমলের প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য পশ্চাৎ দিক হইতে তাহাকে বাণবিদ্ধ করিলেন এবং স্বয়ং সমুদ্রতরঙ্গে জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন।

নায়ক-নায়িকার ও অন্য কতকগুলি মৃত্যু লইয়া নাটকখানি বিষাদান্ত। গদ্যের মাধ্যমে ও তিনটি অঙ্কে ইহার পরিসমাপ্তি। চারণীদের কয়েকখানি গান আছে।

ছিন্নহার

নাটককার ইহাকে বিষাদান্ত সামাজিক নাটক বলিয়াছেন। ইহার প্রথম অভিনয় তারিখ ও স্থান—২১শে আগস্ট, ১৯২০ খৃষ্টাব্দ শনিবার, স্টার থিয়েটার। দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ এখানে আলোচিত হইল। বাঙ্গালী সামাজিক জীবনের কয়েকটি সমস্যা নাট্যকার এ নাটকের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। লীলার সহিত লোকনাথের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার কালে বিধি বিড়ম্বনায় লোকনাথের সহিত প্রকৃতির এবং হিমাংশুর সহিত লীলার বিবাহ ঘটিয়া গেল, কি করিয়া তাহা ঘটিল, নাটকের দর্শক বা পাঠক তাহা দেখিয়াছেন বা পড়িয়াছেন। বিবাহের পূর্বে লোকনাথের সহিত বাল্যকাল থেকে যে প্রণয়ের পূর্বরাগ দেখা দিয়াছিল, তাহা লীলা তাহার এই নূতন বিবাহিত জীবনে অপসারিত করিতে পারিলেও লোকনাথ উহা মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই, এবং তাহারি জন্য সে বিবাহের ৬ বৎসর পরেও লীলাকে দেখিবার আগ্রহে একদিন রাত্রিকালে গোপনে তাহার শয়নঘরে হাজির হইয়াছিল। এই সাক্ষাতের পর লোকনাথ লীলার ফটো যাহা লীলা তাহাকে বিবাহের পূর্বে দিয়াছিল তাহা ফেরৎ দিতে চাহিলে লীলা ফেরৎ লইল না, বরং লোকনাথ তাহার গায়ে হলুদের দিন তাহাকে যে হার যৌতুক স্বরূপ দিয়াছিল তাহা লোকনাথকে ফেরৎ দিল। উদ্দেশ্য—নিয়তির কঠিন হস্তের ছিন্ন ও হার রাখিবার সে এখন আর অধিকারিণী নহে। স্বামী বদল ত পূর্বেই হইয়াছে, এখন ঘটনাচক্রে নাটকের ক্রিয়ামধ্যে প্রকৃতি ও লীলার গাড়ী বদল ঘটিয়া পরবর্তী ঘটনার সূচনা করিল।

ঘটনার প্লাবন এত জোরে প্রবাহিত হইয়াছিল যে লোকনাথের জেল, লীলা স্বামী কর্তৃক গৃহ হইতে বিতাড়িতা, লীলার মা-মোক্ষদার আত্মহত্যা, স্বামী অন্বেষণার্থ প্রকৃতির গৃহত্যাগ, পথে কালীঘাটে তাহার কন্যা মায়া অপহৃতা হইল, কিন্তু হিমাংশুর বিরজা নাম্নী বেশ্যা-গৃহে সে প্রতিপালিতা

হইতে লাগিল। প্রকৃতি স্বামী ও মায়ার কল্যাণার্থ তারকেশ্বরে যাইয়া হত্যা দিয়াছে, ঘটনাচক্রে মুমূর্ষু প্রকৃতির কাছে লোকনাথের আগমন ঘটিল। এখানে স্বামী-স্ত্রীর সংলাপটি অন্তর্বেদনায় মুখর হইয়া অভিমানিনী প্রকৃতির মৃত্যুকালীন কথাগুলিকে নাট্যসাহিত্যের পৃষ্ঠায় চিরাঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। অপর দিকে অপহৃতা মায়া পুলিস কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হইল, তাহার গলায় সেই লোকনাথ প্রদত্ত লীলার হারটি শোভা পাইতেছিল। এটি বিরজা তাহার জাল সাক্ষ্যদানের পুরস্কারস্বরূপ হিমাংশুর নিকট হইতে পাইয়াছিল, মায়ার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সে তাহার গলদেশে উহা ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। ঘটনাবলি জটিলতর হইয়া দেখা দিল, হিমাংশু জাল সাক্ষ্য দেওয়াইবার অপরাধে ধৃত হইয়া থানায় নীত হইয়াছে। লীলা তাহার পিতা নীলাম্বরকে লইয়া গোলপাতার এক কুঁড়ে ঘরে সূচি ও চিত্রণ বিদ্যার সাহায্যে জীবিকা অর্জন করিতেছে। খবরের কাগজে হিমাংশুর জালিয়াতি সংবাদ প্রকাশিত দেখিয়া লীলা স্বামীকে বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে থানায় গিয়া চেষ্টা করিল।

এই নাটকখানি ১৫টি প্রধান চরিত্র লইয়া আরম্ভ হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৬টি চরিত্রের মৃত্যু ঘটিয়াছে, ৩টি চরিত্রের অবস্থান্তর লাভ হইয়াছে, ২টি জেলে পচিতেছে, ২টি অপর চরিত্রের চরিত্রোন্মেষের সহায়তা করিয়াছে। লীলা নাম্নী নায়িকা চরিত্রটি তাহার চরিত্র-মাধুর্যে নাটকখানিকে সংঘাতমুখর করিয়া দর্শক বা পাঠকের চিত্তপ্রসাদ আনিয়া দিয়াছে। মায়া চরিত্রটিই ছিন্ন হার। দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্বে এ নাটকে দৈবই বলীয়ান। আধুনিক বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনে বিয়েট্রিস নাম্নী ইওরোপীয় মহিলা বাঙ্গালী পতি লাভ করিয়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের ন্যায় জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। এটি বিলাতী স্ত্রী-জাতীর সমস্যার একটি সমাধানের দিক।

নাট্যকারের নূতন প্রকাশভঙ্গীর গুটিকতক নমুনা—(লীলার ফটো দেখিয়া লোকনাথ প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে এই কথা বলিয়াছে) "তুচ্ছ কাঁচের ক্যামেরার উপর হিংসা হয়। তার নীরস বক্ষে এই ষোড়শী রমণীর লাবণ্য নিমিষের বাহুবেষ্টনে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত করে নিয়েছে।" (পৈতৃক ভিটা সম্বন্ধে নূতন কথা দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নীলাম্বর হিমাংশুকে এইরূপে বলিয়াছে)—"নিজের ভদ্রাসন—যে ভদ্রাসনের চারি পার্শ্বে তোর বাপ-পিতামহের আত্মা বংশধরের নিকট এক গণ্ডূষ জল পাবে বলে তৃষিত চাতকের মত চেয়ে আছে, যে ভদ্রাসন তোর সতীলক্ষ্মী মা, খুড়ী, জেঠাই, ঠাকুর মার পায়ের ধুলায় তীর্থের ন্যায় পবিত্র, যে ভদ্রাসন তোর কুলদেবতার নিত্য পূজার মন্দির" ইত্যাদি। (আধুনিক নাটক-নভেল সম্বন্ধে পুলিস ইন্সপেক্টারের মন্তব্য তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে এইরূপ)—" * * একটা ভাল কথা, কি কাজের কথা বল্‌তে জানেন না, কেবল কাগজে কলমে বিষ ছড়াচ্ছেন—ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি! আর সে সোনার জলে বাঁধন ivory finish কাগজে মোড়ক করা বিষ।" (পঞ্চম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে) (সংলাপের মধ্যে লীলা বলিয়াছে)—"লোকনাথ, আমি এ আশা করিনি, উঃ লোকনাথ! কেন তুমি এমন হলে? আমার জন্য—একটা তুচ্ছ নারী। আমি আশা করেছিলেম, হোক্ তোমার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন—আমি মনে মনে তোমায় গড়েছিলেম মানুষের আদর্শ। সংসারের শত বাধায় শত ঝঞ্ঝায় শত ঝঞ্ঝাবাতের মাঝে সর্বংসহ ঐ বিশাল বটবৃক্ষের মত নভশ্চুম্বী হ'য়ে গর্বোন্নত তোমার শির মহিমায় সহস্রশাখ হ'য়ে এই সংসার অরণ্যকে সদাই স্নিগ্ধ ক'রে রাখবে! আর সেই তুমি আজ এই!" এই কথার উত্তরে লোকনাথ যখন বলিল—"তাতে তোমার কি?—তোমার কি যায়

আসে?" লীলা ঐ কথায় যে উত্তর দিয়াছিল তাহা নাট্যসাহিত্যের পৃষ্ঠায় অবিস্মরণীয়ভাবে সঞ্চিত রাখিবার সামগ্রী। সেই কথা কয়টি এই—"অন্তর্যামী জানেন, তোমায় কি বল্‌ব? ভগবান্ মানুষকে চোখ দিয়েছিলেন, তাঁর সৃষ্টির বাইরের সৌন্দর্য দেখ্‌বার জন্য, কিন্তু এই অস্থি-চর্মের অন্তরালে যে হৃদয়, এই চোখ দিয়ে তা দেখবার সামর্থ্য যদি তাকে দিতেন, তা'হলে তুমি বুঝতে পার্‌তে আমার কি। আমায় পাওনি, কি পাওনি? এই দেহ? ছি-ছি—স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধই কি সংসারে বড় সম্বন্ধ? আর কি কোন সম্বন্ধ নাই? বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য—এ কি শুধু অভিধানে থাক্‌বার জন্য? এর কি কোন মূল্য নাই? লোকনাথ! তুমি আজীবন ভুল বুঝেছ।" এই কথাগুলির মধ্যে বৈষ্ণবীয় 'শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর'—এই পঞ্চবিধ সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' 'বলিদান' ও অন্যান্য নাটকের প্রভাব এ নাটকের প্রকাশভঙ্গিমায় মাঝে মাঝে পাওয়া গিয়াছে, অনুসন্ধিৎসু পাঠক বা দর্শক নাটকের অবয়বে তাহা বুঝিয়া লউন।

নাট্যকার কি ঘটনা বৈচিত্র্যে, কি সংলাপের কায়দায় পাশ্চাত্ত্য প্রসিদ্ধ সমালোচক নিকোলের মতে এই নাটকখানিকে Horror Tragedyতে পরিণত করিয়াছেন বহিরাগত ঘটনার দিকে জোর দেওয়াতে (in having most of the stress on the outward elements) যদিও ইহার অন্তর্নিহিত tragedyর সহিত উহা ঘনিষ্টভাবে অন্বিত (with whatsoever there may be inner tragedy interwoven with)। সংবেদন (sensation) সৃষ্টি করিবার জন্য ঐগুলির আবশ্যক হইয়া থাকে। অপরেশচন্দ্র ইহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন।

গদ্যের মাধ্যমে পাঁচটি অঙ্কের ভিতরে মাত্র চারিখানি গান লইয়া নাটকখানি সমাপ্ত। বিয়েট্রিস একখানি রবিবাবুর গান গাহিয়াছিলেন, কি গান তাহা নাট্যকারের লেখা উচিত ছিল।

অযোধ্যার বেগম

এখানি ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর শনিবার তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের পাঠ আলোচিত হইল। নাটকটি ইতিহাসের পটভূমিকার উপর কল্পনার সৌধ, ঘাত-প্রতিঘাতের অভাব নাই। প্রতি অঙ্কের শেষ দিকে নাট্যকার একটি করিয়া নাটকীয় সংঘাত আনিয়াছেন। অপরেশচন্দ্র তাঁহার এই নাটকের মধ্যে কি গানে, কি সংলাপে তাঁহার পূর্ববর্তী নাটককার গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন, এমন কি তাঁহাদের নাট্যসাহিত্যের এক একটি লাইন বা পদবিন্যাস হুবহু প্রকাশিত করিয়াছেন, চক্ষুষ্মান্ পাঠক বা দর্শক তাহা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সপরিবার মীরকাসেমকে অতিথিরূপে গ্রহণ এবং তাঁহার শত্রুতাসাধন ইহার ঐতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু তাঁহার মহিষী বৌ-বেগমের দেবী চরিত্রের মাহাত্ম্যে স্বামীর অত্যাচার কাহিনী কিরূপে ডুবিয়া গিয়াছিল তাহা এই বিষাদান্ত নাটকখানির বর্ণনীয় বিষয়। ইতিহাস অপেক্ষা কিংবদন্তী বেশী কাজ করিয়াছে। ১২ খানি গান লইয়া গদ্যের মাধ্যমে ইহা রূপায়িত।

কর্ণার্জুন

এই পৌরাণিক নাটকখানির বিংশ সংস্করণের পাঠ আলোচিত হইল। এখানি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে আর্ট থিয়েটার-সম্প্রদায় কর্তৃক স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। কর্ণ,

শকুনি প্রভৃতি মহাভারতীয় চরিত্রে বৈশিষ্ট্যদান এ নাটকটির উদ্দেশ্য। কর্ণের দৈব বিড়ম্বনার হেতু অপরিমিত বীর্যের ফলদান কালে বিপর্যয় ঘটাইয়া কর্ণের নিয়তি কিরূপ কার্যকরী হইয়াছিল নাটককার তাহার বিশ্লেষণে নাটকখানি পূর্ণ করিয়াছেন। শকুনির অন্তর্বিপ্লবের ব্যাখ্যা এ নাটকের অভিনব ঘটনা। অমূর্ত ব্যাপারের (Abstract) মূর্তিদান বিষয়কে (Personification) আধুনিক নাট্য-শাস্ত্র সমর্থন করে না। নিয়তিকে আসরে নামাইয়া যদিও নাটককার বর্তমান নাট্যনীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন, কিন্তু বিনা কাজে মাত্র গান শুনাইবার জন্য তাহার অবতারণা মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে, বা প্রত্যেক নাটকীয় ঘটনায় নিয়তির আবির্ভাব নাটকের বিন্যাস-কৌশলকে শ্লথ করিয়া দেয়। তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রহরণে পাঠক বা দর্শক সমাজ সভাস্থলে উপস্থিত পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মধ্যে যে তীক্ষ্ণ সংঘাতের আশা করিয়াছিলেন তাহা নাট্যকার দিতে পারেন নাই। ঢিমে চালে সংঘাত গড়াইয়া-গড়াইয়া উঠিয়াছে এবং তাহা উক্ত ঘটনার গাম্ভীর্যের ফলে আপনা হইতেই আসিয়াছে, নাটকীয় কৌশলের গুণে তাহা উপচিত হয় নাই।

Pathosকে কি করিয়া pathetic করা যায় তাহা নাটককার চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে কর্ণ ও পদ্মাবতী কর্তৃক বৃষকেতুর বলিপ্রদান ব্যাপারে দর্শক বা পাঠককে দেখাইলেন। এ দৃশ্যটি কি সংঘাত-গরিমায়, কি ভাব-সম্প্রসারণে, কি সত্যনিষ্ঠায় অপরাজেয় হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চম অঙ্কে কর্ণ-কুন্তী সংবাদটি সংলাপের গুরুত্বে বেশ নাটকীয়। এই অঙ্কের 'স্থান কাল হারাইল নিজ ব্যবধান' বা 'কতু মমতায় বিগলিত প্রাণ' প্রভৃত বাক্যাংশগুলি গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটককে স্মরণ করাইয়া দেয়। কর্ণ ও শকুনিকে লইয়া এই নাটকের ঘটনা-পরম্পরা প্রধানতঃ লীলায়িত এবং গদ্য ও গৈরিশ ছন্দে নাট্যকার পাঁচ অঙ্কের মধ্য দিয়া কর্ণের মৃত্যুতে তাহা পূর্ণ করিলেন, শকুনির নিধন ব্যাপারটি নেপথ্যেই রাখিয়া দিলেন। মোট এগারখানি গান ইহাতে আছে, তাহাদের নূতনত্ব নাই।

শ্রীকৃষ্ণ (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)

এখানি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে তারিখে স্টার রঙ্গমঞ্চে আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। প্রথম অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বসুদেব ও দেবকীর মিলন, কংসবধ ও উগ্রসেনকে সিংহাসন প্রদান ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ভাবহীন শব্দঝংকারের মধ্যে তাহা ঘটিয়াছে, নাটকীয় সংঘাত অতিশয় মৃদু। দ্বিতীয় অঙ্কে—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ, জরাসন্ধ ও শিশুপাল বধ এবং রাজসূয়ে শ্রীকৃষ্ণ কতৃক ভীষ্মপ্রদত্ত পাদ্য-অর্ঘ্য গ্রহণ। শব্দাড়ম্বর পূর্ণ বিবরণী ও দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে এই কার্যগুলি নিষ্পন্ন হইয়াছে, নাটকীয় কৌশল বিশেষভাবে জাগ্রত হয় নাই। তৃতীয় অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকে দুর্যোধন পক্ষ ত্যাগ করাইতে অসমর্থ হইলেন। দৌত্যকার্যে শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনকে কুরুক্ষেত্র সমর হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, বরং দুর্যোধন কর্তৃক দূতের বধাজ্ঞা দুঃশাসনের উপর প্রদত্ত হইয়াছিল। দ্রোণ ও অশ্বত্থামার গোপন পরামর্শ। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে গীতোপদেশ দান ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত করানো। এই কার্যগুলির পশ্চাতে যুক্তিবিন্যাস থাকিলেও দীর্ঘসংলাপের মধ্য দিয়া ভাবহীন তর্কচ্ছটায় এগুলি নাটকীয় রূপ পায় নাই। চতুর্থ অঙ্কে—ভীষ্মের সৈনাপত্যে কুরুক্ষেত্র সমর চলিয়াছে। কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন কর্তৃক দুর্যোধনের মুকুটলাভ। অর্জুন বধে কৃত সংকল্প ভীষ্ম অর্জুনের রক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শন-অস্ত্র ধারণ করাইলেন। ভীষ্মের শরশয্যা, দ্রোণের সৈনাপত্য

গ্রহণ, অভিমন্যু বধ, দ্রোণবধ প্রভৃতি ঘটনা পর পর ঘটিয়াছে এবং নাটকে বর্ণনাত্মকভাবেই তাহার বিবৃতি আছে। অস্তি ও প্রাপ্তি চরিত্রে ভীম ও দুর্যোধনে কিছু ঘাত-প্রতিঘাত আছে। পঞ্চম অঙ্কে—অশ্বত্থামা কর্তৃক পাণ্ডব ভ্রমে পঞ্চ পাণ্ডব শিশুর শিরশ্ছেদ, দুর্যোধনের উরুভঙ্গ ও মৃত্যু, অশ্বত্থামার প্রতি ভীমের আক্রমণ ও তাহাকে বন্দীকরণ, অশ্বত্থামার শিরোমণি কর্তন, যাদবদের কণ্ব-মুনিকে প্রতারণা, তাঁহার অভিশাপ ও মুষল প্রসব, যাদবদের কলহ, যদুবংশ ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ। কংস পত্নী অস্তি-প্রাপ্তির পরাগতিলাভ।

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে নাট্যকার অসাবধানতা বশত অশ্বত্থামার মুখ দিয়া প্রাপ্তিকে—'রক্তসিক্ত পদরেখা মোর' না বলাইয়া 'পদসিক্ত রক্তরেখা মোর' বলাইয়াছেন। এ ভুলটি সংঘাতিক, গ্রন্থকারের নজরে পড়া উচিত ছিল। এ পঞ্চাঙ্ক নাটকখানিতে মধ্যে মধ্যে গদ্য থাকিলেও মূলত ইহা গৈরিশছন্দে লিখিত। মোট দশখানি গান ইহাতে আছে। ভাষা আছে, ভাব আছে, স্থানে-স্থানে নূতন পরিকল্পনাও আছে, কিন্তু সব সত্ত্বেও দীর্ঘ সংলাপের আড়ম্বরে নাটকখানি আকর্ষণী শক্তি হারাইয়াছে। দর্শক বা পাঠক কেহই নাট্যরস আস্বাদন করিতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্রের রামের ন্যায় নিজ মুখ দিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ গৌরাঙ্গ অবতার গ্রহণের কথাও শ্রীকৃষ্ণ লীলা সংবরণের পূর্বে প্রকাশিত করিয়া গেলেন।

চণ্ডিদাস

এই প্রেম-ভক্তিমূলক নাটকখানি আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে স্টার রঙ্গমঞ্চে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের পাঠ আলোচিত হইল। ক্ষীরোদ-দ্বিজেন্দ্র প্রবর্তিত নাটকীয় আঙ্গিক অপরেশচন্দ্রের নাটকেও দেখা দিয়াছে। বাঙ্গালার আদি কবি চণ্ডিদাস ও রজকিনী রামীর প্রেমঘটিত কাহিনী এই ত্রয়াঙ্ক পরিধি বিশিষ্ট নাটকে রূপায়িত হইয়াছে। কি নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত, কি পরিবেশ কোনটার অভাব ইহাতে দেখা গেল না, গৈরিশভাবের প্রভাব সর্বত্র সুপরিচিত রহিয়াছে। নাটকের অন্তর্নিহিত সাত্ত্বিক প্রেম কি করিয়া ইষ্টে প্রতিষ্ঠিত হইল তাহাই নাট্যকারের প্রতিপাদ্য বিষয়। চণ্ডিদাসের সংগীত-পদাবলী ও অন্যান্য মহাজন পদাবলী হইতে সংকলিত এবং নাট্যকারের স্বরচিত ২২ খানি গান ইহাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। ভাষা গদ্য, চণ্ডিদাসের সমসাময়িক প্রভাবও নাটকে সুচিত্রিত।

শ্রীরামচন্দ্র

এই পৌরাণিক নাটকখানি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে আর্ট থিয়েটার কর্তৃক মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। গ্রন্থখানির তৃতীয় সংস্করণের পাঠ আলোচিত হইল। ঐ সালের ১৯শে জুলাই তারিখে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম অঙ্কটি ঘটনার বিবৃতিতে পূর্ণ, নাটকীয় সংঘাত নাই বলিলেই চলে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে ঘটনার ঘাতে নর-নারীরূপী রাম-লক্ষ্মণ ও সীতা কর্তৃক প্রতিঘাত তুলিতে যাইয়া এই নূতন নাট্যকার তাঁহাদের দেবত্বের বিনিময়ে মানবত্ব পাইয়াছেন বটে, কিন্তু আসল রসাস্বাদন ব্যাপারে রসাভাস আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় সীতারাম সেবকেরা বেদনা অনুভব করিয়াছেন। চতুর্থ অঙ্কে সীতাহরণের পর-পর ঘটনার বিবৃতি ও লঙ্কায় সীতার নিগ্রহ, মারুতি কর্তৃক সীতার সংবাদ গ্রহণ ও লঙ্কা দগ্ধ প্রভৃতি ঘটনায় ধারাবাহিক অনুষ্ঠান।

পঞ্চম অঙ্কে রাবণবধ ও সীতার অগ্নি পরীক্ষা প্রধান ঘটনা। নাট্যকার বাল্মীকির অনুসরণে ঘটনাবলি সাজাইয়াও গিরিশচন্দ্রের মতো চিত্তাকর্ষক রামচরিত রচনা করিতে পারেন নাই, স্থানে স্থানে গিরিশের পদবিন্যাসের নকল থাকিলেও প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয় নাই। গদ্য ও গৈরিশ ছন্দের বাহনে এখানি রচিত, এগারখানি গানও কোন বিশেষ সাড়া তুলিল না।

মুক্তি

দৃশ্যকাব্যখানি কোন সংস্কৃত প্রহসনের ভাবাবলম্বনে রচিত একখানি কৌতুক নাট্য। এটি স্টার রঙ্গমঞ্চে আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ দ্বারা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে প্রথম অভিনীত। সংস্কৃত নাট্যরীতি বলিয়া প্রহসনের নায়ক তপস্বী, নায়িকা গণিকা এবং হাস্যরস তাদের উপজীব্য হইবে, তাই প্রহসনকার প্রাচীনের সহিত নবীনকে মিলাইয়া ইহার মধ্যে ব্যঙ্গ কৌতুক করিয়াছেন। ইহাতে ধর্মধ্বজীদের মুক্তি কিরূপে সম্ভবপর হইয়া উঠিল তাহার ইঙ্গিত প্রহসনোচিত পরিবেশের ভিতর দিয়া ভাবানুগ নাচ-গানে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। গদ্য ইহার বাহন। এখানি বাঙ্গালা প্রহসনের একটা নূতন রূপ।

শ্রীগৌরাঙ্গ

নাটকখানিকে নাট্যকার প্রেমভক্তি ও করুণরসাত্মক নাটক বলিয়াছেন, এখানি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্ পরিচালিত স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। আধুনিক নাটকীয় প্রয়োগকর্তার সমুদয় নির্দেশ নাটককার নিজেই দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণে ইহার আরম্ভ এবং পুরী হইতে বৃন্দাবন যাত্রা ও পথে নবদ্বীপবাসী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত সাক্ষাতে ইহার পরিসমাপ্তি। সংঘাতমুখর না হইয়া পর-পর বিবৃতি মুখর হইয়া উঠিয়াছে। প্রধান ঘটনার মধ্যে দাক্ষিণাত্যে বাসুদেবের গলিতকুষ্ঠ থেকে উদ্ধারলাভ, রামানন্দ রায়ের সহিত চৈতন্যদেবের পারমার্থিক আলোচনা, বারোজীউদ্ধার বিশিষ্ট রূপ লইয়াছে। রামানন্দ-চৈতন্য সংবাদে অধ্যাত্মতত্ত্বের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে—'এহ বাহ্য এহ বাহ্য আগে কহ আর' প্রশ্নের উত্তরে যথাক্রমে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ তত্ত্ব পর্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল তাহা নাটককার ঠিক তথ্য হিসাবে উদ্‌ঘাটিত করিতে পারেন নাই, ঘটনা হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র। যাহা হোক্ নাটকখানি নাটকীয় সংঘাতপূর্ণ না হইলেও বিবৃতিপূর্ণ (Narrative) হইয়াছে। বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রে গিরিশচন্দ্র তাঁহার নিকট চৈতন্যের ভাবদেহে অবস্থিতিরূপ যে তথ্যের সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন তাহা না করিলেও বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রটি মানুষী হইয়াও দেবীত্বে উন্নীত হইয়াছিল।

গৈরিশ ছন্দে ও গদ্যের মাধ্যমে লোচনদাস প্রভৃতির কতকগুলি মহাজন পদাবলী ও গিরিশচন্দ্রের গীতাবলি দ্বারা নাটকখানিকে সংগীতবহুল করা হইয়াছে। এত উদ্যম সত্ত্বেও নাটকখানি জনপ্রিয় হইল না।

উপসংহারে বলিতে চাই যে অপরেশচন্দ্রের বাকি দৃশ্যকাব্যগুলি নানা চেষ্টা করিয়াও দেখিবার সুযোগ ঘটিল না, তাই সেগুলিকে কালানুক্রমিক তালিকার মধ্যে নিবদ্ধ করিতেছি। উপন্যাসের নাট্যীকরণগুলি তালিকার মধ্যে নাই, কারণ সেগুলি মৌলিক নহে।

মুমুখো সাপ (কৌতুক নাটিকা)—১৯১৯ খৃঃ ৯ই আগস্ট স্টারে প্রথম অভিনীত কিন্তু তৎপূর্বে ২০ মে প্রকাশিত।

বাসব দত্তা (প্রাচীন চিত্র)—১৯২১ খৃঃ ১৫ই জানুয়ারি স্টারে অভিনীত ও ১১ই মার্চ প্রকাশিত।

অপ্সরা (গীতি নাটিকা)—১৯২২ খৃঃ ১৯শে অগস্ট স্টারে প্রথম অভিনীত।

সুদামা (ভক্তিমূলক গীতিনাট্য)—১৯২২ খৃঃ ২৩শে সেপ টেম্বর স্টারে অভিনীত।

ইরাণের রাণী (নাটক)—১৯২৪ খৃঃ ১লা জানুয়ারি স্টারে অভিনীত।

বন্দিনী (নাটক)—১৯২৪ খৃঃ ২৫শে ডিসেম্বর স্টারে অভিনীত।

মগের মুলুক (ঐতিহাসিক নাটক)—১৯২৭ খৃঃ ৩রা ডিসেম্বর স্টারে অভিনীত।

পুষ্পাদিত্য (পৌরাণিক নাটক)—১৯২৮ খৃঃ ১লা জানুয়ারি স্টারে অভিনীত।

ক্ষুন্নরা (পৌরাণিক নাটক)—১৯২৮ খৃঃ ৭ই ডিসেম্বর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

শকুন্তলা (পৌরাণিক নাটক)—১৯৩০ খৃঃ প্রকাশিত।

নাট্যসাহিত্যে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর কাল (১৯২৪—১৯৪০ খৃষ্টাব্দ)

গিরিশোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও নাটককার যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী নাট্যসাহিত্য ক্ষেত্রে কি পদরেখা রাখিয়া গেলেন তাঁহার দৃশ্যকাব্যনিচয়ের আলোচনা দ্বারা তাহা স্থিরীকৃত হইবে। ইনি শিক্ষাক্ষেত্র হইতে যুগপৎ নট ও নাট্যকার হইয়াছেন। নূতনত্বের মধ্যে দৃশ্য ও আঙ্গিকের পরিচর্যা, দৃশ্যপটের ইন্দ্রজাল তাঁহার দৃশ্যকাব্যে অধিক পাওয়া যায়। শিশির কুমার ভাদুড়ী প্রমুখ নাট্যগোষ্ঠীর সহায়তা তাঁহার উন্নতির মূলে বিদ্যমান ছিল। মোট ৮খানি দৃশ্যকাব্য তিনি রচনা করিয়াছিলেন, যথা ক্রমে তাহা আলোচিত হইতেছে। গিরিশোত্তর যুগে তিনিই শেষ মৃত নাট্যকার।

সীতা

এই পৌরাণিক নাটকখানি শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ীর অধিনায়কতায় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট বুধবারে নাট্যমন্দিরে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। গ্রন্থের নবম সংস্করণের পাঠ এখানে আলোচিত হইল। বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাসে পূর্বে যাহা ঘটে নাই সেই ঘটনা এই নাটকখানির ভাগ্যে ঘটিয়াছিল; আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের 'ব্রড্‌ওয়ে—ভাণ্ডার-বিল্ট থিয়েটারে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি তারিখে বাংলা ভাষাতেই ভাদুড়ী মহাশয়ের নাট্যসম্প্রদায় কর্তৃক এ নাটকখানি অভিনীত ও তাহার সাফল্যে তিনি অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। পরে ঐ বৎসরের মার্চ মাসে দিল্লীর তদানীন্তন মাননীয় বড়লাট লর্ড আরউইন্ ও তদীয় মাননীয়া পত্নীর সম্মুখেও এখানি অভিনীত হইয়াছে।

গৈরিশ ছন্দে চারি অঙ্ক পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। ইহার সংলাপগুলি আভিনয়িক সৌকর্যার্থ লিখিত, নাটকীয় তুলাদণ্ডে বিচার করিলে সেগুলি কোন কোন স্থানে ত্রুটিমুক্ত হয় নাই।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রামের আজানুদেশে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত সীতার সম্মুখে যথাক্রমে দুর্মুখ, কঞ্চুকী, অষ্টাবক্র, বৈতালিক, বশিষ্ঠ, লক্ষ্মণ ও উর্মিলা তাঁহাদের প্রবেশ ও নির্গমন দ্বারা নিজ নিজ বার্তা ও কাষ সম্পন্ন করিয়া গেলেন তথাপি সে গোলমালের ভিতরও সীতার নিদ্রাভঙ্গ হইল না, ইহা ঠিক স্বভাবসঙ্গত ঘটনা নহে। নাটককার একটু অবহিত হইলে এরূপ ঘটিত না, যাহা হোক্ অনন্যোপায় উর্মিলা অবশেষে সীতার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন।

নাট্যকার সীতা চরিত্রে যে দাঢ্য আনিয়াছেন তাহা কৃত্তিবাসের বাঙ্গালী সীতায় পাওয়া যায় না। দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা চরিত্রের ধৈর্য ও দৃঢ়তার ভাব এ নাটকেও আসিয়াছে। নাট্যকার প্রায় প্রতি অঙ্কেই পূর্বাভাস (premonition) দিয়া কাজ করাইয়াছেন। নাটকের মধ্যে শম্বুকের যজ্ঞাগার দৃশ্যটি কি ঔপনিষদিক স্তব গরিমায়, কি তাহার নিজের ত্যাগ মহাত্ম্যে, কি তুঙ্গভদ্রার অভিশাপ প্রক্ষেপে গরীয়ান্ হইলেও দর্শক বা পাঠকেরা যে নাটকীয় সংঘাতের আশায় উদ্‌গ্রীব ছিলেন, তাহা যেন হইতে-হইতে হইল না। বেশ শান্ত স্নিগ্ধ ভাবেই ঐ কার্যটি অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। নাট্যকার ইহার গোড়াটি সংঘাতমুখর করিয়াও শেষ পর্যন্ত সংঘাতটিকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। —

নাটকের তৃতীয় অঙ্কটি পরাকাষ্ঠা বহন করিয়াছে নূতন পরিকল্পনায় ও নূতন পরিবেশের মধ্যে। ইহাতে মর্ম ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হইয়াছে। রাম ও সীতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও দাঢ্য নাট্যকার প্রথম দুই অঙ্কে দেখাইয়াছেন কিন্তু শেষের দুই অঙ্কে তাহার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই নায়কের চরিত্রের দিক দিয়া, কারণ এখানে কঠোর সত্য মর্মের আবির্ভাবে বিচলিত হইয়া গিয়াছে। প্রয়োগ নৈপুণ্য ও আঙ্গিকের আবল্যে মাত্র দৃশ্য থাকিয়া গিয়া কাব্যের নাটকত্বকে লঘু করিয়া দিয়াছে। লব চরিত্রটিও সুন্দর হইয়া শেষ দৃশ্যে ভাবের আতিশয্যে ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারে নাই।

পৌরাণিক রাম বশিষ্ঠের আজ্ঞাবাহী, এ নাটকের রাম বশিষ্ঠের আজ্ঞায় দোলায়িত চিত্ত হইয়া বাল্মীকির মতের সমর্থক হইয়াছেন। সংগীতের দিক দিয়া নিম্নলিখিত গানগুলি সম্মোহকর পরিবেশের মধ্যে দর্শকদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল। বাহুল্য ভয়ে উহাদের প্রথম ছত্র মাত্র উদ্ধৃত হইল— (১) 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু-বাদল ঝরে', (২) 'রূপ সায়রের দোদুল তালে আলোর কমল ফুটলো গো!' (৩) 'ধরার মেয়ে, ধরার মেয়ে আয় গো ধরার মেয়ে। শীতল অতল ডাকৃছে তোমায়, মুখের পানে চেয়ে।' (৪) 'মর্ত মরু, শূন্য তরুর কুঞ্জ, দীপ্ত হেথা তপ্ত বালুর পুঞ্জ' ইত্যাদি। নাটকখানি ত্রুটিশূন্য হয় নাই। শিশির কুমার ভাদুড়ী প্রমুখ কয়েকটি অভিনেতার অভিনয়-নৈপুণ্যে এখানি জনসমাজে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

দিগ্বিজয়ী

নাটকখানি ঐতিহাসিক। ইহার প্রণয়ন-বিষয়ে আধুনিক রীতি অবলম্বিত হইয়াছে, কিন্তু নাটককার প্রাচীন রীত্যনুসারে প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ গান দিয়াছেন। এখানি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর শুক্রবারে নাট্যমন্দিরে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। একনায়কত্ব বিধানে নাটকখানি পরিচালিত। ইতিহাস বিশ্রুত নাদির শাহের দিগ্বিজয়, অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের তাণ্ডব ও বিবিধ অত্যাচারের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় এটি পূর্ণ। নাটককার এ বিষয়ে তাঁহার মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয়

দিয়াছেন, যোগেশ পূর্ব নাট্যসাহিত্যে এ কৌশল দেখা যায় নাই। পাঁচ অঙ্ক পর্যন্ত গদ্যের বাহনে ও সামান্য অংশ গৈরিশ ছন্দে নাটকখানি প্রপারিত। ইহার প্রসঙ্গাধীন সংগীতগুলি বেশ সংক্ষিপ্ত, ভাববাহী ও কবিত্বপূর্ণ।

নাদির শক্তির পূজারী এবং নিজ বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের উপর পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, বীর বলিয়া বীরত্বের তিনি উপাসক, অতিমাত্রায় দাম্ভিক, অভিজাত ও অনভিজাতের মধ্যগত দ্বন্দ্ব তিনি মিটাইতে চান, সাম্যবাদ তাঁহার কাম্য। নাদিরের বিদ্যা নাই, কিন্তু বুদ্ধিতে তিনি সতেজ। গুপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্র এককালীন রোধ করে ক্রোধান্ধ নাদির শাহ দিল্লী নগরীতে অবাধ নরহত্যা ও গৃহদাহের আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ শাস্তিদানের তাৎপর্য এই যে যদি কেহ শাস্তি দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া তাহার প্রতিবিধানে মাথা তুলিতে পারে, তাহাই তাহার মানবোচিত ধর্ম হইবে।

স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে সিরাজী ও সিতারা প্রধান। নাট্যকার নিজেই সিরাজীর সহিত সংলাপের মধ্যে এই দুই চরিত্রের পার্থক্য কোথায় সিরাজীকে লক্ষ্য করিয়া তাহা এইরূপে বুঝাইয়াছেন—'তুমি দিয়াছিলে মত্ততা, এ দিয়েছে অমৃত।'

নিশ্চেষ্টতা বা আবেদন-নিবেদন দ্বারা দেশরক্ষা হয় না, শক্তিমত্তাই ও তৎপ্রসূত অত্যাচারেই দেশবাসীকে বাঁচাইয়া রাখে এই তত্ত্বটি 'দিগ্বিজয়ী' নাটকের শিক্ষাপ্রদ মূলসূত্র।

✓এ নাটকের গূঢ় তত্ত্ব জনসাধারণে ধরিতে পারে নাই, তাই নাটকখানি জনপ্রিয় হইল না। অভিনেতা ও প্রয়োগকর্তা হিসাবে শিশির বাবু ইহাতে বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন।

প্রকাশভঙ্গীর দুইচারিটি নমুনা দিতেছি—(চতুর্থ অঙ্ক মেশেদ রাজপ্রাসাদ, হারেমের কক্ষ দৃশ্যে) রেজা খাঁ ও নাদির শাহের কথোপকথনের মধ্যে নাদির বলিলেন—'না তুমি আমার শোণিতোৎপন্ন দুষ্টব্রণ। আমি অস্ত্র-উপচারের দ্বারা তোমার ভিতরের দূষিত রক্ত বে'র করবো।' আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ঐ দৃশ্যে রেজাকে নাদির বলিলেন—'ওঠ। তোমার অন্তরের কলুষ কামনার জন্য আমি তোমায় ক্ষমা করতে প্রস্তুত, কেন না, কামনার উপর মানুষের হাত নাই, বিচার শুধু কার্যের।'

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

নামক ভাবরসাত্মক পঞ্চাঙ্ক নাটকখানি রঙমহলের উদ্বোধন রজনীতে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। অভিনয়-তারিখ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট শনিবার। এ নাটকের প্রথম দুইটি অঙ্ক পর পর নিমাই পণ্ডিতের জীবন কাহিনীর বিবৃতি লইয়া পূর্ণ, কোন নাটকীয় সংঘাত নাই। তৃতীয় অঙ্কে হরি-সংকীর্তন লইয়া প্রথম অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হইল এবং নাটকের নায়িকা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণে ঐ সংকীর্তনের নৃত্যদোদুল ছন্দ স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও মূর্ছা নামক অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব প্রথম স্ফুরিত হইতে দিল।

চতুর্থ অঙ্কে বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভুলাইয়া রাত্রিযোগে নিমাইএর গৃহত্যাগ, পঞ্চম অঙ্কে সন্ন্যাস। ইহাই নাটকের বর্ণিতব্য বিষয়। নাটকের শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নামকরণ সার্থক হয় নাই, কারণ গৌরাঙ্গ দেবের বিচ্ছেদে বিষ্ণুপ্রিয়ার আসল জীবনের যে আরম্ভ তাহা দেখাইলেন, কিন্তু তাহার শেষ পরিণতি দেখাইলেন না। গৌরাঙ্গদেবের নূতন পারিবারিক জীবনের ঘটনাবলি দেখানো হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রের যে ভাবটুকু পাওয়া গিয়াছিল তাহাই চিত্রিত হইয়াছে। বিরহের ভিতর

দিয়া যে মহামিলনের আস্বাদন পাওয়া যায় তাহা মাত্র কথার ব্যক্ত হইয়াছে নাট্যক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই। নাটকখানিকে 'নিমাইপণ্ডিতের সন্ন্যাসগ্রহণ' নাম দিলে অযথা হইত না।

প্রযোজক শিশির বাবু আঙ্গিকের দিকদিয়া যথাসাধ্য করিয়াছেন, কিন্তু সংলাপের ভিতর দিয়া যে আকর্ষণ দর্শক বা পাঠককে মুগ্ধ করিয়া তুলিবে নাটকের মধ্যে তাহার অভাব রহিয়াছে। দৈববাণী যাহা মানুষের সুপ্তচৈতন্যকে জাগাইয়া তুলে তাহা এ নাটকে 'অশরীরী সঙ্গীত বাণী' আখ্যা পাইয়াছে, এ গানগুলি ভাবের পরিপোষক রূপে কাজ করিয়া গিয়াছে এবং তাহাই এ নাটকের নূতনত্ব। কয়েকটি পদাবলি সংগীত সুরতানলয়ে নাটকের অবয়বে ঝংকৃত হইয়াছে। গদ্যের মাধ্যমে এখানি লেখা। লিপিকুশলতার যশ যোগেশচন্দ্র পাইলেন না, অনভিনীত থাকাই তাহার কারণ।

পূর্ণিমামিলন

নামক রঙ্গনাট্যখানি ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ বুধবার নাট্যনিকেতনে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। এখানি মোলেয়ারের 'School for Husbands' নামক satire নাট্যের ভাব অবলম্বনে রচিত নাটিকা। ব্যঙ্গের পরিবর্তে রঙ্গই ইহার রস। নাট্যকার বেশ কৌশলের সহিত পাশ্চাত্ত্যের কাহিনীকে হিন্দু আকারে পরিবেশন করিয়াছেন। সংগীতই নাটিকার প্রাণ, তাই সংগীতগুলির মধ্যে ঘটনার অনুরূপ সংবেদন তুলিয়া সুরতানলয়ে নাটিকার মধ্যে ঐগুলি সংঘাত সৃষ্টি করিয়াছে। এই রোমান্টিক নাটিকা অঙ্কে অঙ্কে দৃশ্যে দৃশ্যে দর্শক বা পাঠকের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। ইহার চিত্তাকর্ষণী শক্তি সমান তেজে চলিয়াছে। স্বামিরা কি করিয়া আপন-আপন স্ত্রী পাইল এবং ব্যয়কুণ্ঠ অর্থপতির কবল হইতে কি কৌশলে উহারই একজন উদ্ধারপ্রাপ্ত হইল এই নাটিকাই তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে। মোলেয়ার 'School'এর আয়তনের ভিতর নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটাইয়াছেন। যোগেশচন্দ্র 'পূর্ণিমা'রজনীর আলোকধারার সহিত অভিপ্রেত নায়ক-নায়িকার মিলন বন্যা বহাইয়া দিলেন।

নন্দরাণীর সংসার

এই করুণরসাত্মক সামাজিক নাটকখানি রঙমহলে অভিনীত হইয়াছে, তারিখ সংগৃহীত নাই, তবে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে নাটকখানি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। নাট্যকার এখানিকে উপন্যাস হইতে নাটকে উপনীত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা সার্থক নাটক হয় নাই। যখনই কোন বড় রকমের নাটকীয় সংঘাত আসিবার উপক্রম করিয়াছে তখনই নাট্যকার সেটিকে নেপথ্যে ঘটিবার সুযোগ দিয়াছেন, এবং পরে অন্য ঘটনার ব্যপদেশে তাহার বিষয় দর্শক বা পাঠক জানিতে পারিয়াছে। নাটকের ভিতর প্রাচীন সামাজিক আদর্শের সহিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রাপ্তদের নবীন আদর্শের মিলনটি ব্যর্থ হইয়া দুই আদর্শেরই অকালে মৃত্যু ঘটাইয়াছে। নন্দরাণীর দৈবমুখী সংসারের আদর্শ মহিমারঞ্জনের পুরুষকার ও আধুনিক আদর্শের সহিত খাপ খাওয়াইতে পারিল না, যদিও মাঝে মাঝে সাময়িকভাবে তাহার চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র। মহিমারঞ্জন-সৌদামিনীর মিলন ও তাঁহাদের সন্তানলাভ ব্যাপারটি রহস্যাবৃত ছিল, চতুর্থ অঙ্কে তাহা উদ্ঘাটিত হইয়াছে, কিন্তু তৎপূর্বে সৌদামিনী ঘটিত ব্যাপারটি কোথা ও কোথায় না যেন কিছু জানাজানি হইয়া গিয়াছে। কাহিনীর ঘটনাগুলি পর পর

আসিয়াছে বর্ণনাত্মকভাবে, কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে পূর্ণিমা-মতিলাল দৃশ্যটিতে পূর্ণিমার মতিলালের প্রতি আকর্ষণ ব্যাপারে সামান্য কিছু নাটকীয় সংঘাত আছে।

নাটকের ভিতরে অপরোক্ষ সংঘাত নাই বলিলেই চলে, বিলম্বিতভাবে পরোক্ষ সংঘাতে ইহা পূর্ণ, তাই ইহার আকর্ষণী শক্তি মন্থরগতিলাভ করিয়াছে। নন্দরাণীর আক্ষেপপূর্ণ জীবনের অবসান চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে ঘটিল। মহিমারঞ্জনের আদর্শপত্নীর স্বপ্নও ভাজিয়া গেল, তাই নাটকখানি দুই দিক দিয়া অর্থাৎ বাস্তব ও আদর্শের Tragedy হইয়া উঠিয়াছে। চারি অঙ্কের পরিধি-মধ্যে গদ্যের মাধ্যমে এবং কতিপয় গানের সাহায্যে এখানি রূপায়িত। সিনেমায় এটি রূপান্তরিত হইয়াছিল।

রাবণ

এই চারি অঙ্ক পূর্ণ পৌরাণিক দৃশ্যকাব্যখানি অভিনীত হইবার সংবাদ, নাই, ইহার প্রকাশ-কালও জানা যায় নাই। গৈরিশ ছন্দে এখানি রচিত, নূতনত্বের মধ্যে Premonition কিরূপে জীবের মনে কাজ করে তাহার উল্লেখ নাটকখানির ভিতরে একাধিক স্থানে পাওয়া যায়। এ বিষয়েও গিরিশচন্দ্র অগ্রদূত ছিলেন, তাঁহার পৌরাণিক নাটক ইহার সাক্ষ্য দিবে।

ইতঃপূর্বে কোন প্রচলিত নাটকেই বিভীষণ চরিত্রের কলঙ্কোচ্ছেদ করা হয় নাই। বিভীষণ কেন লঙ্কা ত্যাগ করিয়া রামের পক্ষে যোগ দিলেন তাহার এবং তাঁহার স্বজাতি ও স্বভ্রাতৃবিরোধিতার যুক্তিটি বেশ নাটকীয়ভাবে যোগেশচন্দ্র দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বিভীষণ-সরমার সংলাপের মধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন। সংলাপটি এই—

"জাতিতে রাক্ষস আমি, আচারে ব্রাহ্মণ।
রাবণ আমার রাজা—জ্যেষ্ঠভ্রাতা—
আমি ভ্রাতা কনিষ্ঠ সোদর।
স্নেহময় জ্যেষ্ঠ সহোদর।
পিতৃস্নেহে মাতৃমমতায়
আশৈশব বর্দ্ধিত যে স্নেহ—
একদণ্ডে এক পদাঘাতে
মৃত্যু কি হইবে তার? সত্যই রাক্ষস যদি আমি,
রাবণ আমার রাজা,
রাক্ষস আমার জাতি।
নৃপতি স্বজাতি রক্ষা
নিশ্চয় কর্তব্য মোর।
কিন্তু প্রিয়ে কোন পথে?
আমি আমার নৃপতি,
আমার স্বজাতি, সমপন্থী, সমধর্মী নই—
তাই এ জিজ্ঞাসা মোর।
কে আমারে দিবে উপদেশ?"

সরমা উত্তরে বলিলেন—

"আমারে করেছ প্রশ্ন,
উত্তর আমার প্রভু কর অবধান,
এ কথা তোমারি মুখে শোনা।
নহ তুমি আচারে ব্রাহ্মণ শুধু,
রাক্ষসীর গর্ভজাত বিশ্রবা মুনির পুত্র—
জাতিতে রাক্ষস কেন হবে ?
মাতৃকুলে পুত্র-কুলরীতি রাক্ষসের—
ব্রাহ্মণের রীতি অন্তরূপ।
সত্য বটে আর দুই ভ্রাতা
তব রাক্ষস প্রকৃতি।
তুমি তাহা নহ আর্যপুত্র।
তুমি বিপ্র, ক্ষত্র লঙ্কেশ্বর।
রাক্ষসের প্রকৃতি নাথ-মধ্যম ভ্রাতার
আর ভগিনীর তব।
তুমি জন্মাবধি সাধিয়াছ ধর্ম ব্রাহ্মণের।
তপ, জপ, দান ধ্যান, বেদ-অধ্যয়ন—
রাক্ষসের কেহ নহ তুমি।"

সরমার উত্তর শুনিয়া বিভীষণ বলিলেন—"* * ধর্ম মম ব্রাহ্মণের, মর্ম রাক্ষসের।" পরে বিবেকের তাড়নায় বিভীষণ বলিতে বাধ্য হইলেন—

"* * সর্বস্ব করিয়া ত্যাগ—
রিক্ত হস্তে ছিন্ন পদে
শোণিতাক্ত মর্ম দিব চরণে অঞ্জলি।
তবে, রাম কৃপা করি
দাসে যদি দেন পদাশ্রয়।"

এই সংলাপের মধ্যে গীতার—'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্মো ভয়াবহঃ।' তত্ত্বের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেখা গেল। বিভীষণ রামের পক্ষ সমর্থনপূর্বক লঙ্কাত্যাগ করিয়া কেন রামের নিকট গিয়াছিলেন তাহা এখন তত্ত্বতঃ বুঝা গেল। বিভীষণের চরিত্র মধ্যে বিপ্রোচিত গুণ এমনি তীব্রভাবে কার্য করিয়াছে যে তিনি নিজ পুত্র তরণীকে ব্রহ্মাস্ত্রে নিধন করিবার ইঙ্গিতও রামচন্দ্রকে বলিয়া দিয়া ইষ্টের জন্য চরম আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। সকল দিক দিয়া বিভীষণ চরিত্রটি অপূর্বতা পাইয়াছে।

কুশধ্বজ কন্যা বেদবতী রাবণ কর্তৃক নির্যাতিতা হইবার কালে অনলে প্রাণত্যাগ করিয়া সীতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ-সম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় বিভীষণ হনুমানকে বুঝাইতেছেন—

"মৃত্যু লয়ে জন্মে জীব, অতিযত্নে
মৃত্যুরে লালন করে যতদিন বাঁচে।
যমরূপে মৃত্যু আসে নির্দিষ্ট দিবসে,
মৃত্যু তার কাম-লালসায়।
অকামা নারীর প্রতি কাম-দৃষ্টিপাতে
মৃত্যুবীজ সৃজিত হইবে।
অতি পুরাকালে
জ্যোতিঃস্নাত সুপবিত্রা নারী বেদবতী
অগ্নিতে দিলেন আত্মদান—
তাঁর অন্তরের জ্বালা
মৃত্যুরূপে সঞ্চারিত হ'ল রাবণের
নিয়তি রেখায়।
এলো রম্ভা, সে অকামা অপ্সরীরে
রাবণ করিলা ভোগ বসে—
দিলা অভিশাপ রম্ভা,
অলক্ষ্যে মরণ পুষ্ট হ'ল
মন্দোদরী আপনার প্রেম দিয়ে
লুকায়ে রেখেছে সে মরণ।
অমোঘ সে মৃত্যুশক্তি বিধাতার বজ্ররূপী,
রাবণের মৃত্যুবাণ অব্যর্থ সন্ধান মহাভাগ।"

রামের যে কলঙ্কগুলি অক্ষালিত রহিয়াছে গিরিশোত্তর যুগের যোগেশচন্দ্র সেগুলিকে যেন সূত্রের (aphorism) ভাষ্যরূপে প্রকটিত করিয়া দিলেন। 'বালীবধ' সম্বন্ধীয় কলঙ্কটি গিরিশচন্দ্র নূতন ব্যাখ্যায় অপসারিত করিয়াছিলেন। রাবণের মৃত্যুবাণ-হরণ-ব্যাপারীয় কলঙ্কটি যোগেশচন্দ্র এই অভিনব উপায়ে যোগ্য স্থানে বিদূরিত করিলেন। ধন্য নাট্যকারের অব্যর্থ সন্ধান। তরণীসেনের যে দৈবদৃষ্টি ও দিব্যজ্ঞান দেখা দিয়াছে তাহা তরণী সম্বন্ধীয় ভবিষ্যৎ ঘটনার অনুপূরক ও তাহার চরিত্রের সামঞ্জস্য বিধায়ক।

শেষ রহিল রাবণ চরিত্রের কথা। নাট্যকার নাটকের তৃতীয় অঙ্কে রাবণের সীতা সম্বন্ধীয় climax আনিয়াছেন। সীতার রূপমোহ ক্রমশ রাবণের মনোরাজ্যে বৈষ্ণবীয় মাধুর্যভাবের স্ফুরণ আনিতেছিল, তাই নাট্যকার রাবণের মুখ দিয়া একস্থানে বলাইয়াছেন 'সীতা রূপ ও অরূপের পারে।' ঐ দৃশ্যে রাবণ সীতাকে তাঁহার প্রেম-নিবেদন এইরূপে করিতেছেন—

"বাণী, বাণী, বাণী—
আমি বসিব হেথায় পদ্মাসনে
তোমার সম্মুখে, তুমি কবে কথা—
আশৈশব রামের কাহিনী।

তোমার আমার মাঝে
বাণীরূপে রহিলেন রাম।
সেই বাণী তোমার জীবন।
দেখিব জানকী,
কেমনে আমারে ছেড়ে যাও।"

এ এক নূতন তত্ত্ব। অবশেষে রাবণ তাঁহার প্রেম সাধনার শেষ দৃশ্যে রামের কাছে মৃত্যুকালীন যে প্রার্থনা জানাইলেন তাহা এই—

"মোক্ষ নাহি চাহি রাম।
আমার প্রার্থনা—
সীতারাম নাম গান, গাহি রসনায়,
চক্ষে হেরি রাম-সীতা যুগল-মিলন,
কর্ণে শুনি সীতারাম প্রণব ঝংকার।"

রাবণের চিরশত্রু রাম কিরূপে তাঁহার ইষ্টে পরিণত হইলেন তাহার বিবর্তনও ঐ সীতাকে ধরিয়া। সে তত্ত্বটি এই—রাবণ সীতাকে আর কোনরূপে ক্লেশ দিতে চাহিলেন না, তাঁহার সুখই রাবণের কাম্য হইয়া উঠিল, তাই রামের শ্যামসুন্দর রূপ সম্বন্ধে রাবণের ধারণা নাট্যকার একস্থানে এইরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন—

"রাম—রাম—আত্মার আলোক যিনি,
জীবনের চির দ্যুতি—
রম্যমান স্নিগ্ধ শ্যামলতা পবিত্র সুন্দর,
জীবের পরম বন্ধু—শত্রু রাবণের।
* * সেইযুদ্ধ কাল প্রাতে হবে আরম্ভন,
যুগ ব্যাপি তার আয়োজন চলে।
স্বর্গে মর্ত্যে রসাতলে তিন লোকে।
সেই আজন্ম সাধন শত্রু এসেছে লঙ্কায়।"

পৌরাণিক রাবণ চরিত্রের এইরূপ অভূতপূর্ব রূপদান নাটককারের বৈশিষ্ট্য। নাট্যকার এই নাটকের মধ্যে বিষ্ণুমায়ার এক ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছেন এবং রঙ্গমঞ্চসজ্জা ও আঙ্গিক অভিনয় দ্বারা আধুনিক প্রয়োগ নৈপুণ্যের নিপুণতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাই রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মায়া মূর্তি নির্মিত হইয়া করুণ ক্রন্দন তুলিয়া পাঠক অপেক্ষা দর্শকের কাছে চমকের সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা করিলেন। নাটকখানি অভিনীত হয় নাই, তাই উহার পরীক্ষা দেখিবার সুযোগ ঘটিল না। এক সম্মোহকর পরিবেশের ভিতর দিয়া নাটকখানি শেষ হইয়াছে তাহাতে সংঘাত অপেক্ষা সম্মোহন বেশি কাজ করিয়াছে। প্রস্তাবনা সংগীতটি চমৎকার।

মহামায়ার চর

নামক নাটকখানি করুণরসাশ্রিত ও গার্হস্থ্য সম্বন্ধীয়। এখানি ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর শুক্রবারে নাট্যনিকেতনে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। ইহার গল্পাংশ একখানি ইংরাজি নাটক হইতে

সংগৃহীত, মাত্র গল্পাংশের কিছু মিল তাহার সহিত আছে, বাকি সবটাই নাট্যকারের কল্পনামণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছে। দেহীর সহিত দেহাতীতের নিত্য সম্বন্ধের কথাটাই ইহার অলৌকিকত্ব, বাকিটা লৌকিক। রূপকের সহিত বাস্তবের মিলন নাট্যকারের প্রতিপাদ্য।

নায়িকা জগদ্ধাত্রীই নাটকটির রহস্য। মহামায়ার চরে তাঁহার আকস্মিক অন্তর্ধান ও আবির্ভাব দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব। নাট্যকার নায়িকার পুত্র অতুলের দ্বারা প্রমাণ করাইতে চাহিতেছেন যে জগদ্ধাত্রী যে কোন কারণে হোক্ মৃত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার অপূর্ণ কামনাপূর্ণ দেহ মৃত্যুঞ্জয়ের পরিত্যক্ত গৃহে কামনা পূরণের আশায় ঘুরিয়া বেড়াইত। পুত্র অতুল নিজ পরিচয় মাকে দিয়া জগদীশ্বরের কাছে তাঁহার প্রেতদেহের মুক্তি এক অভিনব উপায়ে প্রার্থনা করিল। এ যেন 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনম্' তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন, কিন্তু এটি জগদ্ধাত্রীর শেষ ২৫ বৎসর অন্তর্হিত হইয়া থাকিবার সমাধান। তাঁহার ৯ বৎসর বয়সে প্রথম অন্তর্ধান ও ১৫ দিন পরে পুনরাগমনের বিষয় কোন সমাধানপ্রাপ্ত হইল না, তবে সবটাই প্রেতাত্মার কাণ্ড ধরিয়া লইলে অন্য কথা।

নাটক হিসাবে ইহার সার্থকতা নাই, নাটকীয় সংঘাত যে কোথায় তাহা বুঝা কঠিন। দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গান ও সামাজিক জীবনের খানিকটা চিত্র ইহার মধ্যে পাওয়া যায় এবং তাহাকে ঘটনা দ্বারা করুণ রসাশ্রিত করা হইয়াছে।

এ নাটকে একখানি গানে আছে—'এ পারে পদ্মা ও পারে পদ্মা কোথায় বাড়ীঘর— মাঝখানেতে ধু ধু করে মহামায়ার চর।' ইহার আদি জানা নাই, অন্তও অজ্ঞাত মাঝের কয়দিনের সুখ দুঃখ। এই অংশে গিরিশচন্দ্রের 'করমেতি বাঈ' নাটকে পূর্বজন্ম, ইহজন্ম, পরজন্ম সম্বন্ধে করমেতি এক স্থানে যাহা বলিয়াছেন, যথা—'কেউ জানে না কোথায় ছিলুম, কেউ জানে না কোথায় যাব, আগাশেষ জানে না, মাঝে দিন কতকের জন্যে করমেতি নাম দিয়েছে, আমি ডাকলে করি 'হু'। মানব জীবনের এই কথা কয়টিই যেন ইহার তত্ত্বভূমি। কিন্তু তাহাই বা কিরূপে হইবে। জগদ্ধাত্রী দুর্জ্ঞেয় চরিত্র। করমেতি আদর্শ প্রেমিকা এবং সেই প্রেমনিষ্ঠা দ্বারা স্বামীর চরিত্রও তিনি সংশোধিত করিতে পারিয়াছিলেন।

প্রেতাত্মা লইয়া শেক্সপীয়র নাটক লিখিয়াছেন, গিরিশচন্দ্রও তাঁহার কালাপাহাড় নাটকে প্রেতাত্মার প্রভাব দেখাইয়াছেন, কিন্তু ইহলোক-পরলোকের সেতুবন্ধন যোগেশচন্দ্রের জগদ্ধাত্রীই যেন করিল।

পরিণীতা

নামক সামাজিক নাটকখানি ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার নাট্যনিকেতনে প্রথম অভিনীত ও ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানি আধুনিক technique এ লেখা। নাট্যকার ভূমিকায় বলিয়াছেন যে এই নাটকের মর্মকথা তরুণের আত্ম-প্রতিষ্ঠা। সাজ-পোষাকে আধুনিক হইলে চলিবে না, প্রাণ-শক্তিতে আধুনিক হইতে হইবে। তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠা দেখাইতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণের আত্মত্যাগও দেখাইতে হয়। প্রাচীন সংস্কার অতি আধুনিকের সংঘর্ষে কিরূপ মসৃণ হইয়া দেখা দেয় তাহার প্রক্রিয়া নাটকখানি বহন করিয়াছে। বনেদী ঘরের গর্ব উন্নতিশীল কারবারী নূতন ধনী মধ্যবিত্তশ্রেণীর কর্মশক্তিকে কিরূপ অবজ্ঞার চক্ষে দেখে তাহাই নাটকটির অন্তর্দ্বন্দ্ব।

নাটক বলিয়াছে সত্যকে 'স্বীকার করিবার সাহস যার আছে সেই-ই modern। মানুষের সমাজ বা সাংসারিক ব্যবস্থা সব জিনিসই পুরাণো হয়, জীর্ণ হয়; শুধু সত্যই চিরকাল থাকে। Modern হচ্ছেন চিরকিশোর সত্য। নাটকে দ্বিতীয় অঙ্ক পর্যন্ত যে চক্রান্তজাল বিস্তৃত তৃতীয় অঙ্কে তাহারই Climax, চতুর্থ অঙ্কে আনন্দের মধ্যে উহারি পরিসমাপ্তি। ললিতা যে 'পরিণীতা' স্ত্রী তাহা প্রমাণিত করিয়া এই Melodramaখানি চকিতে উঠা ঘাতের উপর চকিতে আসা প্রতিঘাত উঠিয়া নাটকীয় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়াছে।

চরিত্র হিসাবে নগেন, শ্রীপতি, চন্দ্রা ও ললিতা বেশ ফুটিয়াছে। Ultra-modern নাটকে যেরূপ মানের সংলাপ আবশ্যক তাহা ইহাকে পাংক্তেয় করিয়াছে। এটি বিংশ শতকের প্রথমার্ধ কালের শহরে শিক্ষিত সমাজের একখানি প্রতিচ্ছবি। কতকগুলি সুমধুর সংগীত মাঝে মাঝে ইহার প্রাণে রস-সঞ্চার করিয়াছে। বর্তমানে এখানি ধারাবাহিকভাবে স্টার থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে। ইহার দুইচারিটা প্রকাশভঙ্গীর নমুনা—চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ললিতা সম্বন্ধে রমানাথ ও নগেনের কথোপকথনের একাংশ—'নগেন—তুমি হুকুম কর। রমানাথ—কি হুকুম করব? নগেন—বৌদির ওপর যে অত্যাচার ক'রেছে, তার প্রতিকার করুক। Be a modern father! রমানাথ—আমি তো modern নই, আমার বয়স একষট্টি। নগেন—মানুষ idea দ্বারা modern হয়—বয়সে নয়। আমার বিশ্বাস তুমি modern—তুমি নিজে বড় হয়েছ—তুমি সংসার জানো।'

এই কয়খানি নাটক লইয়া যোগেশচন্দ্রের কাল সম্পূর্ণ। নাট্যসাহিত্যে এই নাটকগুলির লাভালাভের কথা আলোচনার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

অধুনা মৃত কয়েকটি প্রবীণ নাট্যকারের বিক্ষিপ্ত দৃশ্যকাব্য

এইবার যে সকল নাট্যকারের নাট্যসাহিত্য লইয়া আলোচনা হইবে তাঁহাদের মধ্যে এক নরেন্দ্রনাথ সরকার ব্যতীত আর কেহই রঙ্গমঞ্চের সত্বাধিকারী বা অধ্যক্ষ ছিলেন না। তাঁহারা সাময়িকভাবে নাট্যশালার সেবা করিয়া প্রস্থিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বা বহু দৃশ্যকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি নূতনত্বের স্বাদবর্জিত পুরাতন ভাবের চর্বিত-চর্বণ। তন্মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত নাম কিনিয়াছিল তারিখ ধরিয়া পর-পর আমরা সেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

হামির

এই ঐতিহাসিক নাটকখানি 'মহিলা' কাব্যপ্রণেতা বিখ্যাত কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নাট্যসাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম ও শেষ দান। গিরিশচন্দ্রের চেষ্টায় এ নাটকখানি প্রতাপচাঁদ জহুরির ন্যাশানল থিয়েটারে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। শুধু প্রথম অভিনয় নয়, এই নাটক লইয়া তাঁহার ঐ থিয়েটার খোলা হইয়াছিল। রাণা হামির কর্তৃক চিতোর নগরীর পুনরুদ্ধারের ঐতিহাসিক ঘটনা ইহার অবলম্বিত ক্রিয়া। কবিতাকারের হাতে নাটকখানি

নাট্য-সৌন্দর্যমণ্ডিত না হইলেও কালমর্যাদা হারায় নাই। গিরিশচন্দ্র পদ্মিনীবিষয়ক গীতিকবিতাটি দীর্ঘ বিধায় দৃশ্যের দ্বারা জহরব্রতের অনুষ্ঠান দেখাইয়া অভিনয়কালে উহাকে হ্রস্ব করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রাচীন নাটকের তুলনায় ইহার সংলাপ লঘু বিবেচিত হইল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম অঙ্কে লীলার সখী বীরণের মুখে—'তাইত, জীবন্ত দেহে না জানি তারা আগুনের তাপ কেমন করেই সয়েছিল!' এই কথার উত্তরে লীলা বলিলেন—'বীরণ। মনের আগুন বলবান হলে বাইরের আগুনের তাপ বড় বোধ হয় না।' মুসলমানের চরিত্রসম্বন্ধে এই প্রাচীন নাটকে বলা হ'য়েছে—'অতি সামান্ত মোছলমান যে সেও আপনাকে রাজগোষ্ঠী বলে জানে; সেও দন্তে মাটি মাড়ায় না।' এক একটা সুন্দর প্রকাশভঙ্গী আছে, যেমন—'করবালের বলে যুদ্ধ জয় করা যায়, কিন্তু তাতে প্রজার মন জয় করা যায় না।' আরও তিনটি নূতন প্রকাশভঙ্গী এইরূপ—(১) 'অন্তঃপুর স্ত্রীলোকের স্থান, স্ত্রীলোক গোপনীয় কথা শুন্‌তেও যেমন ব্যগ্র, প্রকাশ কর্‌তেও সেইরূপ ব্যগ্র।' (২) 'বল্‌গাবিহীন অশ্ব, আর বিবেকবিহীন বীরত্ব এ দুয়ের গতি অনিশ্চিত।' (৩) 'যারা চিত্ত চর্চ্চায় প্রবীণ হয়েছে, তাদের কাছে কপটতার কপাট অতি স্বচ্ছ আবরণ।'

তৃতীয় অঙ্কটি এ নাটকের পরাকাষ্ঠা অদ্ভুত উপায়ে আনিয়াছে। চিতোরের বংশধর হামির কি করিয়া এক ঢিলে চিতোর উদ্ধারের গুপ্তসন্ধান ও চিতোরের রাণী লীলাকে লাভ করিলেন তাহা এ নাটকের দর্শক বা পাঠক জানিতে পারিয়াছে। তাই প্রত্যাখ্যাতা লীলাকে সোহাগ করিতে গিয়া হামির লীলার মুখেই শুনিয়াছিলেন—'মহারাজ! ক্ষান্ত হউন, আর কেন আমার চিত্তকে চঞ্চল করেন?—আমার দুর্দ্দশার মেঘে আর দুরাশার বিজুলি খেলার প্রয়োজন নাই।'

চতুর্থ থেকে সপ্তম অঙ্ক পর্যন্ত নাটকের গতি শ্লথ ও মন্থর। প্রাচীনকালে নাটকের ভাঙ্গা-গড়া কাজ যখন চলিতেছিল, রঙ্গালয়ের বাহিরের লোক দ্বারা তাহার একটা রূপ এইরূপে রূপায়িত হইল।

গিরিশচন্দ্রের রচিত চারিখানি গান ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহা গদ্য ও মাত্র একটি স্থানে কুড়িটি কবিতার অনুচ্ছেদ (stanza) পূর্ণ কবিতায় সম্পূর্ণ হইয়াছে।

হরিরাজ

হ্যাম্‌লেট অনুসরণে এখানি কাল্পনিক নাটক। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে প্রকাশিত এবং ঐ খৃষ্টাব্দেই অমরেন্দ্র নাথ দত্ত কর্তৃক তাঁহার ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ইহার প্রণেতা। ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটককারের বিষাদান্ত নাটকের ঘটনাকে ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া দেশী ছাঁচে ঢালিয়া তিনি রূপদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতি গর্ভধারিণী মাতার কলঙ্কবিষয়ক দৃশ্যকাব্যখানিকে ইওরোপীয় জনসাধারণের মতো তৃপ্তিসহকারে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাই এই পঙ্কাঙ্কপূর্ণ বিষাদান্ত নাটকখানি সুলিখিত হওয়া সত্বেও বিশেষ জনপ্রিয় হয় নাই। হ্যাম্‌লেটের ভাব এমন কি স্থানে স্থানে তাহার ভাবান্তর থাকিলেও হিন্দু দর্শক বা পাঠক তাহার বীভৎসতা উপভোগ করিতে ঘৃণা বোধ করিয়াছে। জনসাধারণ গিরিশচন্দ্রের ম্যাক্‌বেথের রুদ্ররসের তরজমা যেমন উপভোগ করিতে পারে নাই, হ্যাম্‌লেটের করুণ বিষাদপূর্ণ কাহিনীও জননীর বীভৎস রসের সহিত জড়িত হওয়ায় সেইরূপ পরিত্যাজ্য হইয়া রহিল। অমরেন্দ্রনাথ হরিরাজের

ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করিয়াও বেশিদিন রঙ্গালয়ে দর্শকের ভিড় জমাইতে পারিলেন না। ইহার দধিমুখ চরিত্রটি সুন্দর।

মদালসা (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)

এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের রচয়িতা নরেন্দ্রনাথ সরকার, ইনি কিছুকালের জন্য মিনার্ভার সত্বাধিকারী হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই মিনার্ভা থিয়েটারে এখানি অভিনীত হইয়াছে, অভিনয়-তারিখ সংগৃহীত নাই। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার তারিখ, ১৩ই এপ্রেল, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ, উহারই কাছা-কাছি কোন সময়ে এখানি অভিনীত হইয়া থাকিবে। প্রাচীন নাটকের মামুলি ভাব লইয়া এখানি গঠিত, কার্য অপেক্ষা বাগাড়ম্বর বেশি, প্রতিভার কোন ছাপ নাই। সরল ঘটনাবলি পর-প আসিয়াছে ও গিয়াছে, নাটকীয় সংঘাত নাই বলিলেও চলে। মদালসা নাম্নী পৌরাণিক আদর্শ সতী-চরিত্র লইয়া ইতঃপূর্বে কোন নাট্যকারই নাটক রচনা করেন নাই। কাঁচা শিল্পীর হাতে এর রচনামাধুর্য নষ্ট হইয়া দর্শক বা পাঠক সমাজকে তৃপ্তি দিতে পারিল না। গৈরিশ ছন্দ ও গদ্যের মাধ্যমে ইহা রূপায়িত। প্রাণহীন ২৫ খানি গান ইহার মধ্যে আছে। 'প্রাণের হাসি', 'জেরিনা' নামে আরও দুইখানি দৃশ্যকাব্য নরেন্দ্রনাথ সরকার রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি নূতনত্ব বর্জিত গতানুগতিকের ফল।

রিজিয়া

নাটকখানির রচয়িতা মনোমোহন রায়। দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ এখানে আলোচিত হইল। এখানি জনপ্রিয় নাটকের অন্যতম। স্যর ওয়াল্টার স্কটের কেনিলওয়ার্থের ভাব অবলম্বনে এখানি রচিত এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখে অরোরা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল, এ থিয়েটারটি বেঙ্গল রঙ্গমঞ্চে কিছু দিনের জন্য ছিল। গদ্য ও মাইকেলি অমিত্রাক্ষর পদ্যে এখানি রচিত। কাব্যগুণমণ্ডিত হইয়া বস্তু অপেক্ষা আড়ম্বর ইহার মধ্যে বেশি পাওয়া যায়। এখানিকে ব্যর্থপ্রণয়ের লীলানিকেতন বলা চলে। সমরেন্দ্রের ইন্দিরার প্রতি প্রেমদান ব্যাপারটি যেমনি ব্যর্থ তেমনি শোকাবহ; বক্তিয়ারের রিজিয়ার প্রতি ভালবাসা বা রিজিয়ার বীরেন্দ্রের প্রতি প্রেম এক জাতীয়। সংঘাতে উহা প্রতিহিংসায় রূপান্তরিত হইয়া গেল; বীরেন্দ্র ঘাতক হস্তে ছিন্নশির, রিজিয়া রণে পরাজিত হইয়া বক্তিয়ার কর্তৃক বন্দীকৃত। পান্নালাল চরিত্রটি ভাগ্যান্বেষণ ব্যতীত গুপ্তচরগিরিতে হরিরাজ নাটকের দধিমুখ চরিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ। নাটকের মধ্যগত 'কি করিতে পারি আমি' বা 'কি করিতে পার তুমি'—এই দুইটি কথা সমরেন্দ্র বা রিজিয়ার মুখে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সস্তা দরের সংঘাত আনিয়াছে। ইহার প্রথমটি বেদনায় মুখরিত হইয়া, দ্বিতীয়টি প্রতিহিংসায় রূপান্তরিত হইয়া।

সংগীত বিভাগে (১) 'নিমেষের দেখা যদি পাই তোমারি, আঁখিতে মুছাই যত বালাই তোমারি', (২) 'যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা, বঁধু হে শুধু দেখা দিতে আসা এস না'—গান দুইখানি বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এই নাট্যকার পরবর্তীকালে 'ঐন্দ্রিলা' নামে আর একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন।

সংসার

নাটকখানি মনোমোহন গোস্বামীর রচনা। চতুর্থ সংস্করণের পাঠ এখানে আলোচিত হইল। এখানি বহুদিন যাবৎ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকায় থাকিয়া সাধারণে প্রচারিত

ছিল না। আজ কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট সে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছেন। এখানি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রেল তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। বিংশ শতকের প্রথম দশকের বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের সরল সংঘাতময় আলেখ্যপূর্ণ নাটকখানি দর্শক বা পাঠক সমাজের বড়ই আদরণীয় হইয়াছিল। নাটককার পাঁচস্থলে সাজি করিয়া ইহার বিন্যাস-সাধন করিয়াছেন, ইহাতে রসরাজ অমৃতলালের 'তরুবালা' নাটকের গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল, প্রফুল্ল ও হারানিধি নাটকের ভাব, কিছু কিছু পাওয়া যায়। ইহার ঘাত-প্রতিঘাতগুলি বড়ই সরল ও খাড়া প্রকৃতির। প্রাচীন নাট্যকার উপেন্দ্র নাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের মতো রোমাঞ্চকর ঘটনায় নাটকখানি সমাবৃত রহিয়াছে। গদ্যের মাধ্যমে পাঁচ অঙ্ক পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। ইহাতে ঘটনার পর ঘটনার সমাবেশ আছে, কিন্তু তজ্জনিত নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। ইহার মধ্যগত রস-রসিকতা নিচু দরের ও মামুলি। চা-করদের দৌরাত্ম্যের কথা প্রকাশিত থাকায় ইহার প্রচার এতকাল ব্রিটিশ সরকার বন্ধ রাখিয়াছিলেন। এখানি Tragi—comedy শ্রেণীর নাটক. আসামের চা-বাগানের কুলি-সংগীত ব্যতীত অন্য কোন গান ইহার মধ্যে নাই।

মনোমোহন গোস্বামী আরও কয়েকখানি দৃশ্যকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলির কোন বিশেষত্ব নাই, পুরাতনের চর্বিত-চর্বণ লইয়া তাহাদের অস্তিত্ব। আমরা এখানে সেগুলির নাম করিয়াই ক্ষান্ত হইব, যথা—রোশিনারা, পৃথ্বীরাজ, মুরলা, ধর্মবিপ্লব !

রাণী দুর্গাবতী

নামক ঐতিহাসিক নাটকখানির গল্পাংশ টডের রাজস্থান হইতে সংগৃহীত, ইহার প্রণেতা হরিপদ মুখোপাধ্যায়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে কোহিনুর থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ইতিহাসের পটভূমিকার উপর কাল্পনিক সৌধ নাটকখানির ভিত্তিভূমি। এ নাটকে প্রকাশভঙ্গীর একটু নূতনত্ব আছে :—'রাজদণ্ড একবার নিয়েই মুক্তি পাবে, আর ভয় থাক্‌বে না, ঈশ্বরের দণ্ড তা' নয়, সে দণ্ড জন্মে জন্মে নিতে হবে, প'চে প'চে মর্‌তে হবে। বিষ্ঠাকুণ্ডে কৃমি-কীট হোতে হ'বে। পার্‌বে ?'

নাটকটির প্রধান দোষ এই যে দীর্ঘ বক্তৃতার চাপে সংঘাতমুখর সংস্থাগুলি নষ্ট হইয়াছে। নাটকের বেশিভাগ পাত্র-পাত্রীরা কাজ অপেক্ষা উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছে, ঘটনা (action) অপেক্ষা আস্ফালন বেশি। রাণী দুর্গাবতী ও তাঁহার সহচর-সহচরীদের রাজস্থানের স্বাধীনতা আনিবার শেষ চেষ্টা কিরূপে নিষ্ফল হইল তাহার ইঙ্গিতও আছে। নিশ্চেষ্টতা ও আকস্মিক মৃত্যু নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টির কৌশল না হইয়া অন্তরায় হইয়াছে। পাঁচ অঙ্কে গদ্য ও স্থানে স্থানে পদ্যের মাধ্যমে নাটকখানি উদ্দেশ্যহীন হইয়া পরিচালিত। গানগুলি ভাবা সত্বেও কেমন প্রাণহীন।

জয়দেব

নামক নাটকখানি ভক্তিমূলক। অষ্টম সংস্করণের পাঠ আলোচিত হইতেছে। ঐতিহাসিক পটভূমিকার উপর নাটকখানি কল্পনার লীলা নিকেতন। মথুর সাহা যাত্রার পালাকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ইহার রচয়িতা। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রাণ্ড ন্যাশানল থিয়েটারে এখানি প্রথম অভিনীত হইয়াছে। প্রতি অঙ্ক শেষে সস্তায় দৈবশক্তির জয় ঘোষিত রহিয়াছে।

যাত্রায় যাহা সুলভে মিলে, নাটকের মধ্যে তাহা বিনা অন্তর্দ্বন্দ্বে পাওয়া যাইলে ক্ষোভ জন্মে। জয়দেবের মানুষভাব অপেক্ষা দেবভাব ইহাতে বেশি দেখানো হইয়াছে, তাই দৈবশক্তির উপর নাট্যকার অধিক নির্ভর করিয়াছেন। থিয়েটারে অভিনীত হইবে বলিয়া গানের সংখ্যা যাত্রা-গানের তুলনায় কম করা হইয়াছিল। প্রথা অনুযায়ী নাটকখানি পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। গৈরিশ ছন্দে ও গদ্যের মাধ্যমে এখানি রচিত।

সাওদাগর

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'মার্চেন্ট অফ, ভিনিসের' ছায়াবলম্বনে এখানি রচনা করিয়াছেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে এখানি অভিনীত এবং ঐ সালেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। মূল গ্রন্থের পাত্র-পাত্রীকে দেশি ছাঁচে ঢালিয়াছেন। নাটকখানি তিন অঙ্কে সমাপ্ত, ভাবানুবাদের কৃতিত্ব ভিন্ন কমেডির সংগীতবহুলতা ও হাল্কা কথোপকথনও গ্রন্থখানির ভিতর পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

উপেক্ষিতা

এই পৌরাণিক নাটক ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করিয়াছেন। নাটককারের নিজের নাট্যশালা না থাকায় এক শৌখীন নাট্য সম্প্রদায় কর্তৃক এখানি অভিনীত হইয়াছিল, অভিনয়-তারিখ সংগৃহীত নাই। গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের পাঠ আলোচিত হইল। কাশীরাজ তনয়াগণ স্বয়ংবর সভায় ভীষ্ম কর্তৃক বীর্যপ্রভাবে অপহৃতা হইবার পর অম্বা ব্যতীত সকলেই বিচিত্রবীর্যের পত্নী হইলেন। অম্বা কিন্তু পূর্বেই শাম্বকে বরমাল্য দিয়াছিলেন, তাই তিনি ভীষ্ম কর্তৃক শাম্বের কাছে পুনরানীতা হইলে হস্তিনাপুরবাসিনী অম্বাকে শাম্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এইরূপে উপেক্ষিতা অম্বা ভীষ্মকেই তাঁহার উপেক্ষার মূল কারণ বুঝিয়া তাঁহার নিধনকল্পে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। এই ঘটনাই নাটকের বিষয় বস্তু। নাটকের মধ্যে ছোটখাট সংঘাত আছে, কিন্তু পঞ্চম অঙ্কে যে সংঘাতের ফলে নাটকের পরিণতি ঘটিল তাহা অত্যন্ত মৃদু। ভীষ্ম পক্ষে গঙ্গা এবং পরশুরামের পক্ষে দুর্গা সমরে অবতীর্ণা হইয়া শিবের মধ্যস্থতায় ভীষ্ম ও শিবের যে অদ্ভুত মিলন সংঘটিত হইল তাহা সংঘাতের দিক দিয়া নাটকীয় হইয়া উঠে নাই। পাঁচ অঙ্কে নাটকখানি বিভক্ত। উহার পাঁচখানি গানের মধ্যে একখানি 'আলিবাবা' নাটিকার কাঠুরিয়াদের গানের নকলে লেখা। গদ্য ও গৈরিশ ছন্দে নাটকখানি লিখিত।

ভূপেন্দ্রনাথ কতকগুলি দৃশ্যকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি চিরাচরিত ভাবধারায় অভিষিক্ত, পরশমণি স্পর্শজনিত ইন্দ্রজাল তাহাদের মধ্যে নাই। বাহুল্যভয়ে তাহাদের নামোল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। সেগুলির নাম :—পেলারামের স্বাদেশিকতা, বাঙ্গালী, ক্ষত্রবীর, জোর বরাত, সাইন্ অফ্ দি ক্রশ, ধরপাকড়, গোঁসাইজি।

বঙ্গেবর্গী

এই ঐতিহাসিক নাটকখানি নিশিকান্ত বসু রায় কর্তৃক রচিত হইয়া ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মনোমোহন থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের পাঠ আলোচিত হইল। ইংরাজিতে একটি কথা আছে—'A kingdom for a glass of water',

বঙ্গেবর্গীর আরম্ভটিও ঐ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিদ্রোহ সম্বন্ধে মতামত বলিতে যাইয়া সিরাজ জানকীরামকে এক স্থানে বলিয়াছেন—"সব মেঘেই বৃষ্টি হয় না উজির সাহেব—ক্ষুদ্র মেঘ হাওয়ায়ও উড়ে যায়, তুচ্ছ মনোমালিন্য মুহূর্তে মিটে যেতে পারে।" এ প্রকাশভঙ্গীটি সুন্দর। নিশিকান্তের প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে (mode of expression) দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকাশভঙ্গীর গন্ধ পাওয়া যায়, মনে হয় তাঁরা যেন এক স্কুলেরই পোড়ো (member of the same school)। ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে কি না জানি না দ্বিতীয় অঙ্কে সিরাজ ও মোহনলালের প্রথম সাক্ষাৎকার দৃশ্যটি সিরাজ চরিত্রে যে নাটকীয় সংঘাত আনিয়াছে তাহা অপূর্ব। দ্বিতীয় অঙ্কের সর্বশেষ সংঘাতের মধ্যে দৈবশক্তি ও প্রতিহিংসা সমভাবে ক্রীড়া করিয়া অবশেষে দৈবশক্তিরই জয় ঘোষণা করিল, কিন্তু ইহার নাটকত্ব বেপথু অবস্থায় দেখা দিয়াছে। জনান্তিকে কথা বলার রীতিটি আধুনিক নাট্যনীতির সমর্থকেরা নাটকের দোষ বলিয়া থাকেন, কিন্তু এ নাটকটির মধ্যে তাহা এত বেশি যে তাহা এই শক্তিশালী নাট্যকারের পক্ষে গৌরব হানিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উচ্ছ্বাস (emotion) এ নাটকের সর্বত্র কাজ করিয়াছে। ঘাত-প্রতিঘাতের গাঁট-ছড়া ঐ ভাবোচ্ছ্বাসই বাঁধিয়া দিয়াছে। দ্বিজেন্দ্র-স্কুলের সহপাঠী এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

নাটকটির নাম 'বঙ্গেবর্গী'। ইহার কেন্দ্রগত উদ্দেশ্য বর্গীর অত্যাচারের প্রদর্শন, কিন্তু তাহারি ফাঁকে ফাঁকে ভাস্কর পণ্ডিত ও গৌরী নাম্নীর চরিত্রদ্বয়ের মাধুর্য যে reliefএর (সান্ত্বনার) কাজ করিয়াছে তাহা বড়ই উপভোগের বস্তু। চতুর্থ অঙ্কের শেষ সংঘাত-দৃশ্যটি নিষ্ঠুরতার দ্বন্দ্বহীন নির্মম অপলক মূর্তি। এই অঙ্কটি ও পঞ্চম অঙ্কে ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি কার্য খাড়া সংঘাতের মতো আসে নাই। ঘাতের শ্লথগতি প্রতিঘাতের তরঙ্গকে মন্থরভাবে চালাইয়াছে। নাটকের মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের সংস্কৃত শ্লোকের অনুকরণও বেশ প্রকট। গদ্যের মাধ্যমে কয়েকখানি সময়োপযোগী গান লইয়া নাটকখানি পাঁচ অঙ্ক গণ্ডির মধ্যে বেশ ক্রীড়া দেখাইয়াছে। 'দেবলা দেবী' নামে আর একখানি নাটকও নিশিকান্ত বসু রায় কর্তৃক রচিত হইয়াছিল বাহুল্যভয়ে তাহা আলোচিত হইল না।

আত্ম-দর্শন

মহাতাপ চন্দ্র ঘোষের এই নাটকখানি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট শনিবার তারিখে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। মানব-মনের ক্রিয়াক্ষেত্র লইয়া নাটককার তাহার এক একটি ক্রিয়া বৈশিষ্ট্যকে মূর্তিময় করিয়া নাটকোচিত ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রবৃত্তি মার্গ হইতে মন কি অবস্থায় নিবৃত্তিমার্গে উপনীত হয় তাহারই প্রক্রিয়া নাটকখানির বিষয়। অধ্যাত্মবিজ্ঞানে একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনকেই রাজা বলা হয়। প্রবৃত্তি ও তাহার সহচরী কুমতির প্রেরণায় কার্য করিয়া অবসাদগ্রস্ত মন বিবেক সহায়ে নিবৃত্তির দুয়ারে পৌঁছিয়া তাহার সহচরী সুমতির প্রেরণায় বৈরাগ্যলাভ করিল। বৈরাগ্যের পথে ভক্তি দেখা দিয়া মনকে প্রেমিক করিয়া তুলিল। তখন আত্মজয় দ্বারা যথাকালে মন জ্ঞান লাভ করিল। মন সত্য-শিব-সুন্দরকে পাইয়া বা সচ্চিদানন্দময় অবস্থায় থাকিয়া ক্রমশ নিরঞ্জন সত্তার উপলব্ধি করিয়া লইল।

নাটককার ২৮খানি ইঙ্গিতপূর্ণ গানের ভিতর দিয়া গদ্য ও গৈরিশ ছন্দের মাধ্যমে অধ্যাত্ম সম্বন্ধীয় এই রূপক নাটকটি রূপায়িত করিয়াছেন। মনোরাজ্য সম্বন্ধীয় এরূপ সার্থক রূপক আর

দ্বিতীয় নাই। নাট্যসাহিত্যে নাট্যকার এই একখানি গ্রন্থ লিখিয়া অমর হইয়া রহিলেন। এই নূতন লেখকের লেখার ভঙ্গিমায় কাঁচা হাতের ছাপ মাঝে মাঝে দেখা গিয়াছে, কিন্তু বস্তুর তুলনায় সে দোষ সামান্যই। বৈষ্ণবীয় ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তির বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা আছে, জ্ঞানমার্গ সাধকের পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয় এই গ্রন্থে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী' নামে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বর গুপ্তের 'বোধেন্দুবিকাশ নাটক' নামে একখানি দৃশ্যকাব্য রচিত হইয়াছিল, ইহাতে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ক্রীড়া দেখানো হইয়াছে। এগুলির নাটকীয় সার্থকতা নাই, 'আত্ম-দর্শন' কিন্তু সার্থক নাটক।

ষোড়শী

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই নাটকখানি স্বয়ং রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাটকীয় লিপি-কুশলতা কতদূর কার্যকরী ইহার বিশ্লেষণে তাহা আলোচিত হইবে। এখানি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট তারিখে নাট্যমন্দিরে প্রথম অভিনীত হইয়াছে। আধুনিক নাট্যকারের মতো প্রয়োগ শিল্পীর যাবতীয় নির্দেশই নাটকের মধ্যে পাওয়া যায়। এখানি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা' নামক কথা কাহিনীর নাট্যরূপ। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ষোড়শী-জীবানন্দ সংবাদ দৃশ্যটি কি সংলাপের গুরুত্বে, কি নাটকীয় সংঘাতস্পর্শে বরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। নিরুদ্দিষ্ট হইবার পূর্বে অলকা-জীবানন্দের বিবাহকালীন অসম্পূর্ণ শুভদৃষ্টি নারীর অন্তররাজ্যে যে ছায়াচিত্র চিরাঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল তাহা যে আজও মুছিয়া যায় নাই, বরং জীবানন্দ-ষোড়শীর ভবিষ্যৎ জীবনকে এই কীলকের উপর ঝুলাইয়া ভবিষ্যৎ ঘটনা-পরম্পরা আবর্তিত করিয়াছে এ দৃশ্যে তাহাই প্রমাণিত হইল।

আধুনিক নাট্যকাররা বড়ই সমাজ সচেতন হইয়াছেন, এর প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাটকগুলিতে পাওয়া গিয়াছে। কবি-নাট্যকার স্বয়ং পাত্র-পাত্রীর বাহিরের লোক হইয়া 'রথের রশি' নাট্যে শূদ্রের টানে কেন রথ চলিল তাহার মীমাংসা করিতে গিয়া কবি স্বয়ং রঙ্গক্ষেত্রে দেখা দিয়া বলিলেন—"এই বেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন * * যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে, যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক্ একবার মাথা তুলে।" ষোড়শী নাটকেও নাট্যকার প্রয়োগকর্তার আসনে বসিয়া প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ভৈরবীর বয়স জিজ্ঞাসা করিবার ব্যপদেশে পরে কি ঘটনা ঘটিবে তাহার নির্দেশসূচক বলিতেছেন—"ঘরের মধ্যে ক্রমশঃ সন্ধ্যার আবছায়া ঘনাইয়া আসিতে লাগিল" এবং সমুদয় সংশয়টি উচ্ছেদের পর ঐ দৃশ্যের শেষের দিকে বলা হইল—"আলো নিভাইতেই অতি প্রত্যূষের আবছায়া আভা জানালা দিয়া ঘরে ছড়াইয়া পড়িল।" দৃশ্যে ও জীবানন্দের মনে যুগপৎ এই ক্রিয়া চলিতেছিল। এগুলি নাটককারের সমাজ-সচেতনার ফল।

Morgan সাহেব তাঁহার 'Tendencies of modern English drama' গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন—'Another tendency of the serious modern dramatist is to over-emphasise the inter-pretative side of his art.'

নাটকটির মধ্যে সংলাপের মান এত উচ্চ ও রহস্যময় যে তাহার রহস্যোদ্‌ভেদ হইতে না হইতেই নূতন রহস্যের সৃষ্টি হইয়া যায়। এ ধরণের সংলাপ শরৎ পূর্ব নাট্যসাহিত্যে অত্যন্ত বিরল। উহার আরও একটা কায়দা এই যে কোন মীমাংসায় পৌছিবার পূর্বেই তাহা শুরু হইয়া যায়। সংলাপের মধ্যে

romance সর্বত্র ক্রীড়া করিয়াছে, কিন্তু তাহা এতই প্রচ্ছন্নভাবে যে ধরা-ছোঁয়া যায় না, ইহাই শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। নাটকটির পরাকাষ্ঠা ধীরে ধীরে তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে আসিয়াছে। জীবানন্দ-ষোড়শীর বিচ্ছেদ কি মিলনে তাহা ঘটিল দর্শক বা পাঠক সমাজ রসগ্রহণের অধিকার ভেদে তাহা বুঝিয়া লউন।

নাটকখানি চারি অঙ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। শরৎচন্দ্র ইহাতে প্রচলিত সমাজের দোষ-ত্রুটি, গ্রামের দলাদলি, দেবায়তনের আয়ের দিকে কর্তৃপক্ষের লালসাপূর্ণ দৃষ্টি প্রভৃতি বিবিধ সামাজিক দোষের পরিণাম দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রণয়-ব্যাপারে প্রথম অঙ্কে অলকার প্রচ্ছন্ন অভিমান জীবানন্দের সহিত মিলনে যে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে জীবানন্দের অভিমান ও মৃত্যু আসিয়া ষোড়শীর আত্মদান ব্যাপারে নাটকটিকে বিষাদান্ত করিয়া তুলিল। নাটকের গানগুলি ভাব সম্প্রসারণে বড়ই মুখর। অপরাজেয় কথাশিল্পী নাট্যক্ষেত্রের প্রথম দানে অপরাজিতই থাকিয়া গেলেন।

মানময়ী গার্ল্‌স্ স্কুল

এই ত্র্যঙ্ক নাটকখানি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর শুক্রবার তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র এই গ্রন্থের প্রণেতা, দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ আলোচিত হইল। ১৯৩৩ সালের ৭ই জানুয়ারি তারিখে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। আধুনিক নাটক বলিয়া নাট্যকার প্রতি অঙ্ক ও দৃশ্যে নিজেই প্রয়োগকর্তা সাজিয়া সমুদয় নির্দেশ দিয়াছেন। সংলাপের রীতিতে ড্যাশের ব্যবহার দ্বারা ইঙ্গিত ও উহ্য কথার অন্তর্লক্ষ্য প্রকাশিত করিবার পদ্ধতি এ নাটকে প্রথম দেখানো হইয়াছে। ইহাকে আধুনিক রীতিতে সংলাপের মানের পরিবর্তন বলা চলে। লেখায় আধুনিকতার স্পর্শ থাকিলেও স্বগতোক্তি প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য নাট্যসমালোচক এ রীতির বিরোধী। পূর্বপ্রচলিত নাটকীয় পরিবেশ এখানিতে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। অভিনয় করিতে করিতে দুইজনের প্রেম কিরূপে প্রণয়ে পরিণত হইয়া গেল তাহার মূর্তিমান বিগ্রহ একদিকে মানস ও নীহারিকা অপরদিকে রাজেন্দ্র ও চপলা। গ্রাজুয়েট ও গার্ল্‌স্ স্কুলই নাটকটির পরিবেশ।

আদর্শ প্রেমের খনি দামোদর ও মানময়ীর ছোঁয়াচ নায়ক-নায়িকার vaccinationএর কাজ করিয়াছে। কমেডির প্রাচীন নির্দেশিত পথ এখানি যথার্থ ই অতিক্রম করিল।

পাঁচখানি গান ও গদ্যের মাধ্যমে কমেডিখানি রূপায়িত। রাজেন্দ্রের কথার মাত্রা 'যথার্থ' যাহা ইংরাজি 'exactly, justly, surely, rightly' প্রভৃতি কথার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে তাহা রসরাজ অমৃতলালের 'খাসদখল' নাটকের নিতাইয়ের 'is the' মাত্রাকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

এইখানেই প্রাচীন নাট্যকারদের কয়েকখানি বিক্ষিপ্ত দৃশ্যকাব্যের আলোচনা শেষ হইল। আলোচনার মধ্যে তাহাদের দোষ-গুণ ব্যক্ত হইয়াছে।

নাটকীয় কাহাকে বলে

এই গ্রন্থের বহুস্থানে নাটকীয় শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে এবং গ্রন্থ মধ্যে তাহার স্থূল ব্যাখ্যা মাঝে মাঝে দেওয়া গিয়াছে, কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের বিখ্যাত নাট্যসমালোচক নিকোল সাহেব তাঁহার 'The Theory of drama' গ্রন্থে যে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দিয়াছেন সাধারণকে বুঝাইবার জন্য তাঁহার ব্যাখ্যানের মর্ম-কথা দেওয়া হইল—"দৃশ্যকাব্যের মধ্যে কোন সংবাদকে নাটকীয় তখনি বলা হয়, যখনি কোন ঘটনাজনিত আঘাতের ফলে অপ্রত্যাশিত কিছু চমকপ্রদ সমাপতনের মতো (strange

coincidence) হইয়া হোক্ বা সাধারণ মানুষের জীবনে যাহা ঘটে না সেরূপ ভাবেই হোক্ উপস্থিত হইয়া থাকে।" এই সংজ্ঞা দ্বারা বিচার করিলে নাটকের নাটকত্ব বুঝিবার কোন অসুবিধা আর হইবে না।

দৃশ্যকাব্যে রসানুভূতি

আলংকারিকেরা রস লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন। কেহ ব্রহ্মকেই রস বলিয়াছেন, যেমন 'রসো বৈ সঃ', আবার কাব্য-রসাস্বাদকে 'ব্রহ্মানন্দ সহোদরঃ' আখ্যা দিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি জন্মিলে যেমন জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, দৃশ্যকাব্যের রসানুভূতি জন্মিলে সেইরূপ নায়ক-নায়িকা, অভিনেতা, দর্শক বা পাঠকের পৃথক অস্তিত্ব ভলাইয়া গিয়া রসানন্দে সকলকে ডুবাইয়া রাখে। মানুষের মনের ভিতরকার সুপ্ত বিভাবাদি স্থায়িভাবগুলি যখন উদ্দীপক ঘটনার সাহায্যে আস্বাদনযোগ্য হইয়া দেখা দেয় তখন তাহাকেই রস বলা হয়। রসের পৃথক রূপ নাই, আস্বাদনীয় হইলেই রসের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অপর আলংকারিক 'নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া' এরূপ বলিয়াছেন। ভাব ও রস এক পদার্থ নহে। ভাব জিনিসটা ব্যক্তিগত নির্বিকার চিত্তের প্রথম বিক্রিয়া, রস ব্যাপক অর্থাৎ সমষ্টিগত চিত্তের আস্বাদ্য জিনিস। অলৌকিক-প্রতিভাসম্পন্ন কবি যখন পুত্রস্নেহের নির্যাস লইয়া আদর্শ বাৎসল্যের কোন চিত্র অঙ্কিত করেন তখন উহা ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে সঞ্চারিত হয় বলিয়া অলংকারোক্ত 'পরস্য ন পরস্যেতি, মমেতি চ মমেতি ন' অর্থাৎ পরের অথচ পরের নহে, আমার অথচ আমার নহে এইরূপ বোধের সংঘর্ষে আসিয়া বাৎসল্যরসের সৃষ্টি হয়, এবং তাহাতেই দর্শক বা পাঠক যে আনন্দ উপভোগ করে তাহাই রস। রসের সহিত আনন্দের নিত্য সম্বন্ধ, তাই আদি, করুণ প্রভৃতি নব-রসের প্রত্যেকটাই আনন্দপ্রদ। অধিকারীভেদে ইহার অনুভূতির তারতম্য হয় মাত্র।

আধুনিক বাঙ্গালা নাটক প্রাচ্যের রস ও প্রতীচ্যের ঘটনার সমবায়ে রচিত হইয়া বঙ্গবাসীকে আনন্দ বিতরণ করিতেছে, এবং দৃশ্যকাব্যের ভিতর দিয়া পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াক্রমে দর্শক বা পাঠকের রসানুভূতি জন্মিতেছে।

নাটকের বৈশিষ্ট্য

উপন্যাস এক হিসাবে মানুষের জীবনচরিত, নাটক সেই হিসাবেই জীবন্ত মানুষের প্রতিচ্ছবি— অন্তর্দ্বন্দ্বে ও ক্রিয়ায় ইহার অভিব্যক্তি। মানুষের একটিমাত্র পদক্ষেপে নাটকের সূচনা এবং তাহার জীবনের গতি তাহাতেই নির্ধারিত। সমগ্র নাটক সেই একটি মুহূর্তের ইতিহাস। নাটক নিসর্গের প্রতিচ্ছবি হইলেও নাটককারের প্রতিভাবলী সৃষ্টি, এ সসীম শিল্পের অন্তরালে অসীমের ভাব লুক্কায়িত থাকে। নায়ক বা নায়িকা চরিত্রের চরমবিকাশ অপরিবর্তনীয় হইয়া উঠিলে ঘটনার সম্পূর্ণ বিরাম ঘটে, এবং তাহাতেই নাটকের যবনিকাপাত হয়।

সংযত সংহত পূর্বাপর সম্বন্ধবিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত সংলাপ নাটকের প্রাণ। অনাবশ্যক কথা তাহার মধ্যে থাকিলে চলিবে না। উৎকৃষ্ট নাটক সংলাপের কায়দায় একের দ্বারা উত্থিত ঘাত অপরের দ্বারা প্রতিঘাত তুলাইয়া ধাপে ধাপে পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। ট্রাজেডিগুলি শেষ দৃশ্যে নায়ক বা নায়িকার কার্য-পরম্পরার চিহ্ন দর্শক বা পাঠকের চিত্তে চিন্তার খোরাক হিসাবে রাখিয়া শেষ হইয়া যায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই গুলিই নাটকের বৈশিষ্ট্য।

উপসংহার

মানুষের মনোরাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া নানাভাবে ও আকারে রূপ হইতে রূপান্তরে পরিবর্তিত হইতে হইতে বাংলা দৃশ্যকাব্য বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, 'দৃশ্যকাব্য পরিচয়' সে কথা ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া তাহার এই বিরাট দেহ-মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছে, কিন্তু আজ এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্যের অবসানে বলিতে বাধ্য হইতেছি, যে কি কারণে জানি না দৃশ্যকাব্যের চাহিদা বর্তমানে সবাক চলচ্চিত্র গ্রহণ করিয়া লইয়াছে, যদিও তাহাতে নাটকের মর্ম অপেক্ষা কায়ার খবরই বেশি থাকে। 'কালো হি বলবত্তরো।' যখন যাহা বড় হইয়া দেখা দেয় কালই তাহাকে তুলিয়া ধরে।

পৃথিবীর বর্তমান পরিবেশে গুরুগম্ভীর নাটকের অভিনয় যেন গুহীভূত অবস্থায় অনুকূল কালের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। হাল্কাভাব মানুষকে এখন অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাই নাচ, গান ও সন্দরের যৌন আকর্ষণ পূর্ণ সিনেমা তাহাকে আমোদ দিতেছে।

ইওরোপের সর্বত্র প্রচলিত ব্যালে নৃত্য রাশিয়া দেশে নৃত্যনাট্যে পরিণত হইয়া দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইয়াছে। ইওরোপ ভ্রমণ কালে রবীন্দ্রনাথও ঐ নৃত্যনাট্যের প্রভাবে পড়িয়া নিজ প্রতিভাবলে কতকগুলি নৃত্যনাট্য রচনা করিয়া অভিনীত করাইয়াছিলেন, তাঁহার কালবিভাগে এ সম্বন্ধীয় আলোচনা দ্রষ্টব্য। কথাকলি, মণিপুরী প্রভৃতি বিবিধ ধরণের মুদ্রাসংযুক্ত নৃত্য প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল।

আমাদের দেশে আধুনিক নৃত্যনাট্যের উপরেও ঐ ব্যালের প্রভাব দেখা যায়। এর মূলে আছেন উদয়শঙ্কর। আনা পাবলোভার নৃত্যসম্প্রদায়ে তিনি বহুকাল নর্তকরূপে কাজ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি যে রুশীয় ব্যালের প্রত্যেকটি বিশেষত্বের সহিত সুপরিচিত, এটুকু অনায়াসে অনুমান করা যায়। পৃথিবী মানুষের বাসভূমি, তাহার প্রতি অংশের প্রভাব একদিন না একদিন মানুষকে প্রভাবান্বিত করিবেই।

ভারতের প্রাচীন মর্যাদাবোধক নৃত্য (Classical dance) যাহা দাক্ষিণাত্যে 'মীনাক্ষি সুন্দরমের' সুবিখ্যাত নৃত্যপটিয়সী শিষ্যা শ্রীমতী শান্তার প্রচেষ্টায় 'ভারত নাটাম্' নামক এক সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষের হস্ত ও তাহার অঙ্গুলী সঞ্চালনের সাহায্যে নানামুদ্রার সৃষ্টি করিয়া তাহার সহিত দেহের অঙ্গ-ভঙ্গীর সৌষ্ঠব-গতি দেখাইয়া দেশ-বিদেশের দর্শকবৃন্দকে স্তম্ভিত করিতেছে, তাহা এক অপূর্ব দৃশ্য। শ্রীমতী শান্তার চক্ষু, হস্ত ও পদদ্বয় যুগপৎ দেহের নমনীয়তার সহিত নৃত্য করিতে থাকে, এবং কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীত তৎসহ পরিচালিত হইয়া উহার গৌরব বৃদ্ধি করে। আবর্তিত নাট্যজগতে ইহা যেন তৌর্যত্রিকের পুনরাগমন, প্রাচীনের নূতনরূপে প্রত্যাবর্তন। গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এটি সম্পর্কহীন, তাই ভবিষ্য লেখকের জন্য ইঙ্গিত মাত্র করিয়া অপসৃত হইলাম।

সিনেমার অভিনয়ে Biographical dramaও দেখা দিতেছে, এগুলি আমাদের গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয়ের বহির্ভূত ব্যাপার, তাই মাত্র নামোল্লেখ করিয়া ভবিষ্য সমালোচকের আলোচনার জন্য উহা রাখিয়া দিয়া পাঠকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সমাপ্ত

কৃতজ্ঞতা

এই গ্রন্থের রচনাসম্বন্ধে কতকগুলি কৃতজ্ঞতা আছে, গ্রন্থশেষে সেগুলির উল্লেখ না করিলে প্রত্যবায়ের ভয় আছে। যথাক্রমে ঐগুলির স্বীকার করিতেছি :—

১। পরলোকগত নাট্যকারগণের গ্রন্থনিচয় আমার আসল উপজীব্য তজ্জন্য সর্বপ্রথমে তাঁহাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

২। আমার দ্বিতীয় কৃতজ্ঞতা সর্বশেষ তালিকা-বর্ণিত গ্রন্থ, নিবন্ধ বা প্রবন্ধের রচয়িতাদের উপর আসিয়া পড়ে। এই গ্রন্থ-প্রণয়ন-বিষয়ে ঐ সকল ব্যক্তির গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি, যথাস্থানে তাহার উল্লেখ আছে; এ ঋণ অপরিশোধনীয়।

৩। আমার তৃতীয় কৃতজ্ঞতা কলিকাতা শিকদার বাগানের অবৈতনিক বান্ধব নাট্যসমাজের কর্তৃপক্ষের উপর প্রকাশিত হইল। তাঁহাদের ঐকান্তিক যত্নে ও শিক্ষার গুণে তাঁহাদের শৌখিন অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত দুই-তিনখানি নাটকে আমি নটবেশে অভিনয় করিয়া দৃশ্যকাব্য-সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। এই গ্রন্থ-প্রণয়নে সেই জ্ঞান অনেক স্থলে কার্যকরী হইয়াছে, তজ্জন্য তাঁহাদের কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

৪। আমার চতুর্থ কৃতজ্ঞতা বেলগাছিয়া নিবাসী স্নেহভাজন শ্রীমান্ সনৎকুমার গুপ্তের উপর প্রকাশিত হইল। তিনি তাঁহার পাঠাগার হইতে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পড়িতে দিয়া আমার এ গ্রন্থ-প্রকাশে সহায়তা করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেছি।

গ্রন্থ-পঞ্জী (bibliography)

বাঙ্গালা

(১) যোগীন্দ্রবসুর 'মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত'
(২) দুর্গাদাস লাহিড়ীর 'পৃথিবীর ইতিহাস'
(৩) বর্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্যশাখার 'সভাপতির অভিভাষণ'
(৪) দীনেশ সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'
(৫) রাজনারায়ণ বসুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা'
(৬) রামগতি ন্যায়রত্নের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব'
✓(৭) বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'গোপাল উড়ের টপ্পা গান'
(৮) ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস'
(৯) গঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা'
(১০) 'ভারতী পত্রিকা', মাঘ, ১২৮৮ সাল
✓(১১) সঞ্জীব চট্টোর 'যাত্রা সমালোচনা'
(১২) বসন্ত চট্টোর 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'
(১৩) প্রমথ মল্লিকের 'কলিকাতার কথা', ২য় খণ্ড
(১৪) অবিনাশ গাঙ্গুলীর 'গিরিশচন্দ্র'
(১৫) ডাঃ হেমেন্দ্র দাশ গুপ্তের 'গিরিশপ্রতিভা'
✓(১৬) শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'ভারতীয় নাট্যরহস্য'
(১৭) রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল'
(১৮) শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'
(১৯) নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত 'আমার জীবন' (৫ম ভাগ)

(২০) হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' (১ম ভাগ)

(২১ বিপিন বিহারী গুপ্তের "পুরাতন প্রসঙ্গ"

(২২) হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "কলিকাতার সেকাল ও একালের ইতিহাস"

(২৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবনস্মৃতি'

(২৪) ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোঃ 'রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচয়'

(২৫) কবি নবীন সেন কৃত 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'র অনুবাদ

(২৬) পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী'

(২৭) হাফ্ আখ্ড়াই সংগীত সংগ্রামের ইতিহাস গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর (ভট্টাচার্য) বিরচিত।

(২৮) সাধন-সমর বা দেবী-মাহাত্ম্য—ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব।

(২৯) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডাঃ সুকুমার সেন।

(৩০) দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'শকুন্তলায় নাট্যকলা'

সংস্কৃত

(১) সাহিত্যদর্পণম্

(২) শব্দকল্পদ্রুমঃ

(৩) সঙ্গীত দামোদরঃ

ইংরাজী

(1) Encyclopaedia Britannica (11th edition)

(2) Weber's 'Dramatic history of the World'

(3) Kumarswami's 'Dramatic literature of the World'

(4) Ward's 'Dramatic literature'

(5) Hazelette's 'Characters of Shakespeare's plays'

(6) Calcutta Review Vol XIII, 1850

(7) Calcutta monthly Journal

(8) Schlegel's 'Dramatic literature'

(9) Dryden's 'Essay on the defence of dramatic poesy'

(10) Dowden's 'Shakespeare – his mind and art'

(11) Hudson's "Shakespeare, his life, art and characters"

(12) Dr. H. P. Dass Gupta's 'Indian Stage Vol II'

(13) Bengali Literature in the 19th century—Dr. S. K. De

(14) Western influence in Bengali literature—Priyaranjan Sen

(15) The origin and development of the Bengali Language – Dr. Suniti Kumar Chatterjee

ইতি—গ্রন্থকার।

নির্দেশিকা

(বর্ণানুক্রমে)

ঈ

উ

ঊ

ছ

জ

ট

ঠ

ড

প

ষ

স

হ

ক্ষ

সংশোধনী

[চন্দ্রবিন্দু, রেফ, ঋকার, র-ফলা, হসন্ত, হ্রস্বউকার, দীর্ঘউকার—যেগুলি অক্ষরের উপরে ও নিচে থাকে মুদ্রাযন্ত্রের কলের টানে সেগুলি ছাপিবার কালে বাহির হইয়া যায়। ঐগুলি সহজবোধ্য বলিয়া তালিকার অন্তর্গত করা হয় নাই]

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভুল	ঠিক
নিবেদন	২৭	যথাক্রমে	যথাক্রমে
৭	১৬	হিন্দুকাব্যের	হিন্দুদৃশ্যকাব্যের
৯	২৮	Hazlettes'	Hazlette's
১১	২৩	ইতি	ইনি
১১	২৪	সংস্কৃতভাষার	সংস্কৃতভাষায়
১২	৩	জনসাধরণ	জনসাধারণ
৩৯	১৮	যে	যে
৫৩	২৩	নিক্রিয়তা	নিষ্ক্রিয়তা
৫৪	৩৪	ours	hours
৫৪	৩৫	,'Dramatic	"Dramatic
৫৯	৩৪	সাবলীন	সাবলীল
৬০	১৫	ভাবায়	ভাষায়
৬২	৪	কাছ	কাছে
৬৫	২৩	কাবরূপ	কাব্যরূপ
৬৬	৫	এখনি	এখানি
৭০	২৬	এতাবত্ত	এতাবত্তা
৭০	২৬	কালের	কলের
৭৯	১০	থাক	থাকা
৮০	২৩	রসোৎসব	রাসোৎসব
১০০	৮	নবীনচন্দ্রর	নবীনচন্দ্রের
১০৭	২৬	লক্ষণে	লক্ষ্মণে
১১৭	৩০		কার্য (বসিবে)
১২৪	২৬	সংকল্প	সংকল্প
১৪১	১৩	আসিয়াছে	আসিয়াছে
১৬৮	৫	পর ম্ম	পরব্রহ্ম
১৯১	৩৪	'লুম চারদল ফেরা	চারদল ফেরালুম,
১৯২	২৬	ম্পটের	লম্পটের
২২৩	৩৩	পদ-চি	পদ-চিহ্ন
২২৮	৯	দেবলো	দেবলোক
২৩৩	৬	নিরস	নীরস
২৪৮	৩৪	করলেন	করিলেন
২৬৪	২২	বুঝিলেম	বুঝিলেন
২৬৫	২২	করিয়	করিয়া
২৭২	৭	হে।	হেথা
২৭২	৩৩	এড়াব	এড়াবে
২৮৫	২	জল	জলে
২৮৬	২৯	নীচত্ত	নীচতা
৩০২	২৫	চিতোয়ে	চিতোরে
৩০৫	২৮	অপদেয়তার	অপদেবতার
৩৩১	২	কৃতিত্ব	কৃতিত্ব
৩৩১	১১	ভোটদ্বারার	ভোটদ্বারা
৩৫১	১৬	ideosyncrasy	idiosyncrasy
৩৬৯	১০	এখান	এখানি
৩৬৯	২২	সাগর-তনয়	সগর-তনয়
৪২৮	৩	মুখে	মুখে
৪৭০	১৩	থিয়েটার	থিয়েটারে
৪৭৯	২৩	তৃষ্ণিত	তৃষিত
৪৮৫	৯	মহাত্ম্যে	মাহাত্ম্যে
৪৯৫	৮	পয়-প	পয়-পয়